বাঙ্গালীর ইতিহাস

আদি পর্ব

১

বাঙ্গালীর ইতিহাস
আদি পর্ব

প্রথম খণ্ড

পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ
সমিতি

প্রথম সংস্করণ
মাঘ, ১৩৫৬

প্রথম সাক্ষরতা সংস্করণ ॥ (তৃতীয় সংস্করণ)
১১ই মাঘ, ১৩৮৬
২৬শে জানুয়ারী, ১৯৮০

প্রকাশক
দীন মহম্মদ
সাক্ষরতা প্রকাশন
পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি
বিদ্যাসাগর সাক্ষরতা ভবন
৬০, পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক
কানাইলাল বসাক
ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্ট প্রেস
১৭৩, রমেশ দত্ত স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদপট ও নামপত্র
পরিকল্পনা-গ্রন্থকার

অঙ্কন
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রাণকৃষ্ণ পাল

মানচিত্র
বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগের সৌজন্যে

গ্রাহক মূল্য—দুই খণ্ড একত্রে ৫০ টাকা
সাধারণ মূল্য দুই খণ্ড একত্রে ১০০ টাকা

"সার্থক জনম আমার
জন্মেছি এই দেশে
সার্থক জনম মা গো
তোমায় ভালবেসে।"

—রবীন্দ্রনাথ

যাঁহাদের চরণতলে দেশের ইতিহাসে
আমার দীক্ষা

*

যাঁহারা এ-পথের পূর্বগামী পথিক

*

যাঁহাদের চর্চা ও মননের ফলে বাঙলাদেশ ও বাঙালী জাতি
আমার চিত্তের নিকটতর হইয়াছে

*

যাঁহাদের জীবন-সাধনা আমাকে
দেশকে ও দেশের মানুষকে ভালবাসিতে শিখাইয়াছে

*

সেই জীবিত ও মৃত, জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সাধকদের
উদ্দেশ্যে

শ্রদ্ধাঞ্জলি

পরিচয়-পত্র

অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায়ের "বাঙালীর ইতিহাস" একখানি অমূল্য গ্রন্থ। বহু বৎসর ধরিয়া ইহা আমাদের অবশ্য-পঠিতব্য প্রামাণিক পুস্তক বলিয়া গণ্য হইবে, এবং ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের পথনির্দেশ করিবে।

নীহাররঞ্জন বিনয়ের সঙ্গে বলিয়াছেন, '...আমি কোনও নূতন শিলালিপি বা তাম্র-পট্টের সন্ধান পাই নাই, কোনও নূতন উপাদান আবিষ্কার করি নাই।...যে-সমস্ত তথ্য ও উপাদান পণ্ডিত-মহলে অল্পবিস্তর পরিচিত ও আলোচিত, প্রায় তাহা হইতেই আমি সমস্ত তথ্য ও উপকরণ আহরণ করিয়াছি।...আমি শুধু প্রাচীন বাঙলার ও প্রাচীন বাঙালীর ইতিহাস একটি নূতন কার্যকারণসম্বন্ধগত যুক্তিপরম্পরায় একটি নূতন দৃষ্টিভঙ্গির ভিতর দিয়া বাঙালী পাঠকের কাছে উপস্থিত করিতেছি মাত্র।...এই যুক্তি ও দৃষ্টি অনুসরণ করিলে প্রাচীন বাঙালীর ইতিহাসের সামগ্রিক সর্বতোভদ্র রূপ দৃষ্টিগোচর হয়...। নূতন নূতন উপাদান প্রায়শ আবিষ্কৃত হইতেছে।...আমি শুধু কাঠামো রচনার প্রয়াস করিয়াছি—ভবিষ্যৎ বাঙালী ঐতিহাসিকেরা ইহাতে রক্তমাংস যোজনা করিবেন, এই আশা ও বিশ্বাসে।...'

মনীষার যে সমৃদ্ধি এই গ্রন্থে পরিস্ফুট, সেই সমৃদ্ধি যাঁহার আছে তিনি বিনয়ী হইবেন, ইহা বিস্ময়ের বিষয় নহে। তবু, নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায় যে, যতদিন পর্যন্ত আরও নূতন তথ্য প্রচুর পরিমাণে আবিষ্কৃত না হইবে, যতদিন পর্যন্ত সুদীর্ঘ গবেষণার ফল আরও ব্যাপক ও গভীর ভাবে বাঙালীর প্রাচীন জীবনের ইতিহাস আলোকিত না করিবে, ততদিন পর্যন্ত এই গ্রন্থের অতি উচ্চ আসন আর কেহ অধিকার করিতে পারিবে না, ইহার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকিবে। ইতিহাসের যে বিরাট দৃশ্য এই গ্রন্থে উদ্‌ঘাটিত এবং যে মহামূল্যবান্ বিভাগটি এই গ্রন্থের অন্তর্গত তাহা বুঝিতে হইলে এবং তাহাতে বিশুদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে এই গ্রন্থ পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পাঠ এবং নীহাররঞ্জনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গভীর জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মন্তব্যগুলি বারবার আলোচনা করা ভিন্ন অন্য গতি নাই। এই গ্রন্থ আমাদের দেশের ইতিহাস আলোচনার নূতন পথ রচনা ও নূতন আদর্শ স্থাপন করিল। পরবর্তী গবেষকদের ইহাকে ভিত্তিরূপে লইয়া কাজ আরম্ভ না করিলে আমাদের নিজের ইতিহাসের ক্ষেত্রে জ্ঞানবিস্তার সম্ভব হইবে না।

ইতিহাসের কথা ছাড়িয়া, ভাষা ও সাহিত্যের দিক হইতেও সমগ্র বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে ইহা একটি অনন্যপূর্ব গ্রন্থ। ইতিহাস-বিষয়েই শুধু নয়, সাহিত্য-রচনার ক্ষেত্রে এত বিশদ, এত পূর্ণাঙ্গ, এত পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও যথার্থ বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে রচিত

গ্রন্থ ইহার আগে কেহই লেখেন নাই। শুধু ইহার আকারে নহে, শাখাপল্লবে নহে, বিষয়-নির্বাচনে নহে,—বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রতি নীহাররঞ্জনের অটুট নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা, অসংখ্য ক্ষেত্রে গভীর জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গির সজীব বৈশিষ্ট্য, সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি, উচ্চস্তরের বস্তুনিষ্ঠ কল্পনা, এবং সর্বোপরি সত্যে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন চিন্তা করিবার শক্তি এই গ্রন্থকে সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যের জগতে অদ্বিতীয় আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। গ্রন্থকার অনেক নূতন শব্দ চয়ন করিতে, নূতন পদাংশ ও বাক্‌ভঙ্গি ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছেন; দুরূহ ভাব ও অনভ্যস্ত ভঙ্গি ও চিন্তা আয়ত্ত করিয়া অর্থ ও ব্যঞ্জনাময় ভাষায় সেগুলি ব্যক্ত করিয়াছেন। তথ্যবহুল মননশীল গ্রন্থ বাঙলা ও ভারতীয় অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায় খুব বেশি রচিত হয় নাই; এমতাবস্থায় এই কাজটি যেমন কঠিন তেমনি নূতন। অথচ, নীহাররঞ্জনের ভাষার বেগ ও উদ্দীপনা দেখিয়া মনে হয়, এ-কাজ যেন তিনি খুব সহজেই করিয়াছেন। বিষয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ একাত্মতা না হইলে এই সাফল্য সম্ভব নয়। কোথাও কোথাও তাঁহার বিবরণ ও মন্তব্যের ভাষা সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যে এই ধরনের সার্থক প্রয়াস আর কেহ করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই।

ইংরেজি ভাষায় এই গ্রন্থ রচিত হইলে নীহাররঞ্জন ব্যক্তিগতভাবে উপকৃত হইতেন; গ্রন্থের প্রচার বেশি হইত, তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা সুদূরব্যাপী হইত। কিন্তু তিনি যে তাহা করেন নাই ইহা বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগেরই প্রমাণ।

বিষয়-গৌরবেও এই গ্রন্থ অনন্যপূর্ব। এই গ্রন্থের নাম রাখা হইয়াছে বাঙলার ইতিহাস নহে, বাঙালীর ইতিহাস; অর্থাৎ, ইহা বাঙলা দেশের রাজা, রাজকর্মচারী, যুদ্ধবিগ্রহ, শাসন-বিস্তার প্রভৃতি বর্ণনার উদ্দেশ্যে লিখিত নহে, কারণ, সেরূপ "গ্রহ বাহ্য" ইতিহাস তো আগে অনেক লেখা হইয়াছে। এই গ্রন্থ বাঙালীর লোক-ইতিহাস; ইহাতে বাঙালীর জনসাধারণের, বাঙালী জাতির সমগ্র জীবন-ধারার যথার্থ পরিচয় দিবার জন্য অশান্ত চেষ্টা করা হইয়াছে। সুতরাং, বলা যাইতে পারে, এই ঐতিহাসিক কাব্যটির "নায়ক" রাজবংশ নহে, ধনীসমাজ নহে, পণ্ডিতবর্গ নহে, জাতীয় চিন্তায় শিক্ষিত নেতাদের সমাজ নহে—যাহাদের বলা হয় জনসাধারণ, যাহারা উচ্চ বর্ণসমাজের বাহিরে, পৌরাণিক ও স্মৃতিশাসিত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বাহিরে, যাহারা গ্রামের দরিদ্র ভূমিহীন বা স্বল্প ভূমিবান প্রজা বা সমাজ-শ্রমিক তাহারাই এই ইতিকথার "নায়ক"—যদিও নীহাররঞ্জন প্রথমোক্ত শ্রেণী ও সমাজের লোকেদের কথাও ভুলেন নাই, তাহাদের ইতিহাসও বাদ দেন নাই। এই নিম্নতর কিন্তু বৃহত্তম সামাজিক স্তরকে প্রধান আলোচ্য বিষয় করাই এই গ্রন্থের সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্য ও অনন্যপূর্বতা। অথচ, এইরূপ সামাজিক ইতিহাসই বর্তমান ইউরোপ ও আমেরিকার পণ্ডিত সমাজে সর্বোচ্চ শ্রেণীর ইতিহাস বলিয়া গণ্য করা হয়।

এগারো

সত্য বটে, ইহার পূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত ও শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার-সম্পাদিত (ইংরেজি ভাষায়) বাঙলার ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে, এবং খুব সংক্ষিপ্তাকারে শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন-রচিত "প্রাচীন বাঙলা ও বাঙালী" (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ পুস্তিকামালা, ১২ নং) বাঙলা পুস্তিকাটিতে এইরূপ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের আভাস পাওয়া গিয়াছিল। সেই দুই গ্রন্থের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে সন্দেহ নাই ; কিন্তু তাহাতে আংশিক আলোচনার স্থান মাত্র ছিল, তাহাদের পরিকল্পনাও ছিল অন্য প্রকৃতির।

অধ্যাপক নীহাররঞ্জনের বিরাট গ্রন্থের সমস্তটারই বিষয়বস্তু হইতেছে বাঙলার লোকেদের দৈনন্দিন জীবন, সমাজ, ধর্মকর্ম, সংস্কৃতি, ধনসম্পদ প্রভৃতি। অর্থাৎ, বাঙালী জাতি কি করিয়া ক্রমে ক্রমে আজিকার বাঙালীতে বিবর্তিত হইয়াছে, তাহা বুঝিবার চেষ্টা। বাঙলার লোকেরা একেবারে আদিতে কেমন ছিল, কখন কোথা হইতে কে আসিল, এই ভূখণ্ডের নদনদী-পাহাড়-প্রান্তর-বন-খাল-বিল কালক্রমে কিরূপে পরিবর্তিত হইল, ভৌগোলিক প্রভাব এই প্রদেশের বাসিন্দাদের মধ্যে কোথায় কি কি কাজ করিয়াছে, বাঙালীর দেহে কোন্ কোন্ জাতির রক্ত কি পরিমাণে মিশিয়াছে, অতীত যুগের ভূমিসংস্থা, কৃষি-পদ্ধতি, শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য, অশন-বসন, ধর্ম ও ক্রিয়াকাণ্ড, শিল্প-বিজ্ঞান, ভাষা ও সাহিত্য, এক কথায় প্রাচীন বাঙালী জীবনের সকল দিক্ হাজার বৎসর ধরিয়া কালের স্রোতের আঘাতে আঘাতে কেমন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপ লইল—এই সব তলাইয়া বুঝিবার এবং যুক্তি প্রমাণ দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা এই গ্রন্থে করা হইয়াছে, এবং আমার সংশয় নাই, নীহাররঞ্জনের চেষ্টা অসামান্য সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

ঐতিহাসিক গবেষণার অভিজ্ঞতা যাঁহাদের আছে তাঁহারাই শুধু বুঝিতে পারিবেন, এই সুকঠিন কার্যে কি অসীম ধৈর্য, কি অক্লান্ত শ্রমশীলতা, কি নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা, কি মার্জিত অথচ সূক্ষ্ম বোধ ও বুদ্ধির প্রয়োজন হয়। এক ব্যক্তির পক্ষে একক ভাবে এই ধরনের গ্রন্থ রচনা অত্যন্ত দুরূহ সাধনা, এবং তাহাতে সিদ্ধিলাভ আরও দুরূহ। নীহাররঞ্জন তাঁহার সাধনায় অপূর্ব সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

নীহাররঞ্জনের সুবৃহৎ গ্রন্থে কোথাও আমাদের প্রচলিত 'অমুক জাতির ইতিহাস'-শ্রেণীর বইগুলির 'গুলিখুরী' মত্ ও প্রবাদে অন্ধ বিশ্বাস নাই। আমার পরিচিত জনৈক বাঙালী লেখক তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ভাদুড়ী বংশ চম্বল নদীর দক্ষিণে (আগ্রা ও গোয়ালিয়রের মাঝামাঝি) 'ভাদাওর্' প্রদেশ হইতে আসিয়াছিল, এবং তাহাদের আদি পুরুষ সেখানে সামন্ত ছিলেন। তিনি যদি দিল্লীর বাদশাহদের ইতিহাস পড়িতেন, তবে অতি সহজেই জানিতে পারিতেন যে, 'ভাদাওরীয়া' একটি ক্ষত্রিয় রাজপুত বংশ, ব্রাহ্মণ নহে ; তাঁহাদের অনেকে বাদশাহদের মনসবদার ছিলেন।

এইরূপ জ্ঞানহীন, বিচারবুদ্ধিহীন আলোচনার কোন চিহ্নই এই গ্রন্থে নাই। সর্বাপেক্ষা প্রশংসার বিষয় এই যে, নীহাররঞ্জন পণ্ডিত-সুলভ অহংকারে কোথাও ভিন্ন মত

গায়ের জোরে প্রচারের চেষ্টা করেন নাই ; সর্বত্রই তিনি পূর্ববর্তী পণ্ডিতদের মতামত শ্রদ্ধার সঙ্গে আলোচনা করিয়া, নূতন যুক্তি দিয়া, সমস্ত প্রমাণপঞ্জী বিচার করিয়া, তাহার পর নিজের সিদ্ধান্ত পাঠকের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। পরের ও নিজের উপাদানের নাম, পাঠনির্দেশ প্রভৃতি দিয়া পাঠক যাহাতে সন্দেহ ভঞ্জন করিতে এবং নিজের স্বাধীন মত গঠন করিতে পারে, সে কাজে তিনি সাহায্যের ত্রুটি করেন নাই। ইহার পরও মুখবন্ধের শেষে তিনি লিখিয়াছেন, '…আমার কোনও কথাই শেষ কথা নয়।…এই কাঠামো রচনার প্রয়াস সত্যে পৌঁছিবার নিম্নতর স্তর ; এই স্তর যদি ভবিষ্যত ঐতিহাসিককে সত্যে পৌঁছিতে কিঞ্চিৎমাত্র সহায়তা করে, তবেই আমার জাতির এই ইতিহাস রচনা সার্থক।' ইহাই তো যথার্থ ঐতিহাসিকের, যথার্থ জ্ঞানীর উক্তি।

অধ্যাপক নীহাররঞ্জনের উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি তাঁহার সুবিস্তৃত বিবরসূচী এবং গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় না পড়িলে ভাল করিয়া বুঝা যাইবে না ; সে সম্বন্ধে পরিচয়-পত্রে বলিবার কিছু নাই। কিন্তু এই গ্রন্থের দু' একটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা আবশ্যক।

এই গ্রন্থ আমাদের একটি নূতন জিনিস দিতেছে। বাঙলা দেশের যে 'পলিটিক্যাল হিস্ট্রী' অর্থাৎ জড় ঘটনাগুলি আমরা পূর্বসূরীদের গবেষণার ফলে প্রায় সম্পূর্ণ বিশুদ্ধরূপে আজ জানিতে পারিয়াছি সেই ঘটনাগুলির মূল কারণ কি কি, কোন্ কোন্ শক্তির প্রভাবে আমাদের জনসমষ্টির সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন বর্তমানের আকার ধারণ করিয়াছে, এবং সেই সেই শক্তিগুলি কি প্রণালীতে কোন্ কোন্ সুযোগে কাজ করিয়াছে, গভীর চিন্তা ও অন্তর্দৃষ্টির সহায়তায় নীহাররঞ্জন সর্বত্র তাহার সুবিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। অর্থাৎ, ইংরাজিতে যাহাকে বলে 'the why and how of the pepole's evolution', তাহাই গ্রন্থকার বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। রাষ্ট্র, দৈনন্দিন জীবন, শিল্প, সাহিত্য, জ্ঞানবিজ্ঞান, ধর্মকর্ম যখনই যাহা আলোচনা তিনি করিয়াছেন, প্রবহমান জীবনধারার সঙ্গে, বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে তাহার কি সম্বন্ধ তাহার বিচার ও আলোচনাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য. এবং তাহাই এই গ্রন্থের সুগভীর বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যের ফলেই বাঙালী জাতির অভিব্যক্তির সর্বাঙ্গ চিত্রটি উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সর্বশেষ অধ্যায়ে নীহাররঞ্জন যে-ভাবে আমাদের প্রাচীন জীবনপ্রবাহের সমগ্র ধারাটিকে, 'বাঙালী জীবনের মৌলিক ও গভীর চরিত্রটিকে' ধরিবার ও বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তথ্যের ও যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া, এমনভাবে এত বড় ও সার্থক চেষ্টা ইতিপূর্বে আর কেহ করেন নাই। ঐতিহাসিকের কর্তব্যজ্ঞানের ও সামাজিক অনুভূতির এমন পরিচয় আমাদের দেশে ইতিহাস-চর্চায় বিরল, অথবা, নাই বলিলেই চলে।

সর্বোপরি উল্লেখযোগ্য, দেশের ও দেশের জনসাধারণের প্রতি নীহাররঞ্জনের গভীর অনুরাগ। তথ্যবহুল পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনার ভিতরেও সেই অনুরাগ ধরা না পড়িয়া যায় নাই। আর, সেই অনুরাগ হৃদয়ে না থাকিলে গ্রন্থকার হয়ত এই বিরাট গ্রন্থ-রচনায় অনুপ্রেরণাই পাইতেন না।

তথ্যবিবৃতি বা আলোচনায় এই সুবৃহৎ গ্রন্থের ত্রুটিবিচ্যুতি কোথাও নাই, এমন কথা আমি বলিতে পারি না; গ্রন্থকারও সেই দাবি করেন নাই, এবং কেহই তাহা করিবেন না। ছিদ্রান্বেষী হইলে তেমন ত্রুটিবিচ্যুতি কিছু কিছু ধরা পড়িবে, বিচিত্র নয়। কিন্তু সেই ধরনের দৃষ্টি লইয়া এ-গ্রন্থ যাঁহারা পড়িবেন তাঁহারা শুধু ক্ষতিগ্রস্তই হইবেন; তাঁহাদের কাছে এই গ্রন্থের অপূর্বত্ব ও গভীর মহিমা ধরা পড়িবে না। সেই মহিমাই বিচারের বস্তু, গ্রহণের বস্তু, ছিদ্রগুলি নয়।

এই বিরাট অথচ পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য ও গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থখানি বড় আকারে প্রায় নয়-শত পৃষ্ঠায় শেষ হইয়াছে। এখানি আদিপর্ব মাত্র, অর্থাৎ মুসলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয় পর্যন্ত পৌঁছিয়া এই খণ্ডের গ্রন্থকার থামিয়াছেন। মুস্‌লিম্‌ ও ইংরাজযুগে এই ধরনের বাঙালীর ইতিহাস রচনা এখনও বাকী আছে। একজন লোকের জীবনে, অথবা একজন পণ্ডিতের একক শ্রমে কি তাহা এই আদিপর্বের মত সুষ্ঠু ও সমৃদ্ধরূপে রচনা করা সম্ভব হইবে? নীহাররঞ্জন অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। সেই আশ্বাসে আশ্বস্ত হইয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করি, ভগবান তাঁহার স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাঁহাকে সেই ক্ষমতা দান করুন যাহার বলে তিনি বাকী দুই যুগের ইতিহাসও এমনই সুষ্ঠু ও সমৃদ্ধরূপে রচনা করিতে পারেন। তাহা হইলে তাঁহার কীর্তি অক্ষয় হইয়া থাকিবে।

যদি কেহ এই গ্রন্থের অন্ধকার অংশগুলি পড়িয়া অসন্তুষ্ট হন তবে তিনি Coulton-প্রণীত Social life in mediaeval England (1916) গ্রন্থখানি পড়িয়া দেখুন। পেন্‌গুইন-সিরিজে নব-প্রকাশিত Britain under the Romans বইখানাও পড়িয়া দেখুন। তাহা হইলে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে ঐ দেশে ঐ প্রাচীন যুগেও কত অধিক পরিমাণে এবং কত বিচিত্র ধরনের ঐতিহাসিক উপাদান পাওয়া গিয়াছে; তাহার তুলনায় বাঙলাদেশের হিন্দুযুগের নিদর্শন অত্যন্ত স্বল্প। এরূপ উপাদানবৃক্ষহীন ঐতিহাসিক মরুভূমিতে নীহাররঞ্জন যে ফসল ফলাইয়াছেন তজ্জন্য তিনি ধন্য ও সমগ্র বাঙালী জাতির কৃতজ্ঞতার পাত্র।

এই গ্রন্থের বহুল প্রচার আবশ্যক। সেই উদ্দেশ্যে আমার দুইটি মন্তব্য গ্রন্থকার ও প্রকাশক উভয়কেই জানাইতেছি। প্রথমত, সরল বাঙলা ভাষায় এই গ্রন্থের অনধিক ২৫০ পৃষ্ঠায় একটি সংক্ষিপ্ত সারাংশ অবিলম্বেই প্রকাশিত হওয়া উচিত, এবং মূল্যেও তাহা সহজলভ্য হওয়া উচিত। দ্বিতীয়ত, সঙ্গে সঙ্গে অনধিক ৩৫০ পৃষ্ঠায় ইহার একটি ইংরাজী সারাংশও প্রকাশিত করা আবশ্যক। তাহা হইলে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ঐতিহাসিকেরা নিজ নিজ জাতির ইতিহাস রচনায় একটি আদর্শ লাভ করিবে, যাহা এদেশের সাহিত্য ও ইতিহাস চর্চায় একেবারেই নাই।

যদুনাথ সরকার

॥ ২০ আশ্বিন, ১৩৫৬ ॥

তৃতীয় সংস্করণে

গ্রন্থকারের নিবেদন

পঁচিশ বৎসরেরও কিছু আগে এ-গ্রন্থের দ্বিতীয় একটি সংস্করণ (যথার্থত, প্রথম সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ) প্রকাশিত হয়েছিল। এক বৎসরের মধ্যেই ২২০০ কপির সংস্করণটি নিঃশেষিত হ'য়ে যায়। তারপর থেকে ক্রমাগতই বাঙালী পাঠক ও প্রকাশকদের পক্ষ থেকে এই নালিশ আমায় শুনতে হয়েছে, এ-গ্রন্থের নূতন সংস্করণ প্রকাশ না করে আমি খুব অন্যায় করেছি ও করছি। নানা ভাবে, নানা উপায়ে তাঁরা আমাকে এ-ব্যাপারে উদ্যোগী করে তুলবার চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। আমার কোন তৎপরতা না দেখে লেখক-সমবায়-সমিতি নামে একটি পুস্তকপ্রকাশ-সংস্থা অগত্যা গ্রন্থটির একটি 'সংক্ষেপিত' সংস্করণ প্রকাশ করতে বাধ্য হ'ন, অবশ্যই আমার অনুমতি নিয়ে, পাঠকদের চাহিদা মেটাবার জন্য। সেই 'সংক্ষেপিত' সংস্করণের প্রথম মুদ্রণ স্বল্পকালের মধ্যেই নিঃশেষিত হ'য়ে যায় এবং দ্বিতীয় একটি মুদ্রণের প্রয়োজন হয়। এই দ্বিতীয় মুদ্রণ বাজারে এখন চালু আছে। ভেবেছিলাম, এই 'সংক্ষেপিত' সংস্করণই সাধারণ বাঙালী পাঠকের দাবি মেটাতে পারবে, মূল গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণের আশু কোন প্রয়োজন নেই। আমার এই ধারণা মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে, কারণ 'সংক্ষেপিত' সংস্করণ প্রকাশের পরও পাঠক ও প্রকাশকবর্গের নালিশের কোন বিরতি ঘটেনি, না গুণে না পরিমাণে। এই বিরামহীন নালিশে আমার কোন ক্ষোভ বা দুঃখ ত নিশ্চয়ই নেই, বরং আত্মপ্রসাদলাভের কারণ আছে। সে কারণ ব্যাখ্যা করে বলবার অপেক্ষা রাখে না।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত মূল গ্রন্থটির নূতন একটি সংস্করণ প্রকাশে আমি সম্মত হয়েছি এবং এ-ব্যাপারে আমার যা দায়িত্ব তা যথাসাধ্য পালন করতে চেষ্টা করেছি। নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতির উদ্যোগে এই সংস্করণটিতে ১০,০০০ কপি ছাপা হ'চ্ছে, যা'তে আমার জীবদ্দশায় নূতন আর একটি সংস্করণের প্রয়োজন না হয়। ব্যবহারের সুবিধার জন্যে বইটিকে আকারে একটু ছোট করা হয়েছে এবং ওজন অনেকটা কমানো হয়েছে বইটিকে দু'টি পৃথক পৃথক খণ্ডে ভাগ করে, কিন্তু পৃষ্ঠা সংখ্যা একটানা রেখে। মূল গ্রন্থের দীর্ঘ সূচীপত্রটিকেও দুভাগে ভাগ করা হয়েছে, প্রতিখণ্ডধৃত অধ্যায়ানুযায়ী। কিন্তু গ্রন্থ শেষের নামসূচীটি দুভাগে ভাগ করা হয়নি, সেটিকে দেওয়া হচ্ছে একেবারে দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে, দুই খণ্ড একত্রে। তালিকাসহ মূলগ্রন্থের মানচিত্রগুলি দেওয়া হয়েছে প্রথম খণ্ডে, যেহেতু মানচিত্রগুলির যোগাযোগ প্রথম খণ্ডধৃত 'দেশ-পরিচয়' অধ্যায়ের সঙ্গে। লিপিমালার পরিশোধিত ও পরিবর্ধিত তালিকাটি যাচ্ছে দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে, পরিশিষ্ট "খ" হিসেবে। প্রথম ও দ্বিতীয়, দু'টি খণ্ডেই, অনেকগুলি অধ্যায়ে বেশ কিছু সংযোজন ও কিছু কিছু সংশোধন প্রয়োজন হয়েছে, প্রধানত নূতন নূতন আবিষ্কারের

ফলে। এই সংযোজন ও সংশোধনও যাচ্ছে দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে পরিশিষ্ট "ক" হিসেবে। পরিশিষ্ট "ক"-এর দশম অধ্যায়ের সংযোজন ও সংশোধন পর্যন্ত এবং পরিশিষ্ট "খ"-এর সমগ্রটাই প্রথম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করতে পারলেই ভালো হতো, যুক্তিযুক্ত হতো, কিন্তু এ-খণ্ডটির পৃষ্ঠা সংখ্যা এত বেশি হয়ে গেল যে, প্রকাশকেরা এর আয়তন আর বাড়াতে রাজি হলেন না। তাতে দু'টি খণ্ডের আয়তন-সমতার বড় বেশি তারতম্য ঘটতো। এখন যা করা হলো তার ফলে পাঠক সাধারণের কিছু অসুবিধা হয়ত হতে পারে; আশা করি তাঁরা এ-অসুবিধাটুকু দয়া করে স্বীকার করে নেবেন। এই নূতন সংস্করণে ছবির সংখ্যা ত্রিগুণিত হলো। তালিকাসহ ছবিগুলি দেওয়া হ'চ্ছে দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে, যেহেতু এগুলির সঙ্গে যোগাযোগ দ্বিতীয়খণ্ডধৃত শিল্পকলা অধ্যায়ের। সংখ্যায় প্রায় দুই তৃতীয়াংশ ছবি নবাবিষ্কৃত শিল্পনিদর্শনের এবং অধিকাংশে আজও গ্রন্থসন্নিবিষ্ট হয়নি।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকাতেই বলেছিলাম, নূতন কোনো তথ্য, কোনো উপাদান-উপকরণ, নূতন কোনো মূল উৎস আমি আবিষ্কার করিনি। সাধারণত সর্বত্রই আমি নির্ভর করেছি সুপরিজ্ঞাত ও স্বল্পজ্ঞাত তথ্যাদির উপর, এবং যখন যেখানে যে-তথ্য বা উপাদান-উপকরণ বা পণ্ডিতদের মতামত উল্লেখ করেছি প্রায় সর্বত্রই সঙ্গে সঙ্গে মূল উৎসেরও উল্লেখ করেছি, যত সংক্ষেপেই হোক। শুধুমাত্র এই যুক্তিতেই পাদটীকার ব্যবহার আমি গোড়া থেকেই করিনি। বস্তুত, এই যুক্তিতেই আমার ঐতিহাসিক বা সাহিত্যগত রচনায় পাদটীকার ব্যবহার যথাসম্ভব কমই থাকে। এর একমাত্র কারণ, আমার উদ্দেশ্য পাণ্ডিত্য পরিচয় নয়, পরিসর নয় কায়িক পরিশ্রমের নয় অধ্যয়ন-বিস্তারের। এ-যুক্তি সত্ত্বেও মূলগ্রন্থের কোনো কোনো অধ্যায়ের শেষে আমি একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জী যোগ করেছিলাম: প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পূর্বসূরীদের ঋণ স্বীকার। যদিও আমার সকৃতজ্ঞ স্বীকৃতি সর্বত্রই মূল উৎসের দুয়ারে, তবু যে-সব জায়গায় আমি টীকাকারদের উপর নির্ভর করেছি সে-সব জায়গায় আমি গ্রন্থমধ্যেই তাঁদের নাম এবং রচনারও উল্লেখ করেছি। দু-চার জায়গায় তার ত্রুটি হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তা কোথাও ইচ্ছাকৃত নয়, শপথ করে বলতে পারি। যাই হোক, এই গ্রন্থপঞ্জীগুলি আমি নূতন করে লিখেছি, অবশ্যই খুব সংক্ষিপ্তভাবে।

এখানে ওখানে কিছু কিছু অংশ বর্জন এবং একটু আধটু সংশোধন ছাড়া মূল গ্রন্থটিকে আমি ইচ্ছা করেই মোটামুটি অক্ষত, অবিকৃত রেখেছি। গত পঁচিশ বছরে পশ্চিমবঙ্গ ও বাঙলাদেশে প্রাচীন বাঙালীর ইতিহাসের অনেক নূতন নূতন উপাদান-উপকরণ আবিষ্কৃত হয়েছে, বিশেষভাবে বাঙলাদেশে। তথ্যের দিক থেকে এসব উপাদান-উপকরণ অত্যন্ত মূল্যবান, কিন্তু যত মূল্যবানই হোক, আমি মূলগ্রন্থে প্রাচীন বাঙালী জীবনের যে-চিত্র উদ্ঘাটনের চেষ্টা করেছি, যে কার্যকারণ শৃঙ্খলায় সে-জীবনকে

সামগ্রিক পরিচয় দিতে প্রয়াস করেছি, এমন কোনো তথ্যই আবিষ্কৃত হয়নি যা আমার সে-চিত্র ও সে-পরিচয়কে কিছুমাত্র আচ্ছন্ন করে দিতে পারে। বস্তুত, আমার কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, কোনো বিবরণই এ পর্যন্ত অযথার্থ বা মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়নি। এ-তথ্য আমার আত্মপ্রসাদের বস্তু। অংশত এই কারণে মূলগ্রন্থের পাঠকে আমি কোথাও বিঘ্নিত করিনি। কিন্তু অন্য কারণও আছে। প্রথমতঃ ছোট বড় নানা তথ্য ও তথ্যবিশ্লেষণ মূল পাঠের ভিতর এখানে ওখানে ঢোকাতে হলে ভাষা ও বর্ণনার প্রবাহ বড় বিঘ্নিত হতো। তেমন অনুপ্রবেশে আমার প্রবৃত্তি হলো না। দ্বিতীয়ত, গত পঁচিশ বছরে আমার ভাষা ও বাকভঙ্গী বেশ একটু বদলে গেছে। এতে ভাল হয়েছে কি মন্দ হয়েছে সে প্রশ্ন তুলে লাভ নেই, কারণ ইচ্ছে করলেও আমি এখন আর সেই পঁচিশ বছর আগেকার ভাষা ব্যবহার করতে পারবো না, সে-বাকভঙ্গীও আর আয়ত্তে নেই। সুতরাং, পুরাণো পাঠের ভেতর নূতন ভাষা ও বাকভঙ্গীর অনুপ্রবেশ ঘটানোর কথা উঠতেই পারে না।

এ-সমস্ত বিবেচনায় কোনো প্রয়োজনই হতোনা যদি সমস্ত নূতন তথ্য, উপাদান-উপকরণাদি পুরানো তথ্য ইত্যাদির সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে গ্রন্থের পাঠটিকে একটি অখণ্ড সমগ্রতা দান করতে পারতাম, যদি সমস্ত অধ্যায়গুলি নূতন করে সাজিয়ে নূতন যুক্তি-শৃঙ্খলায় নূতন করে বিন্যস্ত করতে পারতাম, যদি যাবতীয় ছোটবড় বক্তব্য আরও সুস্পষ্ট-ভাবে, সংহত পারিপাট্যে উপস্থিত করতে পারতাম, অর্থাৎ আজ যদি আবার সমস্ত গ্রন্থখানি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নূতন করে লিখতে পারতাম। কখনো কখনো সে-ইচ্ছা যে একে-বারে হয়নি, সে-কথা শপথ করে বলতে পারবো না। কিন্তু সাধ হলেই তো সব সাধ্য হয় না। জীবনের কাল সীমিত, অথচ সেই সীমিত কালের দাবি-দাওয়ার তালিকা দীর্ঘ; 'বাঙালীর ইতিহাস' সেই তালিকায় একতম অন্তর্ভুক্তি নয়, অন্যতম মাত্র।

বলেছি, গত পঁচিশ বছরে প্রাচীন বাঙালীর ইতিহাসের অনেক নূতন উপাদান-উপকরণ আবিষ্কৃত হয়েছে, প্রচুর নূতন তথ্যাদি জানা গেছে। এ-গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সময় খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতাব্দের আগে প্রাচীন বাঙালীর জীবনযাত্রায় কোনো ঐতিহাসিক তথ্যই আমাদের জানা ছিল না বললেই চলে। কিন্তু গত বিশ বছরে পশ্চিমবঙ্গে নানা জায়গায় প্রত্নসন্ধান ও উৎখননের ফলে বাঙালীর ইতিহাসের সূচনাকে অক্লেশে আরও অন্তত চার পাঁচ-শ' বছর অতীতে, অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব ৯০০|১০০০ অব্দে ঠেলে দেওয়া যায়। ভাষান্তরে, বাঙালীর ইতিহাসে আজ একটি সম্পূর্ণ নূতন অধ্যায় যোজিত হয়েছে, যাকে বলা যেতে পারে ইতিহাস-পূর্ব অধ্যায়। ঐতিহাসিক কালেও পশ্চিমবঙ্গে ও প্রতিবাসি বিহারে প্রত্নানুসন্ধান ও উৎখননের ফলে কিছু কিছু নূতন তথ্য জানা গেছে, যেমন, চন্দ্রকেতুগড়ে, কর্ণসুবর্ণে, তাম্রলিপ্তিতে, বিক্রমশিলায়। পূর্ববাঙলা, অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশেও একই ভাবে একই উপায়ে কিছু নূতন সংযোজন ঘটেছে,

যেমন, কুমিল্লা জেলার ময়নামতীতে। পশ্চিমবঙ্গে ও বাঙলাদেশে অনেকগুলি নূতন লেখ ও লিপিপট্ট আবিষ্কৃত হয়েছে, যার পাঠোদ্ধারের ফলে আমরা দু-চারজন নূতন রাজা, সামন্ত-মহাসামন্ত, রাজপাদোপজীবী প্রভৃতির খবর জেনেছি, কিছু কিছু সন তারিখও বদলে গেছে। এ-সমস্ত তথ্যই মূল্যবান এবং সাধারণ পাঠকেরও এ-সব তথ্য জানা উচিত, বিশেষজ্ঞদের তো বটেই। কোনো তথ্যই এই গ্রন্থের মূল বর্ণনা ও বক্তব্যের কিছুমাত্র পরিবর্তন ঘটাতে না পারলেও বিশুদ্ধ তথ্য হিসাবেই এই সব নূতন উপাদান-উপকরণের সঙ্গে পাঠক-সাধারণের পরিচয় বাঞ্ছনীয়। এই উদ্দেশ্যে লিপিমালার তালিকাটিতে যেমন আমি নবাবিষ্কৃত লিপিগুলির উল্লেখ করেছি, তেমনই বর্তমান সংস্করণের উভয় খণ্ডেই পরিশিষ্ট-অংশে নূতন অর্থবহ তথ্য যত প্রায় সবই সংকলনও করেছি। তবে এ-সব তথ্যের ঐতিহাসিক ইঙ্গিত এমন কিছু নয় যাতে ইতিহাসের প্রবাহে নূতন কোনো দিকে নূতন কোনো অর্থের দ্যোতনা লাভ করা যায়। তবু, শুধু তথ্য হিসাবেও তথ্যের কিছু মূল্য আছে। বহুলাংশে এই কারণেই সংযোজনের প্রয়োজন হয়েছে, জ্ঞানের বা প্রজ্ঞার প্রয়োজনে নয়।

বর্তমান সংস্করণ সম্বন্ধে আমার যা বক্তব্য তা বলা হলো। কিন্তু বাঙ্গালী পাঠক সাধারণের কাছে আমি জবাবদিহি হয়ে আছি আরও দু-টি ব্যাপারে। প্রথমটি হচ্ছে, এই সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর আমি কেন সম্মত হলাম না নূতন একটি সংস্করণ প্রকাশের প্রস্তাবে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, এ-গ্রন্থের মধ্যপর্ব রচনা সম্বন্ধে। শেষোক্তটির ব্যাপারে প্রখ্যাত বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ পাঠক সম্প্রদায় আমাকে দিয়ে কবুল করিয়ে নিতে চেয়েছেন, দ্বিতীয়, অর্থাৎ মধ্যপর্বটি যেন আমি নিশ্চয়ই রচনা করি এবং তা আর কালবিলম্ব না করে। এই উভয় প্রসঙ্গেই যখন কোনো সরাসরি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি, উত্তর একটা দিয়েছি যা ঠিক উত্তর নয়, প্রশ্নটি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা মাত্র। কিন্তু নিজেকে নিজে শেষ পর্যন্ত এড়িয়ে যাওয়া যায় না। সুতরাং মনস্থ করেছি, এই সংস্করণ প্রকাশের সুযোগে এ দু-ব্যাপারে আমার যা বক্তব্য তা বাঙ্গালী পাঠক সাধারণের কাছে বলে যাই ; এর পর এ-ধরনের সুযোগ আমার জীবদ্দশায় ঘটবার কোনো আশা বা ইঙ্গিত নেই।

গ্রীক চিন্তানায়ক হেরাক্লিটাস বলেছেন, মানুষ একই নদীতে দু-বার স্নান করে না। হেরাক্লিটাস যে-অর্থেই কথাটা বলে থাকুন একটা অর্থ নিশ্চয়ই এই যে, মানুষ একই অভিজ্ঞতার প্রবাহে একাধিকবার অবগাহন করতে চায় না, বোধ হয় সম্ভবত নয় ; নূতন থেকে নূতনতর অভিজ্ঞতা তাকে আকর্ষণ করে। জীবনের একটা পর্বে, প্রায় ছ-সাত বৎসর, প্রাচীন বাঙ্গালীর ইতিহাস ছিল আমার ধ্যান জ্ঞান, পঞ্চেন্দ্রিয়, প্রাণ মন বুদ্ধি সমস্তই ছিল সেই জীবন-প্রবাহে সদাসন্তরমান। গ্রন্থখানি মুদ্রাযন্ত্রের কবল থেকে মুক্ত

হয়েছিল ১৯৪৯'র শেষের দিকে, কিন্তু আমার লেখা শেষ হয়ে গিয়েছিল, অর্থাৎ আমার সেই জীবনাভিজ্ঞতায় যবনিকাপাত হয়েছিল ১৯৪৫'র গোড়াতেই। এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিলাম নূতন একটি অভিজ্ঞতার প্রবাহে, নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষায়; সে সুদীর্ঘ প্রবাহ ভারতশিল্পেতিহাসের, তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সে ইতিহাস-জিজ্ঞাসা নিয়ে। এ-প্রবাহের গভীরে আজও আমি নিমজ্জিত। কিন্তু এরই ভেতর কখনও কিছু কাল কাটিয়েছি রবীন্দ্র-জীবন ও সাহিত্য প্রবাহে, কিছু কাল কেটেছে ভারতেতিহাসের নানা জিজ্ঞাসার আশ্রয়ে, কখনও শিখগুরু ও শিখ সমাজ নিয়ে, কখনও বা ভারতের স্বাজাত্যবোধের চরিত্র ও গতিপ্রকৃতি নিয়ে। এই এক ঘাট থেকে অন্য ঘাটে, প্রবাহ থেকে প্রবাহান্তরে সন্তরমানতার মধ্যে বাঙ্গালীর ইতিহাসের প্রবাহে ফিরে যাবার অন্তরপ্রেরণা কখনও গভীরভাবে অনুভব করিনি, বোধ হয়, মানসিকতার পরিবর্তনের ফলে। তা ছাড়া, সময় ও শক্তির অপ্রতুলতার হেতুও তুচ্ছ করবার মত নয়।

এই দুই প্রধান কারণ ছাড়া আর একটি বড় কারণও বহুদিন, ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সক্রিয় ছিল। সীমানার এপারে বসেও থেকে থেকে খবর পাচ্ছিলাম, তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে, অর্থাৎ বর্তমান বাঙলাদেশে নূতন নূতন তাম্রপট নূতন নূতন শিল্পবস্তু আবিষ্কৃত হচ্ছিল, ময়নামতীতে উৎখননের ফলে নূতন একটি বৌদ্ধ বিহারায়তনের ভগ্নাবশেষ উদ্‌ঘাটিত হচ্ছিল, প্রচুর পোড়ামাটির শীলমোহর, ফলক, মূর্তি ইত্যাদি সহ। অথচ তার বিস্তৃত, সুনির্দিষ্ট খবরাখবর কিছুই পাচ্ছিলাম না, পাওয়ার উপায়ই ছিল না। এসব সম্বন্ধে স্থানীয় বিশেষজ্ঞরা স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় যা প্রকাশ করছিলেন, সরকারী যে সব বিবরণী প্রকাশিত হচ্ছিল, সীমানা পার হয়ে কিছুই আমাদের কাছে পৌঁছাচ্ছিল না। স্বভাবতই মনে হয়েছিল, এসব নূতন উপাদান-উপকরণগুলি না দেখে, বিশ্লেষণ ও বিচার না করে, নূতন অর্থবহ তথ্যগুলি গ্রন্থমধ্যে অন্তর্ভুক্ত না করে "বাঙালীর ইতিহাস : আদিপর্ব"—এর নূতন একটি সংস্করণ প্রকাশের কোনো অর্থই হয় না। সদ্যোক্ত এই তিনটি কারণে আমি এতকাল নূতন একটি সংস্করণ প্রকাশে সম্মত হইনি।

দ্বিতীয় ব্যাপারটি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য বিষয় একটিই মাত্র, কিন্তু তা একটু বিশদ-ভাবে বলা প্রয়োজন মনে করি। "বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদিপর্ব" যখন লিখি তখন আমার চিত্তে কিছুমাত্র বাসনা ছিল না যে এ-গ্রন্থের মধ্যপর্ব বা উত্তরপর্বও আমি লিখবো। আমি জানতাম, সে অধিকারই আমার নেই। কিন্তু গ্রন্থটি প্রকাশের পূর্বাহ্নে 'পরিচয়-পত্রটি' আমার হাতে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই আচার্য যদুনাথ আমায় আদেশ করেছিলেন, এ-গ্রন্থের 'মধ্য' ও 'উত্তর' পর্বটিও যেন আমি লিখি। তাঁর সেই আদেশ শিরোধার্য করে কিছুদিন চেষ্টা করেছিলাম মধ্যপর্বের উপাদান-উপকরণ ও বিচিত্র তথ্যাদির সঙ্গে

পরিচিত হতে, প্রাণমনবুদ্ধিকে এ-বিষয়ে সক্রিয় করে তুলতে। কিন্তু অচিরকালের মধ্যেই বুঝতে পারলাম, এবং এখনও আমার এই ধারণা যে, অন্তত দুটি ভাষা ভালো করে আয়ত্ত করতে না পারলে মধ্যপর্বের ইতিহাস লেখার কোনো অধিকারই জন্মাতে পারে না, একটি ফারসী, অন্যটি পর্টুগীজ। ডাচ্ বা ওলন্দাজ ভাষাটা জানা থাকলেও একটু সুবিধে হয়, কিন্তু তা নিয়ে আমার বিশেষ দুর্ভাবনা ছিল না, কারণ ও-ভাষায় কিছু ব্যুৎপত্তি আমার ছিল। সুতরাং বেশ কিছুদিন, সময় ও সুযোগমত, ফারসী ও পর্টুগীজ ভাষা দুটি আয়ত্ত করবার চেষ্টা করি। আজ সখেদে নিবেদন করতে বাধ্য হচ্ছি, অন্য নানা বিচিত্র জীবনাভিজ্ঞতার আবর্ষণের ফলে এই দুই ভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি অর্জনের অবসর আমার একেবারেই হয়নি ; সে-সুযোগই পাইনি। ঠিক এই কারণেই 'মধ্যপর্ব' রচনার বাসনা বেশ কিছুদিন আগেই পরিত্যাগ করেছিলাম। আজ এই পরিণত বার্ধক্যে তেমন বাসনার তো কোনো অর্থই আর থাকতে পারে না। আর 'উত্তরপর্ব' রচনার বাসনা আমার কোনো দিনই ছিল না।

আমি জানি, সুবিস্তীর্ণ বাঙলা সাহিত্যে ইতিহাসের প্রচুর তথ্য ও উপকরণ প্রকীর্ণ, আর ফারসী গ্রন্থ, লিপিমালা ও দলিল দস্তাবেজের ইংরাজি অনুবাদেরও কোনো অপ্রতুলতা নেই, এবং এগুলির উপর নির্ভর করে, কতকাংশে অন্য পণ্ডিতদের সংগ্রহ, বর্ণনা ও ব্যাখ্যাদির উপর নির্ভর করে মধ্যপর্বের ইতিহাস একটা লেখা যায়। একাধিক পণ্ডিত তা করেছেন, বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বা দ্বিধাবোধ করেননি। আমার কুণ্ঠা ও দ্বিধা দুইই আছে। আমি যে-ধরনের ইতিহাস রচনায় অভ্যস্ত, যে-ইতিহাসাদর্শ ও পদ্ধতিতে আমার বিশ্বাস তা অনুসরণ করতে হলে, বিশ্লেষণ-বিচার-ব্যাখ্যা তদনুযায়ী হতে হলে মূল উৎসের সঙ্গে গভীর, ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা প্রয়োজন ; ভাষাজ্ঞান গভীর না হলে তা হয় না। শুধুমাত্র অনুবাদের উপর নির্ভর করে ইতিহাস রচনায় দুঃসাহস বা আস্পর্ধা আমার নেই, কোনো কালে ছিলও না।

অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়
ওয়াল্টেয়ার
বিজয়াদশমী, ১৩৮৬

প্রথম সংস্করণের
নিবেদন

দশ বৎসর আগে, বাঙলা ১৩৪৬ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ আমাকে অধরচন্দ্র-বক্তৃতামালায় ভারতবর্ষের ইতিহাসের যে-কোন একটি পর্ব বা দিক সম্বন্ধে তিনটি বক্তৃতা দেবার জন্য আহ্বান করেন। সেই আহ্বানের উত্তরে 'বাঙালীর ইতিহাসের কাঠামো' একটি রচনা করিয়া পরিষদ-মন্দিরে তাহা পাঠ করি, পর পর তিনটি বিশেষ অধিবেশনে। এই তিন অধিবেশনেই সভাপতি ছিলেন শ্রদ্ধেয় আচার্য যদুনাথ সরকার মহাশয়, এবং তিন দিনই বক্তৃতার শেষে সভাপতির মন্তব্যে তিনি আমাকে যথেষ্ট পুরস্কৃত করেন, এবং কাঠামোটিকে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসে রূপান্তরিত করিতে বলেন। সেই বক্তৃতা তিনটি পরিষদ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে পর সহৃদয় সতীর্থরাও অনেকে প্রচুর উৎসাহ প্রকাশ এবং আচার্য যদুনাথের কথারই প্রতিধ্বনি করেন। কিন্তু, তখন ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলার ইতিহাসের প্রথম খণ্ড রচনা ও সম্পাদনাধীন; কাজেই কাঠামোটিকে রক্ত-মাংসে ভরিয়া পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস-রচনার কথা তখনও ভাবি নাই। স্বভাবতই মনে হইয়াছিল, সে প্রয়োজন তো ঐ গ্রন্থেই মিটিবে।

কিছুদিন পরই, বোধ হয় বাঙলা ১৩৪৯ সালে, ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবৃহৎ গ্রন্থটি আত্মপ্রকাশ করিল শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সম্পাদনায়। এ-গ্রন্থ বাঙলার ও বাঙালীর মনীষার গৌরব, সন্দেহ নাই, তবু মনে হইল আমার কাঠামোটি অবলম্বন করিয়া আদিপর্বের বাঙালীর একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস-রচনার প্রয়োজন বোধ হয় থাকিয়াই গেল। আমার এই ধারণা কতটা সত্য বা মিথ্যা তাহার বিচার এখন পাঠকদের হাতে। কিন্তু, আচার্য যদুনাথ ইতিমধ্যে একাধিকবার আমার কর্তব্য পালনের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন, এবং সে-কর্তব্য পালনের সুযোগও করিয়া দিলেন তদানীন্তন বাঙলার রাজসরকার। রাজরোষে আমি বন্দী হইলাম। জেলখানায় সেই নির্বাধ অবসরে আমার মূল কাঠামোর দশটি সুদীর্ঘ অধ্যায় রচনা যখন শেষ হইল তখন একদিন হঠাৎ মুক্তি পাইলাম। ইহার কিছুকাল পরই 'বুক এম্পোরিয়মের' তদানীন্তন কর্মকর্তা, বন্ধু শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে পাণ্ডুলিপি ঢুকিল প্রেসে; ভাবিলাম, ছাপার কাজ অগ্রসর হইবার সঙ্গে সঙ্গে আর বাকী পাঁচটি অধ্যায়ের রচনাও অগ্রসর হইবে। তাহাই ধীরে ধীরে হইতেছিল, কিন্তু হঠাৎ একদিন ধূমায়িত সাম্প্রদায়িক বিরোধ অগ্নিশিখায় জ্বলিয়া উঠিয়া কলিকাতার জীবন বিপর্যস্ত করিয়া দিল। এক বৎসরেরও অধিককাল একটি

অক্ষরও ছাপা হইল না। আজ তাহার দুই বৎসর পর বাকী রচনা ধীরে ধীরে এবং সঙ্গে সঙ্গে ছাপাও শেষ হইয়া গ্রন্থটি অবশেষে মুক্তিলাভ করিল।

আমিও মুক্তি পাইলাম বলিয়া মনে হইতেছে।

এ-গ্রন্থ রচনা যখন আরম্ভ করিয়াছিলাম তখন বাঙলাদেশ অখণ্ড এবং বৃহৎ ভারতবর্ষের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে যুক্ত; আজ গ্রন্থ-রচনা যখন শেষ হইল, রাষ্ট্র-বিধাতাদের ইচ্ছায় ও কূট কৌশলে দেশ তখন দ্বিখণ্ডিত এবং ভারতবর্ষের সঙ্গে তাহার অনাদিকালের নাড়ীর সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন। দুই হাজার বৎসরের ইতিহাসে বাঙলাদেশ কখনও এত গভীর ব্যাপক দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয় নাই। ইহার ফলে আজ বাঙালী জীবন যে-ভাবে বিপর্যস্ত হইয়াছে ও হইতেছে, সপ্তম-অষ্টম শতকের মাৎস্যন্যায় এবং ত্রয়োদশ শতকের রাষ্ট্র, সমাজ ও সংস্কৃতি বিপর্যয়েও তাহা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু রাষ্ট্রবিধাতাদের ইচ্ছা যাহাই হউক, ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে সীমানার এপার-ওপার লইয়া বাঙলাদেশ ও বাঙালী এক এবং অখণ্ড। এই গ্রন্থে আমি সেই এক এবং অখণ্ড দেশ ও জাতিরই ধ্যান করিয়াছি। অন্যতর ধ্যান সম্ভব নয়; বহুদিন পর্যন্ত তাহা সম্ভবও হইবে না।

যত অধ্যয়ন, বীক্ষণ, মনন, আলোচনা ও গবেষণাই এই গ্রন্থের পশ্চাতে থাকুক বা না থাকুক, জ্ঞানস্পৃহা আমাকে এই গ্রন্থ-রচনায় প্রবৃত্ত করে নাই। প্রথম যৌবনে প্রাণের আবেগে এবং স্বদেশব্রতের দুর্দম দুরন্ত নেশায় বাঙলার এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত আমাকে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছিল। তখন বিস্তৃত বাংলার কৃষকের কুটিরে, নদীর ঘাটে, ধানের ক্ষেতে, বটের ছায়ায়, সহরের বুকে, নির্জন প্রান্তরে, পদ্মার চরে, মেঘনার ঢেউয়ের চূড়ায় এই দেশের এবং এই দেশের মানুষের একটি রূপ আমি দেখিয়াছিলাম, এবং তাহাকে ভালবাসিয়াছিলাম। পরিণত যৌবনেও বারবার বাঙলার ও ভারতবর্ষের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত ঘুরিয়াছি—নানা প্রয়োজনে, অপ্রয়োজনে; আজও তাহার বিরাম নাই। যত দেখিয়াছি, যত নিকটে গিয়াছি ততই সেই ভালবাসা গভীর হইতে গভীরতর হইয়াছে। এই ভালবাসার প্রেরণাতেই আমি এই গ্রন্থ-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, ভালবাসাকে জ্ঞানের বস্তুভিত্তিতে সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠাদানের উদ্দেশ্যে, দেশকে আরও গভীর আরও নিবিড় করিয়া পাইবার উদ্দেশ্যে। আমার বাঙলাদেশ ও বাঙালী জাতি প্রাচীন পুঁথির পাতায় নাই, রাজকীয় লিপিমালায়ও নয়; সে-দেশ ও জাতি আমার চোখের সম্মুখে ও হৃদয়ের মধ্যে বিস্তৃত ও বিদ্যমান। প্রাচীন অতীত আজিকার সদ্য বর্তমানের মতই আমার কাছে সত্য ও জীবন্ত। সেই সত্য জীবন্ত অতীতকে আমি ধরিতে চাহিয়াছি এই গ্রন্থে, মৃতের কঙ্কালকে নয়।

দুর্ভিক্ষ, রাষ্ট্রবিপ্লব, দেশচ্ছেদ, প্রান্তীয় দ্বেষ ও হিংসা, চারিত্রদৈন্য, আর্থিক দুর্গতি

প্রভৃতি সকল শত্রু মিলিয়া আজ বাঙলাদেশকে এবং মূঢ়, আশাহত বাঙালী জাতিকে চরম দুর্গতির মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছে। এই চরম দুর্গতি আজ দৈহিক যন্ত্রণার মত আমার এবং আমার মত অনেকের সমস্ত দেহমনকে উৎপীড়িত করিতেছে। এই সময়ে যে এই গ্রন্থ বাঙালী পাঠকের হাতে তুলিয়া দিতে পারিলাম, ইহাই আমার পরম সান্ত্বনা ও আত্মপ্রসাদ। এই গ্রন্থ যদি বাঙালী জাতির প্রাণে কিছু আশার সঞ্চার করিতে পারে, ভবিষ্যতের কিছু ইঙ্গিত দিতে পারে, দেশ ও জাতির প্রতি কিছু শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জাগাইতে পারে, নিজেদের কিছু সত্য পরিচয় চিত্তের নিকটতর করিতে পারে এবং সেই ভালবাসা ও পরিচয়ের সম্পদ লইয়া বৃহৎ ভারতবর্ষের সঙ্গে আত্মীয়-বন্ধনে নিজেকে বাঁধিতে পারে, তাহা হইলেই ঐতিহাসিকের চরম পুরস্কার ও সার্থকতা লাভ ঘটিয়া গেল। আর কিসেরই বা প্রয়োজন!

দীর্ঘকাল ধরিয়া এই গ্রন্থরচনা করিয়াছি, দীর্ঘতর কাল ব্যাপিয়া গ্রন্থের বিষয়বস্তু ধ্যান রিয়াছি, সতীর্থ ও সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করিয়াছি, পূর্বগামী ও সমসাময়িক পণ্ডিত নীষীদের রচনার মধ্যে বিচরণ করিয়াছি। তাঁহাদের সকলের নাম উল্লেখ করিয়া শেষ রা যায় না, কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিয়া ঋণশোধ করিবার ইচ্ছাও আমার নাই। তবু তটা সম্ভব যথাস্থানে নামোল্লেখ ও ঋণস্বীকারে ত্রুটি করি নাই। তাহা সত্ত্বেও হয়তো মন অনেকেই রহিলেন যাঁহাদের নামোল্লেখ করা হয় নাই; তেমন হইয়া থাকিলে ামার একান্ত অনিচ্ছা ও অনবধানতাবশতই হইয়াছে। তাঁহারা যেন দয়া করিয়া আমার ই ত্রুটি মার্জনা করেন। অনেক সতীর্থ, এবং এই পথের পথিক নহেন এমনও অনেকে হৃদয় বন্ধুবৎসলতায় দিনের পর দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া ধৈর্য ধরিয়া এই গ্রন্থের নেক অংশের পাঠ শুনিয়াছেন, তর্ক করিয়াছেন, আলোচনা করিয়াছেন, আমাকেই বাধিত ও পকৃত করিবার জন্য। তাঁহাদের সকলকে আজ আমার বিনীত কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। মার, বন্ধুত্বের যাহা ঋণ তাহা তো শোধ করা যায় না।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ বাঙালী জাতির গৌরবময় প্রিয় প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান ও হার কর্মকর্তারাই আমাকে প্রাথমিক কাঠামো রচনায় প্রবৃত্ত করাইয়াছিলেন; সেই বর্তনারই পরিণতি এই গ্রন্থ। আজ গ্রন্থ-রচনা যখন শেষ হইল তখন পরম শ্রদ্ধায়, কৃতজ্ঞ অন্তরে পরিষদ ও পরিষদ-কর্মকর্তাদের স্মরণ করিতেছি, এবং সর্বাগ্রে এই গ্রন্থ তাঁহাদেরই উদ্দেশ্যে নিবেদন করিতেছি।

এই গ্রন্থ রচনায় একজন মহদাশয় মনীষীর প্রেরণা ও উৎসাহ কিছুতেই উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না। শ্রদ্ধেয় আচার্য যদুনাথ সরকার মহাশয়ের প্রেরণা ও উৎসাহ আগাগোড়া দীপ্যমান না থাকিলে এ-গ্রন্থ রচনা শেষ হওয়া দূরে থাক, সূত্রপাতই হয়তো হইত না। তাঁহার ইতিহাস-ধ্যানের আদর্শ, তাঁহার স্নেহ ও শুভেচ্ছা আমার জীবনের পরম ঐশ্বর্য। তাঁহার কাছে সত্যই আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নাই। তিনি কৃপাবশে পরম স্নেহে এই গ্রন্থের একটি পরিচয়-পত্র রচনা করিয়া দিয়াছেন; তাহাই ইহার শিরোভূষণ।

আমার সকল প্রকার কর্ম প্রচেষ্টায় এবং ধ্যানে ও মননে প্রেরণা ও উৎসাহ যোগাইয়া আসিতেছেন শ্রীমতী মণিকা দেবী ; এই গ্রন্থের পশ্চাতেও সে-প্রেরণা ও উৎসাহ অনুক্ষণ জাগ্রত ছিল। সাংসারিক ক্ষয় ও ক্ষতি যাহা তাহাও তাঁহাকেই সহ্য করিতে হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে আমার যে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ তাহাতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অবকাশ নাই।

আমার স্নেহাস্পদ প্রাক্তন ছাত্র শ্রীমান প্রভাসচন্দ্র মজুমদার ও সুনীলকুমার রায় এই গ্রন্থের নাম-সূচী সংকলনে আমাকে প্রচুর সাহায্য করিয়াছেন। তাহাদিগকে আমার একান্ত শুভকামনা ও সস্নেহ আশীর্বাদ জ্ঞাপন করিতেছি। সতীর্থ বন্ধু শ্রীযুক্ত সরসীকুমার সরস্বতী, সোদরোপম শ্রীমান পুলিনবিহারী সেন এবং আমার প্রীতিভাজন প্রাক্তন ছাত্র ও বর্তমান অধ্যাপক শ্রীমান সুধীররঞ্জন দাশ নানাদিক দিয়া আমার শ্রমলাঘব করিয়া পরম উপকার করিয়াছেন। ইঁহাদের সঙ্গে আমার আত্মীয়-বন্ধন এত ঘনিষ্ঠ যে, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া সে-বন্ধনের অমর্যাদা করিব না।

গ্রন্থ মুদ্রণ ও প্রকাশনা ব্যাপারে শ্রীপ্রশান্তকুমার সিংহ, প্রফুল্লকুমার বসু, শক্তি দত্ত, দেবপ্রসাদ ঘোষ এবং বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগ ও আশুতোষ-চিত্রশালার কর্মকর্তারা নানাভাবে আমাকে যে সাহায্য করিয়াছেন শুধু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া সে ঋণ শোধ করা যায় না।

এই ধরনের তথ্যবহুল ও গবেষণানির্ভর গ্রন্থে সম্পূর্ণ বিস্তৃত পাদটীকা থাকার প্রচলিত রীতি আমার অজ্ঞাত বা অনভ্যস্ত নয় ; তবু, আমি পাদটীকা ব্যবহার করি নাই, অধ্যায়-শেষে এক একটি করিয়া সংক্ষিপ্ত পাঠপঞ্জী দিয়াছি মাত্র। আমার যুক্তি এই যে, সাধারণ পাঠক যাঁহারা তাঁহাদের পাদটীকার প্রয়োজন নাই, তথ্য জানাতেই তাঁহাদের আগ্রহ এবং তথ্যবিবৃতিই তাঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট। পাদটীকাকন্টকিত গ্রন্থের প্রতি তাঁহাদের বিরাগ সর্বজনবিদিত। আর, যাঁহারা পণ্ডিত ও গবেষক, যাঁহারা তথ্যের মূল পর্যন্ত পৌঁছিতে চাহেন, তাঁহাদের কাছে আমার বিনীত নিবেদন, এই গ্রন্থে এমন কোন উপাদান আমি ব্যবহার করি নাই, এমন কোন তথ্য বহন করিয়া আনি নাই যাহা তাঁহাদের কাছে অজ্ঞাত, যাহা এতদিন ছিল লোকচক্ষুর অগোচরে বা যাহা ছিল অনাবিষ্কৃত। আমি সুজ্ঞাত বা স্বল্পজ্ঞাত, অনাদৃত ও অবহেলিত তথ্যগুলি নূতন করিয়া সাজাইয়াছি মাত্র, নূতন শৃঙ্খলায় বাঁধিয়াছি মাত্র, নূতন অর্থনির্দেশ সন্ধান করিয়া নূতন ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছি মাত্র। তাহার জন্য তো পাদটীকার অলংকারে পাণ্ডিত্যের ঐশ্বর্য-প্রকাশের কোন প্রয়োজন নাই। তাহা ছাড়া, এইটুকুই শুধু বলিতে পারি, কোন সাক্ষ্য-প্রমাণকেই আমি সজ্ঞানে বিকৃত করি নাই বা এমন কোন উপাদান ও সাক্ষ্যপ্রমাণ ব্যবহার করি নাই যাহা অবিসংবাদিত ভাবে মিথ্যা বা অগ্রাহ্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। যেখানে সংশয় বিদ্যমান অথবা যাহা শুধু অনুমান সেখানে তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রাখিতে ত্রুটি

করি নাই। গ্রন্থশেষে প্রাচীন বাঙলার লিপিমালার একটি পঞ্জীও সংকলন করিয়া দিয়াছি; যাঁহাদের প্রয়োজন তাঁহারা ব্যবহার করিতে পারিবেন।

প্রুফ্-সংশোধন ব্যাপারে আমি বরাবরই অত্যন্ত অপটু; তাহা ছাড়া, এই ধরনের গ্রন্থে সে-কাজ আগাগোড়া নিজে একা করা ছাড়া উপায় ছিল না, এবং তাহাও অন্য নানা কাজের ভিড়ের মধ্যে। সেই কারণে, এবং কিছুটা নিজের অজ্ঞতা এবং অনবধানতায় কিছু বর্ণাশুদ্ধি ও অন্যান্য নানা প্রকারের ভুলচুক থাকিয়া গেল। তবে, আশা করি, তথ্যগত মারাত্মক ভুল, অথবা এমন ভুল যাহাতে ব্যাখ্যা বা অর্থই হইয়া যায় বিপরীত, তেমন বেশি নাই। যদি থাকে সহৃদয় পাঠক দয়া করিয়া আমাকে জানাইলে উপকৃত হইব এবং পরবর্তী সংস্করণে সশ্রদ্ধস্বীকার তাহা সংশোধন করিতে পারিব। তবু, গ্রন্থান্তে একটি সংশোধন ও সংযোজন জুড়িয়া দিয়া অপরাধ কিছুটা স্খালনের চেষ্টা করিয়াছি; কৌতূহলী পাঠক আগেই তাহা দেখিয়া যথাস্থানে সংশোধন করিয়া লইবেন। আর যাহা বাকি রহিল তাহার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা ছাড়া উপায় নাই। ইতি, ৩০ আশ্বিন, ১৩৫৬

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নীহাররঞ্জন রায়

প্রথম পুনর্মুদ্রণের নিবেদন

"বাঙালীর ইতিহাস: আদিপর্ব" প্রথম সংস্করণ দেড় বৎসরের মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশকেরা আমাকে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রস্তুত করিবার জন্য তাগাদা দিতেছিলেন। ইচ্ছা ছিল ভুল ত্রুটি সংশোধন করিয়া কোনো কোনো অংশ নূতন করিয়া লিখিব, কিন্তু বিচিত্র কর্মব্যস্ততার দরুণ তাহা কিছুতেই সম্ভব হইতেছিল না। এমন সময় কর্মান্তরে আমাকে দূর প্রবাসে চলিয়া আসিতে হইল। অথচ, অন্যদিকে বইটির চাহিদা ক্রমশ বাড়িয়াই চলিতেছিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া প্রকাশকেরা স্থির করিলেন, প্রথম সংস্করণই যথাযথ পুনর্মুদ্রণ করিয়া ক্রেতাদের দাবি মিটাইবেন; বাধ্য হইয়া প্রবাস-যাত্রার পূর্বাহ্ণে আমাকে সে প্রস্তাবে রাজি হইতে হইল। আমি প্রবাসে পৌঁছিবার পর মুদ্রণ কার্য আরম্ভ হইয়াছিল; পাঁচ মাস যাইতে না যাইতেই খবর পাইলাম, মুদ্রণ কার্য শেষ হইয়াছে এবং আমার বক্তব্য বলিবার সময় উপস্থিত।

প্রবাস-বাস হেতু এই পুনর্মুদ্রণ সংস্করণের সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকুক একটি পৃষ্ঠাও আমি নিজে পরীক্ষা করিতে পারি নাই; ভুল ত্রুটি কি রহিল বা না রহিল তাহাও জানি না। পরিশোধন বা পরিমার্জন কিছুই সম্ভব হইল না। সেজন্য অপরাধী চিত্তে পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

ইচ্ছা ছিল, পুনর্মুদ্রণ সংস্করণের অর্থমূল্য যাহাতে কিছু স্বল্পতর করা যায় তাহার চেষ্টা করিব, এবং সে-চেষ্টা করাও হইয়াছিল গ্রন্থকার ও প্রকাশক উভয়ের পক্ষ হইতেই। কিন্তু প্রথম সংস্করণ যখন ছাপা হয় সে-সময়ের বাজার দর অপেক্ষা এখনকার বাজার দর এত বেশি বাড়িয়া গিয়াছে যে আমাদের সে চেষ্টা কিছুতেই কার্যে পরিণত করা গেল না। প্রকাশকেরা এজন্য দুঃখিত, আমি ততোধিক।

এ-গ্রন্থের মধ্যপর্ব কবে রচনা শেষ হইয়া প্রকাশিত হইতে পারিবে, অসংখ্য উৎসুক পাঠক এ-প্রশ্ন করিয়াছেন ও করিতেছেন। একদিকে এ-প্রশ্নে যেমন আত্মপ্রসাদ অনুভব করি, অন্যদিকে নিজের দায়িত্বও ক্রমশ বাড়িয়াই চলিতেছে, সে সম্বন্ধেও সচেতন হই। পাঠক-পাঠিকাদের শুধু এই নিবেদনই জানাইতে পারি, মধ্যপর্বের প্রস্তুতি চলিতেছে, কবে নাগাদ শেষ করিতে পারিব, কবে গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে পারিবে, এ সম্বন্ধে নিশ্চিত কোনো আশ্বাসই দেওয়া আপাতত আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কাল নিরবধি, পৃথ্বীও বিপুলা, ইহাই আমার একমাত্র সান্ত্বনা।

"বাঙালীর ইতিহাস ঃ আদিপর্ব" আমার ভাষাভাষী দেশবাসীর কাছে যে পরম সমাদর লাভ করিয়াছে তাহা এত আশাতীত যে আমি তাহাতে অভিভূত হইয়াছি। এই গ্রন্থ আমাকে সমসাময়িক বাঙালী চিত্তে বিস্তৃত করিয়াছে, ইহার চেয়ে দুর্লভতর মর্যাদা আর কিছু কামনা করিতে পারি না। অগণিত পাঠক-পাঠিকা, বন্ধুবান্ধব, শ্রদ্ধাভাজন মনীষী সাক্ষাতে অথবা পত্রযোগে আমাকে প্রীতিময় অভিনন্দন জানাইয়াছেন ; দৈনিক-সাপ্তাহিক-মাসিক পত্রের সম্পাদক ও গ্রন্থসমালোচকেরা উচ্ছ্বসিত ভাষায় গ্রন্থের সুখ্যাতি করিয়াছেন ; পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রথম রবীন্দ্রস্মারক পুরস্কার দানে এই গ্রন্থকে সম্মানিত করিয়াছেন—সমস্তই সম্ভব হইয়াছে, আমার কোনো কৃতিত্বে নয়, গ্রন্থের বিষয়বস্তুর গুণে, বাঙলাদেশ ও বাঙালীর নামে, এ-তথ্য সম্বন্ধে আমি সচেতন। তবু, সেই সূত্রে যে মর্যাদা ও অভিনন্দন আমার দুয়ারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহা আমি অত্যন্ত বিনীতভাবে অন্তরে গ্রহণ করিয়াছি এবং সেজন্য আমি সকলকে আমার সকৃতজ্ঞ অন্তরের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

কোনো কোনো সমালোচক গ্রন্থোক্ত কোনো কোনো বিচার বিশ্লেষণ, দুই একটি তথ্য সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। ইচ্ছা ছিল, সে-সব সম্বন্ধে আমার যাহা করণীয় দ্বিতীয় সংস্করণে তাহা করিব। যে অবস্থায় গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত হইল তাহাতে তাহা সম্ভব হইল না। কখনও যদি দ্বিতীয় সংস্করণ প্রয়োজন হয়, তখন তাহা করিব, এই প্রতিশ্রুতি দিয়া রাখিলাম। গ্রন্থকারের কর্তব্য হইতে বিচ্যুত হইবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা আমার নাই।

অত্যন্ত খেদের সঙ্গে এ-তথ্য পাঠক-পাঠিকাদের জানাইতে হইতেছে যে, প্রথম সংস্করণে গ্রন্থ শেষে যে-সব ছবি ছাপা হইয়াছিল, তাহার সবগুলি পুনর্মুদ্রণ সংস্করণে ছাপা সম্ভব

হইল না। যে-গুলি ছাপা হইতে পারিল না তাহার মালিকত্ব ছিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মুাজিয়মের কর্তৃপক্ষের হাতে। তিন মাস ধরিয়া তাঁহাদের দুয়ারে প্রার্থনা জানাইয়াও ব্লকগুলি ধার পাওয়া সম্ভব হয় নাই। বাধ্য হইয়াই সে-আশা পরিত্যাগ করিয়া আর বিলম্ব না করিয়া বই বাজারে বাহির করিতে হইল। সেজন্য মার্জনা ভিক্ষা ছাড়া আর উপায়ান্তর নাই। ইতি ২৫শে বৈশাখ, ১৩৫৯

ওআসিংটন বিশ্ববিদ্যালয়
সেন্ট্‌ লুইস, মিসৌরী ; যুক্তরাষ্ট্র
॥ আমেরিকা ॥

বিনয়াবনত
নীহাররঞ্জন রায়

বিষয়-সূচী

(প্রথম খণ্ড)

তৃতীয় অধ্যায় : দেশ-পরিচয় ৮৪—১৬৫ পৃষ্ঠা

চতুর্থ অধ্যায় : ধন-সম্বল ১৬৬-১৭২ পৃষ্ঠা

সমাজ-বিন্যাস

পঞ্চম অধ্যায় : ভূমি-বিন্যাস ২১৮—২৬৬ পৃষ্ঠা

ষষ্ঠ অধ্যায় : বর্ণ-বিন্যাস ২৬৭—৩৩৬ পৃষ্ঠা

সপ্তম অধ্যায় : শ্রেণী-বিন্যাস ৩৩৭—৩৬৪ পৃষ্ঠা

অষ্টম অধ্যায় : গ্রাম ও নগর-বিন্যাস ৩৬৫—৪০৮

নবম অধ্যায় : রাষ্ট্র-বিন্যাস ৪০৯—৪৫৩ পৃষ্ঠা

দশম অধ্যায় : রাজবৃত্ত ৪৫৪–৫৫৯ পৃষ্ঠা

মানচিত্র সূচী

প্রথম অধ্যায়

ইতিহাসের যুক্তি

বাংলার ইতিহাস ও বাঙালীর ইতিহাসে প্রভেদ কোথায় এ কথা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। যে বিষয়ের আলোচনার জন্য এই গ্রন্থ, তাহাকে বাঙলার ইতিহাস বলিলে আপত্তি করিবার কিছু নাই; তবু, বাঙালীর ইতিহাস যখন বলিতেছি তখন তাহার কারণ নিশ্চয়ই একটু আছে।

বাঙালীর ইতিহাসের অর্থ

স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ইংরাজি ভাষায় রচিত বাঙলার পাল রাজবংশের কাহিনী, এবং তাঁহার 'বাঙ্গালার ইতিহাস' বহুদিন প্রাচীন বাঙলার প্রামাণিক ইতিহাস বলিয়া গণ্য ছিল। কয়েক বৎসর আগে শেষোক্ত গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে; এখনও যে সে গ্রন্থের মূল্য পণ্ডিতমহলে স্বীকৃত ইহাই তাহার প্রমাণ। স্বর্গত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের 'গৌড়রাজমালা'ও ঐতিহাসিকের কাছে সুপরিচিত এবং মূল্যবান গ্রন্থ। 'গৌড়রাজমালা' প্রকাশিত হইবার পর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার, হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, বিনয়চন্দ্র সেন, হেমচন্দ্র রায়, রাধাগোবিন্দ বসাক, প্রমোদলাল পাল, স্বর্গত ননীগোপাল মজুমদার, গিরীন্দ্রমোহন সরকার এবং আরও অনেক প্রখ্যাত পণ্ডিত ও মনীষী প্রাচীন বাঙলার রাজকীয় ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায় রচনা করিয়া তুলিয়াছেন। এ কথা স্বীকার করিতেই হয় যে ইঁহাদের এবং অন্যান্য আরও অনেক গবেষকের সম্মিলিত চেষ্টা ও সাধনার ফলে আজ প্রাচীন বাঙলার ইতিহাস আমাদের কাছে অল্পবিস্তর সুপরিচিত; অন্তত মোটামুটি কাঠামো সম্বন্ধে অস্পষ্ট ধারণা কিছু নাই। কিন্তু, একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, আজ প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের গবেষণার ফলে, সমবেত চেষ্টার ফলে, প্রাচীন বাঙলার ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের যাহা জানিবার সুযোগ হইয়াছে তাহার অধিকাংশই প্রাচীন রাজবংশাবলীর কথা—রাজা, রাজ্য, রাজধানী, যুদ্ধবিগ্রহ এবং জয়পরাজয়ের কথা। সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রশাসনপদ্ধতি এবং রাজকর্মচারীদের সম্বন্ধে কিছু কিছু সংবাদ জানিবার সুযোগও হইয়াছে। প্রাচীন বাঙলাদেশ সম্বন্ধে যে-সমস্ত লেখমালা ও যে কয়েকখানি সাহিত্যগ্রন্থ সম্পাদিত ও প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতেও এইসব রাজকীয় সংবাদ ছাড়া কিংবা রাষ্ট্রশাসনপদ্ধতির কথা ছাড়া আর কিছু আহরণ করিবার চেষ্টা কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত বিশেষ কিছু হয় নাই। কোনও কোনও সম্পাদক, যেমন, স্বর্গত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য, ননীগোপাল মজুমদার, গঙ্গামোহন লস্কর,

পারজিটার, নগেন্দ্রনাথ বসু, লালমোহন বিদ্যানিধি, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, কীলহর্ন, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী, রাধাগোবিন্দ বসাক, দীনেশচন্দ্র সরকার, দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রমুখ পণ্ডিতেরা সমাজ সম্বন্ধেও কিছু কিছু তথ্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। কিন্তু এই সমাজ সর্বত্রই বর্ণাশ্রমবদ্ধ সমাজ, এবং তাঁহাদের আহৃত সমাজ-সংবাদ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য উচ্চতর বর্ণের সমাজ-সংবাদ। এ-যাবৎ 'সামাজিক অবস্থা' বলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'সমাজ' কথাটা অত্যন্ত সংকীর্ণ অর্থে, উচ্চতর বর্ণ-সমাজ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; এবং সে সংবাদও অত্যন্ত অপ্রচুর। মোটামুটি ইহাই ছিল কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও বাঙলার ইতিহাসের উপাদান। গ্রন্থাকারে বা প্রবন্ধাকারে প্রাচীন বাঙলার যত ইতিহাসাধ্যায় রচিত হইয়াছে তাহাতে রাজ্য, রাজা, রাজকর্মচারী, রাষ্ট্রশাসন-পদ্ধতি এবং উচ্চতর বর্ণ-সমাজসংপৃক্ত সংবাদ ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না। ইহাই আমাদের বাঙলার ইতিহাস।

আরও কিছু আছে। ধর্ম, শিল্প ও সাহিত্য সম্বন্ধেও আমাদের কিছু কিছু জানিবার সুযোগ আছে। এ বিষয়ে সর্বাগ্রে স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নাম করিতে হয়। প্রাচীন বাঙলার সাহিত্য এবং বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের স্বরূপ সম্বন্ধে তিনিই সর্বপ্রথম আমাদের সজাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার এবং স্বর্গত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের প্রদর্শিত পথে শিল্প, সাহিত্য, ভাষা ও ধর্ম -সংপৃক্ত সংবাদ আহরণ ও আলোচনায় স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ বসু, গিরীন্দ্রমোহন সরকার, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সরসীকুমার সরস্বতী, অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, নলিনীনাথ দাশগুপ্ত, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, যোগেশচন্দ্র রায়, শ্রীমতী স্টেলা ক্রামরিশ প্রভৃতি পণ্ডিত ও মনীষীরা নানাদিকে উল্লেখযোগ্য উদ্যম প্রকাশ করিয়া বাঙলার ইতিহাসের সীমা ও পরিধি বিস্তৃত করিয়াছেন। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি, ঢাকার সরকারী চিত্রশালা এবং বাঙলার ও বাঙলার বাহিরের অন্যান্য ক্ষুদ্র বৃহৎ সাধারণ ও ব্যক্তিগত প্রত্নবস্তু-সংগ্রহের সহায়তায় প্রাচীন বাঙলার ভাষা ও সাহিত্য, ধর্ম ও শিল্প সম্বন্ধে আজ আমাদের জ্ঞান ও দৃষ্টি অনেকটা সুস্পষ্ট। ইঁহারা এবং এইসব প্রতিষ্ঠান ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকদের পথ সুগম করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও এ কথা সত্য ছিল যে, কি বাঙলা কি ইংরাজি, কি অপর কোনও ভাষায় প্রাচীন বাঙলার সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিপূর্ণ একটা রূপ কেহ গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করেন নাই। ধর্ম, শিল্প ও সাহিত্য সম্বন্ধে আমরা যাহা জানিতামত াহার অধিকাংশই বর্ণ-ধর্মের কথা,—সে ধর্ম বৌদ্ধই হউক আর পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মই হউক,—সভাশিল্প বা নাগর সমাজের অভিজাত শিল্পের কথা, সংস্কৃত সভা-সাহিত্যের কথা। যে ধর্ম বর্ণাশ্রমীদের, যে শিল্প বা সাহিত্য রাজসভায় বা বিত্তশালী বণিক অথবা গৃহস্থের পোষকতায় পুষ্ট ও লালিত,

যে শিল্প বা সাহিত্য বর্ণাশ্রম ধর্মের, পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ও শিল্পশাস্ত্রের অনুশাসন, সাধন-পদ্ধতি এবং লক্ষণদ্বারা শাসিত, সেই ধর্ম, শিল্প ও সাহিত্যের কথাই এ-যাবৎ আমরা পড়িয়া আসিয়াছি। লোকধর্ম, লোকশিল্প, লোকসাহিত্য প্রভৃতি সম্বন্ধে আমরা বহুদিন একেবারে সজাগই ছিলাম না। স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় মাঝে মাঝে আমাদের একটু সজাগ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন মাত্র।

বহুদিন আগে বঙ্কিমচন্দ্র দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী কখনও মানুষ হইবে না * * *।" তিনি শুধু রাজা ও রাষ্ট্রের ইতিহাস-রচনা কামনা করেন নাই : চাহিয়াছিলেন বাঙলার সেই ইতিহাস যে-ইতিহাস বলিবে

* * * রাজ্যশাসন প্রণালী কিরূপ ছিল, শান্তিরক্ষা কিরূপে হইত। রাজসৈন্য কত ছিল, কি প্রকার ছিল, তাহাদের বল কি, বেতন কি, সংখ্যা কি? * * * কতপ্রকার রাজকর্মচারী ছিল * * *? কে বিচার করিত * * * রাজা কি লইতেন, মধ্যবর্তীরা কি লইতেন, প্রজারা কি পাইত, তাহাদের সুখদুঃখ কিরূপ ছিল? চৌর্য, পূর্ত, স্বাস্থ্য এসকল কিরূপ ছিল? * * * কোন্ ধর্ম কতদূর প্রচলিত ছিল? * * * তখনকার লোকের সামাজিক অবস্থা কিরূপ? সমাজভয় কিরূপ? ধর্মভয় কিরূপ * * * বাণিজ্য কিরূপ, কি কি শিল্পকার্যে পারিপাট্য ছিল? কোন্ কোন্ দেশোৎপন্ন শিল্প কোন্ কোন্ দেশে পাঠাইত? * * * ভিন্ন দেশ হইতে কি কি সামগ্রী আমদানি হইত, পণ্যকার্য কি প্রকারে নির্বাহ হইত?"

আজ বহুদিন পর বঙ্কিমচন্দ্রের এই কামনা কিছু সার্থক হইয়াছে, বলা যায়। সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুকূল্যে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদারের সুযোগ্য সম্পাদনায় এবং প্রভূত শ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে ইংরাজি ভাষায় রচিত বাঙলার ইতিহাসের সুবৃহৎ প্রথম খণ্ড, অর্থাৎ প্রাচীন বাঙলার পরিপূর্ণ সুপরীক্ষিত, সু-আলোচিত তথ্যবহুল একটি সামগ্রিক ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে। প্রায় সাতশত পৃষ্ঠায় বারোজন বাঙালী পণ্ডিত ও মনীষীর সমবেত প্রচেষ্টায় প্রসূত এই গ্রন্থকে বাঙলার প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে বিগত ৭৫ বৎসরের সম্মিলিত গবেষণার সমষ্টিগত ফল বলা যাইতে পারে। আলোচনারম্ভেই যে অভাব সম্বন্ধে অভিযোগ করা হইয়াছে, এই গ্রন্থ প্রকাশের ফলে সেই অভাব কিছুটা মিটিয়াছে এ কথা বোধ হয় বলা যায়। এ গ্রন্থ বাঙালী পাণ্ডিত্য ও মনীষার গৌরব, এমন উক্তি করিলে খুব অত্যুক্তি কিছু করা হয় না। সম্প্রতি রমেশবাবু এই সুবৃহৎ গ্রন্থের একটি বাঙলা সংক্ষিপ্তসারও প্রকাশ করিয়াছেন।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও বাঙলার এই ইতিহাসকে বাঙালীর ইতিহাস বোধ হয় বলা চলে না। তাহার কারণ একটু সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে। প্রথমত, ইতিহাসের কোনও যুক্তি, কার্যকারণ-সম্বন্ধের কোনও ব্যাখ্যা বা ইঙ্গিত এই ইতিহাস-পরিকল্পনার পশ্চাতে নাই; তাহা না থাকিবার ফলে প্রত্যেকটি অধ্যায় সুপরীক্ষিত, সু-আলোচিত ও তথ্যবহুল হওয়া সত্ত্বেও এই গ্রন্থে সমসাময়িক বাঙালীর সমগ্র জীবনধারার যথার্থ পরিচয় ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। দ্বিতীয়ত, প্রাচীন বাঙলায় যাঁহাদের বলা যায়

জনসাধারণ, যাঁহারা বর্ণসমাজের বাহিরে, পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের বাহিরে অথবা বৌদ্ধধর্মের বাহিরে, যাঁহারা রাষ্ট্রের দরিদ্র ভূমিহীন প্রজা বা স্বল্পভূমিবান প্রজা বা সমাজ-শ্রমিক তাঁহাদের কথা এই গ্রন্থে যথেষ্ট স্থান পায় নাই ; অথচ তাঁহারাই যে ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ এ সম্বন্ধে তো সন্দেহ নাই। যে লোকধর্ম, লৌকিক দেবদেবী, গ্রাম্য জনসাধারণের জীবনযাত্রা, গ্রামের সঙ্গে নগরের পার্থক্য ও যোগাযোগের অধিকতর তথ্য, যে অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর সমগ্র জীবনধারা প্রবহমান তাহার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা জনসাধারণের এই ইতিহাসকে পূর্ণতর ও উজ্জ্বলতর করিতে পারিত, তাহা পরিপূর্ণ মর্যাদায় এই গ্রন্থভুক্ত হইতে পারে নাই। সত্য বটে, ইঁহাদের কথা বলিবার মতো যথেষ্ট তথ্য হয়তো আমাদের সম্মুখে উপস্থিত নাই; তবু, যতটুকু জানা যায় ততটুকু অন্তত প্রাচীন বাঙলাদেশকে বেশি জানা। তৃতীয়ত, এই গ্রন্থের প্রত্যেকটি অধ্যায় বিচ্ছিন্ন ; একে অন্যের সঙ্গে অপরিহার্য অনিবার্য সম্বন্ধসূত্রে গ্রথিত নয়। সুলিখিত এবং তথ্যবহুল রাজকাহিনী ও রাষ্ট্রযন্ত্রের আলোচনা এই গ্রন্থের এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি অধিকার করিয়া আছে ; কিন্তু এত বেশি মূল্য পাওয়া সত্ত্বেও রাজ্য ও রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে সমাজে বিভিন্ন দিকের যোগাযোগ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু সচেতনতা এই অধ্যায়গুলিতে নাই। ভাষা এবং সাহিত্য সম্বন্ধে অধ্যায় দুইটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ, তথ্যবহুল এবং অত্যন্ত সুলিখিত ; কিন্তু ইহাদের মধ্যেও সাহিত্যের সঙ্গে সমসাময়িক সমাজ ও রাষ্ট্রের এবং অর্থনৈতিক অবস্থার সম্বন্ধের ইঙ্গিত অত্যন্ত কম। ধর্মের অধ্যায়ে লোকধর্ম, লৌকিক দেবদেবীর অস্তিত্বের স্বীকৃতি প্রায় নাই বলিলেই চলে ; অথচ, বাঙলাদেশে উচ্চতর বর্ণসমাজে যে ধর্মের প্রচলন তাহার ভিত্তিভূমিই হইতেছে লোকধর্ম, লৌকিক দেবদেবী ও লৌকিক আচারানুষ্ঠান। সমাজ কথাটিও অত্যন্ত সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ; তবু জনসাধারণের কথা যাহা কিছু তাহা সমাজ-অধ্যায়েই আছে। একমাত্র এই অধ্যায় এবং ইহার পরবর্তী অর্থনৈতিক অবস্থার অধ্যায়েই জনসাধারণ আমাদের দৃষ্টির বাহিরে পড়িয়া থাকে নাই। কিন্তু, এ-সব ক্ষেত্রেও ধর্ম, সমাজ ও আর্থিক অবস্থার সঙ্গে রাজা ও রাষ্ট্রের এবং বর্ণ-বিন্যস্ত, শ্রেণী-বিন্যস্ত বৃহত্তর সমাজের সম্বন্ধ নির্ণয়ের চেষ্টা যথেষ্ট করা হয় নাই।

রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, আর্থিক বিন্যাস প্রভৃতি সমস্ত কিছুই গড়িয়া তোলে মানুষ ; এই মানুষের ইতিহাসই যথার্থ ইতিহাস। এই মানুষ সম্পূর্ণ মানুষ ; তাহার একটি কর্ম অন্য আর-একটি কর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন নয়, এবং বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে দেখা ও পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না ; একটি কর্মের সঙ্গে অপরাপর কর্মকে যুক্ত করিয়া দেখিলে তবেই তাহার সম্পূর্ণ রূপ ও প্রকৃতি দৃষ্টিগোচর হয়। দেশকালধৃত মানুষের সমাজ সম্বন্ধেও এ কথা সত্য এবং সর্বত্র স্বীকৃত। এই সত্য স্বীকৃতি না পাইলে ইতিহাস যথার্থ ইতিহাস হইয়া উঠিতে পারে না। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত যে ভারতবর্ষের ইতিহাস ব্রিটিশ ইতিহাস-রচনার আদর্শ এবং আমরা আমাদের

দেশে যে আদর্শ ও পদ্ধতি এ-যাবৎ অনুসরণ করিয়া আসিয়াছি তাহার মূলে পূর্বোক্ত সত্যের স্বীকৃতি যথেষ্ট নাই। ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতির যুক্তি না তুলিয়াও বলা যায়, উনবিংশ শতকের মধ্যপাদ হইতেই মানবিক তথ্য ও তত্ত্ব ব্যাখ্যা ও আলোচনায় এই সত্য স্বীকৃত যে, মানুষের সমাজই মানুষের সর্বপ্রকার কর্মকৃতির উৎস, এবং সেই সমাজের বিবর্তন-আবর্তনের ইতিহাসই দেশকালধৃত মানব-ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি নির্ণয় করে। আমাদের দেশে ইতিহাসালোচনায় এই সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টি ও আলোচনা-পদ্ধতি আজও পূর্ণ স্বীকৃতি লাভ করে নাই। তাহা ছাড়া, এই দেশে রাজকাহিনী এবং রাষ্ট্রযন্ত্র-কাহিনী আজও ঐতিহাসিক গবেষণা ও আলোচনার একটা প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইহার কারণ অবশ্য সহজবোধ্য ও সুপরিজ্ঞাত। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের রাজসভায় রাজা ও রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় যে-সব গ্রন্থ রচিত হইত তাহার মধ্যে রাজকাহিনী, রাষ্ট্রকাহিনী-গ্রন্থের অপ্রাচুর্য ছিল না—রাজসভায় তাহা হইয়াই থাকে—কিন্তু এইসব গ্রন্থে দেশের সমাজবিন্যাস বা জ্ঞান-বিজ্ঞান সৃষ্টি ও আলোচনার যথেষ্ট স্থান বা মূল্য ছিল না। অথচ, রাজা ও রাষ্ট্র ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় কখনও একান্ত হইয়া থাকে নাই। অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত ভারতবর্ষের সর্বত্র আমাদের জীবন ছিল একান্তই সমাজকেন্দ্রিক, রাষ্ট্রকেন্দ্রিক নয়; আমাদের দৈনন্দিন জীবন, আমাদের যাহা কিছু কর্মকৃতি—সমস্তই আবর্তিত হইত সমাজকে ঘিরিয়া। কিন্তু, উনবিংশ শতকে ইতিহাস-রচনার যে রীতিপদ্ধতি ও আদর্শের সন্ধান আমরা ইংরাজি শিক্ষার ভিতর দিয়া পাইয়াছি তাহা একান্তই রাজা ও রাষ্ট্র -কেন্দ্রিক। বিংশ শতকে তাহা অনেকটা সমাজ ও সংস্কৃতি-আলোচনার দিকে মোড় ফিরিয়াছে সত্য, কিন্তু এখনও সমাজকেন্দ্রিক হইয়া উঠে নাই।

অথচ, দেশে রাজা বা রাজপাদোপজীবী কয়জন? রাষ্ট্রশাসনযন্ত্র যাঁহারা পরিচালনা করেন তাঁহারাই বা কয়জন? যুদ্ধবিগ্রহ নিত্য হইত না, সমগ্র ইতিহাসে তাহার স্থান কতটুকু? আজিকার দিনের সামগ্রিক যুদ্ধের মতো তখনকার দিনের যুদ্ধবিগ্রহ সমাজের মূল ধরিয়া টান দিত না। যুদ্ধ সাধারণত যুদ্ধের স্থান, রাজা, সেনাধ্যক্ষ, সৈন্যবাহিনী, রাজসভা, রাজকর্মচারী—ইঁহাদের মধ্যেই আবদ্ধ ও সীমাবদ্ধ থাকিত। যুদ্ধের ফলাফল নিকট ও দূর ভবিষ্যৎকে একান্তভাবে রূপান্তরিতও করিতে পারিত না। রাজা ও রাজসভার বাহিরে ছিল অগণিত জনসাধারণ, বিভিন্ন বর্ণে বিভক্ত, বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসদ্বারা শাসিত, বিভিন্ন শ্রেণীর সীমায় সীমিত, ঠিক এখনও বাঙলাদেশে যেমনটি আমরা দেখি। তবু বর্তমান কালে, রাষ্ট্র যতটা সর্বগ্রাসী, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় সমস্যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে যতটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত, প্রাচীনকালে এমনটি এতটা হইবার সুযোগ ছিল না। এক রাজা পরাজিত হইয়াছেন, অন্য রাজা রাজমুকুট পরিয়া রাজসিংহাসনে বসিয়াছেন; তাহাতে অগণিত জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের বৈপ্লবিক রূপান্তর কিছু ঘটে নাই,

বৃহত্তর সমাজব্যবস্থারও খুব দ্রুত 'উলোট-পালোট কিছু হইয়া যায় নাই ; যাহা হইয়াছে তাহা ধীরে ধীরে এবং সমাজের উচ্চতর স্তরে।

আসল কথা, প্রাচীন ভারতবর্ষে রাজা ও রাষ্ট্রযন্ত্র সমগ্র সমাজব্যবস্থার রক্ষক ও নিয়ামক মাত্র। রাজা ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব ছিল এই সমাজব্যবস্থাকে রক্ষণ ও পালন করা, আর সমাজের দায়িত্ব রাজা ও রাষ্ট্রকে প্রতিপালন করা। সমাজ আছে বলিয়াই রাষ্ট্র এবং রাজাও আছেন ; সমাজহীন রাষ্ট্র কল্পনাও করা যায় না। রাজা ও রাষ্ট্রের পক্ষে ধন যেমন অপরিহার্য, সমষ্টির পক্ষেও তাহাই। ধনব্যবস্থা, ভূমিব্যবস্থা, শ্রেণী-ব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা—সমস্তই সামাজিক ধনকে কেন্দ্র করিয়া ; ধন না হইলে রাজা ও রাষ্ট্র প্রতিপালিত হয় না। এই ধন উৎপাদনের তিন উপায় প্রাচীন বাঙলায় দেখিতে পাওয়া যায়—কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য। এই তিন উপায় তিন শ্রেণীর করায়ত্ত : ভূমি-বানশ্রেণী, শিল্পীশ্রেণী, বণিক-ব্যবসায়ী শ্রেণী। এই তিন উপায়ে উৎপাদিত অর্থদ্বারা সমাজ-ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা প্রতিপালিত হইত, এবং সদ্যকথিত তিন শ্রেণী ও রাষ্ট্র মিলিয়া উৎপাদিত ধন বণ্টনের ব্যবস্থা করিতেন। কাজেই, রাজা ও রাষ্ট্র ছাড়া সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে এই শ্রেণীর অর্থাৎ ধনোৎপাদক শ্রেণীর একটা বিশেষ স্থান ছিল, এবং রাজা ও রাজকর্মচারীদের অপেক্ষা ইঁহারা যে সংখ্যায় অনেক বেশি ছিলেন তাহা সহজেই অনুমেয়। অথচ, ইঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু জানিবার সুযোগ নাই। ধনোৎপাদন, ধনবণ্টন, ভূমিব্যবস্থায় ভূমিবানদের সঙ্গে ভূমিহীন কৃষককুল ও কৃষি-শ্রমিকদের সম্বন্ধ, শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যে শিল্পী-বণিক-ব্যবসায়ীদের সঙ্গে রাষ্ট্র ও সমাজের সম্বন্ধ, শ্রেণী-ব্যবস্থা ও বর্ণ-ব্যবস্থায় বর্ণের সঙ্গে শ্রেণী, বর্ণের সঙ্গে রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের সঙ্গে শ্রেণীর সম্বন্ধ ইত্যাদি ব্যাপারে আমাদের কিছু জানিবার সুযোগ আজও অতি অল্পই আছে।

এই মাত্র যে ধনোৎপাদক শ্রেণী ও কৃষিশ্রমিকদের কথা বলিলাম, ইঁহাদের জীবনা-চরণ যে শুধুই ধনসর্বস্ব, ধনকেন্দ্রিক ছিল, এ কথা বলা চলে না। ইঁহাদের রক্ষা ও পালন যাঁহারা করিতেন সেই রাজা ও রাজপাদোপজীবীদের জীবনে ধর্ম ও শিল্পের, শিক্ষা ও সাহিত্যের, এক কথায় সংস্কৃতিরও প্রয়োজন ছিল। সেই সংস্কৃতি স্বভাবতই এমন হওয়া প্রয়োজন ছিল যাহা তদানীন্তন সমাজ-সংস্থানের পরিপন্থী নয়। এই সংস্কৃতির পুষ্টি ও পালন ধনসাপেক্ষ : সেই ধন সমাজের উদ্‌বৃত্ত ধন। দৈনন্দিন একান্ত প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার নির্বাহ করিয়া যে-ধন থাকিত সেই ধনের কিয়দংশ যাঁহারা দিতেন ও দিতে সমর্থ ছিলেন তাঁহারাই পরোক্ষভাবে উচ্চতর সমাজস্তরের সংস্কৃতির আদর্শ নির্ণয় ও নিয়ন্ত্রণ করিবেন, ইহাই তো স্বাভাবিক। অপরোক্ষভাবে ইহাকে রূপদান করিতেন সমাজের বুদ্ধিজীবীরা—ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ শাস্ত্রবিদেরা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলকরা, এবং ইঁহাদের প্রায় সকলেই ছিলেন বৌদ্ধ অথবা পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য-ধর্মাশ্রয়ী। শিক্ষা ও ধর্মাচরণের, সামাজিক স্মৃতি ও ব্যবহারাদি, নিয়ম-আচার প্রভৃতি

প্রণয়নের দায়িত্ব ছিল তাঁহাদের। এই দায়িত্ব তাঁহারা পালন করিতেন বলিয়া সমাজের মধ্যে সমর্থ শ্রেণী বা শ্রেণীসমূহ জৈন, বৌদ্ধ, যতি ও ব্রাহ্মণদের প্রতিপালন ও ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করিত। সংস্কৃতির ধারক ও বাহক ইঁহাদের বর্ণ ও শ্রেণী -গত স্থান ও ব্যবহার, রাষ্ট্রের সঙ্গে ইঁহাদের সম্বন্ধ, ধনোৎপাদক ও বণ্টক শ্রেণীদের সঙ্গে সম্বন্ধ ইত্যাদি ব্যাপার, এবং ইঁহাদের সৃষ্ট সংস্কৃতির আদর্শ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্ট করিয়া লইবার সুযোগ আজও কম। ইঁহারা ছাড়া, সমাজের নিম্নতর স্তরগুলিতে নিরক্ষর জনসাধারণেরও একটা মানস-জীবন ছিল, সংস্কৃতি ছিল। এ সম্বন্ধেও আমাদের জ্ঞান স্বল্পই। অথচ, ইঁহারাও সমাজের বিশেষ একটি অঙ্গ, এবং এই সংস্কৃতির যথার্থ স্বরূপ ও ইতিহাস বাঙলার ও বাঙালীর ইতিহাসেরই কথা।

রাজা, রাজপাদোপজীবী, শিল্পী, বণিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী, ভূমিবান সম্প্রদায় প্রভৃতি শ্রেণীর অসংখ্য লোকের বিচিত্র প্রয়োজনের সেবার জন্য ছিল আবার অগণিত জনসাধারণ। ইঁহাদের অশন-বসন, বিলাস-আরাম, সুখ-সুবিধা, দৈনন্দিন জীবনের বিচিত্র কর্তব্য প্রভৃতি সম্পাদনার জন্য প্রয়োজন হইত নানা শ্রেণীর, নানা বৃত্তির সমাজসেবক ও সমাজশ্রমিক শ্রেণীর অসংখ্যের 'ইতর' জনের —প্রাচীন লিপিমালায় যাঁহাদের বলা হইয়াছে 'অকীর্তিত' বা অনুল্লিখিত জনসাধারণ। ইঁহাদের ছাড়াও সমাজ চলিত না, এই অকীর্তিত জনসাধারণও সমাজের অঙ্গবিশেষ, এবং সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে ইঁহাদেরও স্থান ছিল। অথচ, ইঁহাদের কথাও আমরা কমই জানি। ইঁহাদেরও ধর্মবিশ্বাস ছিল, দেবদেবী ছিল, পূজানুষ্ঠান ছিল, সংস্কৃতির একটা ধারা ছিল। উৎপাদিত ধনের খানিকটা—খুব স্বল্পতম অংশ সন্দেহ নাই—ইঁহাদের হাতে আসিত কোনও না কোন সূত্র ধরিয়া। এ-সব সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টি আজও যথেষ্ট সচেতন নয়।

কাজেই, রাজা, রাষ্ট্র, রাজপাদোপজীবী, শিল্পী, বণিক, ব্যবসায়ী, শ্রেষ্ঠী, মানপ, ভূমিবান মহত্তর, ভূমিহীন কৃষক, বুদ্ধিজীবী, সমাজসেবক, সমাজশ্রমিক, 'অকীর্তিতান্ আচণ্ডালান্' প্রভৃতি সকলকে লইয়া প্রাচীন বাঙলার সমাজ। ইঁহাদের সকলের কথা লইয়া তবে বাঙালীর কথা, বাঙালীর ইতিহাসের কথা। এই অর্থেই আমি 'বাঙালীর ইতিহাস' কথাটি ব্যবহার করিতেছি। বাঙালী-সমাজও এই বৃহত্তর অর্থেই বুঝিতেছি।

অথচ এই অর্থে বাঙলার অথবা বাঙালীর ইতিহাস সম্বন্ধে মনীষী ঐতিহাসিকেরা সকলেই কিছু একেবারে সজাগ ছিলেন না, এ কথা সত্য নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের কথা আগে বলিয়াছি : তাঁহার মন দেশকালধৃত ইতিহাসের এই সমগ্ররূপ সম্বন্ধে সচেতন ছিল বলিয়া মনে হইতেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের বহুদিন পরে আর-এক বাঙালী ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতেও এই বাঙালীর ইতিহাসের কল্পনা ধরা দিয়াছিল। 'গৌড়রাজমালা' গ্রন্থের ভূমিকায় স্বর্গত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় লিখিয়াছিলেন, "রাজা, রাজ্য, রাজধানী, যুদ্ধবিগ্রহ এবং জয়পরাজয়—ইহার সকল কথাই ইতিহাসের কথা। তথাপি কেবল এইসকল কথা

লইয়াই ইতিহাস সংকলিত হইতে পারে না। বাঙালীর ইতিহাসের প্রধান কথা—বাঙালী জনসাধারণের কথা।" এই বাঙালী জনসাধারণের কথা এযাবৎ বাংলার ইতিহাসে সম্যক কীর্তিত হয় নাই।

২

উপরোক্ত অর্থে বাঙালীর ইতিহাস কেন রচিত হইতে পারে নাই ?

কেন হয় নাই তাহার কারণ খুঁজিতে খুব বেশি দূর যাইতে হয় না। ঊনবিংশ শতকের শেষপাদে এবং বিংশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে ঐতিহাসিক গবেষণার যে-পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গি বাঙলাদেশে, তথা ভারতবর্ষে, প্রচলিত সে পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গি আমরা পাইয়াছি সমসাময়িক য়ুরোপীয়, বিশেষভাবে ইংরেজি ঐতিহাসিক আলোচনা-গবেষণার রীতিপদ্ধতি ও আদর্শ হইতে। এই আদর্শ, পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গি একান্তই ব্যক্তিকেন্দ্রিক, এবং রাজা ও রাষ্ট্রই এই গবেষণার কেন্দ্র। সামাজিক চেতনা এই আদর্শ ও পদ্ধতিকে উদ্‌বুদ্ধ করে নাই। স্থূলদৃষ্টিতে দেখা যায়, রাষ্ট্রই সকল ব্যবস্থার নিয়ন্তা ; যেদিকে তাকানো যায়, সেইদিকেই রাষ্ট্রের সুদীর্ঘবাহু বিস্তৃত, ইহাই দৃষ্টি আকর্ষণ করে ; এবং সেই রাষ্ট্রও কোনও বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ ব্যক্তি-সমষ্টিকেই যেন আশ্রয় করিয়া আছে, ইহাই সর্বজনগোচর হয়। অথচ, সেই রাষ্ট্রের পশ্চাতে যে বৃহত্তর সমাজ এবং সমাজের মধ্যে যে বিশেষ বিশেষ স্বার্থের লীলাধিপত্য তাহা সহজে চোখে ধরা পড়ে না। সমাজ-বিকাশের অমোঘ নিয়মের বশেই যে রাজা ও রাষ্ট্রের সৃষ্টি, এ কথা ঊনবিংশ শতকের ইংরেজি ঐতিহাসিক আলোচনা-গবেষণা স্বীকার করে নাই। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন, ইতিহাস ও ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রেও তেমনই। তখনও পর্যন্ত ইংলণ্ডে এবং য়ুরোপেও অধিকাংশ পণ্ডিত মহলে ফরাসী বিপ্লবের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের, কার্লাইলের বীর ও বীরপূজাদর্শের বিজয়-পতাকা উড়িতেছে। এদেশে আমরা তাহার অনুকরণ করিয়াছি মাত্র। ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দৃষ্টি সেইজন্যই বিশেষভাবে রাজা ও রাষ্ট্রের দিকেই আকৃষ্ট হইয়াছে, এবং সমাজ সম্বন্ধেও তথ্য যখন আহৃত ও আলোচিত হইয়াছে, তখন 'সমাজ' অত্যন্ত সংকীর্ণ অর্থেই গ্রহণ ও প্রয়োগ করা হইয়াছে। কিন্তু ঊনবিংশ শতকের তৃতীয় পাদ হইতেই য়ুরোপের কোথাও কোথাও, বিশেষভাবে অস্ট্রিয়া ও জার্মানিতে, কিছুটা ফরাসী দেশেও, সমাজবিকাশের বিজ্ঞান-সম্মত ঐতিহাসিক গবেষণার সূত্রপাত হয়, এবং তাহার ফলে সর্বত্র পণ্ডিতসমাজ এ কথা স্বীকার করিয়া লন যে, ধনোৎপাদনের প্রণালী ও বণ্টন-ব্যবস্থার উপরই বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন কালের বৃহত্তর সমাজ-সংস্থান নির্ভর করে, বিভিন্ন বর্ণ, শ্রেণী ও স্তর এই ব্যবস্থাকে আশ্রয় করিয়াই গড়িয়া ওঠে। এই ব্যবস্থাকে

রক্ষণ ও পালন করিবার জন্যই রাজা ও রাষ্ট্র প্রয়োজন হয় ; এবং এই সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করিবার জন্যই একটি বিশেষ সংস্কৃতির উদ্ভব ও পোষণের প্রয়োজন হয়। সমাজ-বিকাশের এই বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা ক্রমশ সমগ্র য়ুরোপে ছড়াইয়া পড়ে, এবং বিগত প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে ইংরেজ ঐতিহাসিক-দের মধ্যেও এই ব্যাখ্যার প্রভাব দেখা দেয়। য়ুরোপে যাহা ঊনবিংশ শতকের শেষ পাদেই আরম্ভ হইয়াছিল, এবং যাহার ঢেউ কতকটা বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্ততটে আসিয়া আঘাত করিয়াছিল, বিংশ শতকের প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে ইংলণ্ডেও তাহার প্রবর্তনা দেখা দেয়। ইহার কিছুদিন আগে হইতেই সমাজ, সামাজিক ধন, রাষ্ট্রের সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ, রাষ্ট্র, ধর্ম এবং সংস্কৃতি প্রভৃতির পারস্পরিক সম্বন্ধ ইত্যাদি লইয়া প্রামাণিক গ্রন্থ ইংলণ্ডেও রচিত হইতেছিল ; কিন্তু জনতত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞানের আলোচনার প্রসার ও প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই নূতন ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির রূপ ক্রমশ আরও সুস্পষ্ট হইতেছে। আমাদের দেশের ঐতিহাসিক আলোচনা-গবেষণায় এই ইঙ্গিত আজ বিংশ শতকের দ্বিতীয় পাদেও ধরা পড়িল না ! এইজন্যই আজ পর্যন্ত বাঙালীর বা ভারতবাসীর যথার্থ ইতিহাস রচিত হইতে পারিল না।

উপরোক্ত ধ্যান ও ধারণা -গত কারণ ছাড়া সমগ্র জনসাধারণের ইতিহাস রচিত না হওয়ার একটা বস্তুগত কারণও আছে ; তাহা জনসাধারণের ইতিহাস-রচনার উপযোগী উপাদানের অভাব। প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে সমগ্রভাবেই এই অভিযোগ করা চলে, বাঙলাদেশের ইতিহাস সম্বন্ধে তো চলেই। রাজা, রাজবংশ, রাষ্ট্র, রাষ্ট্রাদর্শ, রাজকর্মচারী ইত্যাদির কথাই প্রভূত যত্নে তিল তিল করিয়া সংগ্রহ করিতে হইয়াছে, তবে আজ আমরা এতদিনের পর আমাদের ইতিহাসের অপবিস্তুর স্পষ্ট একটা রূপ দেখিতে পাইতেছি। এখনও এমন কাল ও এমন দেশখণ্ড আছে যাহার ধারাবাহিক ইতিহাস-সংকলন অত্যন্ত আয়াসসাধ্য। রাজা ও রাষ্ট্রের ইতিহাস সম্বন্ধেই যেখানে এই অবস্থা, সেখানে বৃহত্তর সমাজ ও সমাজের ইতিহাস সম্বন্ধে উপাদানের অপ্রাচুর্য থাকিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য কী ! সমগ্র ভারতবর্ষের কথা বলিয়া লাভ নাই ; বাঙালীর ইতিহাস রচনা করিতে বসিয়া বাঙলাদেশের কথাই বলি। বাঙলার রাষ্ট্র ও রাজবংশাবলীর ইতিহাস যতটুকু আমরা জানি তাহার বেশির ভাগ উপাদান যোগাইয়াছে প্রাচীন লেখমালা। এই লেখমালা, শিলালিপিই হউক আর তাম্রলিপিই হউক, ইহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয় রাজসভাকবি-রচিত রাজার অথবা রাজবংশের প্রশস্তি, কোনও বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে রচিত বিবরণ, বা কোনও ভূমিদান-বিক্রয়ের দলিল, অথবা কোনও মূর্তি বা মন্দিরে উৎকীর্ণ উৎসর্গলিপি। ভূমিদান-বিক্রয়ের দলিলগুলিও সাধারণত রাজা অথবা রাজ-কর্মচারীদের নির্দেশে রচিত ও প্রচারিত। এই লেখমালার উপাদান ছাড়া কিছু কিছু সাহিত্য-জাতীয় উপাদানও আছে ; ইহাদের অধিকাংশই আবার রাজসভার সভাপণ্ডিত,

সভাপুরোহিত, রাজগুরু অথবা রাষ্ট্রের প্রধান কর্মচারীদের দ্বারা রচিত স্মৃতি, ব্যবহার ইত্যাদি জাতীয় গ্রন্থ। ধোয়ীর 'পবনদূত', সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত', শ্রীধর দাসের 'সদুক্তিকর্ণামৃত'-জাতীয় দুই-চারিখানি কাব্যগ্রন্থও আছে ; সেগুলি অধিকাংশ রাজা বা রাজসভাপুষ্ট কবিদের দ্বারা রচিত বা সংকলিত। বৃহদ্ধর্ম, ব্রহ্মবৈবর্ত এবং ভবিষ্যপুরাণের মতো দুই-তিনটি অর্বাচীন পুরাণ-গ্রন্থও আছে ; এগুলি রাজসভায় রচিত হয়তো নয়, কিন্তু রাজসভা, রাজবংশ অথবা অভিজাত সম্প্রদায় -কর্তৃক পুষ্ট ও লালিত ব্রাহ্মণ্য বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের রচনা। ইহা ছাড়া, অন্যান্য প্রদেশের সমসাময়িক লিপিমালা এবং গ্রন্থাদি হইতেও কিছু কিছু উপাদান পাওয়া যায় ; কিন্তু এগুলির চরিত্রও প্রায় একই প্রকারের। ফা হিয়ান্, য়ুয়ান-চোয়াঙ্, ইৎসিঙের মতন বিদেশী পর্যটকদের বিবরণী, গ্রীক ও মিশরীয় ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিকদের বিবরণী, তিব্বতে ও নেপালে প্রাপ্ত নানা বৌদ্ধ ও অন্যান্য ধর্ম ও সম্প্রদায় -গত বিভিন্ন বিষয়ক পুঁথিপত্র হইতেও কতক উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে, এখনও হইতেছে। কিন্তু, এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন, বিভিন্ন বিদেশী পর্যটকেরা রাজ-অতিথিরূপে বা রাষ্ট্রের সহায়তায় এই দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারা বিশেষ বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। বিদেশী পাশ্চাত্য ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিকের রচনাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে লেখকদের শ্রেণী ও সম্প্রদায় -গত স্বার্থদৃষ্টিকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। আর, তিব্বতে-নেপালে প্রাপ্ত পুঁথিগুলি তো একান্তভাবে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ছত্রছায়ায় বসিয়াই লেখা হইয়াছিল। যতগুলি উপাদানের উল্লেখ করা হইল তাহার অধিকাংশই রাজসভা, ধর্মগোষ্ঠী বা বণিকগোষ্ঠীর পোষকতায় রচিত। তবে রাজা, মন্ত্রী বা রাজবংশের অথবা অন্য কোন অভিজাত বংশের প্রশস্তি-লিপিগুলি হইতে এবং 'রামচরিতে'র মতো সাহিত্যগ্রন্থ হইতেই রাজা ও রাষ্ট্র সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে ; আর 'আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প'-জাতীয় অন্যান্য ধর্ম অথবা সাহিত্য- গ্রন্থ, অন্যান্য স্মৃতি ব্যবহার ও পুরাণ -গ্রন্থ হইতে কিংবা ভূমিদান-বিক্রয়ের তাম্রপট্ট হইতে যে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহা পরোক্ষ। বাণভট্টের 'হর্ষচরিত', বিল্হনের 'বিক্রমাঙ্কদেবচরিত' বা কহ্লনের 'রাজতরঙ্গিণী'র মতন কোনও ইতিহাস-গ্রন্থ প্রাচীন বাঙলার ইতিহাস-রচনায় সহায়তা করিতেছে না। এই অবস্থায়, রাজা, রাজবংশ, রাষ্ট্র ও যুদ্ধবিগ্রহের ইতিহাস-রচনার উপাদানই তো অপূর্ণ ও অপ্রচুর, সামাজিক ইতিহাসের তো কথাই নাই।

উপরোক্ত উপাদানগুলি বাঙলার বৃহত্তর সামাজিক ইতিহাসেরও উপাদান। সমাজ সম্বন্ধে যে সংবাদ ইহাদের মধ্যে পাওয়া যায় তাহা যে শুধু পরোক্ষ সংবাদ তাহাই নয়, শুধু যে অপূর্ণ ও অপ্রচুর তাহাই নয়, কতকটা একদেশীয়, একপক্ষীয় হওয়াই স্বাভাবিক। প্রথমত, সামাজিক ইতিহাসের সংবাদ দেওয়া তাহাদের উদ্দেশ্য নয়। যতটুকু সংবাদ পাওয়া যায় তাহা পরোক্ষভাবে, বিবৃত ঘটনা ও পারিপার্শ্বিকের জন্য যতটুকু প্রয়োজন

হইয়াছে তাহার প্রসঙ্গক্রমে। সেই দিক হইতে যাহা পাওয়া যায় তাহাই মূল্যবান এবং ঐতিহাসিকের নিকট গ্রহণযোগ্য সন্দেহ নাই। দ্বিতীয়ত, যেহেতু স্বভাবতই এই-সব উপাদানের উৎপত্তিস্থল হইতেছে রাজসভা, অভিজাতসম্প্রদায় বা ধর্মগোষ্ঠী সেইহেতু স্বভাবতই তাহাদের মধ্যে সমাজের অন্যান্য শ্রেণী বা গোষ্ঠী সম্বন্ধে যে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহা অত্যন্ত স্বল্প শুধু নয়, অপক্ষপাতদৃষ্টিও তাহার মধ্যে নাই। শিল্পী ও বণিকশ্রেণী, ক্ষেত্রকর ও সমাজ-শ্রমিক শ্রেণীর মতন সমাজের এমন প্রয়োজনীয় শ্রেণীদের সম্বন্ধেও এই-সব উপাদান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নীরব। তাহা ছাড়া, প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস, বিশেষভাবে সামাজিক ইতিহাস-রচনায় যে সাহায্য সমকালীন ধর্ম, স্মৃতি, সূত্র এবং অর্থশাস্ত্রজাতীয় গ্রন্থাদি হইতে পাওয়া যায়, প্রাচীন বাঙালীর ইতিহাস-রচনায় সেই ধরনের সাহায্য একাদশ-দ্বাদশ শতকের আগে পাওয়া যায় না বলিলেই চলে। অবশ্য অনেকে ধরিয়া লন যে, এই-জাতীয় গ্রন্থাদিতে বর্ণিত সামাজিক অবস্থা তদানীন্তন বাঙলাদেশেও হয়তো প্রচলিত ছিল। তবু যেহেতু এই-জাতীয় কোন গ্রন্থ বাঙলাদেশে রচিত হইয়াছিল বলিয়া নিঃসংশয়ে বলা যায় না, সেই কারণে প্রাচীন বাঙলার ইতিহাস-রচনায় তাহাদের প্রমাণ অনুমানের অধিক মূল্য বহন করে না, এবং ঐতিহাসিকের কাছে অনুমানসিদ্ধ প্রমাণের মূল্য খুব বেশি নয়, যদি সমাজবিকাশের প্রাকৃতিক নিয়মদ্বারা তাহা সিদ্ধ ও সমর্থিত না হয়। এই-সব কারণেও বৃহত্তর সামাজিক ইতিহাস-রচনার দিকে, তথা বাঙালীর ইতিহাস-রচনার দিকে, আমাদের ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই।

৩

বাঙালীর সমাজবিন্যাসের ইতিহাসই বাঙালীর ইতিহাস

বস্তুত, সমাজবিন্যাসের ইতিহাসই প্রকৃত জনসাধারণের ইতিহাস। প্রাচীন বাঙলার সমাজবিন্যাসের ইতিহাসই এই গ্রন্থের মুখ্য আলোচ্য বলিয়াও ইহার নামকরণ করিয়াছি 'বাঙালীর ইতিহাস'। রাজা ও রাষ্ট্র এই সমাজবিন্যাসে যতটুকু স্থান অধিকার করে ততটুকুই আমি ইহাদের আলোচনা করিয়াছি। এই সমাজবিন্যাসের বস্তুগত ভিত্তি, সমাজের বিভিন্ন বর্ণ ও শ্রেণী, সমাজে ও রাষ্ট্রে তাহাদের স্থান, তাহাদের দায় ও অধিকার, বর্ণের সঙ্গে শ্রেণীর ও রাষ্ট্রের সম্বন্ধ, রাষ্ট্রের সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ, সমাজ ও রাষ্ট্রের সঙ্গে সংস্কৃতির সম্বন্ধ, সংস্কৃতির বিভিন্ন রূপ ও প্রকৃতি ইত্যাদি সমস্তই প্রাচীন বাঙলার সমাজবিন্যাসের, তথা জনসাধারণের ইতিহাসের আলোচনার বিষয়। এই সমাজবিন্যাসের ইতিহাস-রচনার কতকটা পরিচয় পাওয়া যায় জার্মান পণ্ডিত ফিক্ (Fick)-রচিত বুদ্ধদেবের সমসাময়িক উত্তরপূর্ব ভারতবর্ষের ইতিহাস-গ্রন্থে (*Die Sociale*

Gielderung in Nordostlichen zu Buddhas Zeit)। অবশ্য, জাতকের অসংখ্য গল্পে এবং প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থগুলিতে তদানীন্তন সমাজবিন্যাসের যে চিত্র আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, প্রাচীন বাঙলার সামাজিক ইতিহাসের উপাদানে সে স্পষ্টতা বা সম্পূর্ণতা একেবারেই নাই। তবু, সমাজতাত্ত্বিক রীতিপদ্ধতি অনুযায়ী প্রাচীন বাঙলার ঐতিহাসিক উপদান সযত্নে বিশ্লেষণ করিলে আজ মোটামুটি একটা কাঠামো গড়িয়া তোলা একেবারে অসম্ভব হয়তো নয়। বর্তমান গ্রন্থে তাহার চেয়ে বেশি কিছু করা হইতেছে না, বোধহয় সম্ভবও নয়। বাঙলাদেশে ঐতিহাসিক উপাদান আবিষ্কারের চেষ্টা খুব ভাল করিয়া হয় নাই। এক পাহাড়পুর নানাদিক দিয়া প্রাচীন বাঙলার জনসাধারণের ইতিহাসে অভিনব আলোকপাত করিয়াছে; কিন্তু, তেমন উদ্যম অন্যত্র এখনও দেখা যাইতেছে না। বেশির ভাগ উপাদানের আবিষ্কার আকস্মিক এবং পরোক্ষ। তবু, ক্রমশ নূতন উপাদান সংগৃহীত হইতেছে, এবং আজ যাহা কাঠামো মাত্র, ক্রমশ আবিষ্কৃত উপাদানের সাহায্যে হয়তো সেই কাঠামোকে একদিন রক্তে-মাংসে ভরিয়া সমগ্র একটা রূপ দেওয়া সম্ভব হইবে।

উপাদান সম্বন্ধে সাধারণ দুই-একটি কথা

সমাজবিন্যাসের অথবা বৃহত্তর অর্থে সামাজিক ইতিহাস রচনার একটা সুবিধাও আছে, রাষ্ট্রীয় ইতিহাস রচনায় যাহা নাই। রাষ্ট্রীয়, বিশেষভাবে রাজবংশের, ইতিহাসে সন তারিখ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তথ্য। কোন্ রাজার পরে কোন্ রাজা, কে কাহার পুত্র অথবা দৌহিত্র, কোন্ যুদ্ধ কবে হইয়াছিল ইত্যাদির চুলচেরা বিচার অপরিহার্য। সন-তারিখ লইয়া সেইজন্য প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনায় এত বিতর্ক। এই ইতিহাসে ঘটনার মূল্যই সকলের চেয়ে বেশি এবং সেই ঘটনার কালপরম্পরার উপরই ইতিহাসের নির্ভর। সামাজিক ইতিহাস-রচনায় এই-জাতীয় ঘটনার মূল্য অপেক্ষাকৃত অনেক কম; সন-তারিখের মোটামুটি কাঠামোটা ঠিক হইলেই হইল, যদি না কিছু রাষ্ট্রীয় অথবা সামাজিক বিপ্লব-উপপ্লব সমাজের চেহারাটাই ইতিমধ্যে একেবারে বদলাইয়া দেয়। তাহার কারণ সহজেই অনুমেয়। সামাজিক বর্ণবিভাগ, শ্রেণীবিভাগ, ধনোৎপাদন ও বণ্টন -প্রণালী, জাতীয় উপাদান, ভূমিব্যবস্থা, বাণিজ্যপথ ইত্যাদি, এক কথায় সমাজবিন্যাস রাজা বা রাজবংশের হঠাৎ পরিবর্তনে রাতারাতি কিছু বদলাইয়া যায় নাই; অন্তত প্রাচীন বাঙলায় বা ভারতবর্ষে তাহা হয় নাই। প্রাচীন পৃথিবীতে সর্বত্রই এইরূপ। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বৃহৎ কিছু একটা বিপ্লব-উপপ্লব সংঘটিত হইলে সমাজবিন্যাসও হয়তো বদলাইয়া যায়; কিন্তু তাহাও একদিনে, দুই-দশ বৎসরে হয় না। বহুদিন ধরিয়া ধীরে ধীরে এই বিবর্তন চলিতে থাকে, সমাজপ্রকৃতির নিয়মে। অবশ্য, বর্তমান

যুগে ভৌতিক বিজ্ঞানের যুগান্তকারী আবিষ্কারের ফলে এই বিবর্তন অত্যন্ত দ্রুত সংঘটিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই-সব আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত তাহা ধীরে ধীরেই হইত। আর্যদের ভারতাগমন প্রাচীন কালের একটি বৃহৎ সামাজিক উপপ্লবের দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। অনার্য অথবা আর্যপূর্ব সমাজবিন্যাস ছিল একরকম; তারপর আর্যেরা যখন তাঁহাদের নিজেদের সমাজবিন্যাস লইয়া আসিলেন, তখন দুই আদর্শে একটা প্রচণ্ড সংঘাত নিশ্চয়ই লাগিয়াছিল। সেই সংঘাত ভারতবর্ষে চলিয়াছিল হাজার বৎসর ধরিয়া, এবং ধীরে ধীরে তাহার ফলে যে নূতন ভারতীয় সমাজবিন্যাস গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাই পরবর্তী হিন্দুসমাজ। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে যখন লৌহধাতুর আবিষ্কার হইয়াছিল, তখনও এই রকমই একটা সামাজিক বিপ্লবের সূচনা হয়তো হইয়াছিল, কারণ এই আবিষ্কারের ফলে ধন-উৎপাদনের প্রণালী বদলাইয়া যাইবার কথা, এবং তাহার ফলে সমাজবিন্যাসও। কিন্তু এই পরিবর্তনও একদিনে হয় না। প্রাচীন বাঙলায় ঐতিহাসিক কালে—প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা আমি বলিব না, তাহার কারণ সে সম্বন্ধে স্পষ্ট করিয়া আমরা এখনও কিছুই জানি না—এমন কোন সামাজিক উপপ্লব দেখা দেয় নাই। যুদ্ধবিগ্রহ যথেষ্ট হইয়াছে, ভিন্নদেশাগত রাজা ও রাজবংশ বহুদিন ধরিয়া বাঙলাদেশে রাজত্বও করিয়াছেন, মুষ্টিমেয় সৈন্য ও সাধারণ প্রাকৃতজন নানা বৃত্তি অবলম্বন করিয়া এদেশে নিজেদের রক্ত মিশাইয়া দিয়া বাঙালীর সঙ্গে এক হইয়াও গিয়াছেন, কিন্তু এইসব ঐতিহাসিক পরিবর্তন বিপ্লবের আকার ধারণ করিয়া সমাজের মূল ধরিয়া টানিয়া সমাজবিন্যাসের চেহারাটাকে একেবারে বদলাইয়া দিতে পারে নাই। অদল-বদল যে একেবারে হয় নাই তাহা নয়, কিন্তু যাহা হইয়াছে, তাহা খুব ধীরে ধীরে হইয়াছে, এখানে-সেখানে কোন কোন সমাজ-অঙ্গের রং ও রূপ একটু-আধটু বদলাইয়াছে, কোনও নূতন অঙ্গের যোজনা হইয়াছে, কিন্তু মোটামুটি কাঠামোটা একই থাকিয়া গিয়াছে। অদল-বদল যাহা হইয়াছে তাহা প্রাকৃতিক ও সমাজবিজ্ঞানের নিয়মের বশেই হইয়াছে। কাজেই, রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের 'অজ্ঞাত যুগ' সামাজিক ইতিহাসের দিক হইতে একেবারে অজ্ঞাত নাও হইতে পারে। পূর্বের এবং পরের সমাজবিন্যাসের ইতিহাস যদি জানা থাকে তাহা হইলে মাঝখানের ফাঁকটা কল্পনা ও অনুমান দিয়া ভরাট করিয়া লওয়া যাইতে পারে, এবং তাহা ঐতিহাসিক সত্যের পরিপন্থী না হওয়াই স্বাভাবিক। প্রাচীন বাঙলার সমাজবিন্যাসের ইতিহাসেও একথা প্রযোজ্য।

কিন্তু সুবিধার কথা যদি বলিলাম, অসুবিধার কথাও বলি। আগেই বলিয়াছি জনসাধারণের ইতিহাস-রচনার যে-সব উপাদান আমাদের আছে, তাহার অধিকাংশ রাজসভা বা ধর্মগোষ্ঠীর আশ্রয়ে রচিত। রাজসভা বা ধর্মগোষ্ঠী সম্বন্ধে যাহা জ্ঞাতব্য তাহার অনেকাংশ এইসব উপাদানের মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর যে

অগণিত জনসাধারণ তাহাদের বা তাহাদের আশ্রয়ে রচিত কোনও উপাদানই আমরা পাই না কেন ? যে বণিক-সম্প্রদায় দেশে-বিদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইতেন তাঁহারা মূর্খ বা নিরক্ষর ছিলেন না, এমন অনুমান সহজেই করা যায়। ব্যবসা-বাণিজ্যের সমৃদ্ধি যতদিন ছিল ততদিন সমাজে তাঁহাদের স্থান বেশ উপরেই ছিল, রাষ্ট্র এবং সমাজ পরিচালনায় তাঁহাদের প্রভুত্বও কম ছিল না ; একথা অনুমান-সাপেক্ষ নয়, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে ; তথাপি তাঁহাদের কথা বিশেষভাবে কেহ বলে নাই। ইহা আশ্চর্য, সন্দেহ কি ? তাঁহারা নিজেরাও কেহ কিছু সাক্ষ্য রাখিয়া যান নাই। শিল্পী ও ক্ষেত্রকর-সম্প্রদায় সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। আর, চণ্ডাল পর্যন্ত যে অকীর্তিত জনসাধারণ তাঁহাদের কথা না-ই বলিলাম। ইঁহারা তো নিরক্ষরই ছিলেন ; সমাজে ইঁহাদের আধিপত্য বা অধিকার বলিয়া কিছু ছিল, এমন প্রমাণও নাই। কাজেই, ইঁহাদের সম্বন্ধে যে বিশেষ কিছু জানি না তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। কিন্তু কি শিল্পী-মানপ-ব্যাপারী-বণিক, কি ক্ষেত্রকর, কি নিম্নতম সম্প্রদায়, ইঁহারা রাজসভা বা ধর্মগোষ্ঠী -দ্বারা কীর্তিত কিংবা কীর্তনযোগ্য বিবেচিত না হইলেও, ইঁহাদের সকলের দৈনন্দিন সুখদুঃখের, জীবনসমস্যার, নিজের বৃত্তি-সংপৃক্ত নানা প্রশ্নের, এবং সাফল্য-অসাফল্যের প্রকাশ ও পরিচয় তদানীন্তন বাঙালী সমাজের মধ্যে কোথাও না কোথাও ছিলই। হয়তো সকল শ্রেণীর প্রকাশ ও পরিচয় সমভাবে একত্র কোথাও হইত না ; হয়তো বিশেষ শ্রেণীর জীবনধারার প্রকাশ ও পরিচয় শ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিত। কিন্তু যেভাবেই তাহা হউক, তাহা কোথাও লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে নাই ; সভাকবি, রাজপণ্ডিত, অভিজাতসমাজপুষ্ট কবি ও লেখক, বা ধর্মগোষ্ঠীর নেতাদের কাছে এইসব প্রকাশ ও পরিচয় লিপিযোগ্য বা গ্রন্থনযোগ্য মর্যাদা লাভ করিতে পারে নাই। স্মৃতি-ব্যবহার-পুরাণ -গ্রন্থাদিতে পরোক্ষভাবে কিছু কিছু সংবাদ লিপিবদ্ধ হইয়াছে মাত্র, ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য উচ্চতর বর্ণসমাজের সঙ্গে ইঁহাদের সম্বন্ধ নির্ণয়ের প্রসঙ্গে। তাহা ছাড়া, রাজসভা ও ধর্মগোষ্ঠী উভয়েরই লেখ্য ভাষা ছিল সংস্কৃত ; অথচ, এই 'দেবভাষা' যে প্রাকৃতজনের ভাষা ছিল না তাহা তো সর্বজনস্বীকৃত ; বাঙলার লিপিমালায়ও তাহার প্রমাণ বিক্ষিপ্ত। প্রাচীন বাঙলার প্রাকৃতজনের এই ভাষার বিশেষ কিছু পরিচয় আমাদের সম্মুখে উপস্থিত নাই। স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় -কর্তৃক আবিষ্কৃত এবং অধুনা সুপরিচিত চর্যাগীতিগুলির ভাষা হয়তো দশম-দ্বাদশ শতকের এই প্রাকৃত ভাষা, কিন্তু সন্ধ্যাভাষায় রচিত এই দোঁহা ও গানগুলিকে ঐতিহাসিক উপাদানরূপে পুরোপুরি গ্রহণ করা সর্বত্র সম্ভব নয়। ধর্মের ইতিহাসে অবশ্য এই পদগুলির বিশেষ মূল্য আছে। ডাক ও খনার বচনগুলিতেও কিছু কিছু ইতিহাসের উপাদান আছে। পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন যে, এই বচনগুলিতে সমাজের যে পরিচয় টুকরা টুকরা ভাবে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পাওয়া যায় তাহা নিঃসংশয়ে খ্রীষ্টীয় দশম অথবা একাদশ

শতকের, কিন্তু ঐতিহাসিকের বিপদ এই যে, এই বচনগুলি বর্তমানে আমরা যে রূপে পাই, যে ভাষায় বর্তমানে ইহারা আমাদের হাতে আসিয়াছে, সে রূপ ও সে ভাষা এত প্রাচীন নয়। কাজেই মুখে মুখে প্রচলিত বচনগুলি পরবর্তী কালে ক্রমশ যখন লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তখন যে সঙ্গে সঙ্গে সমসাময়িক যুগের সমাজের পরিচয় কিছু কিছু তাহার মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে নাই তাহার নিশ্চয়তা কী? 'শূন্যপুরাণ', 'গোপীচাঁদের গীত', 'সেখ শুভোদয়া', 'আদ্যের গম্ভীরা', মুর্শিদ্যা গান', প্রাচীন রূপকথা ইত্যাদি সম্বন্ধেও এই সন্দেহ প্রযোজ্য, যদিও ইহাদের বিষয়বস্তু প্রাচীনতর কাল সম্পর্কিত। মধ্যযুগের আরও দুই-চারটি বাঙলা বই সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। আসল কথা হইতেছে, জনসাধারণ প্রাকৃতজনসুলভ ভাব ও ভাষায় তাঁহাদের দৈনন্দিন জীবনের যে-সব সুখ-দুঃখ, ক্ষুদ্র-বৃহৎ জীবন-সমস্যা ইত্যাদি প্রকাশ করিত গানে-গল্পে-বচনে-গাথায়-রূপকথায়, তাহা কেহ লিখিয়া রাখে নাই; লোকের মুখে মুখেই তাহা গীত ও প্রচারিত হইয়াছে, এবং বহুদিন পরে তাহা হয়তো লিপিবদ্ধ হইয়াছে যখন প্রাকৃতজনের ভাষা লেখ্য-মর্যাদা লাভ করিয়াছে। কিন্তু মুশকিল হইতেছে, এইসব প্রমাণ স্বসম্পূর্ণ, স্বয়ংসিদ্ধ প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করিবার উপায় নাই, যতক্ষণ পর্যন্ত সমসাময়িক প্রমাণদ্বারা তাহা সমর্থিত না হয়।

পূর্বেই বলিয়াছি, প্রাচীন লিপিমালা এবং কিছু কিছু ধর্ম ও সাহিত্য -গ্রন্থই বাঙালীর ইতিহাসের উপাদান এবং ইহাদের সাক্ষ্যই প্রামাণিক। এই লিপিগুলি সমস্তই সমসাময়িক; স্মৃতি, পুরাণ, ব্যবহার এবং কাব্য -গ্রন্থগুলিও প্রায় তাহাই। কোথাও কোথাও কিছু কিছু পরবর্তী অথবা পূর্ববর্তী প্রামাণিক লিপি ও গ্রন্থের সহায়তা আমি গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সমসাময়িক প্রামাণিক সাক্ষ্যদ্বারা তাহা সমর্থিত না হইয়াছে ততক্ষণ আমার বক্তব্যের পক্ষে অনুমানের অধিক মূল্য কখনও আমি দাবি করি নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমি বাঙলাদেশের সাক্ষ্যপ্রমাণই গ্রহণ করিয়াছি, তবে মাঝে মাঝে কোথাও কোথাও কোনও সাক্ষ্য বা উক্তি সুস্পষ্ট করিবার জন্য প্রতিবেশী কামরূপ অথবা বিহার অথবা ওড়িশার সাক্ষ্য-প্রমাণও উল্লেখ করিয়াছি। সেগুলি প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত না হইলেও একথা অনুমান করিতে বাধা নাই যে, বাঙলাদেশেও হয়তো অনুরূপ রীতি প্রচলিত ছিল।

বাঙলাদেশের লিপিগুলি কালানুযায়ী সাজাইলে খ্রীষ্টপূর্ব আনুমানিক দ্বিতীয় শতক হইতে আরম্ভ করিয়া তুর্কী বিজয়েরও প্রায় শতবর্ষ কাল পর পর্যন্ত বিস্তৃত করা যায়। তবে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্তই ধারাবাহিকভাবে পাওয়া যায়, এবং এই সাত-আট শত বৎসরের সামাজিক ইতিহাসের রূপই কতকটা স্পষ্ট হইয়া চোখের সম্মুখে ধরা দেয়। পঞ্চম শতকের আগে আমাদের জ্ঞান প্রায় অস্পষ্ট এবং অনেকটা অনুমানসিদ্ধ। লিপিগুলির সাক্ষ্যপ্রমাণ ব্যবহারের আর-একটু বিপদও আছে। খ্রীষ্টীয়

পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ শতকে উৎকীর্ণ দামোদরপুরে (পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি) প্রাপ্ত কোনও তাম্রপট্টে ভূমিব্যবস্থা অথবা রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্বন্ধে যে খবর পাওয়া যায় তাহা যে দশম অথবা একাদশ শতকে সমতলমণ্ডল অথবা খাড়িমণ্ডল, কিংবা পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্য কোনও মণ্ডল বা বিষয় সম্বন্ধে সত্য হইবে, এমন মনে করিবার কোনও কারণ নাই। এমন কি, সেই শতকেরই বাঙলার অন্য কোনও ভুক্তি অথবা বিষয় সম্বন্ধে সত্য হইবে, তাহাও বলা যায় না। কাজেই যে-কোনও লিপিবর্ণিত যে-কোনও অবস্থা সমগ্রভাবে বাঙলাদেশ সম্বন্ধে অথবা সমগ্র প্রাচীনকাল সম্বন্ধে প্রযোজ্য না-ও হইতে পারে। বস্তুত, দেখা যায়, একই সময়ে বাঙলার বিভিন্ন স্থানে একই বিষয়ে বিভিন্ন ব্যবস্থা, রীতি ও পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। এইজন্যই সাক্ষ্যপ্রমাণ উল্লেখ করিবার সময় ইচ্ছা করিয়াই আমি লিপিবর্ণিত স্থান ও কালের উল্লেখ সর্বত্রই করিয়াছি ; এবং সেই স্থান ও কালেই বর্ণিত বিষয় প্রযোজ্য, এইরূপ ইঙ্গিত করিয়াছি। তারপর বিশেষ কোন নিয়ম বা পদ্ধতি কতটুকু অন্য কাল ও অন্য স্থান সম্বন্ধে প্রযোজ্য, কী পরিমাণে সমগ্র বাঙলাদেশ সম্বন্ধে প্রযোজ্য তাহা লইয়া পাঠক অনুমান যদি করিতে চান তাহাতে ঐতিহাসিকের দায়িত্ব কিছু নাই।

৪

এই গ্রন্থের যুক্তিপর্যায়

সমাজবিন্যাসের ইতিহাস বলিতে হইলে প্রথমেই বলিতে হয় নরতত্ত্ব ও জনতত্ত্বের কথা এবং তাহারই সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিজড়িত ভাষাতত্ত্বের কথা। সেইজন্য বাঙালীর ইতিহাসের গোড়ার কথা বাঙালীর নরতত্ত্বের কথা, বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর ভাষার কথা, বাঙালীর জন, ভাষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির অস্পষ্ট উষাকালের কথা। বাঙালীর আর্যত্ব কতখানি ? পণ্ডিতেরা আর্যভাষাভাষী নরগোষ্ঠীর যে একাধিক তরঙ্গের কথা বলেন, যদি তাহা সত্য হয়, তাহা হইলে সেই আর্যত্ব কি ঋগ্বেদীয় আর্যভাষীদের না পামীর মালভূমি ও তক্‌লামাকান্ মরুভূমি হইতে আগত আল্‌পাইন আর্যভাষীদের, নর্ডিক না প্রাচ্য আর্যভাষীদের, না আর কাহারও ? আর্যপূর্ব জনদের কাহারা বাঙলা দেশের অধিবাসী ছিলেন ; এই আর্যপূর্ব বাঙালীদের মধ্যে নেগ্রিটো, অস্ট্রিক, বা ভূমধ্যীয় নরগোষ্ঠীর আভাস কতটুকু দেখা যায়, কোথায় কোথায় দেখা যায় ? মোঙ্গোলীয় ও ভোট-চীন নরগোষ্ঠীর কিছু আভাস বাঙালীর রক্তে, বাঙালীর দেহগঠনে আছে কি ? থাকিলে কতটুকু এবং বাঙলার কোন্ কোন্ জায়গায় ? আর্য ও আর্যপূর্ব জাতিদের রক্ত ও দেহগঠন বাঙালীর রক্ত ও দেহগঠনে কতটুকু, কী পরিমাণে সহায়তা করিয়াছে ? ঐতিহাসিক কালে ভারতবর্ষের বাহিরের ও ভিতরের অন্যান্য

প্রদেশের কোন্ কোন্ নরগোষ্ঠীর লোক বাঙলাদেশে আসিয়াছে, এবং বাঙালীর রক্ত ও দেহগঠন কতখানি রূপান্তরিত করিয়াছে ? বাঙলাদেশে যে বর্ণবিভাগ দেখা যায় তাহার সঙ্গে নরতত্ত্বের সম্বন্ধ কতটুকু ? ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ইত্যাদি বর্ণের লোকেরা কোন্ নরগোষ্ঠী ? সমাজে চলচল শূদ্রবর্ণের লোকেরা কোন্ নরগোষ্ঠী ? জল-অচল নিম্ন বা অন্ত্যজ পর্যায়ের যে অসংখ্য লোক তাহারাই বা কোন্ নরগোষ্ঠী ? রজক, নাপিত, কর্মকার, সূত্রধর ইত্যাদিরাই বা কে ? সব প্রশ্নের উত্তর বাঙলার নরতত্ত্ব-গবেষণার বর্তমান অবস্থায় পাওয়া যাইবে না ; তবু, যতটুকু নির্ধারিত হইয়াছে তাহারই বলে মোটামুটি একটা কাঠামো গড়িয়া তোলা যাইতে পারে। বাঙালীর জন-গঠনের এই গোড়াকার কথাটা না জানিলে প্রাচীন বাঙলার শ্রেণী ও বর্ণ -বিভাগ, রাষ্ট্রের স্বরূপ, এক কথায় সমাজের সম্পূর্ণ চেহারাটা ধরা পড়িবে না।

তৃতীয় অধ্যায় : দেশ-পরিচয়

বাঙালীর ইতিহাসের দ্বিতীয় কথা, বাঙলার দেশ-পরিচয়। বাঙলাদেশের নদ-নদী পাহাড়প্রান্তর বনজনপদ আশ্রয় করিয়া ঐতিহাসিক কালের পূর্বেই যে-সমস্ত বিভিন্ন কোম একসঙ্গে দানা বাঁধিয়া উঠিতেছিল তাহাদের বন্ধনসূত্র ছিল পূর্বভারতের ভাগীরথী-করতোয়া-লৌহিত্য-বিধৌত বিন্ধ্য-হিমালয়-বাহুবিধৃত ভূভাগ। এই সুবিস্তীর্ণ ভূভাগের জল ও বায়ু এই দেশের অধিবাসীদিগকে গড়িয়াছে ; ইহার ভূমির উর্বরতা কৃষিকে ধনোৎপাদনের অন্যতম প্রধান উপায় করিয়া রচনা করিয়াছে ; ইহার অসংখ্য মৎস্যবহুল নদ-নদী, তাহাদের শাখা ও উপনদীগুলি অন্তর্বাণিজ্যের সাহায্য করিয়া ধনোৎপাদনের আর-একটি উপায় সহজ ও সুগম করিয়াছে। ইহার সমুদ্রোপকূল শুধু যে বহির্বাণিজ্যের সাহায্য করিয়াছে, তাহাই নয়, দেশের কোনও কোনও উৎপন্ন দ্রব্যের স্বরূপও নির্ণয় করিয়াছে। তাহা ছাড়া, এই দেশের প্রাচীন যে রাষ্ট্র ও জনপদ -বিভাগ তাহাও কিছুটা নির্ণীত হইয়াছে বাঙলার নদ-নদীগুলির দ্বারা। বাঙলার এই নদ-নদীগুলি, এই বন ও প্রান্তর, ইহার জলবায়ুর উষ্ণ জলীয়তা, ইহার ঋতু-পর্যায়, ইহার বিধৌত নিম্নভূমিগুলি, বনময় সমুদ্রোপকূল সমস্তই এই দেশের সমাজবিন্যাসকে কমবেশি প্রভাবান্বিত করিয়াছে। কাজেই বাঙলাদেশের সত্য ভৌগোলিক পরিচয়ও বাঙালীর ইতিহাসেরই কথা।

চতুর্থ অধ্যায় : ধনসম্বল

জাতি এবং দেশ হইতেছে সমাজ-রচনার ঐতিহ্য ও পরিবেশ। কিন্তু, পূর্বেই বলিয়াছি, সমাজ-সৌধের বস্তুভিত্তি হইতেছে ধন। কাজেই প্রাচীন বাঙলার ধনসম্বল কী ছিল, ধনোৎপাদনের কী কী উপায় ছিল, কী কী ছিল উৎপন্ন বস্তু, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য ইত্যাদি কিরূপ ছিল, এইসব তথ্য বাঙালীর ইতিহাসের তৃতীয় কথা। এই তিন কথা লইয়া বাঙালীর ইতিহাসের বস্তুভিত্তি এবং এই ভিত্তির উপরই গড়িয়া উঠিয়াছিল প্রাচীন বাঙালীর সমাজবিন্যাস।

পঞ্চম অধ্যায় : ভূমিবিন্যাস

এইমাত্র বলিলাম, প্রাচীন বাঙলায় কৃষি ছিল ধনোৎপাদনের অন্যতম প্রথম ও প্রধান উপায়। কৃষির সঙ্গে দেশের ভূমিব্যবস্থা জড়িত। এই ভূমিব্যবস্থার উপরই দেশের অগণিত জনসাধারণের মরণ-বাঁচন নির্ভর করিত, এখনও যেমন করে। ভূমি কয় প্রকার ছিল, ভূমির উপর রাজার অধিকারের স্বরূপ কী ছিল, প্রজার অধিকারই বা কতটুকু ছিল, ভূমির মূল্য গ্রাহী কে ছিলেন, ভূমিদানের প্রেরণা কী ছিল, ভূমির সীমানির্দেশের রীতি ও উপায় কী ছিল, রাজস্ব কিরূপ ছিল, প্রজার দায়িত্ব কী ছিল, খাসপ্রজা, নিম্নপ্রজা, ভূমিহীন প্রজা ইত্যাদি ছিল কিনা, এক কথায় ভূমিব্যবস্থার কথা বাঙালীর ইতিহাসের পঞ্চম এবং সমাজবিন্যাসের প্রথম কথা।

ষষ্ঠ অধ্যায় : বর্ণবিন্যাস

প্রাচীন ও বর্তমান বাঙলার সমাজবিন্যাসের দিকে তাকাইলে যে জিনিস সর্বপ্রথম দৃষ্টিগোচর হয় তাহা বর্ণ-উপবর্ণের নানা স্তর-উপস্তরে বিভক্ত সুনির্দিষ্ট সীমায় সীমিত বাঙালীর বর্ণসমাজ। বাঙলাদেশে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নাই, প্রাচীনকালেও ছিল বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট প্রমাণ নাই ; অল্পসংখ্যক থাকিলেও তাঁহাদের কোনও প্রাধান্য ছিল বলিয়া মনে হয় না। ইহার কারণ কী ? ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য বাঙলাদেশে কিভাবে কখন প্রতিষ্ঠিত হইল ? বৈদ্য-কায়স্থ বৃত্তিধারী লোকেরাই বা কী করিয়া কখন বর্ণবদ্ধ হইলেন ? এবং, ব্রাহ্মণদের পরেই তাঁহাদের স্থান নির্ণীত হইল কিরূপে ? অন্যান্য সংকর পর্যায়ের বিচিত্র জাতের এবং ম্লেচ্ছ-পতিত-অন্ত্যজ পর্যায়ের যে-সব লোকদের কথা প্রাচীন লেখমালায় ও সাহিত্যগ্রন্থাদিতে পাওয়া যায় তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ কিরূপ, প্রত্যেকের স্বরূপ কী, বৃত্তি কী, দায় কী, অধিকার কী ছিল ? বর্ণের সঙ্গে শ্রেণীর সম্বন্ধ কিরূপ ছিল, রাষ্ট্রে বিভিন্ন বর্ণের স্থান কিরূপ ছিল, রাজবংশের এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে বর্ণবিন্যাসের সম্বন্ধ কী ছিল ইত্যাদি সকল কথাই বাঙালীর ইতিহাসের কথা। এই কথা লইয়া বাঙালীর ইতিহাসের ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায় : শ্রেণীবিন্যাস

আগে যে বাঙলার জনসাধারণের কথা বলিয়াছি তাঁহারা সকলেই তো কিছু কৃষক বা ক্ষেত্রকর ছিলেন না। এখনকার মতো তখনও বৃহৎ একটা চাকুরিজীবী সম্প্রদায়ও ছিল। ইঁহাদের অধিকাংশই ছিলেন রাজকর্মচারী। তাহা ছাড়া, ছোট ছোট মানপ বা দোকানদার হইতে আরম্ভ করিয়া বড় বড় বণিক, শ্রেষ্ঠী, সার্থবাহ, ব্যাপারী ইত্যাদির সংখ্যাও কম ছিল না। কৃষক বা ক্ষেত্রকররা তো ছিলেনই। তাহা ছাড়া, অধ্যাপনা, দেবপূজা, পৌরোহিত্য, নীতিপাঠ, ধর্ম ও সংস্কৃতি -চর্চা প্রভৃতি নানা বৃত্তি লইয়া ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য বর্ণেরও অল্পসংখ্যক বুদ্ধিজীবী ব্যক্তি ছিলেন। সকলের শেষে সমাজের নিরক্ষ

বর্ণস্তর ও শ্রেণীতে চণ্ডাল পর্যন্ত অন্যান্য অকীর্তিত লোকও ছিলেন অগণিত। প্রাচীন বাঙালী সমাজ এইসব নানা শ্রেণীতে বিন্যস্ত ছিল। এইসব বিভিন্ন শ্রেণীর বৃত্তি, তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ, তাহাদের দায় ও অধিকার ইত্যাদি সম্বন্ধে যে স্বল্প কথা জানা যায় তাহা লইয়া বাঙালীর ইতিহাসের সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায় : গ্রাম ও নগর -বিন্যাস

বিভিন্ন ব ঃ ও শ্রেণীর অগণিত জনসাধারণ বাস করিতেন হয় গ্রামে না হয় নগরে। এখনকার মতো তখনও বোধ হয় বর্তমান কালাপেক্ষাও অধিকসংখ্যক লোক গ্রামেই বাস করিতেন। জনসাধারণ বলিতে তখন প্রধানত এই অগণিত গ্রামবাসীদেরই বুঝাইত, এমন মনে করা অযৌক্তিক নয়। এক-একটা গ্রাম কী করিয়া গড়িয়া উঠিত তাহার দুই-একটি প্রমাণ পাওয়া যায়। গ্রামের সংস্থান কিরূপ ছিল. নগরের সংস্থান কিরূপ ছিল ? ইহাদের বিশেষ বিশেষ রূপ কী ছিল ? গ্রাম ও নগর এই দুয়ের সভ্যতার পার্থক্য কিরূপ ছিল ? ধর্ম ও শিক্ষা-কেন্দ্র, বাণিজ্যকেন্দ্রগুলির চেহারা কিরূপ ছিল ? সমস্ত প্রশ্নের উত্তর হয়তো মিলিবে না ; তবু. যতটুকু জানা যায় ততটুকু জানাই প্রাচীন বাঙলাদেশ ও বাঙালীকে জানা। এই জানার চেষ্টায় বাঙালীর ইতিহাসের অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায় : রাষ্ট্রবিন্যাস

এই যে বিভিন্ন শ্রেণী ও বর্ণের বিচিত্র জনসাধারণ, ইঁহাদের দৈনন্দিন জীবনের যে বিচিত্র কর্ম. বিচিত্র দায় ও অধিকার, তাহা ইঁহারা নির্বিবাদে পরস্পরের স্বার্থের সংঘাত বাঁচাইয়া নির্বাহ করিতেন কী করিয়া ? ক্ষেত্রকর যে হলচালনা করিতে গিয়া নিজের জমির সীমা ডিঙাইয়া প্রতিবেশীর জমি লোভ করিবেন না, তাহা দেখিবে কে ? যে বণিক পুণ্ড্র অথবা চম্পাপুরী-পাটলিপুত্র হইতে গরুর গাড়ির লহরে অথবা নদীপথে সপ্তডিঙ্গায় পণ্য সাজাইয়া চলিয়াছেন তাম্রলিপ্তি. পথে দস্যু তাঁহাকে হত্যা করিয়া পণ্য লুটিয়া লইবে না, এই আশ্বাস তাঁহাকে দিবে কে ? প্রত্যেকে স্বধর্মে ও স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আপন আপন রুচি ও কর্তব্যানুযায়ী জীবন যাপন করিয়া যাইতে পারিবেন, এই আশ্বাস সমাজ দিতে না পারিলে সমাজবিন্যাস সম্ভব হইতে পারে না। এই আশ্বাস দিবার, প্রত্যেককে স্বধর্মে ও স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার যন্ত্র হইতেছে রাষ্ট্র। ভিতর ও বাহিরের হাত হইতে দেশ ও রাজ্যকে রক্ষা করিবার যন্ত্রও এই রাষ্ট্র। সমাজ নিজের প্রয়োজনেই এই রাষ্ট্রযন্ত্র সৃষ্টি করে, এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রধান পরিচালককে রাজা বা প্রধান বা নায়ক বলিয়া স্বীকার করে, তাঁহার ও তাঁহার রাজপুরুষদের এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের নিয়ম-নির্দেশ মানিয়া চলে, রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনার ব্যয়ভার নির্বাহ করে, রাজাকে শ্রদ্ধাদান করে, এবং তাঁহার ও রাষ্ট্রযন্ত্রের সর্বপ্রকার বাধ্যতা স্বীকার করে। ইহাই মহাভারতের শান্তিপর্ব-বর্ণিত রাজধর্ম, অষ্টাদশ শতাব্দীর য়ুরোপের সামাজিক শর্তের মূল সূত্র। প্রাচীন বাঙলায় এই রাজা ও রাষ্ট্রযন্ত্রের স্বরূপ কী ছিল ? রাষ্ট্রপ্রধান কাহারা ছিলেন,

রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনা কাহারা করিতেন? রাষ্ট্রের আয়ব্যয় কী ছিল? রাজস্ব কী কী ছিল, কিরূপ ছিল? রাষ্ট্রের সঙ্গে বর্ণ ও শ্রেণীর সম্বন্ধ কী ছিল, গ্রাম ও নগরগুলির সম্বন্ধ কী ছিল, ধনোৎপাদনে ও বণ্টনে রাষ্ট্রের আধিপত্য কতটুকু ছিল? রাষ্ট্রের আদর্শ বিভিন্ন কালে কিরূপ ছিল? রাষ্ট্রের সঙ্গে সামাজিক সংস্কৃতির যোগ কিরূপ ছিল? এইসব বিচিত্র প্রশ্নের যথালভ্য উত্তর লইয়া বাঙালীর ইতিহাসের নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায় : রাজবৃত্ত

ধনসম্বল, ভূমিবিন্যাস, বর্ণবিন্যাস, শ্রেণীবিন্যাস, গ্রাম ও নগর-বিন্যাস, রাষ্ট্রবিন্যাস প্রভৃতি সব-কিছুর সঙ্গে দেশের ইতিবৃত্তকথা, অর্থাৎ বিভিন্ন পর্ব-বিভাগের কথা, রাষ্ট্রীয় উত্থান-পতনের কথা, রাজা ও রাজবংশের পরিচয়, রাষ্ট্রীয় আদর্শের পরিণতি, বিগ্রহ ও বিপ্লব, শান্তি ও সংগ্রাম প্রভৃতির বিবরণ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সমাজবিন্যাস ও রাষ্ট্রীয় ইতিবৃত্ত একে অন্যকে প্রভাবান্বিত করে, এবং দুইয়ে মিলিয়া ইতিহাসচক্রকে আবর্তিত করে। সেইজন্যই সমাজবিন্যাসের প্রেক্ষাপট হিসাবে এবং অন্যতম প্রধান প্রভাবক হিসাবে রাজবৃত্ত কথা অবশ্য জ্ঞাতব্য—রাজা এবং রাজবংশের স্থূল ও বিস্তৃত বিবরণ হিসাবে নয়, সমাজের সঙ্গে ইহাদের এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রপর্ব ও রাষ্ট্রাদর্শের সম্বন্ধের দিক হইতে। সেইজন্যই রাজবৃত্তকথা লইয়া এই ইতিহাসের অন্যতম সুদীর্ঘ অধ্যায়।

সর্বশেষে আসিতেছে প্রাচীন বাঙালীর মানস-সংস্কৃতির কথা। সংস্কৃতির প্রয়োজন কী? মানুষ তো শুধু খাইয়া পরিয়া দেহগত জীবনধারণ করিয়া বাঁচিয়া থাকে না। তাহার একটা মানসগত জীবনও আছে। এই মানসগত জীবন সকল মানুষের সমান নয়। যে শ্রেণী অথবা সমাজের সামাজিক ধনসম্বল যত বেশি সেই শ্রেণী ও সমাজের মানসজীবন তত উন্নত। এই মানসজীবনের প্রকাশই সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি সকল শ্রেণী ও বর্ণের লোকদের এক নয়, এক হইতে পারে না। সংস্কৃতির মূলে আছে কায়িক শ্রম হইতে অবসর; যে শ্রেণী ও বর্ণের সামাজিক ধনসঞ্চয় বা উদ্‌বৃত্ত ধন বেশি তাহারাই সেই ধনের বলে সেই শ্রেণী ও বর্ণের এবং অন্য শ্রেণী ও অন্য বর্ণের কতকগুলি লোককে ধনোৎপাদনগত কায়িক শ্রম হইতে মুক্তি দিয়া অবসরের সুযোগ দিতে পারে। সেই সুযোগে তাঁহারা চিন্তা, অধ্যয়ন, শিল্পচর্চা ইত্যাদি করিতে পারেন, এবং তাঁহারা তাঁহাদের শ্রেণীগত, নিজস্ব ও বৃহত্তর সমাজগত মানসের চিন্তা, কল্পনা, ভাব ও অনুভাবকে রূপদান করিতে পারেন। প্রাচীন বাঙলায়ও তাহাই হইয়াছিল; ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। যাহাই হউক, প্রাচীন বাঙলায় সংস্কৃতির রূপ আমরা দেখিতে পাই ধর্মকর্মের ক্ষেত্রে, শিল্পকলায় ও নৃত্যগীতে, জ্ঞানবিজ্ঞানে, ব্যবহারিক অনুশাসন-সামাজিক অনুশাসন ইত্যাদিতে। এই সংস্কৃতির অর্ধেক পুরাতন ঐতিহ্যজাত; এই ঐতিহ্যের মধ্যে থাকে জনগত, বর্ণগত রক্তের স্মৃতি, পূর্বপুরুষদের সংস্কৃতির স্মৃতি; বাকি অর্ধেক সমসাময়িক সমাজবিন্যাসের প্রয়োজনে গড়িয়া উঠে। কাজেই অতীতের স্মৃতি ও

বর্তমানের প্রয়োজন, এই দুই বস্তুই বিশেষ দেশ ও বিশেষ কালের সংস্কৃতির মধ্যে জড়াজড়ি করিয়া মিশাইয়া থাকে। প্রাচীন বাঙলার এই সংস্কৃতির স্বরূপটি কী, সত্যকার চেহারাটা কী তাহা জানিবার প্রয়াস লইয়াই আমার বাঙালীর ইতিহাসের শেষ কয়েকটি অধ্যায়। সুস্পষ্ট স্বরূপ হয়তো জানা যাইবে না, জানিবার যথেষ্ট উপাদানও এ-যাবৎ আবিষ্কৃত হয় নাই; তবু, চেষ্টা করিতে দোষ নাই, মোটামুটি আভাস একটু পাওয়া যাইবে তো! তাহা ছাড়া, মানস-সংস্কৃতি প্রকাশ পায় নরনারীর দৈনন্দিন জীবনচর্যার ভিতর দিয়া, তাহাদের আহার-বিহারে, বসন-ব্যসনে, আচার-ব্যবহারে। জনসাধারণের জীবনেতিহাস জানিতে হইলে এ-সমস্ত বিষয়েরও আলোচনা অপরিহার্য।

দ্বাদশ অধ্যায়: ধর্মকর্ম

প্রাচীন বাঙালীর মানস-সংস্কৃতির প্রথম ও প্রধান পরিচয় তাঁহাদের ধর্মকর্মে। বিচিত্র ধর্মসংস্কার, বিশ্বাস, পূজা, আচার-অনুষ্ঠান, বার মাসে তের পার্বণ, অসংখ্য দেবদেবী ও অন্যান্য প্রতীক লইয়াই প্রাচীন বাঙালীর জীবন; তাঁহার দৈনন্দিন জীবনও এইসব লইয়াই একই সঙ্গে মধুর ও দায়িত্বময়। তাঁহার প্রাগৈতিহাসিক কৌম বিশ্বাস, সংস্কার, পূজা, আচার, অনুষ্ঠান ইত্যাদির উপর উত্তরকালে ক্রমে ক্রমে জৈন, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য প্রভৃতি আর্যধর্মের, নানাপ্রকার তান্ত্রিক আচার, পদ্ধতি ও অনুষ্ঠান ইত্যাদির প্রভাব পড়িয়া যে ধর্ম-বিশ্বাস, কর্মানুষ্ঠান প্রভৃতি বিবর্তিত হইয়াছে, তাহার সঙ্গে উত্তর বা দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের পার্থক্য প্রচুর! সমাজবিন্যাসের উপরও এইসব বিশ্বাস-অনুষ্ঠানের প্রভাব কম পড়ে নাই। বিশেষ বিশেষ বর্ণ ও শ্রেণীতে বিশেষ বিশেষ দেবদেবীর, বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান ও বিশ্বাসের প্রচারের মধ্যেও সমসাময়িক সমাজবিন্যাসের পরিচয় সুস্পষ্ট। ধর্মকর্মের বিবর্তন-ইতিহাসের ভিতর দিয়াও সেইজন্য জনসাধারণের জীবনের এবং সমাজবিন্যাসের ইতিহাস উজ্জ্বলতর হয়। সেইজন্য ধর্মকর্মের কথা লইয়া প্রাচীন বাঙালীর ইতিহাসের দ্বাদশ অধ্যায়।

চতুর্দশ অধ্যায়: শিল্পকলা

এই ধর্মকর্মের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি জড়িত প্রাচীন বাঙলার শিল্পকলা, নৃত্যগীত ইত্যাদি। শিল্পই হউক আর নৃত্যগীতই হউক, ইহাদের প্রথম ও প্রধান আশ্রয় ছিল ধর্মকর্ম; ধর্মকর্মানুষ্ঠান উপলক্ষেই নৃত্যগীতের প্রচলন হইয়াছিল বেশি। মূর্তি ও মন্দির ইত্যাদি তো একান্তভাবেই ধর্মাশ্রয়ী। রাজপ্রাসাদ, অভিজাত-বংশীয়দের বাসগৃহ ইত্যাদি ইট-কাঠে নির্মিত হইত সন্দেহ নাই; চিত্রে মূর্তিতে গৃহ সজ্জিত হইত; কিন্তু কাল, প্রকৃতি ও মানুষের ধ্বংসলীলার হাত এড়াইয়া আজ আর তাহাদের চিহ্ন বর্তমান নাই; যে দুই-চারিটি চিহ্ন বহু আয়াসে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা প্রায় সমস্তই ধর্মকর্মাশ্রিত। শিল্পকলা-নৃত্যগীতের দিক হইতে ইহাদের যাহা বিশুদ্ধ শিল্পমূল্য বা সংস্কৃতিমূল্য তাহা

তো আছেই ; ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে প্রাচীন বাঙলার শিল্পকলার একটি বিশেষ স্থানও আছে। কিন্তু বাঙালীর ইতিহাসে তাহার আলোচনার মূল্য সমাজমানসের দিক হইতেই বেশি ; এবং তাহাই মুখ্য। এই শিল্পকলা-নৃত্যগীতের মধ্যে প্রাচীন বাঙালীর মন, তাঁহাদের সমাজবিন্যাস, পরিবেশ সম্বন্ধে তাঁহাদের মানসিক প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি কিভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই আমাদের প্রধান আলোচ্য। এই আলোচনা লইয়া আমাদের ইতিহাসের চতুর্দশ অধ্যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায় : শিক্ষাদীক্ষা-জ্ঞানবিজ্ঞান-সাহিত্য

ধর্মকর্ম শিল্পকলার মতো সমাজমানসের অভিব্যক্তি দেখা যায় সমসাময়িক সাহিত্যে, জ্ঞানবিজ্ঞানে ও শিক্ষাদীক্ষায়। প্রাচীন বাঙলায় ইহাদেরও প্রধান আশ্রয় ধর্মকর্ম, ধর্মবিশ্বাস, সমাজ-সংস্কার ইত্যাদি। এইসব সমস্তই মানসোৎকর্ষের বা অপকর্ষের, এক কথায় সংস্কৃতির, লক্ষণ সন্দেহ নাই। ইহাদের কতক অংশ গড়িয়া উঠিয়াছিল দৈনন্দিন জীবনচর্যার এবং বৃহত্তর সমাজচর্যার বা অন্য ব্যবহারিক প্রয়োজনে, কতক একান্তই সৃষ্টির প্রেরণায়, বুদ্ধিগত, ভাবকল্পনাগত, চিন্তাগত, অভিজ্ঞতাগত মানসের আত্মপ্রকাশের যে স্বাভাবিক বৃত্তি তাহারই প্রেরণায়। এই আত্মপ্রকাশের রূপ ও রীতি বহুলাংশে সমাজবিন্যাস দ্বারা নিয়মিত হইয়া থাকে। আবার, সমাজবিন্যাসও ইহাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। এই উভয়ের ঘাতপ্রতিঘাতেই যে শিক্ষা-দীক্ষা, সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রভৃতি যুগে যুগে বিবর্তিত হইতে থাকে, এ তত্ত্ব বর্তমান সমাজতত্ত্বাদর্শে ও আলোচনায় স্বীকৃত। সেইজন্যই প্রাচীন বাঙলার ইতিহাসে ধর্মকর্ম-শিল্পকলার মতো শিক্ষাদীক্ষা-সাহিত্য-বিজ্ঞানের আলোচনাও সমসাময়িক সমাজবিন্যাস ও সমাজমানসের পরিচয় হিসাবেই বেশি, বিশুদ্ধ সাহিত্য বা বিজ্ঞান -মূল্যের দিক হইতে ততটা নয়। এই শিক্ষাদীক্ষা-জ্ঞানবিজ্ঞান-সাহিত্য লইয়া বাঙালীর ইতিহাসের ত্রয়োদশ অধ্যায়।

একাদশ অধ্যায় : আহার-বিহার, বসন-ব্যসন, আচার-ব্যবহার, দৈনন্দিন জীবন

জনসাধারণের মানস-সংস্কৃতির পরিচয় শুধু ধর্মকর্ম, শিল্পকলা, সাহিত্য-বিজ্ঞানের মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া থাকে না। শিথিলভাবে বলিতে গেলে, ইহারা মানস-সংস্কৃতির পোশাকী দিক ; কিন্তু, সংস্কৃতির আর-একটা আটপৌরে দিক আছে, এবং সেই দিকটাতেই জনসাধারণের জীবনচর্যার ঘনিষ্ঠতম পরিচয়। আহার-বিহার, বসন-ব্যসন, আমোদ-আহ্লাদ, দৈনন্দিন জীবনের সুখদুঃখ, উৎসব-আচার-ব্যবহার প্রভৃতির মধ্যে এই পরিচয় যেমন পাওয়া যায় এমন আর কোথাও নয়। দৈনন্দিন জীবনের আটপৌরে দিকটা লইয়া জনসাধারণের জীবনেতিহাসের অন্যতম প্রধান, অপরিহার্য এবং অবশ্য আলোচ্য একাদশ অধ্যায়।

পঞ্চদশ অধ্যায় : ইতিহাসের ইঙ্গিত

ইতিহাস শুধু তথ্যমাত্র নয়। যে তথ্য কথা বলে না, কার্যকারণ-সম্বন্ধের ইঙ্গিত বহন করে না, যাহার কোনও ব্যঞ্জনা নাই, শুধুই বিচ্ছিন্ন তথ্য মাত্র, যে তথ্য কোনও যুক্তিসূত্রে গ্রথিত নয়, ইতিহাসে তাহার কোনও মূল্য নাই। সমস্ত তথ্যের পশ্চাতে কার্যকারণ-পরম্পরার অমোঘ নিয়ম সর্বদা সক্রিয়। এই নিয়মটি ধরিতে পারা, দেশকাল-ধৃত নরনারীর গতি-পরিণতির প্রকৃতিটি ধরিতে পারা, সমাজের প্রবহমাণ ধারাস্রোতের পশ্চাতের ইঙ্গিতটি জানাই ঐতিহাসিকের কর্তব্য। কার্যকারণপরম্পরায়, যুক্তিশৃঙ্খলায় তথ্যসন্নিবেশ করিয়া যাইতে পারিলে তবেই সেই অমোঘ নিয়মটি, ইঙ্গিত ও প্রকৃতিটি জানা যায়। প্রাণহীন, নীরব, নীরস তথ্য তখন সজীব, মুখর ও সরস হইয়া উঠে। আমার তথ্যসন্নিবেশের মধ্যে ইতিহাসের সেই সজীব মুখরতা পরিস্ফুট হইবে কিনা জানি না, তবু সকল তথ্যের পশ্চাতে বাঙালীর আদি ইতিহাসের গতি-প্রকৃতির একটি সমগ্র ইঙ্গিত আমি মনন-কল্পনার মধ্যে ধরিতে চেষ্টা করিয়াছি। সে ইঙ্গিত আলোচ্য অধ্যায়গুলির স্থানে স্থানে পাওয়া যাইবে, বিশেষভাবে পাওয়া যাইবে রাজবৃত্ত অধ্যায়ে। তবু, সর্বশেষ অধ্যায়ে ইতিহাসের ইঙ্গিতটি একটি অখণ্ড অথচ সংক্ষিপ্ত সমগ্রতায় উপস্থিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

৫

আমি কোনও নূতন শিলালিপি বা তাম্রপট্টের সন্ধান পাই নাই, কোনও প্রাচীন গ্রন্থের খবর নূতন করিয়া জানি নাই, কোনও নূতন উপাদান আবিষ্কার করি নাই। যে-সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থ বা লেখমালা সংকলিত ও সম্পাদিত হইয়াছে, অথবা সংকলন-সম্পাদনের অপেক্ষা করিতেছে নানা গ্রন্থাগার ও চিত্রশালায়, যে-সমস্ত তথ্য ও উপাদান পাণ্ডিতমহলে অল্পবিস্তর পরিচিত ও আলোচিত, প্রায় তাহা হইতেই আমি সমস্ত তথ্য ও উপকরণ আহরণ করিয়াছি। কাজেই পূর্ববর্তী প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক গবেষকদের সকলের কাছেই আমি ঋণী, বিশেষভাবে ঋণী এই অধ্যায়ের প্রথমেই যে-সব মনীষীদের নামোল্লেখ করিয়াছি তাঁহাদের কাছে। এই ঋণ সগৌরবে ঘোষণা করিতে এতটুকু দ্বিধা আমার নাই। ইঁহারা যে-কোনও দেশের গৌরব, এবং ইঁহাদেরই অকুণ্ঠ অবারিত দানের ঘোষণা এই গ্রন্থের পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে। এই-সমস্ত পূর্বাবিষ্কৃত উপাদান ও পূর্বসূরীদের রচনা আমার সম্মুখে বর্তমান না থাকিলে এই প্রয়াস অসম্ভব হইত। আমি শুধু প্রাচীন বাঙলার ও প্রাচীন বাঙালীর ইতিহাস একটি নূতন কার্যকারণসম্বন্ধগত যুক্তিপরম্পরায়, একটি নূতন দৃষ্টিভঙ্গির ভিতর দিয়া বাঙালী পাঠকের কাছে উপস্থিত করিতেছি মাত্র। এই যুক্তিপারম্পর্য ও দৃষ্টিভঙ্গি সমাজবিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক যুক্তি ও দৃষ্টি বলিয়া আধুনিক ঐতিহাসিকেরা বিশ্বাস করেন, আমিও করি। আমার বিশ্বাস, এই যুক্তি ও

দৃষ্টি অনুসরণ করিলে প্রাচীন বাঙালীর ইতিহাসের যে সামগ্রিক সর্বতোভদ্র রূপ দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা অন্য উপায়ে সম্ভব নয়।

তাহা ছাড়া, এই যুক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া আমি প্রাচীন বাঙলা ও বাঙালীর সম্পূর্ণ ইতিহাস রচনার প্রয়াসও করিতেছি না। সে সময় হয়তো এখনও আসে নাই। নূতন নূতন উপাদান প্রায়শ আবিষ্কৃত হইতেছে। বর্তমানে উপাদান সুপ্রচুর নয়, উপাদানলব্ধ সংবাদও অল্পতর। আমি শুধু কাঠামো রচনার প্রয়াস করিয়াছি, ভবিষ্যৎ বাঙালী ঐতিহাসিকেরা ইহাতে রক্তমাংস যোজনা করিবেন, এই আশা ও বিশ্বাসে। আরও একটু আশা এই যে, এই যুক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া বর্তমান সমাজ-বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তাঁহারা বাঙলার মধ্য ও উত্তর-পর্বের ইতিহাসও রচনা করিয়া তুলিবেন। সুযোগ ও অবসর ঘটিলে নিজের উপরও সে কর্তব্য পালনের দায়িত্ব রহিল, তাহা অস্বীকার করিতেছি না।

আমার কোনও কথাই শেষ কথা নয়। সত্যসন্ধী ঐতিহাসিকের কাছে শেষ কথা কিছু নাই; তাঁহার সব কথাই experiments with truth মাত্র। এই কাঠামো রচনার প্রয়াস সত্যে পৌঁছিবার নিম্নতম স্তর; এই স্তর যদি ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিককে সত্যে পৌঁছিতে কিছুমাত্র সহায়তা করে, তবেই আমার দেশের এবং আমার জাতির এই ইতিহাস-রচনা সার্থক বলিয়া মনে করিব।

সাধারণ পাঠনির্দেশ

প্রথম অধ্যায়ের কোনো পাঠপঞ্জী প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না, সর্বশেষ বা পঞ্চদশ অধ্যায়েরও নয়। দ্বিতীয় থেকে চতুর্দশ অধ্যায় পর্যন্ত প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষেই একটি করে সংক্ষিপ্ত পাঠপঞ্জী দেওয়া হচ্ছে, নূতন সংকলন করে। পরিশিষ্টে 'সংশোধন ও সংযোজন' অংশের পাঠপঞ্জী ঐ অংশেরই অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। নীচে যে সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জীটি দেওয়া হচ্ছে তা প্রথম অধ্যায়ের নয়; সমস্ত গ্রন্থটি জুড়ে বিভিন্ন অধ্যায়ে যে-সব প্রধান প্রধান উপাদান উপকরণ, ছোট বড় যে-সব তথ্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে তার উৎসের সাক্ষাৎ কোথায় পাওয়া যাবে তার, অর্থাৎ সাধারণ আকর-গ্রন্থগুলির একটি তালিকা দেওয়া হচ্ছে। এই সব ক'টি গ্রন্থই যে এ-গ্রন্থের প্রথম প্রকাশকালে রচিত হয়েছিল, এমন অবশ্য নয়।

আমার প্রথম ও প্রধান নির্ভর প্রাচীন লিপিমালা। এই লিপিমালার একটি পরিবর্ধিত তালিকা প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্টে সংবদ্ধ করা হচ্ছে। সেখানে প্রত্যেকটি লিপির সঙ্গে সঙ্গেই তার পাঠনির্দেশও দেওয়া আছে। তবু নীচে কয়েকটি এমন গ্রন্থের উল্লেখ করছি যেখানে একত্রে অনেকগুলি লিপির পাঠ, অনুবাদ, টীকাটিপ্পনী ইত্যাদি পাওয়া যাবে।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, গৌড়-লেখমালা, রাজসাহী, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ।

পদ্মনাথ ভট্টাচার্য, কামরূপ-শাসনাবলী।

Fleet, J. F., Corpus Inscriptionum Indicarum, III, Calcutta.

Gupta, Kamalakanta, Copper plates of Sylhet, I, 1967.

Majumder, N. G., Inscriptions of Bengal, III, Rajsahi, 1929.

Mukherji, Ramaranjan and Maity, Sachindra Kumar, Corpus of Bengali Inscriptions bearing on History and Civilization of Bengal, Calcutta, 1967.

Sircar, D. C., Select Inscriptions bearing on Indian History and Civilization, 2nd. edn, 1965.

,, ,, Epigraphic Discoveries in East Pakistan, Calcutta, 1973.

এ-গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশকালের আগে প্রত্নসন্ধান ও উৎখনন কোথাও বেশি কিছু হয়নি, পাহাড়পুর, বাণগড় ও ময়নামতী ছাড়া। ময়নামতীর প্রত্নসংবাদ তখন যতটুকু জানা ছিল, তা অস্পষ্ট; বস্তুত, এখন আমরা যা জানি তা সবই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের পর। যাই হোক, এই তিনটি স্থানের প্রত্নসংবাদ আহরণ করা হয়েছে নিম্নোক্ত রচনাগুলি থেকে:

Dikshit, K. N., Excavations at Paharpur, Archaeological Survey of India, Memoir no. 55, 1938.

Goswami, Kunjagobinda, Excavations at Bangarh, Calcutta.

Ramachandran, T. N., Recent Archaeological Discoveries along the Mainamati and Lalwai Ranges, in B. C. Law Volume II, p 213 ff.

প্রাচীন মুদ্রাদি সম্বন্ধেও কিছু কিছু তথ্য একাধিক অধ্যায়ে ব্যবহার করা হয়েছে। যে-সব তথ্য আহরণ করা হয়েছে নিম্নোক্ত গ্রন্থাদিতে তার উৎস-সন্ধান পাওয়া যাবে :

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাচীন মুদ্রা, কলিকাতা, ১৩২২ বঙ্গাব্দ।

Allan, John, Catalogue of Coins of the Gupta Dynasties and of Sasanka, King of Gauda (in the British Museum), London, 1914.

Bhattacharyya, P. N , A Hoard of Silver Punch-marked Coins from Purnea, Archaeological Survey of India, Memoir no. 62, Calcutta, 1940.

Roychoudhury, Chittaranjan, A Catalogue of Early Coins in the Asutosh Museum, Calcutta, 1962.

Sircar, D. C., Studies in Indian Coins, Calcutta, 1968.

Smith, V. A., Catalogue of Coins in the Indian Museum, Calcutta, I, Oxford, 1906.

বেশ কিছু প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থাদি থেকেও নানা অধ্যায়ে নানা তথ্য সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। এমন কয়েকটি গ্রন্থের নাম নীচে উদ্ধার করা হলো :

অর্থশাস্ত্র, কৌটিল্য প্রণীত। Ed. and translated by Shamsastri

আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প। টি. গণপতি শাস্ত্রী সং। ত্রিবান্দ্রম সংস্কৃত গ্রন্থমালা। কাশীপ্রসাদ জয়সওয়াল সং (An Imperial History of Inda in a Sanskrit Text, by K. P Jayaswal).

কামসূত্র, বাৎস্যায়নকৃত। চৌখাম্বা সংস্কৃত গ্রন্থমালা।

চর্যাগীতি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কৃত সং : হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালাভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা, কলিকাতা, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ। প্রবোধচন্দ্র বাগচী সম্পাদিত দোহাকোষ, Journal of the Department of Letters, Calcutta University, XXVIII.

বৃহদ্ধর্মপুরাণ, পঞ্চানন তর্করত্ন সং, কলিকাতা, ১৮২৭ শকাব্দ।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সং (Bibliotheca Indica Series), কলিকাতা, ১৮৯৭।

রামচরিত, সন্ধ্যাকর নন্দীকৃত। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সং, কলিকাতা, ১৯১০। রমেশচন্দ্র মজুমদার, রাধাগোবিন্দ বসাক ও ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সং (ইংরাজি অনুবাদ সহ), রাজসাহী, ১৯৩৯।

সদুক্তিকর্ণামৃত, শ্রীধরদাস সংকলিত, রামাবতার শর্মা ও হরদত্ত শর্মা সং।

অনুরূপ ভাবেই নানা অধ্যায়ে প্রচুর তথ্য সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে কিছু কিছু প্রাচীন বিদেশী গ্রন্থ ও পর্যটকদের বিবরণী থেকে। তেমন কয়েকটি গ্রন্থ ও ভ্রমণবৃত্তান্ত নীচে উল্লেখ করা হচ্ছে :

Beal, S, Buddhist Records of the Western World, translated from the Chinese of Hiuen Tsang, London, 1906

" " " Life of Hiuen Tsang, London, 1911

Legge, J A, A Record of Buddhistic Kingdoms, being an Account by the Chinese Monk Fa hien of his Travels in India and Ceylon, 1886.

Majumdar, R. C. (ed), The Classical Accounts of India, Calcutta, 1960.

McCrindle J. W, Ancient India as described by Megasthenes and Arrian, London, 1877.

" " , The Invasion of India by Alexander the Great, as Described by Arrian, Q. Curtius, Diodorus, Plutarch and Justin, Westminster, 1896.

Periplus of the Erythrean Sea, edited and translated by Schiefner.

Ptolemy, Ancient India, trans. and edited by S. N. Majumdar, Calcutta.

Takakusu, J A, Record of the Buddhist Religion as Practised in India and the Malay Archipelago, by I-tsing, Oxford, 1896.

Watters, T., On Yuan Chwang's Travels in India, 2 vols. London, 1905.

সাম্প্রতিক কালে কয়েকজন আধুনিক পণ্ডিত ও গবেষক প্রাচীন বাঙলার ইতিহাস নিয়ে প্রচুর তথ্যপূর্ণ গ্রন্থাদি রচনা করেছেন। যে-সব গ্রন্থ পড়ে আমি উপকৃত হয়েছি এবং ঋণগ্রহণ করেছি, সেগুলি নীচে তালিকাবদ্ধ করছি। প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশকালে এর সব কটিই যে রচিত হয়েছিল, এমন অবশ্য নয়।

রমাপ্রসাদ চন্দ, গৌড়-রাজমালা, রাজসাহী, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, প্রথম সং, কলিকাতা, ১৩২১ বঙ্গাব্দ।

Basak, Radhagovinda, History of North-eastern India, Calcutta.

Majumdar, R. C. The Early History of Bengal, Dacca, 1924

Majumdar, R. C (ed.), The History of Bengal 1, Dacca, 1943.
Majumdar, R. C. History of Ancient Bengal, Calcutta, 1974,
Monahan, F. J. The Early History of Bengal, Oxford, 1924.
Paul, Pramodelal, The Early History of Bengal, 2 parts, Calcutta, 1939.
Sen, Benoy Chandra, Some Historical Aspects of the Inscriptions of Bengal, Calcutta, 1942,

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইতিহাসের গোড়ার কথা

১

জনতত্ত্বের ভূমিকা

একদা রবীন্দ্রনাথ ভারততীর্থকে অগণিত জাতির মিলনক্ষেত্র কল্পনা করিয়া বলিয়াছিলেন,

কেহ নাহি জানে, কার আহ্বানে
কত মানুষের ধারা,
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে
সমুদ্রে হল হারা।

ভারততীর্থের অন্যতম প্রান্তিক দেশ বঙ্গভূমি সম্বন্ধেও এ কথা সমান প্রযোজ্য। গঙ্গা-করতোয়া-লৌহিত্যবিধৌত, সাগর-পর্বতধৃত, রাঢ়-পুণ্ড্র-বঙ্গ-সমতট এই চতুর্জনপদসমৃদ্ধ বাঙলাদেশে প্রাচীনতম কাল হইতে আরম্ভ করিয়া তুর্কী অভ্যুদয় পর্যন্ত কত বিভিন্ন জন, কত বিচিত্র রক্ত ও সংস্কৃতির ধারা বহন করিয়া আনিয়াছে, এবং একে একে ধীরে কোথায় কে কীভাবে বিলীন হইয়া গিয়াছে ইতিহাস তাহার সঠিক হিসাব রাখে নাই। সজাগ চিত্তের ও ক্রিয়াশীল মননের রচিত কোনও ইতিহাসে তাহার হিসাব নাই এ কথা সত্য, কিন্তু মানুষ তাহার রক্ত ও দেহগঠনে, ভাষায় ও সভ্যতার বাস্তব উপাদানে এবং মানসিক সংস্কৃতিতে তাহা গোপন করিতে পারে নাই। সকলের উপর এই বিচিত্র রক্ত ও সংস্কৃতির ধারা তাহার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রাখিয়া গিয়াছে বাঙালীর প্রাচীন সমাজবিন্যাসের মধ্যে। রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে সে ইঙ্গিত কিছুতেই ধরা পড়িবার কথা নয়।

বাঙলাদেশে আজ জনতত্ত্ব-গবেষণার মাত্র শৈশবাবস্থা। এ কথা অবশ্য সকলেই জানেন, বাঙালী এক সংকর জন,[১] কিন্তু কথাটা ঐখানেই শেষ হইয়া যায় না, বরং ঐখানেই কথার আরম্ভ। অথচ, কী কী মূল উপাদানের জৈব সমন্বয়ের ফলে বাঙালী আজ এক সংকর জনে পরিণত হইয়াছে, এ কথা কমবেশি নিশ্চয় করিয়া বলিবার মতন যথেষ্ট উপকরণ দেশের সর্বত্র ইতস্তত বিক্ষিপ্ত থাকিলেও নৃতত্ত্ববিদ্ ও ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি সেদিকে আজ পর্যন্ত বিশেষ আকৃষ্ট হয় নাই। কেন হয় নাই তাহার কারণ দুর্বোধ্য না হইলেও এখানে তাহার আলোচনা অবান্তর। বাঙালীর জনতত্ত্ব-নিরূপণ শুধু

১। এই নিবন্ধে 'জন' সাধারণত ইংরাজী 'people' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; caste বুঝাইতে 'বর্ণ' ও বাংলা চলতি 'জাত্' শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। প্রাণিতত্ত্ব বা নরতত্ত্বগত 'race' বুঝাইতে 'নর' এবং 'নরগোষ্ঠী' এবং 'tribe' অর্থে হিন্দুস্থানী 'কোম' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইংরাজী 'race' ও 'people' এই দুইটি শব্দ লইয়া নানাপ্রকার বিভ্রমের সৃষ্টি ঐতিহাসিকদের মধ্যে দুর্লভ নয়।

নৃতাত্ত্বিকের কাজ নয় ; তাঁহার সঙ্গে ঐতিহাসিক ও ভাষাতাত্ত্বিকের জ্ঞান ও দৃষ্টির একত্র মিলন না হইলে বাঙালীর জনরহস্য উন্মোচন করা প্রায় অসম্ভব বলিলেই চলে। যে জন যত বেশি সংকর সে জনের ক্ষেত্রে এ কথা তত বেশি প্রযোজ্য।

বাঙালীর জনতত্ত্ব-নিরূপণের একতম এবং প্রধানতম উপায় বাঙলাদেশের আচণ্ডাল সমস্ত বর্ণের এবং সমস্ত শ্রেণীর জনসাধারণের, বিশেষভাবে প্রত্যন্তশায়ী জনপদবাসীদের সকলের রক্ত ও দেহগঠনের বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ, এক কথায় নরতত্ত্বের পরিচয়। আমাদের দেশের নৃতত্ত্ব গবেষণায় রক্তবিশ্লেষণ এখনও সাধারণভাবে পণ্ডিতদের দৃষ্টির পরিধির মধ্যে ধরা দেয় নাই। দুই-একজন একটু-আধটু পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছেন মাত্র। দেহগঠনের বিশ্লেষণেরও এ-পর্যন্ত যাহা স্বীকৃত ও অনুসৃত হইয়াছে তাহা শুধু নরমুণ্ড, নরকপাল ও নাসিকার পরিমিতি ও পরস্পর অনুপাত, এবং চুল, চোখ ও চামড়ার রং আশ্রয় করিয়া। য়ুরোপে, বিশেষ করিয়া জার্মানি ও অস্ট্রিয়ায়, গায়ের চামড়ার উপাদানবৈশিষ্ট্য, কেশমূল, কেশবৈশিষ্ট্য, নখবৈশিষ্ট্য, হাত ও পায়ের তালু প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নানা গুণ ও বৈশিষ্ট্য লইয়া যে-সব আলোচনা হইয়াছে আমাদের দেশের নরতত্ত্ব গবেষণায় আজ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদেও তাহা অল্পই স্থান পাইয়াছে। নরমুণ্ড, কপাল ও নাসিকার পরিমিতি ও পরস্পর অনুপাত বিশ্লেষণ যাহা হইয়াছে তাহাও যথেষ্ট নয়। বহুদিন আগে রিজ্‌লী সাহেব বাঙলাদেশের বিভিন্ন স্থানের জনসাধারণের কিয়দংশের পরিমিতি গণনা করিয়াছিলেন : আজ পর্যন্ত নৃতত্ত্ববিদেরা সাধারণত সেই গণনার উপরই নির্ভর করিয়া আসিয়াছেন। সাম্প্রতিক কালে ফন্‌ আইকস্টেড্‌ট্‌, জে এইচ্‌ হাটন্‌, বিরজাশংকর গুহ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, রমাপ্রসাদ চন্দ, শরৎচন্দ্র রায়, হারাণচন্দ্র চাকলাদার, মীনেন্দ্রনাথ বসু, তারকচন্দ্র রায়চৌধুরী প্রমুখ কয়েকজন পণ্ডিত কিছু কিছু নূতন পরিমিতি গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু লোকসংখ্যার অনুপাতে তাহা খুবই অল্প, অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাহা ছাড়া, যে-সব নিদর্শন আহরণ ইঁহারা করিয়াছেন, সর্বত্র সেগুলির প্রতিনিধিত্ব স্বীকার করা যায় না, অর্থাৎ সমাজের সকল বর্ণ ও শ্রেণী -স্তরের ও দেশের সকল স্থানের জনসাধারণের মধ্য হইতে নিদর্শন নির্বাচন সর্বত্র যথার্থ ও যথেষ্ট হইয়াছে, বর্ণ, শ্রেণী ও স্থানের ইতিপরম্পরাগত মূল্য স্বীকৃত হইয়াছে এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। তাহা ছাড়া, পরিমিতিগণনায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই যে ব্যক্তিগত ভুল থাকার সম্ভাবনা, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবু, যতটুক হইয়াছে, যেভাবে হইয়াছে তাহা হইতে কিছু কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়, এবং বাস্তব সভ্যতা ও মানসিক সংস্কৃতি-বিকাশের ইতিহাসের সাহায্যে সেই ইঙ্গিতগুলি ফুটাইয়া তোলা হয়তো অসম্ভব নয়।

বাঙালীর জনতত্ত্ব-নিরূপণের কিছুটা সহায়ক উপায়, বাঙলা ভাষার বিশ্লেষণ। অবশ্য এ কথা সত্য যে ভাষাবিশ্লেষণের সাহায্যে নরতত্ত্ব ঠিক নির্ণয় করা চলে না ; কারণ মানুষ

নানা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অথবা ধর্মগত কারণে ভাষা বদলায় ; এক জন অন্য জনের ভাষা গ্রহণ করে এবং সেই ভাষাই দুই তিন পুরুষ পরে নিজেদের জাতীয় ভাষায় পরিণতি লাভ করে ; ভারতবর্ষের ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই। কাজেই ভাষার উপর নির্ভর করিয়া নরতত্ত্ব-নির্ণয়ের চেষ্টা স্বভাবতই অযৌক্তিক এবং বিজ্ঞানসম্মত পন্থার বিরোধী। তবে জননির্ণয়ে ভাষা-বিশ্লেষণ যে অন্যতম সহায়ক এ কথাও একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। কোনও জনের ভাষা বিশ্লেষণ করিয়া যদি দেখা যায় সেই ভাষার জীবনচর্যার মূল শব্দগুলি কিংবা পদরচনারীতি কিংবা পদভঙ্গি অথবা মানুষ ও স্থান ইত্যাদির নাম অন্য কোনও জনের ভাষা হইতে গৃহীত বা উদ্ভূত, তখন স্বভাবতই এ অনুমান করা চলে যে, সেই পূর্বোক্ত জনের সঙ্গে শেষোক্ত জনের রক্তে সংমিশ্রণ না হোক, মেলামেশা ঘটিয়াছে। এই মেলামেশা নানা সামাজিক ও অন্যান্য কারণে সমাজ-কাঠামোর সকল স্তরে নাও হইতে পারে, যে যে স্তরে হইয়াছে সেখানেও সর্বত্র সমভাবে হইয়াছে এ কথাও বলা যায় না। যাহাই হউক, ভাষাবিশ্লেষণের ইঙ্গিত নরগোষ্ঠী-নির্ধারণে না হউক, জন-নিরূপণে অনেকখানি সাহায্য করিতে পারে ; আর সেই ইঙ্গিতের মধ্যে যদি নরতত্ত্ব-বিশ্লেষণলব্ধ ইঙ্গিতের সমর্থন পাওয়া যায়, তাহা হইলে পূরক সাক্ষ্য হিসাবে জনতত্ত্ব-নির্ণয়ের কাজেও লাগিতে পারে।

বাঙলাদেশ ও বাঙলার সংলগ্ন প্রত্যন্ত দেশগুলির ভাষার বিশ্লেষণ অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। আচার্য গ্রীয়ার্সন হইতে আরম্ভ করিয়া সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পর্যন্ত কয়েকজন খ্যাতনামা পণ্ডিত বাংলা ভাষার জন্ম ও জীবনকথা নিরূপণ করিতে সার্থক প্রয়াস করিয়াছেন। ফরাসী পণ্ডিত জ্যাঁ পশিলুস্কি, জুল ব্লখ্ ও সিলভ্যাঁ লেভি এবং তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় আর্যপূর্ব ও দ্রাবিড়পূর্ব ভারতীয় ভাষা ও জন সম্বন্ধে যে মূল্যবান গবেষণার সূত্রপাত করিয়া দিয়াছেন, তাহাও প্রাচীন বাঙলার ভাষা ও জন সম্বন্ধে নূতন আলোকপাত করিয়াছে, এবং তাহার ফলে বাঙলার জন-নিরূপণ-সমস্যা সহজতর হইয়াছে।

বাঙালীর জনতত্ত্ব-নিরূপণের অন্যতম সহায়ক উপায়, প্রাচীন ও বর্তমান বাস্তব সভ্যতা ও মানসিক সংস্কৃতির বিশ্লেষণ। যেমন ভাষায় তেমনই বাস্তব সভ্যতা ও মানসিক সংস্কৃতিতেও বিভিন্ন জনের সংমিশ্রণের ইতিহাস লুক্কায়িত থাকে। প্রত্যেক জনের ভিতর এই দুই বস্তু একটা রূপ গ্রহণ করে, এবং নানা উপায় ও উপকরণ, রীতি ও অনুষ্ঠান, আদর্শ ও বিশ্বাসের মধ্য দিয়া তাহা আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। কালচক্রের আবর্তে সেই জন যখন অন্য জনের দ্বারা পরাভূত অথবা মিত্র বা শত্রুরূপে পরস্পরের সম্মুখীন হয়, একের সঙ্গে অন্যের আদান-প্রদান ঘটে তখন কোন জনই নিজের সভ্যতা-সংস্কৃতিকে অন্যের প্রভাব হইতে মুক্ত রাখিতে পারে না। ব্যক্তির জীবনে সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মে যাহা ঘটে জনের জীবনেও তাহাই। অবশ্য, অধিকতর পরাক্রান্ত ও বীর্যবান যে জন সে প্রভাবান্বিত বেশি

করে, নিজে প্রভাবান্বিত হয় কম। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠী ও স্তরে এই নৈকট্যের ফলে কমবেশি আদান-প্রদান চলিতেই থাকে এবং একটা সমন্বয়ও সঙ্গে সঙ্গে চলিতে থাকে। জীবধর্মের নিয়মই এইরূপ। আঘাত হইলেই প্রত্যাঘাতও অনিবার্য এবং দুইয়ে মিলিয়া একটা সমন্বিত গতিও সমান অনিবার্য। বাঙলাদেশে প্রাচীনকালে, এবং কতকটা বর্তমানেও, যে সমন্বিত সভ্যতা ও সংস্কৃতির রূপ দেখিতে পাওয়া যায় তা বিশ্লেষণ করিলে বিভিন্ন জনের বাস্তব সভ্যতা ও মানসিক সংস্কৃতির কিছু কিছু পরিচয় সহজেই ধরা পড়ে, এবং ভাষা ও নৃতত্ত্ব বিশ্লেষণের সাহায্যে তাহা হইতে জন-নির্ণয়ের কাজটাও কিছুটা সহজ হয়। এ কথা অবশ্যই সত্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিশ্লেষণ একক কখনই জননির্দেশক হইতে পারে না। কিন্তু, তাহা যে ইঙ্গিত দেয়, ভাষা ও নৃতত্ত্বের ইঙ্গিতের সঙ্গে তাহা যোগ করিলে জনতত্ত্বের স্বরূপ তাহাতে অল্পবিস্তর ধরা পড়িতে বাধ্য।

এই সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিশ্লেষণের কাজ আমাদের দেশে খুব যে অগ্রসর হইয়াছে তাহা বলা যায় না। সংস্কৃতি, বিশেষভাবে ধর্ম ও মূর্তিতত্ত্ব এবং আচার-অনুষ্ঠানের বিশ্লেষণ কিছু কিছু যদি বা হইয়াছে, বাস্তব সভ্যতার বিশ্লেষণ একেবারেই হয় নাই। এক্ষেত্রে ভাষা-বিশ্লেষণের সাহায্য অপরিহার্য। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ যাহা হইয়াছে তাহার মধ্যে সমাজের উচ্চ ও নিম্ন -স্তরের লোকাচার ও লোকধর্ম অল্পই স্থান পাইয়াছে এবং পুরাণানুমোদিত ধর্মের স্থানও যথেষ্ট হয় নাই; অথচ জনতত্ত্বের অনেক নিশানা ঐ গুহাগুলির মধ্যে নিহিত।

এই-সমস্ত উপায় ও উপকরণ সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য জানিবার উপায় নাই এবং জন ও ভাষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে যে-সব প্রশ্ন এই উপলক্ষে মনকে অধিকার করা সম্ভব, তাহার সব-কিছুর উত্তর পাওয়া যাইবে, তাহাও বলা যায় না। তবে মোটামুটি কাঠামোটা ধরা পড়িতে পারে, এই আশা করা যায়। বাঙালীর ইতিহাসের জন্য বাঙলাদেশের নরতত্ত্ব ও তৎসংলগ্ন অন্যান্য সমস্যা সম্বন্ধে যে-সব আলোচনা-গবেষণা ইত্যাদি হইয়াছে তাহার বিশদ ও বিস্তারিত পরিচয় ও বিশ্লেষণের প্রয়োজন এখানে কিছু নাই। এই আলোচনা ও গবেষণার মোটামুটি ফলাফল একত্র করিতে পারিলে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিশ্লেষণের ফলাফলের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে পারিলেই ইতিহাসের প্রয়োজন মিটিতে পারে।

ভারতবর্ষে বায়ানা নামক স্থানে প্রস্তরীভূত নরমুণ্ডের কঙ্কাল, দক্ষিণ ভারতে আদিত্যনল্লুরে প্রাপ্ত কতকগুলি মুণ্ড-কঙ্কাল, মহেন্-জো-দড়ো ও হরপ্পায় প্রাপ্ত কতকগুলি নরকঙ্কাল এবং তক্ষশিলার ধর্মরাজিক বিহারের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রাপ্ত কয়েকটি বৌদ্ধভিক্ষুর দেহাবশেষ ভারতীয় নরতত্ত্বজিজ্ঞাসার মীমাংসায় যে-পরিমাণে সাহায্য করিয়াছে, বাঙলাদেশের জননির্ণয়ে তেমন সাহায্য পাইবার উপায় এ-পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। বস্তুত, এ যাবৎ বাঙলাদেশের কোথাও প্রাগৈতিহাসিক বা ঐতিহাসিক

কোনও যুগেরই কোনও নরকঙ্কাল আবিষ্কৃত হয় নাই। প্রাগৈতিহাসিক লৌহ অথবা প্রস্তর-যুগের বিশেষ কোনও বাস্তবাবশেষও বাঙলাদেশে এ-পর্যন্ত এমন কিছু পাওয়া যায় নাই যাহার ফলে সেই যুগের সভ্যতা এবং সেই সূত্রে নরতত্ত্বনির্ণয়ের ইঙ্গিত কতকটা পাওয়া যাইতে পারে। কিছু যাহা আমাদের নাই তাহা লইয়া দুঃখ করিয়াও লাভ নাই। যতটুকু যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা লইয়াই একটা হিসাব-নিকাশ আপাতত করা যাইতে পারে।

২

বাঙলার বর্ণবিন্যাস ও জনতত্ত্ব

বাঙলার বিভিন্ন বর্ণ ও শ্রেণীর জনসাধারণের দেহগঠনের, বিশেষভাবে কেশবৈশিষ্ট্য, চোখ ও চামড়ার রং, নাসিকা, কপাল ও নরমুণ্ডের আকৃতি ইত্যাদির পরিমিতি গ্রহণ করিয়া এ-পর্যন্ত যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা সংক্ষেপে জানিয়া লওয়া যাইতে পারে। সকলের পরিমিতি একই মানদণ্ড অনুসারে গৃহীত হয় নাই ; পণ্ডিতদের মধ্যে পরিমিতি-গণনার যে বিভিন্নতা দেখা যায় ইহা তাহার অন্যতম কারণ। তবে, মোটামুটি বৈশিষ্ট্য-গুলি ধরিতে পারা খুব কঠিন নয়। সর্বত্রই প্রধান প্রধান ধারার কথাই উল্লেখ করা সম্ভব ; উপধারাগুলির ইঙ্গিতমাত্র দেওয়া চলে। অথচ প্রধান প্রধান ধারার সঙ্গে উপধারা মিলিয়া এক হইয়াই বাঙালীর জন সাংকর্যের সৃষ্টি হইয়াছে, এ কথা ভুলিলে চলিবে না।

বৃহদ্ধর্মপুরাণ একটি উপপুরাণ ; ইহার তারিখ আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতক ; তুর্কি-বিজয়ের অব্যবহিত পরেই রাঢ়দেশে ইহা রচিত হইয়াছিল এমন অনুমান করিলে খুব অন্যায় হয় না। ব্রাহ্মণ-বর্ণ বাদ দিয়া সমসাময়িক বাঙলাদেশের জনসাধারণ যে ছত্রিশটি জাত-এ বিভক্ত ছিল, তাহার একটু পরিচয় এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। গ্রন্থটির রচয়িতা ব্রাহ্মণেতর শূদ্রবর্ণের লোকদিগকে তদানীন্তন বর্ণবিভাগানুযায়ী তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন :

(১) উত্তম সংকর বিভাগ : করণ (সৎশূদ্র), অম্বষ্ঠ (বৈদ্য) উগ্র, মাগধ, গান্ধিক বণিক, শাংখিক, কংসকার, কুম্ভকার, তন্তুবায়, কর্মকার, গোপ, দাস (চাষী), রাজপুত্র, নাপিত, মোদক, বারজীবী, সূত (সূত্রধর), মালাকার, তাম্বুলী ও তৌলিক। (২০)

(২) মধ্যম সংকর বিভাগ : তক্ষণ, রজক, স্বর্ণকার, স্বর্ণবণিক, আভীর, তৈলকারক, ধীবর, শৌণ্ডিক, নট, শাবাক (শাবার), শেখর ও জালিক। (১২)

(৩) অন্ত্যজ বা অধম সংকর (বর্ণাশ্রম-বহিষ্কৃত) : মলেগ্রহী, কুড়ব, চণ্ডাল, বরুড়, চর্মকার, ঘণ্টজীবী বা ঘট্টজীবী, ডোলাবাহী, মল্ল ও তক্ষ। (৯)

ইহা ছাড়া তিনি অবাঙালী ও বৈদেশিক ম্লেচ্ছ কয়েকটি কোমের নামও করিয়াছেন

স্বতন্ত্র বিভাগের অধীনে, যথা, দেবল বা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ, গণক-গ্রহবিপ্র, বাদক, পুলিন্দ, পুক্কশ, খশ, যবন, সুহ্ম, কম্বোজ, শবর, খর ইত্যাদি। উপরের তালিকা হইতে দেখা যাইবে, বৃহদ্ধর্মপুরাণ যদিও বলিতেছেন ছত্রিশটি জাত বা বর্ণ-উপবর্ণের কথা, নাম করিবার সময় করিতেছেন একচল্লিশটির। পাঁচটি যে পরবর্তী কালের যোজনা, এ অনুমান সেই হেতু অসংগত নয়! এখনও আমরা ছত্রিশ জাত-এর কথাই তো প্রসঙ্গত বলিয়া থাকি। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের ব্রহ্মখণ্ডও খুব সম্ভব বাঙলাদেশের রচনা এবং বৃহদ্ধর্মপুরাণের প্রায় সমসাময়িক। এই পুরাণেও সমসাময়িক বাঙলার বিভিন্ন জাতের একটা অনুরূপ তালিকা পাওয়া যায়। এই গ্রন্থেরই বর্ণবিন্যাস অধ্যায়ে এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যাইবে; এখানে বর্তমান প্রয়োজনে সে তালিকার আর কোনও প্রয়োজন নাই।

বর্ণ ও জনের দিক হইতে এই বিভাগ যে কৃত্রিম এ কথা অনস্বীকার্য, তাহা ছাড়া বর্ণ তো কিছুতেই জন-নির্দেশক হইতে পারে না। আর একটু মনোযোগ করিলেই দেখা যাইবে, ইহার প্রথম দুইটি বিভাগ ব্যবসায়কর্মগত এবং তৃতীয় ও চতুর্থ বিভাগ দুইটি কতকটা জনগত। প্রথম বিভাগটি জলচল ও দ্বিতীয় বিভাগটি জল-অচল বর্ণের বলিয়া অনুমেয়; কাজেই কি কর্মবিভাগ কি জনবিভাগ, কোনও দিক হইতেই ইহার মধ্যে ঐতিহাসিক যুক্তি হয়তো মিলিবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, স্বর্ণকার ও স্বর্ণবণিক কেনই বা মধ্যম সংকর, আর গন্ধবণিক ও কংসবণিক কেনই বা উত্তম সংকর, অথবা তৈলকার কেনই বা মধ্যম সংকর। বস্তুত, বর্ণবিভাগ যেখানে ব্যবসায়-কর্মগত সেখানে প্রত্যেক বর্ণের মধ্যেই বিভিন্ন জনের বর্ণ আত্মগোপন করিয়া থাকিবেই; এই বর্ণগুলি সেইজনাই সংকর এবং স্মৃতি ও পুরাণে বারবার যে বর্ণসংকর ও জাতিসংকরের কথা বলা হইয়াছে ইহার ইঙ্গিত ইতিহাস ও নরতত্ত্বের দিক হইতে নিরর্থক ও অযৌক্তিক নয়। ব্রাহ্মণবর্ণের মধ্যে সাংকর্যের কথা যে বলা হয় নাই তাহার কারণ হয়তো এই যে, এইসব পুরাণ ও স্মৃতি প্রায়শ তাঁহাদেরই রচনা; অথচ নরতত্ত্বের দিক হইতে দেখা যাইবে এই জাতিসাংকর্য অম্বষ্ঠ ও করণদের সম্বন্ধে যতখানি সত্য ঠিক ততখানি সত্য ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধেও। নরতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে এই কথাটা ভাল করিয়া ধরা পড়িবে এবং তখন দেখা যাইবে, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চবর্ণের লোকেরা যে পরিমাণে সংকর, বৃহদ্ধর্মপুরাণের উত্তম ও মধ্যম সংকর বিভাগের অধিকাংশ বর্ণই সেই পরিমাণে এবং প্রায় একই বৈশিষ্ট্যে সংকর।

বাঙালী ব্রাহ্মণদের দেহদৈর্ঘ্য মধ্যমাকৃতি; মুণ্ডের আকৃতিও মাধ্যমিক (mesocephalic), অর্থাৎ গোলও নয়, দীর্ঘও নয়; নাসিকা তীক্ষ্ণ ও উন্নত। বিরজাশংকর গুহ মহাশয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের যে পরিমিতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে এই বৈশিষ্ট্যগুলি ধরা পড়িয়াছিল। কিন্তু, সাম্প্রতিক কালে যাঁহারা এই বর্ণের মুণ্ডাকৃতি বিশ্লেষণ

করিয়াছেন তাঁহারা মনে করেন যে, উত্তর বা দক্ষিণ রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র বা বৈদিক—সকল পর্যায়ের ব্রাহ্মণদের মধ্যেই গোল মাথার (brachycephalic) একটা সুস্পষ্ট ধারা একেবারে অস্বীকার করা যায় না ; কায়স্থদের মধ্যেও তাহাই। সঙ্গে সঙ্গে এই তিন পর্যায়ের ব্রাহ্মণদের মধ্যে আবার চ্যাপটা বিস্তৃত নাসার (platyrrhine) একটা অস্পষ্ট ধারাচিহ্নও অনস্বীকার্য, যদিও গোল এবং মধ্যমাকৃতির মুণ্ড ও উন্নত সুগঠিত নাসাই সাধারণ বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এই বিশ্লেষণের পরেও এ কথা বলা প্রয়োজন যে, ব্রাহ্মণদের মধ্যে দীর্ঘ মস্তিষ্কাকৃতির (dolic cephalic) স্বল্প হইলেও একটা অনুপাত ধরা পড়ে। এ কথা সাধারণভাবে অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিমিতিবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেও সত্য ; কারণ, আগেই বলিয়াছি, প্রধান ধারার উল্লেখই সম্ভব, উপধারাগুলির ইঙ্গিত দেওয়া যায় মাত্র।

ব্রাহ্মণদের দেহগঠন সম্বন্ধে আমরা যাহা জানি, বাঙালী কায়স্থদের দেহবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেও তাহা সত্য। বস্তুত, মুণ্ড ও নাসাকৃতির দিক হইতে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের মোটামুটি কোনও পার্থক্যই নৃতত্ত্ববিদের চোখে ধরা পড়ে না ; নরতত্ত্বের দিক হইতে ইহারা সকলেই একই নরগোষ্ঠী। ব্রাহ্মণদের মতো ইহারাও মধ্যমাকৃতি, ইহাদেরও চুলের রং কালো, চোখের মণি মোটামুটি পাতলা হইতে ঘন-বাদামী যাহা সাধারণ দৃষ্টিতে কালো বলিয়াই মনে হয়। গায়ের রং পাতলা বাদামী হইতে আরম্ভ করিয়া পাতলা গৌর। কাহারও কাহারও মতে রাঢ়ীয় কায়স্থদের মধ্যে দীর্ঘ অনুন্নত করোটির প্রাধান্য দেখা যায়, মধ্যমাকৃতির বৈশিষ্ট্য সেখানে কম। কিন্তু এই কমবেশি যেহেতু মানদণ্ডনির্ভর এবং যেহেতু বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন মানদণ্ড ব্যবহার করিয়া পরিমিতি গ্রহণ করা হইয়াছে, সেই হেতু শেষোক্ত মত সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না।

ব্রাহ্মণেতর অন্যান্য যে-সমস্ত জাতির দেহবৈশিষ্ট্য-পরিমিতি গ্রহণ করা হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে কায়স্থ, গোয়ালা, কৈবর্ত, পোদ, বাগ্দী, বাউরী, চণ্ডাল, মালো, মালী, মুচি, রাজবংশী, সদ্‌গোপ, বুনা, বাঁশফোঁড়, কেওড়া, যুগী, সাঁওতাল, নমঃশূদ্র, ভূমিজ, লোহার মাঝি (বেদে), তেলি, সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক, ময়রা, কলু, তন্তুবায়, মাহিষ্য, তাম্বলী, নাপিত এবং রজকই প্রধান। ইহা ছাড়া যশোহর ও খুলনা অঞ্চলের নলুয়া (মুসলমান) এবং পূর্ব বাঙলার মুসলমানদের কিছু কিছু পরিমিতিও গণনা করা হইয়াছে। কিন্তু সমস্ত জাতেরই পরিমিতি-গণনা সমসংখ্যায় হইয়াছে এবং দেশের সর্বত্র সমভাবে বিস্তৃত হইয়াছে, এ কথা বলা যায় না। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও পোদদের পরিমিতি গণনা করিয়াছেন বিরজাশংকর গুহ মহাশয়। পশ্চিম বাঙলার কয়েকটি জেলার সাঁওতাল, ভূমিজ, বাউরী, বাগ্দী, লোহার, মাঝি, তেলি, সুবর্ণ ও গন্ধবণিক, ময়রা, কলু, তন্তুবায়, মাহিষ্য, তাম্বলী, নাপিত, রজক ইত্যাদি গণনা করিয়াছেন ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় ; বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের পরিমিতি লইয়াছেন তারকচন্দ্র রায়চৌধুরী, এবং হারাণচন্দ্র চাকলাদার লইয়াছেন

কলিকাতার ব্রাহ্মণ ও বীরভূমের মুচিদের। রিজলী গণনা করিয়াছেন সদ্‌গোপ, রাজবংশী, মুচি, মালী, মালো, কৈবর্ত, গোয়ালা, চণ্ডাল, বাউরী, বাগ্দী এবং পূর্ব বাঙলার মুসলমানদের, কিন্তু অমুসলমান নিদর্শনগুলি কোথা হইতে আহৃত তাহা বলেন নাই। মীনেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় গণনা করিয়াছেন উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ বাঙলার আটটি জেলার বুনা, নলুয়া (মুসলমান), বাঁশফোঁড়, মুচি, রাজবংশী, মালো (এই দুই বর্ণেরই ব্যবসা মাছ ধরা ও মাছ বিক্রি), কেওড়া ও যুগীদের। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদ্‌গোপ, কৈবর্ত, রাজবংশী, পোদ এবং বাগ্দীদের পরিমিতি গণনা করিয়াছেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। মোটামুটিভাবে এইসব বর্ণ ও শ্রেণীগুলির মধ্যে বৃহদ্ধর্মপুরাণের উত্তম সংকর, মধ্যম সংকর ও অন্ত্যজ—এই বিভাগ তিনটির প্রতিনিধিদের অনেকেরই সন্ধান মিলিবে। নমঃশূদ্রবর্ণের যে অসংখ্য জনসাধারণ মধ্য ও বর্তমান যুগের একটি বলিষ্ঠ বর্ণ ও শ্রেণী-স্তর তাঁহাদের দেহগঠনের পরিমিতি যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে হাটন ও রিজলীর নাম করিতেই হয়।

ইঁহাদের সকলের সম্মিলিত বিশ্লেষণ হইতে দেহগঠন, চোখ ও চামড়ার রং, কেশ-বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি সম্বন্ধে কতকগুলি তথ্য সহজেই ধরা পড়ে। ইহাদের মধ্যে সর্বাগ্রে নমঃশূদ্রদের কথা বলিতেই হয়, কারণ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি উচ্চ বর্ণের লোকেদের সঙ্গে নরতত্ত্বের দিক হইতে ইঁহাদের কোনও পার্থক্য নাই এ কথা প্রায় নিঃসন্দেহে বলা যায়। উচ্চ বর্ণের লোকদের মতো ইঁহারাও দৈর্ঘ্যে মধ্যমাকৃতি, মুণ্ডের গঠন মাধ্যমিক, এবং নাসা তীক্ষ্ণ ও উন্নত ; ইঁহাদের চোখ ও চামড়ার রংও মোটামুটিভাবে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থদেরই মতো, অথচ স্মৃতিশাসিত হিন্দুসমাজে ইঁহাদের স্থান এত নিচে যে নরতত্ত্বের পরিমিতি গণনার মধ্যে তাহার কোনও যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সে-যুক্তি হয়তো পাওয়া যাইবে জাত সংঘর্ষের ইতিহাসের মধ্যে অথবা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ইতিহাসের মধ্যে।

ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ও নমঃশূদ্রদের ছাড়া আর যে-সব বর্ণের উল্লেখ আগে করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে গান্ধিক বণিক, সদ্‌গোপ ও গোয়ালা (গোপ), কৈবর্ত (চাষী ও মাহিষ্য), নাপিত, ময়রা (মোদক) বারুই (বারুজীবী অর্থাৎ পানের বরজ যাহার উপজীবিকা), তাম্‌লী (তাম্বুলী = যে পান বিক্রয় করে) এবং যুগী (তন্তুবায়)নিঃসন্দেহেই বৃহদ্ধর্মপুরাণের উত্তম সংকর পর্যায়ভুক্ত, এবং কলু বা তেলি (তৈলকারক), রজক, সুবর্ণবণিক এবং মালী মধ্যম সংকর পর্যায়ভুক্ত। চণ্ডাল বা চাঁড়াল, মুচি (চর্মকার), দুলিয়া (ডোলাবাহী), মালো, কেওড়া, মল্ল, ধীবর প্রভৃতি অন্ত্যজ পর্যায়ের।

এইগুলি ছাড়া আরও কয়েকটি জাতের লোকদের সম্বন্ধে এবং উল্লিখিত জাতগুলি সম্বন্ধেও অতিরিক্ত কিছু কিছু পরিমিতি-গণনা বিভিন্ন নৃতত্ত্ববিদেরা করিয়াছেন। এইসব নরতত্ত্বগত পরিমিতি-গণনায় যাহা পাওয়া যায় তাহা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় উচ্চবর্ণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ-বর্ণের বাঙালী দেহ-দৈর্ঘ্যের দিক হইতে

মধ্যমাকৃতি ; নমঃশূদ্রেরাও তাহাই। উত্তম সংকর বিভাগের বাঙালীও সাধারণত মধ্যমাকৃতি, কিন্তু খর্বতার দিকেও একটা ঝোঁক খুব স্পষ্ট। মালী ছাড়া মধ্যম সংকর বর্ণের লোকেরাও তদনুরূপ ; মালীরা খর্বাকৃতি। অন্ত্যজ পর্যায়ের বা বর্তমানের তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতের লোকেরা সাধারণত খর্বাকৃতি ; কিন্তু ইহাদের মধ্যেও কোন কোন জাত স্পষ্টতই মধ্যমাকৃতি এবং অনেক জাতের মধ্যেই মধ্যমাকৃতির দিকে ঝোঁক কিছুতেই দৃষ্টি এড়াইবার কথা নয়। মুণ্ডাকৃতির দিক হইতে দেখিতে গেলে, সাধারণত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চবর্ণ এবং নমঃশূদ্ররা যেমন গোলাকৃতি, উত্তম সংকর পর্যায়ের অধিকাংশ বর্ণ তেমনই। আবার কোনও কোনও নিম্ন উপবর্ণের মধ্যে, যেমন পশ্চিম বাঙলার ভূমিজ ও সাঁওতালদের মধ্যে, গোলের দিকেও একটু ঝোঁক উপস্থিত। এই ধরনের ঝোঁক অবশ্য কিছু কিছু অন্য বর্ণের মধ্যেও একবারে অনুপস্থিত নয়। তেমনই আবার কতকগুলি বর্ণের মধ্যে দৈর্ঘ্যের দিকে ঝোঁক অত্যন্ত স্পষ্ট, যেমন মাহিষ্য, নাপিত, ময়রা, সুবর্ণবণিক, মুচি, বুনা, বাগ্দী, বেদে, পশ্চিম বঙ্গের মুসলমান প্রভৃতিদের মধ্যে। কতগুলি বর্ণ তো স্পষ্টতই দীর্ঘমুণ্ডাকৃতি, যেমন উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ বঙ্গের জেলে, রাজবংশী, বাঁশফোঁড়, মালী, বাউড়ী, তাম্‌লী, তেলি প্রভৃতি উপবর্ণের লোকেরা। নাসাকৃতির দিক হইতে ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ ও নমঃশূদ্র বর্ণের লোকেরা সকলেই সাধারণত তীক্ষ্ণ ও উন্নতনাসা। সুবর্ণবণিকদের মধ্যে তীক্ষ্ণ ও উন্নতনাসা হইতে চ্যাপ্টা পর্যন্ত সব ধারাই সমভাবে বিদ্যমান ; পশ্চিম বঙ্গের মুসলমানদের মধ্যেও তাহাই। ময়রাদের নাসাকৃতি মধ্যম কিন্তু তীক্ষ্ণতার দিকে ঝোঁক স্পষ্ট। উত্তম ও মধ্যম সংকর পর্যায়ের, এমনকি অস্পৃশ্য ও অন্ত্যজ পর্যায়ের অধিকাংশ বর্ণেরই নাসাকৃতি মধ্যম, তবে কোনও কোনও বর্ণের কোমদের মধ্যে, যেমন গন্ধবণিক, নাপিত, তেলি, কলু, মালো প্রভৃতির, চ্যাপ্টার দিকে ঝোঁক সহজেই ধরা পড়ে। আবার কতগুলি বর্ণের নাসাকৃতি একেবারেই চ্যাপ্টা, যেমন, বেদে, ভূমিজ, বাগ্দী, বাউরী, তাম্‌লী, তন্তুবায়, রজক, মালী, মুচি, বাঁশফোঁড়, মাহিষ্য প্রভৃতি। সাঁওতালদের নাসিকাকৃতিও চ্যাপ্টা, কিন্তু মধ্যমাকৃতির দিকে ঝোঁক আছে।

কয়েকটি ধারণা এইবার মোটামুটি কিছুটা স্পষ্ট হইল। সাধারণভাবে বলা যায়, বাঙালীর চুল কালো, চোখের মণি পাতলা হইতে ঘন বাদামী বা কালো, গায়ের রং সাধারণত পাতলা হইতে ঘন বাদামী, নিম্নতম শ্রেণীতে চিক্কণ ঘনশ্যাম পর্যন্ত। দেহ-দৈর্ঘ্যের দিক হইতে বাঙালী মধ্যমাকৃতি, খর্বতার দিকে ঝোঁকও অস্বীকার করা যায় না। বাঙালীর মুণ্ডাকৃতি সাধারণত দীর্ঘ, উচ্চবর্ণস্তরে গোলের দিকে বেশি ঝোঁক। নাসাকৃতিও মোটামুটি মধ্যম, যদিও তীক্ষ্ণ ও উন্নত নাসাকৃতি উচ্চতর বর্ণের লোকদের ভিতর সচরাচর সুলভ।

বাঙলাদেশের বিভিন্ন শ্রেণীর উচ্চ ও নিম্নজাতের এবং বাঙালী মুসলমানদের কিছু

কিছু রক্তবিশ্লেষণ কোথাও কোথাও হইয়াছে। মিসেস ম্যাকফারলেন, রবীন্দ্রনাথ বসু, মীনেন্দ্রনাথ বসু, শশাঙ্কশেখর সরকার, অনিল চৌধুরী, মাখনলাল চক্রবর্তী প্রভৃতি কয়েকজন তাঁহাদের গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করিয়াছেন। ইঁহাদের সম্মিলিত গবেষণার ফল মোটামুটি বাঙালীর জন-সাংকর্যের ইঙ্গিত সমর্থন করে। ডক্টর ম্যাকফারলেনের মতে, বর্ণ, বর্ণেতর ও অস্পৃশ্য বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে যে রক্তবৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে বাঙালী মুসলমানদের মধ্যেও তাহাই। বাঙালী মুসলমানেরা যে বাঙালী হিন্দুদেরই সমগোত্রীয় ইহা তাহার আর একটি প্রমাণ।

কিন্তু এতক্ষণ বাঙালী জাতির দেহ-গঠনের যে-সব বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হইল, তাহা আসিল কোথা হইতে? এ প্রশ্নের উত্তর পাইতে হইলে প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতবর্ষে যে-সব জন ছিল ও পরে যে-সব জন একের পর এক এদেশে আসিয়া বসবাস করিয়াছে, প্রবহমান রক্তস্রোতে নিজেদের রক্ত মিশাইয়াছে, মৈত্রী ও বিরোধের মধ্য দিয়া একে অন্যের নিকটতর হইয়াছে, তাহাদের হিসাব লইতে হয়। কিন্তু তাহা করিবার আগে একটি সুপ্রচলিত মতবাদ সম্বন্ধে একটু বিচারের অবতারণা করা প্রয়োজন। এই মতটি নরতাত্ত্বিক হার্বার্ট রিজ্‌লীর।

বাঙলাদেশের উচ্চবর্ণগুলির ভিতর এবং অন্যান্য বর্ণের ভিতরও চাওড়া নাসিকাকৃতি এবং গোল মুণ্ডাকৃতির একটা সুস্পষ্ট ধারা বিদ্যমান, এ কথা আগেই বলা হইয়াছে। বাঙালীর এইসব বৈশিষ্ট্যের যুক্তি খুঁজিতে গিয়া বহু দিন আগে রিজ্‌লী সাহেব বলিয়াছিলেন, বাঙালীরা প্রধানত মোঙ্গোলীয় ও দ্রবিড় নরগোষ্ঠীর সংমিশ্রণে উৎপন্ন। তিব্বত-চৈনিক গোষ্ঠীর চীনা, বর্মী, ভোটিয়া, নেপালী প্রভৃতি জনের লোকেরা তো আমাদের সুপরিচিত। ইহারা খর্বকায়, স্বল্পশ্মশ্রু এবং পীতাভবর্ণ। ইহাদের করোটি প্রশস্ত, নাসাকৃতি সাধারণত চ্যাপ্টা। আর, রিজ্‌লী যাহাদের বলিয়াছেন দ্রবিড় সেই নরগোষ্ঠী তাঁহার মতে সিংহল হইতে গঙ্গার উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহারা কৃষ্ণবর্ণ, খর্বকায়, ইহাদের মুণ্ডাকৃতি দীর্ঘ, নাসাকৃতি চ্যাপ্টা। রিজ্‌লী মনে করেন, এই দুই নরগোষ্ঠীর মিশ্রণে উৎপন্ন মোঙ্গোল-দ্রাবিড় নরগোষ্ঠী বিহার হইতে আরম্ভ করিয়া আসাম পর্যন্ত এবং উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর হইতে আরম্ভ করিয়া হিমালয় পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহাদের মাথা গোল হইতে মধ্যমাকৃতি, নাসা মধ্যম হইতে চ্যাপ্টা। ব্রাহ্মণ-কায়স্থদের ভিতর উন্নত ও সুগঠিত নাসার প্রাধান্য দেখা যায়। মোঙ্গোলীয়দের মাথা প্রশস্ত (অর্থাৎ চাওড়া, br chycephalic), কিন্তু তাহাদের নাক চ্যাপ্টা; বাঙালীদের প্রশস্ত মুণ্ডের ধারা মোঙ্গোলীয় শোণিতের দান, আর ব্রাহ্মণ-কায়স্থদের উন্নত সুগঠিত নাসা ভারতীয় আর্য রক্তের দান, ইহাই হইতেছে রিজ্‌লীর মত। এই মত অনুসরণ করিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর পর্যন্ত সমস্ত পূর্বভারতে মোঙ্গোলীয় প্রভাব উপস্থিত; দ্রবিড় বলিয়া একটি নরগোষ্ঠী আছে এবং

ইহাদের মাথা দীর্ঘ—এই দুই নরগোষ্ঠীর সাংকর্যে বাঙালীর উৎপত্তি। কাজেই বাঙালীর মুণ্ডাকৃতি মধ্যম এবং তাহার মধ্যে দুই প্রান্তের গোল ও দীর্ঘ দুই ধারাই বর্তমান। উচ্চবর্ণের লোকদলের মধ্যে যে উন্নত সুগঠিত নাসামান দেখা যায় তাহা ভারতীয় আর্য রক্তের দান।

রিজ্‌লীর মত যথেষ্ট যুক্তিগ্রাহ্য মনে না করিবার কারণ অনেক। প্রথমত, দ্রবিড় কোনও নরগোষ্ঠীর নাম নয়, এমনকি জনের নামও নয়, ভাষাতাত্ত্বিক শ্রেণীবিভাগের অন্যতম নাম মাত্র। দ্বিতীয়ত, গঙ্গাতট হইতে আরম্ভ করিয়া সিংহল পর্যন্ত দ্রবিড় ভাষা প্রচলিত নাই; মধ্যভারতের জঙ্গলময় আটবী ও পার্বত্য ভূমিতে অস্ট্রিক-ভাষাভাষী লোকের বাস এখনও বিদ্যমান। তৃতীয়ত, রিজ্‌লী যে-সব তথাকথিত দ্রবিড় উপজাতি-দের নাম করিয়াছেন, মস্তিষ্কাকৃতির দিক হইতে তাহারা সকলেই মোটামুটি দীর্ঘমুণ্ড হইলেও প্রত্যেক সমাজের উচ্চতম কোমগুলিতে গোল মুণ্ডাকৃতিরও কিছু অভাব নাই। নাসাকৃতিও মোটামুটি উন্নত ও তীক্ষ্ণ হইতে একেবারে চ্যাপ্টা পর্যন্ত। কাজেই দ্রবিড়-ভাষাভাষী বিচিত্র জন লইয়া সমগ্র সমষ্টিটাকেই দ্রবিড় বলাটা খুব যুক্তিসংগত নয়। চতুর্থত, রিজ্‌লী যাহাদের বলিয়াছিলেন দ্রবিড়, নরতত্ত্বের বিশ্লেষণে তাহাদের মধ্যে অন্তত দুইটি বিভিন্ন জনের অস্তিত্ব ধরা পড়ে: (১) আদি-নিগ্রোবটু: ইহাদের মাথা দীর্ঘ ও উচ্চ, নাক তীক্ষ্ণ ও সুউচ্চ, (২) আদি-অস্ট্রেলীয়: ইহাদের মাথা দীর্ঘ ও অনুচ্চ, নাক মধ্যম। ইহাদের সঙ্গে বাঙালীর জনতত্ত্বের সম্বন্ধ কী এবং কোথায়, এবং থাকিলে কতটুকু সে আলোচনা পরে করা যাইবে; আপাতত এইটুকু বলা চলে, রিজ্‌লী-কথিত দ্রবিড় নরগোষ্ঠীর অস্তিত্ব নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদের কাছে অগ্রাহ্য। রিজ্‌লী কথিত মোঙ্গোলীয় প্রভাব সম্বন্ধে প্রথমেই বলিতে হয়, বাঙলার ও ভারতের পূর্ব ও উত্তর-শায়ী প্রত্যন্তদেশ-গুলির সকল ভোট-চৈনিক গোষ্ঠীর লোকেরাই গোলমুণ্ডাকৃতি নয়। দ্বিতীয়ত, আর্যদের ভারতাগমনের পূর্বে, আর্যভাষা বিস্তৃতিলাভের আগে, বাঙলা, উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর পর্যন্ত মোঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর লোকেরা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, ইতিহাসে এমন কোনও প্রমাণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। দীর্ঘকরোটি কোচ, পলিয়া, বা উত্তর-বাঙলার বাহে, রাজবংশী প্রভৃতি ভোট-চৈনিক গোষ্ঠীর লোকেরা হিমালয় অঞ্চল বা ব্রহ্মপুত্র-উপত্যকা হইতে আসিয়া ঐতিহাসিক যুগেই উপনিবিষ্ট হইয়াছে। তৃতীয়ত, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার এইসব মোঙ্গোলীয়েরা বেশির ভাগই দীর্ঘমুণ্ড; কাজেই, বাঙালীর মধ্যে যে গোল মুণ্ডাকৃতি দেখা যায় তাহা এইসব মোঙ্গোলীয় জাতির প্রভাবের ফলে হইতেই পারে না। উত্তরের লেপ্‌চা, ভোটানী, চট্টগ্রামের চাক্‌মা প্রভৃতি লোকেরা গোলমুণ্ড বটে, কিন্তু ইহাদেরই রক্তপ্রভাবে যদি বাঙালীর মাথা গোল হইত তাহা হইলে স্বভাবতই এইসব দেশের কাছাকাছি দেশখণ্ডগুলিতেই গোলমুণ্ড, প্রশস্তনাসা বাঙালীদের দেখা যাইত, কিন্তু যথার্থ তথ্য এই যে, এই বৈশিষ্ট্যগুলি বেশি দেখা যায় দক্ষিণে, পূর্বে ও উত্তরে নয়। চতুর্থত,

মোঙ্গোলীয় জাতির লোকেদের বঙ্কিম চক্ষু, শক্ত চুল, অক্ষিকোণের মাংসের পর্দা, উন্নত গণ্ডাস্থি, কেশস্বল্পতা, চ্যাপ্টা নাসাকৃতি এবং পীতাভ বর্ণ বাঙলাদেশে আমরা আরও বেশি করিয়া গভীর ও ব্যাপকভাবে পাইতাম, যদি যথার্থই মোঙ্গোলীয় প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে থাকিত। পঞ্চমত, বিরজাশংকর গুহ মহাশয় বাঙলার উত্তর ও পূর্ব-প্রান্তশায়ী মোঙ্গোলীয় অধিবাসিদের পরিমিত গণনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, গারো, খাসিয়া, কুকী, এমনকি মৈমনসিংহের উত্তরতম প্রান্তের গারোদের এবং অন্যান্য কোমের লোকদের মুণ্ডাকৃতি মধ্যম, খুব বড় জোর গোলের দিকে একটু ঝোঁক আছে। কাজেই বাঙালীদের মধ্যে যে গোলমুণ্ডের দিকে ঝোঁক তাহা মোঙ্গোলীয় জনদের গোলমুণ্ড অথবা মধ্যমমুণ্ডের প্রভাবের ফল হইতে পারে না। এইসব নানা কারণে রিজ্‌লীর মোঙ্গোলীয়-দ্রাবিড় সাংকর্যের মত এখন আর গ্রাহ্য নয়।

কিন্তু, রিজ্‌লী বাঙালীর জনতত্ত্বগত বৈশিষ্ট্যনির্দেশে খুব ভুল কিছু করেন নাই; ভুল করিয়াছিলেন সেই বৈশিষ্ট্যের মূল অনুসন্ধানে। মূল যে মোঙ্গোলীয়-দ্রাবিড় সংমিশ্রণের মধ্যে নাই, এ বিষয়ে নরতত্ত্ববিদেরা এখন আর কিছু সন্দেহ করেন না; সেই মূলের সন্ধান পাওয়া যায় ভারতীয় নরতত্ত্বের নব-নির্ণীত ইতিহাসের মধ্যে। কাজেই, তাহার পরিচয় অপ্রাসঙ্গিক নয়। এই নব-নির্ণীত ইতিহাস পূর্ণাঙ্গ ও নির্দোষ নয়, কিন্তু তৎসত্ত্বেও ভারতীয় নরতত্ত্বের এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর জনরহস্যের মোটামুটি কাঠামোটা আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়িতে বাধে না।

৩

ভারতীয় জনতত্ত্বে বাঙালীর স্থান

নৃতত্ত্ববিদেরা মনে করেন ভারতীয় জনসৌধের প্রথম স্তর নেগ্রিটো বা নিগ্রোবটু জন। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে এবং মালয় উপদ্বীপে যে নেগ্রিটো জনের বসবাস ছিল এ তথ্য বহু পুরাতন। কিছুদিন আগে হাটন, লাপিক ও বিরজাশংকর গুহ মহাশয় দেখাইয়াছিলেন যে, আসামের অঙ্গামি নাগাদের মধ্যে এবং দক্ষিণ ভারতের পেরাম্বকুলম এবং আন্নামালাই পাহাড়ের কাদার ও পুলায়ানদের ভিতর নিগ্রোবটু রক্তপ্রবাহ স্পষ্ট। ভারতীয় নিগ্রোবটুদের দেহবৈশিষ্ট্য কিরূপ ছিল তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় কম, কারণ বহুযুগ পূর্বেই ভারতবর্ষের মাটিতে তাহারা বিলীন হইয়া গিয়াছিল। তবে, বিহারের রাজমহল পাহাড়ের আদিম অধিবাসিদের কাহারও কাহারও মধ্যে কখনও কখনও যে-ধরনের খুদ্রকায়, কৃষ্ণাভ ঘনশ্যাম, উর্ণাবৎ কেশযুক্ত, দীর্ঘ মুণ্ডাকৃতির দেহবৈশিষ্ট্য দেখা যায়, কাদারদের মধ্যে যে মধ্যমাকৃতি নরমুণ্ডের দর্শন মেলে, তাহা হইতে এই অনুমান করা যায় যে, ভারত ও বাঙলার নিগ্রোবটুরা দেহগঠনে কতকটা তাহাদের প্রতিবাসী নিগ্রোবটুদের মতনই ছিল; বিশেষভাবে, মালয় উপদ্বীপে সেমাং জাতির দেহগঠনের

সঙ্গে তাহাদের সাদৃশ্য ছিল বলিয়া গুহ মহাশয় অনুমান করেন। বাঙলার পশ্চিম প্রান্তে রাজমহল পাহাড়ের বাগ্দীদের মধ্যে, সুন্দরবনের মৎস্যাশিকারী নিম্নবর্ণের লোকদের মধ্যে, মৈমনসিংহ ও নিম্নবঙ্গের কোনও কোনও স্থানে ক্বচিৎ কখনও, বিশেষভাবে সমাজের নিম্নতম স্তরের লোকদের ভিতর, যশোহর জেলার বাঁশফোঁড়দের মধ্যে মাঝে মাঝে যে কৃষ্ণাভ ঘনশ্যামবর্ণ, প্রায়-উর্ণাবৎ কেশ, পুরু উল্টানো ঠোঁট, খর্বকায়, অতি চ্যাপ্টা নাকের লোক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা তো নিগ্রোবটু রক্তেরই ফল বলিয়া মনে হয়। নিগ্রোবটুদের এই বিস্তৃতি হইতে অনুমান করা চলে যে, এখন তাহাদের অবশেষ প্রমাণসাপেক্ষ হইলেও এক সময়ে এই জাতি ভারতবর্ষে এবং বাঙলার স্থানে স্থানে সুবিস্তৃত ছিল। কিন্তু বিচিত্র জনসংঘর্ষের আবর্তে তাহারা টিকিয়া থাকিতে পারে নাই। জার্মান পণ্ডিত ফন্ আইকস্টেডট্ কিন্তু ভারতবর্ষে নিগ্রোবটুদের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, এ দেশে সম্ভানসম্ভাব্য আদিমতম স্তরে নিগ্রোবটুসম অর্থাৎ কতকটা ঐ ধরনের দেহলক্ষণবিশিষ্ট একটি নরগোষ্ঠীর বিস্তার ছিল, কিন্তু তাহারা যে নেগ্রিটো বা নিগ্রোবটু নরগোষ্ঠীরই লোক, এ কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

নিম্নবর্ণের বাঙালীর এবং বাঙলার আদিম অধিবাসীদের ভিতর যে-জনের প্রভাব সবচেয়ে বেশি, নরতত্ত্ববিদেরা তাহাদের নামকরণ করিয়াছেন আদি-অস্ট্রেলীয় (proto-Australoid)। তাঁহারা মনে করেন যে, এই জন এক সময় মধ্যভারত হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ-ভারত, সিংহল হইতে একেবারে অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মোটামুটিভাবে ইহাদের দেহ-বৈশিষ্ট্যের স্তরগুলি ধরা পড়ে ভারতবর্ষের, বিশেষভাবে মধ্য ও দক্ষিণ-ভারতের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে, সিংহলের ভেড্ডাদের মধ্যে এবং অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে। এই তথ্যই বোধ হয় আদি-অস্ট্রেলীয় নামকরণের হেতু। যাহা হউক, মধ্য ও দক্ষিণ-ভারতের আদিম অধিবাসীরা যে খর্বকায়, কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘমুণ্ড, প্রশস্তনাসা, তাম্রকেশ এই আদি-অস্ট্রেলীয়দের বংশধর এ-সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। পশ্চিম-ভারতে এবং উত্তর-ভারতের গাঙ্গেয় প্রদেশে যে-সব লোকের স্থান হিন্দু সমাজ-বিন্যাসের প্রান্ততম সীমায় তাহারা, মধ্য-ভারতের কোল, ভীল, করোয়া, খারওয়ার, মুণ্ডা, ভূমিজ, মালপাহাড়ী প্রভৃতি লোকেরা, দক্ষিণ-ভারতের চেঞ্চু, কুরুব, য়েরুব প্রভৃতি লোকেরা, সকলেই সেই আদি-অস্ট্রেলীয় গোষ্ঠীর লোক। বেদে যে নিষাদদের উল্লেখ আছে, বিষ্ণু-পুরাণে যে নিষাদদের বর্ণনা করা হইয়াছে অঙ্গার-কৃষ্ণবর্ণ, খর্বকায়, চ্যাপ্টামুখ বলিয়া, ভাগবত-পুরাণ যাহাদের বর্ণনা করিয়াছেন কাককৃষ্ণ, অতি খর্বকায়, খর্ববাহু, প্রশস্তনাসা, রক্তচক্ষু এবং তাম্রকেশ বলিয়া, সেই নিষাদরাও আদি-অস্ট্রেলীয়দেরই বংশধর বলিয়া অনুমান করিলে অন্যায় হয় না। পুরাণোক্ত ভীল্ল-কোল্লরাও তাহাই। বর্তমান বাঙলাদেশের, বিশেষভাবে রাঢ় অঞ্চলের সাঁওতাল, ভূমিজ,

মুণ্ডা, বাঁশফোড়, মালপাহাড়ী প্রভৃতিরা যে আদি-অস্ট্রেলীয়দের সঙ্গে সম্পৃক্ত, এ অনুমান নরতত্ত্ববিরোধী নয়। এই আদি-অস্ট্রেলীয়দের সঙ্গে পূর্বতন নিগ্রোবটুদের কোথায় কোথায় কতখানি রক্তমিশ্রণ ঘটিয়াছিল তাহা বলা কঠিন, তবে কোথাও কোথাও কিছু কিছু যে ঘটিয়াছিল তাহা অনস্বীকার্য। তাহা না হইলে মধ্য-ভারতের, দক্ষিণ-ভারতের এবং বাঙলাদেশের আদি-অস্ট্রেলীয়দের মধ্যে দেহ-বৈশিষ্ট্যের যে পার্থক্য দেখা যায়, তাহার যথেষ্ট ব্যাখ্যা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এ প্রসঙ্গে বলা উচিত, ফন্ আইক্স্টেড্ট্ মোটামুটি এই আদি-অস্ট্রেলীয় নরগোষ্ঠীর যে-অংশ মধ্য ও পূর্ব-ভারতবর্ষের অধিবাসী তাহাদের নামকরণ করিয়াছেন 'কোলিড্' এবং সিংহলীয় অংশের, 'ভেড্ডিড্'। 'কোলিড্' বা 'কোলসম' নামকরণ ভারতীয় ঐতিহ্যের সমর্থক; সেই কারণে আইক্স্টেড্টের এই নামকরণ গ্রহণযোগ্য।

ভারতবর্ষের জনবহুল সমতল স্থানগুলিতে যে জনের বাস তাহাদের মধ্য হইতে পূর্বোক্ত আদিম অধিবাসীদের দেহলক্ষণগুলি বাদ দিলে কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়। এই জনের লোকেরা দেহদৈর্ঘ্যে মধ্যমাকৃতি, ইহাদের মুণ্ডাকৃতি দীর্ঘ ও উন্নত, কপাল সংকীর্ণ, মুখ খর্ব এবং গণ্ডাস্থি উন্নত, নাসিকা লম্বা ও উন্নত কিন্তু নাসামুখ প্রশস্ত, ঠোঁট পুরু এবং মুখগহ্বর বড়, চোখ কালো এবং গায়ের চামড়া সাধারণত পাতলা হইতে ঘন বাদামী। দক্ষিণ-ভারতের অধিকাংশ লোক এবং উত্তর-ভারতের নিম্নতর শ্রেণীর প্রায় সকলেই উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন দীর্ঘমুণ্ড জনের বংশধর, এবং এই দীর্ঘমুণ্ড জনেরাই ভারতীয় জনপ্রবাহে যে দীর্ঘমুণ্ডধারা বহমান তাহার উৎস। বাঙলাদেশেও উত্তম ও মধ্যম সংকর এবং অন্ত্যজ পর্যায়ে যে দীর্ঘমুণ্ডের ধারাচিহ্ন দেখা যায়, তাহাও মূলত এই নরগোষ্ঠীরই দান। এই গোষ্ঠীর আদি বাসস্থান কোথায় এবং বিস্তৃতি কোথায় ছিল তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় নাই, তবে বিরজাশংকর গুহ মহাশয় প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, এক সময় এই দীর্ঘমুণ্ডগোষ্ঠী উত্তর-আফ্রিকা হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের উত্তর-পশ্চিম দেশগুলি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল; পরে নব্যপ্রস্তর যুগে ইহারা ক্রমশ মধ্য-দক্ষিণ-ভারতে বিস্তৃতি লাভ করে এবং এইসব দেশে আদি-অস্ট্রেলীয়দের সঙ্গে ইহাদের কিছু রক্তসংমিশ্রণ ঘটে।

এই সদ্যকথিত জন ছাড়া আরও দুইটি দীর্ঘমুণ্ড জন কিছু পরবর্তী কালেই ভারতবর্ষে আসিয়া বসবাস করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। এই দুই জনের কিছু কিছু কঙ্কালাবশেষ পাওয়া গিয়াছে সিন্ধু নদীর উপত্যকায়। মাব্রান্, হরপ্পা ও মহেন্-জো-দড়োর নিম্নস্তরে প্রাপ্ত কঙ্কালগুলি হইতে মনে হয় ইহাদের মধ্যে একটির দেহগঠন ছিল সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ, মগজ বড়, ভ্রূ-অস্থি স্পষ্ট, কানের পিছনের অস্থি বৃহৎ। এইসব দেহলক্ষণ পঞ্জাবের সমর-কুশল, দৃঢ় ও বলিষ্ঠ কোনও কোনও শ্রেণী ও বর্ণের ভিতর এখনও দেখা যায়। কিন্তু এই জন পঞ্জাব অতিক্রম করিয়া পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে আর অগ্রসর হইয়াছিল বলিয়া মনে

হয় না। দ্বিতীয় দীর্ঘমুণ্ড জনের পরিচয়ও মহেন্-জো-দড়োর কোনও কোনও কঙ্কালাবশেষ হইতেই পাওয়া যায়। এই জনের লোকদের দেহগঠন তত সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ নয়, বরং ইহারা দৈর্ঘ্যেও একটু খর্ব, কিন্তু মুখাবয়ব তীক্ষ্ণ ও সুস্পষ্ট, নাসিকা তীক্ষ্ণ ও উন্নত, কপাল ধনুকের মতো বঙ্কিম। ইহাদের মধ্যে ভূমধ্য নরগোষ্ঠীর দেহলক্ষণের সাদৃশ্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট, এবং অনুমান করা যায়, সিন্ধু উপত্যকার প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার যে পরিচয় হরপ্পা ও মহেন্-জো-দড়োতে আমরা পাইয়াছি তাহা ইহাদেরই সৃষ্টি। উত্তর-ভারতে সর্বত্র সকল বর্ণের মধ্যেই, বিশেষভাবে উচ্চবর্ণের লোকদের ভিতর, এই দীর্ঘমুণ্ড নরবংশের রক্তধারা প্রবহমান এবং এই রক্তপ্রবাহের তারতম্যের ফলেই উত্তর-ভারত ও দক্ষিণ-ভারতের লোকদের মধ্যে দেহগঠনের সুস্পষ্ট তারতম্য দেখা যায়, যদিও দক্ষিণ-ভারতে ব্রাহ্মণদের মধ্যে এ ধারার কিছুটা অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বাঙলাদেশে এই দীর্ঘমুণ্ড জনের রক্তপ্রবাহের ধারা কতখানি আসিয়া পৌঁছিয়াছিল তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না; কতকটা স্রোতস্পর্শ যে লাগিয়াছিল সে-সম্বন্ধে সন্দেহ কী?

উপরোক্ত দীর্ঘমুণ্ড জনেরা যে জনস্তর গড়িয়া তুলিয়াছিল, উত্তর-পশ্চিম হইতে তাহার উপর এক গোলমুণ্ড জন আসিয়া নিজেদের রক্তপ্রবাহ সঞ্চারিত করিল। মনে রাখা প্রয়োজন যে, ইহাদের সঙ্গে গোলমুণ্ড মোঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর কোনই সম্বন্ধ নাই। এই জনের সর্বপ্রাচীন সাক্ষ্য সংগৃহীত হইয়াছে হরপ্পা ও মহেন্-জো-দড়োতে প্রাপ্ত মুণ্ড-কঙ্কাল হইতে। ইহাদের সঙ্গে পূর্ব-ইউরোপের দীনারীয় এবং কতকাংশে আর্মানীয় জাতির সম্বন্ধ সুস্পষ্ট। এই জাতিই লাপোং, রিপ্‌লী লুসসান্ ও রমাপ্রসাদ চন্দ-কথিত অ্যালপাইন (Homo Alpinus) নরগোষ্ঠী, বিরজাশংকর গুহ-কথিত অ্যাল্‌পো-দীনারীয় নরগোষ্ঠী, ফন্ আইক্‌স্টেড্‌ট্-কথিত পশ্চিম ও পূর্ব 'ব্র্যাকিড্' বা গোলমুণ্ড নরগোষ্ঠী। বাঙলাদেশের উচ্চবর্ণের ও উত্তম সংকর বর্ণের জনসাধারণের মধ্যে যে গোল ও মধ্যম মুণ্ডাকৃতি, তীক্ষ্ণ ও উন্নত এবং মধ্যম নাসাকৃতি ও মাধ্যমিক দেহ-দৈর্ঘ্যের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অনেকাংশে এই নরগোষ্ঠীরই দান। বস্তুত, বাঙলাদেশের যে জন ও সংস্কৃতি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার প্রায় সমগ্র মূল রূপায়ণই প্রধানত অ্যালপাইন ও আদি-অস্ট্রেলীয়, এই দুই জনের লোকদের কীর্তি। পরবর্তী কালে আগত আর্যভাষাভাষী আদি-নর্ডিক নরগোষ্ঠীর রক্তপ্রবাহ ও সংস্কৃতি তাহার উপরের স্তরের একটি ক্ষীণ প্রবাহ মাত্র, এবং এই প্রবাহ বাঙালীর জীবন ও সমাজ-বিন্যাসের উচ্চতর স্তরেই আবদ্ধ; ইহার ধারা বাঙালীর জীবন ও সমাজের গভীর মূলে বিস্তৃত হইতে পারে নাই। যাহাই হোক, পামীর মালভূমি, তাক্‌লমাকান্ মরুভূমি, আল্পস্ পর্বত দক্ষিণ-আরব ও ইউরোপের পূর্বদেশবাসি এই অ্যালপাইন জনের বংশধরেরা বর্তমান ভারতবর্ষে ছড়াইয়া আছে নানা স্থানে—গুজরাটে, কর্ণাটে, মহারাষ্ট্রে, কুর্গে, মধ্যভারতে, বিহারে,

'নাগর' ব্রাহ্মণদের মধ্যে, বাঙলায় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য এবং উপরের বর্ণস্তরের সকল লোকদের মধ্যে। সর্বত্র সমানভাবে একই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান নাই, এ কথা সত্য ; কিন্তু ভারতবর্ষে গোলমুণ্ড, উন্নতনাসা মানুষের রক্তধারা যেখানে যে পরিমাণে আছে তাহার মূলে এই গোলমুণ্ড, উন্নতনাসা অ্যালপাইন নরগোষ্ঠী উপস্থিত। ফন্ আইক্‌স্টেড্‌টের মতে এই নরগোষ্ঠীর তিন শাখা : পশ্চিম ব্র্যাকিড্, যাহাদের বংশধর বর্তমান মহারাষ্ট্র ও কুর্গের অধিবাসীরা, গাঙ্গেয় উপত্যকার দীর্ঘদেহ ব্র্যাকিড্‌রা এবং বাঙলা ও উড়িষ্যার পূর্ব ব্র্যাকিড্‌রা। এই তিন শাখাই, তাঁহার মতে, আর্যভাষী 'ইণ্ডিড্' নামক বৃহত্তর নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু যে জন বিশিষ্ট ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির জন্মদাতা এবং যাহারা পূর্বতন ভারতীয় সংস্কৃতির আমূল রূপান্তর সাধন করিয়া তাহাকে নবকলেবরে নবরূপ দান করিয়াছিল, তাহারা এই অ্যালপাইন নরগোষ্ঠী হইতে পৃথক। এই নূতন জনের নরতত্ত্ববিদ্‌দত্ত নাম হইতেছে আদি-নর্ডিক্ (proto Nordic)। এই আদি-নর্ডিক্ জনই বৈদিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির সৃষ্টিকর্তা। ভারতবর্ষে ইহাদের সুপ্রাচীন কোনও কঙ্কালাবশেষ আবিষ্কৃত হয় নাই ; তবে, তক্ষশিলার ধর্মরাজিক বিহারের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যে কয়টি নরকঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে অনুমান হয়, ইহাদের মুখাবয়ব দীর্ঘ, সুদৃঢ় ও সুগঠিত নাসিকা সংকীর্ণ ও সুউন্নত, মুণ্ডাকৃতি দীর্ঘ হইলেও গোলের দিকে ঝোঁক সুস্পষ্ট এবং নিচের দিকের চোয়াল দৃঢ়। মাথার খুলি এবং মুখাবয়ব হইতে মনে হয় ইহাদের দেহ ছিল খুব বলিষ্ঠ ও দৃঢ়সংবদ্ধ। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাঠান, হিন্দুকুশ পর্বতের কাফীর প্রভৃতি কোমের লোকেরা, পঞ্জাব ও রাজপুতনার উচ্চ শ্রেণী ও বর্ণের লোকেরা ইহাদেরই বংশধর, যদিও শেষোক্ত দুই স্থানে পূর্বতন দীর্ঘমুণ্ড জাতির সঙ্গে ইহাদের সংমিশ্রণ একটু বেশি ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়। উত্তর ও পশ্চিম-ভারতে সর্বত্রই ইহাদের ধারাচিহ্ন পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা সর্বত্র খুব বলিষ্ঠ ও বেগবান নয়। উত্তর-য়ুরোপের নর্ডিক জাতির সঙ্গে ইহাদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, তবে পার্থক্যও আছে, বিশেষভাবে চুল ও গায়ের রঙে। ভারতীয় নর্ডিক জাতির চুলের রং সাধারণত ঘন বাদামী হ!তে ঘনকৃষ্ণ এবং চামড়া বাদামী হইতে রক্তিম গৌর। উত্তর-য়ুরোপের নর্ডিকদের চামড়া রক্তিম শ্বেত এবং কেশ পাতলা বাদামী হইতে শ্বেতোপম। এই পার্থক্য কতকটা জলবায়ু-নির্ভর সন্দেহ নাই, কিন্তু মূলত কতকটা পূর্বাপর ইতিহাসগত তাহাও অস্বীকার করা যায় না। সম্ভবত, বৈদিক আর্যসভ্যতার নির্মাতা নর্ডিকেরাই আদি-নর্ডিক, এবং ইহারাই পরবর্তী কালে উত্তরে য়ুরোপখণ্ডে গিয়া ক্রমশ নূতন দেহলক্ষণ উদ্ভব করিয়াছিল। ফন্ আইক্‌স্টেড্‌ট্ এই বলিষ্ঠ ও দুর্জয় নরগোষ্ঠীর নামকরণ করিয়াছেন 'ইণ্ডিড্'। যাহাই হউক, ইহাদেরই আর্য ভাষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি ঐতিহাসিক কালে বহু শতাব্দী ধরিয়া ধীরে ধীরে

বাঙলাদেশে সঞ্চারিত হইয়া পূর্বতন সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে আত্মসাৎ করিয়া নূতনরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু বাঙালীর রক্ত ও দেহগঠনে এই আদি-নর্ডিক জনের রক্ত ও দেহগঠন-বৈশিষ্ট্যের দান অত্যন্ত অল্প; সে ধারা শীর্ণ ও ক্ষীণ, এত শীর্ণ ও ক্ষীণ যে বাঙলাদেশের ব্রাহ্মণদের মধ্যেও তাহা খুব সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ সত্ত্বেও সহসা ধরা পড়ে না। বর্তমান যুক্তপ্রদেশ, রাজপুতনা বা পঞ্জাবের ব্রাহ্মণদের সঙ্গে নরতত্ত্বের দিক হইতে বাঙালী ব্রাহ্মণের কোন সম্বন্ধই যে প্রায় নাই তাহার কারণ এই তথ্যের মধ্যে নিহিত। ঐসব দেশের ব্রাহ্মণেরা যে সামাজিক ক্ষেত্রে বাঙালী ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্বের দাবি সম্পূর্ণ স্বীকার করেন না তাহার অন্যতম কারণ এই জনপার্থক্য নয় কি?

ইহা ছাড়াও আর একটি খর্বদেহ দীর্ঘমুণ্ড জাতির অস্তিত্ব অনুমান করিয়াছেন নরতত্ত্ববিদ্ ফিশার সাহেব, এবং ইহাদের নামকরণ করিয়াছেন প্রাচ্য বা Orienta বলিয়া। ইহারা পাতলা গৌর, কিন্তু ইহাদের চুল ও চোখ কৃষ্ণবর্ণ এবং নাসিকা দীর্ঘ ও উন্নত। উত্তর আফগানিস্তানের বাদক্ষীরা, মীর্ হইতে খাইবার গিরিবর্ত্ম পর্যন্ত যে-সব লোক বাস করে, চিত্রল হইতে হিমালয়ের সানুদেশ ধরিয়া নেপালের পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত যে-সব পার্বত্য জনের বাস, ইহারা সকলেই কমবেশি সেই প্রাচ্য জনের বংশধর। পঞ্জাবে হিন্দুসমাজের কোন কোন শ্রেণীতে এবং মুসলমানদের উচ্চশ্রেণীতে এই জনের শীর্ণ প্রবাহ কিছুটা ধরা পড়ে, কিন্তু বাঙলাদেশে ইহাদের রক্তধারা আসিয়া পৌঁছিতে পারে নাই, এমনকি পর্বতশায়ী উত্তরাংশেও নয়। ফন্ আইকস্টেড্ট্ এই নরগোষ্ঠীর নামকরণ করিয়াছেন 'উত্তর-ইণ্ডিড্' বলিয়া; এবং ডেনিকার ও জিউফ্রিডা-রাগ্গেরী ইহাদেরই বোধ হয় বলিয়াছেন 'ইন্দো-আফগানীয়'।

মোঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর সঙ্গে ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠতর পরিচয় পরবর্তী ঐতিহাসিক কালে। এইসব মোঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে ছড়াইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ভারতবর্ষের জনপ্রবাহে ইহাদের স্পর্শ গভীরভাবে কোথাও লাগে নাই, একমাত্র আসাম, উত্তরে হিমালয়শায়ী নেপাল-ভোটান এবং পূর্ব প্রান্তে ব্রহ্মদেশশায়ী প্রত্যন্ত জনপদ ও অরণ্যবাসী লোকদের মধ্যে ছাড়া। চৈনিক তুর্কীস্থানের তুর্কী-ভাষাভাষী অথবা খিরগিজ, উজবেক প্রভৃতি লোকদের মতো যথার্থ মোঙ্গোলীয় জন বা কোম আজ পর্যন্ত ভারতীয় নরতত্ত্বের বহির্ভূত। তবে উত্তরে হিমালয়সানুদেশ-বাসী লিম্বু, লেপচা, রংপা প্রভৃতি কোমের লোকদের মধ্যে তিব্বতী রক্তধারা সুস্পষ্ট। ইহাদের দেহাকৃতি মধ্যম হইতে দীর্ঘ, মুণ্ডাকৃতি গোল, গণ্ডাস্থি উন্নত এবং নাসিকাকৃতি দীর্ঘ ও চাপ্টা। নেপালেও এই রক্তধারার প্রভাব ধরা পড়ে, তবে উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে ক্রমশ ক্ষীয়মাণ।

আসামের উত্তর-পূর্বপ্রান্তশায়ী পার্বত্য দেশগুলিতে আবার একটি পৃথক মোঙ্গোলীয় রক্তধারার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাদের মুণ্ডাকৃতি গোল নয়, গোলের ঠিক উল্টা

অর্থাৎ দীর্ঘ, এবং অক্ষিপুট সম্মুখীন। ইহারা যে মোঙ্গোলীয় তাহার প্রমাণ ইহাদের চ্যাপ্টা নাক, উন্নত গণ্ডাস্থি, বঙ্কিম চক্ষু, উদ্দণ্ড কেশ এবং কেশবিহীন দেহ ও মুখমণ্ডল। দক্ষিণ-পশ্চিম চীন হইতে ইহারা ক্রমশ ব্রহ্মদেশ, মালয় উপদ্বীপ ও পূর্ব-দক্ষিণ সমুদ্রশায়ী দেশ ও দ্বীপগুলিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল ; পথে উত্তর-পূর্ব আসামে এবং উত্তর ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় মিরি, নাগা, বোদো বা মেচ প্রভৃতি লোকদের ভিতর, কোচ, পালিয়া, রাজবংশী প্রভৃতি লোকদের ভিতর ইহাদের একটি ধারাপ্রবাহ ধরা পড়িয়া গিয়াছে। আসামে এই ধারা সর্বত্রই, সমাজের সকল স্তরেই প্রবহমান, তবে উচ্চবর্ণগুলির ভিতর গোলমুণ্ড অ্যালপাইন এবং কিছু পরিমাণে দীর্ঘমুণ্ড আদি-নর্ডিক ধারাও সুস্পষ্ট ; এই শেষোক্ত দুই ধারাই আসামের হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিত্তি। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাধৃত ধারাটির একটি প্রবাহ ঐতিহাসিক কালে বাঙলাদেশে আসিয়া ঢুকিয়া পড়ে, এবং রংপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি অঞ্চলে এইভাবেই খানিকটা মোঙ্গোলীয় প্রভাব আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু তাহা সাধারণত সমাজের নিম্নস্তরে।

ব্রহ্মদেশে যে মোঙ্গোলীয় জনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে, তাহারা খর্বদেহ, তাহাদের মুণ্ডাকৃতি গোল,—দীর্ঘ নয়, এবং চামড়ার রং আরও ঘোর। দীর্ঘমুণ্ড অহোমীয় মোঙ্গোলীয়দের সঙ্গে ইহাদের আত্মীয়তা থাকিলেও ইহারা একগোত্রীয় নয় ; বরং ব্রহ্মদেশীয় গোলমুণ্ড মোঙ্গোলীয়দের সঙ্গে সমগোত্রীয়তা আছে ত্রিপুরা জেলার চাক্‌মাদের, টিপ্‌রাইদের, এবং আরাকানের এবং চট্টগ্রামাঞ্চলের মগদের। বাঙলাদেশের অন্যত্র কোথাও এই ব্রহ্ম-মোঙ্গোলীয় প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায় না এবং বাঙলার জনগণের রক্তপ্রবাহে ইহারা বিশেষ কোন চিহ্ন রাখিয়া যায় নাই।

ভারতবর্ষের নরগোষ্ঠীপ্রবাহ সম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইল, পাশ্চাত্য ও ভারতীয় নৃতাত্ত্বিকেরা মোটামুটি তাহা স্বীকার করেন। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে লাইপ্‌ৎসিগ স্যাক্সন ইনস্টিটিউটের ভারতীয় নৃতত্ত্বাভিযানের নেতা ব্যারন্ ফন্ আইকস্টেড্‌ট্ সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়িয়া যে সুবিস্তৃত শারীর-পরিমিতি গণনা করিয়াছেন, তাহার ফলে ভারতীয় নরগোষ্ঠীপ্রবাহে কিছু নূতন আলোকপাত হইয়াছে। ফন্ আইকস্টেড্‌টের বিশ্লেষণ ও মতামত আমাদের দেশে বহুলপ্রচারিত নয় ; অথচ নানা কারণে তাঁহার মতামত আলোচিত হইবার দাবি রাখে। প্রথমত, ভারতীয় নরতত্ত্ব-জিজ্ঞাসায় তিনিই বোধ হয় সর্বপ্রথম সমস্ত ভারতবর্ষ তাঁহার গণনা ও বিশ্লেষণের বিষয়ীভূত করিয়াছেন। দ্বিতীয়ত, তিনিই সকলের চেয়ে বেশি সংখ্যায় পরিমিতি লইয়াছেন। তৃতীয়ত, সমস্ত পরিমিতি একই মানদণ্ডানুযায়ী গৃহীত হইয়াছে ; এবং চতুর্থত, যে বিচার-পদ্ধতি অনুযায়ী পরিমিতি বিশ্লেষিত হইয়াছে তাহা একান্ত আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। পূর্বতন সকল মতামত বিচার করিয়া এবং সুবিস্তৃত ও সুগভীর গবেষণার ফলে তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত একটু পরিচয় লওয়া

এ-প্রসঙ্গে অবান্তর নয়। তিনি বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর যে নামকরণ করিয়াছেন, তাহা অনন্যপূর্ব না হইলেও একটু অসাধারণ। কিন্তু, একটু গভীরভাবে বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে, নামকরণ যাহাই হোউক, বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর যে যে বিশিষ্ট দেহ-লক্ষণের উপর এই নামকরণের নির্ভর সেই দেহলক্ষণ সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতের বিভিন্নতা খুব বেশি নাই। শ্রেণীনির্ধারণ সম্বন্ধে মতের বিভিন্নতা অবশ্যই লক্ষণীয়।

ফন্ আইকস্টেড্টের মতে ভারতবর্ষে মোটামুটি তিনটি নরগোষ্ঠীর রক্তপ্রবাহ উপস্থিত। প্রত্যেক গোষ্ঠীতেই কয়েকটি শাখাগোষ্ঠী সংলগ্ন।

(১) ভেড্ডিড্ বা ভেড্ডীয় নরগোষ্ঠী—উত্তর-দাক্ষিণাত্যের পাতলা রং ও বলিষ্ঠ গড়নের উত্তর-গোণ্ডীয় লোকেরা এবং দক্ষিণ-ভারতের ঘোরকৃষ্ণ 'মেলিড্' ও সিংহলের ভেড্ডারা এই ভেড্ডিড্ বা ভেড্ডীয় নরগোষ্ঠীর শাখা। লক্ষণীয় যে, কোল-মুণ্ডা নর-গোষ্ঠীকে ফন্ আইক্স্টেড্ট্ এই বৃহত্তর গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করিতেছেন না।

(২) 'মেলানিড্' বা ভারতীয় 'মেলানিড্'—এই নরগোষ্ঠীর প্রধান বাসস্থান দক্ষিণ-ভারতের সমতল প্রদেশ, এবং বর্তমান তামিলভাষী লোকেরা ইহাদের বংশধর। উত্তরে হো'দের মধ্যে এই 'মেলানিড্' রক্তস্পর্শ সুস্পষ্ট এবং আরও উত্তরে গাঙ্গেয় উপত্যকায় ইহাদের কোনও কোনও ক্ষুদ্রতর শাখার দর্শন দুর্লভ নয়, বিশেষত, তথা-কথিত নিম্নজাতদের ভিতর। কোল'য়রাও ইহাদেরই একটি সুবৃহৎ শাখা। এই হিসাবে ফন্ আইক্স্টেড্ট্ কোল-মুণ্ডা নরগোষ্ঠীকে বর্তমান দ্রবিড়ভাষী 'মেলানিড্' নরগোষ্ঠীর আত্মীয় বলিয়া মনে করিতেছেন ; কোল-মুণ্ডা-খাসিয়ারা যে অন্য পৃথক নরগোষ্ঠীর লোক তাহা বলিতেছেন না। তাহা ছাড়া, অন্যান্য নৃতাত্ত্বিকেরা বর্তমান দ্রবিড়ভাষী লোকেদের যে-সব দেহলক্ষণসমূহের উপর নির্ভর করিয়া তাহাদের সঙ্গে ভারতবহির্ভূত মিশর-এশীয় বা ভূমধ্য নরগোষ্ঠীর আত্মীয়তার সন্ধান পাইতেছেন, মোটামুটি সেই দীর্ঘমুণ্ড উন্নতনাসা নরগোষ্ঠীর লোকদেরই তিনি বলিতেছেন ভারতীয় 'মেলানিড্'।

(৩) 'ইণ্ডিড্' বা ভারতীয় নরগোষ্ঠী—ইহাদের প্রধানত তিন শাখা : (ক) যথার্থ 'ইণ্ডিড্' ; ইহারাই মোটামুটি যাহাদের আগে বলা হইয়াছে আদি-নর্ডিক ; (খ) উত্তর 'ইণ্ডিড্' অর্থাৎ মোটামুটিভাবে ফিশার যাহাদের বলিয়াছেন প্রাচ্য বা 'ওরিয়েন্টাল' ; এবং (গ) 'ব্র্যাকিড্' ; ইহারা আর-একটি গোলমুণ্ড নরগোষ্ঠী, অর্থাৎ মোটামুটিভাবে আগে যাহাদের বলা হইয়াছে অ্যালপাইন বা আল্পো-দীনারীয়। এই 'ব্র্যাকিড্'দের আবার তিন উপধারা ; (অ) মহারাষ্ট্র দেশের 'পশ্চিম ব্র্যাকিড্' (আ) বাঙলা ও উড়িষ্যার 'পূর্ব ব্র্যাকিড্'। এবং (ই) গাঙ্গেয় উপত্যকার 'দীর্ঘদেহ ব্র্যাকিড্'। যথার্থ 'ইণ্ডিড্'দের বিস্তার বিনশন-প্রয়াগধৃত আর্যাবর্তে বা মধ্যদেশে, দক্ষিণ-ভারতের কেরল ভূমিতে এবং মিশ্রিতরূপে সিংহল দ্বীপেও।

ফন্ আইকস্টেড্ট্ আরও বলেন যে, দাক্ষিণাত্যের উত্তর-পশ্চিমাংশের কোনও কোনও

অধিবাসীদের ভিতর আদি-মোঙ্গোলীয় রক্তপ্রভাব সুস্পষ্ট, এবং তাহা বোধ হয় অপেক্ষাকৃত আধুনিক কোলভাষী লোকদের রক্তধারা দ্বারা স্পৃষ্ট। এই আদি-মোঙ্গোলীয় প্রভাব ভারতবর্ষের সর্বত্র সমভাবে বিস্তৃত নয়, তবে এখানে ওখানে আকীর্ণ চিহ্ন পৃথক পৃথক ভাবে নানা স্থানে ধরা পড়ে। ইহা হইতে তিনি অনুমান করেন যে, ভারতবর্ষে এই মোঙ্গোলীয় প্রভাব খুব সুপ্রাচীন নয়।

দক্ষিণ-ভারতের অধিবাসীরা, তাঁহার মতে, নৃতত্ত্বের দিক হইতে অধিকতর সমন্বিত, এবং সমন্বয়ের মূল ভিত হইতেছে সুবিস্তৃত আদিমতম নেগ্রিড্ রক্তপ্রবাহ। এই সমন্বিত নরগোষ্ঠীই ফন্ আইকস্টেড্ট্ কথিত 'মেলানিড্' নরগোষ্ঠী এবং তাহাদেরই বংশধর বর্তমান মধ্যস্তরের তামিল। উচ্চ ও নিম্নস্তরে এই সমন্বয়ের সমগ্র ও সুস্পষ্ট রূপটি ধরা পড়ে না, কারণ উভয় স্তরেই অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক বা প্রাচীনতর কালের অন্য নর-গোষ্ঠীর রক্তস্পর্শ লাগিয়াছে; উচ্চস্তরে বোধ হয় 'ইণ্ডিড্'দের এবং নিম্নস্তরে প্রাচীনতর 'মালিড্'দের। এই 'মালিড্'রা পর্বতবাসী ভেড্ডিড নরগোষ্ঠীর সঙ্গে কমবেশি আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ। ইহাদের কাহারও মধ্যেই অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের নিগ্রোবটু রক্তস্পর্শের চিহ্নমাত্র নাই, যদিও আদিমতম নিগ্রোবটু রক্তস্পর্শের কমবেশি প্রভাব সকলের মধ্যেই আছে, তবে সে প্রভাবও বহুদিন আগেই শুকাইয়া উবিয়া গিয়াছে।

সংখ্যায় ও বিস্তৃতিতে ভারতবর্ষে সর্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ নরগোষ্ঠী হইতেছে 'ইণ্ডিড্'রা। ফন্ আইক্স্টেড্টের মতে ইহারাই প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু-সভ্যতার উত্তরাধিকারী এবং দ্রাবিড় ও বিশিষ্ট "ভারতীয়" আত্মিক সাধনার যথার্থ প্রতিনিধি। 'ইণ্ডিড' নরগোষ্ঠীর উত্তর-পশ্চিমাংশ বারবার মধ্য এশিয়ার নানা জন ও কোম দ্বারা আক্রান্ত ও পর্যুদস্ত হইয়াছে; আর্যভাষা কিন্তু তাহাতে কখনও শিথিলমূল হয় নাই, বরং তাহার প্রতাপ বরাবরই অম্লান ও অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু আর্যভাষীদের বাস্তব সভ্যতা ও মানস-সংস্কৃতি বারবার রূপান্তর ও সমন্বয় লাভ করিয়াছে। আর্যভাষাকে আশ্রয় করিয়া কিছু নর্ডিক রক্তপ্রবাহ, পরবর্তীকালে কিছু শক ও হুন রক্তপ্রবাহ এবং আরও পরবর্তী কালে মুসলমান অভিযান আশ্রয় করিয়া কিছু 'ওরিয়েন্টাল' বা প্রাচ্য নরগোষ্ঠীর রক্তধারা 'ইণ্ডিড্' প্রবাহে সঞ্চারিত হইয়াছে। মূলে এই 'ইণ্ডিড্' নরগোষ্ঠী আদিমতম ভেড্ডীয় নরগোষ্ঠীর সঙ্গে সংপৃক্ত। অতি প্রাচীনকাল হইতেই উত্তর হইতে "ইণ্ডিড্'দের দক্ষিণমুখী চাপে ক্রমশ 'মেলানিড' নরবংশের সৃষ্টি এবং ভেড্ডিডদের চাপে ক্রমশ 'মালিড্'দের।

'ইণ্ডিড্' ও 'মেলানিড্' নরগোষ্ঠী ও তাহাদের ভাষা সম্বন্ধে ফন্ আইকস্টেড্টের উক্তি উদ্ধারযোগ্য। আমার মনে হয়, দ্রাবিড়ভাষীদের নরতত্ত্ব সম্বন্ধে একান্ত সাম্প্রতিক কালেও নরতাত্ত্বিকদের মধ্যে যে জিজ্ঞাসা বর্তমান তাহার একটা সন্তোষ-জনক মীমাংসা এই উক্তির মধ্যে পাওয়া যায়।

'The origina'ly Dravidian Indids, whose descendants adopt d the Ar)an language, pushed over the Melanids, who in their turn adopted Dravidian idioms for which they are now the typical representatives. So, race and language do no more in India in any way coincide. Races remained, but languages were shoven southward···The disturb ing results of the idea of a Dravidian "race" are therefore easy to understand. The Dravida speakers of today are no more the same as four millenniums ago At that time they were of Indid race, today they are prevailingly of Melanid race."

এই সুদীর্ঘ জাতিপ্রবাহের ইতিহাস আলোচনায় একটি তথ্য সুস্পষ্ট ধরা পড়ে; সেটি এই : নরতত্ত্বের দিক হইতে বাঙলার জনসমষ্টি মোটামুটি দীর্ঘমুণ্ড, প্রশস্তনাস আদি-অস্ট্রেলীয় বা 'কোলিড্', দীর্ঘমুণ্ড, দীর্ঘ ও মধ্যোন্নতনাস মিশর-এশীয় বা 'মেলানিড্', এবং বিশেষভাবে গোলমুণ্ড, উন্নতনাস অ্যালপাইন বা 'পূর্ব ব্র্যাকিড্', এই তিন জনের সমন্বয়ে গঠিত। নিগ্রোবটু রক্তেরও স্বল্প প্রভাব উপস্থিত, কিন্তু তাহা সমাজের খুব নিম্নস্তরে এবং সংকীর্ণ স্থানগণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ। মোঙ্গোলীয় রক্তের কিছুটা প্রভাবও আছে, কিন্তু তাহাও উত্তর ও পূর্ব দিকে সংকীর্ণ স্থানগণ্ডির সীমা অতিক্রম করে নাই। আদি-নর্ডিক বা খাঁটি 'ইণ্ডিড্' রক্তপ্রবাহও অনস্বীকার্য, কিন্তু সে ধারা অত্যন্ত শীর্ণ ও ক্ষীণ। মোটামুটিভাবে ইহাই বাঙলাভাষাভাষী জন-সৌধের চেহারা, এবং এই জন-সৌধের উপরই বাঙালীর ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছে। এই বিচিত্র সংকর জন লইয়াই বাঙলার ও বাঙালীর ইতিহাসের সূত্রপাত।

বাঙালীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ এবং উত্তর-ভারতের বিভিন্ন বর্ণের এবং জনের উপরোক্ত নরতাত্ত্বিক বিবরণের তুলনামূলক আলোচনা হইতে বাঙালীর বিভিন্ন বর্ণ বা জাত সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে এখন কতকগুলি ইঙ্গিত ধরিতে পারা যায়। খুব সংক্ষেপে প্রধান ও অপ্রধান কয়েকটি বর্ণ সম্বন্ধে সে ইঙ্গিত বিবৃত করিলেই সমগ্র চেহারাটি পরিষ্কার হইবে।

ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থদের সম্বন্ধেই আগে বলা যাইতে পারে। বাঙলাদেশে ব্রাহ্মণরাই একমাত্র জাত যাহাদের সঙ্গে পঞ্জাবের ব্রাহ্মণদের এবং উত্তর-ভারতের অন্যান্য উচ্চবর্ণের সঙ্গে খানিকটা মিল আছে ; কিন্তু তাহা অপেক্ষাও বাঙালী ব্রাহ্মণদের বেশি নরতাত্ত্বিক আত্মীয়তা দেখা যায় বাঙালী বৈদ্য ও কায়স্থদের সঙ্গে। বস্তুত, বাঙালী ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ জনতত্ত্বের দিক হইতে একই গোষ্ঠীর লোক বলিলে কিছু অবৈজ্ঞানিক কথা বলা হয় না। জনতত্ত্বের দিক হইতে বলিতে পারা যায়, যে-সব জাত (অর্থাৎ বৈদ্য-কায়স্থ, বৃহদ্ধর্মপুরাণের করণ ও অম্বষ্ঠ) দেহবৈশিষ্ট্যে ব্রাহ্মণদের যত সন্নিকটে, বাঙলাদেশে সেই সব জাত-এর সামাজিক কৌলীন্য তত বেশি। বাঙালী ব্রাহ্মণদের (এবং কায়স্থ-

বৈদ্যদের) সঙ্গে পূর্ব-ভারতীয় আদিমতম অধিবাসীদের (যেমন, ছোটনাগপুর অঞ্চলের সাঁওতালদের, উত্তরাঞ্চলের গারো-খাসিয়াদের, নিম্নবঙ্গের রাজবংশী-বুনা ইত্যাদিদের), কিংবা নিম্নতম বর্ণ ও শ্রেণীর লোকদের (পোদ্-বাগ্দী প্রভৃতি) রক্তসংমিশ্রণ বেশি ঘটিয়াছে, এমন প্রমাণ নাই। ঘটে যে নাই তাহার খানিকটা প্রমাণ পাওয়া যায় বঙ্গীয় স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতে এবং ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থদের, বিশেষভাবে ব্রাহ্মণদের, সামাজিক আচার-ব্যবহারে। নির্বিচার আন্তর্বিবাহ ও আন্তর্ভোজনে একটা আপত্তি বরাবরই তাহাদের ছিল, যদিও সেই আপত্তি সুপ্রাচীন কালে সর্বত্র সব সময় খুব কার্যকরী হয় নাই। আর এইসব আপত্তি ও সংস্কার তো খুবই ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছিল, একদিনেই তাহা কার্যকরী করা সম্ভবও হয় নাই। সেই হেতুই ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বৈদ্য-কায়স্থদের একটা জনতাত্ত্বিক আত্মীয়তা সহজেই লক্ষ করা যায়। বাঙলার অন্য কোন বর্ণ বা জাত-এর সঙ্গে সেই আত্মীয়তার প্রমাণ নাই। আশ্চর্যের বিষয় সন্দেহ নাই, বাঙালী ব্রাহ্মণদের সঙ্গে গাঙ্গেয় ভারতের ব্রাহ্মণদের জনতাত্ত্বিক আত্মীয়তা বাঙালী ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থদের জনতাত্ত্বিক আত্মীয়তা অপেক্ষা অনেক কম ; বরং বাঙালী ব্রাহ্মণের আত্মীয়তা মধ্য-ভারতীয় অব্রাহ্মণদের সঙ্গে বেশি। উচ্চতম বর্ণের বিহারীদের সঙ্গে বাঙলার উচ্চতম বর্ণের লোকদের কিছুটা আত্মীয়তা আছে। বাঙলা-বিহারের ভৌগোলিক নৈকট্যে এবং ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানে সে মিল থাকা তো খুবই স্বাভাবিক ; কিন্তু সে মিলও বাঙালী বৈদ্য-কায়স্থদের সঙ্গে মিলের চেয়ে অনেক কম। এইসব কারণে মনে হয়, বাঙালী ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ বর্ণের লোকেরা একটি বিশেষ ঐক্যবদ্ধ জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি, এবং জনতত্ত্বের দিক হইতে তাহারা একই গোষ্ঠীবদ্ধ! বৃহদ্ধর্মপুরাণোক্ত উত্তম সংকর বর্ণের অনেক বর্ণই এই জনগোষ্ঠীর সঙ্গে অল্পবিস্তর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ, এই অনুমানও বোধ হয় সঙ্গে সঙ্গে করা চলে। অন্তত, বাঙালী কায়স্থরা যে বাঙালী সদ্‌গোপ ও কৈবর্তদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ, ইহা তো নরতাত্ত্বিক পরিমিতি-গণনা হইতেই ধরা পড়ে ; সদ্‌গোপদের সঙ্গে কায়স্থদের তো কোনই পার্থক্য নাই। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ তো বলেন, কায়স্থ, সদ্‌গোপ ও কৈবর্তরাই যথার্থত বঙ্গজন-প্রতিনিধি। বস্তুত, বাঙলাদেশের সমস্ত বর্ণের (বৃহদ্ধর্মপুরাণোক্ত উত্তম ও মধ্যম সংকর বর্ণের) সঙ্গে কায়স্থদের আত্মীয়তাই সবচেয়ে বেশি। বাঙলার বাহিরে এক বিহারে কিছুটা ছাড়া অন্যত্র কোনও বর্ণের সঙ্গেই ইহাদের বিশেষ কোনও মিল নাই, এবং এই তথ্য সদ্‌গোপ ও কৈবর্তদের সম্বন্ধেও সত্য। কায়স্থ, সদ্‌গোপ ও কৈবর্তদের সঙ্গে (সদ্‌গোপ ও কৈবর্তরা ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ-কথিত সৎশূদ্র) সাঁওতাল, গারো, খাসিয়া বা বৃহদ্ধর্মপুরাণোক্ত অন্ত্যজ বর্ণের লোকদের কোনই রক্তসংমিশ্রণ ঘটে নাই, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় ; তেমনই নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, ছোটনাগপুর অঞ্চলের সাঁওতাল প্রভৃতিদের সঙ্গে বাঙলার পোদ্, বাগ্দী, বাওড়ী প্রভৃতি উপবর্ণের লোকদের সুপ্রচুর রক্তসংমিশ্রণ ঘটিয়াছে।

নমঃশূদ্রদের সম্বন্ধে নরতাত্ত্বিক পরিমিতি-গণনার ফলাফল একটু চাঞ্চল্যকর। এ তথ্য অন্যত্রও উল্লেখ করিয়াছি যে, দেহবৈশিষ্ট্যের দিক হইতে ইহারা উত্তর-ভারতের বর্ণ-ব্রাহ্মণদের সমগোত্রীয় ; বস্তুত, উত্তর-ভারতের বর্ণ-ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বাঙালী ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থদের চেয়েও বাঙালী নমঃশূদ্রদের আত্মীয়তা বেশি। অথচ, এই নমঃশূদ্রেরা আজ সমাজের একেবারে নিম্নতম স্তরে! আমরা তাহাদের চণ্ডাল বা চাঁড়াল বলিয়া জানি, এবং বৃহদ্ধর্মপুরাণ রচনার কালেই ইহারা অন্ত্যজশ্রেণীভুক্ত। এই সামাজিক তথ্যের সঙ্গে নরতত্ত্বপ্রমাণগত তথ্যের যুক্তির কোনও সম্বন্ধ এখনও কিছু খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।

যাহাই হউক, উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত বিবৃতি, বাঙলার বিভিন্ন জেলার বিচিত্র বর্ণসমূহের ভিতর আপেক্ষিক সূক্ষ্ম ও স্থূল পার্থক্য, একই বর্ণের মধ্যে দেহপরিমিতির ভেদবৈচিত্র্য ইত্যাদি খুঁটিনাটি বিচার করিলে বলিতেই হয়, এ সমস্তই বিচিত্র জন-সাংকর্যের দ্যোতক। জন-সাংকর্যের নরতত্ত্বগত বৈশিষ্ট্যের জৈব মিশ্রণের এমন চমৎকার দৃষ্টান্ত আর কী হইতে পারে! বস্তুত, স্মরণাতীত কাল হইতে এই ধরনের জন-সাংকর্যের দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষের অন্যত্র খুব সুলভ নয়। এই মিশ্রণ এত গভীর ও ব্যাপক যে, নরতত্ত্বের দিক হইতে কোনও বিশিষ্ট বর্ণ, যত উচ্চ বা নিম্নই হউক না কেন, বা কোন বিশিষ্ট স্থানের অধিবাসীদের একান্তভাবে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিবার উপায় নাই।

৪

ঐতিহাসিক কালে বাঙলার জনপ্রবাহ

জনপ্রবাহ তো একটি নিরবচ্ছিন্ন ধারা ; সে ধারা কখনও একটা নির্দিষ্ট সময়ে আসিয়া ঠেকিয়া যাইতে পারে না এবং তাহার ইতিহাস কোথাও শেষ হইয়া যায় না। সেই ধারা আজও বহমান। কাজেই প্রাচীন বাঙলাদেশে ঐতিহাসিক কালে সেই চিরবহমান ধারায় আরও কোনও কোনও জনের রক্তস্পর্শ লাগিয়াছে কি না, লাগিলে কতটুকু লাগিয়াছে এবং সেই প্রবহমান ধারাকে কিভাবে কতটুকু রূপান্তরিত করিতে পারিয়াছে বা পারে নাই, তাহার পরিচয়ও এই সঙ্গেই লওয়া প্রয়োজন।

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে গ্রীক ভৌগোলিক ও জ্যোতির্বিদ টলেমি (Ptolemy) তাঁহার 'ইণ্ডিকা'-গ্রন্থে গঙ্গার পূর্বশায়ী দেশগুলির পরিচয় দিতে গিয়া মুরুণ্ড (Murandooi) নামে এক জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন। পঞ্জাব অঞ্চলে এক মুরুণ্ড উপকোমের উল্লেখ গ্রীক ঐতিহাসিকেরা একাধিকবার করিয়াছেন ; ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই মুরুণ্ডেরা সুপরিচিত। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে এই মুরুণ্ডদের উল্লেখ আছে কুষাণবংশীয় দেবপুত্রশাহী-শাহানুশাহী এবং শকদের সঙ্গে। ইহা হইতে

অনুমান হয় যে, এই মুরুণ্ডরা জন হিসাবে শক-কুষাণদেরই সমগোত্রীয়। শক-কুষাণেরা এক মিশ্র জন। পূর্ব-ভারতে গঙ্গার পূর্বাঞ্চলে যে মুরুণ্ডদের কথা টলেমি বলিতেছেন তাহারা পঞ্জাবের মুরুণ্ডদেরই একটি শাখা হওয়া বিচিত্র নয়। তবে, এই মুরুণ্ডরা বাঙলাদেশে নূতন কোনও রক্তপ্রবাহ বহন করিয়া আনে নাই, তাহা কতকটা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়।

বাঙলার বাহিরের অনেক রাজবংশের পরাক্রান্ত রাজারা সৈন্যসামন্ত লইয়া বহুবার বাঙলাদেশ আক্রমণ করিয়াছেন, কমবেশি অংশ জয় করিয়াছেন, এবং তাহার পর বিজয়-গর্ব লইয়া, বহুবিধ ঐশ্বর্য লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া গিয়াছেন। সৈন্যসামন্ত ইত্যাদি সঙ্গে যাহারা আসিয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশ বিজেতা প্রভুর সঙ্গেই ফিরিয়া গিয়াছে। কিছু যাহারা হয়তো স্থায়ী বাসিন্দারূপে থাকিয়া গিয়াছে তাহারা জনসমুদ্রে জলবিন্দুবৎ কোথায় যে বিলীন হইয়া গিয়াছে, তাহার কোনও হিসাব নাই। ইহারা ছাড়া, পাল ও সেন রাজাদের পট্টোলীগুলিতে এবং সমসাময়িক বাঙলার অন্যান্য লিপিতে দেখা যায়, অনেক অবাঙালী ভারতীয় কোম-উপকোমের উল্লেখ। ভূমি দান-বিক্রয়ের পট্টোলীগুলিতে দান-বিক্রয় যাহাদের নিকট বিজ্ঞাপিত করা হইতেছে, সেখানে বিভিন্ন রাজকর্মচারী, স্থানীয় মহত্তর, গৃহস্থ, কুটুম্ব ইত্যাদির পরই নাম করা হইতেছে নানা কোম ও উপকোমের। দৃষ্টান্তস্বরূপ মদনপালের মনহলি পট্টোলীর তালিকাটি উদ্ধার করা যাইতে পারে; রাজকর্মচারীদের পরেই তালিকাগত করা হইয়াছে "গৌড়-মালব-চোড়-খস-হূণ-কুলিক-কর্ণাট-লাট-ভট্ট" প্রভৃতি রাজসেবকদের। ইহাদের মধ্যে মালব, চোড়, খস, হূণ, কুলিক, কর্ণাট, লাট সকলেই অবাঙালী; হূণেরা তো মূলত অ-ভারতীয়, কিন্তু ইতিপূর্বেই তাহারা অন্তত চার-পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া এ দেশে বাস করিয়া ভারতীয় বনিয়া গিয়াছে। আমার ধারণা—অন্যত্র এ ধারণার কারণ বলিতে চেষ্টা করিয়াছি—এইসব অবাঙালী কোমের লোকেরা বাঙলাদেশে আসিয়াছিল বেতনভুক্ সৈনিকরূপে, না-হয় রাজ-সরকারে একান্ত নিম্নস্তরের কর্মচারী-রূপে। বৃহদ্ধর্মপুরাণ এবং ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে এই রকম কয়েকটি ভিন্-প্রদেশী কোমের খবর পাইতেছি, যথা, খস, যবন, কম্বোজ, খর, দেবল বা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ। যে-ভাবেই হউক এইসব লোকেরা ক্রমশ বাঙলাদেশেরই বাসিন্দা হইয়া গিয়াছিল এবং এ দেশেরই বিশাল জনসমুদ্রে নিজেদের বিলীন করিয়া দিয়াছিল। বাঙলাদেশের জনপ্রবাহের বেগবান ধারায় কবেই ইহারা নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। কর্ণাট হইতে কল্যাণের চালুক্য রাজবংশ, তামিলভূমি হইতে চোল রাজবংশ একাদশ শতকে বাঙলাদেশে সার্থক বিজয়াভিযান প্রেরণ করিয়াছিল; যে-সব সৈন্যসামন্ত এইসব অভিযানের সঙ্গে আসিয়াছিল, তাহাদের কিছু কিছু এই দেশে থাকিয়া যাওয়া অসম্ভবও নয়। ইহাদের আগে মালবরাজ যশোধর্মাও এক অভিযানে পূর্ব-ভারতে আসিয়াছিলেন। প্রতিহারবংশীয় রাজারাও বাঙলাদেশে একাধিক বিজয়াভিযান প্রেরণ

করিয়াছিলেন। শৈলবংশীয় রাজারাও এক সময়ে এ দেশে এক সমরাভিযান পাঠাইয়াছিলেন। এইসব বিচিত্র সেনাবাহিনীর কিছু কিছু অংশ হয়তো পশ্চাতে থাকিয়া গিয়াছিল এবং তাহারাই যে পরবর্তী কালে মালব, চোড় (চোল), কর্ণাট, লাট প্রভৃতি নামে রাজসেবক হইয়া পাল ও সেন -লিপিগুলিতে দেখা দেয় নাই, তাহা কে বলিবে ? হূণ, খস ইত্যাদিরাও হয়তো এইভাবেই আসিয়া থাকিবে। খসেরা তো হিমালয়ের সানুদেশের পার্বত্য জন ; ভোট-চৈনিক রক্তের প্রভাব ইহাদের মধ্যে থাকা স্বাভাবিক। ধর্মপালের খালিমপুর লিপিতে বাঙলাদেশের মন্দিরে লাটদেশীয় ব্রাহ্মণ পুরোহিতের উল্লেখ আছে। আদি-মধ্যযুগের দু-একটি লিপিতে বাঙলার বাহিরের ভিন্ন-প্রদেশাগত ব্রাহ্মণকে ভূমিদানের উল্লেখ আছে। অন্যান্য বর্ণের লোকেরাও নিশ্চয়ই নানা কাজে এ দেশে আসিয়াছিল এবং অনেকেই কালক্রমে এ দেশেরই বাসিন্দা হইয়া গিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে অন্ধ্ররাও পাল আমলে, বোধ হয় তাহারও আগে, বাঙলাদেশে আসিয়াছিল। একটু অন্য প্রসঙ্গে লিপিগুলিতে ইহাদেরও নাম পাওয়া যায় একেবারে চণ্ডালদের সঙ্গে। কেন যে সমাজের একেবারে নিম্নতম স্তরে চণ্ডালদের সঙ্গে ইহাদের স্থান নির্ণীত হইয়াছিল, তাহা বোঝা যায় না। যাহাই হউক, যে-ভাবেই আসিয়া থাকুক, এবং সমাজের যে স্তরেই থাকুক, অগণিত জনপ্রবাহের মধ্যে ইহারা সংখ্যায় এত স্বল্প এবং ইহাদের প্রত্যেকের ধারা এত ক্ষীণ যে, জনতত্ত্বের দিক হইতে আজ আর তাহাদের পৃথক করিয়া চিনিয়া লইবার উপায় নাই, বিরাট বেগবান প্রবাহের মধ্যে তাহারা একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া, ইহারা সকলেই তো পূর্ববর্ণিত কোনও না কোনও বৃহত্তর জনের অঙ্গীভূত ছিল এবং সে-সব জাতি ঐতিহাসিক যুগের পূর্বেই বাঙলাদেশে তাহাদের রক্তপ্রবাহ সঞ্চার করিয়া গিয়াছিল ; যাহারা পারে নাই, তাহাদের ঐতিহাসিক বংশধরেরা পরবর্তী কালে যে স্বল্প সংখ্যায় বাঙলাদেশে আসিয়াছিল, যে ক্ষীণ ধারা সঙ্গে আনিয়াছিল, তাহাতে সুস্পষ্ট নিদর্শন আঁকিয়া দেওয়া সম্ভব ছিল না।

রাজা-রাজকুমারেরা অনেক সময় ভারতবর্ষেরই ভিন্নপ্রদেশী রাজকুমারীদের বিবাহ করিয়া আনিতেন ; বাঙালী পাল-রাজারাই করিতেন, কর্ণাট-দেশাগত সেন-রাজারা তো করিতেনই। পুরুষানুক্রমে কয়েক পুরুষ ধরিয়া এইরূপ হইয়াছে, এমন দৃষ্টান্তও আছে। রাজারাজড়ার তো কোন বাধা নাই ; কাজেই মহিষী নির্বাচন করিতে গিয়া জন-বর্ণ দেখিবারও প্রয়োজন হইত না, রাজবংশ হইলেই চলিত ; এখনও তো তাহাই চলে। বিশেষত, রাষ্ট্রীয় ও সামরিক কারণ থাকিলে তো কথাই নাই। কিন্তু এই ধরনের দৃষ্টান্তও বিরাট জনগণপ্রবাহে জলবিন্দুবৎ ; কাজেই, মুষ্টিমেয় ভিন্নপ্রদেশাগত নারীও বিশাল জনসমুদ্রে বিলীন হইয়া গিয়াছেন। ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম।

সদ্যোবর্ণিত এইসব দৃষ্টান্ত ছাড়া বাঙলার ইতিহাসে কয়েকটি রাজবংশের পরিচয় আছে যাঁহারা বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বাঙলায় আসিয়া নিজেরা রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করিয়া

এ দেশের কমবেশি অংশে রাজত্ব করিয়াছেন, পুরুষানুক্রমে বসবাস করিয়াছেন এবং এই দেশেরই বিরাট জনগণপ্রবাহে কালক্রমে বিলীন হইয়া গিয়াছেন। তুর্কী বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত বাঙলাদেশে এই রকম তিন-চারিটি প্রধান প্রধান রাজবংশের পরিচয় পাওয়া যায়। সপ্তম শতাব্দীর শেষার্ধে খড়্গ নামে একটি রাজবংশ সমতট অঞ্চলে প্রায় তিন-চার পুরুষ ধরিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন ; খড়্গোদ্যম, জাতখড়্গ, দেবখড়্গ ও রাজ-রাজভট—এই চারিজন রাজার নাম আমরা জানি। খড়্গ—এই উপান্ত নামটি কেমন যেন সন্দেহজনক এবং ভিন্‌প্রদেশী অবাঙালী নাম বলিয়াই মনে হয়, অথচ ইঁহারা কোথা হইতে আসিয়াছিলেন জানিবার উপায় নাই। তিন পুরুষ ধরিয়া ইঁহারা অন্তত উপান্ত নামে নিজেদের জন-পরিচয় অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন, কিন্তু চতুর্থ পুরুষে তাহা পরিত্যাগ করিয়া একেবারে যেন দেশি বাঙালী বনিয়া গিয়াছিলেন। দশম শতকে কম্বোজাখ্য নামে আর এক রাজবংশ গৌড়ে কিছুদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। দিনাজপুর জেলার বাণগড়ে প্রাপ্ত একটি স্তম্ভলিপিতে ইঁহারা "কাম্বোজান্বয়জ গৌড়পতি" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন ; ইর্‌দা তাম্রপট্টেও ইঁহাদের উল্লেখ আছে। এই কাম্বোজান্বয়জ রাজারা কাহারা ? কোথা হইতে ইঁহারা আসিয়াছিলেন ? দেবপালের মুঙ্গের-শাসনে এক কাম্বোজের উল্লেখ আছে, কিন্তু সেই কাম্বোজদেশ যে উত্তর-পশ্চিমের গন্ধার দেশের সংলগ্ন দেশ, এ-সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু বাণগড় স্তম্ভলিপি ও ইর্‌দাপট্টের কাম্বোজ যে মুঙ্গের-শাসনের কাম্বোজ, আমার তাহা মনে হয় না। বহুদিন আগে রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় বলিয়াছিলেন এবং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাহা সমর্থন করিয়াছিলেন যে, এই কাম্বোজরা তিব্বত, ভোটান প্রভৃতি হিমালয়ের সানুদেশের কোন মোঙ্গোলীয় জনের শাখা এবং বর্তমান উত্তরবঙ্গের কোচ্‌-পলিয়া-রাজবংশীয়দের পূর্বপুরুষ। সুনীতিবাবু কাম্বোজের সঙ্গে কোচ শব্দের একটা শব্দতাত্ত্বিক যোগও অনুমান করিয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি এই মত এখন পরিত্যাগ করিয়াছেন ; কেন করিয়াছেন, জানি না। আসামের পূর্বতম প্রান্তে চীনদেশের সীমায় যুনান প্রদেশকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত প্রাচ্য ভৌগোলিক ও ব্যবসায়ীরা গন্ধার বলিয়াই অভিহিত করিতেন : ত্রয়োদশ শতকেও রসিদ-উদ্‌-দীন্ এই দেশকে গন্ধার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই গন্ধারেরই সংলগ্ন এক কাম্বোজদেশ যে ছিল না, কে বলিবে ? বিশেষত, পূর্ব-দক্ষিণ সমুদ্রশায়ী চম্পাভূমি-সংলগ্ন কম্বুজদেশ যখন পূর্ব হইতেই এত সুপরিচিত ? তাহা ছাড়া, ব্রহ্মদেশের পেগু শহরের নিকটস্থ পঞ্চদশ শতকের সুদীর্ঘ কল্যাণী শিলালিপিতে রাজা ধম্মচেতি ঐ দেশে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস ও ধর্মসংস্কারের যে বিবরণ উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন, তাহাতে কম্বোজ সঙ্ঘ নামে এক বৌদ্ধ ধর্মগোষ্ঠীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহারা যে সেই উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের কাম্বোজদের সঙ্গে সম্পৃক্ত, এ কথা সহজে বিশ্বাস করা যায় না। আমার তো মনে হয়, আসামের পূর্ব-সীমান্তের গন্ধার-সংলগ্ন একটা কম্বোজ দেশ ছিল, এবং বাঙলার

কাম্বোজরাজবংশ সেই দেশ হইতে আগত। যদি তাহা হয়, তাহা হইলে ইঁহারা মোঙ্গোলীয় পরিবার-অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, এই অনুমান অসংগত নয়, এবং বাণগড় শিলা-লিপির সাক্ষ্য স্বীকার করিলে ইঁহারা যে এ দেশে আসিয়া এ দেশের শৈবধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন তাহাও স্বীকার করিতে হয়। বৃহদ্ধর্মপুরাণ এবং ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে বাঙলাদেশে যে-সব অবাঙালী জনের নাম করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে কম্বোজ অন্যতম। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা হইতে একাধিক মোঙ্গোলীয় জন যে প্রাচীনকালে বাঙালীর জনপ্রবাহে রক্তধারা মিশাইয়াছে, এ কথা আগেই উল্লেখ করিয়াছি। বস্তুত, বাঙলা ও আসামের প্রাচীন ইতিহাসে ঐ অঞ্চল হইতে একাধিক সমরাভিযান ব্রহ্মপুত্র-করতোয়া অতিক্রম করিয়া বাঙলাদেশে বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার স্বল্পকালস্থায়ী উত্তর-বঙ্গ ও কর্ণসুবর্ণাধিকার তাহার একটিমাত্র দৃষ্টান্ত।

আর-এক বর্মণ রাজবংশ একাদশ ও দ্বাদশ শতকে পূর্ববঙ্গে প্রায় পাঁচ-ছয় পুরুষ ধরিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, এই বর্মণেরা বাঙলার দক্ষিণে কোন প্রদেশ, সম্ভবত উড়িষ্যা বা অন্ধ্রদেশ হইতে আগত। কিন্তু যে ভিন্নপ্রদেশাগত রাজবংশ বাঙলাদেশে আসিয়া প্রায় দুই শত বৎসর ধরিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং বাঙালীর সমসাময়িক সমাজবিন্যাসকে আমূল বদলাইয়া স্মৃতি-শাসনের রূপান্তর ঘটাইয়া সমাজের উচ্চস্তরে নূতন এক সমাজবিন্যাস গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, সেই সেন-রাজবংশের কথা এই প্রসঙ্গে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই সেন-রাজারা নিজেদের পরিচয় দিয়াছেন "কর্ণাট-ক্ষত্রিয়" বলিয়া। তাঁহারা যে দক্ষিণ-ভারতের কর্ণাটদেশ হইতে আসিয়াছিলেন, এ কথা আজ সর্বজনবিদিত। কর্ণাটদেশবাসী চালুক্য রাজবংশ একাদশ শতকে বাঙলা ও বিহারে একাধিক সমরাভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন; এইসব অভিযানের সঙ্গে যে-সব সৈন্যসামন্তরা আসিয়াছিলেন, তাঁহারাই যে পরবর্তী কালে ত্রিহুত ও নেপালে "কর্ণাটক" রাজবংশ, রাঢ়ে ও বঙ্গে "কর্ণাটক্ষত্রিয়" রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এ অনুমান ইতিহাস-সম্মত। সেন-রাজারা সাধারণত বৈবাহিক আদান-প্রদান ভিন্নপ্রদেশের রাজবংশের সঙ্গেই করিতেন—রাজারাজড়া তো তাহা করিয়াই থাকেন; কিন্তু এ কথাও সত্য যে, দুই শত বৎসরে তাঁহারা একেবারে বাঙালী বনিয়া গিয়াছিলেন এবং বাঙালীর জনপ্রবাহে নিজেদের বিলীন করিয়া দিয়াছিলেন। কর্ণাটদেশের উচ্চবর্ণের লোকেরা তো জন হিসাবে মোটামুটি গোলমুণ্ড, উন্নতনাস অ্যালপাইন পরিবারভুক্ত; উচ্চবর্ণের বাঙালীরাও তাহাই। কাজেই, কর্ণাট-ক্ষত্রিয় সেন-রাজবংশ বাঙলাদেশে এমন নূতন কোনও রক্তধারা বহন করিয়া আনেন নাই যাহা বাঙলাদেশে ছিল না; আনিলেও সে ধারা এত ক্ষীণ ও শীর্ণ যে, বেগবান স্রোতপ্রবাহে কোথায় যে তাহা মিশিয়া গিয়াছে, আজ আর তাহা ধরা পড়িবার উপায় নাই।

তুর্কীবিজয়ের পরও বাঙলাদেশে এই ধরনের শীর্ণ রক্তধারার স্পর্শ কিছু কিছু লাগিয়াছে। ভারতবর্ষের বাহির হইতে যেটুকু আসিয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত দুই-চারিটি

দেওয়া যায়। কিছু কিছু আরবী মুসলমান পরিবার বাণিজ্যব্যপদেশে বাঙলাদেশে আসিয়া বসবাস করিয়াছে; নোয়াখালি-চট্টগ্রাম অঞ্চলে এবং বাঙলার অন্যান্য জেলায়ও স্বল্পসংখ্যায় ইহাদের দর্শন মেলে। শতাব্দীর পর শতাব্দীর আবর্তে ইহারা বাঙালী মুসলমানদের সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছে। নেগ্রিটো-রক্তসংপৃক্ত হাবসীদের কথাও বলা যায়; বাঙলাদেশে প্রায় পাঁচ-ছয়জন হাবসী সুলতান বহুদিন ধরিয়া রাজত্ব করিয়াছেন। তাহা ছাড়া দিল্লী-আগ্রার অনুকরণে এ দেশেও হাবসী প্রহরী রাখার চলন কিছু কিছু ছিল। ইহারাও বাঙালীর রক্তেই নিজেদের রক্ত মিশাইয়াছে; তাহার ক্বচিৎ নিদর্শন হঠাৎ চোখে পড়িয়া যায় বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের উচ্চস্তরেও। কৃষ্ণ বর্ণ, প্রশস্ত নাসা, ঊর্ণাবৎ রুক্ষ কেশ, পুরু উলটানো ঠোঁট দেখিয়া হঠাৎ চমক লাগিয়া যায়। আরাকানী মগ প্রভাবও উল্লেখ করা যায়। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে পর্তুগীজ ও মগ জলদস্যুর উৎপাতে বাঙলার সমুদ্র-উপকূলশায়ী জেলাগুলি পর্যুদস্ত হইয়াছিল; ইহারা চুরি-ডাকাতি করিয়া মেয়ে ধরিয়া লইয়া আসিত আরাকান প্রভৃতি অঞ্চল হইতে এবং এ দেশ হইতে বাহিরে লইয়া যাইত। এইসব মেয়ে বিক্রয় করাই ছিল ইহাদের ব্যাবসা। বরিশাল, খুলনা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি প্রভৃতি স্থান ছিল এই ব্যাবসার কেন্দ্র। এইভাবে কিছু কিছু মগরক্তও বাঙালীর রক্তপ্রবাহে সঞ্চারিত হইয়াছে। "ভরার মেয়ে"র যে গীত ও প্রবাদ-কাহিনী আমাদের দেশে প্রচলিত তাহা বোধ হয় নিরর্থক স্বপ্নকল্পনা মাত্র নয়। এইভাবেই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বাঙলাদেশে জাতি-সমন্বয় চলিয়াছে, চলিতেছে এবং সমগ্র জীবনপ্রবাহকে মর্মান্বিত গতি ও রূপ দান করিতেছে।

৫

জন ও ভাষাতত্ত্ব

এ-পর্যন্ত বাঙালীর জনতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া যাহা পাওয়া গেল ভাষাতত্ত্বের বিশ্লেষণের মধ্যে তাহার সমর্থন কতটুকু পাওয়া যায়, তাহা এখন দেখা যাইতে পারে। এ চেষ্টা আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একাধিকবার সার্থকভাবেই করিয়াছেন; তবু মনে হয়, জনতত্ত্ববিশ্লেষণ-লব্ধ তথ্যের দিকে দৃষ্টি আর-একটু সজাগ রাখিয়া বাঙলাদেশের জন ও ভাষাপ্রবাহের আলোচনা এবং পরস্পর-সম্বন্ধ-নির্ণয়ের অবকাশ এখনও যথেষ্ট আছে। বস্তুত, পশিলুস্কি, ব্লক, লেভি, বাগচী ও চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যেদিকে গবেষণার সূত্রপাত করিয়াছেন, সেদিকে সমস্ত সম্ভাবনা এখনও নিঃশেষিত হয় নাই। বাঙলাদেশের ভৌগোলিক সংস্থান ও গ্রাম্য জীবনের সমস্ত খুঁটিনাটির জ্ঞান লইয়া প্রবোধবাবু ও সুনীতিবাবুর ইঙ্গিতগুলি ফুটাইয়া তোলার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে এবং আমার বিশ্বাস

সেই ফলাফলগুলি জনতত্ত্ব গবেষণার ফলাফলের সঙ্গে যোগ করিলে বাঙালীর সমাজ ও সংস্কৃতির অনেক রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইবে।

ভারতবর্ষ ও পূর্ব-দক্ষিণ এশিয়ার দেশ ও দ্বীপপুঞ্জগুলির বিচিত্র ভাষার সুদীর্ঘ ও সুবিস্তৃত গবেষণার ফলে আজ এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে, আনাম, মালয়, তালৈঙ্, খাসিয়া, কোল (অথবা মুণ্ডা), সাঁওতাল, নিকোবর, মালাক্কা প্রভৃতি ভূমির বিচিত্র বিভিন্ন অধিবাসীরা যে-সব ভাষায় কথা বলে, তালৈঙ্ ও খ্‌মের গোষ্ঠীর প্রাচীন সাহিত্য যে-সব ভাষায় রচিত সেই ভাষাগুলি একই পরিবারভুক্ত। এই সুবৃহৎ ও সুবিস্তৃত ভাষা-পরিবারের পুরাতন নাম অস্ট্রো-এশীয়, আধুনিক নামকরণ অস্ট্রিক। একটু মনঃসংযোগ করিলেই ধরা পড়িবে, এইসব অধিবাসীরা সকলই জন হিসাবে একই গোষ্ঠীর নয়; আনাম বা মালয়-মালাক্কা অঞ্চলে অস্ট্রেলয়েড্ রক্তের সঙ্গে মোঙ্গোলীয় রক্তের বহুল সংমিশ্রণ হইয়াছে, অথচ কোল অথবা সাঁওতালদের মধ্যে মোঙ্গোলীয় প্রবাহ নাই, কিন্তু আদি-অস্ট্রেলয়েড্ রক্তে অন্য জাতির রক্তপ্রবাহ কমবেশি সঞ্চারিত হইয়াছে। খাসিয়াদের তো মোটামুটি মোঙ্গোলীয়-রক্তবহুলই বলা চলে। ইহা হইতে স্বতঃই অনুমান হয়, ঐ-সব ভূখণ্ডে সন্ধান-সম্ভাব্য আদিমতম স্তরে সর্বত্রই অস্ট্রিক ভাষার প্রচলন ছিল এবং যাহাদের মধ্যে ছিল তাহাদের পরিচয় যতটা পাওয়া যায়, তাহা হইতে দেখা যাইবে, ইহারা প্রায় সকলেই আদি-অস্ট্রেলীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত, যেমন মুণ্ডা, কোল ও সাঁওতালেরা, ভূমিজ ও শবরেরা, মালয় ও আনাম অঞ্চলের অধিবাসীরা, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের লোকেরা। পরবর্তী কালে ইহাদের মধ্যে কমবেশি অন্য জনের রক্তসংমিশ্রণ হয়তো অনেক ক্ষেত্রেই হইয়াছে, এমনকি অনেক জায়গায় নূতন কোনও জন তাহাদের একেবারে আত্মসাৎ হয়তো করিয়া ফেলিয়াছে, যেমন করিয়াছে মালয়ে, আনামে, নিম্ন ব্রহ্মে যেখানে তালৈঙ্-ভাষাভাষী লোকের বাস, প্রভৃতি জায়গায়; কিন্তু পুরাতন জনের ভাষা তাহারা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে এবং নানা জন-বিবর্তনের ভিতর দিয়াও সেই ভাষাপ্রবাহ আজ পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। উপরোক্ত তথ্য হইতে আর-একটি তথ্য ধরা পড়ে যে, এই অস্ট্রিক ভাষা এক সময় মধ্য-ভারত হইতে আরম্ভ করিয়া সাঁওতাল-ভূমি, আসাম, নিম্ন ব্রহ্ম, মালয়, আনাম, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি সমস্ত ভূখণ্ডে বিস্তৃত ছিল। লক্ষণীয় ইহাই যে, এই-সমস্ত ভূখণ্ডই এক সময়ে আদি-অস্ট্রেলীয়দের বাসভূমির অন্তর্ভুক্ত ছিল। বলিয়াছি, উপরোক্ত ভাষাগুলি সবই অস্ট্রিক পরিবারের; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই এ কথাও বলা উচিত ছিল যে, এক পরিবারভুক্ত হইলেও ইহাদের মধ্যে আত্মীয়তার তারতম্য আছে; যেমন, তালৈঙ্, মন্-খ্‌মেরের সঙ্গে কোলগোষ্ঠীর আত্মীয়তা বেশি, খাসিয়ার সঙ্গে নিকোবরীর। কোল-মুণ্ডা খুব সম্পন্ন গোষ্ঠী; সাঁওতালী, মুণ্ডারী, ভূমিজ, হো, কোড়ো, অসুরী, খাড়িয়া, জুয়াং, শবর, গদব প্রভৃতি সকল বুলিই এই গোষ্ঠীর এবং মধ্য-ভারতের পূর্বভাগ জুড়িয়া এইসব বুলিভাষী লোকদের বাস। আশ্চর্যের বিষয়,

ইহারা সকলেই আদি-অস্ট্রেলীয়। এই কারণেই অনুমান হয়, আদি-অস্ট্রেলীয়দের ভাষাই হয়তো ছিল যাহাকে আমরা এখন বলিতেছি অস্ট্রিক। যাহা হউক, এই ভূখণ্ডের দক্ষিণেই দ্রাবিড়ভাষী জনপদ এবং তাহার ফলে বলবত্তর দ্রাবিড়ভাষা কোলভাষার ভূখণ্ডে কোথাও কোথাও ঢুকিয়া পড়িয়াছে। অথচ, এ কথা আজকাল সর্বজনস্বীকৃত যে, দ্রাবিড় ভাষার সঙ্গে মুণ্ডার কোনও সম্বন্ধই নাই। আবার অন্যদিকে, উত্তরে হিমালয়ের সানুদেশে এমন কতগুলি বুলি আজও প্রচলিত যেগুলি ভোট-বর্মী গোষ্ঠীর ভাষা হইলেও তাহাদের এমন কতকগুলি লক্ষণ আছে যাহা মুণ্ডা ভাষারই বিশিষ্ট লক্ষণ। এই লক্ষণগুলি যে সেইসব দেশে এক সময়ে বহুল প্রচারিত মুণ্ডা বা অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষার লুপ্তাবশেষ, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। শতদ্রু উপত্যকার কনবারী বুলি হইতে আরম্ভ করিয়া নেপালের কনাষী, বুনান্, রংকস, দারমিয়া, চৌদাংসী বিয়াংসী, ধীমাশ প্রভৃতি বুলি পর্যন্ত প্রত্যেকটিতেই এই লুপ্তাবশেষ ধরা যায়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, অস্ট্রিক ভাষার বিস্তৃতি শুধু পূর্বোক্ত দেশগুলিতেই নয়, এক সময় উত্তর-ভারতের অনেক স্থলেই ছিল। পরবর্তী যুগে দ্রাবিড় ও আর্যভাষা পশ্চিম দিকে এবং ভোট-বর্মী ভাষা পূর্বদিকে এই ভাষাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া অধিকাংশ স্থলেই ইহাকে গ্রাস করিয়া একেবারে হজম করিয়া ফেলিয়াছে ; যে-সব ক্ষেত্রে তাহা পারে নাই, বা নানা প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক কারণে তাহা সম্ভব হয় নাই, সেই সব স্থানেই কোনও মতে দ্বীপের মতন আশ্রয়ের মধ্যে স্বল্পসংখ্যক লোকের বুলিতে আবদ্ধ হইয়া নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে।

উত্তর ও পূর্ব -ভারতে সর্বত্র (কাশ্মীরে, গুজরাতে, মহারাষ্ট্রে, কর্ণাটে, বিহারে উড়িষ্যায়, বাঙলায়, আসামে, হিন্দুস্থানে, রাজপুতনায়, পঞ্জাবে, সীমান্তপ্রদেশে, বিশেষভাবে গাঙ্গেয় উপত্যকায় সর্বত্র) আর্যভাষার প্রবল প্রতাপ। এই আর্যভাষাই আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির বাহন। এই আর্যভাষার প্রধান রূপ সংস্কৃত, যাহা প্রাকৃতজনের মধ্যে প্রাকৃত। এই প্রাকৃত-সংস্কৃতের অপভ্রংশ হইতে বর্তমান উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম -ভারতের প্রাদেশিক ভাষাগুলির উৎপত্তি। বাঙলা ভাষা তাহার মধ্যে অন্যতম। এখন, যদি এ কথা প্রমাণ করা যায় যে, এই প্রাকৃত-সংস্কৃতের ভিতর অস্ট্রিক ভাষার শব্দ ও পদরচনারীতির প্রভাব আছে (হয় তাহা নিছক অস্ট্রিকরূপে, অথবা সংস্কৃত-করণের ছদ্মবেশে) তাহা হইলে বুঝিতে হইবে আর্যভাষাভাষী লোকদের আদিমতর স্তরে অস্ট্রিকভাষাভাষী লোকের বাস ছিল এবং এ তথ্যও ধরা পড়িবে যে, অস্ট্রিকভাষী লোকের যে বিস্তৃতি আমরা আগে দেখিয়াছি তাহাপেক্ষাও তাহাদের বিস্তৃতি আরও ব্যাপক আরও গভীর ছিল। ঠিক এই তথ্যটাই সুপ্রমাণিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস করিয়াছেন, পশিলুস্কি-ব্লক-লেভী-বাগচী স্টেনকোনো-চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি পণ্ডিতেরা। তাঁহাদের সুবিস্তৃত ও সুগভীর গবেষণার সকল কথা বলিবার প্রয়োজন নাই ; অনুসন্ধিৎসু পাঠক তাহা দেখিয়া লইতে পারিবেন। আপাতত এ কথা বলিলেই ইতিহাসের প্রয়োজন মিটিতে পারে যে, প্রাকৃতে-

সংস্কৃতে হয় অস্ট্রিকরূপে না-হয় সংস্কৃত-প্রাকৃতের ছদ্মবেশে, বিশুদ্ধ প্রাকৃত-সংস্কৃত ভাষায় ও প্রাদেশিক ভাষাগুলিতে এমন অসংখ্য শব্দ ঋগ্বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত প্রচলিত আছে, এমন ব্যাকরণ ও পদরচনারীতি আছে যাহা মূলে অস্ট্রিক ভাষা হইতে গৃহীত, এবং এই গ্রহণ সুপ্রাচীন কাল হইতে আরম্ভ করিয়া অপেক্ষাকৃত আধুনিক কাল পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। বাঙালীর ইতিহাসে এমন কতগুলি শব্দ ও রীতির উদ্ধার করা যাইতে পারে, যাহা একান্তভাবে না হউক অন্তত বহুলভাবে বাঙলাদেশে এবং বাঙলার সংলগ্ন দেশগুলিতেই প্রচলিত। সব নির্ধারিত শব্দ উদ্ধার করা সম্ভব নয়, তাহার তালিকা উল্লিখিত পণ্ডিতদের রচনায় পাওয়া যাইবে ; আমি শুধু সেইসব শব্দই উদ্ধার করিতেছি যেগুলির সঙ্গে বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ও প্রায় অবিচ্ছেদ্য।

আসামে ও বাঙলাদেশে এক কুড়ি, দুই কুড়ি, তিন কুড়ি, চার কুড়িতে (বিশ বা বিংশ নয়) এক পণ, অর্থাৎ ৮০টায় এক পণ গণনার রীতি প্রচলিত আছে। হাটে বাজারে পান, সুপারি, কলা, বাঁশ, কড়ি এমনকি ছোট মাছ ইত্যাদি দ্রব্যও এখনও এই-ভাবেই গণনা করিয়া ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। এই কুড়ি শব্দটি এবং এই গণনারীতিটি—দুইই অস্ট্রিক। সাঁওতালী ভাষায় উপুণ বা পুণ বা পণ কথাটির অর্থ ৮০ এবং সঙ্গে সঙ্গে ৪-ও। মূল অর্থ চার। অস্ট্রিকভাষাভাষী লোকদের ভিতর কুড়ি শব্দ মানবদেহের কুড়ি অঙ্গুলির সঙ্গে সম্পৃক্ত ; কুড়িই তাহাদের সংখ্যাগণনার শেষ অঙ্ক এবং কুড়ি লইয়া এক মান। কাজেই এক কুড়ি, দুই কুড়ি, তিন কুড়ি, চার কুড়িতে (৪×২০=৮০) এক পণ। এই অর্থে আশিও পণ, চারও পণ। এই পণও তাহা হইলে অস্ট্রিক শব্দ। আবার কুড়ি গোণ্ড বা গণ্ডাতে এক পণ (=৮০), এ-ও অস্ট্রিক ভাষারই গণনা। অর্থাৎ এক গোণ্ড বা গণ্ডাতে চার সংখ্যা ; প্রত্যেক কুড়িতে (৪×৫) পাঁচটি গোণ্ড। এই গোণ্ড বা গণ্ডই বাঙলায় গণ্ডা যাহা চার সংখ্যার সমান। চার কুড়িতে এক গণ্ডা। এই গণ্ডা হইতেই খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম-দ্বিতীয় শতকের প্রাকৃত মহাস্থান শিলালিপির গণ্ডকমুদ্রা। ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত এই গণ্ডকমুদ্রার প্রচলন বাঙলাদেশে ছিল। গণ্ডক শব্দের অভিধানগত অর্থই হইতেছে : ভাগ, একপ্রকার গণনারীতি, চার সংখ্যায় এক মান ধরিয়া গণনার রীতি, চার কুড়ি মূল্যের একপ্রকার মুদ্রা। দেখা গেল, এই-সমস্ত গণনা-পদ্ধতিটাই অস্ট্রিকভাষাভাষী লোকদের। আর কড়ি মুদ্রা যেখানে গণনা-ক্রমে এতটা স্থান অধিকার করিয়া আছে, সেখানে ইহা তো সহজেই অনুমেয় যে, এই গণনাপদ্ধতি আদিম ভারত ও বৃহত্তর ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্যসমৃদ্ধ সভ্যতার সৃষ্টি। বাঙলা গুঁড়ি বা গুঁড়া ও গুঁটি, এই শব্দগুলিও গোণ্ড বা গণ্ডা শব্দ হইতে উদ্ভূত।

বাঙলা খাঁ খাঁ (করে ওঠা), খাঁখার (দেওয়া), বাঁখারি (বাখারি বা চেড়া বাঁশ), বাদুড়, কানি (ছেঁড়া কাপড়ের টুকরা), জাং (জঙ্ঘা), ঠেঙ (গোড়ালি হইতে হাঁটু

পর্যন্ত পায়ের অংশ) ঠোঁট, পাগল, বাসি, ছাঁচ, ছাঁচতলা, ছোক্কা, কাঁদ (চুন), ছোট, পেট, খোস (পুরাতন বাঙলায় কচ্ছ্‌), ঝোড় বা ঝাড়, ঝোপ, পুরাতন বাঙলায় চিখিল (কাদা), ডোম (প্রাচীন বাঙলার ডোম্ব-ডোম্বী), চোঙ্‌, চোঙ্গা, মেড়া (=ভেড়া), বোয়াল (মাছ), করাত, দা' বা দাও, বাইগণ (বেগুন=সংস্কৃত বাতিঙ্গন, বাতিগণ), পগার (জলময় গর্ত বা প্রণালী), গড়, বরজ (পানের), লাউ, লেবু-লেম্বু, কলা, কামরাঙ্গা, ডুমুর প্রভৃতি সমস্ত শব্দই মূলত অস্ট্রিকগোষ্ঠীর ভাষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ। বাঙলার প্রাচীন জনপদ-বিভাগের মধ্যে পুণ্ড-পৌণ্ড্র, তামলিত্তি-তাম্রলিপ্তি-দামলিপ্ত এবং বোধ হয় গঙ্গা (নদী) ও বঙ্গ—এই দুটি নামও এই একই অস্ট্রিকগোষ্ঠীর ভাষার দান। কপোতাক্ষ ও দামোদর, অন্তত এই দুটি নদীর নামও কোল কব-দাক্‌ এবং দাম-দাক্‌ হইতে গৃহীত। কোল দা বা দাক্‌=জল এবং দা বা দাক্‌ হইতেই সংস্কৃত উদক। অস্ট্রিকভাষাভাষী লোকেরা নিজেদের ভাষার কথা দিয়াই দেশের পাহাড় পর্বত নদনদী গ্রাম জনপদ ইত্যাদির নামকরণ করিয়াছিল, এই অনুমানই তো যুক্তি ও ইতিহাস-সম্মত। তাহার কিছু কিছু চিহ্ন এখনও বাঙলা বুলিতে লাগিয়া আছে, যেমন শিয়ালদহ বা শিয়াল-দা, ঝিনাইদহ বা ঝিনাই-দা, বাঁশদহ বা বাঁশ-দা (দহ=জলভরা গর্ত, নদীগর্ভের গর্ত) ; মুণ্ডা ঢেঙ্কি= বাঙলা ঢেঁকি, মুণ্ডা মোটো=বাঙলা মোটা। লেভি সাহেব তো বলেন, পুলিন্দ=কুলিন্দ, মেকল-উৎকল, উণ্ড্র-পুণ্ড্র-মুণ্ড, কোসল-তোসল, অঙ্গ-বঙ্গ, কলিঙ্গ-তিলিঙ্গ এবং সম্ভবত তক্কোল-কক্কোল, অচ্ছ-বচ্ছ, এই ধরনের জাতিবাচক যমজ নামকরণ পদ্ধতিটাই অস্ট্রিক। তাঁহার বচনটি উদ্ধৃতির যোগ্য—

"Pulinda-Kulinda, Mekala-Utkala (with the group Udra-Pundra-Munda), Kosala-Tasala, Anga-Vanga, Kalinga-Tilinga form the links of a long chain which extends from the eastern confines of Kashmir up to the centre of the peninsula. The skeleton of the "ethnical system" is constituted by the heights of the central plateau; it participates in the life of all the great rivers of India except the Indus in the west and Kaveri in the south. Each of these groups forms a binary whole, each of these binary rasites is united with another member of the system. In each ethnic pair the twin bears the same name, differentiated only by the initial K and T; K and P; zero and V, or M or P. This process of formation is foreign to Indo-European; it is foreign to Dravidian; it is on the contrary characteristic of the vast family of languages which are called Austro-Asiatic, and which cover in India the group of the Munda languages, often called also Kolarian."

"আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প" (অষ্টম শতক) নামক গ্রন্থে এই ভাষাগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটি মন্তব্য আছে এবং সম্ভবত প্রচলনস্থান সম্বন্ধেও একটু ইঙ্গিত আছে। তাহা এই

প্রসঙ্গে উদ্ধার করা যাইতে পারে। এই গ্রন্থের মতে কামরাঙ্গা ফলের উৎপত্তিস্থান ছিল কর্মরঙ্গাখ্যদ্বীপে (=য়ুয়ানচোয়াঙের কামলঙ্ক, চীনা গ্রন্থের লংকীয়া, লংকীয়া-সু,), নাড়িকের দ্বীপে (নারিকেল দ্বীপ), বারুসকদ্বীপে (বর্তমান, বারোস্), নগ্নদ্বীপ (বর্তমান, নিকোবর) বলিদ্বীপ এবং যবদ্বীপে। এইসব দ্বীপের ভাষা, 'র'-কার-বহুল, অস্ফুট, অব্যক্ত (অস্পষ্ট বা দুর্বোধ্য?) এবং নিষ্ঠুর (কর্কশ, রূঢ়)।

কর্মরঙ্গাখ্যদ্বীপেষু নাড়িকের সমুদ্ভবে।
দ্বীপে বারুসকে চৈব নগ্ন বলি সমুদ্ভবে॥
যবদ্বীপে বা সত্ত্বেষু তদন্যদ্বীপসমুদ্ভবা।
বাচা রকারবহুলা তু বাচা অস্ফুটাং গতা॥
অব্যক্তা নিষ্ঠুরা চৈব সক্রোধপ্রেতযোনীষু।

যে বৈশিষ্ট্যের কথা "মঞ্জুশ্রীমূলকল্পে"র লেখক উল্লেখ করিয়াছিলেন, আর্যভাষার দৃষ্টিভঙ্গি হইতে অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষা সম্বন্ধে তাহা বলা কিছু অযৌক্তিক নয়। অস্ট্রিক ভাষায় 'ল' ও 'র'র বাহুল্য সত্যই লক্ষ করিবার মতো। এই অসুর ভাষাভাষী লোকদেরই ঋগ্বেদে 'অসুর' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে বলিয়া মনে করিলে অন্যায় হয় না।

"আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প"-গ্রন্থের আর-একটি সাক্ষ্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থকারের মতে বঙ্গ, সমতট, হরিকেল, গৌড় ও পুণ্ড্রের লোকেরা অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর বঙ্গের লোকেরা 'অসুর'-ভাষাভাষী: "অসুরানাং ভবেৎ বাচা গৌড়পুণ্ড্রোদ্ভবা সদা"। কোল-মুণ্ডা গোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান বুলির নাম এখনও 'অসুর' বুলি; কাজেই এই বুলিই এক সময় গৌড়ে-পুণ্ড্রে বহুলপ্রচলিত ছিল, এ অনুমান সহজেই করা চলে। মধ্য-ভারতের পূর্বখণ্ডে যে-সব লোকেরা অসুর বুলিতে কথা বলিত তাহারা আদি-অস্ট্রেলীয় পরিবারের লোক, সে-সম্বন্ধে সন্দেহ বোধ হয় নাই। গৌড়-পুণ্ড্রে আদিমতর স্তরেও এই আদি-অস্ট্রেলীয়দের বিস্তৃতি ছিল, এ কথাও নরতত্ত্ববিশ্লেষণ হইতে আগেই জানা গিয়াছে। ভাষার সাক্ষ্য হইতেও তাহা অনেকটা পরিষ্কার হইল। "মঞ্জুশ্রীমূলকল্পে"র গ্রন্থকার তাহা পরিষ্কার করিয়াই বলিলেন। আসামেও যে প্রাচীনতর কালে এই 'অসুর'-ভাষাভাষী লোকের বিস্তৃতি ছিল, তাহা অনুমানেরও একটু কারণ আছে। কাম-রূপের বর্মণ রাজবংশের আদিপুরুষ সকলেই 'অসুর' বলিয়া পরিচিত; অন্তত, সপ্তম শতকের রাজারা তাঁহাদের পূর্বপুরুষদের অসুর বলিয়াই জানিতেন এবং মহিরাঙ্গ অসুর, দানবাসুর, হাটকাসুর, সম্বরাসুর, রত্নাসুর, নরকাসুর প্রভৃতি পূর্বপুরুষদের বংশধর বলিয়াই নিজেদের পরিচয় দিয়াছেন। ইঁহারা অসুর-ভাষাভাষী ছিলেন বলিয়াই কি ইঁহাদের নামে তাহার চিহ্ন থাকিয়া গিয়াছে?

আর-একটি প্রাচীনতর সাক্ষ্য উদ্ধৃত করিয়াই এই অস্ট্রিক আদি অস্ট্রেলীয় প্রসঙ্গ শেষ করিব। জৈনদের "আচারাঙ্গসূত্র"-গ্রন্থে উল্লেখ আছে, মহাবীর (খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ

শতক) যখন পথহীন লাঢ় (রাঢ়দেশ), বজ্‌জভূমি ও সুব্‌ভভূমিতে (মোটামুটি, দক্ষিণ-রাঢ়) প্রচারোদ্দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন এইসব দেশের অধিবাসীরা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল। কতকগুলি কুকুরও সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে কামড়াইতে আরম্ভ করে, কিন্তু কেহই এই কুকুরগুলিকে তাড়াইয়া দিতে অগ্রসর হয় নাই। বরং লোকেরা সেই জৈন ভিক্ষুকে আঘাত করিতে আরম্ভ করে এবং ছু ছু (খুক্‌খু) বলিয়া চীৎকার করিয়া তাঁহাকে কামড়াইবার জন্য কুকুরগুলিকে লেলাইয়া দেয়। বাঙলাদেশে এখনও লোকে কুকুর ডাকিবার সময় চু চু বা তু তু বলে। অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীতে কুকুরের প্রতিশব্দ হইতেছে 'ছক্' (খ্‌মের), 'ছুকে' (কোন্ টু), 'ছো' (প্রাচীন খ্‌মের), 'ছো' (আনাম, সেদাং, কাসেং), 'অছো' (তারেং), 'ছু' (সেমাং), 'ছুও', 'ছু-ও' (সাকেই)। এই তথ্য হইতে বাগচী মহাশয় মনে করেন যে, বাংলা চু চু বা তু তু মূলত অস্ট্রিকপ্রতিশব্দ হইতেই গৃহীত এবং চু চু বা তু তু সংস্কৃত কুকুরার্থক বাঙলা দেশজ শব্দ; ওটা শুধু ধ্বন্যাত্মক ডাক মাত্র নয়, চু চু বা তু তু বলিতে কুকুরই বুঝায়। এ অনুমান সত্য হইলে রাঢ়ে-সুহ্মে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহাও স্বীকার করিতে হয়। আর, ছিল যে তাহার অন্য প্রমাণ, এই দুই ভূখণ্ডে এখনও অস্ট্রিকভাষাভাষী পরিবারভুক্ত অনেক সাঁওতাল ও কোলদের বাস দেখিতে পাওয়া যায়।

অস্ট্রিক ভাষা হইতে যেমন, ঠিক তেমনই দ্রাবিড় ভাষা হইতেও আর্যভাষা সংস্কৃতে-প্রাকৃতে অপভ্রংশে অনেক শব্দ, পদরচনা ও ব্যাকরণ-রীতি ইত্যাদি ঢুকিয়া পড়িয়াছে। আর্যভাষাভাষী লোকেরা যে দ্রাবিড়ভাষাভাষী লোকদের সংস্পর্শে আসিয়াছিল, এই তথ্য তাহার প্রমাণ। সংস্কৃত ভাষা বিকাশের বিভিন্ন স্তরে এবং প্রাকৃত-অপভ্রংশ হইতে উদ্ভূত বাঙলা ভাষায় এই দ্রাবিড় স্পর্শ কোন্ দিকে কতখানি লাগিয়াছে, তাহার ইঙ্গিত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দিয়াছেন কতকটা বিস্তৃতভাবেই। এখানে তাঁহার সকল কথা বলিবার প্রয়োজন নাই; অনুসন্ধিৎসু পাঠক তাহা দেখিয়া লইতে পারেন। তাঁহার বহু শ্রম ও বহু মনন -লব্ধ গবেষণার ফলাফল আজ প্রায় সর্বজনস্বীকৃতি লাভ করিয়াছে; এই গৌরব সমগ্র বাঙালী জাতির। বক্ষ্যমাণ বিষয়ে তাঁহার বক্তব্য এই :

"Is there any evidence about the class of speech that prevailed in Bengal before the coming of the Aryan tongue? There is, of course, the presence of Kol and Dravidian (the Santals, the Malers, the Oraons) in the western fringes of the Bengali area, and of the Boda and Mon-Khmer speakers in the northern and eastern frontiers There are, again, some unmistakably Dravidian affinities in Bengali phonetics, morphology, syntax and vocabulary; but these agreements with Dravidian are not confined to Bengali alone but are found in other NIA (New Indo-Aryan) also. Apart from that, local

nomenclature in Bengal may be expected to throw some light on the question. The study of Bengali toponomy is rendered extremely difficult from the fact that old names, when they were not Sanskrit, have suffered from mutilation to such an extent that it is often impossible to reconstruct their original forms; especially when they are non-Aryan. Fortunately for us Bengal inscriptions, from the 5th century onwards, like the inscriptions found elsewhere in India, and occasionally works written in pre-Moslem Bengal, have preserved old forms of some scores of these names. But it is a pity that generally there was an attempt to give these names a Sanskrit look."

তৎসত্ত্বেও এইসব লিপি হইতে অসংখ্য নাম ও প্রমাণ উদ্ধার করিয়া সুনীতিবাবু দেখাইয়াছেন যে, নামগুলিতে দ্রবিড় প্রভাব সুস্পষ্ট। তাঁহার সুদীর্ঘ তালিকা উদ্ধার করিতে গেলে প্রসঙ্গের বিস্তৃতি বাড়িয়া যাইবার আশঙ্কায় আমি আর তাহা করিলাম না। তিনি আরও বলেন,

"In the formation of these names, we find some words which are distinctly Dravidian; e. g. -jola, -jota, joti-jotika etc.; hitti, hitthi-vithi, -hist(h)i etc.; -gadda, -gaddi; pola-vola and probably also, -handa. -vada, -kunda, -kundi. and cavati, cavada etc.; and besides there are many others which have a distinct non-Aryan look. The last word, as in Pindara-viti-jotika, Uktara-jota (jota), Dharmmavo-jotika, Nada-joti, Camyala-joti, Sik (ph) -gadi-joti, meaning channel, water-course, river, water, is found in modern Bengal place-names. .. An investigation of place-names is Bengal, as in other parts of Aryan India, is sure to reveal the presence of non-Aryan speakers, mostly Dravidian, all over the land before the establishment of the Aryan tongue."

এই প্রসঙ্গে অসংখ্য প্রাচীন ও বর্তমান বাঙলাদেশের স্থানের নাম, নামের উপান্ত 'ড়া' (বাঁকুড়া হাওড়া রিষড়া, বগুড়া), 'গুড়ি' (শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি), জুলি (নয়নজুলি), জোল, (নাড়াজোল), জুড় (ডোমজুড়), ভিটা, কুণ্ড প্রভৃতি শব্দ উদ্ধার করিয়া তিনি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছেন যে, ইহারা দ্রবিড় ভাষার।

কিন্তু, নরতত্ত্ববিদদের কাছে এই দ্রবিড়ভাষাভাষী লোকদের সমস্যা বড় জটিল। সাম্প্রতিক নরতাত্ত্বিক পরিভাষায় দ্রবিড় নরগোষ্ঠীর কোনও অস্তিত্বই নাই। দ্রবিড় ভাষার নাম; নরগোষ্ঠীর নয়। প্রাক্‌-আর্য যুগে এই দ্রবিড়ভাষাভাষী লোক কাহারা ছিল? ঐতিহাসিক যুগে দামিল-দ্রমিল-তামিল জাতির লোকদের ভাষা দ্রবিড় সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহারা কাহাদের বংশধর?

পূর্বে নরতত্ত্ব বিশ্লেষণে দেখা গিয়াছে, আদি-অস্ট্রেলীয় নরগোষ্ঠীর পর একে একে তিনটি দীর্ঘমুণ্ড জাতি ভারতবর্ষের জনপ্রবাহে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। ইহাদের মধ্যে দ্বিতীয় ধারাটি পাঞ্জাব অতিক্রম করিয়া পূর্বে বা দক্ষিণে বোধ হয় আর অগ্রসর হইতে পারে নাই। প্রথম ধারাটি মধ্য ও দক্ষিণ-ভারতে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল এবং সেখানে পূর্বতন আদি-অস্ট্রেলীয়দের সঙ্গে তাহাদের খানিকটা সংমিশ্রণও ঘটিয়াছিল। তৃতীয় ধারাটির সঙ্গে সুমেরীয়-আসীরীয়-বাবলনীয় প্রভৃতি ভূমধ্যনরগোষ্ঠীর সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ এবং এই ধারাটিই হরপ্পা, মহেন-জো-দড়োর প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু-সভ্যতার জননী। ইহারা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল উত্তর-ভারতের সর্বত্র ; তবে উত্তর-পূর্ব ভারতে গঙ্গা-যমুনার উপত্যকায় পূর্বতন আদি-অস্ট্রেলীয় কোল-মুণ্ডা-শবর-নিষাদ-অসুরদের বিস্তৃতি ও প্রতাপ প্রবলতর থাকায় ইহারা বিন্ধ্যাগিরি অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ-ভারতে ছড়াইয়া পড়িতে বাধ্য হয়। পরবর্তী কালে অ্যালপো-দীনারীয় ও আদি-নর্ডিক আর্যভাষাভাষী জাতির বিভিন্ন তরঙ্গাঘাতে উত্তর-ভারত হইতেও ইহারা ক্রমশ স্তরে স্তরে পূর্বে ও দক্ষিণে ছড়াইয়া পড়িতে বাধ্য হয়। এই প্রথম ও তৃতীয় ধারার দীর্ঘমুণ্ড দুইটি নরগোষ্ঠীর সমন্বয়ে যে-জন গড়িয়া উঠে তাহারাই খুব সম্ভব দ্রাবিড়ভাষাগোষ্ঠীর বর্তমান তামিল-তেলুগু-মালয়ালী-ভাষাভাষী লোকদের পূর্বপুরুষ। তবে, সিন্ধুনদের নিম্ন-উপত্যকায় বেলুচিস্থানের দ্রাবিড়ভাষী ব্রাহুইদের অস্তিত্ব হইতে অনুমান হয়, এই দ্রাবিড় ভাষা ছিল সিন্ধু-উপত্যকাস্থিত তৃতীয় ধারার দীর্ঘমুণ্ড নরগোষ্ঠীর ভাষা ; অবশ্য এই অনুমান যথেষ্ট সিদ্ধ বলিয়া কিছুতেই গণ্য হইতে পারে না। যাহাই হউক, বাঙলাদেশে দ্রাবিড় ভাষার প্রচলনের দায়িত্ব প্রধানত এই দুই ধারার দীর্ঘমুণ্ড নরগোষ্ঠী দুইটির।

অ্যাল্‌পো-দীনারীয় জাতির লোকেরা আর্যভাষাভাষী, কিন্তু তাহাদের ভাষার স্বরূপ কী ছিল, তাহা সঠিক বলিবার উপায় প্রায় নাই বলিলেই চলে। গ্রীয়ার্সন সাহেব গুজরাত, মহারাষ্ট্র, মধ্যভারত, উড়িষ্যা, কতকাংশে বিহার, বঙ্গদেশ ও আসামের Outer Aryans বা বেদ-বহির্ভূত যে-সব আর্যভাষাভাষী লোকদের কথা বলেন এবং বৈদিক আর্যভাষা হইতে উদ্ভূত সিন্ধু-গঙ্গা উপত্যকার হিন্দী, রাজস্থানী প্রভৃতি ভাষা হইতে পৃথক্ গুজরাতী, মারাঠী, ওড়িয়া, বাঙলা, অহমীয়া প্রভৃতি আর্যভাষার যে-কথা ইঙ্গিত করেন তাহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে বাঙলা, মারাঠী, ওড়িয়া, গুজরাতী, অহমীয়া ইত্যাদি ভাষার মূল, প্রধান ও বিশিষ্ট রূপই যে অ্যাল্‌পো-দীনারীয় জাতির ভাষারূপ তাহা অস্বীকার করিবার উপায় থাকে না। কারণ, গ্রীয়ার্সনের এই "Outer Aryans" যে অ্যালপাইন জাতিরই অন্যতম শাখা রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় বহুদিন আগেই তাহা সুপ্রমাণ করিয়াছেন এবং নরতত্ত্ববিদেরা প্রায় সকলেই তাহা স্বীকার করেন।

মোঙ্গোলীয় ভোট-ব্রহ্ম ভাষার প্রভাব প্রাচীন অথবা বর্তমান বাঙলায় প্রায় নাই বলিলে খুব অযৌক্তিক হয় না। নরতত্ত্বের দিক হইতে মোঙ্গোলীয় রক্তপ্রবাহ বাঙালীর

মধ্যে যেমন ক্ষীণ ও শীর্ণ মোঙ্গোলীয় ভাষা-প্রভাবও তাহাই। তবে উত্তরতম ও পূর্বতম প্রান্তের মোঙ্গোলস্পৃষ্ট লোকদের ভিতর চলতি বুলিতে কিছু ভোট-ব্রহ্ম শব্দের সন্ধান পাওয়া যায়। আর, অন্তত একটি নদীর নাম যে ভোট-ব্রহ্ম ভাষা হইতে গৃহীত তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায়; এই নদীটি দিস্তাং বা তিস্তা যাহার পরবর্তী সংস্কৃত রূপ ত্রিস্রোতা।

যাহা হউক, অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও বেদ-বহির্ভূত আর্যভাষা-প্রবাহের উপর তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া ভাঙিয়া পড়িল বৈদিক আর্যভাষা-প্রবাহের প্রবল স্রোত। একদিনে নয়, দু-দশ বৎসরে নয়, শত শত বৎসর ধরিয়া এবং কালে কালে ক্রমে ক্রমে এই ভাষা সমস্ত পূর্বতন ভাষা-প্রবাহকে আত্মসাৎ করিয়া তাহাদের নবরূপ দান করিয়া, তাহাদের সংস্কৃতীকরণ সাধন করিয়া নিজের এক স্বতন্ত্র রূপ গড়িয়া তুলিল। তাহার ফলে যে সংস্কৃত ভাষার বিকাশ হইল তাহাতে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় শব্দ, পদরচনারীতি, ব্যাকরণ-পদ্ধতি সমস্তই কিছু কিছু ঢুকিয়া পড়িল। সাম্প্রতিক কালে শব্দ ও ভাষা-তাত্ত্বিকেরা তাহা অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিতেছেন। বাঙলাদেশেও তাহার প্রচলন হইল, কিন্তু দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শতকের সংস্কৃত লিপিগুলিতে দেখা যাইবে, সেই সংস্কৃত ভাষায়ও এমন সব শব্দের দেখা পাওয়া যাইতেছে, এমন ব্যাকরণ-বৈশিষ্ট্যের দর্শন মিলিতেছে যাহা বাঙলার বাহিরে দেখা যায় না; 'বরজ', 'ডালিম্ব' (সংস্কৃত দাড়িম্ব নয়), 'লগ্‌গাবয়িত্বা' (লাগাইয়া অর্থে) ইত্যাদি তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত মাত্র।

একান্তভাবে ভাষার দিক হইতে এই আর্যীকরণ সম্বন্ধে সুনীতিকুমার যাহা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধারযোগ্য। এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই উদ্ধৃতির ভিতর আর্য বা অনার্য বলিতে তিনি আর্য ভাষা ও অনার্য ভাষাকেই বুঝাইতেছেন; যেখানে আর্য বা অনার্য নরগোষ্ঠী বলিতেছেন, সেখানেও আমি আর্য বা অনার্য-ভাষাভাষী নরগোষ্ঠী হিসাবেই বুঝিতেছি, কারণ, আমি আগেই বলিয়াছি, নরতত্ত্বের দিক হইতে আর্য-নরগোষ্ঠী বা দ্রাবিড়-নরগোষ্ঠী—এই ধরনের কথা ব্যবহার করা অযৌক্তিক। অ্যালপো-দীনারীয় নরগোষ্ঠীর লোকেরাও আর্যভাষাভাষী, আবার আদি-নর্ডিকেরাও তাহাই; আর দ্রাবিড়ভাষাভাষী লোক-দের মধ্যে যে বিভিন্ন জন বিদ্যমান, সে-ইঙ্গিতও আগেই করিয়াছি। এই কথাটা যাহাতে আমরা বিস্মৃত না হই সেই জন্য বন্ধনীর ভিতর আমি তাহা উল্লেখ করিয়া দিতেছি।

"ভারতবর্ষের সু-সভ্য, অর্ধ-সভ্য ও অ-সভ্য, সব রকমের অনার্য [ভাষাভাষী] আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে আর্য [ভাষী]দের প্রথম সংস্পর্শ হয়তো বিরোধময়ই হইয়াছিল। কিন্তু অনার্য [ভাষাভাষী] ভারতে আর্য [ভাষী]দের উপনিবেশ স্থাপিত হইবার পর হইতেই উভয় শ্রেণীর মানুষ—অনার্য [ভাষী] ও আর্য [ভাষী]—পরস্পরের প্রতিবেশ-প্রভাবে পড়িতে থাকে। আর্য [ভাষী]রা বিদেশ হইতে আগত এবং পার্থিব সভ্যতায় তাহারা খুব উচ্চে ছিল না। আর্য [ভাষী]দের ভাষা আসিয়া দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক ভাষাগুলিকে হীনপ্রভ করিয়া

দিল ; উত্তর-ভারতের কোল ও দ্রাবিড়[ভাষী] অনার্য[ভাষী]দের মধ্যে ঐক্যবিষয়ক ভাষার অভাব ছিল, আর্য[ভাষী] নরগোষ্ঠীর বিজেতৃ-মর্যাদা লইয়া আর্যভাষা সে অভাব পূর্ণ করিল।...আর্য[ভাষী নরগোষ্ঠীর] ভাষা ও আর্য[ভাষী নরগোষ্ঠীর] ধর্ম—বৈদিক ধর্ম ও বৈদিক হোম-যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান—অনার্য [ভাষী]রা শিরোধার্য করিয়া লইল ; অনার্য[ভাষী] আর্য[ভাষী]র পুরোহিত-ব্রাহ্মণের শিক্ষাও মানিল। কিন্তু অনার্য-[ভাষী] নরগোষ্ঠীর ধর্ম মরিল না, তাহাদের ইতিহাস-পুরাণও মরিল না। ক্রমে অনার্য-[ভাষী নরগোষ্ঠীর ধর্ম ও অনুষ্ঠান পৌরাণিক দেবতাবাদে পৌরাণিক পূজাদিতে, যোগচর্যায়, তান্ত্রিক মতবাদে ও অনুষ্ঠানে আর্য[ভাষী]দের বংশধরদিগের দ্বারাও গৃহীত হইল। আর্য ও অনার্য [ভাষাভাষী নরগোষ্ঠী] এই টানা ও পড়িয়ান্ মিলাইয়া হিন্দু-সভ্যতার বস্ত্রবয়ন করা হইল।

"উত্তর-ভারতের গঙ্গাতীরের আর্য[ভাষী নরগোষ্ঠীর] সভ্যতার পত্তন এইরূপে হইল। এই সভ্যতায় আর্য[ভাষী নরগোষ্ঠী] অপেক্ষা অনার্য[ভাষী নরগোষ্ঠী]র দানই অনেক বেশি—কেবল আর্য[ভাষী]দের ভাষা ইহার বাহন হইল। আর্য-[ভাষী]দের আগমনের সময় হইতেই হইতেছিল ; গঙ্গাতীরবর্তী দেশসমূহে ইহা আরও অধিক পরিমাণে হইল।...বাঙলাদেশে আর্য-ভাষা লইয়া যখন উত্তর-ভারতের—বিহার ও হিন্দুস্থানের—লোকেরা দেখা দিল, যখন উত্তর-ভারতের মিশ্র আর্য-অনার্য[ভাষী নরগোষ্ঠী] সৃষ্ট ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ, জৈন মতবাদ বাঙ্গালাদেশে আসিল, তখন উত্তর-ভারতে মোটামুটি এক সংস্কৃতি ও এক জাত হইয়া গিয়াছে। রক্তের বিশুদ্ধি বোধহয় তখন কোনও আর্য[ভাষী] বংশীয়ের ছিল না।"

ভাষা-বিশুদ্ধিও যে ছিল আর্যভাষী নরগোষ্ঠীর তাহাও তো মনে হয় না।

৬

জনপ্রবাহ ও বাস্তব সভ্যতা

সংক্ষেপে জনতত্ত্ব ও ভাষাপ্রসঙ্গ লইয়া বাঙালীর গোড়াপত্তনের কথা বলা হইল। এইবার বাস্তব সভ্যতার উপাদান-উপকরণ এবং তাহার সঙ্গে বাঙালীর ও বাঙলাদেশের সম্বন্ধের একটা দিগ্‌দর্শন করিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে।

ভারতবর্ষ কৃষি-প্রধান দেশ। এই কৃষিই আমাদের প্রধান ধনসম্বল ; এবং উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যপাদ পর্যন্ত যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারা আমাদের দেশে চলিয়া আসিয়াছে তাহাকে যদি একান্তভাবে কৃষি-সভ্যতা ও সংস্কৃতি আখ্যা দেওয়া যায় তাহা হইলে খুব অন্যায় হয় না। বারিবহুল নদনদীবহুল সমতলপ্রধান বাঙলাদেশে উত্তর-ভারতের অন্য

প্রদেশাপেক্ষা কৃষির এক সমৃদ্ধতর রূপ দেখা যায়। এই কৃষিকার্য যে অস্ট্রিক-ভাষাভাষী আদি-অস্ট্রেলীয় লোকেরাই আমাদের দেশে প্রচলন করিয়াছিলেন, তাহা অনুমান করিবার কারণ আছে। প্রশিলুস্কি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছেন যে, 'লাঙ্গল' কথাটাই অস্ট্রিকভাষীদের ভাষা হইতে গৃহীত। আনামীয় ভাষায় এই 'লাঙ্গল' শব্দের মূলের অর্থ 'চাষ করা' এবং 'চাষ করিবার যন্ত্র' দুই বস্তুকেই বুঝায়। খুব প্রাচীনকালেই 'লাঙ্গল' শব্দটি আর্যভাষায় গৃহীত হইয়াছিল। ইহার অর্থ বোধহয় এই যে, আর্যভাষীরা চাষকার্য জানিতেন না এবং সেইহেতু যে-যন্ত্রদ্বারা চাষ করা হয় সে-যন্ত্রের সঙ্গেও তাঁহাদের পরিচয় ছিল না। এই দুইই তাঁহারা পাইয়াছিলেন মূলত অস্ট্রিকভাষাভাষী লোকদের নিকট হইতে। তীক্ষ্ণমুখ কাষ্ঠ-দণ্ড যন্ত্রের সাহায্যে প্রধানত যে বস্তুর চাষ এই অস্ট্রিকভাষী লোকেরা করিত তাহা ধান, এবং এই ধানই ছিল তাহাদের প্রধান খাদ্যবস্তু। অস্ট্রিকভাষী লোকেদের ভিতর যে কৃষিসভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হয়, সমতলভূমিতে ও স্তরে স্তরে পাহাড়ের গা কাটিয়া চাষের ব্যবস্থা করিয়া তাহারা বন্য ধানকে লোকালয়ের কৃষিবস্তু করিয়া লইয়াছিল এবং তাহাই ছিল তাহাদের প্রধান উপজীব্য। অস্ট্রিকভাষী লোকদের বিস্তৃতি ভারতবর্ষে যে যে স্থানে ছিল সর্বত্রই এই ধানচাষেরও প্রচলন হইয়াছিল; তবে বারিবহুল নদনদীবহুল সমতলভূমিতেই যে ধান বেশি জন্মাইত, ইহা তো খুবই স্বাভাবিক। সেইজন্যই আসামে, বাঙলাদেশে, ওড়িশায়, দক্ষিণ-ভারতের সমুদ্রশায়ী সমতল দেশগুলিতে তাহা প্রসারলাভ করিয়াছিল বেশি; উত্তর-ভারতে তত নয়। এখনও তাহাই। পরবর্তী কালে দ্রাবিড়ভাষী দীর্ঘমুণ্ড লোকেরা ভারতবর্ষে যব ও গমচাষের প্রচলন করে এবং যব ও গম উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশ বিহার পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। যব ও গম ধানের মতো তত বারিনির্ভর নয়; উত্তর-ভারতে এই দুই বস্তুর চাষের বিস্তৃতি অনেকটা সেই কারণেই। জন-বিস্তৃতি ও জলবায়ুর কারণ দুটি একত্র করিলেই বুঝা যাইবে, উত্তর-ভারতের লোকেরা কেন আজ পর্যন্তও সাধারণত রুটিভুক্ এবং বাঙলা-আসাম-ওড়িশা ও দক্ষিণ-ভারতের সমুদ্র-শায়ী সমতলভূমির লোকেরা কেন ভাত-ভুক্।

ধান ছাড়া অস্ট্রিকভাষী লোকেরা কলা, বেগুন, লাউ, লেবু, পান (বর), নারিকেল, জাম্বুরা (বাতাবি নেবু), কামরাঙা, ডুমুর, হলুদ, সুপারি, ডালিম ইত্যাদিরও চাষ করিত। এই কৃষিদ্রব্যের নামের প্রত্যেকটিই মূলত অস্ট্রিকগোষ্ঠীর ভাষা হইতে গৃহীত, এবং ইহার প্রত্যেকটিই বাঙালীর প্রিয় খাদ্যবস্তু। এইসব শব্দের সংস্কৃত-প্রাকৃত-অপভ্রংশ ও বাঙলা রূপ লইয়া যে-সব সুবিস্তৃত বিচার ও গবেষণা হইয়াছে তাহার মধ্যে ইতিহাসের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। আমি সেই শব্দতাত্ত্বিক আলোচনার বিস্তৃত পুনরুক্তির অবতারণা এখানে আর করিলাম না। কিন্তু চাষবাসের সঙ্গে ইহাদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হইলেও গো-পালন ইহারা জানিত বলিয়া মনে হয় না। বস্তুত, অস্ট্রিকভাষী লোকদের মধ্যে আজও গো-পালনের

প্রচলন কম ; যাহাদের মধ্যে আছে তাহারা পরবর্তী কালে আর্যভাষীদের নিকট হইতে তাহা গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। যতদূর সম্ভব, গো-পালন আর্যভাষীদের সঙ্গে জড়িত।

তবে, তুলার কাপড়ের ব্যবহারও অস্ট্রিকভাষীদের দান। কর্পাস (কার্পাস) শব্দটিই মূলত অস্ট্রিক। তাঁতী বা তন্তুবায়েরা যে প্রাচীন ও বর্তমান বাঙালী সমাজের নিম্নতর স্তরের ইহার মধ্যে কি তাহার কিছুটা কারণ নিহিত? পট (পট্টবস্ত্র, বাঙলা পট্, পাট), কর্পট (= পট্টবস্ত্র) এই দুটি শব্দও মূলত অস্ট্রিক ভাষা হইতে গৃহীত। মেড়া বা ভেড়ার সঙ্গে ইহারা পরিচিত ছিল। ভেড়ার লোম কি ইহারা কাজে লাগাইত? 'কম্বল' কথাটি কিন্তু মূলত অস্ট্রিক, এবং আমরা যে-অর্থে কথাটি ব্যবহার করি, সেই অর্থেই এই ভাষাভাষী লোকেরাও করে।

বুঝা গেল, অস্ট্রিকভাষী আদি অস্ট্রেলীয়েরা ছিল মূলত কৃষিজীবী। কিন্তু ইহাদের সবারই জীবিকা ছিল কৃষিকার্য, এ কথা বলা যায় না। কতকগুলি শাখা অরণ্যচারীও ছিল। এই অরণ্যচারী নিষাদ ও ভীল, কোল শ্রেণীর শবর, মুণ্ডা, গদব, হো, সাঁওতাল প্রভৃতিরা প্রধানত ছিল পশুশিকারজীবী এবং পশু-শিকারে ধনুর্বাণই ছিল তাহাদের প্রধান অস্ত্রোপকরণ। বাণ, ধনু বা ধনুক, পিনাক—এই সব কটি শব্দই মূলত অস্ট্রিক। ইহারা যে-সব পশুপক্ষী শিকার করিত, অনুমান করা যায়, তাহাদের মধ্যে হাতি, মেড়া (ভেড়া), কাক, কর্কট (কাঁকড়া) এবং কপোতের (যাহার অর্থ শুধু পায়রাই নয়, যে-কোনও পক্ষী) নাম করা যাইতে পারে। গজ, মাতঙ্গ, গণ্ডার (হস্তী অর্থে) এবং কপোত মূলত অস্ট্রিক ভাষা হইতে গৃহীত। অন্যান্য অস্ত্রোপকরণের মধ্যে দা ও করাতের নামোল্লেখ করা যায় ; ইহারাও অস্ট্রিকগোষ্ঠীর ভাষালব্ধ বলিয়া শব্দতাত্ত্বিকেরা অনুমান করেন।

সমুদ্রতীরশায়ী দেশ, দ্বীপ ও উপদ্বীপবাসী অস্ট্রিকভাষী মেলানেশীয়, পলিনেশীয় প্রভৃতি লোকেরা জলপথে যাতায়াত ও ব্যাবসা বাণিজ্যের জন্য গুঁড়িকাঠের একপ্রকার লম্বা ডোঙ্গা (এই কথাটিও অস্ট্রিক) এবং লম্বা লম্বা খণ্ড খণ্ড গুঁড়িকাঠ একত্র করিয়া ভাসমান ভেলার আকারে বড় বড় নৌকা তৈয়ারি করিত, এ তথ্য জনতত্ত্ববিদেরা আবিষ্কার করিয়াছেন। গুঁড়িকাঠের তৈরি ডিঙ্গা, ছোট নৌকা এখনও নদীখালবিলবহুল নিম্ন, পূর্ব ও দক্ষিণ-বঙ্গে বহুল প্রচলিত। যাহাই হউক, এইসব ডোঙ্গা, ডিঙ্গা ও ভেলায় চড়িয়াই প্রাচীন অস্ট্রিকভাষী লোকেরা নদী ও সমুদ্রপথে যাতায়াত করিত এবং এইভাবেই তাহারা একটা বৃহৎ সামুদ্রিক বাণিজ্যও গড়িয়া তুলিয়াছিল।

বস্তুত, বাঙলা তথা ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে অস্ট্রিকভাষী জাতিদের দানের এত প্রাচুর্য দেখিয়াই লেভি সাহেব বলিয়াছিলেন :

"We must know whether the legends, the religion and the philoso-

phical thoughts of India do not owe anything to this past India had been too exclusively examined from the Indo-European stand-point. It ought to be remembered that India is a great maritime country··· the movement which carried the Indian colonisation (in historical times) towards the Far East was far from inaugurating a new route. Adventurers, traffickers and missionaries profited by the technical progress of navigation and followed under better conditions of comfort and efficiency, the way traced from time immemorial, by the mariners of another race, whom Aryan or Aryanised India despised as savages "

নির্মলকুমার বসু মহাশয় আর-একটি জনগত তথ্যের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তাহার উল্লেখ অযৌক্তিক নয়। আসামে, বাঙলাদেশে, ওড়িশায়, দক্ষিণ ভারতের সর্বত্র, গুজরাতে, মহারাষ্ট্রে সকল স্থানেই লোকেরা সাধারণত রান্নার কাজে সরিষা, নারিকেল, অথবা তিলতৈল ব্যবহার করিয়া থাকে। সেলাই-বিহীন উত্তর ও নিম্নবাস (সাধারণত ধুতি, চাদর, উড়ুনি, উত্তরীয় ইত্যাদি) ব্যবহারই এইসব দেশের জনসাধারণের পরিধেয়। আর, যে-পাদুকার ব্যবহার ইহারা করে তাহার পশ্চাদ্ভাগ উন্মুক্ত। বিহারের পশ্চিম প্রান্ত হইতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত ভূখণ্ডের অধিবাসীরা কিন্তু পাঁ বর্তে ব্যবহার করে ঘৃত, বা কোন প্রকার জান্তব চর্বি, সেলাই-করা জামাকাপড় এবং বন্ধ-গোড়ালি পাদুকা। এই পার্থক্যের মধ্যে জন-পার্থক্যের ইঙ্গিত যে আছে তাহা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না, কারণ, জলবায়ুর পার্থক্যদ্বারা ইহার সবটা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।

এ-পর্যন্ত অস্ট্রিকভাষী আদি-অস্ট্রেলীয়দের সম্বন্ধে যাহা বলা হইল তাহা হইতেই বুঝা যাইবে, ইহাদের মধ্যে যে-সব শ্রেণী সভ্য তাহারা যে বাস্তব সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিল তাহা গ্রামীণ, একান্তভাবে গ্রামকেন্দ্রিক। কৃষিজীবী বলিয়া খাদ্যাভাব ইহাদের মধ্যে বড় একটা ছিল না এবং লোকসমৃদ্ধিও যথেষ্ট ছিল, এ অনুমানও করা যাইতে পারে। বর্তমান অস্ট্রিকভাষী লোকদের সাক্ষ্য যদি প্রামাণিক হয় তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, ইহাদের কোনও কোনও প্রাগ্রসর শাখার সমাজবন্ধন নিজেদের গ্রাম অতিক্রম করিয়াও বিস্তৃত হইত। মুণ্ডাদের মধ্যে কয়েকটি গ্রাম মিলিয়া গ্রামসঙ্ঘের মতো একটা সমাজবন্ধন এখনও দেখা যায়। শরৎকুমার রায় মহাশয় তো মনে করেন, "পঞ্চায়ত প্রথা সম্ভবত ভারতে প্রথম ইহাদেরই প্রবর্তিত। পঞ্চায়তকে ইহারা সত্যসত্যই ধর্মাধিকরণ জ্ঞানে মান্য করে। এখনও আদালতে সাক্ষ্য দিবার পূর্বে মুণ্ডা সাক্ষী তাহার জাতি-প্রথা অনুসারে পঞ্চের নাম লইয়া এই বলিয়া শপথ করে, 'সিরমারে-সিঙ্গবোঙ্গা ওতেরে পঞ্চ', অর্থাৎ আকাশে সূর্য-দেবতা, পৃথিবীতে পঞ্চায়ত।"

তিনি এ কথাও বলেন যে, "ইহাদের মধ্যে কোন কোন জাতির কিংবদন্তী আছে যে, এক সময়ে ভারতে ইহাদের ক্ষুদ্র বা বৃহৎ গণতন্ত্র (?) রাজ্য ছিল। রাজশক্তির চিহ্নস্বরূপ মুণ্ডা, ওঁরাও প্রভৃতি জাতির প্রত্যেক গ্রামসঙ্ঘ ও গ্রামে এখনও বিভিন্ন-চিহ্ন-অঙ্কিত পতাকা সযত্নে ও সসম্মানে রক্ষিত হয়। মধ্যপ্রদেশে দ্রবিড়[ভাষী] পূর্ব গন্দ্ জাতির শক্তিশালী সমৃদ্ধ রাজ্য আধুনিক কাল পর্যন্ত ছিল। গঙ্গা-যমুনা উপত্যকায় রাজ্যাধিকারের কিংবদন্তী মুণ্ডা প্রভৃতি কয়েকটি জাতির মধ্যে এখনও বর্তমান।"

অস্ট্রিকভাষাভাষী লোকদের বাস্তব সভ্যতার কিছুটা আভাস পাওয়া গেল এবং সে-সভ্যতা বাঙলাদেশে কতখানি বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল তাহারও খানিকটা ধারণা ইহার ভিতর পাওয়া গেল। দীর্ঘমুণ্ড দ্রবিড়-ভাষাভাষী লোকদের বাস্তব সভ্যতার উপাদান-উপকরণ আরও প্রচুর। মিশর হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতবর্ষের উত্তর ও দক্ষিণ জুড়িয়া এক দীর্ঘমুণ্ড জন এবং পরবর্তী কালে ভূমধ্যজন-সংপৃক্ত আর এক দীর্ঘমুণ্ড নরগোষ্ঠী, এই দুই জনের রক্তধারার সংমিশ্রণে ভারতবর্ষে সিন্ধুনদের উপত্যকা হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ-ভারতের দক্ষিণতম প্রান্ত পর্যন্ত এবং উত্তর-ভারতেও প্রায় সর্বত্রই এক বিরাট নরগোষ্ঠী গড়িয়া উঠিয়াছিল। দক্ষিণ-ভারতের কোনও কোনও স্থানে, উত্তর-ভারতের ২-৪টি স্থানে আকস্মিক আবিষ্কারে, রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণকাহিনীতে, কিন্তু বিশেষভাবে হরপ্পা, মহেন্-জো-দড়ো এবং নাল প্রভৃতি নিম্ন-সিন্ধু উপত্যকার একাধিক স্থানের প্রাচীনতম ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এই নরগোষ্ঠীর বাস্তব সভ্যতার যে চিত্র আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে উন্মুক্ত হইয়াছে তাহা আজ সর্বজনবিদিত। সাম্প্রতিক কালে এ-সম্বন্ধে আলোচনা-গবেষণাও হইয়াছে প্রচুর। তাহার বিস্তৃত আলোচনার স্থান এখানে নয়, প্রয়োজনও কিছু নাই। তবু এই নরগোষ্ঠীর সভ্যতার উপাদান-উপকরণের মোটামুটি একটু পরিচয় লইলে ভারতবর্ষের এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঙলাদেশের সভ্যতার অন্যতম মূল সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা করা যাইবে।

নব্যপ্রস্তরযুগের এই দ্রবিড়ভাষাভাষী লোকেরাই ভারতবর্ষের নগর-সভ্যতার সৃষ্টিকর্তা। আর্যভাষায় 'উর', 'পুর', 'কুট' প্রভৃতি নগর-জ্ঞাপক যে-সব শব্দ আছে সেগুলি প্রায় সবই দ্রবিড় ভাষা হইতে উদ্ভূত। রামায়ণে স্বর্ণলঙ্কার বিবরণ, মহাভারতে ময়দানবের গল্প, মহেন্-জো-দড়োর নগরবিন্যাসের উন্নত ও সমৃদ্ধ রূপ, ভারতের বিভিন্ন প্রাগৈতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ—সমস্তই প্রাক্-আর্যভাষী দীর্ঘমুণ্ড দ্রবিড়ভাষাভাষী নরগোষ্ঠীর নগর-নির্ভর সভ্যতার দিকে ইঙ্গিত করে, এ কথা কতকটা নিঃসংশয়ে অনুমান করা চলে। নগর-নির্ভর সভ্যতা জটিল ; এই সভ্যতার উপাদান-উপকরণও বহুল এবং জটিল হইতে বাধ্য। বিচিত্র খনিজ বস্তুর ব্যবহার তাহার অন্যতম প্রমাণ। এই গোষ্ঠীর লোকেরা সোনা, রূপা, সীসা, ব্রোঞ্জ ও টিনের ব্যবহার জানিত ; শিলাজতু, নানাপ্রকারের পাথর, জান্তব হাড়, পোড়ামাটি, ও নানাপ্রকার খনিজ ও সামুদ্রিক দ্রব্য ইত্যাদি নিজেদের বিচিত্র প্রয়োজনে,

অলংকরণে, বিচিত্র রূপে ও রচনায় ব্যবহার করিত। বর্শা, ছুরি, খড়্গ, কুঠার, তীর, ধনুক, মুষল, বাঁটুল, তরবারি, তীরের ফলা ইত্যাদি ছিল ইহাদের অস্ত্রোপকরণ। পাথরের হল-মুখ, চকমকি পাথরের ছুরি ও কুঠার, নানাপ্রকার ধাতু ও মাটির থালাবাটি ইত্যাদি বিচিত্র রূপের নিত্যব্যবহার্য গৃহোপকরণ, মাটির তৈয়ারি নানাপ্রকারের খেলনা, তামা ও ব্রোঞ্জের দেহসজ্জোপকরণ, খেলার জন্য গুটি ও পাশা ইত্যাদি অসংখ্য, বিভিন্ন ও বিচিত্র উপাদান এই সভ্যতার বৈশিষ্ট্য। গরুর গাড়িও এই সভ্যতারই দান বলিয়া মনে হয়। সুতাকাটা, কাপড় বোনা তো ইহারা জানিতই। যব ও গম, মাছ, মেষ, শূকর ও কুক্কুট -মাংস ছিল ইহাদের প্রিয় খাদ্যবস্তু; বৃহৎ বৃষ (কুকুদ্বান্), গরু, মহিষ, মেষ, হাতি, উট, শূকর, ছাগল, কুক্কুট বা মুরগি, কুকুর ও ঘোড়া (?) ছিল ইহাদের গৃহপালিত জন্তু। ইহাদের বিলাস-দ্রব্যের প্রাচুর্য এবং আরাম উপভোগের উপকরণের যে-পরিচয়, নানাপ্রকার হস্ত ও কারু -শিল্পের যে-পরিচয় সিন্ধু উপত্যকার প্রাগৈতিহাসিক ধ্বংসাবশেষে এবং রামায়ণ-মহাভারতের নানা গল্পের মধ্যে পাওয়া যায় তাহাতেও এক সমৃদ্ধনগর-নির্ভর সভ্যতার দিকে ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। তাম্র-প্রস্তরযুগের চিত্রকলার, জ্যামিতিক রেখাঙ্কন এবং অলং-করণের, মাটির পুতুল ও খেলনায় চারুকলার যে-রূপের সঙ্গে আমরা পরিচিত তাহারও কিছুটা এই দ্রাবিড়ভাষী দীর্ঘমুণ্ড নরগোষ্ঠীরই সৃষ্টি, এ কথা মনে করিবারও যথেষ্ট কারণ আছে। ছোটবড় রাস্তা, জলনিঃসরণের প্রণালী, বড় ছোট একাধিক-তলাবিশিষ্ট ইটকাঠের বাড়ি, দুর্গ, সিঁড়ি, খিলানযুক্ত দরজা, জানালা, স্নানাগার, কূপ, জলকুণ্ড, প্রাঙ্গণ, পূজামন্দির, মৃতদেহ-সংকার-স্থান প্রভৃতি নগরবিন্যাসের যাহা কিছু অত্যাবশ্যক উপাদান, তাম্র-প্রস্তরযুগীয় দীর্ঘমুণ্ড নরগোষ্ঠীর রচিত বাস্তব সভ্যতায় তাহার কিছুরই যে অভাব ছিল না হরপ্পা ও মহেন্-জো দড়োর ধ্বংসাবশেষ তাহা প্রমাণ করিয়াছে।

তামা, লোহা, ব্রোঞ্জ, সোনা, কাঠ ইত্যাদির ব্যবহার এবং এ সব বস্তুর সাহায্যে যে কারুশিল্প ইহারা জানিত তাহার একটু পরোক্ষ প্রমাণ ভাষাতত্ত্বের মধ্যেও পাওয়া যায়। বাঙলা কামার (পরবর্তী সংস্কৃত কর্মকার) তো দ্রাবিড় ভাষার 'কর্মার' শব্দ হইতেই গৃহীত। চারুশিল্পের সঙ্গে পরিচয়ের প্রমাণ, 'রূপ' ও 'কলা' এই দুইটি দ্রাবিড় শব্দ। মৃৎপাত্র যে তৈরি করিত তাহার নাম হইতেছে 'কুলাল'; বানর, গণ্ডার ও ময়ূরের সঙ্গে পরিচয়ের প্রমাণ 'কপি', 'মর্কট', 'খড়্গ' (জন্তু অর্থে) ও 'ময়ূর' প্রভৃতি দ্রাবিড় ভাষার শব্দ। চালের যে ক'টি শব্দ আছে সংস্কৃত ভাষায়, তাহার মধ্যে অন্তত দুইটি, 'তণ্ডুল' ও 'ব্রীহি', দ্রাবিড় ভাষা হইতে গৃহীত। লক্ষণীয় ইহাই যে, এই প্রত্যেকটি শব্দই ঋগ্বেদ ও ব্রাহ্মণ হইতে আহৃত। আর্য সভ্যতার প্রথম স্তরের ইতিহাসেই দ্রাবিড় সভ্যতার বাস্তব উপকরণগত এইরূপ অনেক শব্দ ঢুকিয়া পড়িয়াছে। পরবর্তী কালে সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে বস্তুবাচক আরও কত অসংখ্য শব্দ যে ঢুকিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এইসব বস্তুর সঙ্গে যদি পূর্ব হইতেই আর্যভাষীদের পরিচয় থাকিত তাহা হইলে হয়তো তাহাদের ভাষায় সেইসব বস্তুর নামও

থাকিত ; ছিল না বলিয়াই হয়তো এমন ভাষাভাষী লোকদের নিকট হইতে তাহা ধার করিয়া আত্মসাৎ করিয়া লইতে হইয়াছে যাহাদের মধ্যে সেইসব বস্তু ছিল এবং সেইহেতু তাহাদের নামও ছিল, এবং যাহাদের সঙ্গে আর্যভাষীদের পাশাপাশি বাস করিতে হইয়াছে, কখনও শত্রুভাবে, কখনও মিত্রভাবে। এইসব বস্তুবাচক অসংখ্য শব্দের ইতিহাসের মধ্যে দ্রাবিড়ভাষাভাষীজনদের উন্নত বাস্তব সভ্যতার ইঙ্গিতও সুস্পষ্ট।

দ্রাবিড়ভাষাভাষী বিভিন্ন দীর্ঘমুণ্ড নরগোষ্ঠীর রক্তপ্রবাহ বাঙলাদেশে কতখানি সঞ্চারিত হইয়াছে বা হয় নাই, তাহার ইঙ্গিত আগেই করা হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের ভাষা ও বাস্তব সভ্যতার চলমান প্রবাহ যে বাঙলার ভাষা ও সভ্যতার প্রবাহে স্রোতধারা সঞ্চার করিয়াছে, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার উপায় নাই। বাঙলাদেশে এই ভাষা-প্রভাবের ও সভ্যতার বাহন যতদূর অনুমান করা যায়, দ্রাবিড়ভাষাভাষী লোকেরা নিজেরা ততটা নয় যতটা আর্যভাষীরা নিজেরা। বাঙলাদেশের আর্যীকরণের আগে অ্যালপো-দীনারীয় ও আদি নর্ডিক লোকেরা যতটা দ্রাবিড়ভাষীদের ভাষা ও বাস্তব সভ্যতা আত্মসাৎ করিয়াছিল, তাহারই অনেকখানি অংশ আর্যীকরণের সঙ্গে সঙ্গে বাঙলাদেশে সঞ্চারিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। তবে, প্রত্যক্ষ স্পর্শ লাগে নাই এমন কথাও জোর করিয়া বলা যায় না। বাঙলা ভাষার কিছু কিছু শব্দ ও পদরচনারীতি এবং ব্যাকরণপদ্ধতিতে যে দ্রাবিড় প্রভাব সুস্পষ্ট তাহা তো আগেই বলা হইয়াছে ; বাস্তব সভ্যতায় এই দ্রাবিড়ভাষাভাষী নরগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ প্রভাব এতটা সুস্পষ্ট ও স্বতন্ত্র না হইলেও সাধারণভাবে ইহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুস্পষ্ট ও স্বতন্ত্র না হইবার কারণ, আর্যভাষী অ্যালপো-দীনারীয় ও আদি-নর্ডিক লোকেরা সেই প্রভাবকে একান্তভাবে আত্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছিল এবং আজ আমরা তাহাকে আর্যভাষী লোকদের সভ্যতার অঙ্গীভূত করিয়াই দেখি। তবু মনে হয়, বাঙালীর টাটকা ও শুকনা মৎস্যাহারে অনুরাগ, মৃৎশিল্প ও অন্যান্য কারুশিল্পে দক্ষতা, চারুশিল্পের অনেক জ্যামিতিক নকশা ও পরিকল্পনা, নগর সভ্যতার যতটুকু সে পাইয়াছে তাহার অভ্যাস ও বিকাশ, বিলাসোপকরণের অনেক সামগ্রী, জলসেচনে উন্নততর চাষের অভ্যাস প্রভৃতি দ্রাবিড়ভাষাভাষী নরগোষ্ঠী-প্রবাহেরই ফল। মহেন্‌জো দড়োর ও হরপ্পার দীর্ঘমুণ্ড লোকেরা যে মৎস্যাহারী ছিল তাহার প্রমাণ সুবিদিত। বৈদিক আর্যেরা ছিলেন মাংসাহারী ; কিন্তু পরবর্তী কালে নানা কারণে, বিশেষত বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠীর অহিংসাবাদের অভ্যুদয়ে, প্রাণিহত্যা এবং সঙ্গে সঙ্গে মাংসাহারের এবং মৎস্যাহারের প্রতি একটা বিরাগ আর্যভাষাভাষী লোকদের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে এবং আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দ্রাবিড়ভাষী লোকদের দেশেও তাহা সংক্রামিত হয়। বাঙলাদেশে এই সংস্কৃতির বিস্তার অপেক্ষাকৃত কম হইয়াছিল বলিয়া এ দেশে মৎস্যাহারের প্রতি বিরাগ উৎপাদন ততটা সম্ভব হয় নাই। অবশ্য, এ দেশের নদনদীবহুল

জলবায়ু এবং মাছের সহজলভ্যতা এই অনুরাগের আর একটি প্রধান কারণ, এ কথাও অস্বীকার করা যায় না। তাহা ছাড়া, আগে হইতেই অস্ট্রিকভাষা-ভাষী লোকদের ভিতরও মৎস্যাহারের প্রচলন ছিল বলিয়া মনে হয়।

অ্যাল্‌পো-দীনারীয় নরগোষ্ঠীর বাস্তব সভ্যতার রূপ যে কী ছিল, তাহা বলিবার কিছু উপায় নাই। নানা কারণে মনে হয়, বৈদিক আর্যভাষীদের ভাষা ও সভ্যতা হইতে তাহার এক পৃথক অস্তিত্ব ছিল। পূর্ব-ভারতের অ্যাল্‌পো-দীনারীয় অবৈদিক আর্যভাষীদিগকে বৈদিক আর্যভাষীরা ঘৃণার চক্ষেই দেখিত এবং তাহাদের অভিহিত করিত 'ব্রাত্য' বলিয়া। এই 'ব্রাত্য' অবৈদিক আর্যদের ভিতর হইতেই বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের উদ্ভব বলিয়া অনুমান করিলে ইতিহাস-অসম্মত কিছু বলা হয় না। আর, যেহেতু ইহারাও ছিল আর্যভাষী, সেই হেতু যে ইহাদের ধর্মানুশাসন-গুলিকে যে বলা হয় বলিত 'আর্যসত্য', তাহাতেও কিছু অন্যায় হয় নাই। 'ব্রাত্যষ্টোম' যজ্ঞ করিয়া ইহাদের শুদ্ধিসাধন করিয়া নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করিবার একটা কৌশল বৈদিক আর্যেরা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহারা যে (বৈদিক ভাবে ও ধ্যানে, অর্থাৎ বৈদিক ধর্মে) 'অ-দীক্ষিত' তাহা বলিতেও ছাড়েন নাই। এই তথ্য হইতে মনে হয়, এই অ্যাল্‌পো-দীনারীয় অবৈদিক আর্যভাষী-দের স্বতন্ত্র একটা বাস্তব সভ্যতার রূপও ছিল; কিন্তু তাহা অনুমান করিবার উপায় আজ কিছু অবশিষ্ট আর নাই।

বৈদিক আর্যভাষীদের বাস্তব সভ্যতা ছিল একান্তই প্রাথমিক স্তরের। খড়, বাঁশ, লতাপাতার স্বল্পকালস্থায়ী কুঁড়েঘরে অথবা পশুচর্মনির্মিত তাঁবুতে ইহারা বাস করিত; গো-পালন জানিত, পশুমাংস পোড়াইয়া তাহাই আহার করিত এবং দলবদ্ধ হইয়া এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় ঘুরিয়া বেড়াইত। যাযাবরত্ব ত্যাগ করিয়া এ দেশে আসিয়া স্থিতিলাভ করিবার পর পূর্ববর্তী অস্ট্রিক ও দ্রবিড় -ভাষাভাষী লোকদের সংস্পর্শে আসিয়া যথাক্রমে কৃষি অর্থাৎ গ্রাম-সভ্যতা এবং নগর সভ্যতার সঙ্গে ধীরে ধীরে তাহাদের পরিচয় ঘটিল এবং ক্রমে তাহারা দুই সভ্যতাকেই একান্তভাবে আত্মসাৎ করিয়া নিজস্ব এক নূতন সভ্যতা গড়িয়া তুলিল। এই সভ্যতার বাহন হইল আর্যভাষা। এই দুই সভ্যতার সমন্বিত আর্যীকরণই হইল আর্যভাষীদের বিরাট কীর্তি; অথচ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে তাহাদের একান্ত নিজস্ব কিছু তাহাতে বিশেষ নাই।

বাঙলাদেশ ও বাঙালীর বাস্তব সভ্যতার রূপ শুধু প্রাচীনকালেই নয়, ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত একান্তভাবেই গ্রামীণ, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। দ্রবিড়ভাষাভাষী লোকদের উদ্ভূত নগর-সভ্যতার স্পর্শ বাঙলাদেশে খুব কমই লাগিয়াছে; সেইজন্যই সুদীর্ঘ শতাব্দীর পর শতাব্দী বাঙালীর ইতিহাসে নগরের প্রাধান্য নাই বলিলেই চলে। উত্তর-ভারতে রাজগৃহ, পাটলীপুত্র, সাকেত, শ্রাবস্তী, হাস্তিনাপুর, পুরুষপুর, শাকল,

অহিচ্ছত্র, কান্যকুব্জ, তক্ষশিলা, উজ্জয়িনী, বিদিশা, কৌশাম্বী প্রভৃতি, দক্ষিণ-ভারতের অসংখ্য সামুদ্রিক বাণিজ্যের বন্দর, পুর, নগর প্রভৃতি ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে স্থান অধিকার করিয়া আছে, বাঙলাদেশে বাঙলার ইতিহাসে নগর নগরী সে স্থান অধিকার করিয়া নাই। বস্তুত বাঙলাদেশে নগরের সংখ্যা কম এবং বাঙালীর সমাজবিন্যাসে নগরের প্রাধান্যও কম। এ কথা অন্যত্র আরও পরিষ্কার করিয়া বলিবার সুযোগ হইবে; এখানে এইটুকু বলিলেই চলিতে পারে যে, নগর-সভ্যতার স্পর্শ বাঙলাদেশে যে যথেষ্ট লাগে নাই, তাহার কারণ বাঙলাদেশ চিরকালই ভারতের একপ্রান্তে নিজের কৃষি ও গ্রামীণ সভ্যতা লইয়া পড়িয়া থাকিয়াছে। সর্বভারতীয় প্রাণকেন্দ্রের সঙ্গে তাহার যোগ আর্যভাষা ও আর্যসভ্যতা এবং সংস্কৃতিকে অবলম্বন করিয়াই এবং সেই সূত্রে সে দ্রবিড় ভাষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির যতটুকু প্রবাহস্পর্শ পাইয়াছে, তাহাই বোধহয় তাহার দ্রাবিড়ী উপাদান এবং সে উপাদান তাহার মূল অস্ট্রিক উপাদানকে একান্তভাবে বিলোপ করিতে পারে নাই। ঐতিহাসিক কালেও দক্ষিণ হইতে নানা সমরাভিযান এবং আদান-প্রদানের ফলে বাঙলাদেশে কিছু কিছু দক্ষিণী দ্রবিড়-প্রভাব আসিয়াছে, সন্দেহ নাই; বাঙলা-দেশের প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাসে তাহার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায় ভাষায়, বাস্তব সভ্যতার কিছু কিছু উপাদান-উপকরণে এবং মানস-সংস্কৃতিতে। তাহা স্বতন্ত্র বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবার স্থান এখানে নয়।

৭

জনপ্রবাহ ও মানস-সংস্কৃতি

বাস্তব সভ্যতার উপাদান উপকরণ এবং তাহার সঙ্গে জনপ্রবাহের সম্বন্ধের কিছু আভাস লইতে চেষ্টা করা গেল। এইবার মানস সংস্কৃতি এবং জনপ্রবাহের খানিকটা সম্বন্ধ নির্ণয়ের চেষ্টা করা যাইতে পারে।

অস্ট্রিক-ভাষাভাষী আদি-অস্ট্রেলীয়দের কথাই সর্বাগ্রে বলিতে হয়, কারণ ভারতীয় নিগ্রোবটুদের মানস-সংস্কৃতি সম্বন্ধে প্রায় কিছুই আমরা জানি না। অস্ট্রিক-ভাষাভাষী প্রাচীন ও বর্তমান জনদের সম্বন্ধে যতটুকু জানা যায় এবং অনুমান করা যায়, তাহাতে মনে হয়, ইহারা অতি সরল ও নিরীহ প্রকৃতির লোক ছিল। ঐতিহাসিক যুগে ইহাদের বিবর্তন ও পরিবর্তনের গতি ও প্রকৃতি দেখিয়া মনে হয়, ইহাদের মধ্যে দৃঢ়তা ও সংহতির কিছু অভাব ছিল; সহজেই ইহারা পরের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিত এবং আত্মসমর্পণ করিয়াই নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিত। বারবার অধিকতর পরাক্রান্ত জাতির নিকট রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক বশ্যতা স্বীকার করিয়াও যে ইহারা নিজেদের জনগত বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি আজও বজায় রাখিতে পারিয়াছে, তাহাতে মনে হয় এই বশ্যতা স্বীকার

করিয়াও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখাই ইহাদের প্রাণশক্তির মূল। বর্তমান শবর বা সাঁওতাল, ভূমিজ বা মুণ্ডা প্রভৃতির জীবনাচরণ একটু মনোযোগ দিয়া দেখিলে মনে হয়, ইহারা কিছুটা কল্পনাপ্রবণ, দায়িত্ববিহীন, অলস, ভাবুক এবং কতকটা কামপরায়ণও বটে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া এত বিবর্তন-পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু ইহাদের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য তাহাতে বিশেষ বদলাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

এই অস্ট্রিক-ভাষী আদি-অস্ট্রেলীয়েরা মানুষের একাধিক জীবনে বিশ্বাস করিত, এখনও করে। কাহারও মৃত্যু হইলে তাহার আত্মা কোনও পাহাড় অথবা গাছ অথবা কোন জন্তু বা পক্ষী বা অন্য কোনও জীবকে আশ্রয় করিয়া বাঁচিয়া থাকে, ইহাই ছিল ইহাদের ধারণা. পরবর্তী কালে এই ধারণাই হিন্দু পুনর্জন্মবাদ ও পরলোকবাদে রূপান্তরিত হয়। মৃতদেহ ইহারা কাপড় অথবা গাছের ছালে জড়াইয়া বৃক্ষস্কন্ধে অথবা ডালে ঝুলাইয়া রাখিত, বা মাটির নিচে কবর দিয়া তাহার উপর বড় বড় পাথর সোজা করিয়া পুঁতিয়া দিত, অথবা স্ত্রীলোক হইলে কবরের উপর লম্বালম্বি করিয়া শোয়াইয়া দিত (গন্দ, কোরক, খাসিয়া প্রভৃতিরা এখনও ঠিক যেমনটি করে), মৃতব্যক্তিকে মাঝে মাঝে আহার্যও দান করিত, যেমন এখনও করে। এইসব বিশ্বাস ও রীতিই পরবর্তী কালে হিন্দুসমাজে গৃহীত হইয়া শ্রাদ্ধাদি কার্যে মৃতের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান ইত্যাদি ব্যাপারে রূপান্তরিত হইয়াছে। লিঙ্গ-পূজাও ইহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। 'লিঙ্গ' শব্দটিই তো অস্ট্রিক ভাষার দান, এবং কোনও কোনও নৃতত্ত্ববিদ খাসিয়াদের সমাধির উপর যে দীর্ঘাকার পাথর দাঁড় করানো এবং শোয়ানো থাকে তাহাকে যথাক্রমে লিঙ্গ ও যোনি বলিয়া অনুমানও করিয়াছেন। বস্তুত, পলিনেশীয় ভাষায় এখনও 'লিঙ্গ' তাহার সুপরিচিত অর্থেই ব্যবহৃত হয় এবং তাহার তুষ্টিবিধানের চেষ্টাও সুবিদিত। প্রশিলুস্কি এই সম্বন্ধে বলিতেছেন :

"The phallic cults, of which we know the importance in the ancient religions of Indo-China, are generally considered to have been derived from Indian Saivism. It is more probable that the Aryans have borrowed from the aborigines of India the cult of Linga as well as the name of the idol. These popular practices despised by the Brahmanas were ill known in old times. If we try to know them better, we will probably be able to see clearly why so many non-Aryan words of the family of Linga have been introduced into the language of the conquerors,"

অস্ট্রিকভাষীরা বিশেষ বিশেষ বৃক্ষ, পাথর, পাহাড়, ফলমূল, ফুল, কোন বিশেষ স্থান, বিশেষ বিশেষ পশু, পক্ষী ইত্যাদির উপর দেবত্ব আরোপ করিয়া তাহার পূজা করিত।

এখনও খাসিয়া, মুণ্ডা, সাঁওতাল, শবর ইত্যাদি কোমের লোকেরা তাহা করিয়া থাকে। বাঙলাদেশে পাড়াগাঁয়ে গাছপূজা তো এখনও বহুলপ্রচলিত, বিশেষভাবে শেওড়াগাছ ও বটগাছ ; আর, পাথর ও পাহাড়-পূজাও একেবারে অজ্ঞাত নয়। বিশেষ বিশেষ ফল-ফুল-মূল সম্বন্ধে যে-সব বিধি-নিষেধ আমাদের মধ্যে প্রচলিত, যে-সব ফলমূল আমাদের পূজার্চনায় উৎসর্গ করা হয়, আমাদের মধ্যে যে নবান্ন উৎসব প্রচলিত, আমাদের ঘরের মেয়েরা যে-সব ব্রতানুষ্ঠান প্রভৃতি করিয়া থাকেন, ইত্যাদি, বস্তুত, আমাদের দৈনন্দিন অনেক আচার-অনুষ্ঠানই এই আদিম অস্ট্রিক-ভাষাভাষী জনদের ধর্মবিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, ইহাদের অনেকগুলিই কৃষি ও গ্রামীণ সভ্যতার স্মৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িত। আমাদের নানা আচারানুষ্ঠানে, ধর্ম, সমাজ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আজও ধান, ধানের গুচ্ছ, দূর্বা, কলা, হলুদ, সুপারি, নারিকেল, পান, সিন্দুর, কলাগাছ প্রভৃতি অনেকখানি স্থান জুড়িয়া আছে। লক্ষ্যণীয় এই যে, ইহার প্রত্যেকটিই অস্ট্রিক-ভাষাভাষী জনদের দৈনন্দিন জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ। বাঙলাদেশে, বিশেষভাবে পূর্ববাঙলায়, এক বিবাহ ব্যাপারেই 'পানখিলি', 'গাত্রহরিদ্রা', 'গুটিখেলা', 'ধান ও কড়ির স্ত্রী-আচার' প্রভৃতি যে-সব অবৈদিক, অস্মার্ত ও অব্রাহ্মণ্য, অপৌরাণিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি দেখা যায় তাহাও তো এই কৃষি-সভ্যতা ও কৃষি-সংস্কৃতির স্মৃতিই বহন করে। ধান্যশীর্ষপূর্ণ যে লক্ষ্মীর ঘটের পূজা বাঙলাদেশে প্রচলিত তাহার অনুরূপ পূজা তো এখনও ওঁরাও-মুণ্ডাদের মধ্যে দেখা যায় ; ইহাদের 'সরণা' দেবীর মাথায় ধান্যশীর্ষের জটার কল্পনা সুপ্রাচীন। শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারে অথবা অন্য কোনও শুভ কাজের প্রারম্ভে 'আভ্যুদয়িক' নামে পিতৃপুরুষের যে-পূজা আমরা করিয়া থাকি, তাহাও তো আমরা এই অস্ট্রিক-ভাষী লোকদের নিকট হইতেই শিখিয়াছি বলিয়া মনে হয়। এই ধরনের পিতৃপুরুষের পূজা এখনও সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা, শবর, ভূমিজ, হো ইত্যাদির মধ্যে সুপ্রচলিত। শরৎকুমার রায় মহাশয় তো বলেন, "ভারতে শক্তিপূজার প্রবর্তন সম্ভবত ইহারাই প্রথম করে। ওঁরাও প্রভৃতি জাতির চাণ্ডীনামক দেবতার সহিত হিন্দু চণ্ডীদেবীর সাদৃশ্য দেখা যায়। অর্ধরাত্রে উলঙ্গ হইয়া ওঁরাও অবিবাহিত যুবক-পূজারী 'চাণ্ডী স্থানে' গিয়া চাণ্ডীর পূজা করে।" বাঙলাদেশে হোলি বা হোলাক উৎসব এবং নিম্নশ্রেণীর মধ্যে চড়ক-ধর্মপূজার মিশ্রিত সমন্বিত রূপ বিশ্লেষণ করিলে এমন কতকগুলি উপাদান ধরা পড়ে যাহা মূলত আর্যপূর্ব আদিম নরগোষ্ঠীদের মধ্যে এখনও প্রচলিত। নিম্নশ্রেণী ও নিম্নবর্ণের অনেক ধর্মানুষ্ঠান সম্বন্ধেই এ কথা বলা যাইতে পারে।

দ্রবিড়ভাষী লোকদের মানসপ্রকৃতিও ইহাদের প্রাচীন সাহিত্য ও শিল্পকলা এবং প্রাগৈতিহাসিক তাম্র-প্রস্তর যুগের ধ্বংসাবশেষ হইতেই কিছু কিছু অনুমান করা যায়। মনে হয়, ইহারা খুব কর্মঠ ও উদ্যমশীল, সংঘশক্তিতে দৃঢ়, শিল্প-সুনিপুণ এবং কতকটা

অধ্যাত্মরহস্যসম্পন্ন প্রকৃতির লোক ছিল। প্রাচীন তামিল সাহিত্য যদি প্রামাণিক হয় তাহা হইলে ইহাদের প্রকৃতিতে ভাবুকতার এবং সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিরও অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। ইহাদের মধ্যে "সভ্যতার উন্নতির সহিত শ্রেণীবিভাগের বৃদ্ধি পাইয়াছিল। দ্রবিড় সমাজের শ্রেণীবিভাগের সর্বোচ্চ ছিল 'মাল্লের' বা রাজা, তারপর পর্যায় অনুসারে 'বল্লাল' বা সামন্ত রাজা [বল্লালসেনের নামের বল্লালের সঙ্গে এই বল্লাল কথাটির কি কোন অর্থগত সম্বন্ধ আছে?], তারপর 'বেল্লাল' বা ক্ষেত্রস্বামী বা কৃষক, তারপর 'বণিত' বা ব্যবসায়ী। এইসব শ্রেণী ছিল উচ্চ বা 'মলোর', তারপর শ্রমজীবী বা 'বিলইবলার', আর সর্বনিম্নে দাস জাতি বা 'আদিওর'। প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে আবার বহু বিভাগ ছিল। উচ্চ-নীচ-ভেদ-প্রবণতা দ্রবিড়ভাষাভাষী নরগোষ্ঠীর মধ্যে বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছিল। উহাদের অস্পৃশ্যতাবোধ ক্রমে ভারতের বর্তমান বংশগত অনমনীয় জাতিভেদ প্রথায় পরিণত হইল। সম্ভবত দ্রবিড় নরগোষ্ঠীর মধ্যে হঠযোগের প্রচলন হওয়ায় এই অস্পৃশ্যতাবোধ আরও প্রবল হইয়াছিল। পরিশেষে ইহারা যখন আর্যনর্ডিক নরগোষ্ঠীর সংস্পর্শে আসিল, তখন দেখিল আর্যেরা শূচিপ্রবণতার জন্য অপরিচ্ছন্ন দ্রবিড়পূর্ব নরগোষ্ঠীর সংস্পর্শ বর্জনের প্রচেষ্টা করিতেন। তাহাতে এই দ্রবিড়দের বাহ্য শুচিবোধ আরও উত্তেজিত হইল।" শরৎচন্দ্র রায় মহাশয়ের এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ স্বীকার না করিয়াও বলা যাইতে পারে, দ্রবিড়-ভাষাভাষী লোকদের অস্পৃশ্যতাবোধ এবং শ্রেণী-পার্থক্যবোধ পরবর্তী কালে আর্যভাষী সমাজে বেশ খানিকটা সঞ্চারিত হইয়াছিল। যোগধর্ম ও আনুষঙ্গিক সাধনপদ্ধতি যে ইহাদের কাহারও কাহারও মধ্যে প্রচলিত ছিল তাহা তো প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু-সভ্যতাই অনেকটা প্রমাণ করিয়াছে।

আর্য এবং পরবর্তী পৌরাণিক হিন্দুধর্মে মূর্তিপূজা, মন্দির, পশুবলি, অনেক দেবদেবী, যথা, শিব ও উমা, শিবলিঙ্গ, বিষ্ণু ও শ্রী প্রভৃতি যে-স্থান অধিকার করিয়া আছে তাহার মূলে দ্রবিড়ভাষী লোকদের প্রভাব অনস্বীকার্য। যাগযজ্ঞও, যতদূর জানা যায়, ভূমধ্য-নরগোষ্ঠীর মধ্যেই যেন বেশি প্রচলিত ছিল। প্রাচীন মিশরে, আসিরিয়া ও ব্যাবিলনের সুপ্রাচীন ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যজ্ঞবেদীর নিদর্শন কিছু কিছু মিলিয়াছে এবং আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অরণি ও ব্রীহি, যজ্ঞের যে দুটি প্রধান উপাদান, এই দুইটি শব্দই সম্ভবত মূলত দ্রবিড় ভাষার সঙ্গে সংপৃক্ত। অবশ্য ইহাও হইতে পারে, যাগযজ্ঞ ভারতীয় আর্যভাষী আদি-নর্ডিকদেরই উদ্ভূত ধর্মানুষ্ঠান; কিন্তু যেহেতু ভারতের অন্যান্য নর্ডিক নরগোষ্ঠীর মধ্যে তাহার প্রচলন দেখা যায় না, সেই হেতু অনুমান একান্ত অসংগত না-ও হইতে পারে যে, ভূমধ্য নরগোষ্ঠীর সংস্পর্শে আসিয়াই আবেস্তীয় আর্যভাষী ও ঋগ্বেদীয় আর্যভাষীরা এই যাগযজ্ঞের পরিচয় লাভ করিয়াছিল এবং ঋগ্বেদীয় আর্যভাষীরা ভারতবর্ষে আসিবার আগেই তাহা হইয়াছিল, এমনও অসম্ভব নয়। পশুবলি যে ভূমধ্যনরগোষ্ঠী-সংপৃক্ত প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধুতীরবাসী লোকদের মধ্যে প্রচলিত ছিল,

মহেন্-জো-দড়োর ধ্বংসাবশেষ তাহা কতকটা প্রমাণ করিয়াছে। এই মহেন্-জো-দড়োর ধ্বংসাবশেষের মধ্যেই লোকের বাসের অনুপযোগী ক্ষুদ্রবৃহৎ এমন কয়েকটি গৃহ আবিষ্কৃত হইয়াছে যেগুলিকে কতকটা নিঃসংশয়েই মন্দির বা পূজাস্থান ইত্যাদি বলা যায়। কেহ কেহ তাহা স্বীকারও করিয়াছেন। এক্ষেত্রেও আশ্চর্য এই যে, 'পূজন' বা 'পূজা', এবং 'পুষ্প' (এই শব্দ দুইটি ঋগ্বেদেই আছে)—এই দুটি শব্দই দ্রাবিড়ভাষাগোষ্ঠীর সঙ্গে সংপৃক্ত। লিঙ্গপূজা এবং মাতৃকাপূজা যে সিন্ধুতীরের প্রাগৈতিহাসিক লোকদের মধ্যে প্রচলিত ছিল তাহাও প্রমাণ করিয়াছে হরপ্পা-মহেন্-জো-দড়োর ধ্বংসাবশেষ। অবশ্য, এ দুটি পূজা সর্পপূজার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর অনেক আদিম অধিবাসীদের মধ্যেই প্রচলিত ছিল, তবু ভারতবর্ষে ইহার যে রূপ আমরা দেখি তাহা যে আর্য ভাষীরা ভারতীয় আযপূর্ব ও অনার্য লোকদের সংস্পর্শে আসিয়া ক্রমশ গড়িয়া তুলিয়াছিল, এই অনুমানই যুক্তিসংগত বলিয়া মনে হয়। লিঙ্গপূজাই ক্রমশ শিবের সঙ্গে জড়িত হইয়া শিবলিঙ্গ ও শক্তি-যোনি-পূজায় রূপান্তরিত হয় এবং মাতৃকাপূজা ও সর্পপূজা ক্রমশ যথাক্রমে শক্তিপূজায় ও মনসাপূজায়। দ্রাবিড়ভাষীদের আণ-মন্দি=পুং বানর-দেবতার ক্রমশ বৃষকপি এবং পরবর্তী কালে হনুমান-দেবতায় রূপান্তর অসম্ভব নয়। তেমনই অসম্ভব নয় দ্রাবিড়-ভাষীদের বিণ্ বা আকাশ-দেবতার রূপান্তর বিষ্ণুতে, এবং তাহা সুপ্রাচীন কালেই হয়তো হইয়াছিল। বৈদিক বিষ্ণুর যে-রূপ আমরা দেখি তাহাতে যেন দ্রাবিড়ভাষীদের আকাশ-দেবতার স্পর্শ লাগিয়া আছে। শিব সম্বন্ধে এ কথা আরও বেশি প্রযোজ্য। শ্মশান-প্রান্তর-পর্বতের রক্ত-দেবতা একান্তই দ্রাবিড়ভাষীদের শিবন্ যাহার অর্থ লাল বা রক্ত এবং শেম্বু যাহার অর্থ তাম্র; ইনিই ক্রমে রূপান্তরিত হইয়া আর্যদেবতা রুদ্রের সঙ্গে এক হইয়া যান। পরে শিবন্=শিব, শেম্বু=শম্ভু, রুদ্র-শিব এবং মহাদেবে রূপান্তর লাভ করেন। এই ধরনের সমন্বিত রূপ পৌরাণিক অনেক দেবদেবীর মধ্যেই দেখা যায়, এ কথা ক্রমশ পণ্ডিতদের মধ্যে স্বীকৃতি লাভ করিতেছে। দৃষ্টান্তবাহুল্যের আর প্রয়োজন নাই। এই সমন্বিত রূপই আর্যভাষীদের মহৎ কীর্তি এবং ভারতীয় ঐতিহ্যে তাহাদের সুমহান দান।

মহেন্-জো-দড়োর ধ্বংসাবশেষ হইতে মনে হয় সেখানকার লোকেরা মৃতদেহ কবরস্থ করিত, কেহ কেহ আবার খানিকটা পোড়াইয়া শুধু অস্থিগুলি কবরস্থ করিত।

অ্যাল্পো-দীনারীয় নরগোষ্ঠীর মানস-সংস্কৃতি সম্বন্ধে কিছুই বলিবার উপায় নাই। তবে, মহেন্-জো দড়োর উপরিতম স্তরের ধ্বংসাবশেষ হইতে মনে হয়, ইহারা মৃতদেহ বা শব (এটি দ্রাবিড়গোষ্ঠীর শব্দ) আগে পোড়াইয়া ভস্মশেষ একটি পাত্রে রাখিয়া তাহা কবরস্থ করিত। আগেই বলিয়াছি, আর্যভাষী নর্ডিকেরা ইহাদের ভাষাজ্ঞাতি অ্যাল্পো-দীনারীয় লোকদের প্রীতির চক্ষে তো দেখিতই না, বরং 'ব্রাত্য' বা পতিত বলিয়া ঘৃণা করিত। এই 'ব্রাত্য'রাও অন্যদিকে বৈদিক আর্যভাষীদের যাগযজ্ঞ, আচারানুষ্ঠান প্রভৃতিকে প্রীতির

চক্ষে দেখিত না। এককথায় এই দুই গোষ্ঠীর মানস-সংস্কৃতি একেবারেই বিভিন্ন ছিল, এ অনুমান কতকটা নিঃসংশয়েই করা যায়।

ভারতীয়, তথা বাঙলাদেশের মানস-সংস্কৃতিতে মোঙ্গোলীয় ভোটব্রহ্ম বা চৈনিক বা অন্য কোনও নরগোষ্ঠীর স্পর্শ বিশেষ কিছু লাগে নাই। লাগিলেও তাহা এত ক্ষীণ যে, আজ আর তাহা ধরিবার কোনও উপায় নাই।

বাঙলাদেশে, শুধু বাঙলাদেশেই বা কেন, সমগ্র উত্তর-ভারতেই আজ বিশুদ্ধ নিগ্রোবটু অবলুপ্ত; বহুদিন আগেই তাহারা কোথায় যে বিলীন হইয়া গিয়াছে আজ আর তাহা বুঝিবারও উপায় নাই।

"অস্ট্রিক, মিশ্র অস্ট্রিক ও নেগ্রিটো, দ্রাবিড়, মিশ্র দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক; মিশ্র নেগ্রিটো ও দ্রাবিড় এবং মিশ্র অস্ট্রিক-নেগ্রিটো-দ্রাবিড়, এইসব জনগণ, যখন উত্তর-ভারতের অনার্য জনরূপে নিজ মিশ্র ধর্ম ও সংস্কৃতি লইয়া বাস করিতেছে, যখন দেশ ছিল খণ্ড, ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত, এবং দেশে কোনও ঐক্য-বিধায়িনী কেন্দ্রাভিমুখী শক্তিও ছিল না;—এমন সময়ে ধীরে ধীরে প্রচণ্ড শক্তিশালী, একান্তরূপে কর্মী, অপূর্ব কল্পনাশীল, disciplined বা শৃঙ্খলাসম্পন্ন, সুদৃঢ়রূপে সঙ্ঘবদ্ধ, গুণগ্রাহী কিন্তু আত্মসমাহিত, বাস্তব সভ্যতায় কিঞ্চিৎ পশ্চাৎপদ অথচ নূতন বস্তু উপযোগী হইলে গ্রহণ করিতে সদা-চেষ্টিত, এমন আর্য(ভাষী) জাতি ভারতে দেখা দিল। আর্য(ভাষী)রা আসিয়া খণ্ড ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত ভারতকে এক ধর্মরাজ্য পাশে, এক ভাষা ও এক সংস্কৃতির গ্রন্থিতে বাঁধিয়া দিল। * * * ভারতবর্ষে তাহারা বৈদিকধর্ম ও দেবতাবাদ এবং বেদের কিছু কিছু মন্ত্র বা সূক্ত লইয়া আসিল; তাহারা আনিল তাহাদের নিজস্ব সংস্কৃতি; সেই সংস্কৃতিতে বাবিল ও আসুরীয় এবং পশ্চিম-এশিয়ার অন্য সভ্য (ভূমধ্য) নরগোষ্ঠীর প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে ছিল।"

৮

শতাব্দী পর শতাব্দীর বিরোধ-মিলনের মধ্য দিয়া এমন করিয়া ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের বুকে আর্যভাষী আদি-নর্ডিকেরা এক সমন্বিত জন, ধর্ম সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিল। সে জনের রক্তবিশুদ্ধতা আর রহিল না; তাহার রক্তে বিচিত্র রক্তধারার স্রোতধ্বনি রণিত হইতে লাগিল, কোথাও ক্ষীণ, কোথাও উচ্চগ্রামে। এই সমন্বিত জনের নাম ভারতীয় জন। সে ধর্মও আর বেদ-ব্রাহ্মণের ধর্ম রহিল না; তাহার মধ্যে বিভিন্ন বিচিত্র পূর্বতন ধর্মের স্পর্শ আচার, অনুষ্ঠান সব মিলিয়া মিশিয়া এক নূতন ধর্ম গড়িয়া উঠিল; তাহার নাম পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম। সে সভ্যতাও বৈদিক আর্যভাষীর সভ্যতা থাকিল না; বিচিত্র পুরাতন সভ্যতার উপাদান উপকরণ আহরণ করিয়া তাহার এক নূতন রূপ ধীরে ধীরে

পৃথিবীর দৃষ্টির সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল ; এই নূতন সমন্বিত সভ্যতার নাম ভারতীয় সভ্যতা। আর সেই সংস্কৃতিই কি বেদ-ব্রাহ্মণের সংস্কৃতি থাকিতে পারিল ? তাহার মানসলোকে কত যে পূর্বতন জন ও সংস্কৃতির সৃষ্টি-পুরাণ, দেবতাবাদ, ভয়-বিশ্বাস, ভাব-কল্পনা, স্বভাব-প্রকৃতি, ইতিকাহিনী, ধ্যানধারণা আশ্রয়লাভ করিল তাহার ইয়ত্তা নাই। সকলকে আশ্রয় দিয়া, সকলের মধ্যে আশ্রয় পাইয়া, সকলকে আত্মসাৎ করিয়া, সকলের মধ্যে বিস্তৃত হইয়া এই সংস্কৃতিও এক নূতন সমন্বিত রূপ লাভ করিল : তাহার নাম ভারতীয় সংস্কৃতি। আজ আবার গত সাতশত বৎসর ধরিয়া আর এক বৃহৎ সমন্বয় চলিতেছে এবং তাহার ফলে আমাদের এই বৃহৎ দেশখণ্ডে আর এক নূতন জন, ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি রূপ লাভ করিতেছে।

এই সমন্বিত জন, ধর্ম, সভ্যতা এবং সংস্কৃতিও একটি চলমান প্রবাহ। এই প্রবাহ আজও চলিতেছে। পরবর্তী কালে ইতিহাসের আবর্তচক্রে বারবার নূতন নূতন জন, ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে বিচিত্ররূপে তাহাদের বিরোধ-মিলন ঘটিয়াছে, আজও ঘটিতেছে। ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। চলমান প্রবাহ, বিরুদ্ধ প্রবাহ, সমন্বিতপ্রবাহ—ইহাই জীবনের গতিধর্ম। এই গতিধর্ম স্মৃতি ঐতিহ্যবহ : এই ধর্মই জীবনীশক্তি, প্রাণশক্তি। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই ধর্মের বিকাশের দিকে তাকাইয়া বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ভারতীয় কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে :

রণধারা বাহি জয়গান গাহি
উন্মাদ কলরবে
ভেদি মরুপথ গিরি পর্বত
যারা এসেছিল সবে
তারা মোর মাঝে সবাই বিরাজে,
কেহ নহে নহে দূর—
আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে
তার বিচিত্র সুর।

যাহাই হউক, যে সমন্বিত জন, ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির কথা এইমাত্র বলিলাম, তাহার জন্মনীড় হইল উত্তর-ভারতের গাঙ্গেয় প্রদেশ। তাহাদের বাহন হইল আর্যভাষা। এই আর্যভাষাকে আশ্রয় করিয়া ধীরে ধীরে গাঙ্গেয় প্রদেশের ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রবাহ বাঙলাদেশে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-সপ্তম শতক হইতে। আদিমতম স্তরে আদি-অস্ট্রেলীয়, তারপর দীর্ঘমুণ্ড ভূমধ্য-নরগোষ্ঠী, গোলমুণ্ড অ্যালপো-দীনারীয় নর-গোষ্ঠী এবং সর্বশেষে উত্তর-ভারতের গাঙ্গেয় প্রদেশের মিশ্র আদি-নর্ডিক নরগোষ্ঠীর ক্ষীণ ধারা—এই কয়েকটি ধারার মিলনে বাঙালী জনের সৃষ্টি। অ্যালপো-দীনারীয় প্রবাহপূর্ব আদিম-বাঙালী মুখ্যত অনার্য ; আর্য-প্রবাহ প্রথম আনিল অ্যালপো-দীনারীয় জাতিই।

তারপর দ্বিতীয় প্রবাহ ক্ষীণ ধারায় আনিল আদি-নর্ডিকেরা, কিন্তু উত্তর-ভারতেই সেই প্রবাহ মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল। যাহাই হউক, উত্তর-ভারতের মিশ্র আদি-নর্ডিকদের এবং কিয়ৎপরিমাণে অ্যালপো-দীনারীয়দের আর্যভাষাই সৃজ্যমান বাঙালী জনকে একটা নূতন মানসরূপ দান করিল; আদিম বাঙালীর আদি-অস্ট্রেলীয় ও দ্রাবিড় মন ও প্রকৃতির উপর ব্রাত্য অ্যালপো-দীনারীয় এবং মিশ্র আদি-নর্ডিক নরগোষ্ঠীর মন ও প্রকৃতির চন্দনানুলেপন পড়িল এবং তাহাই বাঙালীকে, বাঙালী-চরিত্রকে একটা স্ফুটতর বৈশিষ্ট্য দান করিল। এই বিবর্তন-পরিবর্তন একদিনে হয় নাই, হাজার বৎসরেরও (খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-সপ্তম শতক হইতে খ্রীষ্টপরবর্তী ষষ্ঠ-সপ্তম শতক পর্যন্ত মোটামুটি) অধিককাল ধরিয়া তাহা চলিয়াছিল। কিন্তু সে তথ্য এবং তথ্যগত বিবরণ ইতিবৃত্তের কথা; এ-অধ্যায়ে তাহার স্থান নাই।

এই অধ্যায়ে আমি যাহা বলিতে চেষ্টা করিলাম, যে-ভাবে অস্ফুট অপরিস্রুত ঐতিহাসিক উষাকালের রেখাচিত্র আঁকিতে, যে-সব ইঙ্গিত দিতে চেষ্টা করিলাম, ঐতিহাসিকেরা সকল ক্ষেত্রে তাহা স্বীকার করিবেন, আমি তাহা আশা করি না। সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট পাথুরে প্রমাণ না পাইলে সাধারণত ইতিহাসের দাবি মেটে না; অথচ যে প্রাগৈতিহাসিক কালের কাহিনী এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তু সেই কালের ঐতিহাসিক-গ্রাহ্য প্রমাণ সুদুর্লভ। তবু, মানুষের জানিবার আকাঙ্ক্ষা দুর্নিবার, সেই আগ্রহে মানুষ নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করে; নরতত্ত্ব, জনতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব এবং প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্ব তাহার কয়েকটি উপায় মাত্র। এইসব উপায়ের সাহায্যে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা এ-পর্যন্ত যে-সব নির্ধারণে পৌঁছিয়াছেন, তাহাই বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া, কিছু রাখিয়া কিছু ছাঁটিয়া, কিছু বাছিয়া, নানা ইঙ্গিতগুলি ফুটাইয়া আমার এই রেখাচিত্র। ঐতিহাসিক কালে বাঙলার ও বাঙালীর যে ইতিহাস আমাদের চোখের সম্মুখে উন্মুক্ত হয়, তাহার সকল তথ্য, সকল ইঙ্গিত, সকল ভাব-কল্পনা, ধ্যান-ধারণা, উপাদান-উপকরণ, আচার-অনুষ্ঠান, গতি-প্রকৃতি ইত্যাদি ঐতিহাসিক কালের তথ্য-প্রমাণের মধ্যে পাওয়া যায় না, সে তথ্য ও প্রমাণ ঐতিহাসিক কাল অতিক্রম করিয়া প্রাগৈতিহাসিক কালের মধ্যে বিস্তৃত। বাঙালীর ইতিহাস বলিতে বসিয়া সেইজন্য সেই অস্ফুট কাল সম্বন্ধে এই সুদীর্ঘ প্রস্তাবের অবতারণা করিতে হইল। শুধু প্রাচীন নয়, আজিকার বাঙালীরও এই ক্ষীণালোকদীপ্ত উষার ইতিহাস যতটুকু সাধ্য জানা প্রয়োজন। এই ইতিহাস বাদ দিলে বাঙালীর ইতিহাস সম্পূর্ণ হয় না; এই কারণেই আমি এমনভাবে এমন ইঙ্গিতে এই ইতিহাস উপস্থিত করিলাম যাহার ফলে বাঙালীর এবং বাঙলার জীবন-প্রবাহের মূল উৎস আমাদের হৃদয়মনের নিকটতর হইতে পারে। "আরম্ভের পূর্বেও আরম্ভ আছে। সন্ধ্যাবেলায় দীপ জ্বালার আগে সকালবেলায় সল্‌তে পাকানো।" এই অধ্যায় সেই 'সকালবেলায় সল্‌তে পাকানো'।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের পাঠনির্দেশ

অতুল সুর, বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, কলিকাতা, ১৯৭৭।

নির্মলকুমার বসু, হিন্দুসমাজের গড়ন, কলিকাতা।

বিজয়চন্দ্র মজুমদার, বাংলা ভাষায় দ্রাবিড়ী উপাদান, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২০, ২০ ভাগ।

শরৎচন্দ্র রায়, ভারতবর্ষের মানব ও মানবসমাজ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪৫, ৪৫ ভাগ।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য, কলিকাতা, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ।

" " বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, তৃতীয় সং, কলিকাতা, ১৯৩৮।

Bagchi, P. C. (*ed* and *trans*), Pre-Aryan and Pre-Dravidian, Calcutta.

Basu M. N, "Blood-groups of the Naluas of Bengal", in *Nature*, 1938, p. 640, and collected papers placed at my disposal.

Chanda. R. P., Indo-Aryan Races. I, Rajsahi, 1916.

Chakladar, H. C., Presidential Address for the Anthropological Section of the XXIIIrd. session of the Indian Science Congress, 1936, Proceedings, pp. 350 90.

Chatterji, S. K., Origin and Development of the Bengali Language, 2 vols, Calcutta, 1926.

" " Indo-Aryan and Hindi.

" " Foundations of Indian Culture, in Tijdschrift van het Konig Bataviaasch Genootschapp van Kunsten en Wetenschappen, LXVIII, 1928.

Ghurye, G. S., Caste and race in India, Bombay, 1923.

Guha, B. S, An Outline of Racial Ethnology of India, in Outline of Field sciences of India, Indian Science Congress Association, 1937.

India, Govt of, Report on the Census of India, 1931, Vol I, Part III, pp. xxxix-lxiii, Vol. V, part I, p. 433 ff.

" " Report on Linguistic Survey of India, Vol. V, p 270 ff.

Mahalanobis, P. C, Analysis of Race-mixture in Bengal, in Journal of the Asiatic Society of Bengal, New Series XXIII, p. 301 ff.

Majumdar, B. C., Origin of the Bengali Language, Calcutta University

Risley, H., The Tribes and Castes of Bengal, 2 Vols, Calcutta, 1891.

,, ,, The Peoples of India, London, 1915.

Raychaudhuri, T. C., Varendra Brahmins of Bengal, in Man in India, 1929.

Von Eicxsted, Rassengeschichte von Indien mit besonderer Beruck-sichtigung von Mysore, in Zeitschrif f. Morph. v. Anthropologie, XXXII, 1933.

,, ,, The History of Anthropological Research in India, being an Introduction to the Travancore tribes and castes, Vol. II, 1939.

তৃতীয় অধ্যায়

দেশ-পরিচয়

যুক্তি

দেশ ও জাতির বাস্তব ইতিহাস জানিতে হইলে সর্বাগ্রে দেশের যথার্থ ভৌগোলিক পরিচয় লওয়া প্রয়োজন। মহাকালের কোনও রূপ নাই; কাল অনন্ত, অব্যয় এবং অরূপ। দেশের আধারকে আশ্রয় করিয়া, অসংখ্য বস্তু ও প্রাণীরূপ পাত্রকে অবলম্বন করিয়া তবে সেই কাল নিজের সীমায়িত রূপ প্রকাশ করে। দেশ এবং পাত্র-নিরপেক্ষ কালের কোনও রূপের কল্পনা অ্যাবস্ট্র্যাক্ট কল্পনা মাত্র, তাহার বস্তুগত ভিত্তি নাই; দেশ এবং পাত্র, অর্থাৎ দেশান্তর্গত বস্তু ও প্রাণী-জগৎ কালকে তাহার বস্তুপ্রতিষ্ঠা দান করে। তখনই সম্ভব হয় কালের বাস্তব স্বরূপ উপলব্ধি করা। তাই, ইতিহাসের অর্থই হইতেছে কাল, দেশ ও পাত্রের যথাযথ বর্ণনা এবং এই ত্রয়ীর সম্মিলিত রূপ ও তাহার ব্যঞ্জনাকে প্রকাশ করা। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে এই ত্রয়ীর তৃতীয়টির, অর্থাৎ পাত্রের (দেশান্তর্গত প্রাণিজগতের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ প্রাণী সেই মানুষের) আদি কথা বলিয়াছি। এই মানুষকে লইয়াই তো মানুষের গর্ব, এবং মনুষ্যসমাজের কথাই ইতিহাসের কথা; কাজেই পরবর্তী সকল অধ্যায়ে তাহাদের কথাই সবটুকু জুড়িয়া থাকিবে। বর্তমান অধ্যায়ে ত্রয়ীর দ্বিতীয়টির অর্থাৎ দেশের বাস্তব বিবরণের কথা বলিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে; কারণ দেশই হইতেছে মানুষের ইতিহাসের ভিত্তি ও পরিবেশ। দেশের বস্তুগত রূপ বহুল পরিমাণে দেশান্তর্গত মানুষের সমাজ, রাষ্ট্র, সাধনা-সংস্কৃতি, আহার-বিহার, বসন-ব্যসন, ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি নির্ণয় করে। কাজেই, বাঙলাদেশের মানুষের কর্মকৃতির কথা বলিবার আগে বাঙলাদেশের বস্তুগত ভৌগোলিক পরিচয় লওয়া অযৌক্তিক হইবে না।

২

সীমা-নির্দেশ

কোনও স্থান বা দেশের রাষ্ট্রীয় সীমা এবং উহার ভৌগোলিক বা প্রাকৃতিক সীমা সর্বত্র সকল সময় এক না-ও হইতে পারে। রাষ্ট্রীয় সীমা পরিবর্তনশীল; রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রসার ও সংকোচনের সঙ্গে সঙ্গে, কিংবা অন্য কোনও কারণে রাষ্ট্রসীমা প্রসারিত ও সংকুচিত হইতে পারে, প্রায়শ হইয়াও থাকে; প্রাচীনকালে হইত, এখনও হয়। প্রাকৃতিক সীমা, যেমন নদনদী, পাহাড়পর্বত, সমুদ্র ইত্যাদি কখনও কখনও রাষ্ট্রসীমা

নির্ধারণ করে সন্দেহ নাই; প্রাচীন ইতিহাসে তাহাই ছিল সাধারণ নিয়ম। কিন্তু, বর্তমান কালে রাষ্ট্রসীমা অনেক সময়ই প্রাকৃতিক সীমাকে অবজ্ঞা করিয়া চলে; বর্তমান যন্ত্র-বিজ্ঞান রাষ্ট্রকে সেই অবজ্ঞার শক্তি দিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, বর্তমান বাঙলাদেশের পশ্চিম ও পশ্চিম-দক্ষিণ সীমা কোনও প্রাকৃতিক সীমাদ্বারা নির্দিষ্ট হয় নাই। কোথায় যে বাঙলাদেশের শেষ, কোথায় যে বিহারের আরম্ভ, কোথায় যে মেদিনীপুর শেষ হইয়া ওড়িশার আরম্ভ, কোথায় যে ত্রিপুরা, মৈমনসিং জেলা শেষ হইয়া শ্রীহট্ট জেলার আরম্ভ, বলা কঠিন। ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক সীমা প্রধানত নির্ণীত হয় ভূপ্রকৃতিগত সীমাদ্বারা, এবং তাহা সাধারণত অপরিবর্তনীয়। দ্বিতীয়ত এক-জনত্বদ্বারা, এবং তৃতীয়ত ভাষার একত্ব দ্বারা। সাধারণত দেখা যায়, বিশিষ্ট প্রাকৃতিক সীমার আবেষ্টনীর মধ্যেই জাতি ও ভাষার একত্ব-বৈশিষ্ট্য গড়িয়া উঠে। অন্তত, প্রাচীন বাঙলায় তাহাই হইয়াছিল। জন ও ভাষার এই একত্ব-বৈশিষ্ট্য বাঙলা-দেশে নিঃসন্দেহে একদিনে গড়িয়া উঠে নাই। প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে আরম্ভ করিয়া এই একত্ব দানা বাঁধিতে বাঁধিতে একেবারে প্রাচীনযুগের শেষাশেষি আসিয়া পৌঁছিয়াছে; বস্তুত, মধ্যযুগের আগে তাহার পূর্ণ প্রকাশ দেখা যায় নাই। বাঙলার বিভিন্ন জনপদরাষ্ট্র তাহাদের প্রাচীন পুণ্ড্র-গৌড়-সুহ্ম-রাঢ়-তাম্রলিপ্ত-সমতট-বঙ্গ-বঙ্গাল-হরিকেল ইত্যাদির ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত করিয়া এক অখণ্ড ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রীয় ঐক্য-সম্বন্ধে যখন আবদ্ধ হইল, যখন বিভিন্ন স্বতন্ত্র নাম পরিহার করিয়া এক বঙ্গ বা বাঙলা নামে অভিহিত হইতে আরম্ভ করিল, তখন বাঙলার ইতিহাসের প্রথম পর্ব অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। প্রাচ্যদেশীয় প্রাকৃত ও মাগধী প্রাকৃত হইতে স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়া, অপভ্রংশ পর্যায় হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বাঙলা ভাষা যখন তাহার যথার্থ আদিম রূপ প্রকাশ করিল তখন আদিপর্ব শেষ না হইলেও প্রায় শেষ হইতে চলিয়াছে। এই জন ও ভাষার একত্ব-বৈশিষ্ট্য লইয়াই বর্তমান বাঙলাদেশ, এবং সেই দেশ চতুর্দিকে বিশিষ্ট ভৌগোলিক বা প্রাকৃতিক সীমাদ্বারা বেষ্টিত। বর্তমান রাষ্ট্রসীমা এই প্রাকৃতিক ইঙ্গিত অনুসরণ করে নাই সত্য, কিন্তু ঐতিহাসিককে সেই ইঙ্গিতই মানিয়া চলিতে হয়, তাহাই ইতিহাসের নির্দেশ।

উত্তর সীমা

বিশিষ্ট প্রাকৃতিক সীমায় সীমিত, জাতি ও ভাষার একত্ব-বৈশিষ্ট্য লইয়া আজিকার যে বাঙলাদেশ সেই দেশের উত্তর-সীমায় সিকিম এবং হিমালয়-কিরীট কাঞ্চনজঙ্ঘার শুভ্র-তুষারময় শিখর; তাহারই নিম্ন উপত্যকায় বাঙলার উত্তরতম দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা। এই দুই জেলার পশ্চিমে নেপাল, পূর্বে ভোটান রাজ্যসীমা। গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্তের

আমলেই দেখিতেছি, নেপাল তাঁহার রাজ্যের পূর্বতম অংশের উত্তরতম প্রত্যন্ত দেশ। দার্জিলিং-জলপাইগুড়ি-কোচবিহার এই তিনটি জেলাই প্রধানত পার্বত্য কোমদ্বারা অধ্যুষিত; কোচ, রাজবংশী, ভোটিয়া—ইহারা সকলেই ভোট-ব্রহ্ম জনের বিভিন্ন শাখা-উপশাখা। কিন্তু, উত্তর-পূর্ব দিকে রংপুর-কোচবিহারের বর্তমান রাষ্ট্রসীমা কিছু প্রাকৃতিক সীমা নয়, সে-সীমা একেবারে ব্রহ্মপুত্রনদ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই নদই প্রাচীনকালে পুণ্ড্রবর্ধন ও কামরূপ রাজ্যের যথাক্রমে পূর্ব ও পশ্চিম সীমা নির্দেশ করিত। সত্য, কামরূপের রাষ্ট্রসীমা কখনও কখনও করতোয়া অতিক্রম করিয়া বাঙলার উত্তরতম জেলাগুলি—রংপুর-কোচবিহার-জলপাইগুড়ি—অতিক্রম করিয়া উত্তর বিহারের প্রাচীন কোশীনদ স্পর্শও হয়তো করিত; তৎসত্ত্বেও ব্রহ্মপুত্রই (এবং কখনও কখনও হয়তো করতোয়া) যে ছিল মোটামুটি কামরূপ রাজ্যসীমা, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। ঐতিহাসিক কালের অধিকাংশ পর্বেই ব্রহ্মপুত্রের উত্তর ও দক্ষিণ উপত্যকাভূমিতে কামরূপের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রভুত্ব বিস্তৃত ছিল। এই হিসাবে বর্তমান গোয়ালপাড়া জেলার অধিকাংশই পুণ্ড্রবর্ধনের সীমাভুক্ত ছিল এই অনুমান অসংগত নয়; মধ্যযুগে তো উত্তর ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার পশ্চিমতম প্রান্ত বাঙলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভুত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিলই।

পূর্ব সীমা

বাঙলার পূর্ব সীমায় উত্তরে ব্রহ্মপুত্রনদ, মধ্যে গারো, খাসিয়া ও জৈন্তিয়াপাহাড়; দক্ষিণে লুসাই, চট্টগ্রাম ও আরাকান শৈলমালা। গারো-খাসিয়া জৈন্তিয়াশৈলশ্রেণীর বিন্যাস দেখিলে স্পষ্টতই বুঝা যায়, বাঙলার সীমা এই পার্বত্যদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। গোয়ালপাড়া জেলার মতো শ্রীহট্ট এবং কাছাড় জেলার বিস্তৃদংশের লোকও বাঙলা-ভাষাভাষী, এবং সামাজিক স্মৃতিশাসন, আচার ব্যবহার, রীতিনীতিও বাঙলা-ভাষাভাষীর; জন এবং জাতও বাঙালীর এবং বাঙলার! তাহা ছাড়া, বরাক ও সুরমানদীর উপত্যকা তো মেঘনা-উপত্যকারই (মৈমনসিং ত্রিপুরা ঢাকা) উত্তরাংশ মাত্র। এই দুই উপত্যকার মধ্যে প্রাকৃতিক সীমা কিছু নাই বলিলেই চলে, এবং এই কারণেই প্রাচীন ও মধ্যযুগে পূর্ব-বাঙলার এই কয়টি জেলার—বিশেষভাবে ত্রিপুরা ও পূর্ব মৈমনসিং জেলার—সংস্কার ও সংস্কৃতি এত সহজে শ্রীহট্ট-কাছাড়ে বিস্তারলাভ করিতে পারিয়াছিল। এখনও শ্রীহট্ট-কাছাড়ের হিন্দু-মুসলমানের সমাজ ও সংস্কৃতি বাঙলার পূর্বতম জেলাগুলির সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা। শুধু তাহাই নয়, লৌকিক ও অর্থনৈতিক বন্ধনও বাঙলার এই জেলাগুলির সঙ্গে। সিলেট-সরকার আকবরের আমলে সুবা বাঙলার অন্তর্গত ছিল; ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে এই দুই জেলা ঢাকা বিভাগের অন্তর্গত ছিল। শ্রীহট্টের দক্ষিণে ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম-শৈলশ্রেণী এই দুই জেলা হইতে শ্রীহট্টকে পৃথক করিয়াছে। ত্রিপুরার উত্তরে ও পূর্বে ত্রিপুরা-শৈলমালা

পার্বত্য চট্টগ্রামকে ত্রিপুরা হইতে পৃথক করিয়াছে ; দক্ষিণ ত্রিপুরার সঙ্গে নোয়াখালি এবং সমতল চট্টগ্রামের যোগাযোগ। যাহা হউক, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম শৈলশ্রেণী বাঙলাদেশকে যে লুসাই জেলা এবং ব্রহ্মদেশ হইতে পৃথক করিয়াছে, তাহা সুস্পষ্ট। এইসব কারণেই এই দুটি শৈলশ্রেণী বাঙলার পূর্ব-দক্ষিণ সীমা-নির্দেশক।

পশ্চিম সীমা

বাঙলার বর্তমান পশ্চিম সীমা পূর্ব-সীমাপেক্ষাও অধিক খর্বীকৃত হইয়াছে। উত্তর প্রান্তে মালদহ ও দিনাজপুর জেলার উত্তর ও পশ্চিম সীমাই আধুনিক বাঙলার সীমা নির্দেশ করিতেছে। অথচ, প্রাচীন ও মধ্যযুগে এই সীমা দক্ষিণে গঙ্গার তট বাহিয়া একেবারে বর্তমান দ্বারভাঙ্গা জেলার পশ্চিম সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দ্বারভাঙ্গা তো দ্বারবঙ্গ (বা বঙ্গের দ্বার) শব্দেরই আধুনিক বিকৃত রূপ। পূর্ণিয়া সরকার তো আকবরের আমলেও বাঙলা সুবার অন্তর্গত ছিল। তাহা ছাড়া, কি ভূমি-প্রকৃতিতে কি প্রাচীন ভাষায় উত্তর-বিহার ও মিথিলার সঙ্গে উত্তর বঙ্গ বা গৌড়-পুণ্ড্র-বরেন্দ্রীর পার্থক্য অল্পই ছিল। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে মিথিলাই তো ছিল অন্যতম বিদ্যা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র যাহাকে বাঙলার পণ্ডিতেরা পরমতীর্থ বলিয়া মনে করিতেন। মৈথিল কবি বিদ্যাপতি বাঙালীরও পরমপ্রিয় কবি। উত্তর-বঙ্গের এবং শ্রীহট্টের কোথাও কোথাও বহুদিন পর্যন্ত মৈথিল স্মৃতির প্রচলন ছিল, এখনও আছে ; বাচস্পতি মিশ্রের স্মৃতি এখনও শ্রীহট্টের কোনও কোনও টোলে পঠিত হইয়া থাকে, প্রচুর প্রাচীন পাণ্ডুলিপিও পাওয়া যায়। শ্রীহট্ট সাহিত্য-পরিষদ-গ্রন্থাগারে বাচস্পতি মিশ্রের স্মৃতিগ্রন্থের অনেকগুলি পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে। এই দুই ভূমির, অর্থাৎ উত্তর-বঙ্গ ও উত্তর-বিহারের মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবধান রচিত হইয়াছে মধ্যযুগে। প্রাচীনকালে এই ব্যবধান ছিল না, এই দুই ভূমি একই ভূমি বলিয়া গণ্য হইত, এমন মনে করিবার ঐতিহাসিক কারণ বিদ্যমান। এই দুই ভূমির মধ্যে প্রাকৃতিক ব্যবধানও কিছু নাই, ভূ প্রকৃতিরও কিছু বিভিন্নতা নাই। উত্তর-বিহারের দক্ষিণ সীমা ধরিয়া, রাজমহলপাহাড়ের ভিতর দিয়া, মালদহের পশ্চিম ও দক্ষিণ সীমা ঘেঁষিয়া গঙ্গা বাঙলাদেশে আসিয়া ঢুকিয়াছে। রাজমহল ও গঙ্গার দক্ষিণে বর্তমান সাঁওতাল পরগনা প্রাচীন উত্তর-রাঢ়ের উত্তর-পশ্চিমতম অংশ ; ভবিষ্যপুরাণে এই ভূমিকে বলা হইয়াছে অজলা, ঊষর, জাঙ্গলময় ভূমি, যেখানে কিছু কিছু লৌহ আকর আছে, যেখানে তিনভাগ জঙ্গল, একভাগ গ্রাম, স্বল্পভূমি মাত্র উর্বর। ভবদেব ভট্টের একাদশ শতকীয় লিপিতেও এই ভূমিকে বলা হইয়াছে ঊষর ও জাঙ্গলময়। ইহাই য়ুয়ান-চোয়াঙ-বর্ণিত কজঙ্গল। সপ্তম শতকে রাজা জয়নাগের (রাজধানী কর্ণসুবর্ণ ?) বপ্পঘোষবাট পট্টোলীতে ঔদুম্বরিক বিষয় নামে একটি ক্ষুদ্র জনপদের উল্লেখ আছে।

আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে ঔদম্বর সরকার পূর্ণিয়া-সরকারের দক্ষিণ সীমা হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে মুরশিদাবাদ-বীরভূম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রাজমহল (তদানীন্তন আক্‌মহল) এই ঔদম্বর সরকারের অন্তর্গত ছিল। বস্তুত, রাজমহল ও সাঁওতাল পরগনার কিয়দংশ যে বাঙলার অন্তর্গত ছিল, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে না। বাঁকুড়ার পশ্চিম-সীমায় মানভূম জেলা বর্তমান বিহারের অন্তর্গত; অথচ, এই মানভূম প্রাচীন মল্লভূমি-মালভূমেরই অন্তর্গত। বাঁকুড়া ও মানভূমের ভিতর কোনও প্রাকৃতিক সীমা নাই; সেই সীমা মানভূম অতিক্রম করিয়া একেবারে ছোটনাগপুরের শৈলশ্রেণী পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এই শৈলশ্রেণীই এই দিকে প্রাচীন বাঙলার সীমা। ভাষায়, ভূ-প্রকৃতিতে, সমাজ ও কৌমবিন্যাসে সাঁওতাল পরগনার সঙ্গে যেমন উত্তর-বীরভূমের, তেমনই মানভূমের সঙ্গে বাঁকুড়ার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। দক্ষিণে মেদিনীপুরের পশ্চিম-দক্ষিণ-সীমায় বালেশ্বর জেলা ওড়িশার অন্তর্গত, এবং সিংভূম বিহারের। এই দুইটি জেলারই কতকাংশ মেদিনীপুর জেলার যথাক্রমে কাঁথি, সদর ও ঝাড়গ্রাম মহকুমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে যুক্ত—ভাষায়, ভূ-প্রকৃতিতে, সামাজিক সংস্কৃতিতে এবং কৌমবিন্যাসে। সম্প্রতি মেদিনীপুর সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত মহারাজ শশাঙ্কের যে তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার হইয়াছে তাহাতে দেখা যাইতেছে, উৎকলদেশও সপ্তম শতকে দণ্ডভুক্তির (বর্তমান দাঁতনের) অন্তর্গত ছিল। যেকোনও প্রাকৃতিক ভূমি-নকশা বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যাইবে রাজমহল হইতে এক অনুচ্চ শৈলশ্রেণী এবং গৈরিক পার্বত্যভূমি দক্ষিণে সোজা প্রসারিত হইয়া একেবারে ময়ূরভঞ্জ-কেওঞ্জর-বালেশ্বর স্পর্শ করিয়া সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। এই শৈলমালা এবং গৈরিক মালভূমিই সাঁওতাল পরগনা, ছোটনাগপুর, মানভূম, সিংভূম, এবং ময়ূরভঞ্জ-বালেশ্বর-কেওঞ্জরশৈলমালার অরণ্যময় গৈরিক উচ্চভূমি এবং বাঙলার স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পশ্চিম সীমা। বাঙলার ভাষা, সমাজবিন্যাস, জন ও কৌমবিন্যাস এবং উত্তর-রাঢ় ও পশ্চিম-দক্ষিণ মেদিনীপুরের ভূ প্রকৃতি এই সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত।

দক্ষিণ সীমা

বাঙলার দক্ষিণ-সীমায় বঙ্গোপসাগর এবং তাহারই তট ঘিরিয়া চব্বিশ পরগনা-খুলনা-বরিশাল ফরিদপুর-ঢাকা-ত্রিপুরার দক্ষিণতম প্রান্ত (অর্থাৎ চাঁদপুর) নোয়াখালি-চট্টগ্রামের সমতটভূমির সবুজ বনময় অথবা শস্যশ্যামল আস্তরণ। এই আস্তরণ অসংখ্য ক্ষুদ্রবৃহৎ নদনদী-খাটিখাড়ি-খালনালা-বিলজলা-হাওর (হায়র=সায়র=সাগর) ইত্যাদিতে সমাচ্ছন্ন। এই জেলাগুলির অধিকাংশ নিম্নভূমি ক্রমশ গড়িয়া উঠিয়াছে অসংখ্য নদনদীবাহিত পলিমাটি এবং সাগরগর্ভতাড়িত বালুকারাশির সমন্বয়ে, প্রাগৈতিহাসিক কালে,—এবং বোধহয় কতকটা ঐতিহাসিক কালেও।

সূত্র-সংক্ষিপ্ততায় এখন এইভাবে বোধহয় বাঙলার সীমা-নির্দেশ করা চলে : উত্তরে হিমালয় এবং হিমালয়ধৃত নেপাল, সিকিম ও ভোটান রাজ্য ; উত্তর-পূর্বদিকে ব্রহ্মপুত্রনদ ও উপত্যকা ; উত্তর-পশ্চিম দিকে দ্বারবঙ্গ পর্যন্ত ভাগীরথীর উত্তর সমান্তরালবর্তী সমভূমি ; পূর্বদিকে গারো খাসিয়া জৈন্তিয়া-ত্রিপুরা-চট্টগ্রামশৈলশ্রেণী বাহিয়া দক্ষিণ সমুদ্র পর্যন্ত ; পশ্চিমে রাজমহল সাঁওতাল পরগনা ছোটনাগপুর-মানভূম ধলভূম কেওঞ্ঝর-ময়ূরভঞ্জের শৈলময় অরণ্যময় মালভূমি ; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। এই প্রাকৃতিক সীমাবিধৃত ভূমিখণ্ডের মধ্যেই প্রাচীন বাঙলার গৌড়-পুণ্ড্র-বরেন্দ্রী রাঢ়-সুহ্ম তাম্রলিপ্তি-সমতট-বঙ্গ-বঙ্গাল-হরিকেল প্রভৃতি জনপদ ; ভাগীরথী করতোয়া-ব্রহ্মপুত্র পদ্মা মেঘনা এবং আরও অসংখ্য নদনদীবিধৌত বাঙলার গ্রাম. নগর, প্রান্তর, পাহাড়, কান্তার। এই ভূখণ্ডই ঐতিহাসিক কালের বাঙালীর কর্মকৃতির উৎস এবং ধর্ম কর্ম নর্মভূমি। একদিকে সু-উচ্চ পর্বত, দুইদিকে কঠিন শৈলভূমি, আর একদিকে বিস্তীর্ণ সমুদ্র; মাঝখানে সমভূমির সাম্য—ইহাই বাঙালীর ভৌগোলিক ভাগ্য। আজ হিমালয় আমাদের নামমাত্রই ; সমুদ্রও বুঝি নামমাত্র ; তাম্রলিপ্তি সত্যই সকরুণ স্মৃতি। সাম্প্রতিক বাঙলার উত্তরে তরাই বনভূমি, দক্ষিণে সুন্দরবন ও তৃণাস্তীর্ণ জলাভূমি। এই দুইয়ে মিলিয়া যেন বাঙলাদেশকে উষ্ণ জলীয়তার ক্লান্ত অবসাদে ঘিরিয়া ধরিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর এক বাঙালী কবির লেখনীতে এই ভৌগোলিক ভাগ্য সুন্দর কাব্যময় রূপ গ্রহণ করিয়াছে। কবিতাটি সমগ্র উদ্ধৃতির দাবি রাখে :

> হিমালয় নাম মাত্র
> আমাদের সমুদ্র কোথায় ?
> টিম্ টিম্ করে শুধু খেলো দুটি বন্দরের বাতি।
> সমুদ্রের দুঃসাহসী জাহাজ ভেড়ে না সেথা ;
> —তাম্রলিপ্তি সকরুণ স্মৃতি।
> দিগন্ত-বিস্তৃত স্বপ্ন সমতল উর্বর ক্ষেতের আছে বটে ;
> কত উগ্র নদী সেই স্বপনেতে গেল মজে হেজে ;
> একা পদ্মা মরে মাথা কুটে।
>
> উত্তরে উত্তুঙ্গ গিরি
> দক্ষিণেতে দুরন্ত সাগর
> যে দারুণ দেবতার বর
> মাঠভরা ধান দিয়ে শুধু
> গান দিয়ে নিরাপদ খেয়া তরণীর
> পরিতৃপ্ত জীবনের ধন্যবাদ দিয়ে
> তারে কভু তুষ্ট করা যায় !

ছবির মতন গ্রাম
স্বপনের মতন শহর
যতো পারো গড়ো,
অর্চনার চূড়া তুলে ধরো
তারাদের পানে :
তবু জেনো আরো এক মৃত্যুদীপ্ত মানে
ছিল এই ভূখণ্ডের,
—ছিল সেই সাগরের পাহাড়ের দেবতার মনে,
সেই অর্থ লাঞ্ছিত যে তাই,
আমাদের সীমা হলো
দক্ষিণে সুন্দরবন
উত্তরে টেরাই !

- প্রেমেন্দ্র মিত্র

৩

নদনদী

বাঙলার ইতিহাস রচনা করিয়াছে বাঙলার ছোট-বড় অসংখ্য নদনদী। এই নদনদীগুলিই বাঙলার প্রাণ; ইহারাই বাঙলাকে গড়িয়াছে, বাঙলার আকৃতি-প্রকৃতি নির্ণয় করিয়াছে যুগে যুগে, এখনও করিতেছে। এই নদনদীগুলিই বাঙলার আশীর্বাদ; এবং প্রকৃতির তাড়নায়, মানুষের অবহেলায় কখনও কখনও বোধহয় বাঙলার অভিশাপও। এইসব নদনদী উচ্চতর ভূমি হইতে প্রচুর পলি বহন করিয়া আনিয়া বঙ্গের ব-দ্বীপের নিম্নভূমিগুলি গড়িয়াছে, এখনও সমানে গড়িতেছে; সেইহেতু বদ্বীপ-বঙ্গের ভূমি কোমল, নরম ও কমনীয়। এবং পশ্চিম, উত্তর এবং পূর্ববঙ্গের কিয়দংশ ছাড়া বঙ্গের প্রায় সবটাই ভূতত্ত্বের দিক হইতে নবসৃষ্টভূমি (new alluvim)। এই কোমল, নরম ও নমনীয় ভূমি লইয়া বাঙলার নদনদীগুলি ঐতিহাসিক কালে কত খেলাই না খেলিয়াছে; উদ্দাম প্রাণলীলায় কতবার যে পুরাতন খাত ছাড়িয়া নূতন খাতে, নূতন খাত ছাড়িয়া আবার নূতনতর খাতে বর্ষা ও বন্যার বিপুল জলধারাকে দুরন্ত অশ্বের মতো, মত্ত ঐরাবতের মতো ছুটাইয়া লইয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সহসা খাতপরিবর্তনে কত সুরম্য নগর, কত বাজার-বন্দর, কত

বৃক্ষশ্যামল গ্রাম, শস্যশ্যামল প্রান্তর, কত মঠ ও মন্দির, মানুষের কত কীর্তি ধ্বংস করিয়াছে, আবার নূতন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছে, কত দেশখণ্ডের চেহারা ও সুখ-সমৃদ্ধি একেবারে বদলাইয়া দিয়াছে তাহার হিসাবও ইতিহাস সর্বত্র রাখিতে পারে নাই। প্রকৃতির এই দুরন্ত লীলার সঙ্গে মানুষ সর্বদা আঁটিয়া উঠিতে পারে নাই, অনেক সময়ই হার মানিয়াছে; তাহার উপর আবার দূরদৃষ্টিহীন মানুষের দুর্বুদ্ধি সাময়িক লোভ ও লাভের হিসাব বড় করিয়া দেখিতে গিয়া জল-নিকাশের এবং প্রবাহের এইসব স্বাভাবিক পথগুলির সঙ্গে যথেচ্ছাচারের ত্রুটি করে নাই। এখনও তাহার বিরাম নাই। তাহার ফলে এইসব নদনদী বন্যায় মহামারীতে দেশকে ক্ষণে ক্ষণে উজাড় করিয়া দিয়া, অথবা সুবিস্তৃত দেশখণ্ডকে শস্যহীন শ্মশানে পরিণত করিয়া মানুষের উপর প্রতিশোধ লইতে ত্রুটি করে নাই। প্রাচীনকালে এই নদনদীগুলির প্রবাহপথের, এবং দুরন্ত প্রাণলীলার সঠিক এবং সুস্পষ্ট ইতিহাস আমাদের কাছে উপস্থিত নাই। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতক হইতে নদনদীগুলির ইতিহাস যতটা সুস্পষ্ট ধরিতে পারা যায় নানা দেশী-বিদেশী বিবরণের এবং নকশার সাহায্যে, প্রাচীন বাঙলা সম্বন্ধে তাহা কিছুতেই সম্ভব নয়। তবে নদনদীগুলির প্রবাহপথের যে চেহারা, তাহাদের যে আকৃতি-প্রকৃতি এখন আমাদের দৃষ্টি ও বুদ্ধি গোচর, প্রাচীন বাঙলায় সেই চেহরা, সেই আকৃতি-প্রকৃতি অনেকেরই ছিল না। অনেক পুরাতন পথ মরিয়া গিয়াছে, প্রশস্ত খরস্রোতা নদী সংকীর্ণ ক্ষীণস্রোতা হইয়া পড়িয়াছে; অনেক নদী নূতন খাতে নূতনতর আকৃতি-প্রকৃতি লইয়া প্রবাহিত হইতেছে। কোন কোনও ক্ষেত্রে পুরাতন নামও হারাইয়া গিয়াছে, নদীও হারাইয়া গিয়াছে; নূতন নদীর নূতন নামের সৃষ্টি হইয়াছে! এইসব নদনদীর ইতিহাসই বাঙলার ইতিহাস। ইহাদেরই তীরে তীরে মানুষ সৃষ্ট সভ্যতার জয়যাত্রা, মানুষের বসতি, কৃষির পত্তন, গ্রাম, নগর, বাজার, বন্দর, সম্পদ, সমৃদ্ধি, শিল্প-সাহিত্য, ধর্মকর্ম সব-কিছুর বিকাশ। বাঙলার শস্যসম্পদ একান্তই এই নদীগুলির দান। উচ্ছলিত উচ্ছ্বসিত উদ্দাম বন্যায় মানুষের ঘরবাড়ি ভাঙিয়া যায়, মানুষ গৃহহীন পশুহীন হয়; আবার এই বন্যাই তাহার মাঠে মাঠে সোনা ফলায় পলি ছড়াইয়া, এই পলিই সোনার সারমাটি। বাঙালী তাই এই নদীগুলিকে ভয়ভক্তি যেমন করিয়াছে, ভালও তেমনই বাসিয়াছে; রাক্ষসী কীর্তিনাশা বলিয়া গাল যেমন দিয়াছে, তেমনই ভালবাসিয়া নাম দিয়াছে ইছামতী, ময়ূরাক্ষী, কবতাক্ষ (কপোতাক্ষ), চূর্ণী, রূপনারায়ণ, দ্বারকেশ্বর, সুবর্ণরেখা, কংসাবতী, মধুমতী, কৌশিকী, দামোদর, অজয়, করতোয়া, ত্রিস্রোতা, মহানন্দা, মেঘনা (মেঘনাদ বা মেঘানন্দ ?), সুরমা, লৌহিত্য (ব্রহ্মপুত্র)। বস্তুত, বাঙলার, শুধু বাঙলারই বা কেন, ভারতবর্ষের নদীগুলির নাম কী সুন্দর অর্থ ও ব্যঞ্জনা ময়!

বাঙলার এই নদীগুলি সমগ্র পূর্ব-ভারতের দায় ও দায়িত্ব বহন করে। উত্তর ভারতের প্রধানতম দুইটি নদীর—গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের—বিপুল নদীজলধারা, পলিপ্রবাহ, এবং পূর্ব-

যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও আসামের বৃষ্টিপাতপ্রবাহ বহন করিয়া সমুদ্রে লইয়া যাইবার দায়িত্ব বহন করিতে হয় বাঙলার কমনীয় মাটিকে। সেই মাটি সর্বত্র এই সুবিপুল জলপ্রবাহ বহন করিবার উপযুক্ত নয়। এই জলপ্রবাহ নূতন ভূমি যেমন গড়ে, মাঠে যেমন শস্য ফলায়, তেমনই ভূমি ভাঙেও, শস্য বিনাশও করে। বাঙালী ক্রোধভরে পদ্মাকে বলিয়াছে কীর্তিনাশা, পদ্মা বাঙালীর অনেক কীর্তিই নষ্ট করিয়াছে সত্য—করিবে না ই বা কেন? গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনার সুবিপুল জলধারা নিম্নতম প্রবাহে সে একা বহন করে, তাহাতে আসিয়া নামে প্রচুর বৃষ্টিপ্রবাহ, নিম্নভূমির সাগরপ্রমাণ বিল-হাওরের অগাধ জলরাশি। দুর্দম মত্ততার অধিকার তাহার না থাকিলে থাকিবে কাহার? এবং, সেই মত্ততা নরম নমনীয় নূতন মাটির উপর! ফল যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে ও হইতেছে। অথচ, এই মেঘনা-পদ্মাই তো আবার স্বর্ণশস্যের আকর; এই পদ্মার দুই তীরেই তো বাঙলার ঘনতম মনুষ্য বসতি, সমৃদ্ধ ঐশ্বর্যের লীলা। মানুষ যদি পদ্মা-মেঘনাকে বশে আনিতে না পারিয়া থাকে, সে যদি আপন দুর্বুদ্ধিবশে ইহাদের মত্ততাকে আরও নির্মম আরও দুরন্ত করিয়া থাকে, তবে সেই দোষ পদ্মা মেঘনার নয়! কিন্তু, ইতিহাস আলোচনায় এসব জল্পনা হয়তো অবান্তর!

উপাদান

বাঙলার ভূ-প্রকৃতিতে নদীর খাত যুগে যুগে পরিবর্তিত হওয়া, পুরাতন নদী মজিয়া মরিয়া যাওয়া, নূতন নদীর সৃষ্টি কিছুই অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। ষোড়শ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া উনবিংশ শতকের শেষ, এই চারি শতাব্দীর মধ্যে বাঙলার প্রধান-অপ্রধান ছোটবড় কত নদনদী যে কতবার খাত বদলাইয়াছে, কত পুরাতন নদী মরিয়াছে, কত নূতন নদীর সৃষ্টি হইয়াছে তাহার কিছু কিছু হিসাব পাওয়া যায় বাঙলার সমসাময়িক ভূমি-নকশায়। বর্তমান বাঙলায় নদীগুলির যে প্রবাহপথ, আকৃতি-প্রকৃতি এখন আমরা দেখিতেছি, একশত বৎসর পূর্বেও এইসব নদনদীর এই প্রবাহপথ, আকৃতি-প্রকৃতি ছিল না। ষোড়শ ও অষ্টাদশ শতকের মধ্যে Jao de Barros (1550), Gastaldi (1561), Hondivs (1614), Cantelli da Vignolla (1683), Van den Broucke (1660), G. Delisl (1720-1740), Izzak Tirion (1730), F. de Witt (1726), de l' Auville (1752), Thornton, Rennel (1764-1776) প্রভৃতি পর্তুগীজ, ডাচ ও ইংরাজ বণিক, রাজকর্মচারী ও পণ্ডিতেরা বাঙলা ও ভারতবর্ষের অনেকগুলি নকশা রচনা করিয়াছিলেন। মধ্যযুগে বাঙলার নদনদী ও জনপদগুলির ক্রমপরিবর্তমান আকৃতি, পুরাতন নদীর মৃত্যু, নূতন নদীর জন্ম—সমস্তই এই নকশাগুলিতে ধরিতে পারা যায়। আমাদের চোখের উপর এই পরিবর্তন এখনও চলিতেছে; যমুনার খাতে ব্রহ্মপুত্রের

নূতনতর প্রবাহ, ভৈরব, কুমার প্রভৃতি নদীর আসন্ন মৃত্যু ইত্যাদি তো সমসাময়িক কালের কথা। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতক হইতে নানা পরিবর্তনের ভিতর দিয়া নদনদীগুলির—এবং সঙ্গে সঙ্গে জনপদগুলিরও—ক্রমপরিণতি এখন অনেকটা স্পষ্ট। শুধু নক্শাগুলিতেই নয়, ইবন্ বতুতা (1328 1354), বারনি (চতুর্দশ শতক), রাল্‌ফ্ ফিচ্ (Ralph Fitch, 1583-91), Fernandes (1598), Fonseca (1599) প্রভৃতি বিদেশী পর্যটকদের বিবরণী, বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল, মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, গোবিন্দদাসের কড়চা, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল জাতীয় সাহিত্যগ্রন্থ এবং মুসলমান লেখকদের সমসাময়িক ইতিহাসেও এই পরিবর্তনের চেহারা ধরিতে পারা কঠিন নয়। সাম্প্রতিক কালে নদীমাতৃক বাঙলার এই ক্রমপরিবর্তমান আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনাও যথেষ্ট হইয়াছে। কাজেই এখানে সে-সব কথার পুনরালোচনা করিয়া লাভ নাই। ষোড়শ শতকের পরেই শুধু নয়, আগেও বাঙলার প্রধান প্রধান নদনদীগুলি যুগে যুগে এই ধরনের পরিবর্তনের মধ্য দিয়া গিয়াছে, এমন অনুমান কিছুতেই অসংগত নয় ; তাহার কিছু কিছু প্রমাণও আছে। কারণ, প্রাচীন সাহিত্যে, টলেমির নক্শায় ও প্রাচীন লিপিমালায় বাঙলার দুই-চারিটি নদনদীর প্রবাহপথ সম্বন্ধে যে-ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাহা বর্তমান প্রবাহপথ তো নয়ই, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের প্রবাহপথের সঙ্গেও তাহার মিল নাই। অষ্টাদশ শতকে রেনেলের, সপ্তদশ শতকে ফান্ ডেন্ ব্রোকের, এবং ষোড়শ শতকে জাও ডি বারোসের নক্শায় নদনদীগুলির গতিপথ অনেকটা পরিষ্কার দেখানো হইয়াছে। এই তিন নক্শার তুলনামূলক আলোচনা করিয়া পশ্চাৎক্রম অনুসরণ করিলে হয়তো মধ্যযুগপূর্ব বাঙলার নদনদীর চেহারা ধরিতে পারা খানিকটা সহজ হইবে। টলেমির নক্শা (দ্বিতীয় শতক) নানা দোষে দুষ্ট, ঐতিহাসিকদের কাছে তাহা অজ্ঞাত নয়। সুতরাং সেই নক্শার উপর খুব বেশি নির্ভর করা চলে না ; তবু কিছু কিছু ইঙ্গিত পাওয়া একেবারে অসম্ভব না ও হইতে পারে।

গঙ্গা-ভাগীরথী

গঙ্গা-ভাগীরথী লইয়াই আলোচনা আরম্ভ করা যাইতে পারে। রাজমহলের সোজা উত্তর-পশ্চিমে গঙ্গার তীর প্রায় ঘেঁষিয়া তেলিগড় ও সিক্রিগলির সংকীর্ণ গিরিবর্ত্ম—বাঙলার প্রবেশপথ। এই পথের প্রবেশদ্বারেই কেন লক্ষ্মণাবতী-গৌড়, পাণ্ডুয়া, টাণ্ডা, রাজমহল মধ্যযুগে বহুদিন একের পর এক বাঙলার রাজধানী ছিল তাহা অনুমান করা কঠিন নয় ; সামরিক ও রাষ্ট্রীয় কারণেই তাহা প্রয়োজন হইয়াছিল। এই গিরিবর্ত্ম দুইটি ছাড়িয়া রাজমহলকে স্পর্শ করিয়া গঙ্গা বাঙলার সমতল ভূমিতে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। ফান্ ডেন ব্রোকের (১৬৬০) নক্শায় দেখিতেছি, রাজমহলের কিঞ্চিৎ

দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া, মুর্শিদাবাদ-কাশিমবাজারের মধ্যে গঙ্গার তিনটি দক্ষিণ-বাহিনী শাখার জল কাশিমবাজারের একটু উত্তর হইতে একত্র বাহিত হইয়া সোজা দক্ষিণবাহিনী হইয়া চলিয়া গিয়াছে সমুদ্রে, বর্তমান গঙ্গা-সাগরসঙ্গমতীর্থে। কিঞ্চিদধিক এক শতাব্দী পর রেনেলের নক্‌শায় দেখিতেছি, রাজমহলের দক্ষিণ পূর্বে তিনটি বিভিন্ন শাখা একটি মাত্র শাখায় রূপান্তরিত এবং তাহাই (সুতি হইতে গঙ্গাসাগর) দক্ষিণবাহিনী গঙ্গা। যাহাই হউক, রেনেল কিন্তু এই দক্ষিণবাহিনী নদীটিকে গঙ্গা বলিতেছেন না ; তিনি গঙ্গা বলিতেছেন আর একটি প্রবাহকে, যে-প্রবাহটি অধিকতর প্রশস্ত, জীবন্ত এবং দুর্দম, যেটি পূর্ব দক্ষিণবাহিনী হইয়া বর্তমান বাঙলার হৃদয়-দেশের উপর দিয়া তাহাকে দ্বিধা-বিভক্ত করিয়া বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া সমুদ্রে অবতরণ করিয়াছে, আমরা যাহাকে বলি পদ্মা। ফান্ ডেন ব্রোক্ এবং রেনেল দুজনের নক্‌শাতেই দেখিতেছি গঙ্গার সুবিপুল জলধারা বহন করিতেছে পদ্মা ; দক্ষিণবাহিনী নদীটি ক্ষীণতরা। ফান্ ডেন ব্রোক্ বা রেনেল যে-নামেই এই দুইটি নদীকে অভিহিত করুন না কেন, দেশের ঐতিহ্যে এই নদীদুইটির নাম কী ছিল দেখা যাইতে পারে। ফান্ ডেন ব্রোকের আড়াই শত বৎসর আগে কবি কৃত্তিবাসের কাল (১৩২০ শক=১৪১৫-১৬ খ্রী)। কৃত্তিবাসের পিতৃভূমি ছিল বঙ্গে (পূর্ব-বাঙ্গালায়) ; তাঁহার পূর্বপুরুষ নরসিংহ ওঝা বঙ্গ (ভাগ) ছাড়িয়া গঙ্গাতীরে ফুলিয়াগ্রামে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন, যে-ফুলিয়ার 'দক্ষিণে-পশ্চিমে বহে গঙ্গা তরঙ্গিণী'। নিঃসন্দেহে পূর্বোক্ত দক্ষিণবাহিনী নদী আমরা যাহাকে বলি ভাগীরথী (বর্তমান হুগলীনদী) তাহার কথাই কৃত্তিবাস বলিতেছেন। কিন্তু, এই গঙ্গা ছোট-গঙ্গা। কারণ, এগার পার হইয়া কৃত্তিবাস যখন বার বৎসরে প্রবেশ করিলেন তখন 'পাঠের নিমিত্ত গেলাম বড়-গঙ্গা পার', এবং সেখানে নানা বিদ্যা অর্জন করিয়া তদানীন্তন গৌড়েশ্বর রাজা কংস বা গণেশের সভায় রামায়ণ রচনা করিলেন। নিশ্চিত যে, এই বড়গঙ্গাই পদ্মা। এই কথার আরও সমর্থন পাওয়া যায় কৃত্তিবাস রামায়ণের অন্যতম একটি পুঁথিতে। কৃত্তিবাস নিজ বাল্যজীবনের কথা বলিতেছেন :

> পিতা বনমালী মাতা মাণিক [মেনকা] উদরে।
> জনম লভিল ওঝা ছয় সহোদরে ॥
> ছোটগঙ্গা বড়গঙ্গা বড় বলিন্দা [নিঃসন্দেহে, বরেন্দ্র-বরেন্দ্রী] পার।
> যথা তথা করা বেড়ায় বিদ্যার উদ্ধার ॥
> রাঢ়ামধৈ [রাঢ় মধ্যে ?] বন্দিনু আচার্য চূড়ামণি।
> যার ঠাঁই কৃত্তিবাস পড়িলা আপনি ॥

স্পষ্টতই গঙ্গার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ববাহিনী দুই প্রবাহকেই কৃত্তিবাস যথাক্রমে ছোটগঙ্গা ও বড়গঙ্গা বলিতেছেন, এবং তদানীন্তন ভাগীরথী-পথের সুন্দর বিবরণ দিতেছেন। সে কথা পরে উল্লেখ করিতেছি। আপাতত এইটুকু পাওয়া গেল যে, পঞ্চদশ

গতকের গোড়াতেই পদ্মা বৃহত্তরা নদী, উহাই বড়গঙ্গা। কিন্তু যত প্রশস্ততরা, যত দুর্দম দুর্দান্তই হোক না কেন, ঐতিহ্যমহিমায় কিংবা লোকের শ্রদ্ধাভক্তিতে বড়গঙ্গা ছোটগঙ্গার সমকক্ষ হইতে পারে নাই। হিন্দুর স্মৃতি-ঐতিহ্যে গঙ্গার জলই পাপমোচন করে, পদ্মার নয়। গঙ্গা স্নিগ্ধা, পাপহরা পদ্মা কীর্তিনাশা; পদ্মা ভীষণা ভয়ংকরী উন্মত্তা।

গঙ্গা-ভাগীরথীই যে প্রাচীনতরা এবং পুণ্যতোয়া নদী, ইহাই যে হিন্দুর পরম তীর্থ জাহ্নবী, এই সম্বন্ধে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য এবং লিপিমালা একমত। পদ্মাকে গঙ্গা কখনও কখনও বলা হইয়াছে, কিন্তু ভাগীরথী-জাহ্নবী একবারও বলা হয় নাই। বাঙলা-দেশের গ্রন্থ ও লিপিই এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতেছি। ধোয়ীর পবনদূতে ত্রিবেণী-সংগমের ভাগীরথীকেই বলা হইয়াছে গঙ্গা; লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুর পট্টোলীতে বর্ধমানভুক্তির বেতড্ড চতুরকের (হাওড়া জেলার বেতড়) পূর্ববাহিনী নদীটির নাম জাহ্নবী; বল্লালসেনের নৈহাটি লিপিতে গঙ্গা-ভাগীরথীকেই বলা হইয়াছে 'সুরসরিৎ' [স্বর্গনদী বা দেবনদী]; রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলয় লিপিতে উত্তর-রাঢ় পূর্বসীমায় গঙ্গাতীরশায়ী, যে-গঙ্গার সুগন্ধ পুষ্পবাহী জল অসংখ্য তীর্থঘাটে ঢেউ দিয়া দিয়া প্রবাহিত হইত: "The Ganga whose waters bearing fragrant flowers dashed against the bathing places"। এই সব bathing pl ces তীর্থঘাট, এবং পুষ্প স্নানপূজার ফুল, সন্দেহ কি! এই পূজা ভাগীরথীরই ভাগ্যে জোটে, পদ্মার নয়!

পদ্মা বা বড়গঙ্গার কথা পরে বলার সুযোগ হইবে; ভাগীরথী বা ছোটগঙ্গার কাহিনী আগে শেষ করিয়া লই। যাহাই হউক, পঞ্চদশ শতকে ভাগীরথী সংকীর্ণতোয়া সন্দেহ নাই, কিন্তু তখন তাহার প্রবাহ আজিকার মতো ক্ষীণ নয়; সাগরমুখ হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে চম্পা-ভাগলপুর পর্যন্ত সমানে বড় বড় বাণিজ্যতরীর চলাচল তখনও অব্যাহত। ফান্ ডেন ব্রোকের নক্‌শায় এই পথের দুই ধারের নগর-বন্দরের এবং পূর্ব ও পশ্চিমাগত শাখা-প্রশাখা নদীগুলির সুস্পষ্ট পরিচয় আছে। নক্‌শা খুলিলেই তাহাদের পরিচয় পাওয়া যাইবে, এবং ভাগীরথীই যে সংকীর্ণতর হওয়া সত্ত্বেও প্রধানতর প্রবাহ তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। সাম্প্রতিক কালে বহু প্রমাণ-প্রয়োগের সাহায্যে এই প্রবাহের ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে। ফান্ ডেন ব্রোকের কিঞ্চিদধিক দেড়শত বৎসর আগে বিপ্রদাস পিপিলাই তাঁহার মনসামঙ্গলে এই প্রবাহপথের যে বিবরণ দিতেছেন তাহা সুপরিচিত নয়। কাজেই, এখানে তাহা উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিপ্রদাসের চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্যতরী রাজঘাট, রামেশ্বর পার হইয়া সাগরমুখের দিকে অগ্রসর হইতেছে; পথে পড়িতেছে, অজয়নদী, উজানী, শিবানদী (বর্তমান শিয়ালনালা), কাটোয়া, ইন্দ্রাণীনদী, ইন্দ্রঘাট, নদীয়া, ফুলিয়া, গুপ্তিপাড়া, মির্জাপুর, ত্রিবেণী, সপ্তগ্রাম (সপ্তগ্রাম যে গঙ্গা-সরস্বতী-যমুনাসংগমে বিপ্রদাস তাহাও উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই), কুমারহাট, ডাইনে হুগলী, বামে ভাটপাড়া, পশ্চিমে বোরো, পূর্বে কাকিনাড়া, তারপর মুলাজোড়া,

গাড়ুলিয়া, পশ্চিমে পাইকপাড়া, ভদ্রেশ্বর, ডাইনে চাঁপদানি, বামে ইছাপুর বাকিবাজার, (ডাইনে) নিমাইতীর্থ (বর্তমান বৈদ্যবাটি ?), চানক, মাহেশ, (বামে) খড়দহ, শ্রীপাট, ডাইনে রিসিড়া (রিষড়া), বামে সুকচর, পশ্চিমে কোন্নগর, ডাইনে কোতরং, বামে কামারহাটি, পূর্বে আড়িয়াদহ (এড়েদহ), পশ্চিমে ঘুষুড়ি, তারপর পূর্বকূলে চিৎপুর (চিৎপুর), কলিকাতা, (পশ্চিমকূলে) বেতড় (দ্বাদশ শতক লিপির বেতড্ড চতুরক), তারপর (বামে) কালীঘাট, চূড়াঘাট, বারুইপুর, ছত্রভোগ, বদরিকাকুণ্ড, হাথিয়াগড়, চৌমুখী, শতমুখী এবং সর্বশেষে সাগরসংগমতীর্থ যেখানে "তীর্থকার্য শ্রাদ্ধ কৈল পবিত্র তর্পণ।। তাহার মেলান ডিঙ্গা সংগমে প্রবেশে। তীর্থকার্য কৈল রাজা পর[ম] হরিষে।।" সাগর-সংগমের নিকট গঙ্গা তো সত্যই চারিমুখে শতমুখে কেন, অসংখ্য খাল-নালায় শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত। মহাভারতের বনপর্বের তীর্থযাত্রা অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, যুধিষ্ঠির পঞ্চশতমুখী গঙ্গার সাগরসংগমে তীর্থস্নান করিয়াছিলেন। যাহা হউক, বিপ্রদাসের উপরোক্ত বর্ণনার সঙ্গে ফান্ ডেন ব্রোকের নকশার বর্ণনা অনেক ক্ষেত্রেই এক। নদীয়া, মির্জাপুর, ত্রিবেণী (Tripeni), সপ্তগ্রাম (Coatgam), হুগলি (Oegli, পর্তুগীজ বণিকদের Ogulium), কলিকাতা (ফান্ ডেন ব্রোক Collecate এবং Calcutta নামে প্রায় সংলগ্ন দুইটি বন্দরের নাম করিতেছেন—একটি বিপ্রদাসের কলিকাতা এবং অপরটি কালীঘাট বলিয়া মনে হয়) প্রভৃতি নাম পাওয়া যাইতেছে। লক্ষ্যণীয় এই, পঞ্চদশ শতকেই বিপ্রদাস হুগলী ও কলিকাতার উল্লেখ করিতেছেন, এবং ইহাই হুগলী ও কলিকাতার সর্বপ্রাচীন উল্লেখ। তবে, সন্দেহ হয়, বিপ্রদাসের মূল-তালিকায় পরবর্তী কালের গায়েনরা হুগলী, কলিকাতা প্রভৃতি নাম সংযোগ করিয়া দিয়াছিলেন ; মূল তালিকায় এ-দুটি নাম ছিল কিনা, সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। পঞ্চদশ শতকে কলিকাতার উল্লেখ সত্যই যথেষ্ট সন্দেহজনক ! ১৪৯৫-র (বিপ্রদাসের) পরে এবং ১৬৬০-র (ফান্ ডেন ব্রোকের) আগে বরা(হ)নগর, চন্দননগর প্রভৃতি বন্দর গড়িয়া উঠিয়াছে ; শুধু যে ফান্ ডেন ব্রোকই ইহাদের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা নয়, জাও ডি ব্যারোসের নকশায়ও অগ্রপাড়া (Agrapara), বরাহনগরের (Barnagar) উল্লেখ পাইতেছি, সপ্তগ্রামের (সাতগাঁও—Satigam) সঙ্গে। ইতিহাসের তথ্যও তাহাই। হুগলীও ব্রোকের সময় ফাঁপিয়া উঠিয়াছে।

আদিগঙ্গা

যাহাই হউক, বিপ্রদাস ও ফান্ ডেন ব্রোকের নিকট হইতে কয়েকটি প্রধান প্রধান তথ্য পাওয়া গেল। প্রথমত, ভাগীরথীর বর্তমান প্রবাহই, অন্তত কলিকাতা পর্যন্ত, পঞ্চদশ-সপ্তদশ শতকের প্রধানতম প্রবাহ ; দ্বিতীয়ত, ত্রিবেণী বা মুক্তবেণীতে সরস্বতী-ভাগীরথী-যমুনাসংগম ; তৃতীয়ত, কলিকাতা ও বেতড়ের দক্ষিণে বর্তমানে আমরা যাহাকে বলি

আদিগঙ্গা। সেই আদিগঙ্গার খাতেই ভাগীরথীর সমুদ্রযাত্রা; অন্তত বিপ্রদাসের চাঁদ সওদাগর সেই পথেই যে গিয়াছিলেন তাহা নিঃসন্দেহ। সপ্তদশ শতকে ফান্ ডেন ব্রোকের নক্শায় দেখা যায়, তখনও আদিগঙ্গার খাত খুব প্রশস্ত, কিন্তু সেই খাতে কোনও গ্রাম-নগর-বন্দরের উল্লেখ নাই! হইতে পারে, এই খাতে বৃহৎ নৌকা চলাচল বিশেষ আর হইতেছে না। এই অনুমানের কারণ, এক শত বৎসর পরে রেনেলের নক্শায় দেখিতেছি, আদিগঙ্গার কোনও চিহ্নই নাই, অর্থাৎ এই এক শতকের মধ্যে আদিগঙ্গা তাহার বর্তমান আকৃতিতে পরিণত হইয়া গিয়াছে। ইহাই বোধ হয় ইতিহাসগত; কারণ, শোনা যায়, নবাব আলীবর্দীর আমলে কলিকাতা-বেতড়ের দক্ষিণে বর্তমান ভাগীরথী প্রবাহের প্রবর্তন হইয়াছিল। আদিগঙ্গা পলি পড়িয়া চলাচলের অযোগ্য হইলে আলীবর্দী নাকি বর্তমান সোজা দক্ষিণবাহী প্রবাহটির মুখ খুলিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু, আলীবর্দী নূতন প্রবাহপথ কাটিয়া বাহির করেন নাই; এ-পথ আদিগঙ্গা অর্থাৎ পঞ্চদশ শতক অপেক্ষাও পুরাতন, এবং বোধ হয় সরস্বতীর প্রাচীনতর খাতের দক্ষিণতম অংশ।

গঙ্গার প্রাচীনতম প্রবাহ

পঞ্চদশ শতকের (বিপ্রদাসের) আগে ভাগীরথী অন্তত আংশিকত এই সরস্বতীর খাত দিয়াই সমুদ্রে প্রবাহিত হইত, এরূপ মনে করিবার কারণ আছে। আনুমানিক ১১৭৫ খ্রীষ্টাব্দে, কলিকাতার দক্ষিণে উলুবেড়িয়া-গঙ্গাসাগরখাতে ভাগীরথী প্রবাহিত হইত, এমন লিপি-প্রমাণ বিদ্যমান। পুরাণে, বিশেষত মৎস্য ও বায়ুপুরাণে উল্লিখিত আছে যে, তাম্রলিপ্ত দেশের ভিতর দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত হইত; এবং সম্ভবত সমুদ্রসন্নিকট গঙ্গার তীরেই ছিল তাম্রলিপ্তির সুবৃহৎ বাণিজ্যকেন্দ্র। এ-সম্বন্ধে মৎস্য পুরাণের উক্তিকে পৌরাণিক উক্তির প্রতিনিধি বলিয়া ধরা যাইতে পারে। হিমালয়-উৎসারিত পূর্ব-দক্ষিণবাহী সাতটি প্রবাহকে এই পুরাণে গঙ্গা বলা হইয়াছে; এই সাতটির মধ্যবর্তী প্রবাহটির ভাগীরথী নামকরণ-প্রসঙ্গে ভগীরথকর্তৃক গঙ্গা আনয়নের সুবিদিত গল্পটিও এইখানে বিবৃত করা হইয়াছে। এই পুরাণে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে, কুরু, ভরত, পঞ্চাল, কৌশিক ও মগধ দেশ পার হইয়া বৈন্ধ্যশৈলশ্রেণীগাত্রে (রাজমহল-সাঁওতালভূমি-ছোটনাগপুর-মানভূম-ধলভূম শৈলমূলে) প্রতিহত হইয়া ব্রহ্মোত্তর (উত্তর-রাঢ়), বঙ্গ এবং তাম্রলিপ্ত (সুহ্ম) দেশের ভিতর দিয়া ভাগীরথী প্রবাহিত হইত। প্রাচীন বাঙলায় ভাগীরথীর প্রবাহপথের ইহার চেয়ে সংক্ষিপ্ত সুন্দর সুস্পষ্ট বিবরণ আর কী হইতে পারে? একটু পরেই আমি দেখাইতে চেষ্টা করিব, উত্তর দক্ষিণ-বিহারের ভিতর দিয়া রাজমহলের নিকট বাঙলাদেশে প্রবেশ করিয়া রাজমহল সাঁওতালভূমি-ছোটনাগপুর-মালভূম-ধলভূমের শৈলভূমিরেখা ধরিয়া যে অগভীর ঝিল ও নিম্নজলাভূমি সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত সেই ভূমিরেখাই ভাগীরথীর সন্ধান-সম্ভাব্য প্রাচীনতম খাত।

যাহাই হউক, পুরাণ-বর্ণনা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, এক্ষেত্রে ভাগীরথী-প্রবাহের কথাই ইঙ্গিত করা হইতেছে, এবং ইহাকেই বলা হইতেছে গঙ্গার প্রধান প্রবাহ। এই প্রবাহ উত্তর-রাঢ় দেশের ভিতর দিয়া দক্ষিণবাহী, এবং তাহার পূর্বে বঙ্গ, পশ্চিমে তাম্রলিপ্ত, এই ইঙ্গিতও যেন মৎস্যপুরাণে পাওয়া যাইতেছে। ইহাই তো ইতিহাস-সম্মত। ভগীরথ -কর্তৃক গঙ্গাআনয়নের গল্প রামায়ণেও আছে, এবং সেখানেও গঙ্গা বলিতে রাজমহল-গঙ্গাসাগর প্রবাহকেই যেন বুঝাইতেছে। যুধিষ্ঠির গঙ্গাসাগর-সংগমে তীর্থস্নান করিতে আসিয়াছিলেন, এবং সেখান হইতে গিয়াছিলেন কলিঙ্গদেশে। রাজমহল-গঙ্গাসাগর প্রবাহই যে যথার্থত ভাগীরথী ইহাই রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণের ইঙ্গিত, এবং এই প্রবাহের সঙ্গেই সুদূর অতীতের সূর্যবংশীয় ভগীরথ রাজার স্মৃতি বিজড়িত। উইলিয়ম উইলকক্স সাহেব এই ভগীরথ-ভাগীরথী কাহিনীর যে পৌর্তিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা ইতিহাস-সম্মত বলিয়া মনে হয় না। পদ্মা-প্রবাহ অপেক্ষা ভাগীরথী-প্রবাহ যে অনেক প্রাচীন এ-সম্বন্ধেও কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। যাহা হউক, জাও ডি ব্যারোসের (১৫৫০) এবং ফান্ ডেন ব্রোকের নক্শায় (১৬৬০) পুরাণোক্ত প্রাচীন প্রবাহপথের ইঙ্গিত বর্তমান বলিয়া মনে হয়। এই দুই নক্শার তুলনামূলক আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, সপ্তদশ শতকে জাহানাবাদের নিকটে আসিয়া দুইভাগে বিভক্ত হইয়া দামোদরের একটি প্রবাহ (ক্ষমানন্দ-কথিত বাঁকা দামোদর) উত্তর পূর্ববাহিনী হইয়া নদীয়া-নিমতার দক্ষিণে গঙ্গায়, এবং আর-একটি প্রবাহ দক্ষিণবাহিনী হইয়া নারায়ণগড়ের নিকটে রূপনারায়ণ-পত্রঘাটার সঙ্গে মিলিত হইয়া তম্বোলি বা তমলুকের পাশ দিয়া গিয়া সমুদ্রে পড়িতেছে। আর, মধ্য ভূখণ্ডে ত্রিবেণী-সপ্তগ্রামের নিকট হইতে তৃতীয় আর-একটি প্রবাহ (অর্থাৎ সরস্বতী) ভাগীরথী হইতে বিযুক্ত হইয়া পশ্চিম দিকে দক্ষিণবাহিনী হইয়া কলিকাতা-বেতড়ের দক্ষিণে পুনর্বার ভাগীরথীর সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে। এক শতাব্দী আগে, ষোড়শ শতকে জাও ডি ব্যারোসের নকশায় দেখিতেছি, সরস্বতীর একবারে ভিন্নতর প্রবাহপথ। সপ্তগ্রামের Satigam

সরস্বতী

নিকটেই সরস্বতীর উৎপত্তি, কিন্তু সপ্তগ্রাম হইতে সরস্বতী সোজা পশ্চিমবাহিনী হইয়া যুক্ত হইতেছে দামোদর-প্রবাহের সঙ্গে, বাঁকা দামোদর সংগমের নিকটেই। এই বাঁকা দামোদরের কথা বলিয়াছেন সপ্তদশ শতকের (১৬৪০) কবি ক্ষমানন্দ তাঁহার মনসামঙ্গল কাব্যে সে কথা পরে উল্লেখ করিয়াছি। যাহাই হউক, দামোদর বর্ধমানের দক্ষিণে যেখান হইতে দক্ষিণবাহী হইয়াছে সেইখানে সরস্বতীর সঙ্গে তাহার সংযোগ—ইহাই জাও ডি ব্যারোসের নক্শার ইঙ্গিত। আমার অনুমান, এই প্রবাহপথই গঙ্গা-ভাগীরথীর প্রাচীনতর প্রবাহপথ, এবং সরস্বতীর পথ ইহার নিম্ন অংশ মাত্র। তাম্রলিপ্তি হইতে এই পথে উজান বাহিয়াই

বাণিজ্যপোতগুলি পাটলিপুত্র-বারাণসী পর্যন্ত যাতায়াত করিত। এবং এই নদীতেই পশ্চিম দিকে ছোটনাগপুর-মানভূমের পাহাড় হইতে উৎসারিত হইয়া স্ব-স্বতন্ত্র অজয়, দামোদর, রূপনারায়ণ প্রভৃতি নদ তাহাদের জলস্রোত ঢালিয়া দিত। ইহাই প্রাচীন

অজয়, দামোদর, রূপনারায়ণ

বাঙলার গঙ্গা-ভাগীরথীর নিম্নতর প্রবাহ। এখনও ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর, রূপনারায়ণ, শিলাই, দ্বারকেশ্বর প্রভৃতি নদনদী ভাগীরথীতে জলধারা মেশায় সত্য, কিন্তু ইহাদের ভাগীরথীসংগমস্থান ভাগীরথীপ্রবাহপথের সঙ্গে সঙ্গে অনেক পূর্বদিকে সরিয়া আসিয়াছে; এবং ইহাদের, বিশেষভাবে দামোদর এবং রূপনারায়ণের, প্রবাহপথও নিম্নপ্রবাহে ক্রমশঃ অধিকতর দক্ষিণবাহী হইয়াছে। বর্ধমানের দক্ষিণে দামোদরের প্রবাহপথের পরিবর্তন খুব বেশি হইয়াছে। ফান্ ডেন ব্রোকের নক্শায় (১৬৬০) দেখা যায় বর্ধমানের দক্ষিণ-পথে দামোদরের একটি শাখা সোজা উত্তরে পূর্ববাহী হইয়া আম্বোনা Ambona'-কালনার কাছে ভাগীরথীতে পড়িতেছে। ক্ষমানন্দ বা ক্ষেমানন্দ দাসের (কেতকদাসের) মনসামঙ্গলে (১৬৪০ আনুমানিক) এই শাখাটিকেই বুঝি বলা হইয়াছে "বাঁকা দামোদর"। এই বাঁকা নদীর তীরে তীরে যে-সব স্থানের নাম কেতকদাস ক্ষমানন্দ করিয়াছেন তাহার তালিকা এই: কুঝাটি বা ওঝাটি, গোবিন্দপুর, গঙ্গাপুর, দে পুর, নেয়াদা বা নর্মদাঘাট, কেজুয়া, আদমপুর, গোদাঘাট, কুকুরঘাটা, হাসনহাটি, নারিকেলডাঙ্গা, বৈদ্যপুর ও গহরপুর। গহরপুরের পরেই বাঁকা দামোদর "গঙ্গার জলে মিলি"য়া গেল। দামোদরের দক্ষিণবাহী প্রবাহপথেই যে এক সময় সরস্বতীর প্রবাহপথ ছিল, আমার এ অনুমান আগেই লিপিবদ্ধ করিয়াছি। জাও ডি বারোসের নক্শার ইঙ্গিত তাহাই। পরে সরস্বতী এই পথ পরিত্যাগ করিয়া সোজা দক্ষিণবাহী হইয়া রূপনারায়ণ-পত্রঘাটার প্রবাহপথে কিছুদিন প্রবাহিত হইত। বস্তুত, রূপনারায়ণের নিম্নপ্রবাহ একদা সরস্বতীরই প্রবাহপথ বলিয়া মনে হয়। যাহাই হউক অষ্টম শতকের পরেই সরস্বতী-ভাগীরথীর এই প্রাচীনতর প্রবাহপথের মুখ এবং নিম্নতম প্রবাহ শুকাইয়া যায়, এবং তাহার ফলেই তাম্রলিপ্ত বন্দর পরিত্যক্ত হয়। অষ্টম হইতে চতুর্দশ শতকের মধ্যে কোনও সময় সরস্বতী তাহার প্রাচীনতর পথ পরিত্যাগ করিয়া বর্তমানের খাত প্রবর্তন করিয়া থাকিবে এবং সেই খাতেও কিছুদিন ভাগীরথীর প্রবলতর স্রোত চলাচল করিয়া থাকিবে। চতুর্দশ শতকের গোড়াতেই সপ্তগ্রামে মুসলমানদের অন্যতম রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এ তথ্য সুবিদিত। কিন্তু দশম শতক হইতে নিম্নপ্রবাহে কলিকাতা-বেতড় পর্যন্ত ভাগীরথীর বর্তমান পথই প্রধানতম পথ এবং আরও দক্ষিণে আদি-গঙ্গার পথ। আলিবর্দীর সময়ে আদিগঙ্গা পরিত্যক্ত হইয়া মধ্যযুগের সরস্বতীর পরিত্যক্ত পথেই গঙ্গা-ভাগীরথীর পথ প্রবর্তিত হয়। বিপ্রদাসের চাঁদ সদাগর ত্রিবেণীর পরেই সরস্বতীতীরে সপ্তগ্রামের সুদীর্ঘ বর্ণনা দিয়াছেন। ১৪৭৫ খ্রীষ্টাব্দে সপ্তগ্রাম সমৃদ্ধিশালী

বন্দর-নগর, তাঁহার বর্ণনাই তাহা প্রমাণ করিতেছে। কিন্তু সপ্তগ্রাম ছাড়িয়া চাঁদ সওদাগর সরস্বতীর পথে আর অগ্রসর হইতেছেন না; তিনি বর্তমান ভাগীরথীর প্রবাহে ফিরিয়া আসিতেছেন; কারণ, সপ্তগ্রামের পরেই উল্লেখ পাইতেছি কুমারহাট এবং হুগলীর। মনে হয় ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দেই সরস্বতীর পথে বেশিদূর আর অগ্রসর হওয়া যাইতেছে না, এবং সেই পথে বৃহৎ বাণিজ্যতরী চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে দেখিতেছি ফান্ ডেন ব্রোকের নক্সায় Oegli বা হুগলী খুব ফাঁপিয়া উঠিয়াছে; তখনও Tripeni (ত্রিবেণী), Coatgam (সাতগাঁ) বিদ্যমান, কিন্তু উভয়েই মুমূর্ষু। ইহাই ইতিহাসগত। কারণ আগরপাড়া (Agrapara), বরাহনগর (Bernagar) ইত্যাদির উল্লেখ বরোসের নক্শাতে দেখিতেছি (১৫৫০): তাঁহার নক্শায় কিন্তু হুগলীর উল্লেখ নাই। ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রেডরিক সাহেব স্পষ্ট বলিতেছেন, বাতোর (Bator) বা বেতড়ের উত্তরে সরস্বতীর প্রবাহ অত্যন্ত অগভীর হইয়া পড়িয়াছে, সেইজন্য ছোট ছোট জাহাজও যাওয়া-আসা করিতে পারে না। নিশ্চয়ই এই কারণে পর্তুগীজেরা ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে সপ্তগ্রামের পরিবর্তে হুগলীতেই তাহাদের বাণিজ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। ইহার পর ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে ফান্ ডেন ব্রোক Oegli খুব মোটা মোটা অক্ষরে উল্লেখ করিবেন তাহা মোটেই আশ্চর্য নয়!

যমুনা

ত্রিবেণী-সংগমের অন্যতম নদী যমুনা, এ-কথা আগেই উল্লেখ করিয়াছি। এই যমুনা এখন খুঁজিয়া বাহির করা আয়াসসাধ্য, কিন্তু পঞ্চদশ শতকে বিপ্রদাসের কালে "যমুনা বিশাল অতি"। ত্রিবেণী-সপ্তগ্রামের বর্ণনাপ্রসঙ্গে বিপ্রদাস বলিতেছেন, "গঙ্গা আর সরস্বতী যমুনা বিশাল অতি, অধিষ্ঠান উমা মাহেশ্বরী"। রেনেলের নক্শায় যমুনা অতি ক্ষীণা একটি রেখা মাত্র।

গঙ্গার উত্তর প্রবাহ

গঙ্গা-ভাগীরথীর দক্ষিণ বা নিম্ন প্রবাহ ছাড়িয়া এইবার উত্তর প্রবাহের কথা একটু বলা যাইতে পারে। এ-সম্বন্ধে সাক্ষ্যপ্রমাণ অত্যন্ত কম; অনেকটা অনুমানের উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নাই। প্রাচীন গৌড়ের প্রায় পাঁচিশ মাইল দক্ষিণে এখন ভাগীরথী ও পদ্মা দ্বিধাবিভক্ত হইতেছে, কিন্তু প্রাচীন বাঙলায়, অন্ততঃ সপ্তদশ শতকপূর্ব বাঙলায় গৌড়-লক্ষ্মণাবতী ছিল গঙ্গার পশ্চিম তীরে, এরূপ মনে করিবার কারণ আছে। বস্তুত, ডি ব্যারোস (১৫৫০) এবং গ্যাস্টাল্ডির Gastaldi, ১৫৬১) নক্শা দুটিতেই গৌড়ের (Gorij: গ্যাস্টাল্ডির নক্শায় Gaur) অবস্থান

গঙ্গা ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে, এবং রাঢ় (জাও ডি ব্যারোসের নক্শার Rara) দেশের উত্তরে স্বল্প উত্তর-পশ্চিমে। মুসলমান ঐতিহাসিকদের বিবরণ হইতেও মনে হয়, গৌড় ভাগীরথীর পশ্চিম তীরেই অবস্থিত ছিল। রাজমহল পার হইয়া গঙ্গা খুব সম্ভবত তখন খানিকটা উত্তর ও পূর্ব বাহিনী হইয়া গৌড়কে পশ্চিম বা ডাইনে রাখিয়া রাঢ় দেশের মধ্য দিয়া দক্ষিণবাহিনী হইত। বর্তমান কালিন্দী ও মহানন্দা খুব সম্ভব এই উত্তর ও পূর্ব প্রবাহ-পথের প্রাচীন স্মৃতি বহন করে। যাহা হউক, ইহা হইতেছে আনুমানিক দ্বাদশ-ত্রয়োদশ হইতে ষোড়শ শতকের কথা ; কিন্তু সপ্তদশ শতকেই গঙ্গা-ভাগীরথী এই পথ পরিত্যাগ করিয়া বর্তমান পথ প্রবর্তন করিয়াছে। দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতকেরও আগে গঙ্গা ভাগীরথীর উত্তর-প্রবাহের একটি প্রাচীনতর পথ বোধ হয় ছিল, এবং এ পথটি বর্তমান প্রবাহপথের পশ্চিমে। পূর্ণিয়ার দক্ষিণ সীমান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া রাজমহল-সাঁওতালপরগনা-ছোটনাগপুর-মানভূম-ধলভূমের নিম্নভূমি ঘেঁষিয়া দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত ঝিল ও নিম্ন জলাভূমিময় এক সুদীর্ঘ দক্ষিণবাহী রেখা চলিয়া গিয়াছে। এই রেখা এখনও বর্তমান। এই রেখাই গঙ্গা-ভাগীরথীর প্রাচীনতম প্রবাহপথের নির্দেশক বলিয়া আমার ধারণা। ইহারই নিম্নতর প্রবাহে আমি ইতিপূর্বে দামোদর-সরস্বতী-রূপনারায়ণের কিয়দংশের প্রবাহপথের ইঙ্গিত করিয়াছি। এই সমগ্র প্রবাহপথ সম্বন্ধে আমার ধারণা যে নিছক কল্পনামাত্র নয় তাহা মৎস্যপুরাণোক্ত গঙ্গার প্রবাহপথের বর্ণনা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায়। মৎস্যপুরাণে আছে কৌশিক (উত্তর-বিহার) ও মগধ (দক্ষিণ-বিহার) পার হইয়া গঙ্গা বিন্ধ্যপর্বতের গাত্রে (রাজমহল-সাঁওতালভূম-ছোটনাগপুর মানভূম-ধলভূম শৈলমূলে) প্রতিহত হইয়া ব্রহ্মোত্তর অর্থাৎ মোটামুটি উত্তর-রাঢ়, বঙ্গ এবং তাম্রলিপ্ত দেশের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইত। ভাগীরথীর পূর্বতীর বঙ্গে, পশ্চিম তীরে তাম্রলিপ্ত, উত্তরতর প্রবাহে উত্তর-রাঢ়।

গঙ্গা ভাগীরথীর প্রবাহপথের প্রাচীন ইতিহাস এখন এইভাবে নির্দেশ করা যাইতে পারে : (১) ঐতিহাসিক কালের সন্ধান সম্ভাব্য প্রাচীনতম পথ : পূর্ণিয়ার দক্ষিণে রাজমহল পার হইয়া গঙ্গা রাজমহল সাঁওতালভূমি-ছোটনাগপুর-মানভূম-ধলভূমের তলদেশ দিয়া সোজা দক্ষিণবাহিনী হইয়া সমুদ্রে পড়িত ; এই প্রবাহেই ছিল অজয়, দামোদর এবং রূপনারায়ণের সংগম। এই তিনিটি নদীই তখন নাতিদীর্ঘ। এবং এই প্রবাহেরই দক্ষিণতম সীমায় তাম্রলিপ্ত বন্দর। (২) ইহার পরের পর্যায়েই গঙ্গার পূর্বদিক যাত্রা শুরু হইয়াছে। রাজমহল হইতে গঙ্গা-ভাগীরথী খুব সম্ভবত বর্তমান কালিন্দী ও মহানন্দার খাতে উত্তর ও পূর্ববাহিনী হইয়া গৌড়কে ডাইনে রাখিয়া পরে দক্ষিণ-পশ্চিম-বাহিনী হইয়া সমুদ্রে পড়িয়াছে। কিন্তু তখন এই প্রবাহ ১ নং খাতের আরও পূর্বদিকে সরিয়া আসিয়াছে। তবে, তখনও দামোদর এবং রূপনারায়ণ-পত্রঘাটার জল ভাগীরথীতে পড়িতেছে এবং তাম্রলিপ্ত বন্দরও জীবন্ত। অর্থাৎ, এই পর্যায় অষ্টম শতকের আগেই।

(৩) তৃতীয় পর্যায়েও গৌড় গঙ্গার পশ্চিম তীরে ; কিন্তু তাম্রলিপ্ত বন্দর পরিত্যক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ দামোদর-রূপনারায়ণ-পত্রঘাটার এবং কিছুদিনের জন্য সরস্বতীরও জল লইয়া ভাগীরথীর যে পশ্চিমতর প্রবাহ তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং কলিকাতা বেতড় পর্যন্ত ভাগীরথীর বর্তমান প্রবাহপথের এবং বেতড়ের দক্ষিণে আদিগঙ্গা পথের প্রবর্তন হইয়াছে। এই পথেরই পরিচয় বিপ্রদাস (১৪৯৫) হইতে আরম্ভ করিয়া ফান্ ডেন্ ব্রোক (১৬৬০), দ্য ল' অভিল (de l' Auvile, 1752), এফ্ ডি হ্বিট্ (F. de Witt, 1726), ইজাক্ টিরিয়ান (Izaak Tirion, 1730), থর্নটন্ (Thornton), প্রভৃতি সকলেরই নক্শায় পাওয়া যাইতেছে। আলীবর্দীর সময়ে (অর্থাৎ মোটামুটি ১৭৫০) আদিগঙ্গা পরিত্যক্ত হওয়াতে বেতড়ের দক্ষিণে পুরাতন সরস্বতীর খাতে কী করিয়া ভাগীরথীকে প্রবাহিত করা হয়, তাহা তো আগেই বলিয়াছি। তাই বোধ হয়, রেনেলের নক্শায় (১৭৬৪-৭০) আদিগঙ্গার কোনও চিহ্নই প্রায় নাই। কর্নেল টলি (Tolly সাহেব এই খাতের খানিকটা অংশ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন (১৭৮৫), তাঁহার নামানুসারেই Tolly's Nullah এবং Tollygunje যথাক্রমে এই খাত এবং বামতীরের পল্লীটির বর্তমান নামকরণ।

পদ্মা

ভাগীরথী বা ছোটগঙ্গার কথা বলা হইল ; এইবার বড়গঙ্গা বা পদ্মার কথা বলা যাইতে পারে। রেনেল সাহেব তো ইহাকেই গঙ্গা বলিয়াছেন। আগেই বলিয়াছি, পদ্মা অর্বাচীনা নদী ; কিন্তু পদ্মাকে যতটা অর্বাচীনা পণ্ডিতেরা সাধারণত মনে করিয়া থাকেন ততটা অর্বাচীনা হয়তো সে নয়। রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয় তো মনে করেন ষোড়শ শতক হইতে গঙ্গার পূর্বযাত্রার অর্থাৎ পদ্মার সূত্রপাত। ইহা ইতিহাস-বিরুদ্ধ বলিয়াই মনে হয়। রেনেল ও ফান্ ডেন্ ব্রোকের নক্সায় পদ্মা বেগবতী নদী। সিহাবুদ্দিন তালিস (১৬৬৬) ও মির্জা নাথনের (১৬৬৪) বিবরণীতে দেখিতেছি গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের সংগমের উল্লেখ, ইছামতীর সংগমে, ইছামতীর তীরে যাত্রাপুর এবং তিন মাইল উত্তর-পশ্চিমে ডাকচর, এবং ঢাকার দক্ষিণে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের সম্মিলিত প্রবাহের সমুদ্রযাত্রা— ভলুয়া এবং সন্দ্বীপের পাশ দিয়া। যাত্রাপুর হইতে ইছামতী বাহিয়া পথই ছিল তখন ঢাকায় যাইবার সহজতম পথ, এবং সেই পথেই টেভার্নিয়ার (১৬৬৬) এবং হেজেস্ (১৬৮২) যাত্রাপুর হইয়া ঢাকা গিয়াছিলেন। কিন্তু তখনও সর্বত্র গঙ্গার এই প্রবাহের পদ্মা নামকরণ দেখিতেছি না। এই নামকরণ দেখিতেছি আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে (১৫৯৬-৯৭), মির্জা নাথনের বহারিস্তান-ই ঘায়বি গ্রন্থে, ত্রিপুরা রাজমালায় এবং চৈতন্যদেবের পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ-প্রসঙ্গে। আবুল ফজলের মতে কাজি-

হাটার কাছে গঙ্গা দ্বিধাবিভক্ত হইয়াছে ; একটি প্রবাহ পূর্ববাহিনী হইয়া পদ্মাবতী নাম লইয়া চট্টগ্রামের কাছে গিয়া সমুদ্রে পড়িতেছে। মির্জা নাথন বলিতেছেন, করতোয়া বালিয়ার কাছে একটি বড় নদীতে আসিয়া পড়িতেছে ; এই বড় নদীটির নাম অন্যত্র বলা হইয়াছে পদ্মাবতী। ত্রিপুরারাজ বিজয়মাণিক্য ১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরা হইতে ঢাকায় আসিয়া ইছামতী বাহিয়া যাত্রাপুরে আসিয়া পদ্মাবতীতে তীর্থস্নান করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবও (জন্ম, ১৪৮৫) ২২ বৎসর বয়সে পূর্ববঙ্গভ্রমণে আসিয়া পদ্মাবতীতে তীর্থস্নান করিয়াছিলেন, কোনও কোনও চৈতন্য-জীবনীতে এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। ষোড়শ শতকেই পদ্মা এবং ইছামতী প্রসিদ্ধা নদী, তাহার কিছু তীর্থমাহাত্ম্যও আছে, এবং ঢাকা পার হইয়া চট্টগ্রামের নিকটে তাহার সাগরমুখ এ তথ্য তাহা হইলে অনস্বীকার্য। ষোড়শ শতকের জাও ডি বারোস্ এবং সপ্তদশ শতকের ফান্ ডেন্ ব্রোকের নক্শায়ও এই তথ্যের ইঙ্গিত পাওয়া কঠিন নয়। পঞ্চদশ শতকের গোড়ায় কৃত্তিবাস যে এই পদ্মাবতীকেই বলিতেছেন বড়গঙ্গা তাহা তো আগেই দেখিয়াছি। চতুর্দশ শতকে ইবন্ বতুতা (১৩৪৫-৪৬) চীন দেশ যাইবার পথে সমুদ্রতীরবর্তী চট্টগ্রামে (Chhadkawan=চাটগাঁ) নামিয়াছিলেন। তিনি চট্টগ্রামকে হিন্দুতীর্থ গঙ্গানদী এবং যমুনা (Jaun) নদীর সংগমস্থল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যমুনা বা Jaun বলিতে বতুতা ব্রহ্মপুত্রই বুঝাইতেছেন, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। তিনি বলিতেছেন, "The first town of Bengal, which we entered, was Chhadkawan (Chittagong), situated on the shore of the vast ocean. The river Ganga, to which the Hindus go in pilgrimage and the river Jaun (Jamuna) have united near it before falling into the sea." তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, অন্তত চতুর্দশ শতকেও গঙ্গার পদ্মাবতী-প্রবাহ চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এবং তাহার অদূরে সেই প্রবাহ ব্রহ্মপুত্র-প্রবাহের সঙ্গে মিলিত হইত। তট-ভূমি প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে চট্টগ্রাম এখন অনেক পূর্ব-দক্ষিণে সরিয়া গিয়াছে, ঢাকাও এখন আর গঙ্গা-পদ্মার উপরে অবস্থিত নয়। পদ্মা এখন অনেক দক্ষিণে নামিয়া গিয়াছে; ঢাকা, এখন পুরাতন গঙ্গা-পদ্মার খাত অর্থাৎ বুড়ীগঙ্গার উপর অবস্থিত ; আর পদ্মা-ব্রহ্মপুত্রের (যমুনা) সংগম এখন গোয়ালন্দের অদূরে। এই মিলিত প্রবাহ আরও পূর্ব-দক্ষিণে গিয়া চাঁদপুরের অদূরে মেঘনার সঙ্গে মিলিত হইয়া সন্দ্বীপের (স্বর্ণদ্বীপ=সোনাদ্বীপ=সন্দ্বীপ) নিকটে গিয়া সমুদ্রে পড়িয়াছে। বস্তুত, সমতটীয় বাংলায়, বিশেষত, তাহার পূর্বাঞ্চলে বরিশাল হইতে আরম্ভ করিয়া চাঁদপুর পর্যন্ত পদ্মা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা যে কী পরিমাণে ভাঙা-গড়া চালাইয়াছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া, তাহা জাও ডি ব্যারোস হইতে আরম্ভ করিয়া রেনেল পর্যন্ত নক্শাগুলো বিশ্লেষণ করিলে খানিকটা ধারণাগত হয়। কিন্তু তাহা আলোচনার স্থান এখানে নয়। প্রাচীন বাঙলায় গঙ্গার এই পূর্ব-প্রবাহের অর্থাৎ পদ্মা বা পদ্মাবতীর আকৃতি-প্রকৃতি কী ছিল তাহাই আলোচ্য। পঞ্চদশ শতক হইতে আরম্ভ

করিয়া ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত পদ্মার প্রবাহপথের অদলবদল বহু আলোচিত ; কাজেই, এখানে তাহার পুনরুক্তি করিয়া লাভ নাই।

গড়াই : মধুমতী : শিলাইদহ

চতুর্দশ শতকে ইবন্ বতুতার বিবরণের আগে বহুদিন এই প্রবাহের কোনও সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না। দশম শতকের শেষে একাদশ শতকের গোড়ায় চন্দ্রবংশীয় রাজারা বিক্রমপুর-চন্দ্রদ্বীপ-হরিকেল অর্থাৎ পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গের অনেকাংশ জুড়িয়া রাজত্ব করিতেন। এই বংশের মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্র তাঁহার ইদিলপুর পট্টোলী দ্বারা 'সতট-পদ্মাবতী বিষয়ের' অন্তর্গত 'কুমারতালক মণ্ডলে' একখণ্ড ভূমিদান করিয়াছিলেন। সতট-পদ্মাবতী বিষয় পদ্মানদীর দুই তীরবর্তী প্রদেশকে বুঝাইতেছে, সন্দেহ নাই ; পদ্মাবতীও নিঃসন্দেহে আবুলফজল-ত্রিপুরা রাজমালা-চৈতন্য জীবনী উল্লিখিত পদ্মাবতী, তাহাতেও সন্দেহের অবকাশ নাই। কুমারতালক মণ্ডলের উল্লেখ আরও লক্ষণীয়। কুমারতালক এবং বর্তমান গড়াই নদীর অদূরে ফরিদপুরের অন্তর্গত কুমারখালি দুইই কুমার নদীর ইঙ্গিত বহন করে, তাহা নিঃসন্দেহ। বর্তমান কুমার বা কুমার নদী পদ্মা-উৎসারিত মাথাভাঙ্গা নদী হইতে বাহির হইয়া বর্তমান গড়াইর সঙ্গে মিলিত হইয়া বিভিন্ন অংশে গড়াই, মধুমতী, শিলা(ই)দহ, বালেশ্বর নাম লইয়া হরিণঘাটায় গিয়া সমুদ্রে পড়িয়াছে।

কুমার

এ অনুমান যুক্তিসংগত যে, এই সমস্ত প্রবাহটিরই যথার্থ নাম ছিল কুমার এবং কুমারই পরে বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন নামে পরিচিত হইয়াছে। তবে শিলা(ই)দহ নামটি পুরাতন বলিয়াই যেন মনে হয়। ফরিদপুরে প্রাপ্ত ধর্মাদিত্যের একটি পট্টোলীতে শিলাকুণ্ড নামে একটি জলাশয়ের উল্লেখ আছে। শিলাকুণ্ড ও শিলা(ই)দহ একই নাম হইতেও পারে ; দুয়েরই অর্থ প্রায় এক। এই কুমার নদীর সাগর-মোহনার মুখ (হরিণঘাটা) বা কৌমারকই বোধ হয় (দ্বিতীয় শতকের) টলেমির গঙ্গার পঞ্চমুখের তৃতীয় মুখ কাম্বেরীখন (Kamberikhon)। যাহা হউক, সতট-পদ্মাবতী বিষয়ের উল্লেখ হইতে বুঝা যাইতেছে যে, দশম-একাদশ শতকেই পদ্মা বা পদ্মাবতীর প্রবাহ ইদিলপুর-বিক্রমপুর অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এবং ঐদিক দিয়াই বোধ হয় সাগরে প্রবাহিত হইত। কুমারতালক মণ্ডলের (যে মণ্ডল কুমার নদীর তল বা অববাহিকা, নদীর দুই ধারের নিম্নভূমি) উল্লেখ হইতে অনুমান হয় কুমার নদীও তখন বর্তমান ছিল এবং পদ্মাবতীর সঙ্গে তাহার যোগও ছিল। সাত শত বৎসর পর রেনেলের নকশায় তাহা লক্ষ্য করা যায়, এবং গড়াই-মধুমতী-

শিলা(ই)দহ-বালেশ্বর যদি কুমারের সঙ্গে অভিন্ন না হয় তাহা হইলে সে যোগ এখনও বর্তমান।

ইদিলপুর পট্টোলীর প্রায় সমসাময়িক একটি সাহিত্যগ্রন্থেও বোধ হয় গুহ্য রূপকছলে পদ্মানদীর উল্লেখ আছে। দশম-দ্বাদশ শতকের বজ্রযান বৌদ্ধধর্ম-সাধনার গুহ্য আচার-আচরণ সম্বন্ধে প্রাচীনতম বাঙলা ভাষার যে-সমস্ত পদ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয়ের কল্যাণে আজ সুপরিচিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে একটি পদের প্রথম চার লাইন এইরূপ :

> বাজণাব পাড়ী পঁউআ খালেঁ বাহিউ।
> অদঅ বঙ্গালে ক্লেশ লুড়িউ॥
> আজি ভুসু বঙ্গালী ভইলী।
> নিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী॥ [৪৯ নং পদ, ভুসুকু সিদ্ধাচার্যের রচনা]

সিদ্ধাচার্য ভুসুকু একাদশ শতকের মধ্যভাগের লোক। ডক্টর শহীদুল্লাহ্ মনে করেন, ভুসুকু তাঁহার গুরু দীপংকর-অতীশ-শ্রীজ্ঞানের 'পঞ্চশিষ্যের অন্যতম এবং "এই বাঙ্গাল দেশেরই এক প্রাচীন কবি"। উদ্ধৃত লাইন চারিটির আপাত অর্থ এই : 'পদ্মাখালে বজ্রনৌকা পাড়ি বাহিতেছি। অদ্বয়-বঙ্গালে ক্লেশ লুটিয়া লইল। ভুসু, তুই আজ (যথার্থ) বঙ্গালী হইলি। চণ্ডালীকে তুই নিজ ঘরনী করিয়া লইয়াছিস্।' এখানে পদ্মাখাল, বঙ্গাল, বঙ্গালী প্রভৃতি শব্দের এবং সমস্ত পদটির সহজিয়া মতানুগত গুহ্য অর্থ তো আছেই, তবে সেই গুহ্য অর্থ গড়িয়া উঠিয়াছে কয়েকটি বস্তুসম্পর্কগত শব্দকে অবলম্বন করিয়া। ভুসুকু বঙ্গালী অর্থাৎ পূর্ব-দক্ষিণ বঙ্গবাসী ছিলেন। ১০২১-২৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্রচোল দক্ষিণ-রাঢ়ের পরেই বঙ্গাল দেশ জয় করিয়াছিলেন, অর্থাৎ ভাগীরথীর পূর্বতীরে বর্তমান দক্ষিণ-বঙ্গই বঙ্গালদেশ এবং এই বঙ্গালদেশ অন্তত বিক্রমপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি যখন বঙ্গালী এবং বঙ্গালদেশের সঙ্গে পদ্মাখালের কথা বলিতেছেন, তখন পঁউআ খাল এবং পদ্মাবতী নদী যে এক এবং অভিন্ন, এ কথা স্বীকার করিতে আপত্তি হইবার কারণ নাই। তাহা হইলে, ইদিলপুর লিপি এবং ভুসুকুর এই পদটিই পদ্মা বা পদ্মাবতী নদীর প্রাচীনতম নিঃসংশয় ঐতিহাসিক উল্লেখ। তবে, পদ্মা তখনও হয়তো এত বড় নদী হইয়া উঠে নাই ; বোধ হয় খালোপমই ছিল।

দশম-একাদশ শতকে পদ্মার উল্লেখ দেখা গেল। কিন্তু পদ্মা যে গঙ্গা-ভাগীরথীর অন্যতম শাখা তাহা খুব প্রাচীন লোকস্মৃতির মধ্যেও বিধৃত হইয়া আছে। দক্ষিণবাহী গঙ্গা-ভাগীরথী হইতে পদ্মার উৎপত্তিকাহিনী বৃহদ্ধর্ম পুরাণ, দেবী ভাগবত, মহাভাগবত-পুরাণ এবং কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদিকাণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাদের একটিও অবশ্য খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের আগের রচিত গ্রন্থ নয়, কিন্তু কাহিনীগুলির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে মনে

হয়, গঙ্গা-ভাগীরথীর পূর্বযাত্রার প্রবাহপথ অর্থাৎ পদ্মা দশম-একাদশ শতক হইতেও প্রাচীন। তবে, তখন বোধ হয় পদ্মা এত প্রশস্তা ও বেগবতী নদী ছিল না, হয়তো ক্ষীণতোয়া সংকীর্ণ ধারাই ছিল। তাহা না হইলে কামরূপ হইতে সমতট যাইবার পথে য়ুয়ান-চোয়াঙ্‌কে এই নদীটি পার হইতে হইত এবং তাহার বিবরণীতে আমরা নদীটির উল্লেখও পাইতাম। এই অনুল্লেখ হইতে মনে হয় পদ্মা তখন উল্লেখযোগ্য নদী ছিল না। তাহা ছাড়া, ষষ্ঠ শতকে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি হিমবচ্ছিখর হইতে দ্বাদশ শতকে সমুদ্রতীর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল; পদ্মা আজিকার মতন ভীষণা প্রশস্তা হইলে হয়তো একই ভুক্তি পদ্মার দুই তীরে বিস্তৃত হইত না। জ্যোতির্বেত্তা ও ভৌগোলিক টলেমি (Ptolemy, 150 A. D.) তাঁহার আন্তর্গাঙ্গেয় (India intra Gangem) ভারতবর্ষের নক্‌শা ও বিবরণীতে তদনীন্তন গঙ্গা-প্রবাহের সাগরসংগমে পাঁচটি মুখের উল্লেখ করিয়াছেন। টলেমির নক্‌শা ও বিবরণ নানা দোষে দুষ্ট এবং সর্বত্র সকল বিষয়ে খুব নির্ভরযোগ্যও নয়। তবু, তাঁহার সাক্ষ্য এবং পরবর্তী ঐতিহাসিক উপাদানের উপর নির্ভর করিয়া কিছু কিছু অনুমান ঐতিহাসিকেরা করিয়াছেন, এবং এইসব মোহনা অবলম্বনে প্রাচীন ভাগীরথী-পদ্মার প্রবাহ-পথেরও কিছু আভাস দিয়াছেন। এ-সম্বন্ধে জোর করিয়া কিছু বলা শক্ত; তবে মোটামুটি মতামতগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে। পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে যথাক্রমে এই মোহনাগুলির নাম: (১) Kambyson; তারপর Poloura নামে নগর; (২) Mega (great); (৩) Kamberi khon, তারপর Tilogrammon নামে এক নগর; (৪) Pseudostomon (false mouth), এবং সর্বশেষে পূর্বতম মোহনা (৫) Antibole (thrown back)। নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় এই মোহনাগুলিকে যথাক্রমে (১) তাম্রলিপ্ত-নিকটবর্তী গঙ্গাসাগর মুখ, (২) আদিগঙ্গা বা রায়মঙ্গল-হরিয়াভাঙ্গা মুখ, (৩) কুমার-হরিণঘাটা মুখ, (৪) দক্ষিণ সাহাবাজপুর মুখ, এবং (৫) সন্দ্বীপ-চট্টগ্রাম-মধ্যবর্তী আড়িয়ল খাঁ নদীর নিম্নতম প্রবাহমুখ বলিয়া মনে করেন। হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় মনে করেন, (১) কালিদাস-কথিত কপিশা বা বর্তমান কাসাইর মুখ, (২) ভাগীরথীর সাগরমুখ (৩) কুমার-কুমারক-হরিণঘাটা মুখ, (৪) পদ্মা-মেঘনার সম্মিলিত প্রবাহমুখ, এবং (৫) বুড়ীগঙ্গা মুখই যথাক্রমে টলেমি-কথিত গঙ্গার পঞ্চমুখ। এই দুই মতের মধ্যে ১ ও ২নং ছাড়া আর কোথাও খুব মূলগত বিশেষ কিছু পার্থক্য নাই; ২নং মুখের পার্থক্যও খুব মূলগত নয়। ৩, ৪, ও ৫ নং মুখ সম্বন্ধে যদি সদ্যোক্ত মত দুইটি সত্য নয় তাহা হইলে স্বীকার করিতেই হয় টলেমির সময়েই অন্তত ঢাকা-ফরিদপুর অঞ্চল পর্যন্ত গঙ্গার পূব-দক্ষিণবাহী প্রবাহপথ অর্থাৎ পদ্মার প্রবাহপথের অস্তিত্ব ছিল। খুব অসম্ভব নাও হইতে পারে, তবে, এ-সম্বন্ধে জোর করিয়া কিছু বলা যায় না।

ধলেশ্বরী : বুড়ীগঙ্গা

পদ্মার প্রাচীনতম প্রবাহপথের নিশানা সম্বন্ধেও নিঃসংশয়ে কিছু বলা যায় না। ফান্ ডেন্ ব্রোকের (১৬৬০) নকশায় দেখা যাইতেছে পদ্মার প্রশস্ততর প্রবাহের গতি ফরিদপুর-বাখরগঞ্জের ভিতর দিয়া দক্ষিণ সাহাবাজপুরের দিকে। কিন্তু ঐ নকশাতেই প্রাচীনতর পথটিরও কিছুটা ইঙ্গিত বোধ হয় আছে। এই পথটি রাজসাহীর রামপুর-বোয়ালিয়ার পাশ দিয়া চলনবিলের ভিতর দিয়া ধলেশ্বরীর খাত দিয়া ঢাকার পাশ দিয়া মেঘনা-খাড়িতে গিয়া সমুদ্রে মিশিত। ঢাকার পাশের নদীটিকে যে বুড়ীগঙ্গা বলা হয়, তাহা এই কারণেই ; ঐ বুড়ীগঙ্গাই প্রাচীন পদ্মা-গঙ্গার খাত। কিন্তু তাহারও আগে কোন্ পথে পদ্মা প্রবাহিত হইত, সে-সম্বন্ধে কিছু বলা কঠিন।

জলাঙ্গী : চন্দনা

পদ্মার প্রধান প্রবাহ ছাড়া পদ্মা হইতে উৎসারিত আরও কয়েকটি নদীর প্রবাহপথে ভাগীরথী-পদ্মার জল নিষ্কাশিত হয়। ইহাদের ভিতর জলাঙ্গী এবং চন্দন, নদী দুইটি পদ্মা হইতে ভাগীরথীতে প্রবাহিত ; এবং দুইটি নদীই ফান্ ডেন্ ব্রোকের নকশায় দেখানো আছে। চন্দনা তদানীন্তন যশোহরের পশ্চিম দিক দিয়া প্রবাহিত হইত। পদ্মা হইতে সমুদ্রে প্রবাহিত প্রাচীন নদীগুলির মধ্যে কুমারই প্রধান এবং প্রাচীনতম। কিন্তু কুমার এখন মরণোন্মুখ। মধ্যযুগে এই নদীগুলির মধ্যে ভৈরবও ছিল অন্যতম, সেই ভৈরবও মরণোন্মুখ। বর্তমানে সাগরগামী পদ্মাশাখাগুলির মধ্যে মধুমতী ও আড়িয়ল খাঁই প্রধান। ধলেশ্বরী-বুড়ীগঙ্গা যেমন পদ্মার উত্তরতম প্রবাহপথের স্মারক, আড়িয়ল খাঁ (মিজা নাথনের অওল খাঁ) তেমনই দক্ষিণতম প্রবাহপথের দ্যোতক। যাহা হউক,

ভৈরব : মধুমতী : আড়িয়ল খাঁ

মধুমতী ও আড়িয়ল খাঁ, এই দুইটি নদীর অস্তিত্ব সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের নকশা-গুলিতেই দেখা যাইতেছে, যদিও বর্তমানে প্রবাহপথ অনেকটা পরিবর্তন হইয়াছে।

বাংলার খাড়ি : ভাটি

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ভাগীরথী-পদ্মার বিভিন্ন প্রবাহপথের ভাঙা-গড়ার ইতিহাস অনুসরণ করিলেই বুঝা যায়, এই দুই নদীর মধ্যবর্তী সমতটীয় ভূভাগে, অর্থাৎ নদী দুইটির অসংখ্য খাড়ি-খাড়িকাকে লইয়া কি তুমুল বিপ্লবই না চলিয়াছে যুগের পর যুগ। এই দুইটি নদী এবং তাহাদের অগণিত শাখাপ্রশাখা-বাহিত সুবিপুল পলিমাটি ভাগীরথী পদ্মা মধ্যবর্তী খাড়িময় ভূভাগকে বারবার তছনছ করিয়া বারবার তাহার রূপ

পরিবর্তন করিয়াছে। পদ্মার খাড়িতে ফরিদপুর অঞ্চল হইতে আরম্ভ করিয়া ভাগীরথীর তীরে ডায়মণ্ড হারবারের সাগরসংগম পর্যন্ত বাখরগঞ্জ, খুলনা, চব্বিশ-পরগনার নিম্নভূমি ঐতিহাসিক কালেই কখনও সমৃদ্ধ জনপদ, কখনও গভীর অরণ্য, অথবা অনাবাসযোগ্য জলাভূমি, কখনও বা নদীগর্ভে বিলীন, আবার কখনও খাড়ি-খাড়িকা অন্তর্হিত হইয়া নূতন স্থলভূমির সৃষ্টি। ফরিদপুর জেলায় কোটালিপাড়া অঞ্চল ষষ্ঠ শতকের একাধিক তাম্রপট্টোলীতে নব্যাবকাশিকা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে; নব্যাবকাশিকা সেই ভূমি, যে ভূমি (বা অবকাশ) নূতন সৃষ্ট হইয়াছে। ষষ্ঠ শতকে নব্যাবকাশিকা সমৃদ্ধ জনপদ এবং নৌ-বাণিজ্যের অন্যতম সমৃদ্ধ কেন্দ্র, অথচ আজ এই অঞ্চল নিম্নজলাভূমি। পট্টোলীগুলি হইতে মনে হয়, নৌকাদ্বারাই এইসব অঞ্চলে যাওয়া-আসা করিতে হইত। আশ্চর্যের বিষয় এই, ত্রয়োদশ শতকের প্রথম পাদে সেনরাজ বিশ্বরূপসেনের সাহিত্য-পরিষৎলিপিতে বঙ্গের নাব্য অঞ্চলে রামসিদ্ধি পাঠক নামে একটি গ্রামের উল্লেখ আছে। এই গ্রাম বাখরগঞ্জ জেলার গৌরনদী অঞ্চলে। এই নাব্য অঞ্চলেরই অন্তর্ভুক্ত বিনয়তিলক গ্রামের পূর্ব সীমায় ছিল সমুদ্র। শ্রীচন্দ্রের (দশম-একাদশ শতক) রামপাল পট্টোলীতে নান্য মণ্ডলের উল্লেখ আছে; কেহ কেহ মনে করেন ইহার যথার্থ পাঠ নাব্য মণ্ডল, এবং ঐ পট্টোলীর নাব্যমণ্ডলান্তর্গত নেহকাষ্ঠি গ্রাম বাখরগঞ্জ জেলার বর্তমান নৈকাঠি গ্রাম। এই অনুমান মিথ্যা নয় বলিয়াই মনে হয়। যাহাই হউক, প্রাচীন বাঙলায় নব্যাবকাশিকা নবসৃষ্ট ভূমি এবং ফরিদপুর-বাখরগঞ্জ অঞ্চল নাব্য অর্থাৎ নৌ-যাতায়াতলভ্য এবং তাহার পূর্ব-সীমায় সমুদ্র। খুলনার নিম্ন অঞ্চলে তো ভাঙাগড়া মধ্যযুগে এবং খুব সাম্প্রতিক-কালেও চলিয়াছে, এখনও চলিতেছে। মধ্যযুগে মুসলমান ঐতিহাসিকেরা, তারনাথ প্রভৃতি বৌদ্ধ লেখকেরা, ময়নামতীর গানের রচয়িতা প্রভৃতিরা ভাগীরথীর পূর্বতীর হইতে সুবা বাংলার পূর্বদিকে বেঙ্গলা (Bengala-ঢাকার বাঙ্গালাবাজার ?) পর্যন্ত, বোধ হয় চট্টগ্রাম পর্যন্ত সমস্ত নিম্নাঞ্চলটাকে বাটি বা ভাটি নামে অভিহিত করিয়াছেন। আবুল ফজল বাটি বা ভাটি বলিতে সুবা বাংলার পূর্বাঞ্চল বুঝিয়াছেন। মানিকচন্দ্র রাজার গানেও "ভাটি হইতে আইল বাঙ্গাল লম্বা লম্বা দাড়ি"—এই ভাটিরও ইঙ্গিত সমুদ্রশায়ী এইসব খাড়ি-খাড়িকাময় নিম্নভূমির দিকে, অর্থাৎ, বঙ্গালভূমির দক্ষিণ অঞ্চলের দিকে। এই ভাটিরই কিয়দংশ প্রাচীন বাংলার সমতট, এইরূপ অনুমান বোধ হয় খুব অসংগত নয়। অর্থের দিক হইতে সমতট হইতেছে সেই ভূমি যে ভূমি (সমুদ্র) তটের সঙ্গে সমান, অর্থাৎ জোয়ারের জল যে-পর্যন্ত প্রবেশ করে; ভাটি অর্থও প্রায় তাহাই।

সুন্দরবন

কিন্তু, সবচেয়ে বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটিয়াছে বর্তমান সুন্দরবন অঞ্চলে, চব্বিশ পরগনা-খুলনা-বাখরগঞ্জের নিম্নভূমিতে; এবং সমস্ত পরিবর্তনটাই ঘটিয়াছে মধ্যযুগে।

কারণ, এই অঞ্চলের পশ্চিম দিকটায় অর্থাৎ চব্বিশ পরগণা জেলার নিম্নাঞ্চলে পঞ্চম-ষষ্ঠ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত সমানে সমৃদ্ধ- ঘনবসতিপূর্ণ জনপদের চিহ্ন প্রায়ই আবিষ্কৃত হইয়াছে ও হইতেছে। জয়নগর থানায় কাশীপুর গ্রামের সূর্য-মূর্তি (আনুমানিক ষষ্ঠ শতক); ডায়মণ্ড হারবারের প্রায় ২০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বকুলতলা গ্রামে প্রাপ্ত লক্ষ্মণসেনের পট্টোলী (দ্বাদশ শতক), এবং ১৫ মাইল দক্ষিণ পূর্বে মলয় নামক স্থানে প্রাপ্ত জয়নাগের তাম্র-পট্টোলী (সপ্তম শতক); রাক্ষসখালি দ্বীপে প্রাপ্ত ডোম্মনপালের পট্টোলী (দ্বাদশ শতক); ঐ দ্বীপেই প্রাপ্ত লিপিউৎকীর্ণ এক-ঝাঁক মাটির সীল-মোহর (একাদশ শতক); খাড়ি পরগনায় প্রাপ্ত অসংখ্য পাথরের মূর্তি, ২।৪টি ভগ্ন মন্দির, কালীঘাটে প্রাপ্ত গুপ্তমুদ্রা, ইত্যাদি সমস্তই চব্বিশ পরগনা জেলার নিম্নভূমিতে প্রাচীন বাঙলার এক বা একাধিক সমৃদ্ধ জনপদের ইঙ্গিত করে। সেন রাজাদের ও ডোম্মনপালের আমলে খাড়িমণ্ডল ও খাড়িবিষয় পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ বিভাগই ছিল। অথচ, আজ এইসব অঞ্চল প্রায় পরিত্যক্ত; কিছুদিন আগে তো সমস্তটা জুড়িয়া গভীর অরণ্যই ছিল। এখনও বহু অংশেই অরণ্য, কিছু কিছু অংশে মাত্র নূতন আবাদ ও বসতি হইতেছে। খুলনার দিকে এবং বাখরগঞ্জের কিয়দংশে তো এখনও গভীর অরণ্য। রাল্‌ফ্‌ ফিচ্‌ (Ralph Fitch, 1583 91) বলিতেছেন, Bengala দেশ ব্যাঘ্র, বন্য-মহিষ ও বন্য-মুরগী (হাঁস)-অধ্যুষিত বনময় জলাভূমি। ধর্মপালের খালিমপুর লিপি, দেবপালের নালন্দা লিপি এবং লক্ষ্মণসেনের আনুলিয়া লিপিতে ব্যাঘ্রতটী মণ্ডল নামে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্গত একটি স্থানের উল্লেখ আছে। নামটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরিলে (যে সমুদ্রতট ব্যাঘ্রদ্বারা অধ্যুষিত) মনে হয়, চব্বিশ-পরগনা, খুলনা, বাখরগঞ্জের দিকেই যেন স্থানটির ইঙ্গিত। এ অনুমান সত্য হইলে স্বীকার করিতে হয় নবম-দ্বাদশ শতকে দক্ষিণ-বঙ্গের অন্তত কিয়দংশে গভীর অরণ্যময় ছিল। ব্যাঘ্রতটী বাগড়ী হইলেও হইতে পারে, না-ও হইতে পারে।

আকবরের আমলে ঈশা খাঁ আফ্‌গান ভাটি অঞ্চলের সামন্তপ্রভু ছিলেন; সেই সময়ে মাহ্‌মুদাবাদ ও খলিফাতাবাদ সরকারের অন্তর্গত ছিল বর্তমান ফরিদপুর, যশোর এবং নোয়াখালি জেলার কিয়দংশ, এবং এই দুই সরকারান্তর্গত বহুলাংশ গভীর অরণ্যময়

[illegible]। খান জাহান আলীর আমলে (ষোড়শ শতকে) যশোর জেলার দক্ষিণ-[illegible]াংশে গভীর অরণ্য; তিনি সুন্দরবনের অনেক অংশে নূতন আবাদ করাইয়াছিলেন। [illegible] সাহ্‌, সৈয়দ হোসেন সাহ্‌, নসরৎ সাহ (১৪৯৪, ১৪৯৪, ১৫২০) প্রভৃতি

সুলতানেরাও এইসব অরণ্যের কিছু কিছু নূতন আবাদ করাইয়াছিলেন প্রধানত ফরিদপুর ও যশোরে। এই দুই জেলার অনেক অংশ ফতেহাবাদ সরকারের অন্তর্গত ছিল : বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলে ফতেহাবাদের উল্লেখ আছে (পঞ্চদশ শতক)। জেসুইট্ পাদ্রী ফারনান্‌ডিজ্ (Fernandus, 1598) হুগলি হইতে শ্রীপুর (খুলনা জেলায় ইছামতীর তীরে, বর্তমান টাকির উলটা দিকে) হইয়া চট্টগ্রামের সমস্ত পথটাই ব্যাঘ্রসংকুল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এক বৎসর পর ফন্‌সেকা (Fonseca 1599, বাক্‌লা হইতে সপ্তগ্রামের (সাতগাঁ=Chandeecan) পথ বানর ও হরিণ-অধ্যুষিত বনময় ভূমি বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন। পূর্বোক্ত ফিচ্ সাহেব (১৫৮৩-৯১) বলিতেছেন, বাক্‌লা বন্দরের পাশ ঘিরিয়াই জঙ্গল। ষোড়শ শতকের শেষের দিকে প্রতাপাদিত্য যশোরে সুন্দরবন অঞ্চলেই নিজ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ত্রয়োদশ শতকের পর কোনও সময় চব্বিশ-পরগনা জেলার নিম্নভূমি কোনও অজ্ঞাত অনির্ধারিত কারণে পরিত্যক্ত হয় ; এই কারণ কোন প্রাকৃতিক কারণ হইতে পারে, কোনও রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক কারণও হইতে পারে। তাহার পর হইতেই এই অঞ্চল গভীর অরণ্যময়। যশোর-খুলনা ও ফরিদপুর-বাখরগঞ্জের কিছু কিছু নিম্নভূমি হিন্দু আমলেই ধীরে ধীরে ক্রমশ সমৃদ্ধ জনপদ গড়িয়া উঠিতেছিল এবং নূতন নূতন আবাদ তথাকথিত পাঠান আমলেও নূতন জনপদ গড়িয়া তুলিতেছিল, কিন্তু প্রকৃতির তাণ্ডব এবং মানুষের ধ্বংসলীলা ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকেই ইহার উপর যবনিকা টানিয়া দেয়। ১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রবল বন্যায় ফতেহাবাদ সরকারে অসংখ্য ঘরবাড়ি, নৌকা, এবং দুই লক্ষ লোক নষ্ট হইয়া যায়। ইহার উপর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হইল মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের উন্মত্ত হত্যা ও লুণ্ঠনলীলা ; তাহার ফলে বাখরগঞ্জ এবং খুলনার নিম্নভূমি একেবারে জনমানবহীন গভীর অরণ্যে পরিণত হইয়া গেল। রেনেলের নকশায় (১৭৬১) দেখা যাইবে, বাখরগঞ্জ জেলার সমস্ত দক্ষিণাঞ্চলে জুড়িয়া লেখা আছে, "মগদের অত্যাচারে পরিত্যক্ত জনমানবহীন" ("Country depopulated by the Maghs.")।

পদ্মার পূর্ব-দক্ষিণতম প্রবাহে উত্তর হইতে লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্র আসিয়া মিলিত হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্র অতি প্রাচীন নদ এবং তাহার তীর্থ-মহিমাও নেহাত অর্বাচীন নয়।

লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্র

তত্টা না হউক, ব্রহ্মপুত্রও পদ্মা-ভাগীরথীর ন্যায় অন্তত কয়েকবার খাত পরিবর্তন করিয়া যমুনা-পদ্মার পথে বর্তমান খাত গ্রহণ করিয়াছে এবং চাঁদপুরের দক্ষিণে মেঘনার সঙ্গে মিলিত হইয়া সমুদ্রে অবতরণ করিয়াছে। গারো পাহাড়ের পশ্চিমের মোড় পর্যন্ত উত্তর-প্রবাহে লৌহিত্যের খাত পরিবর্তনের প্রমাণ বিশেষ কিছু নাই ; পার্বত্যপথ, খাত পরিবর্তনের সুযোগও কম। কিন্তু গারো পাহাড়ের

লক্ষ্যা।

পশ্চিম-দক্ষিণ মোড় ঘুরিয়াই লৌহিত্য ঐ পাহাড়ের পূর্ব দক্ষিণ তলভূমি ঘেঁষিয়া, দেওয়ানগঞ্জের পাশ দিয়া, শেরপুর-জামালপুরের ভিতর দিয়া, মধুপুর গড়ের পাশ দিয়া, মৈমনসিংহ জেলাকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়া, বর্তমান ঢাকা জেলার পূর্বাঞ্চল ভেদ করিয়া, সুবর্ণগ্রাম বা সোনার গাঁ'র দক্ষিণ-পশ্চিমে লাঙ্গলবন্দের পাশ দিয়া ধলেশ্বরীতে প্রবাহিত হইত। এই খাত এখনও বর্তমান, কিন্তু বর্ষাকাল ছাড়া অন্য সময়ে প্রায় মৃত বলিলেই চলে। এই খাতই প্রাচীন এবং ব্রহ্মপুত্রের যাহা কিছু তীর্থমহিমা তাহা এই খাতেরই; এখনও জামালপুর-মৈমনসিংহ-লাঙ্গলবন্দে অষ্টমী-স্নান পূর্ব-বাংলার অন্যতম প্রধান ধর্মোৎসব। ফান্ ডেন ব্রোক (১৬৬০), ইজাক্ টিরিয়ন (১৭৩০) এবং থর্নটনের নক্শায় Salhet (Sylhet) বা শ্রীহট্টকে কেন যে এই প্রবাহপথের পশ্চিমে দেখান হইয়াছে তাহা বলা শক্ত; শ্রীহট্টের অবস্থিতি সম্বন্ধে বোধ হয় ইহাদের সুস্পষ্ট জ্ঞান কিছু ছিল না। রেনেল (১৭৬৪-১৭৭৬) কিন্তু শ্রীহট্টের অবস্থিতি ঠিক দেখাইয়াছেন। যাহা হউক, ঢাকা জেলার উত্তরে এই ব্রহ্মপুত্র প্রবাহেরই ডান দিক হইতে একটি শাখা-প্রবাহ নির্গত হইয়াছে; ইহার নাম লক্ষ্যা (শীতললক্ষ্যা বা শীতলক্ষ্যা), বা ফান্ ডেন ব্রোকের Lecki। লক্ষ্যা ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম দিক দিয়া ব্রহ্মপুত্রেরই সমান্তরালে প্রবাহিত হইয়া বর্তমান ঢাকার দক্ষিণে (ব্রহ্মপুত্র-ধলেশ্বরী-সংগমের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে) নারায়ণগঞ্জের নিকটে ধলেশ্বরীর সঙ্গে আসিয়া মিলিত হইত। লক্ষ্যার এই প্রবাহ এখনও বর্তমান, কিন্তু ধারা ক্ষীণ, অথচ ফান্ ডেন ব্রোকের আমলে এবং তারপরে উনবিংশ শতকের গোড়ায়ও লক্ষ্যা প্রশস্তা বেগবতী নদী। লক্ষ্যার কথা ছাড়িয়া ব্রহ্মপুত্রের মূল প্রবাহে ফিরিয়া আসা যাইতে পারে। ফান্ ডেন ব্রোক, ইজাক্ টিরিয়ন, থর্নটন, রেনেল ইত্যাদি সকলের নক্শা আলোচনা করিলে নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় যে, সপ্তদশ শতকে ফান্ ডেন ব্রোকের আগেই ব্রহ্মপুত্র এই খাত পরিত্যাগ করিয়াছিল। কারণ, এই নক্শাগুলিতে দেখা যায় ব্রহ্মপুত্র আর ধলেশ্বরীতে প্রবাহিত হইতেছে না; বর্তমান ঢাকা জেলার সীমায় পৌঁছিবার অব্যবহিত পূর্বে মৈমনসিংহের ভিতর দিয়া আসিয়া পূর্ব-দক্ষিণতম কোণে ভৈরব-বাজার বন্দরের নিকট উত্তরাগত সুরমা মেঘনার সঙ্গে ব্রহ্মপুত্রের মিলন ঘটিতেছে, এবং উভয়ের সম্মিলিত ধারা চাঁদপুরের দক্ষিণে সন্দ্বীপের উত্তরে গিয়া সমুদ্রে পড়িতেছে। ভৈরববাজারের নিকট হইতে সমুদ্র পর্যন্ত এই ধারা রেনেলের সময়েও মেঘনা (Megna) নামেই খ্যাত। ব্রহ্মপুত্রের সদ্যোক্ত প্রবাহই তাহার পূর্বতম প্রবাহ; কিন্তু ব্রহ্মপুত্র এই প্রবাহও পরিত্যাগ করে উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি কোনও সময়ে; জলপ্রবাহ এখনও বিদ্যমান কিন্তু ধারা ক্ষীণ এবং গ্রীষ্মে মৃতপ্রায়। মেঘনা প্রধানত তাহার নিজের জলরাশিই সমুদ্রে নিষ্কাশিত করে।

ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি হইতে ব্রহ্মপুত্রের অন্যতম শাখা যমুনা প্রবলতরা হইয়া উঠে, এবং বর্তমানে মৈমনসিংহের উত্তর-পশ্চিমতম কোণে ফুলছড়ির নিকট হইতে উৎসারিতা, বগুড়া-পাবনার পূর্বসীমা-বাহিতা এই যমুনাই ব্রহ্মপুত্রের বিপুল জলরাশি বহন করিয়া আনিয়া এখন গোয়ালন্দের কাছে পদ্মাপ্রবাহে ঢালিয়া দিতেছে।

সপ্তদশ শতক হইতে লৌহিত্য-ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহ-ইতিহাস সুস্পষ্ট ; তাহার আগেকার ইতিহাসও কতকটা ধরিতে পারা কঠিন নয়, এবং দেওয়ানগঞ্জ-জামালপুর লাঙ্গলবন্ধ-ধলেশ্বরীর পথে সে ইঙ্গিতও কিছু পাওয়া যাইতেছে। এ পথ চতুর্দশ-ষোড়শ শতকের হইতে পারে, প্রাচীনতরও হইতে পারে। কিন্তু তারও আগে এই পথের ইতিহাস কোথাও পাইতেছি না। লৌহিত্য-ব্রহ্মপুত্রের উল্লেখ পুরাণে, প্রাচীন সাহিত্যে (যথা, মহাভারতে ভীমের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে) এবং লিপিমালায় একেবারে অপ্রচুর নয়, এবং তাহা সুবিদিত। সুতরাং এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। প্রাচীন কামরূপরাজ্য ছিল এই লৌহিত্যের তীরে। গুপ্তরাজ মহাসেনগুপ্ত একবার লৌহিত্যতীরে কামরূপরাজ সুস্থিতবর্মণের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন (ষষ্ঠ শতকের শেষাশেষি)। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই এইসব প্রাচীন উল্লেখ সাধারণতঃ লৌহিত্যের উত্তর-প্রবাহ সম্বন্ধে। দক্ষিণ-প্রবাহে যেখানে বারবার খাত পরিবর্তন হইয়াছে সে-সম্বন্ধে কোনও প্রাচীন ঐতিহাসিক উল্লেখ এখনও পাওয়া যাইতেছে না।

সুরমা-মেঘনা

মেঘনা সম্বন্ধে বক্তব্য সংক্ষিপ্ত। খাসিয়া-জৈন্তিয়া শৈলমালা হইতে মেঘনার উদ্ভব, কিন্তু উত্তর-প্রবাহে মেঘনা সুরমা নামেই খ্যাত এবং এই নামটি প্রাচীন। সুরমা শ্রীহট্ট জেলার ভিতর দিয়া মৈমনসিংহ জেলার নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জ মহকুমার পূর্বসীমা স্পর্শ করিয়া আজমিরিগঞ্জ বন্দর ও অদূরবর্তী বানিয়াচঙ্গ গ্রাম বাম তীরে রাখিয়া ভৈরব-বাজারে এক সময় ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে আসিয়া মিলিত হইত। নিম্নতর প্রবাহের কথা ব্রহ্মপুত্র প্রসঙ্গেই বলিয়াছি। সুরমা যেখান হইতে পশ্চিমা গতি ছাড়িয়া দক্ষিণা গতি লইয়াছে (বর্তমান মার্কুলি স্টীমার স্টেশনের নিকট) সুরমা সেখান হইতে মেঘনা নামও লইয়াছে। রেনেলের নক্শায় এই পথ সুস্পষ্ট দেখান আছে ; আজমিরিগঞ্জ-বানিয়াচঙ্গও বাদ পড়ে নাই। এই নদীপথের উল্লেখযোগ্য কোনও পরিবর্তন হইয়াছে, ঐতিহাসিক প্রমাণ এমন কিছু নাই। মেঘনার নিম্ন-প্রবাহের দুই তীরে সমৃদ্ধ জনপদের পরিচয় চতুর্দশ শতকে ইব্‌ন বতুতার বিবরণেই পাওয়া যায় ; ১৫ দিন ধরিয়া মেঘনার পথে তিনি গিয়াছিলেন ; দুই ধারে ঘনবসতিময় গ্রাম, ফলের উদ্যান, মনে হইয়াছিল যেন কোনো বাজারের মধ্য দিয়া যাইতেছেন। মেঘনা নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি অনুমানের

উল্লেখ এ প্রসঙ্গে হয়তো অবান্তর হইবে না। চলিত লোকবচনে ও স্মৃতিতে এই উৎপত্তি মেঘনাদ বা মেঘানন্দ শব্দ হইতে। কিন্তু টলেমি খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে গঙ্গার অন্যতম মুখের নাম করিয়াছেন Mega (= great) বলিয়া। এই Mega = Megna(Magna = great), নদী হইতে মেঘনাদ = মেঘান্দ = মেঘনা নামের উৎপত্তিএকেবারে ইতিহাস-বিরুদ্ধ না-ও হইতে পারে। তবে, ইহা একান্তই অনুমান।

করতোয়া, তিস্তা, পুনর্ভবা, মহানন্দা, আত্রাই

উত্তর-বঙ্গের নদনদীগুলির কথা এইবার বলা যাইতে পারে। উত্তর-বঙ্গের সর্বপ্রধান নদী করতোয়া। এই নদীর ইতিহাস সুপ্রাচীন এবং ইহার তীর্থমহিমা বহুখ্যাত। পুরাণে বারবার করতোয়া-মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, করতোয়া-মাহাত্ম্য নামে একখানা সুপ্রাচীন পুঁথি এখনও করতোয়ার তীর্থমহিমা ঘোষণা করে। লঘুভারতে বলা হইয়াছে, "বৃহৎপরিসরা পুণ্যা করতোয়া মহানদী"; মহাভারতের বনপর্বের তীর্থযাত্রা অধ্যায়েও করতোয়া পুণ্যতোয়া বলিয়া কথিত হইয়াছে, এবং গঙ্গাসাগরসংগম তীর্থের সঙ্গে একত্র উল্লিখিত হইয়াছে। পুণ্ড্রবর্ধনের রাজধানী প্রাচীন পুন্দনগল (= পুণ্ড্রনগর = বর্তমান মহাস্থানগড়, বগুড়ার অদূরে) এই করতোয়ার উপরই অবস্থিত ছিল। খুব প্রাচীন কালেও যে করতোয়া বর্তমান বগুড়া জেলার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইত তাহা মহাস্থানের অবস্থিতি এবং করতোয়া-মাহাত্ম্য হইতেই প্রমাণিত হয়। সপ্তম শতকে য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ পুণ্ড্রবর্ধন হইতে কামরূপ যাইবার পথে বৃহৎ একটি নদী অতিক্রম করিয়াছিলেন; তিনি এই নদীটির নাম করেন নাই, কিন্তু টাং-সু (T'ang-shu) গ্রন্থের মতে এই নদীর নাম ক-লো-তু বা Ka-lo-tu। Watters সাহেব Ka-lo-tuকে ব্রহ্মপুত্র বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। নিঃসন্দেহে ইহা ভুল। Ka-lo-tu স্পষ্টতই করতোয়া; এই নদীই যে সপ্তম শতকে পুণ্ড্রবর্ধন ও কামরূপের মধ্যবর্তী সীমা, এ খবরও টাং-সু গ্রন্থে পাওয়া যাইতেছে। সন্ধ্যাকরনন্দীর রামচরিতের কবি-প্রশস্তিতেও এই তথ্যের আংশিক সমর্থন পাওয়া যাইতেছে; সেখানে স্পষ্টতই বলা হইতেছে, বরেন্দ্রীদেশ (লিপিমালার বরেন্দ্রী বা বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রীমণ্ডল) গঙ্গা ও করতোয়ার মধ্যবর্তী দেশ। যাহা হউক, এইসব উল্লেখ, এবং লিপিমালার যে-সব গ্রাম ও নগর বরেন্দ্রীর অন্তর্গত বলা হইয়াছে (যেমন বায়ীগ্রাম = বৈগ্রাম বর্তমান দিনাজপুর জেলায় হিলির নিকটে; কোড়ঞ্চ = কুড়ুঞ্জ, বোধ-হয় দিনাজপুর জেলায়; কান্তাপুর = কান্তনগর, বর্তমান দিনাজপুর জেলায়; নাটোরি = নাটোর, বর্তমান রাজসাহী জেলায়; পদুবম্বা = পাবনা? ইত্যাদি) তাহাদের অবস্থিতি বিশ্লেষণ করিলে সন্দেহ করিবার কারণ থাকে না যে, সপ্তম শতকে বরেন্দ্রীর পূর্বদিক ঘিরিয়া, প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধনের পূর্ব-সীমা দিয়া, করতোয়া প্রবাহিত হইত। করতোয়া-মাহাত্ম্য পাঠে মনে হয়, এক সময়ে করতোয়া স্ব-তন্ত্র নদী হিসাবে গিয়া সাগরে পড়িত, কিন্তু তাহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। লোকস্মৃতি সাগর বলিতে বোধহয় কোন

বৃহৎ জলস্রোতকেই বুঝিয়া ও বুঝাইয়া থাকিবে। অন্তত, মধ্যযুগে করতোয়ার জল নিঃশেষিত হইতেছে প্রশস্ত পদ্মা-ধলেশ্বরী সংগমে। কিন্তু এ সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য তাহা পরে বলিতেছি।

করতোয়া ভোটান-সীমান্তেরও উত্তরে হিমালয় হইতে উৎসারিত হইয়া দার্জিলিং-জলপাইগুড়ি জেলার ভিতর দিয়া বাঙলাদেশে প্রবেশ করিয়াছে। এই উত্তরতম প্রবাহে ইহার নাম করতোয়া নয়, দিস্তাং বা তিস্তা, যাহার সংস্কৃতীকরণ হইয়াছে ত্রিস্রোতা। জলপাইগুড়ি হইতে তিস্তার (ফান্ ডেন্ ব্রোকের নক্শায়—Tiesta) তিনটি স্রোত তিন দিকে প্রবাহিত হইয়াছে; দক্ষিণবাহী পূর্বতম স্রোতের নাম করতোয়া: দক্ষিণবাহী মধ্যবর্তী স্রোতধারার নাম আত্রাই: দক্ষিণবাহী পশ্চিমতম স্রোতের নাম পূর্ণভবা বা পুনর্ভবা। পুনর্ভবা উনবিংশ শতকে আইয়রগঞ্জের নিকটে মহানন্দার সঙ্গে মিলিত হইত, এবং মহানন্দা রামপুর-বোয়ালিয়ার নিকটে পদ্মার সঙ্গে মিলিত হইত। কিন্তু, তাহার আগে এক সময় মহানন্দা (এবং পুনর্ভবা) লক্ষণাবতী গৌড়ের ভিতর দিয়া আসিয়া করতোয়ায় নিজ প্রবাহের জল নিষ্কাশিত করিত, এমন প্রমাণ পাওয়া যায়। রেনেলের নক্শায় সে পরিচয় পাওয়া যাইতেছে; কিন্তু ফান্ ডেন্ ব্রোকের আমলে মহানন্দার গতি আরও পশ্চিমে। আত্রাই (তঙ্গন-আত্রাই) তিস্তা হইতে নির্গত হইয়া সোজা দক্ষিণবাহী হইয়া চলনবিলের ভিতর দিয়া জাফরগঞ্জের নিকটে করতোয়ার সঙ্গে মিলিতে হইত। ফান্ ডেন্ ব্রোক্, ইজাক্ টিরিয়ন্, থর্নটন, সকলের নক্শাতেই আত্রাই-করতোয়া-সংগম সুস্পষ্ট দেখান আছে। এই নক্শাগুলিতেই দেখা যায়, আত্রাইর ছোট একটি শাখা পশ্চিমবাহী হইয়া গিয়া পদ্মায় পড়িয়াছে; কিন্তু তঙ্গন-আত্রাই পথই প্রধান প্রবাহপথ। দেখা যাইতেছে, তিস্তা হইতে নির্গত দুইটি স্রোতই উত্তর-বঙ্গের বিভিন্ন অংশ ঘুরিয়া প্লাবিত করিয়া তাহাদের জলরাশি শেষ পর্যন্ত ঢালিয়া দিত তৃতীয় স্রোতটিতে, অর্থাৎ করতোয়ায়; তাহা ছাড়া, সে নিজের এবং উত্তরতম প্রবাহ তিস্তার সমস্ত জলধারা তো বহন করিতই। এইসব কারণেই ষোড়শ শতকের শেষাশেষি পর্যন্ত করতোয়া ছিল অত্যন্ত বেগবতী নদী। সপ্তদশ শতকের গোড়াতে মির্জা নাথনের বিবরণী (১৬০৮) পড়িলে মনে হয়, সাহাজাদপুরের (পাবনা) দক্ষিণে করতোয়া বক্র, সংকীর্ণ ও ক্ষীণতোয়া হইতে আরম্ভ করিয়াছে। আজ করতোয়া মৃতপ্রায়, আত্রাই-পুনর্ভবারও একই দশা! কিন্তু সপ্তদশ শতকেও অবস্থা তত খারাপ হয় নাই। ফান্ ডেন্ ব্রোকের নক্শায় (১৬৬০) আত্রাই ও করতোয়া দুয়েরই আকৃতি প্রশস্ত। টেভার্নিয়ার ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে উত্তরাগত একটি বড় নদীর নাম করিতেছেন Chativor; এই Chativor তো করতোয়া বলিয়াই মনে হয়। তাহা ছাড়া, জাও ডি ব্যারোস (১৫৫০) এবং কাস্তেল্লি দা ভিনোলা (১৬৬৩) এই দুইজন তাঁহাদের নক্শায় উত্তর হইতে সোজা দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত লম্বমান একটি নদী দেখাইতেছেন; ইহার নাম কাওর (Caor)। কাওরকেও করতোয়া

বলি়াই স্বীকার করিতে হয়। ইঁহাদের নক্শা যথাযথ নয় এবং হয়তো সর্বত্র সর্বথা নির্ভরযোগ্যও নয়; তবু সমসাময়িক বাঙলার নদনদী-বিন্যাসের আভাস এইসব নক্শায় খানিকটা নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। হয়তো ইঁহাদের কাছে মনে হইয়াছিল, অথবা লোকস্মৃতিতে বা লোকমুখে ইঁহারা শুনিয়াছিলেন যে করতোয়া সাগরগামিনী নদী। Caor যে করতোয়া তাহার একটু পরোক্ষ প্রমাণ ডি ব্যারোস নিজেই দিতেছেন। তাঁহার নক্শায় দেখিতেছি করতোয়া Rei o de Comotah বা কামতা রাজ্যের ভিতর দিয়া প্রবাহিত। কামতা বর্তমান রংপুর-কোচবিহার। করতোয়া-আত্রাইর সম্মিলিত প্রবাহ এক সময় হয়তো ব্রহ্মপুত্রে গিয়া মিশিত। এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক প্রমাণ কিছু নাই; তবে হাণ্টার সাহেব শুনিয়াছিলেন, করতোয়াবাসীরা করতোয়াকে ব্রহ্মপুত্র বলিয়াই জানিত। ফান্ ডেন ব্রোকের নক্শায় করতোয়া ব্রহ্মপুত্রে গিয়া পড়িতেছে বলিয়া যেন মনে হয়। যাহাই হউক, বুঝা যাইতেছে সপ্তদশ শতকে করতোয়া (এবং আত্রাইও) উল্লেখযোগ্য নদী। অষ্টাদশ শতকে রেনেলের নকশায়ও আত্রাই এবং করতোয়ার সেই মোটামুটি সমৃদ্ধ রূপ দৃষ্টিগোচর হইতেছে, এবং করতোয়া তদানীন্তন রংপুর-দিনাজপুরের ভিতর দিয়া সোজা দক্ষিণবাহী হইয়া, পুটিয়ার (Pootyah) কিঞ্চিৎ উত্তর হইতে পদ্মার সঙ্গে প্রায় সমান্তরালে, পূর্ব দক্ষিণবাহিনী হইয়া পদ্মা-ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গমস্থানের নিকটে, পদ্মায় গিয়া পড়িতেছে। কিন্তু ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দের হিমালয় সানুর বিরাট বন্যায় আত্রাই-করতোয়ার সমৃদ্ধি বিনষ্ট হইয়া গেল। উত্তর প্রবাহে যে-তিস্তা এই নদী দুইটির সমৃদ্ধির মূলে সেই তিস্তা এই বিরাট বন্যার বিপুল জলরাশি বহন করিতে না পারিয়া পূর্ব-দক্ষিণ দিকে একটি প্রায় অবলুপ্ত প্রাচীন সংকীর্ণ নদীর খাত ভাঙিয়া সবেগে ফুলছড়িঘাটে ব্রহ্মপুত্রে গিয়া বিপুল জলরাশি ঢালিয়া দিল। সেই সময় হইতে তিস্তা ব্রহ্মপুত্রমুখী; সে আর পুনর্ভবা-আত্রাই-করতোয়ায় হিমালয় নদীমালার জল প্রেরণ করে না। এবং, আজ যে এই নদী তিনটি, বিশেষভাবে করতোয়া, ক্ষীণা হইতে ক্ষীণতরা হইতেছে তাহার কারণও তাহাই। তবু, ঊনবিংশ শতকের গোড়ায়ও করতোয়ার কিছু খ্যাতি-সমৃদ্ধি ছিল বলিয়া মনে হয়; ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক য়ুরোপীয় লেখক বলিতেছেন, করতোয়া "was a very considerable river, of the greatest celebrity in Hindu fable"।

উত্তর-বঙ্গের আর একটি প্রসিদ্ধ ও সুপ্রাচীন নদী কৌশিকী (বা বর্তমান কোশী)। এই কোশী উত্তর-বিহারের পূর্ণিয়া জেলার ভিতর দিয়া সোজা দক্ষিণবাহী হইয়া গঙ্গায় প্রবাহিত হয়। অথচ, এই নদী এক সময় ছিল পূর্ববাহী এবং ব্রহ্মপুত্রগামী। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া সমস্ত উত্তর-বঙ্গ জুড়িয়া ধীরে ধীরে খাত পরিবর্তন করিতে করিতে কোশী আজ পূর্ব হইতে একেবারে পশ্চিমে সরিয়া গিয়াছে। কোশী প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলার নদী বিন্যাসের ইতিহাসে এক বিরাট বিস্ময়। কোশী (এবং মহানন্দার) এইরূপ বিস্ময়কর খাত পরিবর্তনের ফলেই গৌড়-লক্ষণাবতী-পাণ্ডুয়া অঞ্চল নিম্ন জলা-

ভূমিতে পরিণত হইয়া অস্বাস্থ্যকর এবং অনাবাসযোগ্য হইয়া উঠে, বন্যার প্রকোপে বিধ্বস্ত হয়, এবং অবশেষে পরিত্যক্ত হয়। কোচবিহার হইতে হুগলীর পথে রাল্ফ ফিচ্ (১৫৮৩-৯১) গৌড়ের ভিতর দিয়া আসিয়াছিলেন; এই পথে "we found but few villages but almost all wilderness, and saw many buffes, swine and deere, grasse longer than a man, and very many tigers." সমস্ত উত্তর-বঙ্গ জুড়িয়া অসংখ্য মরা নদীর খাত, নিম্ন জলাভূমি এখনও দৃষ্টিগোচর হয়; স্থানীয় লোকেরা ইহাদের বলে বুড়ী কোশী বা মরা কোশী। মালদহের উত্তরে ও পূর্বে যেসব ঝিল ইত্যাদি এখনও দেখা যায় সেগুলি এই কোশী ও মহানন্দার খাত হওয়া অসম্ভব নয়।

দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের আগে প্রাচীন বাঙলার নদনদীগুলির যে পরিচয় পাওয়া গেল তাহার মধ্যে দেখিতেছি গঙ্গা-ভাগীরথী, পদ্মা-পদ্মাবতী, করতোয়া এবং লৌহিত্য-ব্রহ্মপুত্রই প্রধান। গঙ্গা-ভাগীরথীর ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত অজয়, দামোদর, সরস্বতী ও যমুনা প্রসিদ্ধা নদী। পশ্চিম হইতে সমুদ্রবাহিনী কপিশা বা কাসাইও প্রাচীনা নদী। পদ্মা প্রবাহও যে কম প্রাচীন নয় তাহাও দেখা গিয়াছে, এবং তাহারই শাখা কুমারনদীর নিঃসংশয় উল্লেখ টলেমির বিবরণীতেই পাওয়া যাইতেছে। করতোয়াও সুপ্রাচীন প্রবাহ; কোশী-মহানন্দা-আত্রাই-পুনর্ভবার খুব প্রাচীন উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে না, কিন্তু ইহারাও সুপ্রাচীন বলিয়াই মনে হয়—অন্তত, কোশী-মহানন্দার প্রাচীন প্রবাহপথের ইঙ্গিত মিলিতেছে। ত্রিস্রোতা নামটিও প্রাচীন ঐতিহ্য-স্মৃতিবহ। লৌহিত্যের উল্লেখও খুব প্রাচীন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া এইসব নদনদীর প্রবাহপথের কতকটা ইতিহাস এইখানে ধরিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। বাঙলাদেশ ও বাঙালীর ইতিহাস আলোচনা কালে এই কথা সর্বদা মনে রাখা প্রয়োজন যে, মধ্যযুগে এইসব নদনদীর প্রবাহপথ বারবার যেমন পরিবর্তিত হইয়াছে, প্রাচীন কালেও সেইরূপই হইয়াছে, বিশেষত, পদ্মা ও গঙ্গার নিম্ন-প্রবাহে, নিম্ন-বঙ্গের সমস্ত তট জুড়িয়া, এমনকি উত্তর ও পূর্ববঙ্গেও। বর্তমানেও এই ভাঙা-গড়া চলিতেছে।

৪

যাতায়াত ও বাণিজ্যপথ *

সাধারণভাবে এবং সংক্ষিপ্ত উপায়ে দেশ-পরিচয় লিখিতে বসিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে বা নগর হইতে নগরান্তরে যাতায়াতের পথের উল্লেখ করিয়া লাভ নাই। যে-সব গ্রামের উল্লেখ প্রাচীন বাঙলার লিপিগুলিতে পাওয়া যায় সেগুলি একটু বিশ্লেষণ করিলে প্রায়ই দেখা যায়, গ্রামের প্রান্তসীমায় রাজপথের উল্লেখ; অনেক সময় এই পথগুলিই এক বা

* এই প্রসঙ্গে ধনসম্বল অধ্যায়ে নৌ-শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য বিবরণ দ্রষ্টব্য।

একাধিক দিকে গ্রামসীমা অথবা কোনও ভূমিসীমা নির্দেশ করে, এবং সেই হিসাবেই পথগুলির উল্লেখ। অনুমান করিতে বাধা নাই, এই পথগুলিই গ্রাম হইতে গ্রামে ও নগরে বিস্তৃত ছিল। এই রকম দু-একটি পথের উল্লেখ পরবর্তী গ্রাম ও নগর অধ্যায়ে করা হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, দামোদরদেবের চট্টগ্রাম লিপিতে কামনপিণ্ডিয়া গ্রামের ডাম্বারডাম পল্লীর একখণ্ড ভূমির পূর্বদিকে এক রাজপথের উল্লেখ আছে। কিছুদিন আগে ধনোরার অদূরে দুইটি বাঁধান রাজপথের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। জঙ্গল কাটিয়া অথবা মাটি ভরাট করিয়া নূতন নূতন গ্রাম ও নগর পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই ধরনের যাতায়াত পথ ক্রমশ বিস্তৃত হইয়াছে, এই অনুমান করা চলে। এইসব সাধারণ স্থলপথ ছাড়া নদীমাতৃক দেশের অসংখ্য নদনদী, খাটা-খাটিকা, খাল-বিল, যানিকা-স্রোতিকা ইত্যাদি বাহিয়া জলপথ তো ছিলই। উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে যত লিপি আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার প্রায় প্রত্যেকটিতেই এইসব জলস্রোতের উল্লেখ সুপ্রচুর। ইহাদের প্রেক্ষাপটে যখন সঙ্গে সঙ্গে লিপিগুলিতে দেখা যায়, এবং সমসাময়িক ও প্রাচীনতর সাহিত্যে পড়া যায় নৌসাধনোদ্যত, সমুদ্রাশ্রয়ী বাঙালীর কথা, তাহাদের অসংখ্য নৌবাট, নৌবিতান, নৌদণ্ডক, নাবাতক্ষেণী, প্রভৃতির কথা, গূঢ় অধ্যাত্ম-সংগীতে (যেমন, চর্যাপদে) নদনদী, নৌকা, নৌকার নানা উপাদান (যথা, দাঁড়, হাল, মাস্তুল, পাল, লগি, নোঙরের কাছি) ইত্যাদির উপমা, তখন সহজেই মনের মধ্যে এই ধারণা জন্মায় যে, জলপথে নৌকাযোগে যাতায়াতই ছিল স্থলপথে যাতায়াত অপেক্ষা প্রশস্ততর। লিপিগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, এই নৌকা যাতায়াত পূর্ব-বঙ্গে, পুণ্ড্রবর্ধনে এবং সমতটে, অর্থাৎ নদনদীবহুল নিম্নশায়ী দেশগুলিতেই বেশি ছিল।

এইসব সাধারণ যাতায়াত পথ ছাড়া দেশের প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্যন্ত এবং দেশেরও সীমা অতিক্রম করিয়া দেশান্তরে যে-সব স্থল ও জলপথ বিস্তৃত ছিল, যে সব পথ বাহিয়া শতাব্দীর পর শতাব্দী অসংখ্য নরনারী তীর্থযাত্রা, দেশভ্রমণ ও বিচিত্রকর্ম উপলক্ষে—সর্বোপরি শ্রেষ্ঠী, বণিক ও সার্থবাহের দল ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে—দেশের বিভিন্ন গ্রামে, নগরে, তীর্থে এবং বাণিজ্যকেন্দ্রে, দেশান্তরের নগরে-বন্দরে যাতায়াত করিত, দেশ-পরিচয় প্রসঙ্গে সেইসব সুদীর্ঘ সুপ্রশস্ত বহুজনপদলাঞ্ছিত পথগুলির বিবরণই উল্লেখযোগ্য। এই-সব পথ দেশের শুধু যাতায়াত পথ নয়, বাণিজ্যপথও বটে এবং এইসব পথ বাহিয়াই বাঙলাদেশে লক্ষ্মীর আনাগোনা। এইসব বহু পথই বর্তমান রেলপথগুলির পূর্ব পর্যন্ত শুধু লক্ষ্মীর নয়, সরস্বতীরও আনাগোনার পথ ছিল; রেলপথগুলি সাধারণত সেইসব সুপ্রাচীন পথ বাহিয়াই প্রতিষ্ঠিত। জীবনধারণের প্রয়োজনে, জীবনবিকাশের প্রেরণায় মানুষ সুপ্রাচীন দুর্গম বনজঙ্গল কাটিয়া, পাহাড় ভাঙিয়া, নদী ডিঙাইয়া, যে সব পথের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে সে-সব পথ একদিনে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় না। মানুষের ব্যবহারের মধ্যে, তাহার স্মৃতি ও সংস্কারের মধ্যে, নূতন পথের মধ্যে সেইসব প্রাচীন পথ বাঁচিয়া

থাকে। পৃথিবীতে সর্বত্রই তাহা ঘটিয়াছে, বাঙলাদেশেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। নদ-নদী-প্রবাহ সুপ্রাচীন কালে জলপথ নির্ণয় করিত, এখনও করে; নদীর খাত যখন বদলায় সঙ্গে সঙ্গে পথও বদলায়; খাত মরিয়া গেলে নূতন খাতে জলপ্রবাহ ছুটিয়া চলে, জলপথও তাহার অনুসরণ করে। সমুদ্রস্রোত ও বিভিন্ন ঋতুর বায়ুপ্রবাহ প্রাচীনকালে সমুদ্রপথ নির্ণয় করিত; বাষ্প-জাহাজ-পর্বের পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীতে ইহাই ছিল নিয়ম। বাঙলাদেশেও তাহার ব্যত্যয় ঘটে নাই।

দুঃখের বিষয়, প্রাচীন বাঙলার অন্তর্বাণিজ্যের স্থলপথের বিবরণ স্বল্প। লিপি-গুলিতে, বিদেশী পর্যটকদের বিবরণীতে এবং কিছু সমসাময়িক সাহিত্যে কয়েকটি মাত্র প্রাত্যহিকপ্রাপ্ত সুদীর্ঘ পথের ইঙ্গিত ধরিতে পারা যায়। বিদেশী পর্যটক ও ঐতিহাসিকেরা বৈদেশিক বাণিজ্য সম্বন্ধেই কৌতূহলী ছিলেন এবং সেইসব বাণিজ্যপথের বিবরণই তাঁহারা যাহা কিছু রাখিয়া গিয়াছেন। তবু, ফাহিয়ান্ বা য়ুয়ান-চোয়াঙের মতো পর্যটক যাঁহারা বাঙলার এক জনপদ হইতে অন্য জনপদ কিছু কিছু ঘোরাঘুরি করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাঁহারা প্রসঙ্গত অন্তর্দেশের পথের ইঙ্গিতও কিছু রাখিয়া গিয়াছেন। ইৎসিঙের বিবরণে, সোমদেবের কথাসরিৎসাগরের মতো গ্রন্থে, ২।৪টি জাতকের গল্পে, লিপিমালায় ২।১টি আকস্মিক উল্লেখও এই জাতীয় পথের কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এইসব পথ শুধু অন্তর্বঙ্গপথ নয়; বরং এইসব পথ বাহিয়াই বাঙলাদেশ প্রাচীনকালে সুবিস্তৃত ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশের সঙ্গে সকল প্রকার যোগরক্ষা করিত।

আন্তর্দেশিক স্থলপথ

সোমদেবের কথাসরিৎসাগরে পুণ্ড্রবর্ধন হইতে পাটলিপুত্র পর্যন্ত একটি সুবিস্তৃত পথের উল্লেখ আছে। ইৎসিঙ্ (সপ্তম শতকের তৃতীয় পাদের শেষাশেষি) তাম্রলিপ্তি হইতে বুদ্ধগয়া পর্যন্ত পশ্চিমাভিমুখী একটি পথের ইঙ্গিত দিতেছেন। হাজারিবাগ জেলায় দুধপানিপাহাড়ের আনুমানিক অষ্টম শতকের একটি শিলালিপিতে অযোধ্যা হইতে তাম্রলিপ্তি পর্যন্ত একটি সুদীর্ঘ পথের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। য়ুয়ান-চোয়াঙ্ (সপ্তম শতকের দ্বিতীয় পাদ) বারাণসী, বৈশালী, পাটলিপুত্র, বুদ্ধগয়া, রাজগৃহ, নালন্দা, অঙ্গ-চম্পা প্রভৃতি পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছিলেন কজঙ্গলে। আমি এই গ্রন্থেই অন্যত্র দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, কজঙ্গল দেশ অংশত বর্তমান উত্তর-রাঢ়, বাঁকুড়া-বীরভূমের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তবর্তী অনুর্বর জাঙ্গলময় প্রদেশ। কজঙ্গল হইতে তিনি গিয়াছেন পুণ্ড্রবর্ধনে (উত্তরবঙ্গ =বগুড়া-রাজসাহী-রংপুর-দিনাজপুর), পুণ্ড্রবর্ধন হইতে পথে এক প্রশস্ত নদী পার হইয়া কামরূপ; কামরূপ হইতে সমতট (ত্রিপুরা, ঢাকা, ফরিদপুর, খুলনা, বরিশাল, ২৪ পরগনার নিম্নভূমি); সমতট হইতে তাম্রলিপ্তি (দক্ষিণ পূর্ব মেদিনীপুর); তাম্রলিপ্তি হইতে কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদ জেলার কানসোনা); এবং কর্ণসুবর্ণ হইতে ওড্র, কঙ্গোদ,

কলিঙ্গ। য়ুয়ান্‌-চোয়াঙের বিবরণীতে তাহা হইলে মোটামুটি আন্তর্দেশিক পথগুলির একটু ইঙ্গিত পাইতেছি। কজঙ্গল বা উত্তর-রাঢ় অঞ্চল হইতে একটি পথ ছিল পুণ্ড্রবর্ধন পর্যন্ত বিস্তৃত। চম্পা (বর্তমান ভাগলপুর জেলা) হইতে তিনি আসিয়াছিলেন কজঙ্গলে। ভাগলপুর হইতে বর্তমানে যে রেলপথ রাজমহলপাহাড়ের ভিতর দিয়া নানা শাখা-প্রশাখায় দক্ষিণমুখী হইয়া চলিয়া গিয়াছে সিউড়ি-রানীগঞ্জ-বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর-পুরুলিয়ার দিকে এই পথই ছিল য়ুয়ান্‌-চোয়াঙের পথ। কজঙ্গল হইতে উত্তরমুখী হইয়া এই পথ ধরিয়াই য়ুয়ান্‌-চোয়াঙ রাজমহল বা রাজমহলের কিছুটা দক্ষিণে গঙ্গা অতিক্রম করিয়া পরে পূর্বমুখী হইয়া পুণ্ড্রবর্ধনে গিয়াছিলেন। এখন ই-আই-আর পথের বর্ধমান-রানীগঞ্জ-সিউড়ি হইতে রওয়ানা হইয়া লালগোলাঘাটে গঙ্গা পার হইয়া বি-এ-আর পথে উত্তরবঙ্গে যাওয়া যায়, এবং সেখান হইতে সোজা রেলপথ ধরিয়া কামরূপ। এই রেলপথও প্রাচীন রাজপথই অনুসরণ করিয়াছে। কিন্তু কামরূপ হইতে সমতটের পথ এখন বর্তমান কালে আর খুব পরিষ্কার ধরিতে পারা যায় না; ধলেশ্বরী-যমুনা-পদ্মা এই পথকে এমনভাবে ভাঙিয়া বাঁকাইয়া দিয়াছে যে, তাহার রেখা কল্পনায় আনা হয়তো যায়, কিন্তু সুস্পষ্ট ধরিতে পারা কঠিন। য়ুয়ান্‌-চোয়াঙ বোধহয় স্থলপথে পদব্রজেই আসিয়াছিলেন, বিবরণী পাঠে এই কথাই মনে হয়। বর্তমান ভূমি-নকশা অনুযায়ী অন্তত দুইবার তাঁহার দুইটি সুপ্রশস্ত নদী, যমুনা ও পদ্মা, অতিক্রম করা উচিত, কিন্তু তাহার উল্লেখ বিবরণীতে কিছু নাই। মনে হয়, যমুনা বা পদ্মার আজিকার কিংবা মধ্যযুগের মতো প্রশস্ত অস্তিত্ব তখন ছিল না। অথচ, এখন এই দুইটি নদীই বি-এ-আর পথের গতি নির্ণয় করিতেছে। গৌহাটিতে ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া এক পথ বগুড়া-সান্তাহার-ঈশ্বরদী (পদ্মা) ছুঁইয়া কলিকাতা পর্যন্ত বিস্তৃত; আর-এক পথ জগন্নাথগঞ্জ (যমুনা) সিরাজগঞ্জ-ঈশ্বরদী (পদ্মা) হইয়া কলিকাতা। দুটি পথই বাঁকিয়া চুরিয়া নদনদী এড়াইয়া অতিক্রম করিয়া বিস্তৃত। যাহাই হউক, সমতট হইতে ভাগীরথী পার হইয়া তমলুকের পথে তো এখনও বি-এন-আর পথ সোজা চলিয়া গিয়াছে, এবং ভাগীরথীতীর হইতে উত্তরাভিমুখী মুর্শিদাবাদ (কর্ণসুবর্ণ) ছাড়াইয়া ই-আই-আর পথের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা এখনও বিস্তৃত। মুর্শিদাবাদ হইতে ওড্র বা উড়িশা পর্যন্তও ই-আই-আর ও বি-এন-আর পথে প্রাচীন রাজপথের ইশারা সহজেই পাওয়া যায়। প্রাচীন বাঙলার বিভিন্ন জনপদ যে সব সুদীর্ঘ পথগুলির দ্বারা পরস্পরযুক্ত ছিল সেইসব পথের ইঙ্গিত য়ুয়ান্‌-চোয়াঙের বিবরণ হইতে পাওয়া গেল। এইসব পথ তিনি নিজে আবিষ্কার করেন নাই। তাঁহার বহু আগে হইতেই বহু যানের চক্রপেষণে, বহু পশু ও বহু মানুষের পদতাড়নায় এইসব পথ প্রশস্ত হইয়াছিল; তাঁহার পরেও বহুকাল পর্যন্ত এইসব পথ ক্রমাগত ব্যবহৃত হইয়া আজিকার রেলপথে বিবর্তিত হইয়াছে। কোথাও রেলপথ প্রাচীন পথকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছে, কোথাও প্রাচীন পথ রেলপথগুলির পাশাপাশি

চলিয়াছে। বস্তুত, ভারতবর্ষের কোনো রেলপথই নূতন সৃষ্ট নবাবিকৃত পথ নয়, প্রত্যেকটিই প্রাচীন পথের নিশানা ধরিয়া চলিয়াছে।

বহির্দেশীয় স্থলপথ

অন্তর্দেশের পথ ছাড়িয়া দেশ হইতে দেশান্তরের পথগুলির ইঙ্গিত এইবার ধরিতে চেষ্টা করা যাইতে পারে। উল্লিখিত বিবরণ হইতে বুঝা যাইবে, বাঙলাদেশ হইতে তিনটি প্রধান পথ পশ্চিম দিকে বিস্তৃত ছিল। একটি পুণ্ড্রবর্ধন বা উত্তর-বঙ্গ হইতে মিথিলা বা উত্তর-বিহার ভেদ করিয়া (বর্তমান বি-এন-ডব্লিউ-আর এই পথ অনুসরণ করিয়াছে) চম্পা (ভাগলপুর) হইয়া পাটলিপুত্রের ভিতর দিয়া বুদ্ধগয়া স্পর্শ করিয়া (অথবা, পাটনা-আরা হইয়া) বারাণসী-অযোধ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল ; সেখান হইতে একেবারে সিন্ধু-সৌরাষ্ট্র-গুজরাতের বন্দর পর্যন্ত। বিদ্যাপতির পুরুষপরীক্ষায় গৌড় হইতে গুজরাত পর্যন্ত বাণিজ্য-পথের ইঙ্গিত আছে। য়ুয়ান্-চোয়াঙের বিবরণী ও কথাসরিৎসাগরের গল্প হইতে এই পথের আভাস পাওয়া যায়। দ্বিতীয় পথটিরও ইঙ্গিত পাওয়া যায় য়ুয়ান্-চোয়াঙের বিবরণীতেই। এই পথটি তাম্রলিপ্ত হইতে উত্তরাভিমুখী হইয়া কর্ণসুবর্ণের ভিতর দিয়া রাজমহল-চম্পা স্পর্শ করিয়া পাটলিপুত্রের দিকে চলিয়া গিয়াছে। তৃতীয় পথটির আভাস পাওয়া যাইতেছে ইৎসিঙের বিবরণ এবং পূর্বোল্লিখিত হাজারীবাগ জেলার দুধপানিপাহাড়ের আনুমানিক অষ্টম শতকীয় লিপিটিতে। এই পথ তাম্রলিপ্ত হইতে সোজা উত্তর-পশ্চিমাভিমুখী হইয়া বুদ্ধগয়ার ভিতর দিয়া অযোধ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই তিনটি পথ আশ্রয় করিয়াই প্রাচীন বাঙলাদেশ উত্তর-ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ রক্ষা করিত। বাঙলা ও উত্তর-ভারতের যে-কোনও বর্তমান রেলপথের নক্শা খুলিলেই দেখা যাইবে এই রেলপথগুলি সেইসব প্রাচীন পথই অনুসরণ করিয়াছে।

উত্তর-পূর্বমুখী পথ

বাঙলার পূর্বদিকে কামরূপ রাজ্য, উত্তরে চীন ও তিব্বত। উত্তর-বঙ্গ ও কামরূপের ভিতর দিয়া বাঙলাদেশ এই উত্তরশায়ী দেশদুটির সঙ্গে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ রক্ষা করিত। এই পথের বিবরণ পাওয়া যায় য়ুয়ান্-চোয়াঙ এবং কিয়া-তানের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে, চীন-রাজদূত চাঙ্-কিয়েনের প্রতিবেদনে, এবং বোধহয় মুহম্মদ ইব্‌ন্ বখ্‌তিয়ারের আসাম-তিব্বত অভিযান সংক্রান্ত সুবিখ্যাত শিলালিপিটিতে। তবকাত্-ই নাসিরী গ্রন্থেও বোধহয় কামরূপের ভিতর দিয়া তিব্বত পর্যন্ত বিস্তৃত এই পথের উল্লেখ আছে। এই সাক্ষ্যগুলি বিশ্লেষণ করিলে পথটির আভাস স্পষ্ট হইতে পারে। পুণ্ড্রবর্ধন হইতে কামরূপ এবং কামরূপ হইতে সমতট পর্যন্ত দুইটি সুদীর্ঘ পথ

যে ছিল, য়ুয়ান্-চোয়াঙের বিবরণী এ-সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহই রাখে না ; ইতিপূর্বেই তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখানো হইয়াছে। এই দুই পথ দিয়া প্রাচীন কামরূপ এবং সুবর্ণ-কুড্যকের সমৃদ্ধ ও সুচারু বস্ত্রশিল্প, অগুরু, চন্দন, হাতি প্রভৃতি বাঙলাদেশে আমদানি হইত, এবং বাঙলার সামুদ্রিক বন্দর ও আন্তর্দেশিক বাণিজ্য-কেন্দ্রগুলি হইতে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ও ভারতবর্ষের বাহিরে রপ্তানি হইত। কিন্তু কামরূপই পূর্বাভিমুখী এই পথের শেষ সীমা নয়। য়ুয়ান্-চোয়াঙের অন্তত সাত শত বৎসর আগে চাঙ্-কিয়েন

উত্তর ব্রহ্ম-মণিপুর-কামরূপ আফগানিস্থান পথ

(Chang Kien) নামে এক চৈনিক রাজদূতের প্রতিবেদনে দক্ষিণ-চীন হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর-ব্রহ্ম ও মণিপুরের ভিতর দিয়া কামরূপ হইয়া আফগানিস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত এক সুদীর্ঘ প্রান্তাতিপ্রান্ত পথের ইঙ্গিত ধরিতে পারা যায়। চাঙ্-কিয়েন (খ্রী পূ ১২৬) ব্যাকট্রিয়ার বাজারে দক্ষিণ-চীনের য়ুন্নান এবং সুজেচোয়ান প্রদেশজাত রেশমী বস্ত্র এবং সূক্ষ্ম বাঁশ দেখিতে পাইয়া খোঁজ লইয়া জানিয়াছিলেন, এই-সমস্ত দ্রব্য আসিত চীন হইতে আফগানিস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত উত্তর-ভারতবর্ষ জুড়িয়া লম্বমান সুদীর্ঘ পথ বাহিয়া, সার্থবাহ-দলের পশু ও শকটবাহিনী ভর্তি হইয়া। সুজেচোয়ান হইতে কামরূপ পর্যন্ত এই পথের খবর য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ সপ্তম শতকেও শুনিয়াছিলেন কামরূপবাসীদের নিকট হইতে ; কঠিন পার্বত্য পথ দুই মাসে অতিক্রম করিতে হইত, এ-খবরও য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ পাইয়াছিলেন। নবম শতাব্দীর গোড়ায় কিয়া-তান্ (৭৮৫-৮০৫ খ্রী) নামে আর একজন চীনা পরিব্রাজক টঙ্কিন শহর হইতে কামরূপ পর্যন্ত আর-একটি পথের খবর বলিতেছেন। কামরূপে আসিয়া এই পথটি চাঙ-কিয়েন বর্ণিত পথের সঙ্গে মিলিত হইয়া কজঙ্গল এবং সেখান হইতে মগধ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কজঙ্গল হইতে পুণ্ড্রবর্ধন হইয়া কামরূপের যে পথের কথা কিয়া-তান বলিতেছেন সেই পথই সপ্তম শতকে য়ুয়ান্-চোয়াঙের পথ ছিল।

চাঙ-কিয়েন্ বর্ণিত পথটির এবং অন্য আর-একটি পথের আরও ইঙ্গিত অন্য দুইটি সাক্ষ্য হইতে পাওয়া যায় বলিয়া মনে হয়। তবকাত্-ই-নাসিরী গ্রন্থে বর্ণিত আছে, মুহম্মদ ইব্‌ন্ বখতিয়ার নুদিয়া জয় ও ধ্বংস করিয়া, গৌড় বা লক্ষ্মণাবতীতে নিজ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়া তিব্বত জয়ে অগ্রসর হইয়াছিলেন। পথে তাঁহাকে একটি সুপ্রশস্ত খর-স্রোতা নদী (খরতোয়া=করতোয়া ?) পার হইতে হয় ; সেই নদীর কূল ধরিয়া দশ দিনের পথচলার পর তিনি ২০টি পাষাণনির্মিত খিলানযুক্ত একটি সেতু পার হন। সেই সেতু পার হইয়া আরও ১৬ দিনের পথের পর একটি প্রাকারবেষ্টিত দুর্গরক্ষিত নগর দেখিতে পান, এবং সংবাদ পান যে, সেখান হইতে ২৫ ক্রোশ দূরে করবত্তন, করপত্তন বা করমবত্তন নামে একটি জায়গায় ৫০,০০০ হাজার তুরুষ্ক (?) সৈন্য আছে ; সেখানে বহু ব্রাহ্মণের বাস, এবং সেখানকার বাজারে প্রতিদিন সকালবেলা ১,৫০০ টাঙ্গন (টাট্টু)

ঘোড়া বিক্রয় হয়। লক্ষ্মণাবতীতে যে-সব ঘোড়া দেখিতে পাওয়া যায় সে সমস্তই সেই বাজারে কেনা। ঐ দেশের পথ-ঘাট পার্বত্যদেশ ভেদ করিয়া বিলম্বিত। তিব্বত হইতে কামরূপ পর্যন্ত এই পার্বত্য পথে ৩৫টি গিরিবর্ত্ম আছে এবং সেইসব গিরিবর্ত্মের ভিতর দিয়াই লক্ষ্মণাবতী পর্যন্ত ঘোড়াগুলিকে আনা হয়। এই বিবরণ কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য বলা কঠিন। প্রাকারবেষ্টিত দুর্গরক্ষিত নগরটি কোন্ নগর তাহা নির্ণীত হয় নাই। করবত্তন, করপত্তন বা করমবত্তন কোন্ স্থান নির্দেশ করে, তাহাও বলা যায় না। কেহ কেহ বলেন, করমবত্তনের ঘোড়ার হাট দিনাজপুর জেলার নেকদমার হাট ; সেই হাটে নাকি এখনও বহু ঘোড়া বিক্রয় হয়, এবং সে-সব ঘোড়া তিব্বত-ভোটানের টাট্টু ঘোড়া। কিন্তু করমবত্তন হাট দিনাজপুর জেলায় হওয়া একটু কঠিন। গৌড় হইতে দিনাজপুর জেলার যে-কোনও স্থান ২৬ দিনের পথ হইতে পারে না, দশ সহস্র সৈন্য লইয়া হাঁটিলেও নয়। তাহা ছাড়া, অন্য যুক্তিও আছে ; তাহা এখনই বলিতেছি। যাহাই হউক, বখ্তিয়ার তিব্বত পর্যন্ত অগ্রসর হইতে পারেন নাই ; মধ্যপথেই পর্যুদস্ত হইয়া নানাভাবে লাঞ্ছিত হইয়া তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। মিন্হাজ্ তাহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। মিন্হাজের বিবরণ সব বিশ্বাসযোগ্য না হইলেও বখ্তিয়ার যে কামরূপের ভিতর দিয়া ব্যর্থ একটা উত্তরাভিযান চালাইয়াছিলেন তাহা বর্তমান গৌহাটির নিকটে ব্রহ্মপুত্রের তীরে কানাই-বরশীবোয়া নামক স্থানে পাষাণগাত্রে খোদিত একটি শিলালিপিতেই সুপ্রমাণ। এই লিপিটির পাঠ এইরূপ :

'শাকে ১১২৭ [= ১২০৬, ২৭শে মার্চ, আনুমানিক]
শাকে তুরগ যুগ্মেশে মধুমাস ত্রয়োদশে।
কামরূপং সমাগত্য তুরস্কাঃ ক্ষয়মাযযুঃ।

লিপিটির নিকটেই পাথরের খিলানযুক্ত একটি সেতু আছে। এই সেতুই কি মিন্হাজ-কথিত ৩২-খিলান-যুক্ত পাষাণ-সেতু ? এই সেতু পার হইয়া আরও ১৬ দিনের পথ হাঁটিয়া বখ্তিয়ার যেখানে পৌঁছিয়াছিলেন সেখান হইতেও আরও ২৫ ক্রোশ দূরে করমবত্তনের হাট। কাজেই করমবত্তন দিনাজপুর জেলায় হইতেই পারে না। বরং মনে হয়, শিলালিপি ও মিন্হাজ-কথিত সেতু, প্রাকারবেষ্টিত দুর্গরক্ষিত নগর এবং করমবত্তনের হাট সমস্তই কামরূপসীমা হইতে তিব্বতের সুদুর্গম পার্বত্য পথে অবস্থিত ছিল। এই পথে অসংখ্য গিরিবর্ত্ম ছিল, এ খবর মিথ্যা না-ও হইতে পারে। যাহাই হউক, কামরূপ হইতে তিব্বত পর্যন্ত একটি দুর্গম গিরিপথ ছিল এ-বিষয়ে সন্দেহের অবসর কম। কামরূপে আসিয়া এই পথ চাঙ-কিয়েন-কথিত চীন-ভারত-আফগানিস্থান প্রান্তাতিপ্রান্ত সুদীর্ঘ পথের সঙ্গে মিলিত হইত। হইতে পারে, এই পথ দিয়াও বৌদ্ধ পণ্ডিত ও পরিব্রাজকেরা এবং তিব্বতী দূতেরা মগধ ও বঙ্গদেশ হইতে তিব্বতে যাতায়াত করিতেন। গৌহাটি শহরের নিকট ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া সোজা পাঁচিশ মাইল উত্তরে একটি জায়গায়

এখনও বৈশাখী পূর্ণিমায় এক বিরাট মেলা বসে ; সেই মেলায় বহু তিব্বতী ব্যবসায়ী কম্বল ভেড়া, ঘোড়া ইত্যাদি বিক্রয়ের জন্য লইয়া আসে।

কিন্তু তিব্বতের সঙ্গে যোগাযোগের আর-একটি পার্বত্য পথ বোধহয় ছিল। এই পথ উত্তর বঙ্গের জলপাইগুড়ি-দারজিলিং অঞ্চল হইতে সিকিম, ভোটান পার হইয়া হিমালয় গিরিবর্ত্মের ভিতর দিয়া তিব্বতের ভিতর দিয়া চীনদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পেরিপ্লাস-গ্রন্থে (প্রথম শতক) বোধহয় এই পথের একটু ইঙ্গিত আছে। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে চীনদেশ হইতে যে রেশম ও রেশমজাত দ্রব্যাদি বঙ্গদেশে আসিত তাহা পূর্বোক্ত কামরূপের পথ বা এই সদ্যোক্ত পথ বাহিয়া আসিত বলিয়াই তো মনে হয়। এখনও কালিমপং বা গ্যাংটকের বাজারে যে-সব পার্বত্য টাট্টু ঘোড়া, কম্বল, কাঁচা হলুদ, কাঁচা সোনার অলংকার, নানা বর্ণের পাথর ইত্যাদি বিক্রয় হয় তাহা প্রায় সমস্তই আসে তিব্বত ও ভোটান হইতে, ঐ দেশীয় লোকেরাই তাহা লইয়া আসে।

কামরূপ হইতে তিব্বতের পথ বা জলপাইগুড়ি-দারজিলিং হইতে তিব্বতের পথ ইহার কোনওটাই এখন আর বহুলব্যবহৃত নয়। পার্বত্য প্রদেশের লোকেরাই শুধু এই পথ ব্যবহার করিয়া থাকে বঙ্গ ও আসামের সমভূমিতে আসিবার প্রয়োজনে, কম্বল, ঘোড়া, সোনা, পাথর ইত্যাদির বিনিময়ে লবণ, বিলাসদ্রব্য ইত্যাদি কিনিবার জন্য। কামরূপ হইতে উত্তর-পূর্ব আসাম ও মণিপুরের ভিতর দিয়া, উত্তর ব্রহ্মের ভিতর দিয়া, যে-পথ দক্ষিণ-পূর্ব চীনে চলিয়া গিয়াছে, যে-পথের কথা চাঙ-কিয়েন্ বলিয়াছেন সেই পথে লোক-যাতায়াত বরাবরই কিছু কিছু ছিল ; মধ্যযুগেও ছিল, এবং বর্তমান যুগেও আছে। আসামে ও বাঙলায় গোপনে আফিম আমদানী তো এই পথেই হইয়া থাকে। কিন্তু গত ভারত-ব্রহ্ম-চীন-জাপান যুদ্ধের তাগাদায় এই পথ পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে।

ত্রিপুরা-মণিপুর পথ

বঙ্গদেশ হইতে পূর্বাভিমুখী আর-একটি স্থলপথের উল্লেখ করিতেই হয়। এ পথটি পূর্ব-বাঙলার ত্রিপুরা জেলার লালমাই-ময়নামতী (প্রাচীন পট্টিকেরা রাজ্য) অঞ্চল হইতে আরম্ভ করিয়া সুরমা ও কাছাড় উপত্যকার (বর্তমান, শ্রীহট্ট-শিলচর) ভিতর দিয়া, লুসাইপাহাড়ের উপর দিয়া, মণিপুরের ভিতর দিয়া, উত্তর ব্রহ্মদেশ ভেদ করিয়া, মধ্য-ব্রহ্মদেশে পাগান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পট্টিকেরা রাজ্যের সঙ্গে একাদশ ও দ্বাদশ শতকে ব্রহ্মদেশের পাগান রাষ্ট্রের খুব ঘনিষ্ঠ বৈবাহিক ও রাজনৈতিক সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল। এই দুই রাজ্যের সংযোগ ছিল এই সদ্যোক্ত পথে। এই পথের সংবাদও স্থানীয় লোক ছাড়া আর সকলেই ভুলিয়া গিয়াছিল, অথচ মধ্যযুগে মণিপুর-ব্রহ্মযুদ্ধের সৈন্যসামন্ত তো এই পথ দিয়াই যাওয়া আসা করিয়াছে। চোরাই ব্যবসাও বরাবরই এই পথে চলিত। আজ প্রয়োজনের তাড়নায় সেই পথ আবার বহুজনের পদচারণে প্রশস্ত হইয়াছে।

চট্টগ্রাম-আরাকান পথ

আর-একটি পথের প্রতি একান্ত সাম্প্রতিক কালের দৃষ্টি পড়িয়াছে। এই পথ দক্ষিণশায়ী চট্টগ্রাম হইতে আরাকানের ভিতর দিয়া নিম্ন-ব্রহ্মের প্রোম বা প্রাচীন শ্রীক্ষেত্র পর্যন্ত বিস্তৃত। আনুমানিক নবম-একাদশ শতকে আরাকানে চন্দ্রবংশীয় রাজাদের আধিপত্য সুবিদিত। চট্টগ্রামের সঙ্গে ইহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধও সমান সুপরিচিত। মধ্যযুগে আরাকান মুসলমান রাজসভায় বাঙলা সাহিত্যের প্রচুর সমৃদ্ধি দেখা গিয়াছিল; এই সাহিত্যের সঙ্গে চট্টগ্রাম অঞ্চলের বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। আজ প্রয়োজনের তাড়নায় এই চট্টগ্রাম-আরাকান-প্রোম পথও জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। অবশ্য এই পথের সমান্তরালবাহী সমুদ্রকূলশায়ী জলপথ তো সঙ্গে সঙ্গে ছিলই।

তাম্রলিপ্তি হইতে দক্ষিণমুখী পথ

আর একটি স্থল পথের উল্লেখ করিলেই স্থলপথ-বৃত্তান্ত শেষ হইবে। এই পথটি তাম্রলিপ্তি-তমলুক হইতে, কর্ণসুবর্ণ হইতে, সোজা দক্ষিণবাহী হইয়া বাঙলাদেশকে দক্ষিণ-ভারতের সঙ্গে যুক্ত করিয়াছে। য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ এই পথ ধরিয়াই কর্ণসুবর্ণ হইতে ওড্র, কঙ্গোদ, কলিঙ্গ, দক্ষিণ-কোশল, অন্ধ্র হইয়া দ্রাবিড়, চোল, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে গিয়াছিলেন। পাল ও সেন রাজারা এই পথেই দক্ষিণ দেশ আক্রমণে অগ্রসর হইয়াছিলেন। পশ্চিম-চালুক্যবংশীয় বিক্রমাদিত্য, চোলরাজ রাজেন্দ্রচোল, এবং পূর্ব-গঙ্গবংশের রাজারা এই পথেই বঙ্গদেশ আক্রমণে সৈন্যচালনা করিয়াছিলেন। এই পথেই চৈতন্যদেব নীলাচল এবং দক্ষিণ-ভারতে গিয়াছিলেন। এই পথেই বর্তমান কালের বি-এন আর এবং মান্দ্রাজ-রেলপথ বিস্তৃত।

অন্তর্দেশীয় নদীপথ

স্থলপথের কথা বলা হইল। এইবার আন্তর্দেশিক নদী ও সামুদ্রিক জলপথের কথা বলা যাইতে পারে। এ-সম্বন্ধে সর্বপ্রাচীন সাক্ষ্য কয়েকটি জাতক-কাহিনী হইতে পাওয়া যায়। শঙ্খজাতক, সমুদ্দবাণিজজাতক, মহাজনকজাতক ইত্যাদি গল্পে দেখা যায়, মধ্যদেশের বণিকরা বারাণসী বা চম্পা হইতে জাহাজে করিয়া গঙ্গা ভাগীরথীপথে তাম্রলিপ্তি আসিত এবং সেখান হইতে বঙ্গসাগরের কূল ধরিয়া সিংহলে, অথবা উত্তাল সমুদ্র অতিক্রম করিয়া যাইত সুবর্ণভূমিতে (নিম্ন ব্রহ্মদেশ)। সুবর্ণভূমির পথে বহুদিন বণিকেরা কূলভূমির চিহ্ন পর্যন্ত দেখিতে পাইত না। মেগাস্থিনিসের বিবরণ হইতে সম্ভবত স্ট্র্যাবো এই তথ্য আহরণ করিয়াছিলেন যে, ভাগীরথী-গঙ্গার উজান বাহিয়া সাগরমুখের বন্দর হইতে বাণিজ্যতরীগুলি প্রাচ্য ও গঙ্গারাষ্ট্রের তদানীন্তন রাজধানী পাটলি-

পুত্র পর্যন্ত যাওয়-আসা করিত। নদীপথে গঙ্গা-ভাগীরথী বাহিয়াই বঙ্গদেশের সঙ্গে উত্তর-ভারতের যোগাযোগ ছিল। এ পথ প্রাগৈতিহাসিক পথ, এবং রেলপথে দ্রুত বাণিজ্য-সম্ভার যাতায়াতের সূত্রপাতের আগে বাণিজ্যলক্ষ্মীর যাতায়াত এই পথেই ছিল বেশি। উনবিংশ শতকেও বাঙালী এই নৌকাপথে কাশীধামে যাওয়া-আসা করিত, এই স্মৃতি এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। প্রাচীন বাঙলার অন্য দুইটি প্রধানতম নদনদী করতোয়া এবং ব্রহ্মপুত্র বা লৌহিত্যপথে বাণিজ্যলক্ষ্মীর যাতায়াতের সাক্ষ্য বড় একটা পাওয় যায় না। তবে, কামরূপ হইতে কর্ণসুবর্ণ এক জলপথের ইঙ্গিত বোধহয় পাওয়া যায় য়ুয়ান্ চোয়াঙের বিবরণীতে, হর্ষবর্ধন-ভাস্করবর্মা-সংবাদ প্রসঙ্গে। কিন্তু, এই জলপথ কি ব্রহ্মপুত্র-ভাটি এবং গঙ্গা-উজান বাহিয়া, না কামরূপ হইতে স্থ পথে উত্তর-বঙ্গের ভিতর দিয়া, তাহার পর কোশী বা মহানন্দার ভাটি বাহিয়া গঙ্গাতীরস্থ কর্ণসুবর্ণ পর্যন্ত, তাহা নিঃসংশয়ে বলা কঠিন। যাহা হউক, এ কথা অনুমান করিতে কিছুমাত্র কল্পনার আশ্রয় লইতে হয় না যে, উত্তর-আসামের রেশমজাতীয় বস্ত্রসম্ভার, বাঁশ, কাঠ, চন্দনকাঠ, পান, গুবাক্ বা সুপারি, তেজপাতা ইত্যাদি ব্রহ্মপুত্র-সুরমা মেঘনা বাহিয়াই বাঙলাদেশে আসিত। বাঁশ, কাঠ, ঘর ছাইবার খড় ইত্যাদি তো এখনও ভাটির স্রোতে ভেলায় ভাসাইয়া বাঙলাদেশে আনা হয়। পাট এবং ধান-চাল তো আজও নৌকাপথেই আমদানি-রপ্তানি হয় বেশি, বিশেষত পূর্ব-বাঙলার বিভিন্ন স্থানে এবং আসামে ও সুরমা উপত্যকা অঞ্চলে। করতোয়া যে এক সময় খুবই প্রশস্তা ও খরস্রোতা নদী ছিল এবং সোজা গিয়া সমুদ্রে পড়িত এ কথা তো আগেই বলিয়াছি। উত্তর বঙ্গ ও দক্ষিণ-বঙ্গে যোগাযোগ এই নদীপথেই ছিল, সন্দেহ করিবার কারণ নাই। এ কথাও আগে বলিয়াছি যে, এই নদীমাতৃক দেশে স্থলপথ অপেক্ষা নদীপথেই যাতায়াত ও বাণিজ্য প্রশস্ততর ছিল। লিপি এবং সমসাময়িক সাহিত্যেই যে শুধু সে ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাহাই নয়; মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে এবং উনবিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি পর্যন্ত লোকের অভ্যাস ও সংস্কারের মধ্যেও তাহার আভাস ও ইঙ্গিত সুস্পষ্ট।

বহির্দেশীয় সমুদ্রপথ, বঙ্গ-সিংহল পথ

নদীপথে আন্তর্দেশিক বাণিজ্য অপেক্ষা প্রাচীন বাঙলার সামুদ্রিক বাণিজ্য এবং বাণিজ্য-পথের সাক্ষ্য-প্রমাণ অনেক বেশি পাওয়া যায়। জাতকের গল্পে তাম্রলিপ্তি হইতে সিংহল ও সুবর্ণদ্বীপ যাত্রার কথা বলিয়াছি। দক্ষিণ-ভারত ও সিংহলের পথের কথাই আগে বলা যাক্। সিংহলী ইতিগ্রন্থ দীপবংশ ও মহাবংশে উল্লিখিত লাঢ়দেশী রাজপুত্র বিজয়সিংহ কর্তৃক সমুদ্রপথে সিংহলগমন এবং দ্বীপটি অধিকার ইত্যাদির গল্পৈতিহ্য বাঙালী কবি দ্বিজেন্দ্রলালের কল্যাণে সুপরিচিত। কিন্তু এই লাঢ়দেশ কি প্রাচীন বাঙলার রাঢ় জনপদ, না প্রাচীন গুজরাত বা লাটদেশ, এই লইয়া পণ্ডিতমহলে

মতভেদ আছে, এবং এই সম্পর্কীয় আলোচনা নানা ঐতিহাসিক, নৃতাত্ত্বিক এবং শব্দতাত্ত্বিক বিতর্কে কণ্টকিত। কিন্তু এ সাক্ষ্য ছাড়াও এই সম্বন্ধে অন্য প্রাচীন স্যক্ষ্য বিদ্যমান। পেরিপ্লাসের সাক্ষ্য আগে উল্লেখ করিয়াছি। এই গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, বঙ্গদেশের সঙ্গে দক্ষিণ ভারত ও সিংহলের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য-সম্বন্ধ ছিল। সমুদ্রমুখে গঙ্গাবন্দর হইতে বাণিজ্যসম্ভার কোলাণ্ডিয়া (Colandia) নামক এক প্রকার জাহাজে বোঝাই হইত এবং সেই জাহাজগুলি দক্ষিণ-ভারতে ও সিংহলে যাতায়াত করিত। প্লিনিও এই সামুদ্রিক বাণিজ্যপথের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, আগে প্রাচ্যদেশ হইতে সিংহলে যাইতে ২০ দিন লাগিত, পরে (অর্থাৎ, প্লিনির সময়ে এবং কিছু আগে) লাগিত মাত্র সাত দিন ('a seven days' sail according to the rate of speed of our ships')। চতুর্থ শতকে ফাহিয়ান্ যখন তাম্রলিপ্ত হইতে এক বাণিজ্য-জাহাজ চড়িয়া সিংহল যান তখন লাগিয়াছিল চৌদ্দ দিন ও রাত্রি। সিংহল তো খ্রীষ্টপূর্বকাল হইতেই বৌদ্ধধর্মের এক বিশিষ্ট কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, এবং কালক্রমে এই হিসাবে এই দ্বীপটির খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা বাড়িয়াই চলিয়াছিল। ফাহিয়ানের পর হইতেই বহু চীন বৌদ্ধ পরিব্রাজক সিংহলে-বাঙলাদেশে আসা-যাওয়া করিতেন এবং তাহা সদ্যোক্ত সমুদ্রপথেই। সপ্তম শতকে ইৎসিঙের বিবরণীপাঠে জানা যায়, ঐ সময় অসংখ্য চীনদেশীয় বৌদ্ধশ্রমণ সিংহল হইতে বাঙলায় এবং বাঙলা হইতে সিংহলে ঐ পথে যাতায়াত করিয়াছিলেন। বোধহয়, এই সূত্র ধরিয়াই মহাযান বৌদ্ধধর্ম এবং কিছু কিছু নাগরী লিপির বৌদ্ধধর্মগ্রন্থও সিংহলে প্রসারলাভ করিয়াছিল। অষ্টম শতকের পর বৈদেশিক বাণিজ্যে বাঙলাদেশের প্রতিষ্ঠা ক্ষুণ্ন হওয়ার পরে বহুদিন এই পথের কথা আর শোনা যায় না; তবে মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্য পাঠ করিলে মনে হয়, তখন এই পথ ধরিয়া অর্থাৎ সমুদ্রোপকূল বাহিয়া সিংহল হইয়া গুজরাত পর্যন্ত সমুদ্রপথ পুনরুজ্জীবিত হইয়াছিল, অথবা এইসব পথের সুপ্রাচীন স্মৃতি প্রচলিত গল্প কাহিনীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল, যেমন মনসামঙ্গল কাব্যগুলিতে। সিংহল হইতে মালয়, নিম্ন-ব্রহ্ম, সুবর্ণদ্বীপ, যবদ্বীপ, চম্পা, কম্বোজের সমুদ্রপথ তো ছিলই, এবং তাহার প্রমাণও সুপ্রচুর।

তাম্রলিপ্ত-আরাকান-ব্রহ্ম-মালয়-যবদ্বীপ-সুবর্ণদ্বীপ পথ

তাম্রলিপ্ত হইতে নিম্ন-ব্রহ্মদেশ বা সুবর্ণভূমির দ্বিতীয় সমুদ্রপথের ইঙ্গিত যে মহাজনকজাতকের গল্পে পাওয়া যাইতেছে, সে কথা ইতিপূর্বে বলিয়াছি। এই পথ সম্ভবত ছিল চট্টগ্রাম আরাকানের সমুদ্রোপকূল বাহিয়া। একাদশ শতকে এবং পরে মধ্যযুগে চট্টগ্রামের সঙ্গে আরাকানের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের আনাগোনা যে এই পথেই অনেকটা হইত তাহা কতকটা অনুমান করা চলে। মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যেও [illegible] সামুদ্রিক বাণিজ্যের এবং এই বাণিজ্যপথের সমৃদ্ধ

স্মৃতি ধরিতে পারা কঠিন নয়। সুপারগজাতক নামে আর-একটি জাতকের গল্পেও পূর্ব-ভারতের বণিকদের সুবর্ণভূমিতে যাত্রার কথা আছে। মধ্যযুগে চীন বণিক ও পরিব্রাজকেরা (যেমন, মা-হুয়ান), আরব বণিকেরা এবং পরে পর্তুগীজ বণিকেরা সপ্তগ্রাম ও চেং-টি-গান্ বা চট্টগ্রাম হইতে এই সমুদ্রোপকূল বাহিয়াই আরাকান ও নিম্ন-ব্রহ্মদেশে যাওয়া-আসা করিতেন, এমন প্রমাণ একেবারেই দুর্লভ নয়। ইৎসিঙ্ সপ্তম শতকেই বলিতেছেন, হিউয়েন-তা নামে একজন চীন পরিব্রাজক মালয় উপদ্বীপের সমুদ্রকূলবর্তী কেডা (Keddah) হইতে সোজা তাম্রলিপ্ত গিয়াছিলেন। এই পথটির আভাস বোধহয় খ্রীষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতক হইতেই পাইতেছি। মহানাবিক বুদ্ধগুপ্তের যে লিপিটি মালয়-উপদ্বীপে পাওয়া গিয়াছে সেই লিপিটিতে দেখিতেছি, বুদ্ধগুপ্ত রক্তমৃত্তিকা হইতে সমুদ্রপথে গিয়াছিলেন মালয়ে, বাণিজ্য-ব্যপদেশে। এই রক্তমৃত্তিকা মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙ্গামাটি (য়ুয়ান্-চোয়াঙের লো-টো-মো-চিহ্) বা চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গামাটিও হইতে পারে; শেষেরটি হওয়াই অধিকতর সম্ভব। নবম শতকের মাঝামাঝি দেবপালের নালন্দা-লিপিতেও বঙ্গসাগর বাহিয়া এক সমুদ্রপথের ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। তখন তাম্রলিপ্ত বন্দর অবলুপ্ত, বাঙলার আর কোনও সামুদ্রিক বন্দরের উল্লেখও পাইতেছি না। কাজেই, এই পথ সমুদ্রতীর বাহিয়া, না কোনাকোনি বঙ্গসাগর বাহিয়া, ওড়িশার কোনো বন্দর হইয়া, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতেছে না।

তাম্রলিপ্ত-পলৌরা-মালয়-সুবর্ণভূমি পথ

তৃতীয় আর-একটি পথের কথাও বলিতে হয়। এই পথের সর্বপ্রাচীন সংবাদ দিতেছেন ভৌগোলিক ও জ্যোতির্বেত্তা টলেমি। তাম্রলিপ্ত হইতে যাত্রা করিয়া জাহাজগুলি সোজা আসিত ওড়িশা দেশের পলৌরা (Paloura) বন্দরে, এবং সেখান হইতে কোনাকোনি বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়া যাইত মালয়, যবদ্বীপ, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপ-উপদ্বীপগুলিতে।

৫

ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ু : লোক-প্রকৃতি

নদনদী ও পাহাড়-পর্বত মিলিয়া বাঙলার ভূ-প্রকৃতি নির্ণয় করিয়াছে, এবং তাহা ইতিহাস আরম্ভ হইবার পূর্বেই। ঐতিহাসিক কালেও ভূ-প্রকৃতির কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছে, সন্দেহ নাই, বিশেষত নবগঠিত ভূমিতে—new alluvium-এ। নদীর পলি পড়িয়া, বন্যার দ্বারা তাড়িত মাটি উচ্চভূমিতে বাধা পাইয়া, কিংবা ভূমিকম্প বা অন্য কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে নূতন ভূমির সৃষ্টি বা পুরাতন ভূমি পরিত্যক্ত হয়। বাঙলাদেশেও তাহা

হইয়াছে ; নূতন ভূমির সৃষ্টি হইয়াছে অল্পবিস্তর, কিন্তু তাহাতে প্রাগৈতিহাসিক কালের নবগঠিত ভূমি বা new alluvium-ই প্রসারিত হইয়াছে। পুরাতন ভূমি পরিত্যক্তও হইয়াছে, বিনষ্ট হইয়াছে—সাধারণত নদীর প্রবাহপথের পরিবর্তনের ফলে ; কিন্তু তাহাতে ভূ-প্রকৃতির মৌলিক কোনও পরিবর্তন ঘটে নাই, পুরাভূমিতেও (old alluvium) নয়, নবভূমিতেও (new alluvium) নয়।

পশ্চিমাংশের পুরাভূমি এবং নবভূমি

ভূ-প্রকৃতির দিক হইতে বাঙলাদেশের চারিটি বিভাগ সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট। পশ্চিমে বাঙলার একটা সুবৃহৎ অংশ পুরাভূমি। রাজমহলের দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া এই পুরাভূমি প্রায় সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। রাজমহল, সাঁওতালভূম, মানভূম, সিংহভূম, ধলভূমের পূর্বশায়ী মালভূমি এই পুরাভূমির অন্তর্গত ; তাহারই পূর্বদিক ঘেঁষিয়া মুর্শিদাবাদ-বীরভূম-বর্ধমান-বাঁকুড়া-মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমাংশের উচ্চতর গৈরিকভূমি ; ইহাও সদ্যোক্ত পুরাভূমির অন্তর্গত। মালভূমি অংশ একান্তই পার্বত্য, জাঙ্গলময়, অজলা এবং অনুর্বর। এখনও এই অংশে গভীর শালবন, পার্বত্য আকর ও কয়লার খনি এবং ইহা সাধারণত অনুর্বর। প্রাচীন উত্তর-রাঢ়ের অনেকখানি অংশ, দক্ষিণ-রাঢ়ের পশ্চিমাংশ এবং তাম্রলিপ্তি রাজ্যেরও কিয়ৎ-পশ্চিমাংশ এই মালভূমি এবং উচ্চতর গৈরিক ভূমির অন্তর্গত। দক্ষিণ-রাঢ়ের রানীগঞ্জ-আসানসোলের পার্বত্য অঞ্চল, বাঁকুড়ার শুশুনিয়াপাহাড় অঞ্চল, বনবিষ্ণুপুর রাজ্য, মেদিনীপুরের শালবনী-ঝাড়গ্রাম-গোপীবল্লভপুর অঞ্চল সমস্তই এই পুরাভূমিরই নিম্ন অংশ। এইসব পার্বত্য ও গৈরিক অঞ্চল ভেদ করিয়াই ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর, রূপনারায়ণ, দ্বারকেশ্বর, শিলাবতী (শিলাই), কপিশা (কাসাই), সুবর্ণরেখা প্রভৃতি নদনদী সমতল ভূমিতে নামিয়া আসিয়াছে। এখনও ইহারা ইহাদের জলস্রোতে পার্বত্য লাল মাটি বহন করিয়া আনে। সমতলভূমি এই নদনদীগুলির জল পলিতে উর্বর। এই উর্বর সমতলভূমি নবগঠিত ভূমি, সদ্যোক্ত নদনদীগুলি এবং ভাগীরথী-প্রবাহদ্বারা সৃষ্ট ভূমি। মুর্শিদাবাদের বহুলাংশ, বর্ধমানের পূর্বাংশ, বাঁকুড়ার স্বল্প অংশ, হুগলি-হাওড়া, এবং মেদিনীপুরের পূর্বাংশ এই নবসৃষ্ট ভূমি—বৃক্ষশ্যামল, শস্যবহুল।

অজঙ্গল

পশ্চিমবঙ্গের এই যে ভূ-প্রকৃতি ইহার প্রাচীন সমর্থন কিছু কিছু পাওয়া যায়। ভট্ট ভবদেব রাজা হরিবর্মদেবের মন্ত্রী ছিলেন (একাদশ শতক)। তিনি তাঁহার ভুবনেশ্বর শিলালিপিতে রাঢ়দেশের অজলা জাঙ্গলময় প্রদেশের উল্লেখ করিয়াছেন। ভবিষ্য-পুরাণের ব্রহ্মখণ্ড অংশে রাঢ়ীখণ্ডজাঙ্গল নামে এক দেশের উল্লেখ আছে। বৈদ্যনাথ, বক্রেশ্বর, বীরভূম ও অজয়নদ এই দেশের অন্তর্গত ; ইহার তিনভাগ জাঙ্গল, একভাগ গ্রাম ও জনপদ, অধিকাংশ ভূমি ঊষর, স্বল্পমাত্র ভূমি উর্বর। এখানে কোথাও কোথাও লৌহ আকর

আছে। আমি অন্যত্র দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, ভবিষ্যপুরাণ ও ভবদেবভট্ট-কথিত এই দেশের একাংশে য়ুয়ান্ চোয়াঙ্-রামচরিত-বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ প্রভৃতি কথিত কয়ঙ্গল—কজঙ্গল—কজাঙ্গল—ক-চু-ওয়েন-কি-লো। বর্তমান কাঁকজোল এই ভূখণ্ডের স্মৃতিমাত্র বহন করে। য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ চম্পা হইতে কজঙ্গল গিয়াছিলেন। এই দেশের ভূপ্রকৃতি ও জলবায়ু সম্বন্ধে তাঁহার কিছু বক্তব্য আছে। তিনি বলিতেছেন (সপ্তম শতক), এই স্থানের উত্তর-সীমা গঙ্গা হইতে খুব বেশি দূরে নয়; ইহার দক্ষিণের বনপ্রদেশে বন্য হস্তী প্রচুর। তাঁহার সময়ে এই রাজ্য পররাষ্ট্রের অধীন, রাজধানীতে লোক ছিল না এবং লোকেরা গ্রামে এবং নগরেই বাস করিত। তাঁহারা স্পষ্টাচারী (straightforward), গুণবান এবং বিদ্যাচর্চার প্রতি ভক্তিমান ছিল। দেশটি সমতল, ভূমি জলীয় এবং সুশস্যপ্রসূ, বায়ু উষ্ণ। য়ুয়ান্-চোয়াঙের বর্ণনা হইতে মনে হয়, তিনি কজঙ্গলের যে অংশে দামোদর-অজয়-ভাগীরথী উপত্যকা সেই অংশের উপত্যকা-ভূমির কথা বলিতেছেন, যে অংশে বৈদ্যনাথ বক্রেশ্বর-বীরভূম সেই অংশের কথা নয়। দক্ষিণের বনপ্রদেশ বর্নবিষ্ণুপুর অঞ্চল বলিয়াই তো মনে হইতেছে। দামোদর-অজয়-ভাগীরথী উপত্যকার ভূমিই সমতল, জলীয়, সুশস্যপ্রসূ এবং বায়ু উষ্ণ।

তাম্রলিপ্ত

য়ুয়ান্ চোয়াঙ্ তাম্রলিপ্ত-রাজ্যেও গিয়াছিলেন, এবং তাহার বর্ণনাও রাখিয়া গিয়াছেন। তাম্রলিপ্তর ভূমিও সমতল এবং জলীয়; বায়ু উষ্ণ; ফুল ফল শস্য প্রচুর। লোকের আচার-ব্যবহার রূঢ়, কিন্তু তাহারা খুব সাহসী। এই দেশে স্থল ও জলপথের সমন্বয়, এবং ইহার রাজধানী তাম্রলিপ্তর বন্দর সমুদ্রের একটি খাড়ির উপর অবস্থিত। এক্ষেত্রেও য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ মেদিনীপুরের পূর্ব ও পূর্ব-দক্ষিণ অংশের কথা বলিতেছেন, পশ্চিমের পার্বত্য অংশের কথা নয়।

কর্ণসুবর্ণ, পুরাভূমি বা রাঙ্গামাটির বিস্তৃতি

য়ুয়ান্ চোয়াঙ্ তাম্রলিপ্ত হইতে গিয়াছিলেন কর্ণসুবর্ণ রাজ্যে। কর্ণসুবর্ণ তাঁহার সময়ে লোকবহুল জনপদ, এবং জনসাধারণের আর্থিক সমৃদ্ধিও তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ভূমি ছিল সমতল এবং জলীয়, ফল ফুল শস্য ছিল প্রচুর; কৃষিকর্ম ভাল; বায়ু নাতিশীতোষ্ণ। জনসাধারণ সুচরিত্র এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের পোষক। য়ুয়ান্-চোয়াঙের কর্ণসুবর্ণ মুর্শিদাবাদ জেলার কানসোনা বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। এই অনুমানের সমর্থন চীন-পরিব্রাজকের বিবরণীতেই পাওয়া যায়। কর্ণসুবর্ণের রাজধানীর সন্নিকটেই তিনি লো-টো মো চিহ্ নামক এক সুবৃহৎ বৌদ্ধবিহারের উল্লেখ এবং বর্ণনা করিয়াছেন। লো-টো-মো-চিহ্ (=রক্তমৃত্তি=রক্তমৃত্তিকা) বর্তমান রাঙ্গামাটি; রাঙ্গামাটি মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত। রাঙ্গামাটি

নামটি অর্থব্যঞ্জক। এই রাঙ্গামাটি সমতলভূমি হইলেও রাজমহল-সাঁওতালভূমের পার্বত্য গৈরিক মাটি এই ভূমির নিম্ন ও উপরিস্তরে অপ্রতুল নয়। পুরাভূমি বা old alluviumর কিছু কিছু চিহ্ন যে মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে তাহার ইঙ্গিত রাঙ্গামাটি, লালবাগ প্রভৃতি নামের স্মৃতির মধ্যে পাওয়া যায়। বাঙলার অন্যত্রও যেখানে-যেখানে স্থান-নামের সঙ্গে রাঙ্গা, লাল, রং প্রভৃতি শব্দ জড়িত সেইসব স্থান লক্ষ্যণীয়। চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল ঘেঁষিয়া রাঙ্গামাটি জনপদ এখনও বিদ্যমান। হয়তো ইহাই মহানাবিক বুদ্ধগুপ্তের রক্তমৃত্তিকা। কুমিল্লা শহরের পাঁচ মাইল পশ্চিমে লালমাটি বা লালমাইপাহাড় (ইহাই কি শ্রীচন্দ্রের রামপাল ও ধুল্লা লিপির রোহিতাগিরি?)। রেনেলের নক্শায় দেখা যাইবে, ব্রহ্মপুত্রের উত্তর প্রবাহের পশ্চিমে (রংপুর জেলা), উত্তরে (গোয়ালপাড়া-কামরূপ জেলা), এবং দক্ষিণে (গোয়ালপাড়া কামরূপ জেলা) একাধিক রাঙ্গামাটির উল্লেখ ও পরিচয় (Rangamatta, Rangamatty, Rangamati = রাঙ্গামাটি, সন্দেহ থাকিতে পারে না)। ইহার কিছু সমর্থন করতোয়া-মাহাত্ম্য গ্রন্থেও পাওয়া যায়—"পশ্চিমে করতোয়ায়া লোহিনী যত্র মৃত্তিকা"। বর্তমান রংপুর জেলার রংপুর নামও এই রাঙ্গামাটির স্মৃতিবহ বলিয়া আমি মনে করি। রাঙ্গাপুর = বিদেশী Rungpour (যেমন, রেনেলের নক্শায়) = রঙ্গপুর = রংপুর হওয়া একেবারে অসম্ভব কিছুই নয়। তাহা ছাড়া, আমিনগাঁও-এর পথে রাঙ্গিয়া রেল স্টেশন, তেজপুরের পথে রাঙ্গাপাড়া স্টেশন, রাঙ্গাগ্রাম প্রভৃতি সমস্তই রেনেলের রাঙ্গামাটির সমর্থক; কারণ এগুলি সমস্তই ব্রহ্মপুত্রের পূর্বে, উত্তরে এবং দক্ষিণে। রংপুরের দক্ষিণ-পশ্চিমে বরেন্দ্রী, মুসলমান ঐতিহাসিকদের বরিন্দ্। বরেন্দ্রীর মাটি লাল, এবং তাহা একান্তই পুরাভূমি। এই পুরাভূমির বিচ্ছিন্ন অসংলগ্ন রেখা চলিয়া গিয়াছে রাজমহলের নিকট গঙ্গা পার হইয়া ধলভূম মানভূম-সিংভূম ধরিয়া সমুদ্রতীর পর্যন্ত। উত্তর-রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ়ের পশ্চিমাংশ এবং মুর্শিদাবাদ এই পুরাভূমিরই বিস্তৃতাংশ। পূর্ব দক্ষিণ দিকে এই পুরাভূমিই গারোপাহাড় (মধুপুরগড় সহ), পার্বত্য ত্রিপুরা, পার্বত্য চট্টগ্রাম হইয়া সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত।

যুয়ান্ চোয়াঙের কজঙ্গলতাম্রলিপ্ত-কর্ণসুবর্ণ বিবরণ পড়িয়া মনে হয়, এই পরিব্রাজক পশ্চিমবঙ্গের সমতল ভূমির ভূখণ্ডের সঙ্গেই পরিচিত হইয়াছিলেন। এই সমতলভূমির পশ্চিমাঞ্চলের উত্তর অংশে ভবিষ্যপুরাণ কথিত বৈদ্যনাথ বক্রেশ্বর-বীরভূমধৃত, ঊষর ও জাঙ্গলময় যে রাঢ়ীখণ্ডজাঙ্গলভূমি সেই ভূখণ্ডের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয় নাই। কিংবা ভবদেবভট্ট রাঢ়দেশের যে অজলা জাঙ্গলময় (= জঙ্গলময় হইতে পারে, আবার জাঙ্গল = জাঙ্গাল = উচ্চ বাঁধভূমিময়) ভূমির কথা বলিয়াছেন তাহার পরিচয়ও তিনি পান নাই। কজঙ্গল-তাম্রলিপ্ত-কর্ণসুবর্ণ—এই তিনটি রাজ্যেরই যে সমতলভূমি জলীয় এবং ফলমূল-শস্যপ্রসূ, যাহার জলবায়ু উষ্ণ অথবা নাতিশীতোষ্ণ, এবং যে ভূমি লোকবহুল সেই ভূমি-ভাগের সঙ্গেই তাঁহার পরিচয় ঘটিয়াছিল। তিনি আসিয়াছিলেন বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী

এবং উৎসুক শিক্ষার্থী হিসাবে ; বৌদ্ধধর্মসংঘ ও বিহারগুলির পরিচয়লাভ, পণ্ডিত ও ধর্মগুরুদের অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচয়লাভই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এইসব বৌদ্ধবিহার বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেন্দ্র সাধারণত সহজগম্য এবং লোকালয়প্রধান স্থানেই অবস্থিত ছিল। সুপরিচিত, বহুজনপদচিহ্নিত পথ ধরিয়াই তিনি সে-সব স্থানে গিয়াছিলেন। কাজেই ঊষর, অনুর্বর ও জাঙ্গলময়, এবং সেই হেতু গ্রাম ও নগরবিরল, জনবিরল স্থানগুলিতে যাওয়ার কোনও প্রয়োজন তাঁহার হয় নাই।

উত্তর-বঙ্গের পুরাভূমি ও নবভূমি, বরিন্দ্-বরেন্দ্রী

পূর্বোক্ত পুরাভূমির একটি রেখা রাজমহলের উত্তরে গঙ্গা পার হইয়া মালদহ রাজসাহী-দিনাজপুর-রংপুরের ভিতর দিয়া, ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া ঐ নদীর দুই তীরে বিস্তৃত হইয়া আসামের শৈলশ্রেণী স্পর্শ করিয়াছে। এই পুরাভূমিরেখার মাটি পার্বত্য গৈরিক স্থূল বালিময়। রংপুর-গোয়ালপাড়া কামরূপেই এই রেখার বিস্তৃতি বেশি ; রেনেলের নক্শায় তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। উত্তর-বঙ্গের রাঙ্গামাটি প্রসঙ্গ আগেই বলিয়াছি। তাহা ছাড়া বগুড়া রাজসাহীর উত্তর, দিনাজপুরের পূর্ব, এবং রংপুরের পশ্চিম স্পর্শ করিয়া এই রেখার একটি বিস্তৃত স্ফীতি—উচ্চ গৈরিক ভূমি—দেখিতে পাওয়া যায় ; ইহাই মুসলমান ঐতিহাসিকদের বরিন্দ্, বরেন্দ্রভূমির কেন্দ্রবিন্দু। এই বরিন্দের উত্তরে হিমালয়ের তরাই-পর্বতসানুর অস্বাস্থ্যকর জলীয় নিম্নভূমিতে জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলা, পূর্ণিয়ার কিয়দংশ। বরেন্দ্রীর কেন্দ্রবিন্দু বরিন্দের গৈরিক ভূমি অনুর্বর, পুরাভূমি ; কিন্তু পূর্ব-পশ্চিম-দক্ষিণ ঘিরিয়া তঙ্গন আত্রাই, মহানন্দা কোশী, পদ্মা-করতোয়ার জল ও পলিমাটি-দ্বারা গঠিত নবভূমি। উপরোক্ত পুরাভূমিরেখাটুকু ছাড়া নবভূমির বাকি সবটাই সমতল-ভূমি, সুশস্যপ্রসূ, জলীয় এবং শ্যামল। বরিন্দ্ জনবিরল, এমনকি মালদহ-রংপুরের পুরাভূমিরেখাও অপেক্ষাকৃত জনবিরল, এবং মাটির রং গৈরিক ; ঘন লোকবসতি সাধারণত পদ্মা আত্রাই-করতোয়ার সমতলভূমিতেই দেখা যায়। প্রাচীন কালেও পুণ্ড্র-বরেন্দ্রীর সমৃদ্ধ জনপদগুলি সমস্তই এই নদনদীপ্লাবিত সমতলভূমিতে।

রামচরিতে বরেন্দ্রভূমির যে শস্যসমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়, যে ঐশ্বর্যবিবরণ পড়া যায় এবং যাহার কথা ধনসম্বল অধ্যায় প্রসঙ্গে এবং অন্যত্র নানা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে সেই সমৃদ্ধি সাধারণত এই সমতলভূমির। তাহা হওয়াই স্বাভাবিক। নদনদী বাহিয়াই বাঙলার প্রাচীন সভ্যতা-সংস্কৃতি সমৃদ্ধির জয়যাত্রা, এবং সমতলভূমিতে নদনদীর তীরেই গ্রাম-নগর-বন্দরের পত্তন, মানুষের ঘনতম বসতি, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের বিস্তার।

পুণ্ড্রবর্ধন

বরেন্দ্রভূমি প্রাচীন পুণ্ড্র বা পুণ্ড্রবর্ধনেরই এক সুবৃহৎ অংশ, এমনকি কখনও কখনও সমার্থকও। য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ ভ্রমণ-ব্যপদেশে পুণ্ড্রবর্ধনেও আসিয়াছিলেন। তখন এই

দেশে সমৃদ্ধ, জনবহুল, প্রতি জনপদে দিঘি, আরাম-কানন, পুষ্পোদ্যান ইতস্তত বিক্ষিপ্ত; ভূমি সমতল এবং জলীয়, শস্যসম্ভার সুপ্রচুর, জলবায়ু মৃদু। জনসাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধাবান। আগে বলিয়াছি, উত্তর-বঙ্গ এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার গোয়ালপাড়া ও কামরূপ জেলার ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ু প্রায় একই প্রকার; সেখানেও একই ভূমির বিস্তার। য়ুয়ান্-চোয়াঙের কামরূপ-বিবরণ সেই জন্যই পুণ্ড্রবর্ধনের সঙ্গে একেবারে হুবহু মিলিয়া যায়। সেখানেও ভূমি সমতল এবং জলীয়, শস্যসম্ভার নিয়মিত এবং জলবায়ু মৃদু। কামরূপের লোকেরা খর্ব ও কৃষ্ণকায়; সদাচারী হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের প্রকৃতি হিংস্র। বিদ্যার্থী হিসাবে তাহারা খুব অধ্যবসায়ী এবং তাহাদের ভাষা মধ্যদেশ হইতে পৃথক্। এই দেশের দক্ষিণ-পূর্ব বনভূমিতে (গারো ও খাসিয়া-পাহাড়ে ?) যূথবদ্ধ হইয়া বন্যহস্তী উৎপাত করিয়া চরিয়া বেড়ায় (এখনও করে); তাহার ফলে এখান হইতে যুদ্ধের প্রয়োজনে হস্তী যথেষ্ট পাওয়া যায়।

রাঢ়-পুণ্ড্রের যোগাযোগ

পশ্চিম-বাঙলায় যেমন উত্তর বঙ্গেও তেমনই, য়ুয়ান্-চোয়াঙের পরিচয় পুণ্ড্রবর্ধনের সমতল ভূমির সঙ্গে। কেন্দ্রভূমি বরিন্দের সঙ্গে বোধহয় তাঁহার পরিচয় ঘটে নাই। যাহাই হউক, রাঢ় এবং উত্তর-বঙ্গের ভূ-প্রকৃতি এবং সঙ্গে সঙ্গে পদ্মা ও ভাগীরথীর ইতিহাস একত্রে স্মরণ ও বিশ্লেষণ করিলে মনে হয়, এক সময় পুণ্ড্র-বরেন্দ্রভূমির সঙ্গে রাঢ়ভূমির, বিশেষত মুর্শিদাবাদ বীরভূম-বর্ধমানের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। ভাগীরথী যখন গৌড়কে ডাইনে রাখিয়া উত্তর-পূর্ববাহী হইয়া পরে দক্ষিণবাহী হইত, পদ্মা যখন আরও সোজা পূর্ববাহী ছিল তখন তো পুণ্ড্র-বরেন্দ্রীর কিছুটা অংশ (মালদহ জেলা) রাঢ়ভূমির সঙ্গে যুক্তই ছিল। কিন্তু ইহার পরও গঙ্গা বরেন্দ্র-পুণ্ড্র এবং রাঢ়ভূমির মধ্যে কখনও খুব বড় বাধা হইয়া দেখা দেয় নাই। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্বন্ধের একটি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ প্রাচীন বাঙলার এই দুই ভূখণ্ডের মধ্যে বরাবরই ছিল। আজ উত্তর-বাঙলার সঙ্গে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক যোগ পূর্ব-বাঙলার বেশি, কিন্তু প্রাচীন কালে তাহা ছিল না বলিলেই চলে। দিনাজপুর-রাজসাহী-মালদহের লোকভাষার প্রকৃতিও রাঢ়ের পূর্বাঞ্চলের লোকভাষা-প্রকৃতির সঙ্গে আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ। কিন্তু তাহা আলোচনার স্থান এখানে নয়। তবে, এ কথা অনস্বীকার্য যে, মোটামুটিভাবে পুণ্ড্র-বরেন্দ্রী এবং রাঢ় তাম্রলিপ্তিই বাঙলাদেশের প্রাচীনতর পলিভূমি।

পূর্ববঙ্গের পুরাভূমি ও নবভূমি, মধুপুরগড়, নবভূমির দুই ভাগ

পূর্ব-বাঙলা একান্তই নবভূমি এবং এই নবভূমি পদ্মা-ব্রহ্মপুত্র এবং সুরমা-মেঘনার সৃষ্টি। এই নবভূমির উত্তরে, পূর্বে এবং পূর্ব-দক্ষিণে গারো-

খাসিয়া-জৈন্তিয়া ত্রিপুরা চট্টগ্রামের শৈলশ্রেণী ; ইহাদের অব্যবহিত সানু ও তলদেশ পার্বত্য না হইলেও কোথাও কোথাও গৈরিক বালুকাময়, কখনও কখনও বালির -শক্ত স্তরময়, যেমন চট্টগ্রাম ত্রিপুরা শ্রীহট্ট কাছাড় জেলার কোন কোন স্থানে। চট্টগ্রামের পার্বত্য-চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরার পার্বত্য-ত্রিপুরা অঞ্চল, কাছাড় জেলার উত্তরাংশ ও দক্ষিণাংশে হাইলিয়াকান্দি অঞ্চল, এবং শ্রীহট্ট জেলার পূর্বাঞ্চলকে মোটামুটি পুরাভূমির অন্তর্গতই বলিতে হয়। তাহা ছাড়া, ঢাকা ও মৈমনসিংহ জেলার বিস্তৃত একটি অংশ জুড়িয়া গৈরিক পার্বত্য গজারী-বনময় একখণ্ড পুরাভূমির স্ফীতি দেখিতে পাওয়া যায়—ইহা মধুপুরগড় নামে খ্যাত। ঢাকা জেলায় ভাওয়ালের গড়ও তাহাই। মধুপুরগড়ের উপরের স্তরের মাটি যেন লাল কাদা-জমানো মাটি, কিন্তু তাহার নিচের স্তরেই লাল বালি ; এই বালি ও অজয়-বরাকর উপত্যকার লাল বালি একই গৈরিক পার্বত্য মাটি। পূর্ব-বাঙলার অন্য সমস্ত ভূমিই জলীয় সমতল ভূমি অর্থাৎ নবগঠিত ভূমি এবং এই ভূমি সর্বত্র খালবিল ও সুবিস্তীর্ণ জলাভূমিদ্বারা আচ্ছন্ন। কিন্তু তাহা হইলেও এই নবগঠিত ভূমির দুইটি বিভাগ সুস্পষ্ট। ইহারই মধ্যে মৈমনসিং, ঢাকা, ফরিদপুর, সমতল-ত্রিপুরা ও শ্রীহট্টের বহুলাংশের গঠন পুরাতন (old formation), এবং খুলনা, বাখরগঞ্জ, সমতল-নোয়াখালি ও সমতল-চট্টগ্রামের গঠন নূতন (new formation)। শ্রীহট্ট জেলার পঞ্চখণ্ড অঞ্চলে প্রাপ্ত নিধনপুর তাম্রপট্টোলী (সপ্তম শতক), ভাটেরায় প্রাপ্ত গোবিন্দকেশবের পট্টোলী (একাদশ শতক), বন্দরবাজারে প্রাপ্ত লোকনাথের মূর্তি (দশম-একাদশ শতক), ত্রিপুরা জেলায় প্রাপ্ত লোকনাথের পট্টোলী (অষ্টম শতক) এবং তৎপরবর্তী অগণিত লিপি ও মূর্তি, ফরিদপুরে প্রাপ্ত ধর্মাদিত্য-গোপচন্দ্র ইত্যাদির পট্টোলী (ষষ্ঠ-সপ্তম শতক), ঢাকা জেলায় প্রাপ্ত অসংখ্য মূর্তি ও লিপি এইসব ভূখণ্ডে প্রাচীনকাল হইতেই বহুদিনস্থিত সমৃদ্ধ সভ্যতা এবং জনাবাসের দ্যোতক। এইসব ভূখণ্ড পুরাতন গঠন, এবং ইহাদের অবলম্বন করিয়াই প্রাচীন বাঙলার সভ্যতা ও সংস্কৃতি পূর্বাঞ্চলে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। এইসব ভূখণ্ডের তুলনায় খুলনা-বাখরগঞ্জ-নোয়াখালি-সমতল চট্টগ্রাম নূতন, এবং লক্ষ্যণীয় এই যে, এইসব ভূখণ্ডে বাঙলার প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির বড় একটি চিহ্ন এ-পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। চট্টগ্রামে বহু মূর্তি এবং কয়েকটি লিপি, নোয়াখালিতে দু-একটি মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু তাহার একটিও নবগঠিত সমতলাংশে নয়।

মধ্য বা দক্ষিণ-বঙ্গের নবভূমি

মধ্য বা দক্ষিণ-বঙ্গে পুরাভূমির অস্তিত্ব কোথাও নাই ; এই ভূমি একেবারে পদ্মা-ভাগীরথী মধুমতীর সৃষ্টি, এবং বাঙলার নবভূমির অন্তর্ভুক্ত ; শতাব্দীর পর শতাব্দীর পলিমাটি জমিয়া জমিয়া এই ভূখণ্ডকে এক ধারে বন্যা ও অন্য ধারে সমুদ্রের জোয়ার-ভাটার ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছে। খাড়িমণ্ডল-ব্যাঘ্রতটী-সমতট প্রভৃতি নাম

লক্ষ্যণীয়। নদীয়া জেলার কিয়দংশ, যশোহর, খুলনা, এবং চব্বিশ-পরগনা এই ভূখণ্ডের অন্তর্গত। সমতট অবশ্যই সমতল-ত্রিপুরা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল—তাহার একাধিক লিপি-প্রমাণ বিদ্যমান—কিন্তু সমতল ত্রিপুরাও তো ফরিদপুরের মতো নবভূমিরই অংশ। তবে ইহাদের মধ্যে নদীয়া যশোর, এবং বোধহয় চব্বিশ-পরগনা ফরিদপুর ঢাকা-ত্রিপুরার মতো পুরাতন গঠন, আর, খুলনা-বাখরগঞ্জ সমতল নোয়াখালি বা সমতল-চট্টগ্রামের মতো নূতন গঠন। চব্বিশ-পরগনার গাঙ্গেয় অঞ্চল তো সুপ্রাচীন জনাবাস ও সভ্যতার কেন্দ্রই ছিল।

সমতট

য়ুয়ান্ চোয়াঙ্ সমতটেও আসিয়াছিলেন। তিনি বলিতেছেন, এই সমতট সমুদ্র-তীরবর্তী দেশ ; ইহার ভূমি জলীয় এবং সমতল। ইহার শস্যসম্ভার বা জনসমৃদ্ধি সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলেন নাই। য়ুয়ান্ চোয়াঙের সমতট তদানীন্তন যশোর-ফরিদপুর-ঢাকা অঞ্চল বলিয়াই যেন মনে হয় ; অন্তত খুলনা-বাখরগঞ্জের ভূখণ্ড যে নয় এ অনুমান বোধহয় করা চলে। তখন বোধহয় এইসব অঞ্চল ভাল করিয়া গড়িয়াই উঠে নাই। আগেই দেখিয়াছি, ষষ্ঠ শতকে ফরিদপুরের কোটালিপাড়া অঞ্চল নূতন সৃষ্ট হইয়াছে মাত্র, তখনও তাহার নাম 'নব্যাবকাশিকা', এবং সম্ভবত এই জনপদ তখন প্রায় সমুদ্রতীরবর্তী। বাখরগঞ্জের 'নাব্য' অঞ্চল তাহার অনেক পরের সৃষ্টি। ঐতিহাসিক কালে নূতন ভাঙা-গড়া উলট-পালট বাঙলার এই দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলেই বেশি হইয়াছে।

জলবায়ু, বসন্ত বায়ু, বর্ষা ও হেমন্তের বাঙলা

জলবায়ু সম্বন্ধে য়ুয়ান্-চোয়াঙের সাক্ষ্য ভূ-প্রকৃতি প্রসঙ্গে কিছু কিছু জানা গিয়াছে ; মোটামুটি একটা ধারণা তাহা হইতেই পাওয়া যায়। বাঙলার জলবায়ু এখনও নাতি-শীতোষ্ণ ; তবে পশ্চিমাঞ্চলে, বিশেষত বীরভূমে, বর্ধমানের পশ্চিমাংশে এবং কতকটা মেদিনীপুরেও, গ্রীষ্মের তাপ প্রখরতর ; অন্যত্র গ্রীষ্মের বায়ু উষ্ণ জলীয়। য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ তাহা লক্ষ্য ও বিবরণীবদ্ধ করিতে ভোলেন নাই। কিন্তু বাঙলাদেশের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য হইতেছে পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের বারিপাতবাহুল্য। এই বারিপাত ভারত-মহাসাগরবাহিত মৌসুমীবায়ুসঞ্জাত। এই বায়ু হিমালয়, গারো, খাসিয়া ও জৈন্তিয়াপাহাড়ে প্রতিহত হইয়া সমগ্র উত্তর ও পূর্ব-বাঙলাকে, বিশেষভাবে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, রংপুর, পাবনা, বগুড়া, মৈমনসিং, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, ফরিদপুর, বরিশালকে অবিরল বারিপাতে ভাসাইয়া দেয়। আর-একটি বায়ু-প্রবাহ বসন্তের। ফাল্গুন-চৈত্র মাসের দক্ষিণা বাতাসের রূপকচ্ছলে এই প্রবাহের কিঞ্চিৎ আভাস বোধহয় ধোয়ী কবির পবনদূতে পাওয়া যায়। লক্ষ্মণসেন যখন দিগ্বিজয়-উদ্দেশে দক্ষিণ-ভারতে গমন করেন তখন কুবলয়বতী

নামে মলয়পর্বতের এক গন্ধর্বনারী তাঁহার প্রতি প্রেমাকৃষ্টা হন ; বসন্তাগমে কুবলয়বতী লক্ষ্মণসেনের বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া বসন্ত পবনকে দূত করিয়া প্রেরণ করেন। এই বসন্ত পবন উত্তর-পূর্ববাহী, এবং যেহেতু ইহা মলয়পর্বত স্পর্শ করিয়া আসে সেই হেতু কাব্যসাহিত্যে বসন্তের বাতাসের নাম মলয় পবন। কুবলয়বতী পবনদূতকে মলয়-পর্বত হইতে উত্তর-পূর্ববাহী হইয়া গৌড়ে লক্ষ্মণসেন-সমীপে যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন ; দূত সে আদেশ পালন করিয়াছিল, তবে পথে হয়তো বিভ্রান্ত হইয়া অনেক বিপথ বিদিক ঘুরিয়া তবে রাজধানী বিজয়পুরে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। যাহা হউক, এই কাহিনীতে বাঙলার বসন্তকালীন পবন-প্রবাহের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। সংকলনকর্তা শ্রীধরদাসের সদুক্তিকর্ণামৃত-নামক সংকলন-গ্রন্থে বিভিন্ন বাঙালী কবির রচিত বায়ু প্রসঙ্গে প্রাকৃতিক বর্ণনাময় কতকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত আছে। দক্ষিণ-বায়ুর বর্ণনা প্রসঙ্গে দক্ষিণাপথের বিভিন্ন দেশের তরুণীদের আশ্রয়ে দুইজন অজ্ঞাতনামা কবি বেশ রোম্যাণ্টিক কবি-কল্পনার পরিচয় দিয়াছেন। বারিবাহী মৌসুমী বায়ুর কোনও বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিক উল্লেখ ও বর্ণনা পাওয়া যাইতেছে না ; তবে, রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলয় লিপিতে বঙ্গালদেশের অবিরল বারিপাতের একটু সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে। বঙ্গালদেশ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, এই দেশে বারিপাতের কখনও বিরাম ছিল না (Vangaladesa where the rain water never stopped)। বর্ষার অবিরল বৃষ্টিপাত তো এখনও পূর্ব ও দক্ষিণ-বঙ্গের জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য। একাদশ-দ্বাদশ শতকের বাঙলার বর্ষার একটি বাস্তব সুন্দর ছবি আঁকিয়াছেন কবি যোগেশ্বর (ইনি বাঙালী ছিলেন, এতটুকু সন্দেহ নাই), এবং ছবিটি গ্রাম্য নায়ক তথা কৃষক যুবকের সুখস্বপ্নেরও। উদ্ধার-লোভ সংবরণ করা কঠিন।

> ব্রীহিঃ স্তম্বকারিঃ প্রভূতং পয়সঃ প্রত্যাগতা ধেনবঃ
> প্রত্যুজ্জীবিতমিক্ষুনা ভূশমিতি ধ্যায়ন্নপেতান্যধীঃ।
> সান্দ্রোশীর কুটুম্বিনী স্তনভর ব্যালুপ্তঘর্মক্রমো।
> দেবে নীরমুদারমুজ্ঝতি সুখং শেতে নিশাং গ্রামণীঃ॥ [সদুক্তিকর্ণামৃত, ২।৮৪।৩]

প্রচুর জল পাইয়া ধান চমৎকার গজাইয়া উঠিয়াছে, গোরুগুলি ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে ; ইক্ষুর সমৃদ্ধিও দেখা যাইতেছে ; [কাজেই] অন্য কোনও ভাবনা আর নাই ; ঘর্মক্লান্তিমুক্ত স্ত্রীও ঘরে এই অবসরে উশীর প্রসাধন করিতেছে ; বাহিরে আকাশ হইতে জল ঝরিতেছে প্রচুর, গ্রাম্য [যুবক] সুখে শুইয়া আছে।

প্রাচ্যদেশ বাঙলাদেশ যে প্রচুর জল এবং প্রচুর বারিপাতেরই দেশ, তাহা তো পাল-লিপির প্রসিদ্ধ 'দেশে প্রাচি প্রচুর পয়সি স্বচ্ছমাপীয় তোয়ং' পদেই প্রমাণ। আর, গুরু-গম্ভীর ঘন বর্ষায় মেদুর আকাশকে 'মেঘৈর্মেদুরমম্বরম' বলিয়া বাঙালী কবি জয়দেব যে অভিনন্দন জানাইয়াছেন, এবং তার শ্যাম মহিমাকে যে চিত্রে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহা তো বাঙালীর একান্তই সুপরিচিত এবং তাহা বাঙলাদেশ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য বলিয়া মনে হয়।

যে সদুক্তিকর্ণামৃত কাব্য-সংকলন গ্রন্থ হইতে বর্ষার বাঙলার উপরোক্ত চিত্রটি উদ্ধার করা হইয়াছে, সেই গ্রন্থ হইতেই হেমন্তের বাঙলার আর একটি ছবি উদ্ধারের লোভ সংবরণ করা গেল না; এটি একটি অজ্ঞাতনামা (বোধহয় বাঙালী) কবির রচনা, এবং ধান্য ও ইক্ষুসমৃদ্ধ বাঙলার অগ্রহায়ণ-পৌষের অনবদ্য, মধুর বাস্তব চিত্র।

> শালিচ্ছেদ সমৃদ্ধ হালিকগৃহাঃ সংসৃষ্ট-নীলোৎপল-
> স্নিগ্ধ শ্যাম-যব প্ররোহ-নিবিড়ব্যাদীর্ঘ-সীমোদরাঃ।
> মোদন্তে পরিবৃত্ত-ধেম্বনডুহচ্ছাগাঃ পলালৈর্নবৈঃ
> সংসক্ত-ধ্বনদিক্ষুযন্ত্রমুখরা গ্রাম্য গুড়ামোদিনঃ॥ [সদুক্তি, ২।১৫৬।৫]

কৃষকের বাড়ি কাটা শালিধান্যে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে [আঁটি আঁটি কাটা ধান আঙ্গিনায় স্তূপীকৃত হইয়াছে—পৌষ মাসে এখনও যেমন হয়]; গ্রাম সীমান্তের ক্ষেতে যে প্রচুর যব হইয়াছে তাহার শীষ নীলোৎপলের মতো স্নিগ্ধ শ্যাম; গোরু, বলদ ও ছাগগুলি ঘরে ফিরিয়া আসিয়া নূতন খড় পাইয়া আনন্দিত; অবিরত ইক্ষুযন্ত্র ধ্বনিমুখর [আখ মাড়াই কলের শব্দে মুখরিত] গ্রামগুলি [নূতন ইক্ষু] গুড়ের গন্ধে আমোদিত।

লোক-প্রকৃতি

লোক-প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত য়ুয়ান্‌-চোয়াঙের সাক্ষ্য হইতে ইতিপূর্বেই পাওয়া গিয়াছে। কজঙ্গলের লোকেরা স্পষ্টাচারী, গুণবান এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবান, পুণ্ড্রবর্ধনের লোকেরাও জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধাবান। কামরূপের লোকেরা সদাচারী হওয়া সত্ত্বেও হিংস্র প্রকৃতির; তাম্রলিপ্তির লোকেরা রূঢ়াচারী কিন্তু তাহারা কর্মঠ ও সাহসী; সমতটের লোকেরা কর্মঠ; কর্ণসুবর্ণের লোকেরা ভদ্র ও সচ্চরিত্র এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুপোষক; তাম্রলিপ্তির লোকেরাও জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুরাগী। কিন্তু লোক-প্রকৃতির ব্যক্তিগত বিবরণ যথেষ্ট বস্তুগত ও প্রামাণিক সাক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করা কঠিন। প্রথমত, এ ব্যাপারে দর্শক বা পর্যবেক্ষকের ব্যক্তিগত রুচি-অরুচির প্রশ্ন অনিবার্য; দ্বিতীয়ত, দুই-একটি বিচ্ছিন্ন, প্রসঙ্গবর্জিত উদাহরণ হইতে সাধারণভাবে কয়েকটা মন্তব্যে পৌঁছানও এইসব লেখক ও পর্যবেক্ষকের পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়! তৎসত্ত্বেও বিদেশী ও ভিন্নপ্রদেশী লোকেরা বিভিন্ন সময়ে বাঙালীর লোক-প্রকৃতি সম্বন্ধে কী কী বিভিন্ন ধারণা পোষণ করিতেন তাহার একটু হিসাব লওয়া হয়তো নিরর্থক নয়।

গৌড়-বঙ্গ

কামসূত্র-রচয়িতা বাৎস্যায়ন (তৃতীয়-চতুর্থ শতক) বলিতেছেন, তাঁহার সময়ে প্রাচ্য-দেশের লোকেরা মধ্যদেশের জনসাধারণ অপেক্ষা যৌন ও মিথুন ব্যাপারে অনেক বেশি শিষ্ট ছিল। প্রাচ্যদেশের অন্যান্য অনেক বিভাগের সঙ্গে গৌড় ও বঙ্গ এই দুইটি বিভাগ

তিনি জানিতেন ; কাজেই তাঁহার এই মন্তব্য গৌড়-বঙ্গ সম্বন্ধেও নিশ্চয়ই প্রাযোজ্য। কদর্যতম যৌন অনাচার হইতে তাহারা মুক্ত ছিল ; তবে এই দেশেরই রাজান্তঃপুরের—সব দেশে কালেই যেমন হইয়া থাকে—মহিলারা তাঁহাদের কামবাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য নানারূপ কৌশল অবলম্বন করিতেন। গৌড়বাসীরা সুপুরুষ ছিল, এ সাক্ষ্য বাৎস্যায়ন দিতেছেন, এবং গৌড়-নারীরা যে মৃদুভাষিণী, মৃদু-অঙ্গা এবং অনুরাগবতী ছিলেন তাহাও বলিতেছেন। তাহা ছাড়া তিনি একটি কৌতূহলোদ্দীপক খবরও দিতেছেন ; তাহা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। গৌড়-পুরুষেরা আঙুলের সৌন্দর্যবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে লম্বা লম্বা নখ রাখিতেন এবং মহিলারা নাকি তাহাতে খুব আকৃষ্টা হইতেন। গৌড়দেশের বিভিন্ন নগরের নাগরিক এবং বিদগ্ধ নারীদের নানাপ্রকার কাম এবং বিলাসলীলার বিবরণ পড়িলে বাঙলার নগর-সভ্যতা তৃতীয়-চতুর্থ-পঞ্চম শতকে যৌনব্যাপারে খুব যে নীতি ও সংযমপরায়ণ ছিল, অবশ্য বর্তমান আদর্শে, তাহা তো মনে হয় না। কিন্তু এ প্রসঙ্গ গ্রন্থের অন্যত্র আলোচিত হইয়াছে।

গৌড়বাসী সম্বন্ধে আরও খবর পাওয়া যাইতেছে। বাঙালীদের বিদ্যাচর্চায় অনুরাগের সাক্ষ্য য়ুয়ান্ চোয়াঙের নিকট হইতে আগেই পাওয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া, য়ুয়ান্-চোয়াঙের বিবরণে, নানা তিব্বতী গ্রন্থে, অসংখ্য ভিন্নপ্রদেশের লিপিমালা এবং সাহিত্যগ্রন্থ হইতে অনবরতই দেখা যাইতেছে, এখনকার মতো প্রাচীন কালেও বাঙালী ছাত্র ও শিক্ষকরূপে ভারতবর্ষের সর্বত্র এবং ভারতবর্ষের বাহিরে যাতায়াত করিত। কবি ক্ষেমেন্দ্র তাঁহার দেশোপদেশ গ্রন্থে কাশ্মীরে গৌড়দেশের ছাত্রদের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিতেছেন, এইসব ছাত্রর দেহ এত ক্ষীণ যে, হস্তস্পর্শেই ইহাদের দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িবে বলিয়া যেন মনে হয়, কিন্তু কাশ্মীরের জল হাওয়ায় কিছুদিনের মধ্যেই তাহাদের প্রকৃতি উদ্ধত হইয়া উঠে, এবং স্বল্পমাত্র উত্তেজনাতেই একেবারে সহসা মারমুখী হইয়া উঠে। একবার এইরূপ একটু উত্তেজনার ফলে তাহারা এক দোকানদারকে জিনিসের দাম দিতে অস্বীকার করে এবং মুহূর্তমধ্যেই ছুরিকাঘাতে উদ্যত হয়। গৌড়বাসীর এই অচির-ক্রোধপরায়ণতা এবং কলহপ্রিয়তা মিতাক্ষরা-লেখক বিজ্ঞানেশ্বরও বেশ লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

সুহ্ম-রাঢ়

কালিদাসের রঘুবংশ কাব্য (আনুমানিক পঞ্চম শতক) রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে সুহ্মদের উল্লেখ আছে : কবি বলিতেছেন, বেতসলতা যেমন অবনত হইয়া নদীর স্রোতাবেগ হইতে আত্মরক্ষা করে, সুহ্মদেশীয় লোকেরা অবনত হইয়া উদ্ধত-উচ্ছেদকারী সেই রঘুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছিল। কবির এই উক্তির মধ্যে সুহ্মদেশীয়দের লোক-প্রকৃতি সম্বন্ধে কোনও ইঙ্গিত আছে কিনা বলা শক্ত, কারণ টীকাকার মল্লিনাথ বৈতসীবৃত্তি সম্বন্ধে এ প্রসঙ্গে কৌটিল্যের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছেন : বলীয়সাভিযুক্তো দুর্বলঃ

সর্বত্রানুপ্রণতো বেতসধর্মমাতিষ্ঠেৎ। সুহ্মেরা রঘু সম্বন্ধেই এইরূপ বৈতসীবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন, না দুর্বল বলিয়া এইরূপ বৃত্তিই ছিল জনসাধারণের প্রকৃতি, তাহা বলা কঠিন।

মহাবীর ও তাঁহার কয়েকজন শিষ্যকে ধর্মপ্রচারোদ্দেশে পথহীন লাঢ়দেশে, বজ্জ (বজ্র?) ও সুহ্মভূমিতে, ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছিল (আনুমানিক ষষ্ঠ শতক, খ্রীষ্টপূর্ব)। এই গল্পটি জৈনদের ধর্মগ্রন্থ আচারাঙ্গসূত্রে বর্ণিত আছে : অন্যত্র তাহা সবিস্তারে উল্লেখ করিয়াছি। এই উপলক্ষে, এই কাহিনীটিতে রাঢ়বাসীদের রূঢ় আচরণের এবং বজ্জভূমিবাসীদের কুখাদ্য ভক্ষণের প্রতি ইঙ্গিত আছে। তাহা ছাড়া, আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প (অষ্টম শতক) গ্রন্থে গৌড় ও পুণ্ড্রের ভাষাকে অসুরভাষা বলা হইয়াছে, সে কথাও আগে অন্য প্রসঙ্গে বলিয়াছি। মহাভারতে সমুদ্রতীরবাসী বঙ্গদের ম্লেচ্ছ এবং ভাগবত-পুরাণে সুহ্মদের 'পাপ' কোম বলা হইয়াছে। বোধায়ন ধর্মসূত্রে বলা হইয়াছে, মধ্যদেশ বা আর্যাবর্ত হইতে বঙ্গদেশে গেলে ফিরিয়া আসিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় ; এই দুই দেশ অশিষ্টভূমির অন্তর্গত এবং লোকেরা 'সংকীর্ণ-যোনয়ঃ'। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন, এই সমস্ত উক্তি আর্যভাষাভাষী, আর্য-সংস্কৃতিসম্পন্ন লোকদের ; গৌড়-পুণ্ড্র-বঙ্গের অনার্য বা আর্যপূর্ব লোকদের ভাষা, সংস্কৃতি ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে ইঁহাদের জ্ঞানও ছিল না, শ্রদ্ধা-ভক্তিও ছিল না ; তাঁহারা সেই সুপ্রাচীনকালে ইঁহাদের অবজ্ঞার চোখেই দেখিতেন। কিন্তু আশ্চর্য এই, রাঢ়দেশবাসী মুকুন্দরামও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে রাঢ়দেশবাসীকে একটু রূঢ় এবং হিংস্র প্রকৃতির লোক বলিয়াছেন। রাঢ়দেশের লোকেরা যে একটু রূঢ় এবং অশিষ্ট প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাহা ঘনরামের ধর্মমঙ্গলের একটি পদেও সুস্পষ্ট। মুকুন্দরাম লিখিয়াছেন :

> অক্ষটি হিংশক রাঢ় চৌদিকে পশুর হাড়।
> কৃতাঞ্জলি বীর কহে হই গ চোয়াড়।
> লোকে না পরস করে সভে বলে রাঢ়॥

ঘনরাম লিখিয়াছেন :

> জাতি রাঢ় আমি রে, করমে রাঢ় তু।

দক্ষিণ-রাঢ়ের ব্রাহ্মণেরা যে দাম্ভিক প্রকৃতিক লোক ছিলেন তাহার একটু পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় কৃষ্ণমিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে। কৃষ্ণমিশ্র এই ব্রাহ্মণদের একটু ব্যঙ্গই করিয়াছেন! অহংকাররূপী ব্রাহ্মণের যে চিত্র তিনি আঁকিয়াছেন তাহা উজ্জ্বল এবং উপভোগ্য। জন্মদেশ, জনপদ এবং নগরের, পিতার এবং নিজের অহংকৃত পরিচয়ের পর ব্রাহ্মণ-অহংকার বলিতেছেন,

> নাস্মাকং জননী তথোজ্জ্বলকুলা সচ্ছ্রোত্রিয়ানাং পুনর্
> বূঢ়া কাচন কন্যকা খলু ময়া তেনাস্মি তাতোধিকঃ।

অস্মচ্ছ্যালকভাগিনেয়দুহিতা মিথ্যাভিশপ্তা যতস্
তৎসম্পর্কবশাম্ময়া স্বগৃহিণী প্রেয়স্যাপি প্রোজ্ঝিতা ॥

ব্রাহ্মণ-অহংকারের আত্মশ্লাঘার প্রতি শ্লেষ সত্যই উপভোগ্য !

কবি ধোয়ীও দক্ষিণ-রাঢ়ের (সুহ্মদেশের) প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়াছেন, "রসময় সুহ্মদেশঃ।"

রাজশেখরের কর্পূরমঞ্জরী গ্রন্থে হরিকেল (চন্দ্রদ্বীপ-শ্রীহট্ট ত্রিপুরা মৈমনসিং অঞ্চল, হয়তো চট্টগ্রাম অঞ্চলও) দেশের নারীদের খুব স্তুতিবাদ করা হইয়াছে, এবং রাঢ় ও কামরূপের নারীদের তুলনায় শ্রেষ্ঠতরা বলা হইয়াছে। রাজশেখর গৌড়াঙ্গনাগণের বেশভূষার বর্ণনা করিয়া যে স্তুতিবাদ করিয়াছেন সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থে (১২০৬) তাহা উদ্ধৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থেই কোনও এক অজ্ঞাত কবির রচিত (পূর্ব-) বঙ্গীয় নারীদের সাজ-সজ্জা বর্ণনার একটি শ্লোক উদ্ধার করা হইয়াছে। অন্য আর একজন কবি বাঙলার গ্রাম্য তরুণীর বর্ণনা দিয়া আর একটি শ্লোক বাঁধিয়াছেন, তাহাও এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই-সব শ্লোক অন্যত্র উদ্ধার ও আলোচনা করিয়াছি (আহার-বিহার, বসন-ব্যসন, দৈনন্দিন জীবন প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য)।

প্রাচীন বাঙলার ফলফুল বৃক্ষলতা শস্যসম্ভারের এবং অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্য ইত্যাদির পরিচয় দেশ-পরিচয়েরই অংশ ; ধনসম্বল অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে সবিস্তার উল্লেখ করা হইয়াছে। ধান, যব, পাট, ইক্ষু, সরিষা, আম, মহুয়া, কাঁটাল, নানাবিধ বস্ত্র সম্ভার, ধাতুদ্রব্য, খনিজদ্রব্য, লবণ, পান, গুবাক, নারিকেল, বাঁশ, মাছ, ডালিম, ডুমুর (পর্কটী), খেজুর, পিপ্পল, এলাচ ইত্যাদি শস্য ও দ্রব্যসম্ভার কোথায় কী উৎপাদিত হইত তাহাও সেই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে। জীবজন্তু সম্বন্ধেও একই কথা। বর্তমান ও পূর্বোক্ত অধ্যায়েই ব্যাঘ্র, হস্তী, হরিণ, ঘোড়া, বানর, গোরু,ভেড়া, ছাগল, কুক্কুট, বরাহ, নানা প্রকারের মাছ ইত্যাদির কথাও বলা হইয়াছে।

৬

জনপদ বিভাগ, বাঙালা নামের উৎপত্তি

আমাদের এই দেশের নাম বঙ্গদেশ বা বাঙলাদেশ। মুঘল আমলে এই দেশ সুবা বাঙলা নামে পরিচিত ছিল। আবুল ফজল তাঁহার আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে বাঙলা-বাঙ্গালা নামের ব্যাখ্যাও দিয়াছেন। বঙ্গ শব্দের সঙ্গে আল্ (সংস্কৃত আলি, পূর্ববঙ্গীয় আইল) যুক্ত হইয়া বাঙ্গাল বা বাঙ্গালা শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, ইহাই আবুল ফজলের ব্যাখ্যা। আল্ শুধু শস্যক্ষেত্রের আলি নয়, আল ছোটবড় বাঁধও বটে। এই নদীমাতৃক বারিবহুল দেশে

বৃষ্টি, বন্যা এবং জোয়ারের স্রোত ঠেকাইবার জন্য ছোটবড় বাঁধ বাঁধা কৃষি ও বাস্তুভূমির যথার্থ পরিপালনের পক্ষে অনিবার্য। যে-সব ভূখণ্ডের বারিপাত কম, ভূমি সাধারণত উষর, সেখানেও বর্ষার জল ধরিয়া রাখিবার জন্য ছোটবড় বাঁধ বাঁধা প্রয়োজন হইত, এখনও হয়, যেমন বীরভূম অঞ্চলে। প্রাচীন লিপিতে এই ধরনের বাঁধের পুনঃপুনঃ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন, বিশ্বরূপসেনের মদনপাড়া লিপিতে এবং অন্যান্য অসংখ্য লিপিতে। এ-রকম দুই চারটি বৃহৎ বাঁধ এখনও প্রাচীন অভ্যাসের স্মৃতি বহন করিতেছে! দৃষ্টান্তস্বরূপ রংপুর-বগুড়ার ভীমের (কৈবর্তরাজ ভীমের ?) জাঙ্গাল বা ভীমের ডাইঙ্গ, বীরভূমের সিউড়ি অঞ্চলের দুই চারটি বাঁধের উল্লেখ করা যায়। আমার অনুমান, আবুল ফজলের ব্যাখ্যার অর্থ এই : যে বঙ্গদেশ আল্ বা আলিবহুল, যে বঙ্গ-দেশের উপরিভূমির বৈশিষ্ট্যই হইতেছে আল্ সেই দেশই বাঙ্গালা বা বাঙলাদেশ। এই আল্‌গুলিই আবুল ফজলের সবিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল; তাঁহার ব্যাখ্যা পড়িলে এই কথাই মনে হয়। Gastaldi (1560), Hondivs (1613), Hermann Moll (1710), Van den Broucke (1660), Izzak Tirion (1730), F. de Witt (1726) প্রভৃতির নক্‌শায়, মধ্যযুগের য়ুরোপীয় পর্যটকদের বিবরণীতে, সর্বত্রই এই দেশের নাম পাইতেছি Bengala, এবং ইহার দক্ষিণের সাগরটির নাম Golfo de Bengala বা Gulf of Bengal বলিয়া। মধ্যযুগের বাঙলা—বাঙ্গালা—Bengala একই নাম। Marco Polo এই দেশের নাম বলিতেছেন Bengala, যদিও তাঁহার অবস্থিতিনির্দেশ স্পষ্টই ভ্রমাত্মক। যাহাই হউক, বাঙ্গালা-Bengala Bangala-বাঙলা নাম বর্তমান বঙ্গ-দেশের মোটামুটি প্রায় সমস্তটারই; কোনও কোনও দিকে বর্তমান সীমা অতিক্রমও করিয়াছে, মধ্যযুগীয় সাক্ষ্যে তাহা সুস্পষ্ট। কিন্তু প্রাচীন বাঙলায় বঙ্গ বঙ্গাল বলিতে যে দেশখণ্ড বুঝাইত তাহা বর্তমান বঙ্গ বা বাঙলাদেশের সমার্থক নয়; তাহার একটি অংশ মাত্র। প্রাচীন বাঙলাদেশ যে-সব জনপদে বিভক্ত ছিল বঙ্গ ও বঙ্গাল তাহার দুইটি বিভাগ মাত্র। এই দুইটি বিভাগের নাম হইতেই বর্তমান এবং মধ্যযুগীয় সমগ্র বাঙলাদেশ নামটির উৎপত্তি। কাজেই, প্রাচীন বাঙলার জনপদ-বিভাগের কথা বলিতে গিয়া সর্বাগ্রে এই বিভাগ দুইটির কথাই বলিতে হয়।

কিন্তু তাহার আগে জনপদ-বিভাগ সম্বন্ধে সাধারণ দু একটি কথা বলিয়া লওয়া দরকার। অধিকাংশ ক্ষেত্রে, বিশেষত প্রাচীনতর সাক্ষ্যে, জনপদগুলির নাম যেভাবে আমরা পাই, তাহা ঠিক জনপদ বা স্থানের নাম নয়—কোমের নাম, যথা বঙ্গাঃ, রাঢ়াঃ, পুণ্ড্রাঃ, গৌড়াঃ, অর্থাৎ বঙ্গ জনাঃ, গৌড় জনাঃ, পুণ্ড্র জনাঃ, রাঢ়াঃ জনাঃ, বঙ্গ গৌড়-পুণ্ড্র-রাঢ় কোম (tribe অর্থে)। এইসব জনাঃ বা কোম যে-সব অঞ্চলে বাস করিত, পরে তাহাদের, অর্থাৎ সেই সেই অঞ্চলের নাম হইল বঙ্গ, গৌড়, পুণ্ড্র ইত্যাদি। এইভাবে বহুবচনে

জনবাচক অর্থে এইসব নামের ব্যবহার একাদশ-দ্বাদশ শতকের সাক্ষ্যপ্রমাণেও দেখা যায়। দু-এক ক্ষেত্রে তাহার ব্যতিক্রমও আছে, যেমন সুব্ভ বা সুহ্মভূমি, বজ্জ্ বা বজ্রভূমি (ব্রহ্মভূমি?)। দ্বিতীয়ত, জন হইতে বা জনকে কেন্দ্র করিয়া গঠিত এক-একটি জনপদে এক এক সময়ে এক-একটি রাষ্ট্র বা রাজবংশের আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছে, এবং অনেক সময়ে তাহাদের রাষ্ট্রীয় আধিপত্য সংকোচ বা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জনপদটির সীমাও সংকুচিত বা বিস্তারিত হইয়াছে। পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্রদের জনপদকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল পুণ্ড্রবর্ধন রাজ্য (সপ্তম শতক) এবং পরে পাল ও সেন রাজাদের আমলে পুণ্ড্র-পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তি বা পৌণ্ড্রভুক্তি। এই ভুক্তিটি এক সময় হিমালয়-শিখর হইতে আরম্ভ করিয়া (দামোদরপুর লিপি, পঞ্চম শতক) সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল (দ্বাদশ শতকে বিশ্বরূপসেনের সাহিত্য-পরিষদ্ লিপি দ্রষ্টব্য)। ১২৩৪ খ্রীষ্টাব্দের মেহার লিপি অনুসারে ত্রিপুরা জেলাও এই ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। অথচ, প্রাচীন পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্র জনপদ গড়িয়া উঠিয়াছিল বগুড়া-দিনাজপুর-রাজসাহী-রংপুর জেলাকে কেন্দ্র করিয়া। বর্ধমান রাঢ়দেশের একটি অংশমাত্র ছিল, অথচ এক সময় এই বর্ধমান রাষ্ট্রবিভাগে রূপান্তরিত হইয়া বর্ধমানভুক্তি নাম লইয়া শুধু উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়দেশকেই নয়, দণ্ডভুক্তিমণ্ডলকেও গ্রাস করিয়াছিল। দণ্ডভুক্তি মেদিনীপুর জেলার বর্তমান দাঁতন অঞ্চল; এই অঞ্চল সপ্তম শতকে তাম্রলিপ্তি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, য়ুয়ান্-চোয়াঙের বিবরণ হইতে তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। সুহ্মদেশ মোটামুটি দক্ষিণ-রাঢ়ের সমার্থক; মহাভারতে তাম্রলিপ্তকে সুহ্মদেশ হইতে পৃথক বলা হইয়াছে; অধিকাংশ প্রাচীন সাক্ষ্যের ইঙ্গিতও তাহাই। কিন্তু দশকুমার-চরিত গ্রন্থে দামলিপ্ত বা তাম্রলিপ্তকে সুহ্মের অন্তর্ভুক্ত বলা হইয়াছে। জৈন প্রজ্ঞাপনায় তাম্রলিপ্তি বা তাম্রলিপ্তকে আবার বঙ্গের অন্তর্ভুক্তও বলা হইয়াছে, অথচ প্রাচীন সাক্ষ্যের সর্বত্রই ইঙ্গিত এই যে, বঙ্গ ভাগীরথীর পূর্ব-তীরে। এইসব দৃষ্টান্ত হইতে সহজেই বুঝা যায়, রাষ্ট্র-পরিধির বিস্তার ও সংকোচের সঙ্গে সঙ্গে এক এক সময় এক এক জনপদের সীমাও বিস্তারিত ও সংকুচিত হইয়াছে, সব জনপদের সীমা সকল সময় এক থাকে নাই। আসল কথা, প্রাকৃতিক সীমা ও রাষ্ট্রসীমা সর্বত্র সকল সময় এক হয় না, প্রাচীন বাঙলায়ও হয় নাই। জনপদ-বৃত্তান্ত পাঠের সময় এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন। এই জনপদকথা বলিবার সময় সেইজন্য প্রাকৃতিক সীমা-নির্ধারণের চেষ্টাই প্রথম কর্তব্য, যদিও তাহা সহজসাধ্য নয়, সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রায়শ সুদুর্লভ। দ্বিতীয় কর্তব্য, বিভিন্ন সময়ে নির্দিষ্ট জনপদের রাষ্ট্র-সীমার বিস্তার ও সংকোচ, এবং তাহার বিভিন্ন রাষ্ট্রগত ও সংস্কৃতিগত বিভাগের নির্দেশ। এ কাজও অত্যন্ত কঠিন; কারণ এ ক্ষেত্রেও সাক্ষ্য-প্রমাণ সুলভ নয়। তবু, যতটা সম্ভব মোটামুটি একটা ধারণা গড়িয়া তোলার চেষ্টা করা যাইতে পারে। তৃতীয়ত, খুব প্রাচীন কাল হইতেই নানা প্রসঙ্গে বাঙলার বিভিন্ন জনপদের উল্লেখ প্রাচীন গ্রন্থাদি এবং

লিপিগুলিতে পাওয়া যায়। এইসব উল্লেখ সুবিদিত এবং বহু আলোচিত ; কাজেই, এ প্রসঙ্গে তাহার পুনরালোচনার কিছু প্রয়োজন নাই। যে-সব উল্লেখ, যে-সব সাক্ষ্য-প্রমাণ জনপদগুলির সীমা ও অবস্থিতি নির্ণয়ের সহায়ক, শুধু তাহাদের উল্লেখ ও আলোচনাই এ ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। তাহা ছাড়া, প্রাচীনতর উল্লেখ যাহা পাইতেছি তাহা সমস্তই আর্যভাষাভাষী আর্য-সংস্কৃতিসম্পন্ন লোকদের গ্রন্থ হইতে, যাহারা আর্যপূর্ব বা অনার্য ভাষা ও সংস্কৃতির উপর শ্রদ্ধাবান ছিলেন না এমন লোকদের নিকট হইতে, এ কথাও মনে রাখা দরকার।

বঙ্গ, বঙ্গের পশ্চিম সীমা

বঙ্গ অতি প্রাচীন দেশ। ঐতরেয় আরণ্যক গ্রন্থে বোধহয় সর্বপ্রথম এই দেশের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় ; "বয়াংসি বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদাঃ" পদে বঙ্গজনদের বগধদের সঙ্গে যুক্ত করা হইয়াছে। বগধ বোধহয় মগধ, এই অনুমান অনৈতিহাসিক না-ও হইতে পারে। এই গ্রন্থের ঋষিরা বঙ্গকে মগধের প্রতিবেশী জনপদ বলিয়াই জানিতেন বলিয়া মনে হয়। বোধায়নের ধর্মসূত্রে বঙ্গ জনপদটিকে কলিঙ্গ জনপদের প্রতিবেশী বলিয়া ইঙ্গিত করা হইয়াছে, এমন অনুমান করিলে ভুল হয় না ; আরট্ট, পুণ্ড্র, সৌবীর, বঙ্গ ও কলিঙ্গজনেরা একেবারে বৈদিক সংস্কৃতিবহির্ভূত, এবং তাহাদের দেশে যাতায়াত করিলে ফিরিয়া আসিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, বোধায়ন এইরূপ নির্দেশ দিয়াছেন। মহাভারতে দেখিতেছি, ভীম দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া মুদগগিরি (মুঙ্গের)-রাজকে হত্যা করিয়া কোশীনদী-তীরবর্তী পুণ্ড্র-রাজকে পরাজিত করেন ; তাহার পর, পর পর তিনি বঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, কর্বট, সুহ্ম, প্রসুহ্ম রাজাদের এবং অনেক ম্লেচ্ছ কোমদের পরাভূত করেন। মহাভারতের আদিপর্বে বঙ্গজনপদের উল্লেখ করা হইয়াছে অঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র এবং সুহ্মজনদের সঙ্গে ; সভাপর্বে পুণ্ড্রদের সঙ্গে। রামায়ণেও অন্যান্য জনদের সঙ্গে বঙ্গজনদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় ; ইঁহারা সকলেই অযোধ্যার অভিজাত-বংশীয়দের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন, এইরূপ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সিংহলী মহাবংশ গ্রন্থে বঙ্গজনেরা লাল (রাঢ়)-জনদের সঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে। প্রজ্ঞাপনা-নামক একটি জৈন উপাঙ্গে বঙ্গজনদের সঙ্গে লাল (রাঢ়)-জনদের উল্লেখ করিয়া উভয়কেই আর্য বলা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে তাম্রলিপ্তকে বঙ্গজনদের অধিকারে বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। মহাভারতের উল্লেখ হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, বঙ্গ পুণ্ড্র, তাম্রলিপ্ত ও সুহ্মের সংলগ্ন দেশ, এবং প্রত্যেকটি দেশই স্ব-স্বতন্ত্র ; কিন্তু জৈন উপাঙ্গটির ইঙ্গিত হইতে মনে হয়, কোনও সময়ে তাম্রলিপ্ত বোধহয় বঙ্গের অধিকারভুক্ত হইয়া থাকিবে। বঙ্গের উল্লেখ গুন্টুর জেলার নাগার্জুনীকোণ্ড (খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতক) শিলালিপিতে, রাজা চন্দ্রের (চতুর্থ শতক) মেহেরৌলি স্তম্ভলিপি এবং

বাতাপীর (বাদামী) চালুক্যরাজ পুলকেশীর মহাকূট স্তম্ভলিপি (সপ্তম শতক)তেও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহাদের একটিতেও বঙ্গের অবস্থিতি-নির্দেশ পাওয়া যায় না। কালিদাসের (চতুর্থ শতক ?) রঘুবংশে এই নির্দেশ যেন অনেকটা স্পষ্ট। এই কাব্যের চতুর্থ সর্গে রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে পর পর পাঁচটি শ্লোক আছে। প্রথম দুইটি শ্লোকে তালীবনশ্যাম উপকূলে সুহ্ম-জনদের পরাজয়ের কথা আছে ; তারপরেই তিনি নৌ-সাধনোদ্যত বঙ্গজনদের পরাভূত করিয়া 'গঙ্গাস্রোতোঽন্তরে' জয়স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন। বঙ্গজনদের উৎখাত এবং প্রতিরোপিত করিয়া পরে তিনি কপিশা (কাসাই)-নদী পার হইয়া উৎকলদিগের প্রদর্শিত পথে কলিঙ্গ অভিমুখে গিয়াছিলেন। টীকাকার মল্লিনাথ 'গঙ্গাস্রোতোঽন্তরেষু', পদটির টীকা করিয়াছেন'গঙ্গায়াঃ প্রবাহনাম দ্বীপেষু' ; এবং আধুনিক ঐতিহাসিকেরাও 'গঙ্গাস্রোতের মধ্যে' এই অর্থই করিয়াছেন। এই অর্থ মানিয়া লইলে স্বীকার করিতে হয়, কালিদাসের সময়েও তাম্রলিপ্ত বঙ্গজনপদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং রঘু সুহ্ম অর্থাৎ মোটামুটি দক্ষিণ রাঢ় জয় করিয়া বঙ্গ জয় করেন, এবং পরে কপিশা পার হইয়া উৎকলে যান। কিন্তু মহোদধির তালীবনশ্যামোপকণ্ঠে উপনীত হইয়া সুহ্ম জয়ের উল্লেখ হইতে আমার মনে হয়, তদানীন্তন তাম্রলিপ্ত সুহ্মদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। দশকুমারচরিত গ্রন্থে দামলিপ্ত (তাম্রলিপ্ত) সুহ্মের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। তাহা হওয়াই স্বাভাবিক ; উভয়েই গঙ্গা-ভাগীরথীর পশ্চিমান্ত সংলগ্ন দেশ, এবং তাম্রলিপ্তই যথার্থত সমুদ্রতীরবর্তী তালীবনশ্যাম ভূখণ্ড বলিয়া বর্ণিত হওয়া যুক্তিযুক্ত। তাহা হইলে, বঙ্গ গঙ্গাস্রোতের বামে বা পূর্বদিকে হওয়া উচিত : আমার মনে হয়, 'গঙ্গা-স্রোতোঽন্তরেষু' বলিয়া কালিদাস গঙ্গাস্রোতের অপর দিকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন ; অন্তরেষু অর্থাৎ পার হইয়া। পরবর্তী সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণে গঙ্গা-ভাগীরথীই যে বঙ্গের পশ্চিম সীমা, এই ইঙ্গিত বারবার পাওয়া যায়। বঙ্গ-জয়ের পর রঘু আবার পশ্চিমদিকে ফিরিয়া সুহ্মের ভিতর দিয়া, কপিশা পার হইয়া উৎকল-কলিঙ্গে গিয়াছিলেন।

উপবঙ্গ, বঙ্গ, প্রবঙ্গ, অনুত্তর-বঙ্গ

বৃহৎসংহিতায় উপবঙ্গ-নামে একটি জনপদের উল্লেখ আছে। আনুমানিক ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে রচিত দিগ্বিজয়-প্রকাশ-নামক গ্রন্থে উপবঙ্গ বলিতে যশোর ও তৎসংলগ্ন কয়েকটি কাননময় অঞ্চলের দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে (উপবঙ্গে যশোরাদ্যাঃ দেশাঃ কাননসংযুক্তাঃ)। মনোরথপূরণী এবং অপদান-নামক পালি বৌদ্ধগ্রন্থে বঙ্গান্তপুত্ত এবং বঙ্গীশ এই দুইটি অভিধা হইতে মনে হয়, বঙ্গ শব্দটির সঙ্গে এই দুইটি অভিধার কোনও প্রকার যোগ ছিল, কিন্তু তাহাতে বঙ্গ, উপবঙ্গ, বঙ্গান্ত-দেশের অবস্থিতির কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রবঙ্গ-নামেও আর একটি

জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রবঙ্গ পরবর্তী কালের অনুত্তর বঙ্গ বা দক্ষিণ-বঙ্গের মতো বঙ্গেরই একটি অংশ হয়তো ছিল ; কিন্তু ইহারও অবস্থিতি সম্বন্ধে কোনও ইঙ্গিত আমাদের জানা নাই।

গুপ্ত আমলে বঙ্গের দুইটি বিভাগ ছিল বলিয়া মনে হয়। সমাচারদেবের ঘুগ্রাহাটি লিপিতে দেখিতেছি, সুবর্ণবীথিতে একজন উপরিকের শাসনকেন্দ্র ছিল। এই সুবর্ণ-বীথি নব্যাবকাশিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া মনে হয়। নব্যাবকাশিকা যে ঢাকা-ফরিদপুর অঞ্চলের (ষষ্ঠ-সপ্তম শতকের) নবগঠিত ভূমি তাহা তো আগেই বলিয়াছি। ঢাকা জেলার বর্তমান সুবর্ণগ্রাম (সোনার গাঁ), সোনারাং, সোনাকান্দি প্রভৃতি স্থানের সঙ্গে প্রাচীন সুবর্ণবীথির একটি অর্থগত যোগ আছে, এ অনুমান বোধহয় সংগত। সুবর্ণবীথির অন্তর্গত ছিল বারকমণ্ডল, এবং লিপিতে উল্লেখ করা হইয়াছে বারকমণ্ডল ছিল প্রাক্-সমুদ্রশায়ী। বারকমণ্ডল-মধ্যবর্তী ধ্রুবিলাটি বর্তমান ফরিদপুর শহরের নিকটবর্তী ধুলট।

পাল ও সেন আমলে বঙ্গ পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্গত বলিয়া বারবার বলা হইয়াছে, কিন্তু গুপ্ত আমলে বঙ্গ এবং পুণ্ড্রবর্ধন দুই পৃথক রাষ্ট্রবিভাগে ছিল বলিয়া মনে হয়।

পাল ও সেন আমলের লিপিগুলিতে বঙ্গের উল্লেখ বারবার পাওয়া যায়। প্রতিহাররাজ ভোজদেবের গওআলিয়র প্রশস্তিতে দ্বিতীয় নাগভট কর্তৃক বঙ্গপতিকে (ধর্মপাল) পরাভূত করিবার কথা উল্লিখিত আছে (নবম শতক)। পালরাজ রামপালের মন্ত্রীপুত্র কুমারপালের প্রধানামাত্য বৈদ্যদেবের কমৌলি লিপিতে (একাদশ শতক) অনুত্তর-বঙ্গের সমরবিজয়-ব্যাপারের উল্লেখ আছে, সেই প্রসঙ্গে 'নৌবাটহীহীরব' এবং 'কিঞ্চোৎ-পাতুক-কেনিপাত-পতন-প্রোৎসর্পিতৈঃ শীকরৈঃ' পদ দুইটির উল্লেখ হইতে অনুত্তর-বঙ্গ যে দক্ষিণ-বঙ্গ এ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকে না। মনে হয়, একাদশ শতকের শেষাশেষি বঙ্গের দুইটি বিভাগ কল্পিত হইয়াছিল : একটি বঙ্গের উত্তরাঞ্চল, আর একটি অনুত্তর বা বঙ্গের দক্ষিণাঞ্চল। অনুমান হয়, বঙ্গের উত্তরাঞ্চলের উত্তর সীমা ছিল পদ্মা এবং সমুদ্রশায়ী খালনালা সমাকীর্ণ দক্ষিণাঞ্চল ছিল অনুত্তর-বঙ্গ। অথবা, এমনও হইতে পারে, অনুত্তর-বঙ্গ কোনও বিশিষ্ট স্থানের নাম (proper name) নয়, দক্ষিণ ও পূর্ব-দক্ষিণাঞ্চলের বর্ণনাত্মক নাম মাত্র। যাহাই হউক, কেশবসেন ও বিশ্বরূপসেন এই দুই সেনরাজের আমলে বঙ্গের অন্তত দুইটি বিভাগের নাম পাওয়া যাইতেছে ; একটি বিক্রমপুর-ভাগ, অপরটি নাব্য (ভাগ) বা নাব্য (?) মণ্ডল। চন্দ্র ও সেন -রাজাদের অনেক লিপিই তো বিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার হইতে উৎসারিত। কেশবসেনের ইদিলপুর লিপি ও বিশ্বরূপসেনের মদনপাড়া লিপিতে বিক্রমপুর-ভাগ পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্গত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বিশ্বরূপসেনের সাহিত্য-পরিষদ লিপিতে পাইতেছি নাব্যভাগের উল্লেখ ; তাহাও পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি বঙ্গ-

বিভাগের অন্তর্গত, এবং সেই পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির এবং নাব্যভাগের পূর্বতম সীমায় সমুদ্র, তাহা সাহিত্য-পরিষদের লিপিটিতে উল্লিখিত হইয়াছে। এই লিপিটির নাব্যভাগের অন্তর্গত রামসিদ্ধি পাটক বাখরগঞ্জ জেলার গৌরনদী অঞ্চলের একটি গ্রাম। চন্দ্ররাজ শ্রীচন্দ্রের রামপাল-পট্টোলীর নাব্যমণ্ডল এবং তদন্তর্ভুক্ত নেহকাষ্ঠি যথাক্রমে নাব্যমণ্ডল এবং নৈকাঠি (বাখরগঞ্জ জেলা) হওয়াও কিছুই বিচিত্র নয়। এই প্রসঙ্গে ষষ্ঠ-সপ্তম শতকের ফরিদপুর লিপির নব্যাবকাশিকার সঙ্গে নাব্যের সম্ভাব্য সম্বন্ধেরও উল্লেখ করা যাইতে পারে। যাহাই হউক, এইসব লিপিপ্রমাণ হইতে বুঝা যাইতেছে, বাখরগঞ্জ জেলা এবং আরও পূর্বদিকে সমুদ্র পর্যন্ত অঞ্চল সমস্তটাই নাব্য নামে পরিচিত হইয়াছিল, এবং বর্তমান বিক্রমপুর পরগনার সমগ্র এবং ইদিলপুর পরগনার কিয়দংশ লইয়া ছিল বিক্রমপুর-ভাগ (কেশবসেনের ইদিলপুর লিপি)। সেন লিপিতে বঙ্গ তো শুধু বঙ্গ নয়, সে যে 'মধুক্ষীরক বঙ্গ'—প্রচুর পয়ঃ যে দেশে সে দেশকে কবি মধুক্ষীরক বলিবেন, আশ্চর্য কি?

বঙ্গের অবস্থিতি সম্বন্ধে বাৎস্যায়ন-কামসূত্রের টীকাকার যশোধর তাঁহার জয়মঙ্গল নামীয় টীকায় বলিতেছেন: 'বঙ্গা লৌহিত্যাৎ পূর্বেন' অর্থাৎ বঙ্গ লৌহিত্যের পূর্বদিকে। যশোধরের এই উক্তি বিশ্বাস করা কঠিন। প্রথমত, প্রাচ্যদেশগুলি সম্বন্ধে যশোধরের জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ: কতকগুলি অত্যন্ত মারাত্মক রকমের ভুল তাঁহার টীকায় দেখা যায় এবং সেগুলি ইতিপূর্বেই পণ্ডিতদের লক্ষ্যগোচর হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, ইতিপূর্বেই আমরা দেখিয়াছি, সমস্ত বিক্রমপুর পরগনা এবং ফরিদপুর-বাখরগঞ্জেরও কিয়দংশ বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল, এবং এই-সমস্ত ভূখণ্ডই ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম দিকে। বর্তমান যমুনাও যদি ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীনতর কোনও প্রবাহপথ হইয়া থাকে তাহা হইলেও ফরিদপুর-বাখরগঞ্জ প্রাচীন বঙ্গ বহির্ভূত হইয়া পড়ে। কাজেই যশোধরের উক্তি অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয়।

হরিকেল, হরিকেলি, হরিকোলা

কোষকার হেমচন্দ্র তাঁহার অভিধান-চিন্তামণিতে (দ্বাদশ শতক) বঙ্গ ও হরিকেলি-জনপদ এক ও সমার্থক বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন, "চম্পাস্তু অঙ্গা বঙ্গাস্তু হরিকেলিয়াঃ"। প্রাচ্যদেশের পূর্বতম সীমায় হরিকেল, দুই চীন পরিব্রাজকের (সপ্তম শতক) বিবরণীতে এই খবর জানা যায়। আনুমানিক অষ্টম শতকে রচিত আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প-গ্রন্থে বঙ্গ, সমতট ও হরিকেল তিনটি স্ব-স্বতন্ত্র কিন্তু প্রতিবেশী জনপদ বলিয়া ইঙ্গিত করা হইয়াছে; এই তিনটি জনপদেই অসুর বুলি প্রচলিত ছিল, তাহাও বলা হইয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত রুদ্রাক্ষ মাহাত্ম্য (ম্য) এবং রূপচিন্তামণিকোষ (পঞ্চদশ শতক) নামক দুইটি পাণ্ডুলিপিতে শ্রীহট্ট এবং হরিকোলা নামক জনপদ দুইটিকে এক এবং সমার্থক বলা হইয়াছে। রাজশেখরের কর্পূরমঞ্জরী-গ্রন্থে (নবম শতক) হরিকেলি-জনপদের নারীদের খুব স্তুতিবাদ করা হইয়াছে, এবং তাহারা পূর্বদেশবাসিনী তাহাও ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

ডাকার্ণব-গ্রন্থে বর্ণিত চৌষট্টিটি তান্ত্রিক পীঠের একটি পীঠ হরিকেল, এবং এই হরিকেল টিক্কর, খাড়ি, রাঢ় এবং বঙ্গালদেশ হইতে পৃথক। হরিকেলদেশে বৌদ্ধ দেবতা লোকনাথের একটি মন্দিরও বোধহয় ছিল। টিক্কর রামচরিত কাব্যের ঢেক্করীয় = ঢেকুরী, কাটোয়ার কাছে, বর্ধমান জেলায়। শ্রীচন্দ্রের রামপাল-লিপিতে শ্রীচন্দ্রের পিতা ত্রৈলোক্যচন্দ্রদেবকে আগে হরিকেল এবং পরে চন্দ্রদ্বীপেরও (বাখরগঞ্জ) রাজা বলিয়া ইঙ্গিত করা হইয়াছে। অনুমান হয়, হরিকেল চন্দ্রদ্বীপ বা বাখরগঞ্জ অঞ্চলের সংলগ্ন ছিল। কান্তিদেবের চট্টগ্রাম-লিপিতে হরিকেলকে একটি মণ্ডল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এইসব সাক্ষ্য প্রমাণ হইতে মনে হয়, হরিকেল সপ্তম-অষ্টম শতক হইতে দশম-একাদশ শতক পর্যন্ত বঙ্গ (চন্দ্রদ্বীপও বঙ্গে) এবং সমতটের সংলগ্ন কিন্তু স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল, কিন্তু ত্রৈলোক্যচন্দ্রের চন্দ্রদ্বীপ অধিকারের পর হইতেই হরিকেলকে মোটামুটি বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণনা করা হয়। ডাকার্ণব এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাণ্ডুলিপি-দুইটির সাক্ষ্য একত্র করিলে হরিকেল বা হরিকোলা যে শ্রীহট্ট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তাহা স্বীকার করিতে আপত্তি হইবার কারণ নাই। আর কান্তিদেবের লিপি সাক্ষ্যে মনে হয়, সমসাময়িক কালে চট্টগ্রামও হরিকেল-অন্তর্ভুক্ত থাকা কিছু বিচিত্র নয়। শ্রীহট্ট চৌষট্টি তান্ত্রিক পীঠের অন্যতমপীঠ। দ্বাদশ শতকে গুজরাতে বসিয়া হেমচন্দ্র যখন তাঁহার অভিধান লিখিতেছিলেন তখন তাঁহার পক্ষে বঙ্গ এবং হরিকেল সমার্থক বলা হয়তো খুব অন্যায় হয় নাই। তাহা ছাড়া, তাঁহার উক্তি একটু শিথিলভাবেই প্রযোজ্য, কারণ, চম্পা অঙ্গদেশের একটি অংশ মাত্র, অবশ্য কেন্দ্রীয় অংশ, অথচ তিনি বলিতেছেন, 'চম্পাস্তু অঙ্গাঃ'। হরিকেলও সেই হিসাবে বঙ্গের অংশ মাত্র, অবশ্যই রাজা ত্রৈলোক্যচন্দ্রদেবের রাজ্যের আদিকেন্দ্র; সে ক্ষেত্রেও তিনি বলিতেছেন, 'বঙ্গাস্তু হরিকেলিয়াঃ'। একটু শিথিলভাবে বলা, সন্দেহ কী!'

চন্দ্রদ্বীপ

এইমাত্র আমরা শ্রীচন্দ্রের রামপাল-লিপিতে ত্রৈলোক্যচন্দ্রদেবের প্রসঙ্গে চন্দ্রদ্বীপের উল্লেখ দেখিয়াছি (দশম-একাদশ শতক)। ১০১৫ খ্রীষ্টাব্দের একটি পাণ্ডুলিপিতেও চন্দ্রদ্বীপের তারামূর্তি ও মন্দিরের ইঙ্গিত আছে। বিশ্বরূপসেনের সাহিত্যপরিষদ-লিপিতেও বোধহয় [চা]ন্দ্রদ্বীপের উল্লেখ আছে (ত্রয়োদশ শতক); এই চন্দ্রদ্বীপের ঘাঘরকাট্টি-পাটক নিশ্চয়ই ঘাঘরনদীর তীরবর্তী ঘাঘরকাটি-নামক কোনও গ্রাম (বরিশাল জেলার ঝালকাটি প্রভৃতি কাটি-পদান্ত নাম লক্ষণীয়); এই ঘাঘরনদীর তীরেই ফুল্লশ্রীগ্রামে মনসার পাঁচালীর কবি বিজয়গুপ্তের (পঞ্চদশ শতক) বাসভূমি ছিল।

"পশ্চিমে ঘাগর নদী পূর্বে ঘণ্টেশ্বর।
মধ্যে ফুল্লশ্রী গ্রাম পণ্ডিত-নগর ॥

স্থানগুণে যেই জন্মে সেই গুণময়।
হেন ফুল্লশ্রী গ্রামে বসতি বিজয় ॥"

মধ্যযুগে চন্দ্রদ্বীপ সুপ্রসিদ্ধ স্থান। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থের বাক্‌লা পরগনার বাক্‌লা সরকার (বর্তমান বাখরগঞ্জ জেলায়) আর চন্দ্রদ্বীপ একই স্থান বলিয়া বহুদিনই স্বীকৃত হইয়াছে। এই চন্দ্রদ্বীপ বা বাখরগঞ্জ অঞ্চল যে অন্তত ত্রয়োদশ শতকে বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহা তো আগেই দেখিয়াছি।

সমতট

সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতে (চতুর্থ শতক) ডবাক-নেপাল-কর্তৃপুর-কামরূপের সঙ্গে, এবং বরাহমিহিরের (ষষ্ঠ শতক) বৃহৎ-সংহিতায় পুণ্ড্র-তাম্রলিপ্তক-বর্ধমান-বঙ্গের সঙ্গে, সমতট-নামে একটি জনপদের উল্লেখ সর্বপ্রথম পাওয়া যাইতেছে। সপ্তম শতকে য়ুয়ান-চোয়াঙের বিবরণী পাঠে মনে হয়, সমতট ছিল কামরূপের দক্ষিণে। এই শতকেরই শেষাশেষি ইৎসিঙ্ সমতটে রাজভট-নামে এক রাজার উল্লেখ করিতেছেন; রাজভট এবং আস্রফপুর পট্টোলীর (সপ্তম শতক) রাজরাজভট্ট একই ব্যক্তি বলিয়া বহুদিন পণ্ডিতসমাজে স্বীকৃত হইয়াছেন। রাজরাজভট্টের অন্যতম রাজধানী ছিল কর্মান্ত বা ত্রিপুরা জেলার বড়কামতা। য়ুয়ান্-চোয়াঙের বিবরণী পাঠে মনে হয়, মধ্য-বাঙলার অন্তত কিয়দংশ এই সমতটের অংশ ছিল। অথচ, বর্তমান ত্রিপুরাও যে সমতটেরই অংশ ছিল, সপ্তম হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ শতক পর্যন্ত, তাহা অনস্বীকার্য; এ সম্বন্ধে সাক্ষ্যপ্রমাণ সুপ্রচুর। সপ্তম শতকের কথা বলিয়াছি। দশম শতকে প্রথম মহীপালের রাজত্বের তৃতীয় সম্বৎসরে নির্মিত এবং ত্রিপুরা জেলার বাঘাউরাগ্রামে প্রাপ্ত মূর্তিলিপি, আনুমানিক একাদশ-দ্বাদশ শতকের একটি চিত্রিত পাণ্ডুলিপিতে "চম্পিতলা লোকনাথ সমতটে অরিষষ্টান"-উক্তি (চম্পিতলা বর্তমান ত্রিপুরায়), ১২৩৪ খ্রীষ্টাব্দের দামোদরদেবের অপ্রকাশিত মেহার পট্টোলী ইত্যাদি সাক্ষ্যের ইঙ্গিত হইতে মনে হয়, ত্রিপুরা জেলাই ছিল সমতটের প্রধান কেন্দ্র। এই কেন্দ্রস্থলটি যে একাদশ হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত

পট্টিকেরা

পট্টিকেরা-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার একটি পাণ্ডুলিপিতে (১০১৫ খ্রীষ্টাব্দ; চুণ্ডাদেবীর ছবির নিচে "পট্টিকেরে চুণ্ডাবর ভবনে চুণ্ডা"-পরিচয় দ্রষ্টব্য; এই চুণ্ডাবর ভবন ও চুণ্ডাদেবীর সঙ্গে বর্তমান ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার চুণ্টাগ্রামের একটু যোগ আছে বলিয়া মনে হইতেছে), ব্রহ্মদেশীয় রাজবৃত্ত হ্মনান্ গ্রন্থে, এবং ১২২০ খ্রীষ্টাব্দের রণবঙ্কমল্ল শ্রীহরিকালদেবের একটি লিপিতে। কিন্তু, অন্তত দ্বাদশ শতকে সমতটের পশ্চিম সীমা বোধহয় মধ্য-বঙ্গ অতিক্রম

করিয়া একেবারে বর্তমান চব্বিশপরগনার খাড়ি পরগনা (প্রাচীন খাড়িমণ্ডল) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বিজয়সেনের বারাকপুর পট্টোলীতে দেখিতেছি, খাড়িমণ্ডলের ভূমির পরিমাপ করা হইতেছে 'সমতটীয় নলেন'। সেন-লিপিগুলিতে ভূমিপরিমাপের যে অভ্যাসের পরিচয় আমরা পাই তাহাতে মনে হয়, যে ভূখণ্ড যে জনপদের অন্তর্ভুক্ত সেই জনপদে ব্যবহৃত নলেই ভূখণ্ডের পরিমাপ করা হইত। সেইজন্য মনে হয়, খাড়িমণ্ডল তখন সমতটেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরূপ হওয়া কিছুতেই অস্বাভাবিক নয়, অসম্ভব তো নয়ই। সমতটের অর্থই হইতেছে তটের সঙ্গে যাহা সমান, অর্থাৎ সমুদ্রশায়ী নিম্নদেশ। গঙ্গা-ভাগীরথীর পূর্বতীর হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে মেঘনা-মোহনা পর্যন্ত সমুদ্রশায়ী ভূখণ্ডকেই বোধহয় বলা হইত সমতট, যাহা মুসলমান ঐতিহাসিকদের এবং মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যের ভাটি, তারানাথের বাটি। যাহা হউক ত্রিপুরা ও মধ্য-বঙ্গ যে বঙ্গেরই অন্তর্ভুক্ত, তাহা তো আমরা আগেই দেখিয়াছি।

নারায়ণপালদেবের ভাগলপুর-শাসনে সংসমতটজন্মা শুভদাসপুত্র শ্রীমান সংখদাস-নামে এক শিল্পীর উল্লেখ আছে; সংসমতট কোন্ জায়গা তাহা নির্ণয় করা কঠিন, তবে নিশ্চয়ই সমতট-সংপৃক্ত কোনও স্থান। অথবা, সং শুধু সমতটের একটি বিশেষণ মাত্র।

বঙ্গাল

একাদশ শতক হইতে প্রাচীন বঙ্গের একটি বিভাগের নূতন একটি নাম পাইতেছি, বঙ্গাল। বিজ্জল কলচুর্যের অবলুর লিপি, রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলয় লিপি এবং আরও কয়েকটি দক্ষিণী লিপিতে প্রথম বঙ্গালদেশের নামের উল্লেখ দেখিতেছি। অবলুর লিপি এবং আরও অন্তত দুটি দক্ষিণী লিপিতে বঙ্গ ও বাঙ্গাল দুটি জনপদই একই সঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে। এ অনুমান স্বাভাবিক যে, বঙ্গ ও বঙ্গাল একাদশ শতকে দুই পৃথক জনপদ ছিল। পরেও ইহাদের পৃথকভাবেই গণ্য করা হইত। নয়চন্দ্র সূরীর হাম্মির মহাকাব্য (পঞ্চদশ শতক) এবং সাম্‌শ্-ই-সিরাজ আফিফ্-র তারিখ-ই-ফিরুজসাহী-গ্রন্থেও এই দুই জনপদকে পৃথক ভাবে গণ্য করা হইয়াছে। কিন্তু, এই একাদশ শতকেরই রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলয় লিপি পাঠে মনে হয়, চোল সৈন্য দণ্ডভুক্তি (তাম্রলিপ্ত অঞ্চল, বর্তমান দাঁতন) ও তক্কণ লাঢ় (দক্ষিণ-রাঢ়) জয় করিবার পর বঙ্গালদেশের রাজা গোবিন্দচন্দ্রকে পলায়নপর করেন; বঙ্গের কোনও উল্লেখ এই লিপিতে নাই। স্বতই অনুমান হয়, দক্ষিণ-রাঢ়ের পরই ছিল বঙ্গালদেশ, এবং এই দুই দেশের মধ্যসীমা ছিল বোধ-হয় গঙ্গা-ভাগীরথী। রাজা গোবিন্দচন্দ্র যে বংশের রাজা সেই বংশ যে হরিকেল-ত্রিপুরা-চন্দ্রদ্বীপের অধিপতি ছিলেন, এ তথ্য ঐতিহাসিকদের কাছে সুবিদিত। বিক্রমপুর অঞ্চলেও গোবিন্দচন্দ্রের অন্তত দুইটি লিপিপ্রমাণ পাওয়া গিয়াছে এবং এই অঞ্চলও গোবিন্দচন্দ্রের রাজ্যভুক্ত ছিল। দেখা যাইতেছে, একাদশ শতকে বঙ্গালদেশ বলিতে প্রায় সমস্ত পূর্ব-বঙ্গ

এবং দক্ষিণ বঙ্গের সমুদ্রতটশায়ী সমস্ত দেশখণ্ডকে বুঝাইত। ইহার সম্পূর্ণ না হউক কতক অংশকে যে সমতট বলা হইত, তাহা তো আগেই দেখিয়াছি। চন্দ্রদ্বীপ-হরিকেলও তখন বঙ্গালদেশেরই অংশ। দ্বাদশ শতকে না হউক, ত্রয়োদশ শতকে এইসব অংশই আবার বঙ্গের বিক্রমপুর এবং নাব্যভাগের অন্তর্গত। মানিকচন্দ্র রাজার গানের "ভাটি হইতে আইল বাঙ্গাল লম্বা লম্বা দাড়ি" পদে অনুমান হয়, ভাটি ও বঙ্গাল বা বাঙ্গালদেশ এক সময়ে প্রায় সমার্থকই ছিল। কিন্তু বঙ্গাল বা বাঙ্গালদেশের কেন্দ্রস্থান বোধহয় ছিল পূর্ব-বঙ্গে। বিশ্বরূপসেনের সাহিত্য-পরিষদ-লিপিতে রামসিদ্ধি পাটকের দক্ষিণে বাঙ্গালবড়া-নামে একখণ্ড ভূমির উল্লেখ আছে। রামসিদ্ধি পাটক যে বর্তমান বাখরগঞ্জ জেলার গৌরনদী অঞ্চলের একটি গ্রাম তাহা এখন স্বীকৃত এবং আগেই তাহা উল্লেখও করিয়াছি। বাঙ্গালবড়াও বাখরগঞ্জ জেলার কোনও স্থান হওয়াই স্বাভাবিক। Gastaldi-র (১৫৬১) নক্শায় Bengala-র অবস্থিতি যেন এই অঞ্চলেই দেখান হইয়াছে; কিন্তু ষোড়শ শতক হইতে যত নক্শা প্রায় প্রত্যেকটিতেই দেখিতেছি Bengala-র অবস্থান আরও পূর্বদিকে। এই Bengala-বন্দর যে কোন্ বন্দর তাহা বলা কঠিন; কেহ বলেন চট্টগ্রাম, কেহ বলেন প্রাচীন ঢাকা। ঢাকা শহরে বাঙ্গালাবাজার এখনও প্রসিদ্ধ পল্লী ও বাজার, বাঙ্গালাবাজার মধ্যযুগীয় Bengala-বন্দরের স্মৃতি বহন করা অসম্ভব নয়। সদুক্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থে (সংকলন কাল ১২০৬; সংকলন-কর্তা শ্রীধর দাস) জনৈক অজ্ঞাতনামা বঙ্গাল=বাঙ্গাল=পূর্ববঙ্গীয় কবির রচিত একটি গঙ্গাস্তোত্র স্থান পাইয়াছে। এই কবি নিজের বাণীকে গঙ্গার সহিত উপমিত করিয়াছেন। উপমা-চাতুর্যে স্তোত্রটি এত সুন্দর যে, বঙ্গ-বাঙ্গাল প্রসঙ্গে ইহা উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করা কঠিন :

ঘনরসময়ী গভীরা বক্রিম-সুভগোপজীবিতা কবিভিঃ।
অবগাঢ়া চ পুনীতে গঙ্গা বঙ্গাল-বাণী চ।—বঙ্গালস্য। (সদুক্তি, ৫।৩১।২)

পুণ্ড্র

পুণ্ড্রজনদের সর্বপ্রাচীন উল্লেখ ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে, এবং তারপরে বোধায়ন-ধর্মসূত্রে। প্রথমোক্ত গ্রন্থের মতে ইহারা আর্যভূমির প্রাচ্য-প্রত্যন্তদেশের দস্যু কোমদের অন্যতম; দ্বিতীয় গ্রন্থের মতে ইহারা সংকীর্ণযোনি, অপবিত্র; বঙ্গ এবং কলিঙ্গজনদের ইহারা প্রতিবেশী। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণের শুনঃশেপ-আখ্যানের এই উল্লেখে দেখা যায়, পুণ্ড্ররা অন্ধ্র, শবর, পুলিন্দ ও মুতিব কোমদের সংলগ্ন এবং আত্মীয় কোম। এই ধরনের একটি গল্প মহাভারতের আদিপর্বে আছে, একাধিক পুরাণেও আছে; সেখানে কিন্তু পুণ্ড্ররা অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ এবং সুহ্মদের ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি। মানবধর্মশাস্ত্রে পুণ্ড্রদের বলা হইয়াছে ব্রাত্য ক্ষত্রিয়, যদিও মহাভারতের সভাপর্বে বঙ্গ ও পুণ্ড্র উভয় কোমকেই শুদ্ধজাত ক্ষত্রিয়

বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কর্ণ, কৃষ্ণ এবং ভীমের যুদ্ধ এবং দিগ্বিজয় প্রসঙ্গেও মহাভারতে পুণ্ড্রকোমের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কর্ণ সুহ্ম, বঙ্গ এবং পুণ্ড্রদের পরাজিত করিয়াছিলেন এবং বঙ্গ ও অঙ্গকে একটি শাসন-বিষয়ে পরিণত করিয়া নিজে তাহার অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। কৃষ্ণও একবার বঙ্গ ও পুণ্ড্রদের পরাজিত করিয়াছিলেন। কিন্তু, ভীমের দিগ্বিজয়ই সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি মুদ্গগিরির (মুঙ্গের) রাজাকে নিহত করিয়া প্রতাপশালী পুণ্ড্ররাজ ও কোশীনদীর তীরবর্তী অন্য একজন ভূপালকে পরাভূত করেন, এবং তাহার পর বঙ্গরাজকে আক্রমণ করেন। যাহাই হউক, উপরোক্ত উল্লেখগুলি হইতে বুঝা যাইতেছে, পুণ্ড্রদের জনপদ অঙ্গ, বঙ্গ এবং সুহ্ম কোমদের জনপদের সংলগ্ন, এবং হয়তো ইহারা সকলেই একই নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয়ত, এই জনপদের অবস্থান মুদ্গগিরি বা মুঙ্গেরের পূর্বদিকে এবং কোশীতীর-সংলগ্ন। জৈনদের অন্যতম প্রাচীন গ্রন্থ কল্পসূত্রে গোদাসগণ-নামীয় জৈন সন্ন্যাসীদের তিন-তিনটি শাখার উল্লেখ আছে : তাম্রলিপ্ত শাখা, কোটিবর্ষ শাখা, পুণ্ড্রবর্ধন শাখা। এই তিনটি শাখার নামই বাঙলার দুইটি জনপদ এবং একটি নগর হইতে উদ্ভূত। কোটিবর্ষ পুণ্ড্রবর্ধনের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ নগর। খ্রীষ্টপূর্ব আনুমানিক দ্বিতীয় শতকের মহাস্থান ব্রাহ্মী লিপিতে এক পুন্দনগল বা পুণ্ড্রনগরের উল্লেখ আছে। এই পুন্দনগলই বোধহয় ছিল তদানীন্তন পুণ্ড্রের রাজধানী, বর্তমান বগুড়া জেলার মহাস্থান, যাহার পুরাতন ধ্বংসাবশেষ ঘেঁষিয়া এখনও করতোয়ার ক্ষীণধারা বহমান। এই করতোয়ারই তীর্থমহিমা মহাভারতের বনপর্বের তীর্থযাত্রা অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে। রঘুভারতের কথায় "বৃহৎপরিসরা পুণ্যা করতোয়া মহানদী"।

পুণ্ড্রবর্ধন

এইসব প্রাচীন সাক্ষ্য পরবর্তী সাক্ষ্যদ্বারাও সমর্থিত হইয়েছে। ক্রমবর্ধমান সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুণ্ড্র পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে পুণ্ড্রবর্ধনে রূপান্তরিত হইয়াছে, এবং গুপ্তরাষ্ট্রের একটি প্রধান ভুক্তিতে পরিণত হইয়াছে। ধনাইদহ, বৈগ্রাম, পাহাড়পুর এবং দামোদরপুর তাম্রপট্টোলী কয়টিতে এবং য়ুয়ান্-চোয়াঙের বিবরণে এই পুণ্ড্রবর্ধন নামই পাওয়া যাইতেছে। উপরোক্ত পট্টোলীগুলিতে উল্লিখিত বিভিন্ন স্থানের নাম হইতে এ তথ্য আজ নিঃসংশয় যে, তদানীন্তন পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি অন্তত বগুড়া-দিনাজপুর এবং রাজসাহী জেলা জুড়িয়া বিস্তৃত ছিল। মোটামুটি সমস্ত উত্তর-বঙ্গই বোধহয় ছিল পুণ্ড্রবর্ধনের অধীন, একেবারে রাজমহল-গঙ্গা-ভাগীরথী-তীর হইতে আরম্ভ করিয়া করতোয়া পর্যন্ত। কারণ, য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ কজঙ্গল হইতে আসিয়াছিলেন পুণ্ড্রবর্ধনে এবং করতোয়া পার হইয়া গিয়াছিলেন কামরূপ। কজঙ্গল এবং করতোয়া-মধ্যবর্তী ভূভাগই তাহা হইলে পুণ্ড্রবর্ধন : উত্তরে 'হিমবচ্ছিখর' ; দক্ষিণে সীমা কালে কালে বিভিন্ন।

পরবর্তীকালে পৌণ্ড্রভুক্তি, পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির রাষ্ট্রসীমা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই গিয়াছে। ধর্মপালের (অষ্টম শতক) খালিমপুর-লিপিতেই দেখিতেছি পুণ্ড্রবর্ধনান্তর্গত ব্যাঘ্রতটীমণ্ডলের উল্লেখ। এই ব্যাঘ্রতটীমণ্ডল যে দক্ষিণ-সমুদ্রতীরবর্তী ব্যাঘ্রাধ্যুষিত বনময় প্রদেশ হওয়া অসম্ভব নয়, সে কথা আগেই বলিয়াছি। সেন-আমলে দেখিতেছি পুণ্ড্রবর্ধনের দক্ষিণতম সীমা পশ্চিম দিকে খাড়িবিষয়—খাড়িমণ্ডল (বর্তমান খাড়ি পরগনা, ২৪ পরগনা), অন্যদিকে ঢাকা-বাখরগঞ্জের সমুদ্রতীর পর্যন্ত। বঙ্গের নাব্য এবং বিক্রমপুর ভাগও তখন পুণ্ড্রবর্ধনের অন্তর্গত। সদ্যোক্ত খাড়ি নিশ্চয়ই ভাগীরথীর পূর্ব-তীরের (পূর্ব) খাড়ি বা ১১৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ডোম্মনপালের পট্টোলীর পূর্ব-খাটিকা। কারণ, লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুর-পট্টোলীতে পশ্চিম-খাটিকারও উল্লেখ পাইতেছি ; এই পশ্চিম-খাটিকা বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত, ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে। রাঢ়দেশের কোনও অঞ্চল বোধহয় কখনও পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। পশ্চিম-খাটিকার অন্তর্গত বেতড্ডচতুরক বর্তমান হাওড়া জেলার বেতড়ে পরিণত হইয়াছে। বেতড় ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে।

বরেন্দ্র, বরেন্দ্রী

পুণ্ড্রবর্ধনের কেন্দ্র বা হৃদয়স্থানের একটি নূতন নাম পাইতেছি দশম শতক হইতে ; এই নাম বরেন্দ্র অথবা বরেন্দ্রী। ৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দের একটি দক্ষিণী লিপিতে 'বারেন্দ্রদ্যুতি-কারিণ' এবং 'গৌড়চূড়ামণি' নামক জনৈক ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে। কিন্তু প্রসিদ্ধতম উল্লেখ সন্ধ্যাকরনন্দীর রামচরিত কাব্যের কবি-প্রশস্তিতে, এবং গয়াড়তুঙ্গদেবের তালচের-পট্টোলীতে। কবি সন্ধ্যাকর বরেন্দ্রীকে পালরাজাদের জনকভূ অর্থাৎ পিতৃভূমি বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন, এবং গঙ্গা-করতোয়ার মধ্যে ইহার অবস্থিতি নির্দেশ করিয়াছেন। বৈদ্যদেবের কমৌলি-লিপিতে বরেন্দ্রীর উল্লেখ আছে ; কিন্তু সিলিমপুর-শিলালিপি, তর্পণদীঘি এবং মাধাইনগর-পট্টোলী তিনটিতে স্পষ্ট উল্লিখিত আছে যে, বরেন্দ্রী পুণ্ড্র-বর্ধনভুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেন-রাজাদের পট্টোলীগুলিতে বরেন্দ্রীর অন্তর্গত স্থানগুলির অবস্থিতি হইতে এ অনুমান নিঃসংশয়ে করা যায় যে, বর্তমান বগুড়া-দিনাজপুর ও রাজসাহী জেলা, এবং হয়তো পাবনাও (পদুবন্বা ?) প্রাচীন বরেন্দ্রীর বর্তমান প্রতিনিধি। বরেন্দ্রীই মধ্যযুগীয় মুসলমান ঐতিহাসিকদের বরিন্দ্, তবে বরিন্দ্ প্রাচীন বরেন্দ্রী অপেক্ষা সংকীর্ণতর বলিয়া মনে হয়। তবকাত-ই-নাসিরী-গ্রন্থে বরিন্দ্‌কে গঙ্গার পূর্ব-তীরবর্তী এবং লক্ষ্মণাবতী রাজ্যের একটি অংশ মাত্র বলা হইয়াছে। এই গ্রন্থের মতে লক্ষ্মণাবতী রাজ্যের দুই বিভাগ গঙ্গার দুই তীরে : পশ্চিমে রাল্ (= রাঢ়), পূর্বে বরিন্দ্ (= বরেন্দ্রী বা বরেন্দ্র)। প্রাচীন বাঙলার আর একটি বিভাগে লক্ষ্মণসেনের বংশধরেরা তখনও (অর্থাৎ, ১২৪২-৪৫ খ্রীষ্টাব্দে মিনহাজের লক্ষ্মণাবতী প্রবাস-কালে)

রাজত্ব করিতেছিলেন ; এই বিভাগটির নাম বঙ্গ্ (=বঙ্গ)। যাহা হউক, মধ্যযুগীয় সাহিত্য, ইতিহাস এবং কুলজী গ্রন্থে বরেন্দ্র-বরেন্দ্রীর উল্লেখ প্রচুর ; লোকস্মৃতিতেও বরেন্দ্রী এবং বরেন্দ্রীর ঐতিহ্য বরাবর জাগরূক ছিল। ইহাদের ইঙ্গিতেও বরেন্দ্রী উত্তর-বঙ্গের কেন্দ্রস্থলে।

রাঢ়া

রাঢ়া জনপদের প্রাচীনতম উল্লেখ পাইতেছি প্রাচীন জৈনগ্রন্থ আয়ারাঙ্গ বা আচারাঙ্গ সূত্রে। মহাবীর তাঁহার কয়েকজন শিষ্যসহ রাঢ়া-জনপদে আসিয়াছিলেন ধর্মপ্রচারের জন্য (খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতক) ; এই জনপদ তখন পথহীন, আচারবিহীন, এবং লোকেরাও একটু নিষ্ঠুর ও রূঢ় প্রকৃতির। তাঁহারা এইসব অহিংস যতির পিছনে কুকুর লেলাইয়া দিয়াছিল। জৈন প্রজ্ঞাপনা-গ্রন্থে রাঢ় ও বঙ্গজনদের একত্র গ্রথিত করিয়া উভয়কেই আর্য বলা হইয়াছে। কোড়ীবর্ষ (বা পরবর্তী কোটিবর্ষ) ছিল তাহাদের রাজধানী। কোটিবর্ষ দিনাজপুর জেলায়, এবং দামোদরপুর-পট্টোলীর (পঞ্চম-ষষ্ঠ শতক) মতে কোটিবর্ষ পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্গত ; পাল-আমলেও তাহাই। আচারাঙ্গ সূত্রে রাঢ়া-জনপদের দুইটি বিভাগ : বজ্জ বা বজ্রভূমি, সুব্ভ বা সুহ্মভূমি। বজ্জভূমিতে জৈন সন্ন্যাসীদের অপরিষ্কৃত নিকৃষ্ট খাদ্য খাইয়া দিন কাটাইতে হইয়াছিল। সিংহলী পালিগ্রন্থ দীপবংশ ও মহাবংশ-কথিত বিজয়সিংহের কাহিনী সুবিদিত। বঙ্গরাজ সীহবাহু (সিংহবাহু) লাড়দেশে সীহপুর-নামে এক নগরের পত্তন করিয়াছিলেন বলিয়া এই কাহিনীতে উল্লিখিত আছে। কেহ কেহ বলেন, এই লাড়দেশ কাথিয়াবাড় অঞ্চলের প্রাচীন লাটদেশ, এবং সীহপুর বর্তমান সীহোর। কাহারও মতে লাড়দেশ প্রাচীন লাঢ় বা রাঢ়-জনপদ এবং সীহপুর বর্তমান হুগলী জেলার সিঙ্গুর। সীহবাহু লাড়দেশে নগর পত্তন করিবার সময় বঙ্গ-জনপদেরই রাজা ছিলেন। বঙ্গের সঙ্গে লাড়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ এবং নৈকট্য দেখিয়া মনে হয়, লাড়দেশ বঙ্গের সংলগ্ন রাঢ়দেশ হওয়া অসম্ভব নয়। রাজশেখরের কর্পূরমঞ্জরী-গ্রন্থে রাঢ়া-জনপদের সৌন্দর্যের উল্লেখ আছে ; হলায়ুধের অভিধান-গ্রন্থেও অনুরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়।

সুহ্মভূমি

রাঢ়-জনপদের দুইটি বিভাগের মধ্যে সুব্ভ=সুহ্মবিভাগ সমধিক প্রসিদ্ধ এবং সম্ভবত প্রাচীনতর। সুহ্ম-জনদের উল্লেখ আছে মহাভারতে, কর্ণ ও ভীমের দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে। কর্ণদেব সুহ্ম, পুণ্ড্র ও বঙ্গজনদের যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। ভীমের দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গেও ভীমকর্তৃক মুদ্গগিরি, পুণ্ড্র, বঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, এবং সুহ্মজন ও রাজাদের পরাজয়ের কথা আছে। দশকুমারচরিত-গ্রন্থ কিন্তু সুহ্ম ও তাম্রলিপ্তকে পৃথক

জনপদ বলিতেছে না, বরং তাম্রলিপ্তিকে সুহ্মের অন্তর্গত বলিয়া বলিতেছে। রঘুবংশে রঘুর দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে মহোদধির তালিবনশ্যামোপকণ্ঠে সুহ্মদের পরাজয়ের উল্লেখ আছে। এই শ্লোকদ্বয়ের অব্যবহিত পূর্বেই আর একটি শ্লোক আছে :

সে সেনা মহতীং কর্ষন পূর্বসাগর গামিনীম্।
বভৌ হরজটাভ্রষ্টাং গঙ্গামিব ভাগীরথঃ॥ (৪।৩২)

এই শ্লোকটির ব্যঞ্জনা হইতে মনে হয়, রঘু গঙ্গা-ভাগীরথীর পশ্চিম উপকূল বাহিয়া দক্ষিণসাগরের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন, এবং ইহারই দক্ষিণ অংশের ভূভাগ সুহ্ম-নামে পরিচিত ছিল। ধোয়ী কবির পবনদূতেও গঙ্গা-তীরবর্তী সুহ্মের উল্লেখ আছে এবং এই দেশে গঙ্গা-যমুনা সংগমে ত্রিবেণী অতিক্রম করিয়া লক্ষ্মণসেনের রাজধানী বিজয়-পুরের পথের ইঙ্গিত আছে। এই গঙ্গা-যমুনা সংগম ও ত্রিবেণী বর্তমান হুগলী জেলায়। এইসব সাক্ষ্য-প্রমাণ হইতে অনুমান করা চলে যে, গঙ্গা-ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্তী দক্ষিণতম ভূখণ্ড, অর্থাৎ বর্তমান বর্ধমানের দক্ষিণাংশ, হুগলীর বহুলাংশ এবং হাবড়া জেলাই প্রাচীন সুহ্ম-জনপদ ; মোটামুটি ইহাই পরবর্তী কালের দক্ষিণ-রাঢ়। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ অবশ্য বলিতেছেন, সুহ্ম এবং রাঢ়া এক এবং সমার্থক। হয়তো কখনও সুহ্মজনপদের প্রভাবসীমা সমস্ত রাঢ়দেশেই বিস্তৃত লাভ করিয়াছিল, যেমন দশকুমারচরিত-মতে এক সময় সেই প্রভাব তাম্রলিপ্তিতেও বিস্তৃত হইয়াছিল ; কিন্তু সাধারণত সুহ্মভূমি রাঢ়াভূমির দক্ষিণতম অংশ বলিয়াই পরিচিত ছিল। বৌদ্ধ পালি গ্রন্থ সংযুক্ত-নিকায় এবং তেলপত্ত-জাতকেও সুম্ভ বা সুহ্মজনদের উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহাদের অবস্থিতির কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যায় না।

প্রসুহ্ম সুহ্মোত্তর, ব্রহ্ম, ব্রহ্মোত্তর, বজ্জভূমি

মহাভারতে ভীমের দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে সুহ্মজন এবং সমুদ্রশায়ী অন্যান্য ম্লেচ্ছদের সঙ্গে প্রসুহ্ম-নামীয় আর একটি কোমের উল্লেখ আছে। প্রাচীন সাহিত্যে সুহ্ম-জনপদের উল্লেখ বারবার পাওয়া যায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে সুহ্মজন-সংপৃক্ত আর একটি কোমের নামও শোনা যায় ; তাহার নাম ব্রহ্ম বা ব্রহ্মোত্তর। ব্রহ্মোত্তর খুব সম্ভব আইন-ই-আকবরী-গ্রন্থের বরম্‌হত্তর। কেহ কেহ মনে করেন ব্রহ্মোত্তর পাঠ যথার্থত সুহ্মোত্তর (সুহ্মের উত্তরে যে জনপদ) হওয়া উচিত। প্রসুহ্ম এবং সুহ্মোত্তর কোন্ জনপদ তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় নাই ; তবে অনুমান হয়, দুইটি নামই একই জনপদের দ্যোতক, এবং এই জনপদটি সুহ্মজনপদের উত্তরে, আচারাঙ্গ-সূত্রে যে ভূমিকে বলা হইয়াছে বজ্জ বা বজ্রভূমি, অর্থাৎ রাঢ়ের উত্তরাংশ। এই বজ্রভূমিই বোধহয় কাব্যমীমাংসা এবং পবনদূত-গ্রন্থের ব্রহ্ম (ভূমি) বা ব্রহ্মোত্তর (সমাসবদ্ধ ব্রহ্ম ও উত্তর)-জনপদ। এই ব্রহ্ম যে রাঢ়েরই একটি অংশ তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় পবনদূতে ; এই গ্রন্থে সুহ্ম

ও ব্রহ্ম দুটি জনপদই গঙ্গার পশ্চিমতীরে অবস্থিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। শুধু তাহাই নয়, ব্রহ্ম যে সুহ্মের উত্তরে এবং ত্রিবেণী সংগম এবং বিজয়পুর যে ব্রহ্মভূমিরই অন্তর্গত তাহাও বলা হইয়াছে। খুব সম্ভব মহাভারতের প্রসুহ্ম এই ব্রহ্ম বা ব্রহ্মোত্তরেরই নামান্তর মাত্র। মার্কণ্ডেয় পুরাণের ব্রহ্মোত্তর যদি সুহ্মোত্তরও হয় তাহা হইলে তাহারও অর্থ সুহ্মের উত্তরস্থ জনপদ, অর্থাৎ যে-ভূমিকে কাব্যমীমাংসা ও পবনদূতে বলা হইয়াছে ব্রহ্ম, আচারাঙ্গ-সূত্রে বলা হইয়াছে বজ্র, পরবর্তী লিপিতে মোটামুটিভাবে যে দেশকে বলা হইয়াছে উত্তর-রাঢ়। যাহাই হউক, রাঢ়দেশে সুহ্মজনপদের উত্তরে যে ব্রহ্ম-নামে একসময়ে একটি জনপদ ছিল এ সম্বন্ধে সন্দেহ করা চলে না।

উত্তর-রাঢ়

দিগ্বিজয়প্রকাশ-গ্রন্থে (ষোড়শ শতক) রাঢ়দেশের দক্ষিণসীমায় পাইতেছি দামোদর-নদ—"দামোদরোত্তরভাগে…রাঢ়দেশঃ প্রকীর্তিতঃ"। হয়তো তখন তাম্রলিপ্তজনপদের উত্তর সীমা ছিল দামোদর পর্যন্ত, কিন্তু পূর্ববর্তী সাক্ষ্য এবং লিপি প্রমাণ হইতে মনে হয়, রাঢ়ের দক্ষিণ সীমা দামোদরের আরও দক্ষিণে বিস্তৃত ছিল। নবম-দশম শতক হইতেই রাঢ়ের দুইটি সুস্পষ্ট বিভাগ জানা যাইতেছে—উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ়—প্রাচীনতর কালের মোটামুটি বজ্জ বা ব্রহ্মভূমি ও সুহ্মভূমি। রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলয়-লিপিতে (একাদশ শতকের প্রথম পাদ) উত্তীর-লাঢ়ম (উত্তর-রাঢ়) এবং তক্কণ লাঢ়ম (দক্ষিণ-রাঢ়) নাম একসঙ্গেই পাওয়া যাইতেছে।

উত্তর-রাঢ়ের প্রথম উল্লেখ পাইতেছি আনুমানিক নবম শতকের গঙ্গরাজ দেবেন্দ্র-বর্মণের একটি লিপিতে, এবং তারপর একাদশ শতকের রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলয়-লিপিতে। রাজেন্দ্রচোলের সৈন্য ওড্ডবিষয় (ওড়িশা) এবং কোশলৈনাডু জয় করিয়া, পরে অধিকার করিলেন

> "Tandabutti in whose gardens bees abounded…(land which he acquired) after having destroyed Dharmapala (in) hot battle; Takkanaladam whose fame reached (all) directions, (and which he occupied) after having forcibly attacked Ranasura; Vangala desa where the rain water never stopped, (and from which) Govindachandra fled, having descended (from his) male elephant; elephants of rare strength, women and treasure (which he seized) after having pleased to frighten the strong Mahipala on the field of hot battle with the (noise of the) conches (got) from the deep sea. Uttiraladam (on the shore of) the expansive ocean (producing) pearls [অনুবাদান্তর Uttiraladam, as rich in pearls as the ocean, কিংবা

Uttiraladam, clos: to the sea yielding pearls.] and the Ganga whose waters bearing fragrant flowers dashed against the bathing places."

রাজা ভোজবর্মার বেলাব-লিপিতে উত্তর-রাঢ় এবং তদন্তর্গত সিদ্ধলগ্রামের উল্লেখ আছে। সিদ্ধলগ্রাম বর্তমান বীরভূমের অন্তর্গত সিধলগ্রাম। এই সিদ্ধলগ্রামই পণ্ডিত-মন্ত্রী ভট্ট ভবদেবের জন্মভূমি। তথাকথিত ভুবনেশ্বর-লিপিতে ভবদেব ভট্ট তাঁহার জন্মভূমি সিদ্ধলগ্রামের কথা বলিয়াছেন, এবং রাঢ়ের এই অঞ্চল যে অজলা এবং জাঙ্গলময়, তাহাও ইঙ্গিত করিয়াছেন। রাঢ়ের অজলা ও জাঙ্গলময় এই অঞ্চলে তিনি একটি দীঘি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। বল্লালসেনের নৈহাটি-পট্টোলীতেও উত্তর-রাঢ় এবং তদন্তর্গত বাল্লহিট্ঠা, জলসোথী, খাণ্ডয়িল্লা, অম্বয়িল্লা, এবং মোলাদণ্ডীগ্রামের উল্লেখ আছে। বাল্লহিট্ঠা বর্তমান বর্ধমান জেলার প্রায় উত্তর সীমায় বালুটিয়াগ্রাম (কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত, নৈহাটির ছয় মাইল পশ্চিমে); জলসোথী মুর্শিদাবাদ জেলার জলসোথীগ্রাম (বালুটিয়ার উত্তরে); খাণ্ডয়িল্লা বর্তমান খাবুলিয়া (জলসোথীর দক্ষিণে); অম্বয়িল্লা বর্তমান অম্বলগ্রাম, খাবুলিয়ার পূর্ব-দক্ষিণে ; মোলদণ্ডী বর্তমান মুরুণ্ডি (খাবুলিয়ার পশ্চিমে)। সব ক'টি গ্রামই বর্তমান বর্ধমান-মুর্শিদাবাদ জেলার যোগসীমায়। নৈহাটি-লিপি অনুসারে উত্তর-রাঢ় বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত। কিন্তু লক্ষ্মণসেনের আমলে দেখিতেছি উত্তর-রাঢ়মণ্ডল কঙ্কগ্রামভুক্তির অন্তর্গত হইয়া গিয়াছে ; শক্তিপুর-পট্টোলীতে এই খবর পাওয়া যাইতেছে। এই শাসনে উল্লিখিত উত্তর রাঢ়মণ্ডলের অন্তর্গত যে-সব গ্রামের নাম পাওয়া যাইতেছে তাহাতে প্রমাণ হয় যে, বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার অনেকাংশ উত্তর-রাঢ়ের অন্তর্গত ছিল। য়ুয়ান্-চোয়াঙের কজঙ্গলও এই উত্তর-রাঢ়ে। ভবিষ্যপুরাণের ব্রহ্মখণ্ড অধ্যায়ে ভাগীরথীর পশ্চিমে রাঢ়ীখণ্ড-জাঙ্গল-নামে এক জনপদ এবং তদন্তর্গত বৈদ্যনাথ, বক্রেশ্বর, বীরভূমি প্রভৃতি স্থান এবং অজয় প্রভৃতি নদনদীর উল্লেখ আছে। এই রাঢ়ীখণ্ডজাঙ্গলও উত্তর-রাঢ়েরই অন্তর্গত বলিয়া মনে না করিবার কোনও কারণ নাই। অনুমান হয়, বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তর-পশ্চিমাংশ অর্থাৎ কান্দি মহকুমা, সমগ্র বীরভূম জেলা (সাঁওতালভূমিসহ) এবং বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার উত্তরাংশ, এই লইয়া উত্তর-রাঢ়। মোটামুটি অজয়নদী এই উত্তর-রাঢ়ের দক্ষিণ সীমা এবং দক্ষিণ-রাঢ়ের উত্তর সীমা। উত্তর-রাঢ়ের উত্তর সীমা বোধহয় কোনও সময় গঙ্গা পার হইয়া আরও উত্তরে বিস্তৃত ছিল। জৈন প্রজ্ঞাপনা-গ্রন্থে কোড়ীবর্ষ বা কোটিবর্ষকে রাঢ়ের অন্তর্গত বলা হইয়াছে, তাহা আগেই উল্লেখ করিয়াছি ; ইহারই যেন প্রতিধ্বনি শোনা যাইতেছে ভরতমল্লিকের চন্দ্রপ্রভা-গ্রন্থের "উত্তরগঙ্গ-রাঢ়াম" পদটিতে। কিন্তু, অকাট্য লিপিপ্রমাণ এবং ঐতিহাসিক গ্রন্থে গঙ্গা-ভাগীরথীই রাঢ়ের উত্তরতম সীমা, এ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ তবকাত-ই-নাসিরী'র সাক্ষ্য উল্লেখ করা যাইতে পারে।

দক্ষিণ-রাঢ়

রাজেন্দ্রচোলের সৈন্য ওড্ডবিষয় এবং কোশলৈনাড়ু (দক্ষিণ-কোশল) জয় করিয়া পরে তণ্ডবুত্তি (= দণ্ডভুক্তি = বর্তমান দাঁতন) অধিকার করিয়াছিল, এবং দণ্ডভুক্তির পরেই দক্ষিণ-রাঢ়। দেশগুলির ভৌগোলিক অবস্থিতি সুস্পষ্ট ; দণ্ডভুক্তি এবং বঙ্গের মধ্যবর্তী জনপদ-রাষ্ট্রেই দক্ষিণ-রাঢ় বা তক্কনলাঢ়ম্। দক্ষিণ-রাঢ়ের প্রাচীনতম উল্লেখ মিলিতেছে বাক্‌পতি মুঞ্জের একটি লিপিতে, এবং শ্রীধরাচার্যের ন্যায়কন্দলী-গ্রন্থে (৯৯১-৯২)। ন্যায়কন্দলী-গ্রন্থে আছে ঃ আসীদ্দক্ষিণরাঢ়ায়াং দ্বিজানাং ভূরিকর্মাণাম। ভূরিসৃষ্টিরিতি গ্রামো ভূরিশ্রেষ্ঠিজনাশ্রয়ঃ॥ শ্রীধরের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন দক্ষিণ-রাঢ়ের অধিপতি 'গুণরত্নাকর কায়স্থকুলতিলক' পাণ্ডুদাস। এই পাণ্ডুদাসই পাণ্ডুভূমি-বিহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণমিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে (একাদশ-দ্বাদশ শতক) রাঢ়ের এবং একটি দাক্ষিণী লিপিতে দক্ষিণ রাঢ়ের উল্লেখ আছে ; কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই এই জনপদটিকে গৌড় বা গৌড়দেশান্তর্গত বলা হইয়াছে। মধ্যপ্রদেশের নিমার জেলান্তর্গত মান্ধাতা অঞ্চলের অমরেশ্বর মন্দিরের একটি লিপিতে, এবং মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও (১৫৯৩-৯৪) দক্ষিণ-রাঢ়ের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। শ্রীধর এবং কৃষ্ণমিশ্র দক্ষিণ-রাঢ়ের দুইটি প্রসিদ্ধ গ্রামের নাম করিতেছেন : ভূরিসৃষ্টি বা ভূরিশ্রেষ্ঠিক এবং নবগ্রাম ; আর মুকুন্দরাম বলিতেছেন দামুন্যাগ্রামের কথা, যে দামুন্যা বা দামিন্যা ছিল তাঁহার জন্মভূমি ('শহর সেলিমাবাজ তাহাতে সজ্জনরাজ নিবসে নিয়োগী গোপীনাথ। তাঁহার তালুকে বসি' দামিন্যায় চাষ চষি নিবাস পুরুষ ছয় সাত॥') ভূরিসৃষ্টি বা ভূরিশ্রেষ্ঠিক (যেখানে ছিল অনেক শ্রেষ্ঠীর বাসস্থান = ভূরিশ্রেষ্ঠীজনাশ্রয়) বর্তমান হাওড়া জেলার ভুরসুট (বা ভুরিশিট্ বা ভুরসিট)-গ্রাম। নবগ্রাম বর্তমান হুগলী জেলায়, এবং দামুন্যা দামোদরের পশ্চিমে বর্তমান বর্ধমান জেলায়। স্পষ্টতই দেখা যাইতেছে, বর্তমান হাওড়া এবং হুগলী ও বর্ধমানের অধিকাংশ দক্ষিণ-রাঢ়ের অন্তর্গত। দ্বাদশ শতকের ওড়িশার চোড়গঙ্গরাজাদের আধিপত্য মিধুনপুর (নিঃসন্দেহে, বর্তমান মেদিনীপুর) পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, এবং অনন্তবর্মন চোড়গঙ্গ গঙ্গাতীরে মন্দার রাজকে পরাভূত করিয়া তাঁহার দুর্গনগর আরম্য ধ্বংস করিয়াছিলেন। মিধুনপুর না হউক, মন্দার এবং আরম্য বোধহয় সেই সময় দক্ষিণ-রাঢ়ের অন্তর্গত ছিল। মন্দার নিঃসন্দেহে বর্তমান মন্দারণ বা মদারণ, মধ্যযুগের সরকার মন্দারণ বা গড় মন্দারণ ; আরম্য বর্তমান আরামবাগ। দুইই বর্তমান হুগলী জেলায়।

বর্ধমানভুক্তি, কঙ্কগ্রামভুক্তি

রাঢ়দেশের দুইটি রাষ্ট্রবিভাগের পরিচয় পাওয়া যায়। ষষ্ঠ শতকের মল্লসারুল-লিপি, দশম শতকের ইর্দা-লিপি, লক্ষ্মণসেনের নৈহাটি ও গোবিন্দপুর-লিপিতে বর্ধমান-

ভুক্তির সাক্ষাৎ মেলে। ইর্দালিপিতে দেখিতেছি, দণ্ডভুক্তিমণ্ডল অর্থাৎ দাঁতন পর্যন্ত বর্ধমানভুক্তির সীমা বিস্তৃত; কিন্তু পঞ্চম ষষ্ঠ শতকে বোধহয় দক্ষিণে বর্ধমানভুক্তির এত বিস্তার ছিল না; কারণ, বরাহমিহির গৌড়ক, বর্ধমান ও তাম্রলিপ্তক পৃথক পৃথক জনপদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পাল ও সেন-আমলে দণ্ডভুক্তি-মণ্ডল ছাড়া বর্ধমান-ভুক্তির আরও তিনটি বিভাগ ছিল: উত্তর-রাঢ়, দক্ষিণ-রাঢ়-মণ্ডল এবং পশ্চিম-খাটিকা। বর্ধমানভুক্তির অন্যতম রাষ্ট্রবিভাগ হিসাবে দক্ষিণ-রাঢ়-মণ্ডলের উল্লেখ কোন লিপিতে নাই, কিন্তু এই মণ্ডলটিও যে বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত ছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। যাহাই হউক, এই তিনটি জনপদ-রাষ্ট্রের কথা আগেই বলা হইয়াছে। পাল ও সেন-আমলে ছাড়া দণ্ডভুক্তি সাধারণত তাম্রলিপ্ত জনপদেরই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া অনুমিত; সেইজন্য দণ্ডভুক্তির কথা তাম্রলিপ্ত-প্রসঙ্গেই বলা যাইবে। তবে, এইখানে বলিয়া রাখা চলে যে, ইর্দা-লিপি ছাড়া রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলয়-লিপিতে এবং সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে যথাক্রমে তণ্ডবুত্তি = দণ্ডভুক্তি ও দণ্ডভুক্তি-মণ্ডলের উল্লেখ আছে। দণ্ডভুক্তি বর্তমান মেদিনীপুর (প্রাচীন, মিধুনপুর) জেলার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ; বর্তমান দাঁতন প্রাচীন দণ্ডভুক্তির স্মৃতিবহ। পশ্চিম-খাটিকা যে মোটামুটি বর্তমান হাওড়া জেলা, এবং গঙ্গার পশ্চিম তীরে সে ইঙ্গিত তো আগেই করা হইয়াছে। লক্ষ্মণ-সেনের শক্তিপুর-পট্টোলীতে রাঢ়ের আর একটি বিভাগের খবর পাওয়া যায়; ইহার নাম কঙ্কগ্রামভুক্তি, এবং উত্তর-রাঢ় এই ভুক্তির অন্তর্গত। কঙ্কগ্রাম কাহারও মতে রাজমহল নিকটবর্তী কাঁকজোল, কাহারও মতে মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুর থানার কাগ্রাম। যাহাই হউক শাসনোল্লিখিত স্থানগুলির অবস্থিতি হইতে মনে হয়, বর্তমান মুর্শিদাবাদ এবং বীরভূম জেলার অধিকাংশ এবং সাঁওতাল পরগনারও কিয়দংশ এই কঙ্কগ্রামভুক্তির অন্তর্গত ছিল।

তাম্রলিপ্ত, দণ্ডভুক্তি

মহাভারতে ভীমের দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে তাম্রলিপ্তের উল্লেখ সর্বপ্রথম পাওয়া যায়; পুরাণে তো বারবারই এই জনপদটির দেখা মেলে। বঙ্গ, কর্বট ও সুহ্মজনেরা ছিলেন তাহাদের প্রতিবেশী। জৈন কল্পসূত্র-গ্রন্থে গোদাসগণ নামীয় জৈন সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের অন্যতম শাখার নাম তাম্রলিপ্তি শাখা। জৈন প্রজ্ঞাপনাগ্রন্থেও তামলিত্তি (তাম্রলিপ্তি) বঙ্গজনদের অধিকারে ছিল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। দশকুমারচরিত-গ্রন্থে দামলিপ্ত (তাম্রলিপ্ত) আবার সুহ্মের অন্তর্গত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। জাতকের গল্পে, বৌদ্ধগ্রন্থে বারবার তাম্রলিপ্তির উল্লেখ পাওয়া যায় সুবৃহৎ নৌ-বাণিজ্যের কেন্দ্ররূপে। পেরিপ্লাস-গ্রন্থে, টলেমির বিবরণে, ফাহিয়ান, য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ ও ইৎসিঙের বিবরণে তাম্রলিপ্ত বন্দরের বর্ণনা সুবিদিত। টলেমির সময়ে তাম্রলিপ্ত জনপদের রাজধানীই ছিল তাম্রলিপ্ত

(Tamalites) বন্দর ; সপ্তম শতকে য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ বলিতেছেন, তাম্রলিপ্ত বন্দর সমুদ্রের একটি উপবাহুর তীরে অবস্থিত ছিল near an inlet of sea)। অষ্টম শতকের পর হইতেই তাম্রলিপ্ত বন্দরের সমৃদ্ধির পতন ঘটে, এবং বোধহয় তাহার আগে সপ্তম শতক হইতেই দণ্ডভুক্তিজনপদের নামেই তাম্রলিপ্ত জনপদের পরিচয়। ইহাও হইতে পারে, এই সময় তাম্রলিপ্ত কিছুদিনের জন্য সুহ্মজনপদদ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। যাহাই হউক, ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে বরাহমিহির তাম্রলিপ্তকজনপদকে গৌড়ক (মুর্শিদাবাদ-বীরভূম এবং সম্ভবত পশ্চিম-বর্ধমান ও মালদহ) এবং বর্ধমান হইতে পৃথক জনপদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু সপ্তম শতকে দণ্ডভুক্তি গৌড়-কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্কের করতলগত। সম্প্রতি আবিষ্কৃত শশাঙ্কের মেদিনীপুর-লিপিদুইটিতে দেখিতেছি, দণ্ডভুক্তি বা দণ্ডভুক্তি-দেশ একজন শাসনকর্তার (সামন্ত-মহারাজ সোমদত্ত এবং মহাপ্রতীহার শুভকীর্তি) অধীনে, এবং উৎকলদেশ এই রাষ্ট্রবিভাগের অন্তর্গত। দশম শতকের ইর্দা-লিপিতে দণ্ডভুক্তি-মণ্ডল বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত। একাদশ শতকের প্রথম পাদে রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলয়-লিপিতে তণ্ডবুত্তি বা দণ্ডভুক্তি দক্ষিণ-রাঢ়, বঙ্গালদেশ, এবং উত্তর-রাঢ় হইতে পৃথক জনপদ-রাষ্ট্র ; দ্বাদশ শতকের মধ্যপাদে আবার এই দণ্ডভুক্তি বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত। দণ্ডভুক্তির রাজা পালরাজ রামপালের অন্যতম বিশ্বস্ত বন্ধু এবং সহায়ক ছিলেন।

গৌড়

গৌড়পুর-নামক একটি স্থানের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে পাণিনি-সূত্রে ; কিন্তু এই গৌড়পুর বর্তমান বঙ্গদেশের কোনও স্থান কিনা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। কৌটিল্য বঙ্গদেশের অনেক জনপদেরই খবরাখবর রাখিতেন ; তাঁহার অর্থশাস্ত্রে গৌড়, পুণ্ড্র, বঙ্গ এবং কামরূপে উৎপন্ন অনেক শিল্প ও কৃষিদ্রব্যাদির খবর পাওয়া যায় ; অন্যত্র তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। পাণিনির টীকাকার পতঞ্জলিও গৌড়দেশের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তৃতীয়-চতুর্থ শতকে বাৎস্যায়ন গৌড়দেশের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন ; গৌড়ের নাগরকদের বিলাসব্যসন, নারীদের মৃদুবাক্য ও মৃদু অঙ্গের সবিশেষ পরিচয় তাঁহার ছিল ; বঙ্গ এবং পৌণ্ড্রের সঙ্গেও তাঁহার পরিচয় ছিল। তাহাও যথাস্থানে যথাপ্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে। পুরাণে এক গৌড়দেশের উল্লেখ আছে (যেমন, মৎস্য-পুরাণে), কিন্তু সে গৌড়দেশ কোশলজনপদে বলিয়া অনুমিত হয়। বরাহমিহির (আনুমানিক, ষষ্ঠ শতক) গৌড়ক, পৌণ্ড্র, বঙ্গ, সমতট, বর্ধমান এবং তাম্রলিপ্তক নামে ছয়টি স্বতন্ত্র জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষায় গৌড়ীরীতির খবর পাওয়া যাইতেছে দণ্ডীর কাব্যাদর্শে, রাজশেখরের কাব্যমীমাংসায় ; বস্তুত, প্রাচীন সাহিত্যে গৌড়ের উল্লেখ সুপ্রচুর। কিন্তু সর্বত্র গৌড়দেশের অবস্থিতির ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। বরাহমিহিরের বৃহৎ-সংহিতার উল্লেখ হইতে নিকটা আভাস অবশ্য পাওয়া যাইতেছে, এবং সে আভাস যেন মুর্শিদাবাদ-বীরভূম-

পশ্চিম বর্ধমানের দিকে। মুরারির অনর্ঘরাঘবে (অষ্টম শতক) চম্পা গৌড়জনপদের রাজধানী বলিয়া কথিত হইয়াছে ; এই চম্পা কি ভাগলপুর জেলার প্রাচীন চম্পা না মন্দারণ সরকারের অন্তর্গত বর্ধমান-শহরের উত্তর-পশ্চিমে, দামোদরের বামতীরের চম্পানগরী, বলা কঠিন। অষ্টম শতকের শেষার্ধে (ধর্মপালের প্রায় সমসাময়িক) গৌড়ের রাষ্ট্রাধিকার প্রাচীন অঙ্গদেশে বিস্তৃত ছিল, ইহা একেবারে অসম্ভব নয়। মুদ্গগিরি বা মুঙ্গেরে যে একটি পাল-জয়স্কন্ধাবার ছিল তাহা তো সুবিদিত , তীরভুক্তি বা তিরহুতেও একটি ভুক্তি ছিল। কৃষ্ণমিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে রাঢ়া বা রাঢ়াপুরী এবং ভূরিশ্রেষ্ঠিক গৌড়রাষ্ট্রের অন্তর্গত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। একটি দক্ষিণী লিপিতেও রাঢ়দেশকে গৌড়দেশের অন্তর্ভুক্ত বলা হইয়াছে ; কিন্তু যাদবরাজ প্রথম জৈতুগির মনগোলি লিপিতে আবার লাল (রাঢ়) এবং গোল (গৌড়) পৃথক জনপদ বলিয়া ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কামসূত্রের টীকাকার যশোধর কিন্তু বলিতেছেন, গৌড়দেশ একেবারে কলিঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত। ভবিষ্য-পুরাণের মতে গৌড়দেশের উত্তর সীমায় পদ্মা, দক্ষিণ সীমায় বর্ধমান। এয়োদশ চতুর্দশ শতকের কোনও কোনও জৈনগ্রন্থে জানা যায়, বর্তমান মালদহ জেলার প্রাচীন লক্ষ্মণাবতী গৌড়ের অন্তর্গত ছিল। সমসাময়িক মুসলমান ঐতিহাসিকদের ইঙ্গিতও তাহাই , বস্তুত, লক্ষ্মণাবতী নগরকেই তাঁহারা বলিয়াছেন গৌড় এবং এই গৌড় রাঢ়দেশে। মনে রাখা দরকার লক্ষ্মণাবতী-গৌড় তখন গঙ্গার পশ্চিম বা দক্ষিণ তীরে অবস্থিত ছিল ; গঙ্গা তখন ঐখানে আরও উত্তরে ও পূর্ববাহিনী হইয়া পরে দক্ষিণবাহিনী হইত। ভবিষ্য-পুরাণ বা ত্রিকাণ্ডশেষ গ্রন্থে গৌড়কে (লক্ষ্মণাবতী নগরী ?) যে যথাক্রমে পুণ্ড্র বা বরেন্দ্রীর অন্তর্গত বলা হইয়াছে, তাহা এই কারণেই। শক্তিসংগমতন্ত্রে গৌড়দেশ বঙ্গ হইতে একেবারে ভুবনেশ (ভুবনেশ্বর) পর্যন্ত বিস্তৃত বলিয়া বলা হইয়াছে ; কথাসরিৎসাগরে বর্ধমানকে গৌর (= গৌড়)-জনপদের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বলা হইয়াছে। এক গৌড় ছিল কোশলে (বর্তমান যুক্তপ্রদেশের গোণ্ডা জেলা)। আর এক গৌড়ের খবর পাওয়া যায় শ্রীহট্ট জেলায়, গৌড়ের রাজার সঙ্গে পীর শাহজালালের যুদ্ধকাহিনী-প্রসঙ্গে। রাজতরঙ্গিণী-গ্রন্থে প্রথম পাওয়া যাইতেছে পঞ্চগৌড়ের উল্লেখ, এবং পরে একাধিক গ্রন্থে দেখা যায় গৌড়, সারস্বত, কান্যকুব্জ, মিথিলা এবং উৎকল লইয়া পঞ্চগৌড়। পালসম্রাট ধর্মপাল-দেবপালের সময় গৌড়েশ্বরের রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব বিস্তারের ইতিহাস এই পঞ্চগৌড় নামটির মধ্যে পাওয়া যাইতেছে বলিয়া মনে করিলে বোধহয় কিছু অন্যায় হয় না। আর এক গৌড়-উপনিবেশের খবর পাওয়া যাইতেছে দক্ষিণ ব্রহ্মের পেগু শহরের নিকটবর্তী কল্যাণী লিপিমালায় ; এই লিপিতে গোল বা গৌড়দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু এইসব উল্লেখ ও বিবরণের মধ্যে গৌড়জনপদের সঠিক অবস্থিতি সুস্পষ্ট জানা গেল না ; শুধু এইটুকু বুঝা গেল, মুর্শিদাবাদ-বীরভূমই এই জনপদের আদি কেন্দ্র ;

পরে মালদহ এবং বোধহয় বর্ধমানও এই জনপদের সঙ্গে যুক্ত হয়। বর্তমানের এই কয়টি জেলা লইয়াই প্রাচীন গৌড়। এই গৌড়ের রাষ্ট্রীয় আধিপত্য যখন যেমন বিস্তৃত হইয়াছে—কখনও কলিঙ্গ, কখনও ভুবনেশ্বর—জনপদসীমাও তখন তেমনই বিস্তারিত হইয়াছে। ধর্মপাল-দেবপালের আমলে ভারতীয় ঐতিহাসিক ও জনসাধারণের পঞ্চমুখে শুনা যাইতেছে পঞ্চগৌড়ের কথা ; বাঙ্গালা অর্থই যেন গৌড়।

কর্ণসুবর্ণ

গৌড়ের অবস্থিতি সম্বন্ধে বঙ্গীয় লিপি-প্রমাণ কী আছে দেখা যাইতে পারে ; সমসাময়িক ও নিঃসংশয়ে বিশ্বাসযোগ্য ভিন্প্রদেশী লিপি এবং ইতিবিবরণও এই সম্পর্কে আলোচ্য। ঈশানবর্মণ মৌখরীর হড়াহা লিপিতে (৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দ) গৌড়জনদের বর্ণনা করা হইয়াছে 'গৌড়ান্ সমুদ্রাশ্রয়ান্' বলিয়া। এই কথার সমর্থন পাওয়া যায় একাদশ শতকের গুর্গি-লিপিতে ; এই লিপিতে বলা হইয়াছে, 'the lord of Gauda lies in the watery fort of the sea'। এই উক্তি হইতে মনে হয়, গৌড়জনপদের দক্ষিণ সীমা ষষ্ঠ শতকে সমুদ্র হইতে খুব বেশি দূরে ছিল না। সপ্তম শতকে গৌড়-কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্কের নবাবিষ্কৃত মেদিনীপুর-লিপিদুইটিতে দেখা যাইতেছে, গৌড়-রাষ্ট্রের আধিপত্য সমুদ্রসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত ; উৎকলসহ দণ্ডভুক্তিদেশ গৌড়-রাষ্ট্রসীমার অন্তর্গত বলিয়া এই লিপিদুইটিতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। য়ুয়ান্-চোয়াঙের বিবরণ এবং বাণভট্টের হর্ষচরিতে শশাঙ্কের যে ইতিহাস বর্ণিত আছে তাহাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, শশাঙ্ক ছিলেন গৌড়ের রাজা ; এবং কর্ণসুবর্ণ (= বর্তমান কানসোনা, মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙ্গামাটি অঞ্চল) ছিল তাঁহার রাষ্ট্রকেন্দ্র বা রাজধানী, অর্থাৎ মুর্শিদাবাদ অঞ্চলই ছিল গৌড়ের কেন্দ্রভূমি।

প্রতীহার-রাজ ভোজদেবের গওআলিয়র-লিপিতে দেখিতেছি, পালরাজ [ধর্মপাল]কে বলা হইয়াছে 'বঙ্গপতি' দ্বিতীয় নাগভট যখন চক্রায়ুধকে পরাজিত করেন তখন ধর্মপাল বঙ্গপতি কিন্তু অন্যত্র সর্বত্রই সকল লিপিতেই পালরাজারা 'গৌড়েশ্বর'। রাষ্ট্রকূটরাজ প্রথম অমোঘবর্ষের (৮১৪-৮৭৭) কান্হেরী-লিপিতে গৌড়জনপদ গৌড়বিষয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যাহাই হউক, ধর্মপালের রাজত্বকাল হইতেই গৌড়েশ্বর উপাধি পালরাজাদের নাম-ভূষণরূপে ব্যবহৃত হইতে থাকে, যদিও তখন বঙ্গজনপদ পৃথক স্বতন্ত্রভাবে বিদ্যমান এবং পালেরা বঙ্গেরও অধিপতি। রাজা অমোঘবর্ষের নীলগুণ্ড-লিপিতে বঙ্গজনপদ-রাষ্ট্রের এবং কর্করাজের বড়োদা পট্টোলীতে (৭১১-১২) একই সঙ্গে বঙ্গ ও গৌড়জনপদ-রাষ্ট্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ভট্ট ভবদেবের ভুবনেশ্বর-লিপিতেও গৌড়নৃপ এবং বঙ্গরাজ পৃথকভাবে উল্লিখিত হইয়াছেন। সেনরাজ বিজয়সেনের সময়ে গৌড়রাষ্ট্র স্বতন্ত্র রাজার করায়ত্ত ছিল, কিন্তু বিজয়সেন তাঁহাকে পরাভূত করিয়াছিলেন (দেওপাড়া-

লিপি)। আবার বল্লালসেনের আমলে বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত উত্তর-রাঢ়মণ্ডল সেন-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল (নৈহাটি-লিপি)। লক্ষ্মণসেনের মাধাইনগর-লিপিতে দেখিতেছি, তিনি সহসা গৌড় রাজ্য আক্রমণ ও জয় করিয়াছিলেন, এবং বোধহয়, এইজন্যই এই লিপিতে তিনি গৌড়েশ্বর বলিয়া অভিহিত হইতেছেন। এইসব প্রমাণ হইতে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত করা চলে যে, গৌড় বঙ্গ ও পুণ্ড্রবর্ধন হইতে স্বতন্ত্র জনপদ, এবং আমরা মোটামুটি পশ্চিম-বঙ্গ বলিতে (অর্থাৎ মালদহ-মুর্শিদাবাদ বীরভূম বর্ধমানের কিয়দংশ) এখন যাহা বুঝি তাহাই ছিল প্রাচীন গৌড়জনপদ। দক্ষিণ-রাঢ়মণ্ডল বা তাম্রলিপ্ত-দণ্ডভুক্তি বোধহয় গৌড়জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, যদিও গৌড়ের রাষ্ট্রসীমা কখনও কখনও উৎকল-দণ্ডভুক্তি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এবং গৌড় বলিতে এক এক সময় হয়তো সমগ্র বাঙলাদেশকেও বুঝাইত।

প্রাচীন জনপদ ও বাঙলা নামকরণ

প্রাচীন বাঙলার বিভিন্ন জনপদগুলি সম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে মোটামুটি ভাবে, একটু শিথিল ভাবেই, কয়েকটি কথা বলা চলে। প্রাচীনতম ঐতিহাসিক কাল হইতে আরম্ভ করিয়া আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতক পর্যন্ত প্রাচীন বাঙলাদেশ পুণ্ড্র, গৌড়, রাঢ়, সুহ্ম, বজ্র (অথবা ব্রহ্ম), তাম্রলিপ্তি, সমতট, বঙ্গ প্রভৃতি জনপদে বিভক্ত। এই জনপদগুলি প্রত্যেকেই স্ব-স্বতন্ত্র ও পৃথক ; মাঝে মাঝে বিরোধ-মিলনে একের সঙ্গে অন্যের যোগাযোগের সম্বন্ধও দেখা যায়, কিন্তু প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র-পরায়ণ। সপ্তম শতকের প্রথম পাদে শশাঙ্ক গৌড়ের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন এবং বর্তমান পশ্চিম-বঙ্গ—মালদহ-মুর্শিদাবাদ হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে উৎকল পর্যন্ত—সর্বপ্রথম এক রাষ্ট্রীয় ঐক্য লাভ করে। কিন্তু বর্তমান পশ্চিম-বঙ্গের বিভিন্ন জনপদগুলি এক নাম লইয়া এক ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হইবার সূচনা বোধহয় দেখা দেয় শশাঙ্কের আগেই, খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি হইতে (হড়াহা-লিপির 'গৌড়ান্')। শশাঙ্ক তাহাকে পূর্ণ পরিণতি দান করেন। এই সময় হইতেই গৌড় নামটির ঐতিহাসিক ব্যঞ্জনা যেন অনেকখানি বাড়িয়া গিয়াছিল ; এবং পাল-রাজারা বঙ্গপতি হওয়া সত্ত্বেও গৌড়াধিপ, গৌড়েন্দ্র, গৌড়েশ্বর-নামে পরিচিত হইতেই ভালবাসিতেন। লক্ষ্মণসেন সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। যাহাই হউক, শশাঙ্কের পর হইতে, অর্থাৎ মোটামুটি অষ্টম শতক হইতেই, বাঙলাদেশের তিনটি জনপদই যেন সমগ্র বাঙলাদেশের সমার্থক হইয়া উঠে—পুণ্ড্র বা পুণ্ড্রবর্ধন, গৌড় ও বঙ্গ। এ কথা সত্য, আগে যেমন পরেও তেমনই, দেশে বিভিন্ন জনপদ এবং তাহাদের নামস্মৃতি ছিলই, নূতন নূতন স্থানের বিভাগীয় নামের উদ্ভবও হইতেছিল (যেমন, পূর্ব ও দক্ষিণ বাঙলা অঞ্চলে বঙ্গাল,

হরিকেল, চন্দ্রদ্বীপ, সমতট ; উত্তর-বঙ্গ অঞ্চলে বরেন্দ্রী ; তাম্রলিপ্তি অঞ্চলে দণ্ডভুক্তি ; পশ্চিম বাঙলা অঞ্চলে রাঢ়ের উত্তর ও দক্ষিণ বিভাগ) এবং এইসব বিভাগের আবার নূতন নূতন উপবিভাগও নূতন নূতন নাম লইয়া দেখা দিতেছিল। কিন্তু আর সমস্তই যেন এই তিনটি জনপদের কাছে ম্লান বলিয়া মনে হয় ; আর সকলেই যেন ধীরে ধীরে ইহাদের মধ্যেই নিজেদের সত্তা বিলোপ করিয়া দিতেছিল। রাঢ়ের মতন প্রাচীন জনপদও যেন ক্রমশ গৌড়-নামের মধ্যেই বিলীন হইয়া যাইতেছিল। শশাঙ্ক এবং পাল-রাজারা সমগ্র পশ্চিম-বঙ্গের অধিকারী হইয়াও নিজেদের রাঢ়াধিপতি বা রাঢ়েশ্বর না বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিলেন গৌড়াধিপ এবং গৌড়েশ্বর বলিয়া, এবং ভিন্-প্রদেশীরাও তাহা মানিয়া লইল। হর্ষচরিত ও রাজতরঙ্গিণী-গ্রন্থ এবং নবম শতকের ভিন্-প্রদেশী লিপি-গুলিই তাহার প্রমাণ। পুণ্ড্র-বরেন্দ্রী সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। পুণ্ড্র-বরেন্দ্রীর স্মৃতি পুণ্ড্রবর্ধনের মধ্যে বাঁচিয়া ছিল সেন আমলের প্রায় শেষ পর্যন্ত ; কিন্তু এই পুণ্ড্রও যেন তাহার স্বতন্ত্র নামসত্তা গৌড়ের মধ্যে বিসর্জন দিতে যাইতেছিল ; একজন পাল-রাজা যদি বা একবার অন্তত বঙ্গপতি বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন, পুণ্ড্রাধিপ বা পুণ্ড্র-বর্ধনেশ্বর বা বরেন্দ্রী-অধিপতি বলিয়া কোথাও তাঁহাদের উল্লেখ করা হয় নাই, যদিও বরেন্দ্রী ছিল তাঁহাদের জনকভূমি বা পিতৃভূমি। ইহার ঐতিহাসিক ইঙ্গিত লক্ষ্য করিবার মতন। পাল এবং সেন-রাজাদের লক্ষ্য ও আদর্শ ছিল গৌড়েশ্বর বলিয়া পরিচিত হওয়া। বঙ্গপতি যে মুহূর্তে গৌড়ের অধিপতি সেই মুহূর্তেই তিনি গৌড়েশ্বর ; লক্ষ্মণসেন যে মুহূর্তে গৌড় অধিকার করিলেন সেই মুহূর্তে তিনিও হইলেন গৌড়েশ্বর। শশাঙ্কের সময় হইতেই একটি মাত্র নাম লইয়া প্রাচীন বাঙলার বিভিন্ন জনপদগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করিবার যে চেষ্টার সজ্ঞান সূচনা দেখা দিয়াছিল পাল ও সেন-রাজাদের আমলে তাহা পূর্ণ পরিণতি লাভ করিল, যদিও বঙ্গ তখনও পর্যন্ত আপন স্বতন্ত্র-জনপদপ্রতিষ্ঠা বজায় রাখিয়াছে। এক গৌড় নাম লক্ষ্য ও আদর্শ হওয়া সত্ত্বেও বঙ্গ নাম তখনও প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে বিদ্যমান ; পুণ্ড্র পুণ্ড্রবর্ধনের রাষ্ট্রসত্তা আছে, কিন্তু স্বতন্ত্র পৃথক জনপদ-সত্তা তখন আর নাই। পরবর্তী কালেও গৌড়-নামে বাঙলাদেশের কিয়দংশের জনপদ-সত্তা বুঝাইবার চেষ্টা হইয়াছে ; বাঙলার বাহিরে বাঙালী মাত্রেই গৌড়বাসী বা গৌড়ীয় বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, এমন প্রমাণও দুর্লভ নয়। ঔরংজীবের আমলে সুবা বাঙলার যে অংশ নবাব সায়েস্তা খাঁর শাসনাধীন ছিল তাহাকে বলা হইত গৌড়মণ্ডল। উনবিংশ শতকে যখন মধুসূদন দত্ত মহাশয় লিখিয়াছিলেন :

> "রচিব এ মধুচক্র গৌড়জন যাহে
> আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি"

তখন গৌড়জন বলিতে তিনি সমগ্র বাঙলাদেশের অধিবাসীকেই বুঝাইয়াছিলেন।

কিন্তু গৌড় নাম লইয়া বাঙলার সমস্ত জনপদগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করিবার যে চেষ্টা

শশাঙ্ক, পাল ও সেন-রাজারা করিয়াছিলেন সে চেষ্টা সার্থক হয় নাই ; গৌড় নামের ললাটে সেই সৌভাগ্য অঙ্কিত বোধহয় ছিল না। সেই সৌভাগ্যলাভ ঘটিল বঙ্গ নামের, যে বঙ্গ ছিল আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক হইতে ঘৃণিত ও অবজ্ঞাত, এবং যে বঙ্গ নাম ছিল পাল ও সেন-রাজাদের কাছে কম গৌরব ও আদরের। কিন্তু, সমগ্র বাঙলাদেশের বঙ্গ নাম লইয়া ঐক্যবন্ধ হওয়া হিন্দু আমলে ঘটে নাই ; তাহা ঘটিল তথাকথিত পাঠান-আমলে এবং পূর্ণ পরিণতি পাইল আকবরের আমলে, যখন সমস্ত বাঙলাদেশ সুবা বাঙলা নামে পরিচিত হইল। ইংরাজ আমলে বাঙলা নাম পূর্ণতার পরিচয় ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, যদিও আজিকার বাঙলাদেশ আকবরী সুবা বাঙলা অপেক্ষা খর্বীকৃত।

তৃতীয় অধ্যায়ের পাঠনির্দেশ

এই অধ্যায়ে ব্যবহৃত তথ্যাদির উৎস লিপিমালা তত নয় যত সুবিপুল প্রাচীন সংস্কৃত-পালি-প্রাকৃত সাহিত্য ও মধ্যযুগীয় বাঙলা পুঁথিপত্র। এইসব নানা গ্রন্থের নানা জায়গায় টুকরো-টাকরা নানা খবর ইতস্তত প্রকীর্ণ হয়ে আছে। পাঠপঞ্জীতে সমস্ত উৎসের উল্লেখ সম্ভব নয়; দু'চারটি প্রধান প্রধান উৎসের আভাসমাত্র দেওয়া হচ্ছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, জৈন আচারাঙ্গসূত্র, বৌদ্ধ আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, যশোধরের জয়মঙ্গল টীকাসহ বাৎস্যায়নের কামসূত্র, পাণিনির সূত্রাবলী, কালিদাসের রঘুবংশ, বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতা, রাজশেখরের কাব্যমীমাংসা ও কর্পূরমঞ্জরী, দশকুমারচরিত, কথাসরিৎসাগর, ক্ষেমেন্দ্রের দেশোপদেশ, কহ্লনের রাজতরঙ্গিণী, বায়ু-মৎস্য মার্কণ্ডের পুরাণ, মহাভারতের বনপর্ব ও সভাপর্ব, বৃহদ্ধর্ম ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, হেমচন্দ্রের অভিধান চিন্তামণি, ধোয়ীর পবনদূত, সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত, শ্রীধরদাস-সংকলিত সদুক্তিকর্ণামৃত, বৌদ্ধ চর্যাগীতি প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে ছোট বড় নানা তথ্য এই অধ্যায়ে কাজে লাগানো হয়েছে। কিছু কিছু তথ্য মধ্যযুগীয় গ্রন্থ থেকেও আহরণ করা হয়েছে, যেমন মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল, বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল, কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত, আইন-ই-আকবরী, বাহারীস্তান-ঘায়েবী, তবকাৎ-ই-নাসিরী ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে। প্রাচীন গ্রীক ও চীনা ভাষায় রচিত নানা বৃত্তান্ত ও বিবরণ থেকেও প্রচুর তথ্যাদি আহরণ করা হয়েছে, যেমন Periplus of the Erythrean Sea, টলেমির Indika, মেগাস্থিনিস, এরিয়ান, ডায়োডোরাস প্রভৃতি গ্রীক লেখকদের বিবরণ, ফা-হিয়েন-য়ুয়ান্ চোয়াঙ-ইৎসিং প্রভৃতি চীনা পরিব্রাজকদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত। যাই হোক, নিচের তালিকাটিতে এমন কয়েকটি ইংরেজি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হচ্ছে যেগুলি আমি ব্যবহার করেছি এবং যে-সব বইতে বা টুকরো রচনায় এক জায়গায় একত্রে যথেষ্ট অর্থবহ তথ্যের সন্ধান মেলে।

Berry, J. W. E., The Waterways in East Bengal, in Amrita Bazar Patrika daily, 15 June, 1938.

Bhattasali, N. K., Antiquity of the Lower Ganges, in Science and Culture, VII, 1941, pp. 288-89.

Chakravarti, Manomohan, Notes on the Geography of Old Bengal, in Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1908, p. 267 ff.

Notes on Gaur and other places in Bengal, in Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1909, p. 199 ff.

Dasgupta, J. N. Bengal in the sixteenth century, Calcutta University.

Datta, Kalidas, Antiquity of Khadi, Varendra Research Society Monograph, Rajsahi.

District Gazette r of the 24 Parganas, ed by O'Mailey, Calcutta, 1914.

Hunter, W W., Statistical account of Bengal, 20 vols. London, 1875-77

Legge, J., A record of the Buddhistic Kingdoms : being an account by the Chinese Monk Fa-hien ..Oxford, 1886.

Mazumdar, R. C, Physical features of ancient Bengal, in D R Bhandarkar Volume, Calcutta.

Mazumdar, R. C. (ed.), History of Bengal, I, Chap, I, Dacca, 1943.

Mazumdar, S. C., Rivers of the Bengal delta, Calcutta University.

McCrindle J. W., Ancient India as described by Megasthenes and Arrian, London, 1877.

Mukherjee, Radha Kamal, Changing face of Bengal, Calcutta Univ rsity.

Pargiter, F. E., Ancient countries in Eastern India, in Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1897, p. 85 ff.

Periplus of the Erythrean Sea, *ed.* and *trans.* by Wilfred H. Schoff, Longmans, New York.

Ptolemy, Ancient India, *ed.* and *trans.* by McCrindle, Introduction by S. N Majumdar, Calcutta.

Raychaudhuri, H. C, Studies in Indian antiquities, Sec. on Geography, Calcutta University.

Rennell, J., Memoir of a map of Hindoostan, London, 1783.

Sen, P C., Some janapadas of ancient Radhā, in Indian Historical Quarterly, VIII, p. 521 ff.

Takakusu, J. A., Record of the Buddhist religion...by I-tsing, Oxford, 1896.

Watters, T, On Yuan Chwang's Travels in India, II, London, 1905.

চতুর্থ অধ্যায়

ধন-সম্বল

১

যুক্তি

সমাজ-সংস্থানের বস্তু-ভিত্তি হইতেছে ধন। এই ধন যে শুধু ব্যক্তির পক্ষে, তাহার জীবন-ধারণ, অশন-বসন, শিক্ষা-দীক্ষা, ধর্ম-কর্মের জন্য অপরিহার্য তাহা নয়, গোষ্ঠী ও সমাজের পক্ষেও ইহা সমভাবে অপরিহার্য। সমাজ-নিরপেক্ষ পারত্রিক মঙ্গলের জন্য, অথবা তপশ্চর্যায় বিশুদ্ধ ধর্মজীবন যাপনের জন্য কোনও উদ্দেশ্যে সমাজের বাহিরে একান্ত ভাবে একক জীবন যাঁহারা যাপন করেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এমন মুক্ত পুরুষ হয়তো আছেন যাঁহারা কোনো ভাবেই ধন কামনা করেন না, অশন-বসনের ও কামনার ঊর্ধ্বে যাঁহাদের স্থান। তাঁহারা সমাজ-ইতিহাসের আলোচনার বিষয় নহেন। আমরা তাঁহাদের কথাই বলিতেছি যাঁহারা জীবনের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখে, জীবনের বিচিত্র টানাপোড়েনে নিত্য আন্দোলিত, ঐহিক জীবনের ক্ষুৎপিপাসায়, শীতাতপে পীড়িত এবং সামাজিক নানা বিধি-বিধান প্রয়োজন-আয়োজন দ্বারা শাসিত। সমাজধর্মী এই যে ব্যক্তি তাঁহার দৈনন্দিন জীবনে ধন অপরিহার্য বস্তু; এই ধন বলিতে শুধু মুদ্রা বুঝায় না, টাকা-আনা-পয়সা বুঝায় না, এ কথা আজকাল আর কাহাকেও বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। ব্যক্তির যেমন, সমাজেরও তেমনই; ধন ছাড়া কোনও দেশের কোনও বিশেষ কালের সমাজের ব্যবসা-বাণিজ্য কল্পনাই করিতে পারা যায় না; ধন ছাড়া সমাজের রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালিত হইতে পারে না; কারণ, যাঁহারা এই রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনা করিবেন তাঁহাদিগকে তাঁহাদের কায়িক অথবা মানসিক শ্রমের বিনিময়ে নিজেদের ভরণ-পোষণের, শিক্ষা-দীক্ষার, ধর্ম-কর্মের, আরাম-বিলাসের জন্য বেতন দিতে হইবে, তাহা শস্য দিয়া হউক, মুদ্রা দিয়া হউক, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দিয়া হউক, ভূমি দিয়া হউক, অথবা অন্য যে-কোনও উপায়েই হউক। শুধু রাষ্ট্রের কথাই বা বলি কেন, ধর্ম, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি, কিছুই এই ধন ছাড়া চলিতে পারে না, এবং সমাজ সংস্থানের যে-কোনও ব্যাপারেই এ কথা সত্য।

নানা বর্ণ, নানা জাতি এবং নানা শ্রেণীর অগণিত ও অলিখিত জনসমষ্টি লইয়া প্রাচীন বাঙলার যে সমাজ, তাহার পরিকল্পনা এবং সংস্থানে যে-ধন প্রয়োজন হইত, তাহা আসিত কোথা হইতে? একটু ভাবিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে, যাঁহারা রাজসরকারে চাকরি করিতেন, লেখমালায় যাঁহাদের বলা হইয়াছে রাজপাদপোজীবী, তাঁহারা ধন উৎপাদন করিতেন না, উৎপাদিত ধনের অংশ মাত্র ভোগ করিতেন, শ্রম ও বুদ্ধির বিনিময়ে। শিক্ষাবৃত্তি ছিল যাঁহাদের, ধর্মানুষ্ঠানের পুরোহিত ছিলেন যাঁহারা, সমাজের

তথাকথিত হেয় কর্ম ইত্যাদি যাঁহারা করিতেন, তাঁহারাও যতটুকু পরিমাণে নিজ নিজ বিশেষ বৃত্তির মধ্যে আবদ্ধ থাকিতেন ততটুকু পরিমাণে ধনোৎপাদনের দায় ও কর্তব্য হইতে মুক্ত ছিলেন। কিন্তু, উৎপাদিত ধনের অংশ তাঁহারা ভোগ করিতেন, শ্রম ও বুদ্ধির বিনিময়ে, নিজ নিজ সুযোগ ও অধিকার অনুযায়ী। সোজাসুজি প্রত্যক্ষ ভাবে ধনোৎপাদন ইঁহারা কেহই করেন না বটে, তবে পরোক্ষ ভাবে ধনোৎপাদনে সাহায্য সকলকেই কিছু না কিছু করিতে হয়, কোনও না কোনও উপায়ে। সমাজ বিবর্তনের ইতিহাসের সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারাই এ কথা জানেন।

তাহা হইলেই প্রশ্ন দাঁড়াইতেছে, ধনোৎপাদনের উপায় কী কী? প্রাচীন বাঙলায় দেখিতেছি, ধনোৎপাদনের তিন উপায়: কৃষি, শিল্প, এবং ব্যবসা-বাণিজ্য। ইহাদের মধ্যে কৃষি ও বাণিজ্যই প্রধান। আজ পর্যন্তও বাঙলাদেশে কৃষিই প্রধান ধন-সম্বল, তার-পরেই শিল্প। এই কৃষি ও শিল্পজাত জিনিসপত্র লইয়া দেশে-বিদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে উৎপাদিত ধনের বৃদ্ধি এবং দেশের বাহির হইতে নূতন ধনের আগমন হইত। এই তিন উপায়ে আহৃত যে ধন তাহাই প্রাচীন বাঙলার ধন-সম্বল। এবং এই ধন-সম্বলের উপরই সমাজ, রাজা, রাষ্ট্র, ধর্ম, শিক্ষা, শিল্প, সংস্কৃতি সবকিছুর প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ।

২

উপাদান

কিন্তু এই ধন-সম্বলের কথা বলিবার আগে আমাদের ঐতিহাসিক উপাদান সম্বন্ধে দু'একটি কথা আলোচনা করিয়া লওয়া দরকার। আমাদের প্রধান উপাদান লেখমালা, এবং প্রাচীন বাঙলার সর্বপ্রাচীন লেখমালার তারিখ আনুমানিক খ্রীষ্ট-পূর্ব তৃতীয় হইতে দ্বিতীয় শতকের মধ্যে। বগুড়া জেলার মহাস্থানে প্রাপ্ত এই সুপ্রাচীন প্রস্তর-লেখখণ্ডটিতে প্রাচীন বাঙলার ধন-সম্বলের একটি প্রধান উপকরণের সংবাদ পাওয়া যায়। এই উপকরণটি ধান, কৃষিজাত দ্রব্যাদির মধ্যে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান। এই লেখখণ্ডটি ছাড়া, পঞ্চম হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত বাঙলাদেশ সম্পর্কিত প্রচুর লিপির সংবাদ আমরা জানি, কিছু কিছু প্রাচীন গ্রন্থের উপাদানও আমাদের অজ্ঞাত নয়, অথচ এই সর্বপ্রাচীন মহাস্থান-লেখখণ্ডটি এবং আরও দুই চারিটি তাম্রশাসন ছাড়া বাঙলাদেশের প্রধান উৎপন্ন ধন যে ধান-লিপিতে সে উল্লেখ কোথাও নাই বলিলেই চলে। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে অবশ্য বলা হইয়াছে, বরেন্দ্রীর লক্ষ্মীশ্রী দৃষ্টিগোচর হইত নানা প্রকার উৎকৃষ্ট ধান্যক্ষেত্রের কমনীয় রূপে অর্থাৎ বরেন্দ্র-ভূমিতে (উত্তর-বাঙলায়) নানাপ্রকারের খুব ভাল ধান জন্মাইত, এই ইঙ্গিত রামচরিতে পাওয়া যাইতেছে। অথচ, ইহা তো সহজেই অনুমেয় যে, আজও যেমন অতীতেও তেমনি

ধান্যই ছিল শুধু বরেন্দ্রভূমির নয়, সমগ্র বাঙলাদেশেরই প্রধান ধন-সম্বল। শুধু ধান সম্বন্ধেই নয়, অন্যান্য অনেক কৃষি ও শিল্পজাত বা খনিজ দ্রব্যের উল্লেখই আমাদের ঐতিহাসিক উপাদানে পাওয়া যায় না। কাজেই, আমাদের এই বিবরণীতে যে-সব উপকরণের উল্লেখ নাই, অথচ যাহা উৎপাদিত ধন হিসাবে বর্তমান ছিল বলিয়া সহজেই অনুমান করা যায়, তাহা প্রাচীন বাঙলায় ছিল না, এ কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কার্পাস বস্ত্র ও রেশম বস্ত্র যে বাঙলার প্রধান শিল্পজাত দ্রব্য ছিল, এবং সুদূর মিশর ও রোমদেশ পর্যন্ত তাহা রপ্তানি হইত, সর্বত্র তাহার আদরও ছিল এ কথা আমরা খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকে অজ্ঞাত-নামা গ্রন্থকার বর্ণিত Periplus of the Erythrean Sea অথবা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র কিংবা চর্য গীতি-গ্রন্থ হইতে কিছু কিছু জানিতে পারি; অথচ, এ-যাবৎ বাঙলাদেশ-সম্পর্কিত যত লেখমালার খবর আমরা জানি কোথাও তাহার উল্লেখ নাই। উদাহরণ দিবার জন্য ধান্য ও বস্ত্র-শিল্পের উল্লেখ করিলাম মাত্র, তবে অনেক খনিজ, কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের সম্বন্ধেই এ কথা বলা যাইতে পারে। কাজেই অনুল্লেখের যুক্তি অন্তত এক্ষেত্রে অনস্তিত্বের দিকে ইঙ্গিত করে না। কৃষি ও শিল্পের তদানীন্তন অবস্থায়, প্রাচীন বাঙলার তদানীন্তন ভূমি-ব্যবস্থায়, সমাজিক পরিবেশ ও জলবায়ু এবং নদনদীর সংস্থানে যে-সব দ্রব্য উৎপন্ন হওয়া স্বাভাবিক তাহা সমস্তই উৎপাদিত হইত, এই অনুমানই যুক্তিসংগত, তবু ঐতিহাসিক বিবরণ লিখিতে বসিয়া কেবলমাত্র সেইসব উপকরণই বিবৃত করা যাইতে পারে যাহার উল্লেখ অবিসংবাদিত উপাদানের মধ্যে পাওয়া যায়, এবং যাহার উল্লেখ না থাকিলেও অস্তিত্বের অনুমান প্রমাণের অনুরূপ মূল্য বহন করে। একটি উদাহরণ দিলেই আমার বক্তব্য পরিষ্কার হইবে। তক্ষণ অথবা স্থাপত্য শিল্পের কোন উল্লেখ আমরা আমাদের জ্ঞাত উপাদানের মধ্যে পাই না, যদিও তিব্বতী লামা তারানাথ তাঁহার বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে ধীমান্ ও বীটপলো-নামে বরেন্দ্রভূমির দুই খ্যাতনামা শিল্পীর উল্লেখ করিয়াছেন, এবং বিজয়সেনের দেওপাড়া তাম্রশাসনে "বারেন্দ্রক শিল্পিগোষ্ঠীচূড়ামণি রাণক শূলপাণি"র উল্লেখ আছে। ঠিক তেমনই স্বর্ণকার অথবা রৌপ্যকারের উল্লেখও নাই। অথচ বাঙলাদেশে প্রাপ্ত অগণিত দেবদেবীর পোড়ামাটি ও পাথরের মূর্তিগুলি দেখিলে, পাহাড়পুর ও অন্যান্য স্থানের প্রাচীন মন্দির, স্তূপ এবং বিহারের ধ্বংসাবশেষ অথবা সমসাময়িক চিত্রে ও ভাস্কর্যে সেই যুগের ঘর-বাড়ি-মন্দিরাদির পরিকল্পনা দেখিলে, দেবদেবীর মূর্তিগুলির চিরযৌবনসুলভ শ্রীঅঙ্গে বিচিত্র গহনার সূক্ষ্ম ও বৈচিত্র্যের কারুকার্যগুলির দিকে লক্ষ্য করিলে এ কথা অনুমান করিতে কোনও আপত্তি করিবার কারণ নাই যে, তদানীন্তন কালে তক্ষণ ও স্থাপত্য শিল্প অথবা স্বর্ণ ও রৌপ্যশিল্পজাত দ্রব্যাদির কোনও প্রকার অপ্রতুলতা ছিল। অন্যান্য অনেক কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যাদি সম্বন্ধেই এ কথা বলা যাইতে পারে। ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধেও একই কথা। গঙ্গা ও তাম্রলিপ্ত যে মস্ত বড় দুইটি বন্দর ছিল, এ খবর বিশেষভাবে পেরিপ্লাস-গ্রন্থ, টলেমির

বিবরণ, জাতক-গ্রন্থ ও ফাহিয়ান-য়ুয়ান্-চোয়াঙের বিবরণীর ভিতর পাওয়া যায় ; তাহা ছাড়া অন্য কোথাও ইহাদের বিশদ উল্লেখ কিছু নাই বলিলেই চলে। এই দুই বন্দর হইতে, এবং কিছু পরবর্তীকালে অর্থাৎ, মধ্যযুগের প্রারম্ভ হইতেই সপ্তগ্রাম হইতে যে পূর্ব-দক্ষিণ এশিয়ার দ্বীপগুলিতে, দক্ষিণ-ভারতের উপকূল বাহিয়া সিংহলে, এবং পশ্চিম উপকূল বাহিয়া সুরাষ্ট্র-ভৃগুকচ্ছ পর্যন্ত বাণিজ্যতরী যাতায়াত করিত তাহার কিছু কিছু আভাস হয়তো পাওয়া যায়, কিন্তু সমসাময়িক বিশদ প্রমাণ কিছু নাই বলিলেই চলে। অন্তর্বাণিজ্যও নিশ্চয়ই ছিল, বাঙলাদেশের বিভিন্ন জনপদগুলির ভিতর এবং দেশের বাহিরে অন্যান্য রাজ্য ও রাজ্যখণ্ডগুলির সঙ্গে। এই অন্তর্বাণিজ্য চলিত হয়তো অধিকাংশই নদীপথে, কিন্তু স্থলপথেও কিছু কিছু না চলিত, এমন নয় অথচ এই সব বাণিজ্য-সম্ভার, বাণিজ্যপথ এবং ব্যবসা-বাণিজ্য-সংক্রান্ত অন্যান্য খবরের আভাসও উপাদানগুলির মধ্যে খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন। হাট-বাজার, আপণ-বিপণি, ব্যাপারী ইত্যাদির নির্বিশেষ উল্লেখ লেখমালাগুলির মধ্যে মাঝে মাঝে দেখা যায়, কিন্তু তাহা উল্লেখ মাত্রই ; বিশেষ আর কিছু খবর পাওয়া যায় না।

পাওয়া যে যায় না, উল্লেখ যে নাই তাহার কারণ তো খুবই পরিষ্কার। লেখমালাই হউক, অথবা অন্য যে-কোনও প্রকার লিখিত বিবরণই হউক, ইহাদের কোনটিই দেশের উৎপন্ন দ্রব্যাদির কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্যের, কিংবা দেশের সামাজিক অথবা অর্থ-নৈতিক অবস্থার পরিচয় দিবার জন্য রচিত হয় নাই। দু'একটি ছাড়া সব লেখমালাই প্রায় ভূমি দান-বিক্রয়ের পট্টোলী, আধুনিক ভাষায় পাট্টা বা দলিল। প্রস্তাবিত দান-বিক্রয়ের ভূমির পরিচয় দিতে গিয়া, কিংবা দান-বিক্রয়ের শর্ত ও স্বত্ব উল্লেখ করিতে গিয়া পরোক্ষভাবে কোনও কোনও উৎপন্ন দ্রব্যাদির নাম বাধ্য হইয়াই করিতে হইয়াছে, কারণ সেইসব উৎপন্ন দ্রব্যাদি সেই ভূমিখণ্ডের ধন-সম্পদ, এবং তাহার অবলম্বনেই ক্রেতা অথবা দানগ্রহীতার ক্রয় অথবা দানগ্রহণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। সব লেখমালায় আবার সে উল্লেখও নাই। পূর্বোক্ত মহাস্থান শিলালিপিখণ্ডের কথা ছাড়িয়া দিলে, খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তম শতক পর্যন্ত বহু তাম্রপট্টোলীর খবর আমরা জানি, কিন্তু উহাদের মধ্যে কোথাও দত্ত বা ক্রীত ভূমির উৎপন্ন দ্রব্যাদির বা কোনও শিল্পজাত দ্রব্যাদির উল্লেখ নাই বলিলেই চলে ; একমাত্র সপ্তম শতকে রচিত কর্ণসুবর্ণ (কর্ণস্বর্ণ = কানসোনা, মুর্শিদাবাদ জেলা) রাষ্ট্রের ঔদুম্বরিক বিষয়ের বপ্যঘোষবাট গ্রামের তাম্র-পট্টোলীতে "সর্ষপ-যাণক" বলিয়া সর্ষপক্ষেত্রপার্শ্ববিলম্বিত যে পথের (?) উল্লেখ আছে তাহা হইতে হয়তো অনুমান করা যায়, উক্ত গ্রামের অন্যতম উৎপন্ন দ্রব্য ছিল সর্ষপ বা সরিষা। অষ্টম শতক হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত পাল, সেন ও অন্যান্য রাজবংশের যে-সমস্ত পট্টোলীর খবর আমরা জানি তাহার প্রায় সব ক'টিতেই দত্ত অথবা ক্রীত ভূমির প্রধান কৃষিজাত দ্রব্যাদির উল্লেখ আছে, এবং

কোনও কোনও ক্ষেত্রে, বিশেষ ভাবে একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকের পট্টোলীগুলিতে ভূমিজাত দ্রব্যাদির আয়ের পরিমাণও উল্লেখ করা আছে। ভূমি-সম্পর্কিত দলিল বলিয়াই ভূমিজাত দ্রব্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু শিল্পজাত দ্রব্যাদির উল্লেখ নাই বলিলেই চলে। প্রশ্ন দাঁড়ায়, পঞ্চম হইতে সপ্তম শতকের লেখমালায় ভূমিজাত দ্রব্যাদির উল্লেখ নাই কেন, এবং অষ্টম হইতে ত্রয়োদশ শতকের লেখমালায় আছে কেন? সঠিক উত্তর দেওয়া কঠিন. একটা অনুমান করা চলে। বৈন্যগুপ্তের গুনাইঘর পট্টোলীতে (৫০৭-৮ খ্রী) দেখিতেছি, মহাযানিক অবৈবর্তিক ভিক্ষুসংঘকে যে গ্রাম বা অগ্রহার দান করা হইতেছে তাহার শর্ত হইতেছে "সর্বতোভোগেন" অর্থাৎ দানগ্রহীতা সকল প্রকারে এই ভূমির উৎপন্ন দ্রব্য ও তাহার আয় ভোগ করিতে পারিবেন, এই অধিকার তাঁহাকে দেওয়া হইতেছে। এই যুগের অন্যান্য লেখমালায় এই ধরনের "সর্বতোভোগেন" অধিকারের উল্লেখ বিশেষ ভাবে নাই, কিন্তু "অক্ষয়নীবীধর্মানুযায়ী" যে দান তাহা যে "সর্বতোভোগেন"ই দেওয়া হইত, এবং ক্রেতা ও দানগ্রহীতারা যে সেই ভাবেই গ্রহণ করিতেন, এ অনুমান করা যায়। পরবর্তী কালে এই 'সর্বতোভোগে'র স্বরূপ নির্দেশ করা প্রয়োজন হইয়াছিল, নানা বিশেষ ও অবিশেষ কারণে; ভোক্তার অধিকার সম্বন্ধে প্রশ্ন হয়তো উঠিয়াছিল, এবং হয়তো এই কারণেই প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পরবর্তী কালে কতকটা বিশদভাবে এই অধিকারের স্বরূপ নির্দেশ করা হইয়াছিল; তাহার ফলেই ভূমিজাত দ্রব্যাদির খবর আমরা কিছু কিছু পাই।

এ তো গেল লেখমালাগুলির কথা। অন্যান্য উপাদানগুলি সম্বন্ধে দু'এক কথা বলা দরকার। পূর্বে বলিয়াছি, খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকে রচিত Periplus of the Erythrean Sea নামক গ্রন্থে ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে প্রাচীন বাঙলার প্রধান শিল্পজাত দ্রব্য রেশম ও কার্পাস বস্ত্রের খবর পাওয়া যায়। পূর্বোক্ত গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল বিদেশী বণিক যাঁহারা সমুদ্র-পথে ভারতবর্ষের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইতেন তাঁহাদের সুবিধার জন্য, কতকটা 'গাইড্ বই'র মতন। বাঙলাদেশ হইতে যে সব জিনিস বিদেশে পশ্চিম এশিয়ায়, মিশরে, রোমে, গ্রীসে যাইত তাহাদের মধ্যে অজ্ঞাতনামা লেখক রেশমবস্ত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ সব দেশে এই জিনিসের চাহিদা ছিল, তাই ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে। অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্যও নিশ্চয়ই ছিল, সেগুলির চাহিদা হয়তো তেমন ছিল না, রপ্তানিও হইত না, সেই জন্য তাহাদের উল্লেখ নাই। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এই বস্ত্রশিল্পের উল্লেখ অপরোক্ষভাবে। কারণ, এই গ্রন্থ এবং গ্রন্থোক্ত বিশেষ অধ্যায়টি ভারতবর্ষের বিভিন্ন শিল্পজাত দ্রব্যের সংবাদ দিবার জন্য বিশেষ ভাবে রচিত নয়। রাজশেখরের কাব্য-মীমাংসায় পূর্বদেশগুলির উৎপন্ন দ্রব্যাদির একটি ক্ষুদ্র তালিকা আছে, কিন্তু একটু লক্ষ্য

করিলেই দেখা যাইবে, এই তালিকা কিছুতেই সম্পূর্ণ হইতে পারে না ; মনে হয় কোনও বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে যে সব গন্ধ ও আয়ুর্বেদীয় দ্রব্যাদির প্রয়োজন হইত, এ তালিকায় শুধু সেইসব কয়েকটি দ্রব্যেরই নাম আছে। সেইজন্য আমাদের নানা উপাদানের মধ্যে প্রাচীন বাঙলার ধন-সম্বলের যে সংবাদ তাহা প্রায় সকল ক্ষেত্রেই পরোক্ষ ও অসম্পূর্ণ। এইসব বিচ্ছিন্ন, টুকরা টুকরা তথ্য আহরণ করিয়া এই ধন-সম্বলের একটি সম্পূর্ণ স্বরূপ গড়িয়া তোলা অত্যন্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার। তবু, মোটামুটি একটা কাঠামো গড়িয়া তোলার চেষ্টা করা যাইতে পারে।

৩

কৃষি ও ভূমিজাত দ্রব্যাদি

প্রথম কৃষি ও ভূমিজাত দ্রব্যাদির কথাই বলি। প্রাচীন বাঙলার কৃষি যে ধনোৎপাদনের এক প্রধান ও প্রথম উপায় ছিল তাহার প্রমাণ লেখমালায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। অষ্টম হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত লেখমালাগুলিতে 'ক্ষেত্রকরান্', 'কর্ষকান্', 'কৃষকান', ইত্যাদি কথার তো বারংবার উল্লেখ আছেই। জনসাধারণ যে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল তাহাদের মধ্যে ক্ষেত্রকর বা কৃষকেরাও ছিল বিশেষ একটি শ্রেণী, এবং কোনও স্থানে ভূমি দান-বিক্রয় করিতে হইলে রাজপাদপোজীবীদের, ব্রাহ্মণদের, এবং গ্রামের ও গোষ্ঠীর অন্যান্য মহত্তর ও ক্ষুদ্রের ব্যক্তিদিগের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেত্রকর বা কৃষকদেরও দান বিক্রয়ের ব্যাপার বিজ্ঞাপিত করিতে হইত। উদাহরণ স্বরূপ খালিমপুরে প্রাপ্ত ধর্মপালের লিপি (অষ্টম শতকের চতুর্থ পাদ, আনুমানিক) হইতে এই বিজ্ঞপ্তি-সূত্রটি উদ্ধার করিতেছি :

"এষু চতুর্ষু গ্রামেষু সমুপগতান্ সর্বানেব রাজ-রাজনক রাজপুত্র রাজামাত্য-সেনাপতি-বিষয়পতি ভোগপতি-ষষ্ঠাধিকৃত-দণ্ডশক্তি-দণ্ডপাশিক-চৌরোদ্ধরণিক-দৌঃসাধসাধনিক-দূত-খোল-গমাগমিকা ভিত্বরমাণ-হস্ত্যশ্ব-গোমহিষাজাবিকাধ্যক্ষ - নাকাধ্যক্ষ - বলাধ্যক্ষ - তরিক - শৌল্কিক-গৌল্মিক তদায়ুক্তক-বিনিযুক্তকাদি-রাজপাদপোজীবিনোহন্যাংশ্চাকীর্তিতান্ চাটভট-জাতীয়ান্ যথাকালধ্যাসিনো জ্যেষ্ঠকায়স্থ-মহামহত্তর-মহত্তর দাশগ্রামিকাদি-বিষয় ব্যবহারিণঃ সকরণান্ প্রতিবাসিনঃ ক্ষেত্রকরাংশ্চ ব্রাহ্মণ-মাননাপূর্বকং যথার্হং মানয়তি বোধয়তি সমাজ্ঞাপয়তি চ।"

এই ধরনের উল্লেখ প্রায় প্রত্যেক তাম্র-পট্টোলীতেই আছে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা ভাল প্রমাণ, লোকের ভূমির চাহিদা। পঞ্চম হইতে সপ্তম শতক পর্যন্ত যত ভূমি দান বিক্রয়ের তাম্র-পট্টোলী দেখিতেছি, সর্বত্রই দেখি ভূমি যাচক বাস্তুক্ষেত্রাপেক্ষা খিলক্ষেত্রই চাহিতেছেন বেশি পরিমাণে ; তাহার উদ্দেশ্য যে কৃষিকর্ম তাহা সহজেই অনুমেয়।

যে-জমি কর্ষিত হয় নাই সেই জমির চাহিদাই বেশি : উদ্দেশ্য কর্ষণ, তাহাতে আর সন্দেহ কী ? ধনাইদহ পট্টোলী (৪৩২-৩৩ খ্রী), দামোদরপুরের প্রাপ্ত প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম পট্টোলী (৪৪৩-৪৪ খ্রী ; ৪৮২-৮ খ্রী ; ৫৪৩-৪৪ খ্রী), ধর্মাদিত্যের প্রথম ও দ্বিতীয় পট্টোলী (সপ্তম শতক), গোপচন্দ্রের পট্টোলী (সপ্তম শতক), সমাচার দেবের ঘুগ্রাহাটি পট্টোলী (সপ্তম শতক) প্রভৃতিতে শুধু খিলক্ষেত্র প্রার্থনারই উল্লেখ আছে। অন্যত্র, যেখানে খিল ও বাস্তুক্ষেত্র উভয়ই প্রার্থনা করা হইতেছে, যেমন, বৈগ্রাম পট্টোলীতে (৪৪৭-৪৮ খ্রী) : সেখানেও খিলক্ষেত্রর পরিমাণ বাস্তুক্ষেত্রের প্রায় বার গুণ। পরবর্তী কালের পট্টোলীগুলিতে ভূমির পরিমাণ সমগ্রভাবে পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু সে-ভূমির কতটুকু খিল কতটুকু বাস্তু তাহা পরিষ্কার করিয়া কিছু বলা নাই। তবু দত্ত ও ক্রীত ভূমির যে বিবরণ আমরা এই লিপিগুলিতে দেখি, তাহাতে মনে হয়, খিলভূমির কথাই বলা হইতেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে। তাহা ছাড়া, কৃষির প্রাধান্য সম্বন্ধে অন্য একটি অনুমানও উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভূমির পরিমাণ সর্বত্রই ইঙ্গিত করা হইতেছে এমন মানদণ্ডে যাহা কৃষিব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত। কুল্যবাপ, দ্রোণবাপ, আঢ়বাপ বা আঢকবাপ, উন্মান (উয়ান) এই সমস্ত মানই শস্য-সম্পর্কিত। এক কুল্য, এক দ্রোণ বা এক আঢক (বাঙলা, আঢ়া : পূর্ব-বাঙলার অনেক স্থানে দুন্ এবং আঢ়া শস্যমান এখনও প্রচলিত) বীজ বপনের জন্য যতটুকু জমির প্রয়োজন তাহার পরিমাণই এক কুল্যবাপ, দ্রোণবাপ অথবা আঢ়বাপ ভূমি এবং এই মানানুযায়ীই পঞ্চম হইতে মোটামুটি অষ্টম শতক পর্যন্ত সমস্ত ভূমির পরিমাপ উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রীহট্ট জেলার ভাটেরা গ্রামে প্রাপ্ত গোবিন্দকেশবের তাম্র-পট্টোলী (একাদশ শতক) কিংবা শ্রীচন্দ্রের ধুল্লা তাম্র পট্টোলীতে (দশম শতক) ভূমি-পরিমাপের মান হইতেছে হল, এবং হলই হইতেছে প্রধান কৃষিযন্ত্র। অবশ্য এ কথা সত্য যে আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় পঞ্চম হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত ভূমি সর্বত্রই ঠিক এই কুল্যবাপ, দ্রোণবাপ, উন্মান, হল ইত্যাদি মানদণ্ডে মাপা হইত না ; তাহার জন্য অন্য মানদণ্ডের নির্দেশও পাইতেছি। নল-মানদণ্ডের নির্দেশ আছে (অষ্টকনবকনলাভ্যাম, ৮×৯ নল) পঞ্চম শতকেই, দামোদরপুরের তৃতীয় পট্টোলীতে (৪৮২-৮৩ খ্রী)। এই শস্যমান অথবা কৃষি-যন্ত্রমানের সাহায্যে ভূমির পরিমাণের উল্লেখ ইহার মধ্যে কৃষিপ্রধান সমাজের স্মৃতি যে জড়িত তাহা অনুমান করা অসংগত নয়।

ডাক ও খনার বচনগুলিও প্রাচীন বাঙলার কৃষিপ্রধান সমাজের অন্যতম প্রমাণ। যে ভাষায় এখন আমরা এই বচনগুলি পাই তাহা অর্বাচীন, সন্দেহ নাই। এগুলি প্রচলিত ছিল জনসাধারণের মুখে মুখে বংশপরম্পরায়। ভাষার অদলবদল হইয়া বর্তমানে তাহা যে রূপ লইয়াছে তাহা মধ্যযুগীয়। তবু, এই বচনগুলি যে খুব প্রাচীন স্মৃতি বহন করে তাহাতে সন্দেহ নাই। কোন্ কোন্ ঋতুতে কী শস্য বুনিতে হইবে, কোন্ শস্যের জন্য

কী প্রকার ভূমি, কী পরিমাণের বারিপাত প্রয়োজন, বারিপাত ও খরাতপ নির্দেশ, বিভিন্ন শস্যের নাম ও রূপ, আবহাওয়া-তত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, কৃষিপ্রধান সমাজের বিচিত্র ছবি, ইত্যাদি নানা খবর এই বচনগুলিতে পাওয়া যায়।

বাঙলাদেশ নদীমাতৃক; ইহার ভূমি সাধারণত নিম্ন এবং বারিপাত কৃষির পক্ষে অনুকূল। এ দেশের ভৌগোলিক সংস্থান সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা অন্যত্র করা হইয়াছে; ইহার ভূমির উর্বরতা সম্বন্ধে চীন-পরিব্রাজক য়ুয়ান্-চোয়াঙের সাক্ষ্যও সেই সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছি। সাধারণ ভাবে এ দেশের শস্যসম্ভার সম্বন্ধেও এই চীন-পরিব্রাজকের দু'চার কথা বলিবার আছে। পূর্ব-ভারতের যে কয়টি দেশে তিনি পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে অন্তত চারিটি বর্তমান বাঙলা-ভাষাভাষী জনপদের সীমার ভিতর অবস্থিত—পুন্-ন-ফ-টন্-ন (পুণ্ড্রবর্ধন), সন্-মো-ত-ট' (সমতট), তন্-মো-লিহ্-তি (তাম্রলিপ্তি) এবং ক-লো-ন-সু-ফ-ল-ন (কর্ণসুবর্ণ)। তাহা ছাড়া আর একটি দেশেও তিনি গিয়াছিলেন, তাহার নাম ক-চু-ওয়েন্-কি-লো; ইহার ভারতীয় রূপ হইতেছে কযঙ্গল কজঙ্গল অথবা কজাঙ্গল। কানিংহাম সাহেব এই কজঙ্গলকে কাঁকজোল বা রাজমহলের সঙ্গে অভিন্ন মনে করিয়াছিলেন। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে এক কযঙ্গল রাজার উল্লেখ আছে; কোন কোন বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থেও কজঙ্গলের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভবিষ্যপুরাণের ব্রহ্মখণ্ড পুঁথিতে রাঢ়ীখণ্ডজাঙ্গল নামে এক দেশের উল্লেখ আছে। এই দেশ ভাগীরথীর পশ্চিমে, কীকট অর্থাৎ মগধ দেশের নিকটে; এই দেশের ভিতরেই বৈদ্যনাথ, বক্রেশ্বর ও বীরভূমি (বীরভূম) অজয় ও অন্যান্য নদী। ইহার তিনভাগ জঙ্গল, এক ভাগ গ্রাম ও জনপদ, ইহার অধিকাংশ ভূমি ঊষর, স্বল্প ভূমি মাত্র উর্বর। এই যে জঙ্গল ও জাঙ্গল প্রদেশ ইহাই তো য়ুয়ান্-চোয়াঙের কজঙ্গল বা কজাঙ্গল বলিয়া মনে হয়—রাঢ়দেশের উত্তর খণ্ডের জাঙ্গলময় ঊষর ভূভাগ যাহা রাজমহল ও সাঁওতালভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই হিসাবে এই কযঙ্গল কজঙ্গল-কজাঙ্গল বর্তমান বাঙলাদেশেরই অন্তর্গত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। আমার এই মন্তব্যের সমর্থন পাইতেছি ভট্ট ভবদেবের ভুবনেশ্বর লিপিতে (একাদশ শতক)। ভবদেব ঊষর (অজলা) ও জাঙ্গলময় রাঢ়দেশের কোনও গ্রামোপকণ্ঠে একটি জলাশয় খনন করাইয়া দিয়াছিলেন। এখানেও রাঢ়দেশের যে অংশের বিবরণ পাইতেছি তাহা অজলা, অনুর্বর এবং জাঙ্গলময়। এখন দেখা যাক্ য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ এই পাঁচটি দেশের শস্যসম্ভার সম্বন্ধে সাধারণভাবে কী বলিতেছেন।

কজঙ্গল সম্বন্ধে তিনি বলেন, এ দেশের শস্যসম্ভার ভাল। পুণ্ড্রবর্ধনের বর্ধিষ্ণু জনসমষ্টি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, এবং এ দেশের শস্যসম্ভার ফুল ফল যে সুপ্রচুর তাহাও তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সমতট ছিল সমুদ্রতীরবর্তী দেশ, এ দেশের উৎপাদিত শস্য সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলেন নাই। তাম্রলিপ্ত ছিল সমুদ্রের এক খাড়ির উপরেই; এখানকার কৃষিকর্ম ভাল ছিল, ফলফুল ছিল প্রচুর। স্থলপথ ও জলপথ

এখানে কেন্দ্রীকৃত হইয়াছিল বলিয়া নানা দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যাদি এখানে মজুত হইত এবং এখানকার অধিবাসীরা সেই হেতু প্রায় সকলেই বেশ সম্পন্ন ও বর্ধিষ্ণু ছিল। কর্ণসুবর্ণের লোকেরাও ছিল খুবই ধনী, এবং জনসংখ্যাও ছিল প্রচুর ; কৃষিকর্ম ছিল নিয়মিত ঋতু অনুযায়ী, ফলফুল-সম্ভার ছিল সুপ্রচুর। দেখা যাইতেছে, য়ুয়ান্ চোয়াঙের দৃষ্টিও দেশের কৃষিপ্রাধান্যের দিকেই আকৃষ্ট হইয়াছিল, এবং সর্বত্রই তিনি উৎপন্ন শস্য-সম্ভারের উল্লেখ করিয়াছিলেন, এক সমতট ছাড়া। সমুদ্রতীরবর্তী এই দেশে স্বভাবতই কৃষিকর্মের অবস্থা হয়তো ভাল ছিল না। তাম্রলিপ্তির সমৃদ্ধির হেতু যে শুধু কৃষিকর্মই নয়, তাহাও তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন, এবং সেই জন্যই এই দেশের অন্তর্বাণিজ্য ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছিলেন।

এইবার কৃষিজাত কী কী শস্য ও অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যাদির খবর আমরা জানি একে একে তাহার আলোচনা করা যাইতে পারে।

ধান্য

প্রথমেই প্রধান শস্য ধান্যের সহিত আমাদের পরিচয়। এই পরিচয়, আগেই বলিয়াছি, আমরা পাই খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় হইতে দ্বিতীয় শতকের মধ্যে উৎকীর্ণ, প্রাচীন করতোয়া-তীরবর্তী মহাস্থানের শিলালিপিখণ্ডটি হইতে। ইহা একটি রাজকীয় আদেশ ; রাজা অজ্ঞাত, এবং যে স্থান হইতে এই আদেশ দেওয়া হইতেছে, তাহার নামও অজ্ঞাত। তবে, অক্ষর দেখিয়া শ্রীযুক্ত দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর মহাশয় অনুমান করেন, এবং তাঁহার অনুমান সত্য বলিয়াই মনে হয় যে, আদেশটি দিয়াছিলেন কোনও মৌর্য সম্রাট। আদেশটি দেওয়া হইতেছে পুদনগলের (পুণ্ড্রনগরের) মহামাত্রকে, এবং তাঁহাকে শাসনোল্লিখিত আদেশটি পালন করিতে বলা হইয়াছে। পুণ্ড্রনগরে ও পার্শ্ববর্তী স্থানে সংবঙ্গীয়দের মধ্যে (অন্য মতে, ছবগীয় = ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের মধ্যে) কোনও দৈবদুর্বিপাক-বশত নিদারুণ দুর্গতি দেখা দিয়াছিল। এই দৈবদুর্বিপাক যে কী তাহা উল্লেখ করা নাই। এই দুর্গতি হইতে ত্রাণের উদ্দেশ্যে দুইটি উপায় অবলম্বন করা হইয়াছিল। প্রথমটি কী, তাহা হয়তো শিলাখণ্ডটির প্রথম লাইনে লেখা ছিল, কিন্তু ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে তাহা আর জানিবার উপায় নাই। তবে, অনুমান করা হইয়াছে যে, গণ্ডক মুদ্রায় কিছু অর্থ সংবঙ্গীয়দের (ছবগ্গীয়দের ?) নেতা (?) গলদনের হাতে দেওয়া হইয়াছিল, ঋণ হিসাবে। দ্বিতীয় উপায়ে রাজকীয় শস্যভাণ্ডার হইতে দুঃস্থ জনসাধারণকে ধান্য দেওয়া হইয়াছিল—খাইয়া বাঁচিবার জন্য, না বীজ হিসাবে, তাহা উল্লেখ করা হয় নাই, কিন্তু এই ধান্য-বিতরণও ঋণ হিসাবে। কারণ, এই আশার উল্লেখ লিপিখণ্ডটিতে আছে যে, রাজকীয় এই আদেশের ফলে সংবঙ্গীয়ের অথবা ছবগ্গীয় ভিক্ষুরা বিপদ কাটাইয়া উঠিতে পারিবে, এবং জনসাধারণের মধ্যে আবার শস্যসমৃদ্ধি ফিরিয়া আসিবে। তখন গণ্ডক মুদ্রাদ্বারা রাজকোষ

এবং ধান্যদ্বারা রাজকোঠাগার ভরিয়া দিতে হইবে। এই শিলাখণ্ড হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, জনসাধারণের প্রধান উপজীব্যই ছিল ধান্য ; দুর্গতি-দুর্ভিক্ষের সময়ও এই ধান্য ঋণ গ্রহণই ছিল জীবনধারণের উপায়। রাজাও সেই উপায়ই অবলম্বন করিয়াছিলেন ; রাজকোঠাগারে দৈবদুর্বিপাক কাটাইবার জন্য ধান্যই সংগ্রহ করিয়া রাখা হইত। এই বিপদে রাজা ধান বিনামূল্যে বিতরণ করেন নাই, ঋণ-স্বরূপই দিয়াছিলেন ; অর্থও ঋণস্বরূপই দিয়াছিলেন, ইহা লক্ষণীয়।

পরবর্তী কালের অসংখ্য লিপিতে এই ধান্যশস্যের উল্লেখ সর্বত্র নাই : কিন্তু তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। ধান্যই ছিল একমাত্র উপজীব্য এই দেশের, এবং শস্য বলিতে ধান্যই বুঝাইত সর্বাগ্রে ; তাহার নাম করিবার প্রয়োজন হইত না। এই ধান্য একান্ত-ভাবে বারিনির্ভর ; সেইজন্য অগণিত নদনদী খালবিল থাকা সত্ত্বেও এ দেশের ছড়ায়, গানে, পল্লীবচনে নানা লোকায়ত ব্রত ও পূজানুষ্ঠানে মেঘ ও আকাশের কাছে বারি-প্রার্থনার বিরাম নাই, অতীতেও ছিল না, আজও নাই। লক্ষ্মণসেনের আনুলিয়া, তর্পণ-দীঘি, গোবিন্দপুর ও শক্তিপুর এই চারিটি তাম্রশাসনে একটি মঙ্গলাচরণ শ্লোক আছে ; এই শ্লোকটিতে ধান্যোপজীবী বাঙালীর আন্তরিক আকুতি ধ্বনিত হইয়াছে মনে করিলে অনৈতিহাসিক উক্তি কিছু করা হয় না।

> বিদ্যুদ্‌যত্র মণিদ্যুতিঃ ফণিপতের্বালেন্দুরিন্দ্রায়ুধং
> বারি স্বর্গতরঙ্গিণী সিতশিরোমালা বলাকাবলিঃ।
> ধ্যানাভ্যাসসমীরণোপনিহিতঃ শ্রেয়োঽঙ্কুরোদ্ভূতয়ে
> ভূয়াদ বঃ স ভবার্তিতাপভিদুরঃ শম্ভোঃ কপর্দাম্বুদঃ ॥

ফণিপতির মণিদ্যুতি যাহাতে বিদ্যুৎস্বরূপ, বালেন্দু ইন্দ্রধনুস্বরূপ, স্বর্গতরঙ্গিণী বারিস্বরূপ, শ্বেতকপালমালা বলাকাস্বরূপ, যাহা ধ্যানাভ্যাসরূপ সমীরণের দ্বারা চালিত এবং যাহা ভবার্তিতাপভেদকারী, শম্ভুর এমন কপর্দরূপ অম্বুদ তোমাদের শ্রেয় শস্যের অঙ্কুরোদগমের কারণ হউক।

লক্ষ্মণসেনের আনুলিয়া শাসনে ব্রাহ্মণদের অনেক গ্রামদানের উল্লেখ আছে ; এইসব গ্রাম ছিল নানা শস্যক্ষেত্র এবং উপবন শোভায় অলংকৃত, এবং শস্যক্ষেত্রে শালিধান্য জন্মাইত প্রচুর। কেশবসেনের ইদিলপুর শাসনেও দেখা যাইতেছে, রাজা অনেক ব্রাহ্মণকে বহু গ্রাম দান করিয়াছিলেন ; এইসব গ্রামে সুন্দর সমতল সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্র ছিল এবং সেইসব ক্ষেত্রে চমৎকার ধান উৎপন্ন হইত। ধান এবং ধান চাষ ইত্যাদি সম্বন্ধে আরও খবর জানা যায় ; দু' একটি উল্লেখ করিতেছি। রঘুবংশ-কাব্যে রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে বঙ্গাভিযানের উল্লেখ আছে ; কালিদাস বলিতেছেন, ধানের চারাগাছ যেমন করিয়া একবার উৎপাটন করিয়া আবার রোপণ করা হয় রঘু তেমনই করিয়া বঙ্গজনদের একবার উৎখাত করিয়া আবার প্রতিরোপিত (উৎখাত-প্রতিরোপিতঃ) করিয়াছিলেন। কবিগুরুর

বীক্ষণ-শক্তি ও স্থানীয় জ্ঞান দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। এই ধরনের ধানের চাষ সহজ এবং নিরাপদ এবং বাঙলাদেশের ও আসামাঞ্চলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অন্য যে দুই ধরনের ধানের চাষ বাঙলাদেশে প্রচলিত কালিদাস তাহাও জানিতেন কিনা, এই কৌতূহল প্রায় অনিবার্য। কাটা ধান মাড়াই করার পদ্ধতি এখন যেমন, সুপ্রাচীন কালেও তেমনই ছিল বলিয়া মনে হয়। রামচরিত-কাব্যের কবি-প্রশস্তিতে ধানের 'খলা' বা মাড়াই-স্থানের ইঙ্গিত আছে, এবং গোলাকারে সাজানো কাটা ধানের উপর দিয়া গোরু-বলদ ঘুরিয়া ঘুরিয়া হাঁটিয়া কী করিয়া ধান মাড়াই করিত, তাহারও উল্লেখ আছে। কালিদাসের রঘুবংশ-কাব্যে ইক্ষুক্ষেত্রের ছায়ায় বসিয়া কৃষক রমণীগণ কর্তৃক শালিধান্য পাহারা দিবার কথা আছে, কিন্তু তাহা বাঙলাদেশ সম্বন্ধে কিনা, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায় না।

ইক্ষু

ধান্য, বিশেষভাবে শালিধান্য এবং ইক্ষু সম্বন্ধে বাঙালী কবির কল্পনা নানাভাবে উদ্দীপ্ত হইয়াছে। সদুক্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থে উদ্ধৃত দুইটি বাঙালী কবির রচিত দুইটি শ্লোকে বর্ষায় ধানের ক্ষেত, হেমন্তে কাটা শালিধানের স্তূপ, আখের ক্ষেত, আখ-মাড়াই কল ইত্যাদি লইয়া যে কবি-কল্পনা বিস্তারিত হইয়াছে তাহা অন্য প্রসঙ্গে (দেশ-পরিচয় অধ্যায়ে, জলবায়ু প্রসঙ্গে) উদ্ধার করিয়াছি। এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

সর্ষপ

সর্ষপ যে অন্যতম উৎপন্ন শস্য ছিল তাহার কথা আগেই উল্লেখ করিয়াছি: বপ্য-ঘোষবাট গ্রামের তাম্র-পট্টোলীতে উল্লিখিত 'সর্ষপ-যানক' কথাটিতে তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

য়ুয়ান্-চোয়াঙ যে বাংলার সর্বত্রই প্রচুর ফলশস্য-সম্ভারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা উক্তি মাত্রই নয়; ইহার সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায় অষ্টম হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত রচিত তাম্র-পট্টোলীগুলিতে। আমি আগেই বলিয়াছি, পঞ্চম হইতে সপ্তম শতক পর্যন্ত রচিত লিপিগুলিতে ভূমিজাত দ্রব্যাদির উল্লেখ নাই বলিলেই চলে। কিন্তু অষ্টম শতকে পাল-রাজত্বের আরম্ভের সূত্রপাত হইতেই এই উল্লেখ পাওয়া যায়। কী ভাবে তাহা পাওয়া যায় তাহা দেখা যাইতে পারে।

আম্র, মহুয়া, মৎস্য, লবণ, বাঁশ, কাঠ ও ইক্ষু

খালিমপুর-তাম্রশাসনে দেখিতেছি, ধর্মপাল চারিটি গ্রাম দান করিতেছেন হট্টিকা তলপাটক (বাটক?) সমেত; উৎপাদিত শস্যাদির কোন উল্লেখ নাই। দেবপালের

মুঙ্গের-শাসনে দেখিতেছি, মোষিকা নামক একটি গ্রাম দান করা হইতেছে 'স্বাসীমাতৃণযুতিগোচর পর্যন্ত সতলঃ সোদ্দেশঃ সাম্রমধুকরঃ সজলস্থলঃ সমৎস্যঃ সতৃণঃ...'। যে জমি দান করা হইতেছে তাহার উপর রাজা কোনও অধিকারই রাখিতেছেন না, শুধু ভূমির উপরকার স্বত্ব নয়, ভূমির নিচের স্বত্ব (সতলঃ), জলস্থলের স্বত্ব (সজলস্থলঃ সমৎস্যঃ), গাছগাছড়ার স্বত্ব সবই দান করিয়া দিতেছেন। তিনটি উৎপন্ন দ্রব্যের সংবাদ এখানে আছে—আম্র, মহুয়া (মধুকঃ) ও মৎস্য। নারায়ণপালের ভাগলপুর-লিপিতেও অনুরূপ সংবাদই পাওয়া যায়, শুধু মৎস্যের উল্লেখ নাই। যাহাই হউক, মুঙ্গের ও ভাগলপুর-লিপির দু'টি গ্রামই হয়তো বর্তমান বিহার প্রদেশে, কাজেই এই সাক্ষ্য হয়তো বাঙলাদেশের প্রতি প্রযোজ্য অনেকে না-ও মনে করিতে পারেন। কিন্তু, দেখিতেছি দিনাজপুর জেলার বাণগড়ে প্রাপ্ত প্রথম মহীপালদেবের তাম্রশাসনে যে কুরটপল্লিকা গ্রাম দান করা হইতেছে, তাহার উৎপন্ন দ্রব্যাদির উল্লেখ ঠিক পূর্বোক্ত ভাগলপুর-লিপিরই অনুরূপ ; এখানেও মৎস্যের উল্লেখ নাই, কিন্তু আম ও মহুয়ার উল্লেখ আছে। প্রথম মহীপালদেবের রাজত্বকাল মোটামুটি একাদশ শতকের প্রথমার্ধ বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। অথচ, ইহার কিছু পূর্ববর্তী অর্থাৎ দশম শতকের একটি শাসনে উৎপন্ন দ্রব্যাদির তালিকা অন্যরূপ। কম্বোজরাজ নয়পালদেবের ইর্দা তাম্রপট্টে বৃহৎছত্তিবন্না (যে গ্রামে খুব বড় একটি ছাতিম গাছ ছিল ?) নামে একটি গ্রাম দানের উল্লেখ আছে। এই গ্রামটি বর্ধমানভুক্তির দণ্ডভুক্তি মণ্ডলের অন্তর্গত। দণ্ডভুক্তি মেদিনীপুর জেলার দাঁতন অথবা দাতন। এই গ্রামটি দান করা হইতেছে সমস্ত অধিকার সমেত ; যাঁহাকে দান করা হইতেছে তিনিই ইহার সব-কিছু ভোগ করিবেন, বাস্তুক্ষেত্র, জলাধার, গর্ত, মার্গ (পথ), পতিত বা অনুর্বর জমি, জঙ্গল বা আবর্জনা ফেলিবার জায়গা যাহাকে আমরা বলি আঁস্তাকুড় (= আবস্করস্থান), লবণাকর, সহকার (আম) ও মধুক বৃক্ষের ফলফুল, অন্যান্য গাছ-গাছড়া, হাট, ঘাট, পার বা খেয়া-ঘাট, (সহট্ট-ঘট্ট-সতর) ইত্যাদি সমস্তই তাহার ভোগ্য। ধান্য ও অন্যান্য শস্য ছাড়া, আম্র-মধুক ছাড়া, এখানে আর একটি উৎপন্ন দ্রব্যের খবর পাওয়া যাইতেছে, তাহা লবণ। মেদিনীপুর জেলার দাতন সমুদ্র-তীরবর্তী। জোয়ার যখন আসে, তখন সমুদ্রতীরবর্তী অনেক স্থানই নোনাজলে ভাসিয়া ডুবিয়া যায়, বড় বড় গর্ত করিয়া লোকে এখনও সেই জল ধরিয়া রাখে, পরে রৌদ্রে অথবা জ্বাল দিয়া শুকাইয়া লবণ তৈরি করে। এই প্রথা প্রাচীন কালেও প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় ইর্দা লিপিটিতে। এই বড় বড় গর্তগুলিই শাসনোল্লিখিত লবণাকর। জল কিংবা তলের কিংবা পারঘাটের অধিকার ছাড়িয়া দিয়া রাজা যে ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়ানুযায়ী বা অক্ষয়নীবীধর্মানুযায়ী ভূমি দান করিতেছেন বলিয়া দেখিতেছি, তাহার অর্থ পরিষ্কার। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দেখি, জল, স্থল, পারঘাট ইত্যাদির

অধিকার রাষ্ট্রে কেন্দ্রীভূত ; পারঘাটের আয় রাজার, ভূমির উপরকার অধিকার প্রজার হইলেও নিচেকার অধিকার রাষ্ট্র কখনও ছাড়িয়া দেয় না। সেইজন্যই যেখানে ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে, সেখানে তাহা উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই অর্থশাস্ত্রেই দেখি, লবণে রাষ্ট্রের অথবা রাজার একচেটিয়া অধিকার। সেই একচেটিয়া অধিকারও ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে যেখানে রাজা ভূমিদান করিতেছেন। বৈদ্যদেবের কমৌলি লিপিতে প্রাগ্‌-জ্যোতিষভুক্তির কামরূপ মণ্ডলের বাড়া বিষয়ে একটি গ্রামদানের উল্লেখ আছে ; এই গ্রামটি দানের শর্ত 'জল-স্থল-খিলারণ্য-বাট-গোবাট-সংযুক্তং'। পথ-গোপথের অধিকারও ছাড়া হইতেছে, কিন্তু উল্লেখযোগ্য হইতেছে অরণ্যের উপর অধিকার ত্যাগ। অথচ, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে অরণ্য রাষ্ট্র সম্পদ ও সম্পত্তি। এই অরণ্য-দানের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট। কাঠ অর্থোৎপাদনের একটি প্রধান উপায়। মদনপালদেবের মনহলি তাম্রপট্টে পৌণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির কোটিবর্ষবিষয়ের খলাবর্তমণ্ডলে যে গ্রামদানের উল্লেখ আছে তাহাও দেখিতেছি সুতলঃ···সাম্রমধূকঃ সজলস্থলঃ সগর্তোষরঃ সঝাট বিটপঃ···। পুণ্ড্রবর্ধনেও তাহা হইলে বিস্তৃত মহুয়ার চাষ ছিল ! এই মহুয়া গাছের আয় দুই প্রকারে—খাদ্য হিসাবে এবং মহুয়া-জাত আসব হইতে। মহুয়া-আসবের উল্লেখ কৌটিল্য তো বিশদভাবেই করিয়াছেন। ঝাট-বিটপও উল্লেখযোগ্য ; বাঁশ অথবা অন্য গাছের ঝাড় ও অন্যান্য বড় গাছও এক রকমের অর্থাগমের উপায়। সাধারণ লোকেরা যে বাঁশের চাঁচের বেড়া দিয়াই ঘর-বাড়ি বাঁধিত (খুঁটিও ব্যবহার করিত নিশ্চয়ই), তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় শবরীপাদের একটি চর্যাগীতিতে—"চারিপাশে ছাইলারে দিয়া চঞ্চালী।" চঞ্চালী = চঞ্চারিকা যে আমাদের বাঁশের চাঁচারি এ সম্বন্ধে আর সন্দেহ কি ? আর বাঁশের ব্যবসায় তো এখনও বাঙলাদেশে সর্বত্র সুপরিচিত। খুব ভাল বাঁশের ঝাড় ছিল বরেন্দ্রীতে ; রামচরিতে এ কথার প্রমাণ আছে। এই প্রসঙ্গেই সন্ধ্যাকর নন্দী এ কথাও বলিতেছেন যে, বরেন্দ্রীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অন্যতম উপকরণ ছিল সেখানকার ইক্ষু বা আখের ক্ষেত। এই ভূমির প্রাচীনতর ও বৃহত্তর সংজ্ঞা হইতেছে পুণ্ড্র। ব্রাত্য পুণ্ড্রদের বাসস্থান পুণ্ড্রদেশ, পুণ্ড্রবর্ধন। এই পুণ্ড্র = পুঁড় কোম বোধ হয় আখের চাষে খুব দক্ষ ছিল, এবং হয়তো সেইজন্যই আখের অন্যতম নামই হইতেছে পুঁড় ; এক জাতীয় দেশি আখকে বলে পুঁড়ি। আর একটি লক্ষণীয় নাম গৌড়। গৌড় যে গুড় হইতে উৎপন্ন তাহার শব্দতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক প্রমাণ সুবিদিত। এ তথ্যের মধ্যেও আখের চাষের ইঙ্গিত ধরিতে পারা কঠিন নয়। সুবিখ্যাত সুশ্রুত-গ্রন্থে পৌণ্ড্রক নামে এক প্রকার ইক্ষুর উল্লেখ আছে, এবং বহু সংস্কৃত নিঘণ্ট্-রচয়িতা ও কোষকারদের মত এই যে, পুণ্ড্রদেশে যে ইক্ষু জন্মাইত তাহাই পৌণ্ড্রক। আজকাল পৌড়িয়া, পুঁড়ি, পৌড়া প্রভৃতি নামে যে ইক্ষু ভারতের সর্বত্র চাষ হইতে দেখা যায় তাহা এই পৌণ্ড্রক ইক্ষু নাম হইতেই উদ্ভূত। সুপ্রাচীন কালেই প্রাচ্যদেশের ইক্ষু ও ইক্ষুজাত দ্রব্য—চিনি ও গুড়—

দেশে-বিদেশে পরিচিত ছিল। গ্রীক লেখক ঈলিয়ন্ (Aelien) ইক্ষুদণ্ড পেষণ-জাত একপ্রকার প্রাচ্যদেশীয় মধুর (পাতলা ঝোলা গুড় ?) কথা বলিতেছেন। ইক্ষুনল পেষণ করিয়া একপ্রকার মিষ্ট রস আহরণ করিত গঙ্গাতীরবাসী লোকেরা, এ কথা বলিতেছেন অন্যতম গ্রীক লেখক লুক্যান (Lukan); এ-সমস্তই খ্রীষ্টপূর্ব শতাব্দীর কথা।

পান, গুবাক, নারিকেল

উৎপন্ন দ্রব্যাদির, অবশ্যই ধান্য ও অন্য শস্য ছাড়া, বিস্তৃততর উল্লেখ আমরা পাই পরবর্তী লিপিগুলিতে। একাদশ শতকের শ্রীচন্দ্রের রামপাল তাম্রশাসনে পাই "সতলা।...সাম্রপনসা। সগুবাক নালিকেরা সলবণা সজলস্থলা...।" দ্বাদশ শতকের ভোজবর্মনের বেলব লিপিতে পাই "সাম্রপনসা সগুবাক-নালিকেরা সলবণা সজলস্থলা সগর্তোষরা।" বিজয়সেনের দেওপাড়া-লিপিতে উৎপন্ন দ্রব্যাদির খবর পাওয়া যায় না; এই রাজারই বারাকপুর শাসনেও তাহাই, কিন্তু শেষোক্তটিতে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির খাড়িমণ্ডলের যে গ্রামে চার পাটক ভূমিদানের উল্লেখ আছে তাহার উৎপত্তি-মূল্য (বার্ষিক আয় ?) ছিল দুই শত কপর্দক পুরাণ। চার কড়িতে এক গণ্ডা; ষোল গণ্ডায় এক কপর্দক পুরাণ। বল্লালসেনের নৈহাটি-তাম্রপট্টে বর্ধমানভুক্তির উত্তর-রাঢ়মণ্ডলের স্বল্পদক্ষিণবীথির অন্তর্গত বাল্লহিট্ঠা গ্রামে কিছু ভূমিদানের উল্লেখ আছে; এই ভূমির পরিমাণ বৃষভশংকর অর্থাৎ বিজয়সেনীয় নলের মাপে ৪০ উন্মান ৩ কাক। ইহার উৎপত্তি মূল্য ৫০০ কপর্দকপুরাণ এবং এই আয়ের অন্তত কিয়দংশ পাওয়া যাইতেছে ভূমিসম্বন্ধ 'ঝাট-বিটপ--গর্তোষর-জলস্থল-গুবাক-নারিকেল' হইতে। লক্ষ্মণসেনের তর্পণদীঘি শাসনেও অন্যতম আয়ের পথ ঝাট-বিটপ ও গুবাক নারিকেল। দত্তভূমি পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির বরেন্দ্রীর অন্তর্গত বেলাহিষ্ঠি গ্রামে; ভূমির পরিমাণ ১২০ আঢ়াবাপ, ৫ উন্মান; উৎপত্তি-মূল্য ১৫০ কপর্দকপুরাণ। এই নৃপতিরই মাধাইনগর-লিপিতে দত্তভূমি বরেন্দ্রীর অন্তর্গত কান্তাপুরের নিকট দাপনিয়াপাটক গ্রাম, গ্রামটির পরিমাণ ১০০ ভূখাড়ী, ২১ খাড়িকা; উৎপত্তি-মূল্য ১৬৮ (?) কপর্দকপুরাণ (কপর্দকাষ্টষষ্টিপুরাণাধিকশত = কপর্দকাষ্টষষ্ঠ্যাধিকপুরাণশত)। লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুর-শাসনেও অন্যতম আয়ের পথ ঝাট-বিটপ এবং গুবাক-নারিকেল। দত্তভূমি বর্ধমানভুক্তির পশ্চিম-খাটিকার বেতড্ড চতুরক (= বেতড়) অন্তর্গত বিড্ডারশাসন গ্রাম; পূর্বে গঙ্গা। ভূমির পরিমাণ ৬০ দ্রোণ, ১৭ উন্মান; উৎপত্তি-মূল্য ৯০০ পুরাণ, দ্রোণ প্রতি ১৫ পুরাণ। আনুলিয়া-শাসনে দত্তভূমি পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির ব্যাঘ্রতটী অন্তর্গত মাথরাণ্ডিয়া-খণ্ডক্ষেত্র; ভূমির পরিমাণ ১ পাটক, ৯ দ্রোণ, ১ আঢ়াবাপ, ৩৭ উন্মান, এবং ১ কাকিনিকা; বার্ষিক উৎপত্তি-মূল্য

১০০ কপর্দকপুরাণ, এবং আয়ের অন্যতম উপকরণ ঝাট-বিটপ ও গুবাক-নারিকেল। সুন্দরবন-শাসনে দত্তভূমির পরিমাণ ৩ ভূদ্রোণ, ১ খাড়িকা (?), ২৩ উন্মান, এবং ২৷৷০ কাকিনি ; উৎপত্তির মূল্য ৫০ পুরাণ ; ভূমি পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির খাড়িমণ্ডলের কান্তল্লপুর চতুরকের মণ্ডল গ্রামে। আয়ের অন্যতম উপকরণ এ ক্ষেত্রেও ঝাট-বিটপ ও গুবাক-নারিকেল। ত্রয়োদশ শতকে বিশ্বরূপসেন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ শাসনদ্বারা নানা তিথিপর্ব উপলক্ষে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির সমুদ্রতীরশায়ী নিম্ন প্রদেশে বিভিন্ন গ্রামে ১১টি ভূখণ্ড দান করিয়াছিলেন। দুইটি ভূখণ্ড দিয়াছিলেন বঙ্গের নাব্যখণ্ডে (নৌকা-চলাচলযোগ্য) রামসিদ্ধি পাটকে ; ভূমির পরিমাণ ৬৭$\frac{৫}{৮}$ উন্মান, উৎপত্তিক ১০০ পুরাণ ; এই আয়ের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ (১৯$\frac{১১}{২০}$) পানের বরজ হইতে। এই নাব্যখণ্ডেই বিনয়তিলক গ্রামে দত্ত ২৫ উদান (উন্মান) ভূমির উৎপত্তিক ছিল ৬০ পুরাণ ; মধুক্ষীরকা আবৃত্তির নবসংগ্রহচতুরকে অজিকুলা পাটকে দত্তভূমির পরিমাণ ১৬৫ উন্মান, উৎপত্তিক ১৪০ পুরাণ ; বিক্রমপুরের লাউহণ্ডাচতুরকের দেউলহস্তী গ্রামে দত্ত পাঁচটি ভূখণ্ডের পরিমাণ ৪২ উন্মান, উৎপত্তিক ১০০ পুরাণ ; চন্দ্রদ্বীপের ঘাঘরকাট্টি পাটক ও পাতিলাদিবীক গ্রামে দত্তভূমির পরিমাণ ৩৬$\frac{৫}{৮}$ উন্মান, উৎপত্তিক ১০০ পুরাণ। মোট দত্তভূমির পরিমাণ ছিল ৫৫৬? উন্মান, উৎপত্তিক ছিল ৫০০ পুরাণ। এই ভূমি নালভূমি (অর্থাৎ কৃষিভূমি) ও বাস্তুভূমি দুইই ছিল, এবং আয়ের প্রধান উপকরণ ছিল পানের বরজ ও গুবাক-নারিকেল। রামসিদ্ধি পাটকে যে ৬৭$\frac{৫}{৮}$ উন্মান ভূমি দেওয়া হইয়াছিল তাহার বার্ষিক উৎপত্তিক ছিল ১০০ পুরাণ, এ-কথা পূর্বেই বলিয়াছি ; তাহার প্রায় এক-পঞ্চমাংশ (১৯$\frac{১১}{২০}$ = ১৯ পুরাণ, ১১ গণ্ডা) আয় হইত শুধু পানের বরজ হইতে। বাকি চারি অংশ পরিমাণ আয় যে অন্যান্য উৎপন্ন শস্যাদি হইতে এবং অন্যান্য উপায়ে হইত, তাহাতে আর সন্দেহ কী ? কিন্তু সে সবের উল্লেখ নাই। অন্যান্য লিপিতেও এইরূপই : ধান্য ও অন্যান্য শস্য, মৎস্য ইত্যাদি উপকরণ অনুল্লিখিতই থাকিত। বিশ্বরূপ তাঁহার মদনপাড়া-তাম্রপট্টোলী দ্বারা পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির 'বঙ্গে বিক্রমপুর ভাগে' পিঞ্জোকাষ্ঠি গ্রামে আরও দুইটি ভূখণ্ড দান করিয়াছিলেন ; এই দুই খণ্ড ভূমির আয় ছিল ৬২৭ পুরাণ, এবং প্রধান উল্লিখিত উপকরণ এক্ষেত্রেও গুবাক-নারিকেল। বিশ্বরূপের ভ্রাতা কেশবসেন এই 'বঙ্গে বিক্রমপুরভাগে'ই তলপাড়াপাটক নামে একটি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। এই গ্রামটির মূল্য (না, বার্ষিক উৎপত্তিক) রাজসরকারে নির্ধারিত ছিল ২০০ শত [দ্রম্ম ?] ; এখানেও গুবাক-নারিকেল হইতেছে অন্যতম প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ; এই গুবাক-নারিকেল গাছ ইত্যাদি সমেতই যে গ্রামটি দান করা হইতেছে শুধু তাহাই নয়, দান-গ্রহীতা নীতিপাঠক ঈশ্বরদেবশর্মণকে বলা হইতেছে, তিনি যেন মন্দির ও পুষ্করিণী ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করাইয়া (দেবকুল-পুষ্করিণ্যাদিকং কারয়িত্বা) এবং গুবাক-নারিকেল গাছ ইত্যাদি লাগাইয়া (গুবাক-নারিকেলাদিকং

লগ্গাবয়িত্বা) এই গ্রাম যাবচ্চন্দ্রদিবাকর ভোগ করিতে থাকেন। গুবাক ও নারিকেলই যে ধান্য ইত্যাদি শস্যের পরই এই অঞ্চলের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ছিল, এই নির্দেশই তাহার প্রমাণ। ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগে জনৈক রাজা দামোদর পৃথ্বীধর নামক এক ব্রাহ্মণকে ৫ দ্রোণ ভূমি দান করিয়াছিলেন, তিন দ্রোণ ডাম্বরডাম গ্রামে, দুই দ্রোণ কেটঙ্গপাল গ্রামে। ভূমির আয় বা উৎপন্ন দ্রব্যাদির কোন খবরই চট্টগ্রামে প্রাপ্ত এই শাসনে উল্লেখ নাই, তবে ডাম্বরডাম গ্রামের দক্ষিণ সীমায় 'লবণোৎসবাশ্রমসম্বাধা-বাটী'র উল্লেখ হইতে মনে হয়, এই অঞ্চলের অন্যতম প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ছিল লবণ, এবং লবণ উত্তোলন, অথবা এই ধরনের লবণ-সংক্রান্ত কোনও ব্যাপারে উৎসবও হইত, যেমন নবান্ন উপলক্ষে আজও হইয়া থাকে। চট্টগ্রাম অঞ্চলের সমুদ্রতীরবর্তী দেশে ইহা কিছু অসম্ভবও নহে। দনুজমাধব দশরথদেব সেনরাজবংশ অবসানের পর ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে পূর্ব-বাঙলার রাজা হইয়াছিলেন। তিনি একবার অনেক রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকে পৃথক পৃথক ভাবে অনেকগুলি ভূখণ্ড দান করিয়াছিলেন। এই ভূখণ্ডগুলির সমগ্র উৎপত্তিকের পরিমাণ ছিল প্রায় ৫০০ পুরাণ। বিক্রমপুর পরগনায় আদাবাড়ী গ্রামে প্রাপ্ত এক তাম্রপট্টে ইহার বিস্তৃত খবর পাওয়া যায়; দত্ত ভূখণ্ডগুলি আদাবাড়ীতে এবং আদবাড়ীরই নিকটস্থ অন্যান্য গ্রামে, কিন্তু উৎপন্ন দ্রব্যাদির বিশেষ উল্লেখ তাহাতে নাই।

আম, মহুয়া, কাঁটাল ও অন্যান্য ফল

অষ্টম হইতে ত্রয়োদশ শতকের শেষ পর্যন্ত সমস্ত লেখমালাগুলি এবং রামচরিত ও অন্যান্য গ্রন্থ বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গেল, ধান্য এবং অন্যান্য শস্য ছাড়া প্রাচীন বাঙলার প্রধান ভূমি ও কৃষি-জাত দ্রব্য হইতেছে, আম্র অথবা সহকার, মধুক অর্থাৎ মহুয়া, পনস অর্থাৎ কাঁটাল, ইক্ষু, ডালিম্ব বা দাড়িম্ব, পর্কটি, খর্জুর, বীজ, গুবাক অর্থাৎ সুপারি, নারিকেল, পান, মৎস্য ও লবণ। আম তো বাঙলাদেশের সর্বত্রই জন্মায়, কমবেশি এই মাত্র: এই জন্যই প্রায় সব ক'টি লিপিতেই আমের উল্লেখ আছেই। মহুয়ার উল্লেখ যে ক'টি লিপিতে এবং অন্যান্য জায়গায় আছে প্রত্যেকটিরই স্থানের ইঙ্গিত উত্তর-বঙ্গে, শুধু ইর্দা তাম্রপট্টের ইঙ্গিত মেদিনীপুর জেলার দাঁতনের দিকে। মহুয়ার চাষ এই অঞ্চলে নিশ্চয়ই তখন ছিল, এখনও কিছু কিছু আছে। ঈশ্বরঘোষের রামগঞ্জ শাসনেও মহুয়া বা মধুকের উল্লেখ দেখা যায়। পনস অর্থাৎ কাঁটালের ইঙ্গিত পাইতেছি বিশেষ ভাবে পূর্ব-বাঙলায়, ঢাকা অঞ্চলে। য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ কিন্তু বলিতেছেন কাঁটাল প্রচুর জন্মাইত পুণ্ড্রবর্ধনে, অর্থাৎ উত্তরবঙ্গে, এবং সেখানে এই ফলের আদরও ছিল খুব। গুবাক ও নারিকেল তো এখনও প্রচুরতর পরিমাণে জন্মায় বাঙলার গঙ্গা-পদ্মা-ভাগীরথী-করতোয়া ও বিশেষভাবে সমুদ্রতীর-নিকটবর্তী অঞ্চলগুলিতে; আশ্চর্যের বিষয় কিছু নয়, লেখমালায়

ইঙ্গিতও তাই। ইক্ষুর কথা তো আগেই বলিয়াছি ; বিচিত্র উল্লেখ হইতে মনে হয় ইক্ষুচাষের প্রধানতম স্থান ছিল উত্তর-বঙ্গ, তবে গঙ্গা-ভাগীরথীবাহিত দেশগুলিতেও বোধ হয় কিছু কিছু জন্মাইত। এক ডালিম্ব ক্ষেত্রের উল্লেখ পাইতেছি লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুর পট্টোলীতে ; ইহার অবস্থিতি ছিল বর্তমান হাওড়া জেলায় বেতড় গ্রামের নিকটেই, গঙ্গাতীরের সন্নিকটে। পর্কটি বৃক্ষের উল্লেখ পাইতেছি একাধিক পট্টোলীতে : ইহাদের মধ্যে ধর্মাদিত্যের কোটালিপাড়া-শাসন অন্যতম। বীজফল ও খেজুরের উল্লেখ তো ধর্মপালের খালিমপুর-লিপিতেই আছে। কদলী বৃক্ষ বা ফলের উল্লেখ কোনও পট্টোলীতে বড় একটা দেখা যাইতেছে না ; কিন্তু পাহাড়পুরের পোড়ামাটির ফলকে এবং নানা প্রস্তরচিত্রে বারবার ফলসমন্বিত বা ফলবিযুক্ত কলাগাছের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায় ; সেই অস্ট্রিক্ আদি অস্ট্রেলিয় আমল হইতেই কলা বাঙালীর প্রিয় খাদ্য। উত্তর-রাঢ়ে, বরেন্দ্রীতে গুবাক ও নারিকেলের উল্লেখ পাইতেছি, সন্দেহ নাই : শুধু যে লিপিগুলিতেই আছে তাহা নয়, রামচরিতেও আছে। এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ আছে যে, বরেন্দ্রীর মাটি নারিকেল উৎপাদনের পক্ষে খুব প্রশস্ত। যাহাই হউক, বাঙলাদেশের সর্বত্রই তো সুপারি নারিকেল জন্মায়, তবু অধিক উল্লেখ পাই বঙ্গে বিক্রমপুর ভাগে, সুন্দরবনের খাড়িমণ্ডলে, বঙ্গের নাব্য অর্থাৎ নিম্ন জলাভূমি অঞ্চলে, ঢাকা জেলার পদ্মাতীরবর্তী ভূমি অঞ্চলে। খড়্গবংশীয় রাজা দেবখড়্গের (অষ্টম শতক) আস্রফপুর তাম্র-পট্টোলী (২নং) দ্বারা তলপাটক গ্রামে ১ পাটক ভূমি দান করা হইতেছে, এবং এই ভূমিখণ্ডে যে দুইটি সুপারি বাগান (গুবাক বাস্তুদ্বয়েন সহ) আছে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া হইতেছে। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে, ধন-সম্বল হিসাবে সুপারির আদর কতটুকু ছিল। পানের বরজের উল্লেখ যে পাই, সেও বঙ্গের নাব্য প্রদেশে ; অন্যান্য স্থানেও হইত সন্দেহ নাই। মৎস্যের সবিশেষ উল্লেখ বাঙলার কোনও লিপি অথবা শাসনে নাই, কিন্তু যখনই ভূমি দান করা হইয়াছে, সজল অর্থাৎ জলাধার, খাল, বিল, প্রণালী, নানা পুষ্করিণী ইত্যাদির অধিকার সমেতই দান করা হইয়াছে ; অষ্টম শতক-পরবর্তী শাসনগুলিতে সর্বত্রই তাহার উল্লেখও আছে। এই যে 'সজল' ভূমি দান, ইহা 'সমৎস্য' দান, এই অনুমান কিছু অসংগত নয়। তাহা ছাড়া, এই নদনদীবহুল খালবিলাকীর্ণ বাঙলাদেশে মৎস্য যে একটি প্রধান সামাজিক ধনসম্পদ্ প্রাচীন কালেও ছিল তাহাও সহজেই অনুমেয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে অরণ্য এবং বহু ক্ষেত্রেই ঝাটবিটপ, তৃণযূত্যাদি-সহ ভূমি দান করা হইয়াছে ; ইহার আয়ও কম ছিল না। ঝাট অথবা ঝাড় আমার তো বাঁশের ঝাড় বলিয়াই সন্দেহ হয়, এবং অরণ্য ও বিটপ যে কাঠের কাঁচা মাল তাহাও সুস্পষ্ট। বাঁশ ও কাঠ এখনও পর্যন্ত বাঙলাদেশের অন্যতম ধন-সম্বল। লবণ ঠিক কৃষিজাত অথবা ভূমিজাত দ্রব্য না হইলেও এই সঙ্গেই উল্লেখ করা যাইতে পারে। এ কথা অনেকেই জানেন, বাঙলার সমুদ্রতীরের নিম্নভূমিগুলিতে কিংবা পদ্মার উজান বাহিয়া

জোয়ারের জল সামুদ্রিক লবণ বহন করিয়া আনে। এই অঞ্চলের লোকেরা কী করিয়া লবণ প্রস্তুত করে, তাহা আগেই বলিয়াছি। সেইজন্যই দেখা যাইবে, উল্লিখিত শাসন-গুলিতে যেখানে 'সলবণ' ভূমি দান করা হইতেছে, সেই ভূমি সর্বদাই সমুদ্রতীরবর্তী নিম্নভূমিতে অথবা পদ্মার তীরে তীরে, ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ-নারায়ণগঞ্জের পদ্মাতীরে, মেদিনীপুর জেলার দাঁতন, চট্টগ্রামে। বিক্রমপুরে প্রাপ্ত শ্রীচন্দ্রের ধুল্লা শাসনে যে লোনিয়াজোড়া-প্রস্তরের উল্লেখ আছে, তাহা যে লবণের গর্তের মাঠ এমন ধারণা বোধ হয় সহজেই করা চলে। ইহাও বিক্রমপুর অঞ্চলে।

প্রাকৃত বাঙালীর খাদ্য। অগুরু, কস্তুরী ইত্যাদি

এইসব ছাড়া আরও কিছু কিছু ভূমিজাত অথবা বৃহত্তর অর্থে কৃষি-সম্পর্কিত দ্রব্যাদির খবর ইতস্তত অনুসন্ধানে জানা যায়। যেমন, বিদ্যাপতি তাঁহার কীর্তিকৌমুদী-গ্রন্থে গৌড়দেশকে "আজ্যসার গৌড়" বলিয়া বিশেষিত করিয়াছেন। আজ্য অর্থে ঘৃত ; আজ্য বা ঘৃত যে গৌড়দেশের শ্রেষ্ঠ বস্তু, সেই গৌড় হইল আজ্যসার গৌড় ; তাহাকে রাজা মোদকের মতন করতলগত করিয়াছিলেন। চতুর্দশ শতকের অপভ্রংশ ভাষায় রচিত প্রাকৃত-পৈঙ্গল গ্রন্থের একটি পদে প্রাকৃত বাঙালীসুলভ যে আহার্য-বর্ণনা আছে, তাহাতে কলাপাতায় ওগরা ভাত ও নালিতা শাক এবং মৌরলা মাছের সঙ্গে সঙ্গে গব্য (মহিষের নয়) ঘৃত ও দুগ্ধের উল্লেখ আছে। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে দেখিতেছি, বরেন্দ্রভূমিতে এলাচের সুবিস্তৃত চাষ ছিল ; সেইসব ক্ষেতে খুব ভাল এলাচ উৎপন্ন হইত। প্রিয়ঙ্গুলতাও উৎপন্ন হইত প্রচুর। এলাচ ও প্রিয়ঙ্গু-সরিষা যেমন হইত লবঙ্গও জন্মাইত তেমনই প্রচুর। সরিষার বাণিজ্যিক চাহিদা কেমন ছিল জানা নাই কিন্তু ভারতবর্ষ হইতে অন্যান্য মসলার সঙ্গে সঙ্গে এলাচ ও লবঙ্গ যে প্রচুর পরিমাণে এশিয়া, মিশর এবং পূর্ব ও দক্ষিণ য়ুরোপে রপ্তানি হইত, পেরিপ্লাস-গ্রন্থ ও টলেমির ইণ্ডিকা-গ্রন্থেই সে প্রমাণ আছে। রাজশেখর তাঁহার কাব্য-মীমাংসা গ্রন্থে পূর্বদেশে ১৬টি জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন—যথা, অঙ্গ, কলিঙ্গ, কোশল, তোসল, উৎকল, মগধ, মুদ্গর (মুদ্গগিরি = মুঙ্গের), বিদেহ নেপাল, পুণ্ড্র, প্রাগ্‌-জ্যোতিষ, তাম্রলিপ্তক, বলদ, মল্লবর্তক, সুহ্ম ও ব্রহ্মোত্তর। এই ষোলটি জনপদের উৎপন্ন দ্রব্যের ক্ষুদ্র একটি তালিকাও তিনি দিয়াছেন , যথা, লবলী, গ্রন্থিপর্ণক, অগুরু, দ্রাক্ষা, কস্তুরিকা। এই তালিকা রাজশেখর কী উদ্দেশ্যে করিয়াছিলেন, বলা শক্ত ; কিন্তু এ কথা বুঝা শক্ত নয় যে, তিনি গন্ধদব্য এবং আয়ুর্বেদীয় উপকরণের একটি ক্ষুদ্র তালিকা মাত্র দিয়াছেন। এই তালিকায় দ্রাক্ষা দ্রব্যটি সন্দেহজনক। যে কয়টি দেশের নাম তিনি করিয়াছেন তাহাদের কোথাও দ্রাক্ষা জন্মান প্রায় অসম্ভব বলিলেই চলে। আমার মনে হয়, দ্রব্যটি হইবে লাক্ষা ; এটি লিপিকর-প্রমাদ, অশুদ্ধ পাঠ। দ্রাক্ষা হয় না বটে, কিন্তু পূর্ব-ভারতের অনেক স্থানে

লাক্ষা জন্মায়। এই ষোলটি জনপদের চারিটি বর্তমান বাঙলাদেশে ; যথা, পুণ্ড্র, তাম্রলিপ্তক, সুহ্ম ও ব্রহ্মোত্তর। লাক্ষা রাঢ়দেশে ও উত্তরবঙ্গে বা বরেন্দ্রভূমিতে এখনও জন্মায়। অগুরু বাঙলাদেশে কোথাও জন্মায় কি না, জানি না ; তবে কামরূপের নানা জায়গায় জন্মায়, তাহার প্রমাণ পাইতেছি কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ও তাহার টীকায়। ইব্‌ন খুর্দদ্‌বা নামে একজন আরব ভৌগোলিক (দশম শতক) রহ্‌মি দেশে (রহ্‌ন্‌ = আরাকান্‌) অগুরুকাষ্ঠ জন্মায়, এ কথা বলিতেছেন। কস্তুরী বা কস্তুরিকা নেপালে হিমালয়ের পাদদেশে হয়তো পাওয়া যাইত ; পূর্বদেশের অন্য কোনও জনপদে কস্তুরী-মৃগের বিচরণস্থান ছিল বলিয়া জানি না, তবে কস্তুরিকা নামে একপ্রকার ভৈষজ্য আছে ; রাজশেখর তাহারও ইঙ্গিত করিয়া থাকিতে পারেন। লবলী বরেন্দ্রীতে প্রচুর জন্মাইত ; তাহার উল্লেখ রামচরিতে আছে (৩, ১১)। এই শ্লোকেই উল্লিখিত আছে যে, বরেন্দ্রী দেশে বড় বড় লকুচ, শ্রীফল ও খাদ্যোপযোগী কন্দমূল জন্মাইত।

হীরা, মুক্তা, সোনা, রূপা, তামা, লোহা ইত্যাদি

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের টীকাকার বাঙলাদেশের একটি আকরজ দ্রব্যের খবর দিতেছেন। কৌটিল্য যে অধ্যায়ে মণিরত্নের খবর বলিতেছেন, সেই অধ্যায়ে হীরামণির উল্লেখ আছে। টীকাকার এই হীরামণির খনি কোথায় কোথায় ছিল, তাহার একটি নাতিদীর্ঘ তালিকা দিয়াছেন ; এই তালিকার দুইটি জনপদ নিঃসন্দেহে বাঙলাদেশে ; তাহাদের নাম, টীকাকারের ভাষায়—পৌণ্ড্রক এবং ত্রিপুর (= ত্রিপুরা)। জৈন আচারাঙ্গ সূত্রের মতে রাঢ়দেশের দুইটি বিভাগ ছিল, বজ্রভূমি ও সুব্‌ভভূমি ((= সুহ্মভূমি)। বজ্রভূমিতে খুব সম্ভব হীরার খনি ছিল ; তাহা হইতেই হয়তো বজ্রভূমি নামের উৎপত্তি। আইন-ই-আক্‌বরী-গ্রন্থে কিন্তু মদারণ বা গড়মন্দারণে এক হীরার খনির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই ভূমি হয়তো পশ্চিম দিকে বিহার-সীমায় অবস্থিত কোখ্‌রা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। জাহাঙ্গীরের আমলে কোখ্‌রায় একাধিক হীরাখনির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আর একটি আকরজ দ্রব্যের উল্লেখও অর্থশাস্ত্রে দেখা যায়। গৌড়িক নাম কএকপ্রকার খনিজ-রৌপ্যের নাম কৌটিল্য করিয়াছেন, এবং তাহা যে গৌড়-দেশোৎপন্ন, তাহাও তিনি বলিয়াছেন। টীকাকার বলিতেছেন, এই রৌপ্যের রঙ অগুরু ফুলের মতন।

আর একটি খনিজ দ্রব্যের উল্লেখ পাওয়া যায় কতকটা অর্বাচীন একটি গ্রন্থে—ভবিষ্য-পুরাণে। এই গ্রন্থ কতটা প্রাচীন এবং ইহার ব্রহ্মখণ্ড প্রক্ষিপ্ত, না মূল গ্রন্থের সমসাময়িক, বলা কঠিন। ইহার ব্রহ্মখণ্ডে রাঢ়দেশের জাঙ্গল-বিভাগের বিবরণে আছে :

ত্রিভাগজাঙ্গলং তত্র গ্রামশ্চৈবৈকভাগকঃ
স্বল্পা ভূমিরুর্বরা চ বহুলা চোষরা মতাঃ।

রারী [ঢ়ী] খণ্ডজাঙ্গলে চ লৌহধাতোঃ ক্বচিৎ ক্বচিৎ
আকরো ভবিতা তত্র কলিকালে বিশেষতঃ ॥

এখানে রাঢ়দেশের জাঙ্গলখণ্ডে লৌহখনির উল্লেখ আমরা পাইতেছি। বাঁকুড়া-বীরভূমে-সাঁওতালভূমে তো এখনও জায়গায় জায়গায় লোহা আহরণ এবং লোহার তৈজসপত্র, গৃহোপযোগী অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি তৈরি করা স্থানীয় দরিদ্রতর জনসাধারণের জীবন-ধারণের অন্যতম উপায়। এ-সব জায়গায় লোহা গলানোর পদ্ধতিও প্রাগৈতিহাসিক। ভারতবর্ষের বৃহত্তম লৌহ কারখানা তো এখনও বাঙলার দক্ষিণ-পশ্চিম সীমা-সংলগ্ন। তাম্র বা তামা সম্বন্ধেও প্রায় একই কথা। সুবর্ণরেখার তীর ধরিয়া জামসেদপুর এবং তারপর পশ্চিমে চক্রধরপুর ছাড়াইয়া সমানেই তাম্রসমাবেশ এবং তাম্রখনিনিচয়। আমার তো মনে হয়, তাম্রলিপ্ত নামটির মধ্যেও এই তাম্রসমৃদ্ধির স্মৃতি জড়িত। এই স্মৃতিও প্রাগৈতিহাসিক।

বাঙলাদেশের হীরাসমৃদ্ধির প্রমাণ আরও কিছু আছে। রত্নপরীক্ষা, বৃহৎসংহিতা নবরত্নপরীক্ষা, রত্নসংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থে সর্বত্রই উল্লেখ আছে, পৌণ্ড্রদেশ এক সময় হীরার জন্য বিখ্যাত ছিল; অগস্তিমত-গ্রন্থের মতে বঙ্গেও কিছু কিছু হীরা পাওয়া যাইত। তবে, মনে হয়, এই সমৃদ্ধি খ্রীষ্টপূর্ব শতকের; পেরিপ্লাস-গ্রন্থের সময় সে সমৃদ্ধি আর ছিল না। পেরিপ্লাসে গাঙ্গেয় মুক্তার উল্লেখের কথা আগেই বলা হইয়াছে; তাহা ছাড়া, রত্নপরীক্ষা গ্রন্থে এবং মহাভারতের সভাপর্বে পূর্বদেশে সমুদ্রতীরের জনপদগুলিতে মুক্তা-সমৃদ্ধির উল্লেখ আছে।

পশুপক্ষী, হাতী, হরিণ, মহিষ, বরাহ, ব্যাঘ্র ইত্যাদি

বাঙলাদেশের রাষ্ট্রের সামরিক শক্তি ও সংস্থাপনার মধ্যে হস্তীর একটি প্রধান স্থান ছিল। গ্রীক ঐতিহাসিকদের বিবরণীতে পাই, Prasioi = প্রাচ্য ও Gangaridæ = গঙ্গা-রাষ্ট্রের সম্রাট Agrammes বা ঔগ্রসৈন্যের সামরিক শক্তি অনেকটা হস্তীর উপর নির্ভর করিত। পাল ও সেন রাজাদের হস্তী, অশ্ব ও নৌবল লইয়াই ছিল সামরিক শক্তি। এই হস্তী আসিত কোথা হইতে? কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে আছে, কলিঙ্গ, অঙ্গ, করূষ এবং পূর্বদেশীয় হস্তীই হইতেছে সর্বশ্রেষ্ঠ। এই পূর্বদেশ বলিতে কৌটিল্য বাঙলাদেশ, বিশেষ-ভাবে উত্তর-বঙ্গ ও কামরূপের পার্বত্য অঞ্চলের কথা বলিতেছেন, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। এখনও তো গারো পাহাড় অঞ্চল হাতির জায়গা। আর এই বাঙলাদেশেই যে পরবর্তী কালে হাতি ধরার এবং হস্তী-আয়ুর্বেদ নামে এক বিশেষ বিদ্যা ও শাস্ত্রের উদ্ভব হইয়াছিল, সে কথা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বহুদিন আগেই প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন গৌড়দেশ যে হাতির জন্য বিখ্যাত ছিল তাহা রাজতরঙ্গিণীর কবির নিকটও সুবিদিত ছিল। প্রাচ্য ও গঙ্গারাষ্ট্র দেশও একই কারণে বিখ্যাত ছিল, তাহা

মেগাস্থিনিসের বিবরণে, এবং কামরূপের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে (গারো পাহাড়ে ?) যূথবদ্ধ হাতি বিচরণ করিত তাহা য়ুয়াম্-চোয়াঙের বিবরণে জানা যায়। জীবজন্তু পশুপক্ষীও দেশের ধন-সম্বলের মধ্যে গণ্য। হাতি ছাড়া অন্যান্য পশুর উল্লেখ কিছু কিছু বাঙলার লিপিগুলিতে পাওয়া যায়। লোকনাথের ত্রিপুরা পট্টোলিতে একটি গহন বন কাটিয়া নূতন এক গ্রাম পত্তন করিবার কথা আছে ; সেই বনে যে-সব জীবজন্তুর উল্লেখ আছে তাহার মধ্যে হরিণ, মহিষ, বরাহ, ব্যাঘ্র ও সর্প অন্যতম। আদিম বাঙালীর সর্প ও ব্যাঘ্র -ভীতি সুবিদিত, এবং এই দুইটি প্রাণী ভয় দেখাইয়া কী করিয়া তাহাদের পূজা আদায় করিয়াছিল তাহাও এখন আর অবিদিত নয়। মধ্যযুগে মনসাপূজা এবং দক্ষিণরায় বা ব্যাঘ্রপূজার বিস্তৃত প্রচলন এই দুইটি প্রাণী হইতেই। বনবহুল বৃষ্টিবহুল গ্রীষ্মপ্রধান এই দেশে এই দুয়েরই অপ্রতিহত প্রভাব। বিশেষভাবে বনময় জলময় সমুদ্রতীরবর্তী দেশগুলি তো এই দুই প্রাণীর লীলাস্থল। পাহাড়পুরের পোড়ামাটির ফলকগুলিতে এবং কোনো কোনো প্রস্তরচিত্রে আরও অন্যান্য নানা জীবজন্তুর পরিচয় পাওয়া যায় ; তাহার মধ্যে গোরু, বানর, হরিণ, শূকর, ঘোড়া ও উট উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত দুইটি প্রাণী বিদেশাগত, সন্দেহ নাই এবং যুদ্ধ ও বাণিজ্য -সংক্রান্ত ব্যাপারেই হয়তো ইহাদের আমদানি হইয়াছিল। পক্ষীর উল্লেখ ও পরিচয় কমই পাওয়া যায় ; তবে হাঁস, বন্য ও গৃহপালিত কুক্কুট, কপোত, নানাজাতীয় জলচর বিহঙ্গ, কাক ও কোকিলের উল্লেখ ও পরিচয় লিপিগুলিতে, মৃৎ ও প্রস্তর-চিত্রে ও সমসাময়িক সাহিত্যে দুর্লভ নয়। বাঘ, হরিণ, বন্যমহিষ, নানা-প্রকার হাঁস, বানর ইত্যাদি যে বাঙলার সাধারণ বন্য প্রাণী তাহা মধ্যযুগের Ralph Fitch (1583-91), Fernandes (1598), Fonseca (1599) প্রভৃতি পর্যটকদের বিবরণী পড়িলেও জানিতে পারা যায়।

৪

শিল্পজাত দ্রব্যাদি ; বস্ত্রশিল্প

বাঙলার শিল্পজাত দ্রব্যাদির কথা বলিতে গিয়া প্রথমেই বলিতে হয় বস্ত্রশিল্পের কথা। বাঙলাদেশের বস্ত্রশিল্পের খ্যাতি খ্রীষ্টের জন্মের বহু পূর্বেই দেশে বিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, এবং ইহাই যে এ দেশের প্রধান শিল্প ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে, Periplus of Erythrean Sea নামক গ্রন্থে, আরব, চীন, ও ইতালীয় পর্যটক ও ব্যবসায়ীদের বৃত্তান্তের মধ্যে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের সাক্ষ্যই প্রথম উদ্ধৃত করা যাক। কৌটিল্য বলিতেছেন, বঙ্গদেশের (বাঙ্গক) দুকূল খুব নরম ও সাদা ; পুণ্ড্রদেশের (পৌণ্ড্রক) দুকূল শ্যামবর্ণ এবং দেখিতে মণির মতো পেলব ; সুবর্ণকুড্যদেশের (কামরূপ) দুকূলের রং নবোদিত সূর্যের মতন। টীকাকার যোজনা করিয়াছেন, দুকূল বস্ত্র খুব সূক্ষ্ম,

ক্ষৌম বস্ত্র একটু মোটা। পত্রোর্ণ (জাত) বস্ত্র মগধ (মাগধিকা), সুবর্ণকুড্যক (সৌবর্ণকুড্যকা) অর্থাৎ কামরূপ এবং পুণ্ড্রদেশে (পৌণ্ড্রিকা) উৎপন্ন হইত। পত্রোর্ণজাত বস্ত্র বোধ হয় এণ্ডি ও মুগাজাতীয় বস্ত্র (পত্র হইতে যাহার উর্ণা = পত্রোর্ণ ?)। অমরকোষের মতে পত্রোর্ণ সাদা অথবা ধোয়া কৌষেয় বস্ত্র ; টীকাকার পরিষ্কার বলিতেছেন, কীটবিশেষের জিহ্বারস কোন কোন বৃক্ষপত্রকে এই ধরনের উর্ণায় রূপান্তরিত করে। লক্ষণীয় এই যে, কৌটিল্যোক্ত দেশগুলিতে এখনও খুব ভাল এণ্ডি-মুগাজাতীয় বস্ত্র উৎপন্ন হয়, বিশেষভাবে কামরূপে। পুণ্ড্রদেশে যে শুধু দুকূল ও পত্রোর্ণ বস্ত্র উৎপন্ন হইত তাহাই নয়, মোটা ক্ষৌম বস্ত্রও উৎপন্ন হইত, কৌটিল্য সে কথাও বলিতেছেন। শ্রেষ্ঠ কার্পাসবস্ত্র উৎপন্ন হইত মধুরা (মাদুরা) অপরান্ত, কলিঙ্গ, কাশি, বঙ্গ, বৎস এবং মহিষ জনপদে। বঙ্গে শ্বেতস্নিগ্ধ দুকূল যেমন উৎপন্ন হইত, তেমনই শ্রেষ্ঠ কার্পাসবস্ত্রেরও অন্যতম উৎপত্তি-স্থল ছিল এই দেশ। বঙ্গে ও পুণ্ড্রে প্রাচীনকালে তাহা হইলে চারিপ্রকার বস্ত্রশিল্প ছিল,—দুকূল, পত্রোর্ণ, ক্ষৌম ও কার্পাসিক। প্রাচীন বাঙলার এই সম্পদের কথা গ্রীক ঐতিহাসিকেরা বারবার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইহার রপ্তানির উল্লেখ পাওয়া যায় Periplus-গ্রন্থে। Schoff-এর ইংরেজী অনুবাদটুকু সমস্তই উদ্ধৃত করিতেছি এই জন্য যে, এই উপলক্ষে আমাদের দেশের অন্যান্য রপ্তানি দ্রব্যেরও কিছু কিছু খবর পাওয়া যাইবে। হিমালয়ের সানুদেশে পার্বত্য অসভ্য কিরাত জাতিদের উল্লেখের পরেই বলা হইতেছে :

> 'After these, the course turns towards the east again and sailing with the ocean to the right and the shore remaining beyond to the left, the Ganges comes into view, and near it the very last land towards the east, Chryse. There is a river near it called the Ganges······On its bank is a market-town which has the same name as the river Ganges. Through this place are brought malabathrum and Gangetic spikenard and pearls and muslins of the finest sorts which are called Gangetic. It is said that there are gold-mines near these places and there is a gold coin which is called *caltis*···"

[রপ্তানি] দ্রব্য : তেজপাতা, পিপ্পলি। মুক্তা ও স্বর্ণের প্রাসঙ্গিক উল্লেখ

এই সমুদ্রতীরবর্তী গঙ্গাবিধৌত দেশ যে বাঙলাদেশ, তাহা সুস্পষ্ট। এই দেশকেই গ্রীক ঐতিহাসিকেরা বলিয়াছেন গঙ্গারাষ্ট্র বা Gangaridae। এই গঙ্গা-বন্দরের (তাম্রলিপ্ত হইতে পৃথক) রপ্তানি দ্রব্যগুলির প্রথমেই পাইতেছি malabathrum বা তেজপাতা। Ptolemy বলেন, Kirrhadæ বা কিরাত দেশেই সবচেয়ে ভাল তেজপাতা উৎপন্ন হইত। উত্তর-বঙ্গের কোনও কোনও স্থানে, শ্রীহট্টে এবং আসামের কোনও কোনও

জায়গায়, সাধারণভাবে পূর্ব-হিমালয়ের পার্বত্য জনপদগুলিতে এখনও প্রচুর তেজপাতা উৎপন্ন হয়, এবং তাহার ব্যবসাও খুব বিস্তৃত। ইহার পরেই দেখিতেছি, গাঙ্গেয় পিপ্পলির উল্লেখ : ইহারও উৎপত্তিস্থল বোধহয় ছিল বাঙলার উত্তরে পার্বত্য সানুদেশ। রোম-দেশীয় বণিকেরা Nelcynda হইতে যে প্রচুর পিপ্পলি পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে লইয়া যাইতেন, তাহার অধিকাংশই যে এই গঙ্গা বন্দর হইতে যাইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিছু কিছু মালবার অঞ্চল হইতেও যাইত, কিন্তু দক্ষিণ-ভারতের পিপ্পলি (গ্রীক, পেপেরি = অধুনা pepper) গঙ্গা-বন্দরের পিপ্পলির মতন এত বড় বা ভাল হইত না। এই পিপ্পলির ব্যবসায়ে দেশে প্রচুর অর্থাগম হইত, সে কথা ব্যবসা-বাণিজ্য আলোচনা প্রসঙ্গে জানা যাইবে। পিপ্পলির পরেই পাইতেছি, মুক্তার উল্লেখ। এই মুক্তা যে গাঙ্গেয় মুক্তা, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই, এবং খুব ভাল মুক্তা না হইলেও ইহার কিছু কিছু পশ্চিম-এশিয়ায়, ইজিপ্টে, গ্রীস, রোমে রপ্তানি হইত। কিন্তু সর্বাপেক্ষা মূল্যবান রপ্তানি দ্রব্য হইতেছে Gange ic muslin অর্থাৎ গাঙ্গেয় সূক্ষ্মতম বস্ত্র-সম্ভার। সর্বশেষ উল্লেখ পাইতেছি স্বর্ণখনির। Schoff সাহেব অনুমান করেন, এই স্বর্ণ আসিত Erannaboas (সংস্কৃত, হিরণ্যবাহ) বা বর্তমান সোন নদ বাহিয়া। কিন্তু Herodotus হইতে আরম্ভ করিয়া প্লিনি পর্যন্ত তিব্বতের যে ant-gold-এর কথা বলিতেছেন, Periplus-এ যে তাহার উল্লেখ নাই সে কথা কে বলিবে ? কিন্তু এ দুয়ের কোনওটিই বাঙলাদেশের নয়। বহু দিন পরে টেভারনিয়ারের ভ্রমণবৃত্তান্তে কিছু পাইতেছি, আসাম ও উত্তর-ব্রহ্মের নদী বাহিয়া কিছু কিছু সোনা ত্রিপুরাদেশের ভিতর দিয়া বাঙলায় আসিত। এই সোনার পরিমাণ ছিল যথেষ্ট, যদিও স্বরূপ খুব উৎকৃষ্ট ছিল না। ত্রিপুরার যে-সব বণিক ঢাকায় বাণিজ্য করিতে আসিতেন, তাঁহারা টুকরা টুকরা সোনার পরিবর্তে লইয়া যাইতেন প্রবাল, অয়স্কান্ত মণি, কূর্মাবরণের এবং সামুদ্রিক শঙ্খের বালা। রাঢ়ের দক্ষিণ-সমুদ্রে যে প্রচুর মুক্তা পাওয়া যাইত তাহার একটু ইঙ্গিত আছে রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলয় লিপিতে। তাহা ছাড়া, নিম্ন-বঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিমে সুবর্ণরেখা নদী, ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার সোনারং, সোনার গাঁ বা সুবর্ণগ্রাম, সুবর্ণবীথি, সোনাপুর প্রভৃতি প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় স্থান-নামগুলিও আমার কাছে একেবারে নিরর্থক মনে হয় না। এইসব জনপদের নদীগুলিতে এক সময় dust gold পাওয়া যাইত, তাহারই স্মৃতি হয়তো নামগুলির মধ্য থাকিয়া গিয়াছে।

তলোয়ার

যাহা হউক, কার্পাসবস্ত্র ও অন্যান্য বস্ত্রশিল্পের উল্লেখ অর্থশাস্ত্র বা Periplus ছাড়াও অন্যত্র অনেক জায়গায় আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইবন্ খুর্দদ্‌বা নামক আরব ভৌগোলিকের (দশম শতক) নাম করা যাইতে পারে। ইনি রহ্‌মি বা রহ্‌ম নামে একটি

দেশের নাম করিতেছেন : এই রহ্‌মি বা রহ্‌ম দেশকে Elliot সাহেব মোটামুটি বঙ্গ-দেশের সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। আমার মনে হয়, Elliot সাহেবের এই অনুমান যথার্থ নয় ; রহ্‌মি বা রহম্‌ প্রাচীন আরাকান (রহ্‌ম্‌ = রহন্‌ = রখন্‌ = আরাকান)। ইব্‌ন খুর্দদ্‌বা বলিতেছেন, "জলপথে জাহাজের সাহায্যে রহ্‌মি দেশের রাজা অন্যান্য দেশের রাজাদের সঙ্গে সম্বন্ধ রক্ষা করেন। তাঁহার পাঁচ হাজার হাতি আছে, এবং তাঁহার দেশে কার্পাসবস্ত্র এবং অগুরু কাঠ উৎপন্ন হয়।" এই রহ্‌মি দেশ সম্বন্ধেই আরবদেশীয় সওদাগর সুলেমান্‌ (নবম দশক) বলিতেছেন, এ দেশে এক প্রকার সূক্ষ্ম ও সুকোমল বস্ত্র উৎপন্ন হইত, অন্য কোনও দেশে এমন সূক্ষ্ম বস্ত্র উৎপন্ন হইত না ; এ বস্ত্র এত সূক্ষ্ম ও কোমল ছিল যে একটা আংটির ভিতর দিয়া তাহাকে চালাইয়া দেওয়া যাইত। সুলেমান আরও বলেন যে, এ বস্ত্র ছিল কার্পাসের তৈরি, এবং তেমন বস্ত্র তিনি নিজের চোখে দেখিয়াছেন। ত্রয়োদশ শতকের প্রথম ভাগে চীন-পরিব্রাজক চাও-জু-কুয়া পিং কলো বা বাঙলাদেশ সম্বন্ধে বলিতেছেন, এ দেশে খুব ভাল দুমুখো তলোয়ার তৈরি হয়, এবং কার্পাস এবং অন্যান্য বস্ত্র উৎপন্ন হয়। ত্রয়োদশ শতকেরই শেষের দিকে (১২৯০) মার্কো পোলো, গুজরাট, কাম্বে, তেলিঙ্গানা, মালাবার ও বঙ্গদেশে কার্পাস উৎপাদন ও কার্পাস বস্ত্রশিল্পের কথা বলিয়াছেন। বঙ্গদেশ সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন, বাঙলাদেশের লোকেরা প্রচুর কার্পাস উৎপাদন করে, এবং তাহাদের কার্পাসের ব্যবসা ছিল খুব সমৃদ্ধ। পঞ্চদশ শতকে আর একজন চীন-পরিব্রাজক মা-হুয়ান্‌ (১৪০৫) বাঙলাদেশে আসিয়াছিলেন ; সৈফুদ্দীন হম্‌জা সাহ্‌ তখন গৌড়ের রাজা। কার্পাসবস্ত্রের উল্লেখ ছাড়াও তাহার বিবরণটি অন্যান্য ধনসম্বলের পরিচয়ের দিক হইতে উল্লেখযোগ্য। চেহ্‌টি-গান (চট্টগ্রাম) ও সোনা-উর্‌-কোঙ্‌ (সোনারগাঁ = সুবর্ণগ্রাম) উল্লেখের পর তিনি গৌড় রাজধানীর কথা বলিতেছেন, 'এই রাজ্যের নগরগুলি প্রাচীর বেষ্টিত ; অধিবাসীরা কৃষ্ণবর্ণ এবং মুসলমান। ভাষার নাম বাঙলা, তবে পারস্য ভাষার ব্যবহারও আছে। মুদ্রার নাম টঙ্কা ; অল্প মূল্যের জন্য কড়িও ব্যবহার করা হয়। সমস্ত বৎসর ধরিয়া চীন দেশের গ্রীষ্মকালের মতন গরম। নানা প্রকার ধান, যব, গম ও সর্ষপ এ দেশের প্রধান শস্য। এই দেশে নারিকেল, ধান, তাল ও কাঙ্গু হইতে মদ তৈরি করা হয়, এবং সেই মদ প্রকাশ্যভাবে বিক্রয় করা হয়। উৎপন্ন ফলের মধ্যে কলা কাঁটাল, আম, ডালিম ও ইক্ষু প্রধান। এ দেশে ছয় প্রকারের সূক্ষ্ম কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত হয় ; এই বস্ত্র সাধারণত প্রস্থে দুই এবং দৈর্ঘ্যে উনিশ হাত। এই দেশে রেশমের কীট পালিত হয় ও রেশমনির্মিত বস্ত্র বয়ন করা হয়।...'

কার্পাস সম্বন্ধে একটু পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে চর্যাগীতি-গ্রন্থ হইতেও। এই গ্রন্থ সহজিয়া গুহ্যসাধনার আনন্দ-সংগীত ; ইহার অনেক পদের অর্থ সুস্পষ্ট নয়। তথাপি নানা রাগরাগিণীর এই গানগুলি যে সাধনার আনন্দ প্রকাশ করিতেছে, এ কথা

সহজেই বুঝা যায়। এই গ্রন্থে শবরপাদের একটি পদে আছে :—"হেরি সে মেরি তইলা বাড়ী খসমে সমতুলা। সুকড় এসে রে কপাসু ফুটিলা॥ তইলা বাড়ীর পাসে'র জোহ্না বাড়ী উএলা। ফিটেলি অন্ধারি রে আকাশ ফুলিআ॥" ইহার প্রথম দুই লাইনের তিব্বতী অনুবাদ হইতে প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় সংস্কৃত অনুবাদ করিয়াছেন এইরূপ :—"মম উদ্যানবাটিকাং দৃষ্ট্বা খসম-সমতুল্যাম্। কার্পাসপুষ্পম্ প্রস্ফুটিতম্ অত্যর্থং আনন্দিতঃ ভবতি।" বাড়ির বাগানে কার্পাসফুল ফুটিয়াছে, দেখিয়াই আনন্দ, যেন ঘরের চারপাশ উজ্জ্বল হইল, আকাশের অন্ধকার টুটিল। ইহা হইতেই বুঝা যায়, কার্পাসকে কতখানি মূল্য দেওয়া হইত তদানীন্তন বাঙলাদেশে। শান্তিপাদের একটি পদে আছে ঃ—"তুলা ধুঁনি আঁসুরে আঁসু। আঁসু ধুনি ধুনি নিরবর সেসু॥ তুলা ধুঁনি ধুঁনি সুনে আহারিউ। পুন লইয়া অপনা চটারিউ॥" ভাবার্থ এই : তুলা ধুনিয়া ধুনিয়া আঁশ তৈরি করা হইতেছে, আঁশ ধুনিয়া ধুনিয়া আর কিছু বাকি নাই। তুলা ধুনিয়া ধুনিয়া শূন্যে উড়াইতেছি ; আবার তাহাই লইয়া ছড়াইয়া দিতেছি। হয়তো ইহার গূঢ় অর্থ আছে ; কিন্তু তুলা ধুনিবার যে ইহা একটি বাস্তব চিত্র, তাহাতে আর সন্দেহ কী ? কাহ্নপাদের একটি পদে তাঁতবিক্রয়ের কথাও আছে ; সাধারণত ডোমনীরাই বোধ হয় তাঁত (বাঁশের) তৈরি করিত [তান্তি বিকণঅ ডোম্বী অবর না চাংগেড়া (বাঁশের চাঙাড়ি)]। আর একটি পদের রচয়িতার নাম পাইতেছি তন্ত্রীপাদ। তন্ত্রীপাদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতেছে, তাঁত-শিক্ষক অথবা তাঁত-গুরু। ইহাই বোধ হয় এই পদ-রচয়িতার পূর্বতন বৃত্তি ছিল, পরে তিনি 'সিদ্ধ' হইয়াছিলেন। এই অনুমানের কারণ পদটির ভিতরেই আছে। ইহার মূল বাঙলা পাওয়া যায় নাই ; তবে তিব্বতী অনুবাদ হইতে প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় যে সংস্কৃত অনুবাদ করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ হইতে বুঝা যাইবে, গীত ও সাধন-সংবদ্ধ সমস্ত রূপকটি গড়িয়া উঠিয়াছে বস্ত্রবয়নকে অবলম্বন করিয়া।

কালপঞ্চকতন্ত্রং নির্মলং বস্ত্রং বয়নং করোতি।
অহং তন্ত্রী আত্মনঃ সূত্রম্॥
আত্মনঃ সূত্রস্য লক্ষণং ন জ্ঞাতম্॥
সার্দ্ধত্রিহস্তং বয়নগতিঃ প্রসরতি ত্রিধা।
গগনং পূরণং ভবতি অনেন বস্ত্রবয়নেন॥

নির্ধন ব্রাহ্মণের গৃহে নারীরা যে তুলা ধুনিয়া সূতা কাটিতেন তাহা কবি শুভাঙ্কের (আনুমানিক, একাদশ-দ্বাদশ শতক) একটি প্রশস্তি শ্লোকে জানা যায়।

"কার্পাসাস্থিপ্রচয়নিচিতা নিধান শ্রোত্রিয়াণাং
যেষাং বাত্যাপ্রবিততকুটীপ্রাঙ্গণান্তা বভুবুঃ।" (সদুক্তিকর্ণামৃত)।

সমসাময়িক কালেরই আর একজন অজ্ঞাতনামা কবি বঙ্গ-বারাঙ্গনাদের সূক্ষ্ম বসনের

(বাসঃ সূক্ষ্মং বপুষি) উল্লেখ করিয়াছেন (সদুক্তিকর্ণামৃত)। চতুর্দশ শতকে তীরভুক্তি-বাসী জ্যোতিরীশ্বর তাঁহার বর্ণরত্নাকর গ্রন্থে বাঙলাদেশের 'মেঘ-উদুম্বর', 'গঙ্গা-সাগর', 'লক্ষ্মীবিলাস', 'সিলহটী' (শ্রীহট্ট-জাত), 'গাঙ্গেরী' ইত্যাদি পট্ট ও নেতবস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন।

উপরের এই আলোচনা হইতেই বুঝা যাইবে, কার্পাসের চাষ, গুটিপোকার চাষ, কার্পাস ও অন্যান্য বস্ত্রশিল্পই ছিল প্রাচীন বাঙলার সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত শিল্প এবং ধনোৎপাদনের অন্যতম প্রধান উপায়। পট্টবস্ত্র বা পাটের কাপড়ের শিল্পও ছিল, এবং নানা উপলক্ষে, বিশেষভাবে পূজা, ব্রত, বিবাহানুষ্ঠান ইত্যাদি ব্যাপারে পট্টবস্ত্রের ব্যবহারেরও খুব প্রচলন ছিল। মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে পট্টবস্ত্রের উল্লেখ সুপ্রচুর। পাটের চাষ এখনকার মতো বিস্তৃত না হইলেও ছিল যে সন্দেহ নাই, এবং পাটের কচিপাতা বা নালিতা শাক এখনকার মতো তখনও বাঙালীর প্রিয় খাদ্য ছিল। প্রাকৃত পৈঙ্গল-গ্রন্থে সে কথার প্রমাণ আছে, অন্যত্র তাহা উল্লেখ করিয়াছি।

চিনি, লবণ ও মৎস্য শিল্প

বস্ত্রশিল্পের পরেই উল্লেখ করিতে হয় চিনি, লবণ ও মৎস্যের কথা। একটু পরেই এ সম্বন্ধে বিস্তৃত উল্লেখ করা হইয়াছে। চিনি মারফত দেশে প্রচুর অর্থাগম হইত বলিয়া মনে হয়। পৌণ্ড্রক ইক্ষু হইতে যে প্রচুর চিনি উৎপন্ন হয় এ কথা সুশ্রুত বহুদিন আগেই বলিয়াছেন। ত্রয়োদশ শতকে বাঙলাদেশ হইতে প্রধান রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে চিনির উল্লেখ করিয়াছেন মার্কো পোলো। ষোড়শ শতকের গোড়ায়ও ভারতের বিভিন্ন দেশে, সিংহলে, আরব ও পারস্য প্রভৃতি দেশে চিনি রপ্তানি লইয়া দক্ষিণ-ভারতের সঙ্গে বাঙলাদেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে, এ সাক্ষ্য দিতেছেন পর্তুগীজ পর্যটক বারবোসা। লবণের ব্যবসা লইয়া ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাড়াকাড়ির কথা সুবিদিত ; ইহা হইতেই অনুমান হয়, অষ্টাদশ শতকেও লবণের ব্যবসা খুব লাভজনকই ছিল। মৎস্যের একটা বিস্তৃত আন্তর্দেশিক ব্যবসা নিশ্চয়ই ছিল, কাঁচা এবং শুক্না মৎস্য দুয়েরই। বাঙলাদেশ তো চিরকালই মৎস্যাহারী, এবং বাঙালী স্মৃতিকার ব্রাহ্মণ ভবদেব ভট্ট যেমন করিয়া বাঙালীর মৎস্যাহারের সপক্ষে যুক্তি দিয়াছেন তাহাতে মনে হয়, আজিকার মতন তখনও বাঙলার বাহিরে বাঙালীর এই মৎস্যপ্রীতি সম্বন্ধে একটা ঘৃণার ভাব ছিল। ভবদেব ভট্ট নানাপ্রকার মৎস্যের উল্লেখ করিয়াছেন ; শুক্না মাছের কথাও বলিয়াছেন। দুইই ছিল ভক্ষ্য এবং সেই হেতু ব্যবসা-বাণিজ্যের অন্যতম দ্রব্য। যে-ভাবে দান-বিক্রয়ের পট্টোলীগুলিতে মৎস্যের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতেই মনে হয়, এই দ্রব্যটির মূল্য ও চাহিদা যথেষ্টই ছিল ; পাহাড়পুরের ২১১টি পোড়ামাটির ফলকে তাহার ইঙ্গিতও আছে।

কারুশিল্প : তক্ষণ ও স্থাপত্যশিল্প ; অলংকার শিল্প ; লৌহশিল্প ; মৃৎশিল্প ; কাষ্ঠশিল্প ; দন্তশিল্প ; কাংস্যশিল্প

কারুশিল্পও কম ছিল না। তাহার লিপি-প্রমাণ বিশেষ নাই, কিন্তু অনুমান সহজেই করা চলে। তক্ষণ ও স্থাপত্যশিল্প, স্বর্ণ ও রৌপ্যশিল্পের কথা আগেই প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিয়াছি ; এখানে আর বিস্তৃত করিয়া উল্লেখ করিবার বিশেষ কিছু নাই। সোনা, রূপা, মণি, হীরা ও বিচিত্র দ্যুতিময় প্রস্তরসজ্জিত নানা অলংকার বিত্তশালী সমাজে ব্যবহৃত হইত, এ কথা তো সহজেই অনুমেয়। অন্যত্র উল্লিখিত বিচিত্র দেবদেবীর অলংকরণ ঐশ্বর্য দেখিলে তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। তবকত্-ই নাসিরী গ্রন্থে উল্লেখ আছে, লক্ষ্মণসেন সোনা ও রূপার বাসনে আহার করিতেন। ইহা কিছু অত্যুক্তি নয়। রাজারাজড়া তো করিতেনই, বণিক সাধু-সওদাগরেরাও করিতেন ; তাহার কিছু আভাস মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যেও আছে। রামচরিত-কাব্যে মণিময় ঘুঙুর, মুক্তা, হীরা ও নানা বিচিত্রবর্ণ প্রস্তরখচিত অলংকারের উল্লেখ আছে ; বিজয়সেনের দেওপাড়া লিপি, লক্ষ্মণসেনের নৈহাটীলিপি এবং অন্যান্য লিপিতে দেবদাসী, রাজান্তঃপুরের নারী ও পরিচারিকাদের নানা মূল্যবান অলংকার-সজ্জার উল্লেখ আছে। এই বিলাস ঐশ্বর্যের প্রদর্শনী সেন আমলেই বেশী আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। লৌহশিল্পও ছিল; দুই একটি শাসনে কর্মকার তো রাজপাদোপজীবী বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছেন। চাও-জু-কুয়া যে বলিয়াছেন, বাঙলাদেশে দুমুখো খুব ধারালো তলোয়ার তৈরি হয়, তাহার মধ্যে লৌহ ইত্যাদি ধাতুশিল্পে এ দেশের শিল্প-কৃতিত্ব প্রকাশ পাইতেছে। লৌহশিল্পের প্রচলন যে খুবই ছিল তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। কর্মকারের সুপ্রাচুর্য না থাকিলে তো কৃষিকর্ম এবং কৃষিসমাজ চলিতেই পারে না। দা', কুড়াল, কোদালি, খন্তা, খুরপি, লাঙ্গল ইত্যাদি ছাড়া লোহার জল-পাত্র (ইদিলপুর লিপি), তীর, বর্শা, তরোয়াল ইত্যাদি যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্রও প্রচুর তৈরি হইত। অগ্নিপুরাণের মতে অঙ্গ ও বঙ্গদেশ তরোয়ালের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল ; বঙ্গদেশীয় তরোয়াল নাকি ছিল খুব শক্ত ও ধারালো। কুম্ভকারের মৃৎশিল্পের প্রচলনও ছিল খুব। কুম্ভকারের উল্লেখ ২।১টি লিপিতে আছে (যথা, বৈদ্যদেবের কমৌলি লিপি), এবং একাধিক লিপিতে কুম্ভকার-গর্তের উল্লেখও আছে (যথা, নিধনপুর লিপি)। এই উল্লেখ-প্রসঙ্গ হইতে মনে হয়, কুম্ভকার-বৃত্তির কেন্দ্র ছিল গ্রাম। পোড়ামাটির নানা প্রকারের থালা, বাটি, জলপাত্র, রন্ধনপাত্র, দোয়াত, প্রদীপ ইত্যাদি পাহাড়পুরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে, বজ্রযোগিনীর সন্নিকটস্থ রামপালে, ত্রিপুরায় ময়নামতীর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। পাহাড়পুর, মহাস্থান, সাভার ইত্যাদি স্থানে প্রাপ্ত অসংখ্য পোড়ামাটির ফলকও বিস্তৃত মৃৎশিল্পের সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

শ্রীহট্ট জেলার ভাটেরা গ্রামে প্রাপ্ত গোবিন্দ-কেশবের শাসনে আমরা রাজবিগা নামে

জনৈক দন্তকারের উল্লেখ পাইতেছি ; মনে হইতেছে, হস্তিদন্ত-শিল্পের প্রচলনও ছিল। কেশবসেনের ইদিলপুর লিপিতে দ্বিপদন্ত-দণ্ড শিবিকার উল্লেখ পাইতেছি। সূত্রধরের উল্লেখও কয়েকটি লিপিতে পাইতেছি। আশ্চর্যের বিষয় এই, ইঁহাদের উল্লেখ তাম্রপট্ট-গুলির খোদাইকররূপে ; লিখিত শাসন ইঁহারাই তাম্রপট্টে উৎকীর্ণ করিতেন। এই অর্থে আমরা এখন আর এই শব্দটি ব্যবহার করি না, কিন্তু যে-যুগের কথা আমরা বলিতেছি, সে-যুগে যে ব্যবহৃত হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। না হইবারও কারণও নাই। সূত্রধর যে শুধু কাঠ-মিস্ত্রী, তাহাই নয় ; আমাদের প্রাচীন বাস্তু-শাস্ত্রে (যেমন, মানসারে) সূত্রধর বলিতে স্থপতি তক্ষণকার, খোদাইকর, কাঠ-মিস্ত্রী সকলকেই বুঝাইত। কাঠের শিল্পের প্রচলনও কম ছিল না। কাঠের তৈরি ঘরবাড়ি কালের ভ্রূক্ষেপ উপেক্ষা করিয়া আজ আর বাঁচিয়া নাই, কিন্তু স্তম্ভ, খিলান, খুঁটি ইত্যাদির ২।৪টি টুকরা আজও যাহা পাওয়া যায় তাহাদের কারু ও শিল্পনৈপুণ্য বিস্ময়কর। ঢাকার চিত্রশালায় তেমন নিদর্শন কয়েকটি আছে। সংসারের আসবাবপত্র, ঘরবাড়ি, মন্দির, পালকি, গরুর গাড়ি, রথ, বিশেষভাবে নদীগামী নানাপ্রকার নৌকা ও সমুদ্রগামী বৃহদাকৃতি নৌকা বা জাহাজ ইত্যাদি সমস্তই তো ছিল কাঠের। সেই দিক দিয়া দেখিলে কাষ্ঠশিল্পের সমৃদ্ধি সহজেই অনুমেয়, এবং সমাজের মধ্যে এই শিল্পীদের একটা স্থানও ছিল। সাধারণ ভাবে শিল্পী ও শিল্পীগোষ্ঠীর কথার আভাস তো বিজয়সেনের দেওপাড়া লিপির খোদাইকর রাণক শূলপাণির "বারেন্দ্রক শিল্পিগোষ্ঠীচূড়ামণি" এই বিশেষণটির মধ্যেও আছে। তাহা ছাড়া, পঞ্চম হইতে অষ্টম শতকের তাম্রপট্টোলীগুলিতে ভূমি দান-বিক্রয় ব্যাপারে বিষয়পতি বা অন্য রাজপ্রতিনিধি রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে যে-কয়জন প্রধানের মতামত গ্রহণ করিতেন, অর্থাৎ যে-কয়জনে মিলিয়া অধিকরণ গঠিত হইত, তাহাদের মধ্যে প্রথম-কুলিক সর্বদাই অন্যতম। কুলিক অর্থ শিল্পী (artisan) ; এই প্রথম-কুলিক খুব সম্ভবত ছিলেন শিল্পীগোষ্ঠী বা নিগমের প্রধান প্রতিনিধি। নগরের অথবা বিষয়ের শ্রেষ্ঠ গণ্যমান্য শিল্পী যিনি ছিলেন, তিনিই এই জাতীয় অধিকরণে আসন লইবার জন্য আহূত হইতেন। রাজপাদোপজীবীদের মধ্যেও কোথাও কোথাও কুলিক বা শ্রেষ্ঠ শিল্পীর নাম পাওয়া যাইতেছে। পূর্বোল্লিখিত ভাটেরা গ্রামের গোবিন্দ-কেশবদেবের লিপিতে গোবিন্দ নামে এক কাংস্য অর্থাৎ কাংস্যকার বা কাঁসারীর উল্লেখ পাইতেছি। কাঁসা বা bell-metalএর শিল্পের আভাসও তাহা হইলে কিছু পাওয়া গেল। নানাপ্রকার মিশ্র ধাতুশিল্পের প্রমাণ ও পরিচয় আরও পাওয়া যায় অসংখ্য ব্রোঞ্জ ও অষ্টধাতুর রচিত মূর্তিগুলির মধ্যে।

নৌ-শিল্প

সকল শিল্পের মধ্যে নৌ-শিল্প বা নদীগামী নৌকা ও সমুদ্রগামী পোত-নির্মাণ শিল্পের একটা বিশেষ স্থান নিশ্চয়ই ছিল ; তাহার প্রমাণ শুধু বর্তমান চট্টগ্রামে কিংবা

মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যে নয়, প্রাচীন বাঙলার লিপিগুলিতে এবং সংস্কৃত সাহিত্যেও ইতস্তত ছড়াইয়া আছে। মৌখরী-রাজ ঈশানবর্মের হড়াহা লিপিতে (ষষ্ঠ শতকের দ্বিতীয় পাদ) গৌড়দেশবাসীদের (গৌড়ান্) "সমুদ্রাশ্রয়ান্" বলা হইয়াছে; ইহার অর্থ সমুদ্র-তীরবর্তী গৌড়দেশ হইতে পারে, অথবা সামুদ্রিক বাণিজ্যই যাহার আশ্রয়, সেই গৌড়দেশও বুঝাইতে পারে। কালিদাস রঘুবংশে রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে বাঙালীকে "নৌসাধনোদ্যতান্" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। পাল ও সেন বংশের লিপিমালায় নৌবাট, নৌবিতান (fleet of boats) প্রভৃতি শব্দ তো প্রায়শ উল্লিখিত হইয়াছে। এই উভয় রাজবংশের, এবং সমসাময়িক বাঙলাদেশের অন্যান্য রাজবংশেরও, সামরিক শক্তি নৌবলের উপর অনেকটা নির্ভর করিত; ইহার উল্লেখ তো অনেক শিলালিপিতেই আছে। বৈদ্যদেবের কমৌলি লিপিতে নৌযুদ্ধের বর্ণনাও আছে। সাধারণ লোকদের যাতায়াত এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য নৌ-যানের প্রয়োজন ছিল যথেষ্ট। এই নদীমাতৃক, খাড়িপ্রধান, বারিবহুল, এবং বহুলাংশে নিম্নভূমির দেশে ইহা তো স্বাভাবিক এবং সহজেই অনুমেয়। বৈন্যগুপ্তের গুণাইঘর লিপিতে (৫০৭-৮ খ্রী) নৌযোগ অর্থাৎ নৌকাঘাট বা বন্দর বা পোতাশ্রয়ের উল্লেখ আছে; এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, যে ভূমি-সীমানা সম্পর্কে এই নৌযোগের উল্লেখ, সেই ভূমি ত্রিপুরা জেলার গুণাইঘর গ্রামের নিকটবর্তী জলপ্লাবিত দেশে। ফরিদপুর জেলায় প্রাপ্ত মহারাজ ধর্মাদিত্যের ১নং তাম্রপট্টোলীতে ভূমির সীমা সম্পর্কে "নাবাত-ক্ষেণী" কথার উল্লেখ আছে। 'নাবাত' পাঠ খুব শুদ্ধ বলিয়া মনে হয় না, প্রকাশিত প্রতিলিপিতে 'ভাবতা' পাঠই সমীচীন মনে হয়; কিন্তু 'ভাবতা-ক্ষেণী' কথার কোনও সংগত অর্থ এস্থলে করা যায় না। সেইজন্য পার্জিটার সাহেবের আনুমানিক পাঠ নাবাত-ক্ষেণী' আপাতত স্বীকার করা যাইতে পারে। তিনি ইহার অনুবাদ করিয়াছেন, ship-building harbour। ধর্মাদিত্যের ২নং শাসনে অন্য একটি ভূমির সীমা সম্পর্কে "নৌদণ্ডক" কথার উল্লেখ আছে, বোধ হয় "নৌদণ্ডক" কথার অর্থও নৌকার আশ্রয়, নৌকা যেখানে বাঁধা হইত সেই স্থান, অর্থাৎ বন্দর, ঘাট। এইসব উল্লেখ হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, নদনদীগামী ছোটবড় নৌকা, সমুদ্রগামী পোত ইত্যাদি নির্মাণ-সংক্রান্ত একটা সমৃদ্ধ শিল্প ও ব্যবসায় প্রাচীন বাঙলায় নিশ্চয়ই ছিল। রক্তমৃত্তিকাবাসী মহানাবিক বুদ্ধগুপ্তের কাহিনী সুপরিচিত। ভাটেরার গোবিন্দকেশবের লিপিতেও জনৈক নাবিক দ্যোজ্জের উল্লেখ পাইতেছি।

৫

ব্যবসা-বাণিজ্য

পান, গুবাক ও নারিকেলের ব্যবসা। লবণের ব্যবসা

এই নৌ-শিল্পের কথা হইতেই ধনোৎপাদনের তৃতীয় উপায় ব্যবসা-বাণিজ্যের কথার মধ্যে আসিয়া পড়া যাইতে পারে। এ-পর্যন্ত ভূমিজাত ও শিল্পজাত যে-সব দ্রব্যাদির

কথা বলিয়াছি, তাহাই ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের উপকরণ। ফলফুল, অর্থাৎ আম, কাঁটাল, মহুয়া ইত্যাদি লইয়া কোনও বিস্তৃত ব্যবসা সম্ভব ছিল না, মৎস্য সম্বন্ধেও তাহাই। তবু গ্রাম হইতে গ্রামান্তরের হাটে হাটে এইসব জিনিস লইয়া ছোটখাট ব্যবসা-বাণিজ্য চলিত বইকি। হট্ট, হট্টিকা, হট্টিয়গৃহ, হট্টবর, আপণ, মণ্ডপ (তৌলদার = দোকানদার = ছোট ব্যবসায়ী) ইত্যাদি শব্দের উল্লেখ প্রায়শ লেখমালাগুলিতে দেখা যায়। অষ্টম শতক-পরবর্তী লিপিগুলিতে তো অনেক স্থলেই হাট-বাজার-ঘাট সমেত (সহট্ট সঘট্ট) জমি দান করা হইয়াছে। হট্টপতি, শৌল্কিক, তরিক ইত্যাদি রাজকর্মচারীর উল্লেখ হইতেও একটা সমৃদ্ধ অন্তর্বাণিজ্যের কতকটা আভাস পাওয়া যায়; হাটবাজার, বাণিজ্য-শুল্ক এবং পারঘাটা-খেয়াঘাটের কর ইত্যাদি আদায়ের দায়িত্ব ছিল ইঁহাদের উপর। প্রসঙ্গ উল্লেখ হইতে মনে হয়, এইসব উপায় হইতে রাষ্ট্রের যথেষ্ট অর্থাগম হইত। ধর্মাদিত্যের পট্টোলী দুইটিতে "ব্যাপার-কারণ্ডয়" এবং "ব্যাপারণ্ড্য" ও গোপচন্দ্রের পট্টোলীতে "ব্যাপারায় বিনিযুক্তক" নামে একপ্রকার রাজপুরুষের উল্লেখ আছে. খুব সম্ভব ইঁহারা ব্যবসা-বাণিজ্য রক্ষণাবেক্ষণের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন এবং ছোটবড় নগরগুলিই এইসব ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল। নব্যাবকাশিকা এবং কোটীবর্ষ যে বণিক ও ব্যবসায়ীদের খুব সমৃদ্ধ মিলনকেন্দ্র ছিল, এ খবর তো কোটালিপাড়া ও দামোদরপুর পট্টোলীতেই পাওয়া যায়। পুণ্ড্রবর্ধনের কোনও এক অনুল্লিখিত স্থানে যে বিচিত্র বিপণিমালা শোভিত এক সমৃদ্ধ, বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল, সে খবর পাওয়া যাইতেছে সোমদেবের কথাসরিৎসাগর-গ্রন্থে। কিন্তু শহর ছাড়া গ্রামাঞ্চলের হাটবাজারেও কিছু কিছু ব্যবসা-বাণিজ্য নিশ্চয়ই চলিত। ইর্দা লিপিতে দেখিতেছি হাটসহ একটি গ্রাম দান করা হইতেছে; দামোদর লিপি, ধর্মপালের খালিমপুর লিপি, গোবিন্দকেশবের ভাটেরা লিপি প্রভৃতিতেও হাটবাজার সমেত অনুরূপ ভূমি বা গ্রাম দান-বিক্রয়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এইসব গ্রাম ও গ্রামান্তরের হাটে স্থানীয় উৎপন্ন ও নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়াই ক্রয়-বিক্রয় চলিত। ভূমিজাত অন্যান্য কিছু কিছু দ্রব্য, যেমন পান, সুপারি, নারিকেল ইত্যাদির ব্যবসা নিশ্চয়ই বিস্তৃততর ছিল সন্দেহ নাই, এবং শুধু বাঙলাদেশের ভিতরেই নয়, দেশের বাহিরেও প্রতিবেশী দেশগুলিতে সুপারি ও নারিকেল এই দুই দ্রব্যই কিছু কিছু রপ্তানি হইত, এরূপ অনুমান করা যায় পরবর্তী মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যের প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া। বংশীদাসের মনসামঙ্গলে ও কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে পাই, দক্ষিণ-ভারতের সমুদ্রোপকূল বাহিয়া বাঙালী বণিকেরা গুজরাট পর্যন্ত যে বাণিজ্য-সম্ভার লইয়া যাইতেন, তাহার মধ্যে গুয়া (ক) বা গুবাক, পান ও নারিকেল উল্লেখ্য। গুয়ার বদলে লইয়া আসিতেন মাণিক্য, পানের বদলে মরকত এবং নারিকেলের বদলে শঙ্খ। গুয়া বা গুবাক যে সুপারি নাম লইল, তাহার ইতিহাসের মধ্যে বাঙলাদেশের এই দ্রব্যটির বাণিজ্য ইতিহাসও লুকাইয়া আছে। বর্তমান গৌহাটি শহরের নামটি আসিয়াছে গুয়া হইতে; গুবাক ক্রয়-বিক্রয়ের

হাট বা হাটি অর্থে গুবাহাটি = গুয়াহাটি = গৌহাটি। যাহা হউক, এই গুবাক প্রাচীন কালেই আরব-পারস্য প্রভৃতি দেশগুলিতে রপ্তানি হইত; ঐ দেশীয় বণিকেরা এই দ্রব্য জাহাজ বোঝাই করিতেন বাঙলাদেশের কোনো সামুদ্রিক বন্দর হইতে নয়, পশ্চিম-ভারতের বন্দর শূর্পারক = সুপ্পারক = সোপারা হইতে, এবং তাঁহারা এই দ্রব্যকে সোপারার ফল বলিয়াই জানিতেন; এই অর্থে পরবর্তী কালে গুবাক হইল সুপারি এবং সেই নামেই ভারতের সর্বত্র ইহার পরিচয়; কিন্তু বাঙলাদেশের, বিশেষত পূর্ববাঙলার গ্রামে গ্রামে এখনও ইহার নাম গুবা বা গুয়া। গুবাকের ব্যবসা যে খুবই প্রশস্ত ছিল, এবং তাহা হইতে এই দেশের প্রচুর অর্থাগমও হইত, তাহার প্রমাণ তো ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমল পর্যন্তও পাওয়া যায়। কোম্পানির আমলে সুপারি বাঙলাদেশের একচেটিয়া ব্যবসা ছিল। এই সুপারি-নারিকেলের অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের ইতিহাস যদি পরবর্তী মধ্যযুগ বাহিয়া কোম্পানির আমল পর্যন্ত অনুসরণ করা যায়, তবেই বুঝা যাইবে প্রাচীন বাঙলার ভূমিদান সম্পর্কিত লিপিগুলিতে বিশেষ করিয়া গুবাক, নারিকেল এবং পানের বরজের [বর্ (অস্ট্রিক্) = পান, বরজ = পান যেখানে জন্মায়; পানের বরজ যাঁহাদের জীবিকা তাঁহারা বারুজীবী = বারুই] উল্লেখ কেন করা হইয়াছে, এবং অনেক ক্ষেত্রে তাহা হইতে আয়ের পরিমাণও কেন উল্লেখ করা হইয়াছে। লবণ সম্বন্ধেও ঠিক একই কথা বলা চলে। বাঙলাদেশের লবণ সামুদ্রিক লবণ। মধ্যযুগের যে দুইটি কাব্যের নাম কিছু আগে করিয়াছি, তাহাতেই প্রমাণ আছে, লবণও অন্যতম বাণিজ্যদ্রব্য ছিল। বাঙালী বণিকেরা সামুদ্রিক লবণের বিনিময়ে পাথুরে লবণ লইয়া আসিতেন। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলেও দেখি, লবণের ব্যবসা লইয়া কাড়াকাড়ি, কোম্পানির সওদাগরেরা অনবরত চেষ্টা করিতেছেন লবণের ব্যবসা একচেটিয়া করিতে। এই প্রয়াসের ইতিহাস পড়িলে স্বতই মনে হয়, ব্যবসাটা খুবই লাভবান ছিল। সে-কথাটি না বুঝিলে প্রাচীন লিপিগুলিতে কেন যে ভূমি-দানের সময় বারবারই 'সলবণ' কথাটি উল্লেখ করা হইতেছে, সে-রহস্যটি ধরা পড়ে না।

পিপ্পলির দাম। বস্ত্র-ব্যবসা ও বস্ত্রের মূল্য

Periplus Erythri Mari-গ্রন্থে তেজপাতা ও পিপ্পলের উল্লেখ আমরা দেখিয়াছি। এই দুটি দ্রব্যের ব্যবসাও খুব লাভজনক ব্যবসা ছিল, সন্দেহ নাই। সব দ্রব্যের বাণিজ্য-মূল্য উপাদানের অভাবে জানিবার উপায় নাই; কিন্তু পিপ্পলির বাণিজ্যমূল্যের খানিকটা আভাস পাইতেছি প্লিনির ইণ্ডিকা নামক গ্রন্থ হইতে (খ্রী প্রথম শতক)। তিনি বলিতেছেন, রোম সাম্রাজ্যে এক পাউণ্ড বা আধ সের পিপ্পলির দাম ছিল তখনকার দিনে ১৫ দিনার, অর্থাৎ পনরটি স্বর্ণমুদ্রা। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে, এইসব বাণিজ্যসম্ভার হইতে দেশে কম অর্থাগম হইত না। কার্পাস ও অন্যান্য বস্ত্রশিল্প সম্বন্ধেও একই কথা

বলা চলে। এই শিল্প সম্বন্ধে আগে যে-সমস্ত প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা হইতেই বুঝা যাইবে, নানা প্রকার বস্ত্রের ব্যবসা বাঙলাদেশে খুব সুপ্রাচীন এবং শুধু প্রাচীন বাঙলায়ই নয়, একেবারে অষ্টাদশ শতকের শেষ, উনবিংশ শতকের প্রথম পর্যন্ত সর্বদাই এই বস্ত্রশিল্পের ব্যবসা দেশের অর্থাগমের একটা মস্ত বড় উপায় ছিল। প্লিনি সেই খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকেই বলিতেছেন, ভারতবর্ষ হইতে যত রেশম ও কার্পাস ইত্যাদি বস্ত্র পশ্চিমের বণিকেরা বহন করিয়া লইয়া যাইত, তাহার বার্ষিক মূল্য ছিল (আনুমানিক) এক লক্ষ (স্বর্ণ ?) মুদ্রা। এই অর্থের একটা বৃহৎ অংশ যে বাঙলাদেশে আসিত, তাহাতে সন্দেহ কী ?

বাণিজ্যে তাম্রলিপ্তের স্থান। রাষ্ট্র ও সমাজে বণিক ব্যবসায়ীর স্থান

বংশীদাসের মনসামঙ্গল অথবা মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যে বাঙালীর অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের যে ছবি পাওয়া যায়, তাহা অতিরঞ্জিত সন্দেহ নাই। গ্রন্থ দুইটি আমাদের যুগের পক্ষে অর্বাচীনও, কিন্তু তৎসত্ত্বেও সাক্ষ্য দুটি যে বাঙালীর প্রাচীন বাণিজ্যস্মৃতি বহন করে, একথা সকলেই স্বীকার করেন। ইহার সাক্ষ্য আমাদের বক্ষ্যমাণ বিষয়ে প্রামাণিক কিছুতেই নয়, তবু এই দেশজাত পান, গুবাক, নারিকেল ইত্যাদির পরিবর্তে বণিকেরা যে-সব মূল্যবান দ্রব্য লইয়া আসিতেন তাহার অংশমাত্রও যদি সত্য হয়, তাহা হইলেও এ-কথা অনুমান করা চলে যে, প্রাচীন বাঙলায় অর্থাগমের অন্যতম নয়, প্রথম ও প্রধান উপায়ই ছিল বাণিজ্য। এ কথা যে একেবারে শূন্যকথা নয়, তাহা বস্ত্রশিল্প ও পিপ্পল সম্বন্ধে প্লিনির উক্তি হইতেও কতকটা বুঝা যায়। ইক্ষু ও ইক্ষুজাত দ্রব্য, লবণ, নানা প্রকারের হীরা, মুক্তা ও সোনা, তেজপাতা ও অন্যান্য মসলাদ্রব্য ইত্যাদির কথা তো আগেই বলিয়াছি। হাজারিবাগ জেলার দুধপানি পাহাড়ে একটি লিপি উৎকীর্ণ আছে ; অক্ষরের রূপ দেখিয়া মনে হয় লিপিটি খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের। এই লিপিতে আছে :

অথ কস্মিংশ্চি[ৎ স]ময়ে বাণিজ্যে ভ্রাতরস্ত্রয়ঃ।
তাম্রলিপ্ত[ম]যোধ্যায়া যযুঃ পূর্ববণিজয়া ॥
ভূয়ঃ প্রতিনিবৃত্তাস্তে সমাসাং বিয়াসবঃ।
প্রয়োজনেন কেনাপি চিরঞ্চক্রুরিহ স্থিতিং ॥
সুবর্ণ মণি মাণিক্য মুক্তা প্রভৃতি বৈর্ধনং।
বিত্তপণ্যার্ধয়েবা সোদপর্যন্তমুপার্জিতং ॥

অষ্টম শতকে বলা হইতেছে, 'কোনো-এক সময়ে' অর্থাৎ এখানে যে উল্লেখটি আছে, তাহা একটি প্রাচীন দিনের ঘটনার স্মৃতি। কিন্তু, বাণিজ্য উপলক্ষে তিন ভাই অযোধ্যা হইতে তাম্রলিপ্তিতে আসিয়া কিছুকালের মধ্যে প্রচুর ধনরত্ন উপার্জন করিয়া নিজের দেশে ফিরিয়া

গিয়াছিলেন, এ কথাটির মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে, তাহাতে আর সন্দেহ কী ? বৌদ্ধ জাতকের অনেক গল্পে বাণিজ্য উপলক্ষে তাম্রলিপ্তির উল্লেখও সুপরিচিত ; পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সোমদেবের কথাসরিৎসাগরে একাধিক জায়গায় উল্লেখ আছে, পাটলীপুত্র হইতে বাণিজ্য উপলক্ষে বণিকদের পুণ্ড্রে অথবা পুণ্ড্রবর্ধনে আসিবার কথা। ই-ৎসিঙ্‌ও এই পথেরই উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, তাম্রলিপ্তি হইতে পশ্চিমবাহী পথ ধরিয়া যখন তিনি বুদ্ধগয়া যাইতেছিলেন তখন তাঁহার পথসঙ্গী হইয়াছিল শত শত বণিক। তাম্রলিপ্তির বাণিজ্যের উল্লেখও বারবার নানা গ্রন্থে দেখা যাইতেছে। বিদ্যাপতির পুরুষপরীক্ষায় গুজরাটের সঙ্গে গৌড়ের বাণিজ্য-সম্বন্ধে আভাস পাইতেছি। গঙ্গার মুখে গঙ্গাবন্দরের কথা, তাম্রলিপ্তি ও কর্ণসুবর্ণের বাণিজ্য-সমৃদ্ধির উল্লেখ তো য়ুয়ান্-চোয়াঙ্‌ও করিয়া গিয়াছেন। য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ বলেন, নানা প্রকার মূল্যবান দ্রব্য, মণিরত্ন ইত্যাদির প্রচুর সমাগম হইত তাম্রলিপ্তিতে ; তাম্রলিপ্তির লোকেরা এই হেতুই খুব বিত্তবান ছিলেন। কথাসরিৎসাগরের মতে তাম্রলিপ্তি বিত্তশালী বণিকদের কেন্দ্র ছিল ; তাঁহারা লঙ্কা, সুবর্ণদ্বীপ ও অন্যান্য দেশের সঙ্গে সমৃদ্ধ সামুদ্রিক বাণিজ্যে লিপ্ত ছিলেন। উত্তাল বিক্ষুব্ধ সমুদ্রকে তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা মণিরত্ন ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যাদি জলে অর্পণ করিয়া পূজা করিতেন। এই সুপ্রাচীন রীতির উল্লেখ মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যেও দেখা যায়। এই-সমস্ত সাক্ষ্যই সুপরিচিত। এই সব সাক্ষ্যপ্রমাণ দেখিলে সহজেই মনে হয়, প্রাচীন বাঙলার সমৃদ্ধি যাহা ছিল, তাহা বহুলাংশে নির্ভর করিত ব্যবসা-বাণিজ্যেরই উপর। তাহা ছাড়া পঞ্চম হইতে অষ্টম শতক পর্যন্ত দেখিতেছি, ভূমি দান-বিক্রয়ের দলিলগুলিতে স্থানীয় অধিকরণে যাঁহাদের আহ্বান করা হইতেছে, সেই পাঁচ জনের মধ্যে দুই জন তো রাজকর্মচারীই—বিষয়পতি স্বয়ং এবং প্রথম-কায়স্থ বা জ্যেষ্ঠ-কায়স্থ। বাকি তিন জনের মধ্যে দুই জন ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতিনিধি—নগরশ্রেষ্ঠী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠীগোষ্ঠীর যিনি প্রধান তিনি এবং প্রথম-সার্থবাহ অর্থাৎ বণিক্‌দের মধ্যে যিনি প্রধান তিনি। অবশিষ্ট যিনি রহিলেন, তিনি প্রথম-কুলিক অর্থাৎ শিল্পিগোষ্ঠীর প্রতিনিধি। তাহা হইলে দেখিতেছি, সমসাময়িককালে রাষ্ট্রেও কতকটা আধিপত্য এই বণিক্ ও ব্যবসায়ীরাই করিতেছেন। রাষ্ট্রের অন্যান্য ব্যাপারেও 'প্রধান ব্যাপারিণঃ' যাঁহারা তাঁহাদের সাহায্য লওয়া হইতেছে, মহত্তর অর্থাৎ সমাজের অন্যান্য গণ্যমান্য লোকদের সঙ্গে সঙ্গে। এই সম্বন্ধে পরবর্তী এক অধ্যায়ে আরও বলিবার সুযোগ আসিবে ; এইখানে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে, ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে এইসব শ্রেষ্ঠী ও বণিকদের হাতে যে অর্থাগম হইত, তাহার ফলেই ইঁহারা রাষ্ট্রে আধিপত্য লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। আমাদের শাস্ত্রে যে আছে, 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ তদর্ধং কৃষিকর্মণি', এ কথা প্রাচীন বাঙলায় যথার্থ সার্থকতা লাভ করিয়াছিল বলিলে ইতিহাসের অমর্যাদা হয় না। প্রাচীন বাঙলার লক্ষ্মী ব্যবসাবাণিজ্য-নির্ভরই ছিলেন বেশি, এবং সেই লক্ষ্মী বাস করিতেন বণিক্, ব্যাপারী, শ্রেষ্ঠী

ইত্যাদির ঘরে—ধর্মাদিত্যের ২নং এবং গোপচন্দ্রের তাম্রপট্টে যাঁহাদের যথাক্রমে বলা হইয়াছে ব্যাপার-কারণ্ডয়ঃ, ব্যাপারিণঃ, তাঁহাদের ঘরে। মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যে সওদাগরদের ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত কাহিনীগুলিতেও সে কথার প্রমাণ আছে; ধনপতি, হীরামাণিক, দুলালধন, ইত্যাদি নাম যে বণিকদের মধ্যেই পাই, তাহা একেবারে নিরর্থক নয়। বর্তমান হুগলী জেলার ভুরশুট গ্রামে প্রাচীন বাঙলার শ্রেষ্ঠীদের খুব বড় একটা কেন্দ্র ছিল। ভুরশুটের প্রাচীন নাম ভূরিশ্রেষ্ঠিক = ভূরিসৃষ্টি = ভূরিশ্রেষ্ঠীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় ভট্টভবদেবের শিলালিপিতে, শ্রীধর আচার্যের ন্যায়কন্দলী-গ্রন্থে। শেষোক্ত গ্রন্থে স্পষ্টই বলা হইয়াছে "ভূরিসৃষ্টিরিতি গ্রাম ভূরিশ্রেষ্ঠী-জনাশ্রয়"। গ্রামটিতে বিত্তবান সমৃদ্ধ বণিকসম্প্রদায় ছিল, কাজেই সঙ্গে সঙ্গে শ্রেষ্ঠীরাও ছিলেন। অষ্টম শতকপূর্ব লিপিগুলিতে দেখা যায় রাষ্ট্রে ও সমাজের সার্থবাহদের সঙ্গে শ্রেষ্ঠীদেরও যথেষ্ট আধিপত্য ছিল।

বাণিজ্যপথ

এই সমৃদ্ধ বাণিজ্য স্থলপথ ও জলপথ উভয় পথেই চলিত। বাণিজ্যপথের বিস্তৃততর আলোচনা দেশ-পরিচয় অধ্যায়ে ইতিপূর্বেই করিয়াছি; এখানে ইঙ্গিতমাত্রই যথেষ্ট। এই নদীমাতৃক দেশে নৌ-শিল্পের প্রচলন যেমন দেখিতে পাই, যত 'নাবাত-ক্ষেণী', 'নৌবাট', 'নৌদণ্ডক', 'নৌবিতান', ইত্যাদির উল্লেখ পাইতেছি, চর্যাচর্যবিনিশ্চয়-গ্রন্থ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাকৃত-পৈঙ্গল পর্যন্ত প্রাকৃত ও অপভ্রংশে রচিত অসংখ্য গান ও পদে যত নদ-নদী-নৌকা সংক্রান্ত রূপক ও উপমার দেখা পাইতেছি তাহাতে অনুমান হয়, নৌ-বাণিজ্যই প্রবলতর ও প্রশস্ততর ছিল। গুজরাট হইতে গৌড়ে, কিংবা বারাণসী হইতে পুণ্ড্রবর্ধনে যে বাণিজ্যের আভাস বিদ্যাপতির পুরুষপরীক্ষায় কিংবা সোমদেবের কথাসরিৎসাগরে পাওয়া যায়, জাতকের বহু গল্পে তাম্রলিপ্তিতে বণিকদের যে আনাগোনার খবর পাওয়া যায়, তাহা হয়তো স্থলপথেই বেশি হইত, বৌদ্ধ-যুগের সুপরিচিত বাণিজ্যপথ ধরিয়া। বারাণসী হইতে মগধের ভিতর দিয়া অঙ্গের রাজধানী চম্পা হইয়া পুণ্ড্রবর্ধন পর্যন্ত সার্থবাহের গরুর গাড়ির বহর চলাচলের পথও ছিল, এ কথা মনে করিতে সুদূরবিসর্পী কল্পনার আশ্রয় লইবার কোনও প্রয়োজন নাই। চম্পা হইতে গঙ্গা ও ভাগীরথী বাহিয়া গঙ্গাবন্দর ও তাম্রলিপ্তি পর্যন্ত নৌকাপথও প্রশস্ত ছিল। মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে এই নদীপথের বন্দর ও দেশগুলির বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। বংশীদাসের মনসামঙ্গলে, এবং অন্যান্য মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে এবং বিস্তৃত ভাবে মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যে, বিভিন্ন চৈতন্যচরিত কাব্যে এই পথের কিয়দংশের বন্দরগুলির উল্লেখ আছে। এই বিবরণের মধ্যে প্রাচীন স্মৃতি কিছু লুকাইয়া নাই, এ কথা কে বলিবে? স্থলপথের আর একটি আভাস য়ুয়ান্-চোয়াঙের বিবরণীতে পাওয়া যায়

কজঙ্গল বা উত্তররাঢ় হইতে তিনি গিয়াছিলেন পুণ্ড্রবর্ধনে এবং সেখান হইতে একটি বৃহৎ নদী পার হইয়া কামরূপে। এই পরিব্রাজক নিজে নূতন করিয়া পথ কাটিয়া অগ্রসর হন নাই ; যে পথ বহু দিন আগে হইতেই বহুলোক-যাতায়াতে প্রশস্ত হইয়াছে, সেই পথেই তিনি গিয়াছিলেন, এ অনুমানই সংগত। এই পথেই কামরূপের সঙ্গে উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের বাণিজ্য-সম্বন্ধ চলিত। পূর্ব ও নিম্নবঙ্গের সঙ্গে কামরূপের বাণিজ্য-সম্বন্ধ ছিল সেই পথ ধরিয়া যে পথে এই চীন-পরিব্রাজক কামরূপ হইতে সমতট ও তাম্রলিপ্তিতে আসিয়াছিলেন। আর, উড়িষ্যার সঙ্গে বাণিজ্য-সম্বন্ধের স্থলপথ ধরিয়াই যে পরবর্তী কালে চৈতন্যদেব নীলাচল গিয়াছিলেন, তাহা তো সহজেই অনুমেয়। এইসব পথ বহু প্রাচীন এবং বহুজনের চরণচিহ্নে অঙ্কিত।

গঙ্গাবন্দর ও তাম্রলিপ্তি ; বৌদ্ধবণিক বুদ্ধগুপ্ত

সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রধান বন্দর যে ছিল গঙ্গাবন্দর ও তাম্রলিপ্তি, তাহাও সুস্পষ্ট। তাম্রলিপ্তিই জাতকের দামলিপ্তি এবং **Ptolemy**'র **Tamalites**, য়ুয়ান্-চোয়াঙের তন্-মো-লিহ্-তি। সিংহলের সঙ্গে তাম্রলিপ্তির বাণিজ্যপথের আভাস ফাহিয়ান্ রাখিয়া গিয়াছেন (চতুর্থ শতক)। তাহারও তিন-চারি শত বৎসর আগে ভারতের দক্ষিণ-সমুদ্রতীর বাহিয়া গঙ্গাবন্দর ও তাম্রলিপ্তির সঙ্গে সুদূর রোম-সাম্রাজ্যের বাণিজ্য-সম্বন্ধের আভাস তো **Periplus** ও **Ptolemy**-র গ্রন্থেই পাওয়া যায়। এ-সমস্ত সাক্ষ্যই অত্যন্ত সুপরিচিত। মিলিন্দ-পঞ্‌হ গ্রন্থে বঙ্গ বা পূর্ববঙ্গেও একটি অন্যতম সামুদ্রিক বাণিজ্য-কেন্দ্রের বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, অন্যান্য অনেক বাণিজ্যকেন্দ্রের সঙ্গে। বলা হইয়াছে, বঙ্গদেশে বাণিজ্যব্যপদেশে অনেক সমুদ্রগামী জাহাজ একত্র হইত। এই বন্দর কোন্ বন্দর তাহা অনুমান করিবার উপায় নাই। তবে বুড়ীগঙ্গা (**Ptolemy**'র **Antibole ?**) বা মেঘনার মুখের কোনও বন্দর হওয়া অসম্ভব নয়, অথবা চট্টগ্রামও হইতে পারে, কিন্তু মধ্যযুগের **Bengala** বন্দর হওয়াই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। বহু পরবর্তী কালেও সপ্তগ্রাম হইতে আরম্ভ করিয়া অন্তত ভৃগুকচ্ছ-সুরাষ্ট্র-পাটন পর্যন্ত এই বাণিজ্য-সম্বন্ধের বিস্তৃততর বিবরণ পাওয়া যাইবে মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারায়। ব্রহ্মদেশ ও যবদ্বীপ, সুবর্ণদ্বীপ ও পূর্বদক্ষিণ বৃহত্তর ভারতের দ্বীপগুলির সঙ্গে বাঙলাদেশের বাণিজ্য সম্বন্ধ বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছু নাই, তবে অনুমান খুব সহজেই করা যাইতে পারে। উত্তর-ব্রহ্মের সঙ্গে আসাম ও মণিপুরের ভিতর দিয়া স্থলপথে একটা নিকট-সম্বন্ধ তো ছিলই, এ কথা অন্যত্র বলিয়াছি। বর্তমান ত্রিপুরা জেলার পট্টিকেরার রাজবংশের সঙ্গে যে পাগানের আনাউরহ্‌থা ও চান্‌জিথ্‌থার রাজবংশের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল, তাহাও আমি অন্যত্র দেখাইয়াছি। মধ্যযুগে এই পথ দিয়াই একাধিক বার মণিপুরে ব্রহ্মদেশের

যুদ্ধাভিযান আসিয়াছে। নিম্নব্রহ্মের সঙ্গে সমুদ্রোপকূল বাহিয়া জলপথও ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় ব্রহ্মদেশীয় প্রাচীন রাজবংশাবলীগুলির ইতিহাসের মধ্যে, কিছু কিছু লিপিমালায়; ব্রহ্মদেশে থেরবাদ বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস ও আমার অন্য দুটি প্রাসঙ্গিক গ্রন্থে সে কথা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এখানে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। যবদ্বীপ সুবর্ণদ্বীপের সঙ্গে পূর্বদক্ষিণ সমুদ্রের দেশ ও দ্বীপগুলির সম্বন্ধের প্রমাণ আছে মহানাবিক বুদ্ধগুপ্তের লিপিতে (চতুর্থ-পঞ্চম শতক), মেঘবর্মন-সমুদ্রগুপ্ত (চতুর্থ শতক) প্রসঙ্গে, রাজা বালপুত্রদেবের নালন্দা লিপিতে (দশম শতক), ইৎসিঙের (৭ম শতক) ভ্রমণ-বৃত্তান্তে, বৌদ্ধ মহাপণ্ডিত ধর্মকীর্তির জীবন-ইতিহাসের মধ্যে (একাদশ শতক)। এই-সমস্ত সাক্ষ্যই এত সুপরিচিত যে, ইহাদের উল্লেখ পুনরুক্তি দোষে দুষ্ট হইবে। তাহা ছাড়া, ইতিপূর্বেই দেশ-পরিচয় অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। সাধারণ ভাবে এইসব পূর্ব-দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপ ও দেশগুলিতে বাঙলাদেশের ধর্মসাধনা ও সংস্কৃতির প্রভাব এত সুস্পষ্ট এবং পণ্ডিতমহলে এত বেশি আলোচিত হইয়াছে যে, প্রাচীন বাঙলা-দেশের সঙ্গে ইহাদের নিকট সম্বন্ধের কথা এখন আর কল্পনার বিষয় নয়। সত্য, এইসব সাক্ষ্য-প্রমাণ ও সিদ্ধান্ত একটিও প্রত্যক্ষভাবে বাণিজ্য-সংক্রান্ত নয়, যদিও এ কথা অনুমান করিতে বাধা নাই যে, বাণিজ্য-সম্বন্ধের উপর নির্ভর করিয়াই ক্রমে ক্রমে বাঙলা-দেশের ও ভারতের অন্যান্য দেশের ধর্মসাধনা ও সংস্কৃতি ক্রমশ এইসব অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। অন্য দেশে সংস্কৃতিবিস্তার এই ভাবেই হইয়া থাকে, প্রাচীন কালেও হইয়াছিল, বর্তমান কালেও হইয়াছে ও হইতেছে। সর্বাগ্রে বণিক, বণিকের সঙ্গে বণিকের প্রয়োজনেই ধর্ম ও পুরোহিত, তারপরেই ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে আসিয়া পড়ে সামরিক এবং সাংস্কৃতিক প্রভাব। যাহা হউক, প্রত্যক্ষ বাণিজ্য-সম্বন্ধের প্রমাণ প্রাচীন বাঙলায় পাইতেছি না, কিন্তু নানা মনসামঙ্গল কাব্যে সে প্রমাণ ছড়াইয়া আছে; আরাকান ও ব্রহ্মদেশের সঙ্গে বাণিজ্য-সম্বন্ধের আভাসও এইসব গ্রন্থে পাওয়া যায়। অনুল্লিখিত-নাম যে দেশের বিবরণ সওদাগরদের শুনান হইতেছে, সেই দেশ যে ব্রহ্মদেশ, বিবরণটি একটু মনোযোগ দিয়া পড়িলে এ সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকে না। কিন্তু প্রাচীনকালে এই পূর্বদক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপ ও দেশগুলির সঙ্গে বাঙলাদেশের বাণিজ্য-সম্বন্ধের একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণও কি নাই? আমার মনে হয়, আছে। সেই প্রমাণটি উল্লেখ করিয়াই এই ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসঙ্গ শেষ করিব। মালয় উপদ্বীপের ওয়েলেস্‌লি জেলার একটি প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের মধ্য হইতে ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে একটি শ্লেট্ পাথরে উৎকীর্ণ লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। পাথরটির মাঝখানে উৎকীর্ণ বৌদ্ধস্তূপের প্রতিকৃতি: স্তূপটির দুই পাশে লিপি উৎকীর্ণ। লিপিটির পাঠ এইরূপ:

অজ্ঞানাচ্চীয়তে কর্ম জন্মনঃ কর্ম কারণ [ম]

জ্ঞানান্ন চীয়তে [কর্ম কর্মাভাবান্ন জায়তে]

ইহা একটি বৌদ্ধ সূত্র । এর পরেই দক্ষিণতম প্রান্তে লেখা আছে ঃ

মহানাবিক বুদ্ধগুপ্তস্য রক্তমৃত্তিকা বাস্ [ত ব্যস্য]

এবং তার পরেই বাম প্রান্তে ও পার্শ্বে আছে ঃ—

সর্বেণ প্রকারেণ সর্বস্মিন্ সর্বথা স (র) ব···সিদ্ধ যাত [র] + [ঃ] সন্তু ।

এই মহানাবিক বুদ্ধগুপ্ত পণ্ডিতমহলে সুপরিচিত ; লিপিটি বহু আলোচিত । বুদ্ধগুপ্তের বাড়ি ছিল রক্তমৃত্তিকায় । সিদ্ধযাত্র ও সিদ্ধযাত্রা কথাটি লইয়া বহু তর্কবিতর্ক হইয়াছে । বেশির ভাগ তর্ক নিরর্থক । কথাটি এ-পর্যন্ত এই দেশ ও দ্বীপগুলির অন্তত সাতটি প্রাচীন লিপিতে পাওয়া গিয়াছে । সিদ্ধযাত্রিক, সিদ্ধযাত্রত্ব, যাত্রাসিদ্ধিকাম ইত্যাদি কথা পঞ্চতন্ত্রে ও জাতকমালায় বার বার পাওয়া যায় । জাতকমালার সুপারগ-জাতকে পূর্ব-ভারতের বণিকদের সুবর্ণভূমি বা নিম্নব্রহ্মদেশে যাত্রার কথা আছে (সুবর্ণভূমি বণিজো যাত্রাসিদ্ধিকামাঃ)—তাহাদের যাত্রা সিদ্ধিলাভ করুক, এই কামনা তাহাদের মনে ছিল, সেই জন্য তাহাদের বলা হইয়াছে যাত্রাসিদ্ধিকামাঃ । বুদ্ধগুপ্তের এই লিপিটির শেষ ছত্রটির অর্থেরও অস্পষ্টতা কিছু নাই ; সর্বপ্রকারে, সকল বিষয়ে, সর্বথা বা সর্ব উপায়ে সকলে সিদ্ধযাত্র হউক, এই প্রকার একটা কামনা বা আশীর্বাদ করা হইতেছে । এই কামনা বা আশীর্বাদ করা হইয়াছিল যাত্রার পূর্বে, ইহাই তো 'সন্তু' এই ক্রিয়াপদটির এবং সমস্ত আশীর্বাদটির ইঙ্গিত । কামনা বা আশীর্বাদ করা হইয়াছিল খুব সম্ভব কোনও বৌদ্ধ পুরোহিত বা ধর্মগোষ্ঠীর পক্ষ হইতে ; স্তূপের প্রতিকৃতিটি তাহার প্রমাণ, এবং এই আশীর্বাদের একটি লিপি বৌদ্ধসূত্র সহ, ধর্মনিদর্শন সহ খোদাই করিয়া, রক্ষাকবচের মতো বুদ্ধগুপ্তের সঙ্গে দিয়া দেওয়া হইয়াছিল । এই প্রথা তো এখনও বাঙলার বহু পরিবারে প্রচলিত । এই মহানাবিকের বাস্তব্য অর্থাৎ বাড়ি ছিল রক্তমৃত্তিকায় । এই রক্তমৃত্তিকা কোথায়, ইহাই হইতেছে প্রশ্ন । অধ্যাপক কার্ন বলিয়াছিলেন, এই রক্তমৃত্তিকা চৈনিক উপাদানের Ch'ih t'u, সিয়াম দেশের সমুদ্রোপকূলের একটি স্থানের সঙ্গে অভিন্ন। অক্ষর দেখিয়া লিপিটির তারিখ পণ্ডিতেরা অনুমান করিয়াছেন খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক । লিপিটির ভাষা শুদ্ধ সংস্কৃত ; ধর্মপ্রেরণা একান্তভাবেই ভারতীয় ; মহানাবিকটির নাম ও ধাম একান্তভাবেই ভারতীয় ; বুদ্ধগুপ্ত নামটি যেন বিশেষ করিয়াই ভারতীয় । এই অবস্থায় নাবিকটিকে সিয়ামদেশবাসী বলিয়া মনে করিতে একটু ঐতিহাসিক দ্বিধা বোধ হয় বইকি ! বিশেষত রক্তমৃত্তিকার সন্ধান যদি ভারতবর্ষে কোথাও পাওয়া যায়, তাহা হইলে তো কথাই নাই । য়ুয়ান্-চোয়াঙ (সপ্তম শতক) কিন্তু কর্ণসুবর্ণের বিবরণ দিতে বসিয়া এক রক্তমৃত্তিকার সন্ধান দিতেছেন ; বলিতেছেন, কর্ণসুবর্ণের রাজধানীর একেবারে পাশেই ছিল লো টো মো-চিহ্ (Lo to mo-chih) নামে বৃহৎ বৌদ্ধ-বিহার । চীন লো-টো-মো-চিহ্ পালি অথবা প্রাকৃত লত্তমত্তি = রক্তমত্তি = রক্তমৃত্তি বা রক্তমৃত্তিকা, বাঙলা, রাঙামাটি । আমার তো মনে হয়, বুদ্ধগুপ্তের বাড়ি কর্ণসুবর্ণের এই রক্তমৃত্তিকা বা

রাঙামাটি। তাহা ছাড়া, আর-একটি রাঙামাটির খবর আমরা জানি চট্টগ্রামে। প্রাচীন ঐতিহ্য ও ঐতিহাসিক পরিবেশের কথা মনে রাখিলে মহানাবিক বুদ্ধগুপ্ত যে বাঙলাদেশের তাম্রলিপ্তি বন্দর হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন পূর্ব দক্ষিণ সমুদ্রতীরের দেশে, এই অনুমানই তো বিজ্ঞানসম্মত সত্য বলিয়া মনে হয়। এবং যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে এইখানে আমরা প্রাচীন বাঙলার সামুদ্রিক বাণিজ্য-বিস্তারের একটা পাথুরে ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলাম। লক্ষণীয় এই যে, লিপির তারিখ খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক। পরে আমি একাধিক প্রমাণ ও অনুমানের সাহায্যে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, খ্রীষ্টপূর্ব কাল হইতে আরম্ভ করিয়া আনুমানিক খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতক পর্যন্তই বাঙলার সামুদ্রিক বাণিজ্যের স্বর্ণযুগ; ইহার পর আদিপর্বে বাঙলার সামুদ্রিক বাণিজ্যের সেই যুগ আর ফিরিয়া আসে নাই।

সামুদ্রিক বাণিজ্যলব্ধ সমৃদ্ধি

এই যে আমরা একটা প্রশস্ত, সমৃদ্ধ ও সুবিস্তৃত অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের পরিচয় পাইলাম, এই বাণিজ্যে বাঙলাদেশে প্রচুর অর্থাগম হইত এবং সে অর্থের অধিকাংশ বণিকদের হাতেই কেন্দ্রীকৃত হইত, এই ইঙ্গিত আগেই করিয়াছি। কিন্তু এই অর্থ কী? ইহা কি মুদ্রায় বিনিময় দ্রব্যাদিতে রূপান্তরিত? প্লিনি যে বলিয়াছেন, আধ সের পিপ্পলির দাম হইত ১৫ স্বর্ণ দিনার, এবং ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের বার্ষিক রপ্তানির মূল্য ছিল প্রায় এক লক্ষ মুদ্রা, তাহা হইতে অনুমান হয়, বণিকেরা বাণিজ্য-পসরার বদলে মুদ্রাই লইয়া আসিতেন, এবং এই মুদ্রা সুবর্ণমুদ্রা dinarius বা দিনার ও রৌপ্যমুদ্রা drachm বা দ্রম্ম। পঞ্চম হইতে অষ্টম শতক পর্যন্ত প্রায় সমস্ত পট্টোলীগুলিতে ভূমির মূল্যের উল্লেখ (স্বর্ণ) দিনার অনুযায়ী, কিংবা পরবর্তী পাল ও সেন-বংশের লিপিগুলিতে মূল্যের উল্লেখ পাই রৌপ্য দ্রম্মে (ধর্মপালের মহাবোধি লিপির "ত্রিভি-ন সহস্রেণ দ্রম্মানাং খানিতা"; বিশ্বরূপ ও কেশবসেনের দুইটি লিপিতেও ভূমির মূল্য বোধহয় দেওয়া হইয়াছে দ্রম্মে ?)। এই দুইটি মুদ্রার নাম হইতে মনে হয়, এক সময়ে এই দুই বিদেশী মুদ্রাই বেশ কিছু পরিমাণে বাঙলাদেশে আসিত, এবং বিনিময়-মুদ্রা হিসাবে স্বীকৃত এবং গৃহীতও হইত; পরে ইহাদের নাম হইতেই স্বর্ণ ও রৌপ্য-মুদ্রা বাঙলাদেশে দিনার ও দ্রম্ম নামে পরিচিত হইয়াছিল। 'দাম' এবং 'দর্মা' (বেতন) এই কথা দুইটি তো 'দ্রম্ম' হইতেই আমরা পাইয়াছি। এই দুই মুদ্রাপ্রচলনের মধ্যেও প্রশস্ত বৈদেশিক বাণিজ্য সম্বন্ধের স্মৃতি লুক্কায়িত আছে, সন্দেহ নাই।

কিন্তু বিনিময়-বাণিজ্যও (trade by barter) সঙ্গে সঙ্গে ছিল না, একথাও বলা চলে না। Periplus-গ্রন্থে ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে তো মনে হয়, এই বাণিজ্য পণ্য-বিনিময়েও মাঝে মাঝে চলিত। বংশীদাস ও মুকুন্দরামের যে সাক্ষ্য আগে একাধিক বার উল্লেখ করিয়াছি তাহা হইতেও প্রমাণ হয় যে, মধ্যযুগেও এই বিনিময়

বাণিজ্য বহির্বাণিজ্যের অন্যতম নিয়ম ছিল। টেভার্নিয়ারের যে সাক্ষ্য ত্রিপুরাদেশাগত সোনা সম্বন্ধে আগে উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে তো দেখা যায়, অন্তর্বাণিজ্যেও এই ব্যবস্থা কতকটা প্রচলিত ছিল। এই দুটি সাক্ষ্যই মধ্যযুগীয় ; তবু মনে হয় প্রাচীন ধারা কিছুটা মধ্যযুগেও অক্ষুণ্ণ ছিল। তবে বিনিময় বাণিজ্যই যে একমাত্র নিয়ম ছিল না তাহা খ্রীষ্টীয় শতকের আগে হইতে সমৃদ্ধ মুদ্রাপ্রচলন হইতেই সুপ্রমাণিত হয়।

৬

কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের আলোচনা শেষ হইল। এগুলি সমস্তই সামাজিক ধনসম্পদের বনিয়াদ ; এই তিন উপায়েই দেশের অর্থোৎপাদন হইত। মুদ্রায় এই অর্থের রূপান্তর কিরূপ ছিল, দেখা প্রয়োজন।

মুদ্রায় সামাজিক ধনের রূপ

বিনিময়ের জন্য মুদ্রার ব্যবহার অর্থনৈতিক সভ্যতার দ্যোতক। খ্রীষ্টীয় শতকের আগে হইতেই বাঙলাদেশে মুদ্রার প্রচলন দেখা যায়। মহাস্থানের শিলাখণ্ডের লিপিটিতে গণ্ডক নামে এক প্রকার মুদ্রার প্রচলন দেখিতে পাইতেছি। এই মুদ্রা সোনা কি রূপার, বলার কোনও উপায় নাই। তবে বহু পূর্ববর্তী কালের 'গণ্ডা' গণনা রীতির সঙ্গে যে এই গণ্ডক মুদ্রার একটা শব্দতাত্ত্বিক সম্বন্ধ ছিল এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। এই গণ্ডক মুদ্রার চেহারা যে কিরূপ ছিল তাহাও আমরা কিছু জানি না। কেহ কেহ মনে করেন, মহাস্থান লিপিতে 'কাকনিক' নামে আর এক প্রকার মুদ্রারও উল্লেখ আছে। এই মুদ্রারও রূপ, মূল্য বা ওজন সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি না। গণ্ডকের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ যে কী ছিল তাহাও বলা যায় না। পেরিপ্লাস-গ্রন্থে খবর পাওয়া যাইতেছে, গঙ্গা-বন্দরে ক্যালটিস (Caltis) নামে এক প্রকার স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন ছিল ; ইহা তো খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের কথা। কেহ কেহ মনে করেন, Caltis সংস্কৃত 'কলিত' অর্থাৎ সংখ্যাঙ্কিত শব্দেরই রূপান্তর। পেরিপ্লাস-গ্রন্থের সম্পাদক মনে করেন Caltis এবং দক্ষিণ-ভারতের Kallais একই মুদ্রা। ভিন্সেন্ট স্মিথ তো বলেন, Kallais নামেও বাঙলা দেশে এক প্রকার মুদ্রার প্রচলন ছিল। কনকলাল বড়ুয়া মনে করেন, আসামের 'কলিত' বণিকেরা একপ্রকার স্বর্ণমুদ্রা ব্যবহার করিত, তাহার নাম ছিল Kaltis। বোধহয় ইহারও আগে এক ধরনের নানা চিহ্নাঙ্কিত punchmarked রৌপ্য ও তাম্র-মুদ্রার বিস্তৃত প্রচলন ছিল বাঙলাদেশে। চব্বিশ পরগনার নানা প্রত্নস্থানে, রাজসাহীর ফেটগ্রাম, মৈমনসিংহের ভৈরববাজার, মেদিনীপুরের তমলুক এবং ঢাকার উয়াড়ী প্রভৃতি স্থানে এই ধরনের সীসা, রৌপ্য ও তাম্র-মুদ্রা প্রচুর আবিষ্কৃত হইয়াছে ; ইহাদের সঙ্গে ভারতবর্ষের নানাস্থানে প্রাপ্ত এই জাতীয় মুদ্রার

নিকট আত্মীয়তা সহজেই ধরা পড়ে। সেই হেতু, সর্বভারতীয় সাধারণ অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গে বাঙলার একটা যোগাযোগ ছিল এই অনুমান হয়তো নিতান্ত মিথ্যা না-ও হইতে পারে। কুষাণ আমলের দুই-চারিটি স্বর্ণমুদ্রাও বাঙলাদেশে পাওয়া গিয়াছে। বাঙলাদেশ কখনও কুষাণ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না; কাজেই অনুমান হয়, বাণিজ্য ব্যপদেশে বা অন্য কোনও উপায়ে কিছু কিছু কুষাণ স্বর্ণমুদ্রা বাঙলাদেশে আসিয়া থাকিবে।

উত্তর-বঙ্গ গুপ্ত-সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল এ তথ্য সুবিদিত। সেই আমলে গুপ্ত মুদ্রারীতি বাঙলাদেশে বহুল প্রচলিত ছিল। এই মুদ্রা ছিল প্রধানতম সুবর্ণ ও রৌপ্যের; স্কন্দগুপ্তের আমলে গুপ্ত স্বর্ণমুদ্রার ওজন ছিল ১৪২ মাষের কাছাকাছি, এবং রৌপ্যমুদ্রার ওজন একটি রৌপ্য কার্ষাপণের প্রায় সমান অর্থাৎ ৩৬ মাষ। পূর্ববর্তী সম্রাটদের কালে স্বর্ণমুদ্রা ওজনে আরও কম ছিল। যাহাই হউক, গুপ্ত আমলে এই দুই মুদ্রাই যে বাঙলাদেশে প্রচলিত হইয়াছিল তাহার লিপি-প্রমাণ প্রচুর; বিনিময়-মুদ্রা হিসাবে এই মুদ্রাই ব্যবহৃত হইত। পঞ্চম হইতে সপ্তম শতক পর্যন্ত ভূমি দান-বিক্রয়ের পট্টোলীগুলিতে ভূমির মূল্য দেওয়া হইয়াছে (স্বর্ণ) দিনারে (denarius Aureus)। প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রাই যে ছিল দিনার, তাহা ইহাতেই সপ্রমাণ। রৌপ্যমুদ্রার নাম ছিল রূপক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বৈগ্রাম পট্টোলীর উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই লিপি হইতেই প্রমাণ হয় যে, আটটি রূপক মুদ্রা অর্ধ-দিনারের সমান, অর্থাৎ ষোলটিতে এক দিনার। প্রথম কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে (ধনাইদহ, দামোদরপুর ও বৈগ্রাম পট্টোলীর কালে) এক স্বর্ণ দিনারের ওজন ছিল ১১৭.৮ হইতে ১২৭.৩ মাষ পরিমাণ, এবং এক রূপকের ওজন ছিল ২২.৮ হইতে ৩৬.২ মাষ পরিমাণ। ইহা হইতে সোনার সঙ্গে রূপার আপেক্ষিক সম্বন্ধের যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাহাতে মনে হয়, রূপার আপেক্ষিক মূল্য সোনা অপেক্ষা অনেক বেশি ছিল। খুবই আশ্চর্য ব্যাপার সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার কারণ বর্তমানে যে ঐতিহাসিক উপাদান আমাদের হাতে আছে তাহার মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। হইতে পারে, দেশে রৌপ্যের অপ্রতুলতাই ইহার কারণ, অথবা কোনও-না-কোনো কারণে দেশে রৌপ্যের আমদানি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, অথবা পট্টোলীগুলির মধ্যে আমরা যে স্বর্ণ দিনারের উল্লেখ দেখিতেছি তাহার যথার্থ স্বর্ণমূল্য (intrinsic value) অনেক কম ছিল, অর্থাৎ সুবর্ণমুদ্রার স্বর্ণগত অবনতি ঘটিয়াছিল (debasement)। দেখিতেছি, গুপ্ত আমলের অব্যবহিত পরেই বাঙলাদেশে যখন স্ব স্ব প্রধান ছোট ছোট রাজবংশের স্বতন্ত্র আধিপত্য চলিতেছে তখন রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন একবারে নাই, অথচ স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন অব্যাহত, এবং এই স্বর্ণমুদ্রার যথার্থ মূল্য স্বর্ণমূল্য অনেক কম; ইহা অবনত (debased) স্বর্ণমুদ্রা, যদিও ওজনে তাহা কমে নাই। বাঙলাদেশের বহু স্থানে কিছু কিছু গুপ্ত স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। তাহার কিছু সাধারণ সরকারী গ্রন্থশালায় রক্ষিত, কিন্তু ব্যক্তিগত সংগ্রহে যাহা আছে তাহার সংখ্যাও কম নয়। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কালীঘাটে প্রায় ২০০ (গুপ্ত ?) সুবর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছিল,

কিন্তু তাহার অধিকাংশই গলাইয়া ফেলা হইয়াছিল। গুপ্ত স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে যশোহরের মহম্মদপুরে, হুগলিতে ও হুগলি জেলার মহানাদে। গুপ্ত রৌপ্য ও তাম্র-মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে যশোহরের মহম্মদপুরে, বর্ধমান জেলার কাটোয়ায়। 'নকল' গুপ্তমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে উপরোক্ত মহম্মদপুরে, ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়ায়, ঢাকা জেলার সাভার গ্রামে এবং রংপুরে। বাঙলাদেশের নানা জায়গায় শশাঙ্ক, জয় (নাগ?), সমাচা (র দেব?) এবং অন্যান্য রাজার নামাঙ্কিত এই ধরনের কিছু কিছু সুবর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। রৌপ মুদ্রা একেবারেই নাই। আশ্চর্যের বিষয় এই, গুপ্ত আমলেও, যখন স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা বহুল প্রচলিত, তখনও মুদ্রার নিম্নতম মান কিন্তু কড়ি। চতুর্থ শতকে ফাহিয়ান বলিতেছেন, লোকে ক্রয়বিক্রয়ে কড়িই ব্যবহার করিত, এবং নিম্নতম মান কড়ি একেবারে উনবিংশ শতক পর্যন্ত কোনও দিনই ব্যবহারের বাইরে চলিয়া যায় নাই। চর্যাপদ (দশম-একাদশ শতকগুলিতে) দেখিতেছি, কবাড়ি (কড়ি) এবং বোড়ির (বুড়ি) ব্যবহার। মিনহাজ উদ্দীন তুরস্কাভিযানের বিবরণ দিতে গিয়া বলিয়াছেন, অভিযাত্রী তুরুষ্কেরা বাঙলাদেশে কোথাও রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন দেখিতে পান নাই; সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ে লোকে কড়িই ব্যবহার করিত। এমনকি রাজাও যখন কাহাকেও কিছু দান করিতেন, কড়ি দ্বারাই করিতেন; লক্ষ্মণসেনের নিম্নতম দান ছিল এক লক্ষ কড়ি। ত্রয়োদশ শতকেও কড়ির প্রচলনের সাক্ষ্য অন্যত্র পাইতেছি। পঞ্চদশ শতকে মা-হুয়ান একই সাক্ষ্য দিতেছেন; মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য এবং বিদেশী পর্যটকদের সাক্ষ্যও একই প্রকার। এমনকি ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ বণিকেরাও দেখিয়াছেন, কলিকাতা শহরে কর আদায় হইত কড়ি দিয়া; বাজারে অনেক ক্রয়-বিক্রয়ও কড়ির সাহায্যেই হইত।

যাহাই হউক, মাৎস্যন্যায়-পর্বের শেষে পালরাজারা যখন দেশে প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং শান্তি ও সুশাসন ফিরিয়া আসিল তখন আবার দেশে রৌপ্যমুদ্রার (এবং সঙ্গে সঙ্গে তাম্রমুদ্রার) প্রচলন যেন ফিরিয়া আসিল। কিন্তু সুবর্ণমুদ্রা আর ফিরিল না। সুবর্ণমুদ্রার ক্রমশ অবনতি ঘটিতে ঘটিতে শেষে যেন একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল। বস্তুত, পালরাজা ও সেনরাজাদের আমলের একটি সুবর্ণমুদ্রাও বাঙলাদেশে কোথাও আবিষ্কৃত হয় নাই, কিংবা সমসাময়িক সাহিত্যে কোথাও তাহার কোনও উল্লেখও নাই। সপ্তম শতকের পর হইতেই সুবর্ণ দিনার বা যে-কোনও প্রকার সুবর্ণমুদ্রা একেবারে অনুপস্থিত। বাঙলা ও বিহারের কোথাও কোথাও "শ্রী বি(গ্রহ)" নামাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে; কোথাও কোথাও ঐ নামাঙ্কিত বা কোন নামাঙ্কন ছাড়া পালযুগীয় তাম্রমুদ্রাও পাওয়া গিয়াছে (যেমন, পাহাড়পুরে)। "শ্রী বি(গ্রহ)" পালরাজ প্রথম বিগ্রহপাল; নিকৃষ্ট তাম্রমুদ্রাগুলি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বিগ্রহপালের আমলেরও হইতে পারে, এমনকি সমসাময়িক বা পরবর্তী অন্য কোনো রাজারও হইতে পারে। ঐ নামাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রা সাধারণত দ্রম্ম (drachm) নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ধর্মপালের মহাবোধি লিপিতে দ্রম্ম

নামক এক প্রকার মুদ্রার উল্লেখ আছে ; এই উল্লেখই পাল আমলে দ্রম্ম মুদ্রার প্রচলনের প্রমাণ। উক্ত রাজার রাজত্বের ষোল বৎসরে কেশব নামক এক ব্যক্তি তিন সহস্র দ্রম্ম মুদ্রা খরচ করিয়া (ত্রিভয়েন সংস্রেণ দ্রম্মাণাং খানিতা) একটি পুকুর খনন করাইয়াছিলেন। সুবর্ণমুদ্রার প্রচলন তো ছিলই না, এবং আবিষ্কৃত মুদ্রাগুলি হইতে মনে হয়, রৌপ্যমুদ্রারও যথেষ্ট অবনতি ঘটিয়াছিল। যে অবনতি গুপ্ত পরবর্তী যুগে দেখা গিয়াছিল, পালরাজারাও সেই অবনতি ঠেকাইতে পারেন নাই। এমনকি আবিষ্কৃত তাম্রমুদ্রাগুলিও মূল মূল্য বা আকৃতি বা শিল্পরূপের দিক হইতে অত্যন্ত নিকৃষ্ট। ভাস্করাচার্যের (১০৩৬ শক =১১১৪ খ্রী) লীলাবতী-গ্রন্থে একটি আর্যা আছে ; কুড়ি কড়া বা কড়িতে এক কাকিনী, চার কাকিনীতে এক পণ, ষোল পণে এক দ্রম্ম (রৌপ্যমুদ্রা), ষোল দ্রম্মে এক নিষ্ক। অমরকোষের মতে এক নিষ্ক এক দিনারের সমান, অর্থাৎ ষোল দ্রম্মে এক দিনার অর্থাৎ ষোল দ্রম্ম = ষোল রূপক। দ্রম্ম যে রৌপ্যমুদ্রা তাহা হইলে এ সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ থাকিল না। কিন্তু রৌপ্যমুদ্রা হইলে কী হইবে, পাল রৌপ্যমুদ্রা যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরনের ; মূল মূল্য (intrinsic value) এবং বাহ্যরূপ উভয় দিক হইতেই নিকৃষ্ট।

সেন আমলে কিন্তু তাহাও নাই। সুবর্ণমুদ্রা তো দূরের কথা, রৌপ্যমুদ্রাও একেবারে অন্তর্হিত। বস্তুত, ধাতুমুদ্রা প্রচলনের একটা চেষ্টা পাল আমলে যদি বা ছিল, সেন আমলে তাহাও দেখিতেছি না। এই আমলে দেখিতেছি, ঊর্ধ্বতম মুদ্রামান পুরাণ বা কপর্দক পুরাণ। এই পুরাণ বা কপর্দক পুরাণের একটিও বাঙলাদেশের কোথাও আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। সেই জন্যই এই মুদ্রার রূপ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে অনুমান ছাড়া আর কোনও উপায় নাই। কেহ কেহ বলেন, যে পুরাণ মুদ্রার আকার ছিল কপর্দক বা কড়ির মতন, সেই মুদ্রাই কপর্দক পুরাণ। দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর মহাশয় এইরূপ মনে করেন এবং বলেন কপর্দক পুরাণ রৌপ্যমুদ্রা। এইরূপ মনে করিবার কারণ এই যে, পুরাণ ৩২ রতি বা ৫৮ মাষ পরিমাণের সুবিদিত রৌপ্যমুদ্রা বলিয়া নানা গ্রন্থে কথিত। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, প্রায় প্রত্যেকটি লিপিতেই শত শত পুরাণ-মুদ্রার উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত বাঙলাদেশে একটিও পুরাণ-মুদ্রা পাওয়া গেল না কেন ? এবং অন্যদিকে, মিনহাজই বা কেন বলিতেছেন, তুরুষ্কেরা রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন দেখে নাই, হাটবাজারে কড়িরই প্রচলন ছিল ? এমনকি রাজার দানমুদ্রাও ছিল কড়ি ! এ রহস্যের অর্থ কি এই যে, কপর্দক পুরাণ বা পুরাণ বলিয়া যথার্থত কোনও ধাতু-মুদ্রার অস্তিত্বই সেন আমলে ছিল না, আন্তর্দেশিক ব্যবসা বাণিজ্যে মুদ্রার ঊর্ধ্বতম ও নিম্নতম উভয় মানই ছিল কড়ি ? অথবা, কপর্দক-পুরাণ ছিল একটা কাল্পনিক রৌপ্যমুদ্রা মান, এবং এক নির্দিষ্ট সংখ্যক কড়ির মূল্য ছিল সেই রৌপ্যমানের সমান ? বহির্বাণিজ্য এবং পরদেশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্যই কি এইরূপ মান নির্ধারণের প্রয়োজন ছিল ?

বোধ হয় তাহাই। সুরেন্দ্রকিশোর চক্রবর্তী মহাশয় নানা অনুমানসিদ্ধ প্রমাণের সাহায্যে এই ধরনের ইঙ্গিতই করিতেছেন, বলিতেছেন, "..Pa ments were made in cowries snd a certain number of them came to be equated to the silver coin, the *purana*, thus linking up all exchan e transactions ultimately to silver, just as at present, the silver coin is linked up to gold at a ce tain ratio"।

গুপ্তযুগের পর অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতক হইতেই মুদ্রার, বিশেষভাবে সুবর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার, এরূপ অবনতি ঘটিল কেন, এই প্রশ্ন অর্থনীতিবিদ এবং ঐতিহাসিক উভয়ের সম্মুখেই উপস্থিত করা যাইতে পারে। প্রথমাবস্থায় সুবর্ণমুদ্রার অবনতি ঘটিল, কিছুদিন গুপ্ত সুবর্ণমুদ্রার নকলও চলিল এবং তারপর একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গেল! রৌপ্যমুদ্রা সপ্তম শতকেই একবার অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল, তবে পাল আমলে আবার তাহার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা দেখা যায়, কিন্তু সে চেষ্টা সার্থক হয় নাই। সেন আমলে আর তাহা দেখাই গেল না, এমনকি তাম্রমুদ্রাও নয়। গুপ্ত আমলে স্পষ্টত স্বর্ণই ছিল অর্থমান নির্দেশক, পাল আমলে রৌপ্য; সেন আমলেও স্বীকারত রৌপ্য, কিন্তু সে রৌপ্য দৃশ্যত অনুপস্থিত। নিম্নতম মান কড়ি সব সময়ই ছিল, এবং ছোটখাট কেনাবেচায় ব্যবহারও হইত, কিন্তু অর্থমান নির্ণীত হইত সোনা বা রূপায়। সেন আমলে কড়িই মনে হইতেছে সর্বেসর্বা। মুদ্রার এই ক্রমাবনতি কি দেশের সাধারণ আর্থিক দুর্গতির দিকে ইঙ্গিত করে? না, রাষ্ট্রের স্বর্ণের ও রৌপ্যের গচ্ছিত মূলধনের স্বল্পতার দিকে ইঙ্গিত করে? মুদ্রার প্রচলন কি কমিয়া গিয়াছিল? সুবর্ণমুদ্রার অবনতি এবং বিলুপ্তি হয়তো Gresham Law দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়; রৌপ্যমুদ্রার অবনতিও কি সেই কারণে? যে ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর, বিশেষ করিয়া বহির্বাণিজ্যের উপর, প্রাচীন বাঙলার সমৃদ্ধি নির্ভর করিত, তাহার অবনতি ঘটিয়াছিল কি? সোনা ও রূপার অভাব ঘটিয়াছিল কি? রাজকোষে সমস্ত সোনা ও রূপা সঞ্চিত হইতেছিল কি?

সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আজও হয়তো সম্ভব নয়। তবে কিছু কিছু তথ্য ও তথ্যগত অনুমান উল্লেখ করা যাইতে পারে। গুপ্ত রাজাদের আমলের পর হইতেই, এমনকি শশাঙ্কের আমলেই, বাঙলার রাষ্ট্রীয় অবস্থায় গুরুতর চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছিল। প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ চলিতেছিল। তারপর তো প্রায় সুদীর্ঘ এক শতাব্দীরও উপর দুরন্ত মাৎস্যন্যায়ের অপ্রতিহত রাজত্ব চলিয়াছে; অন্তর্বাণিজ্য বহির্বাণিজ্য দুইই খুব বিচলিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই, এবং সমাজের অর্থনৈতিক স্থিতিও খানিকটা শিথিল হইয়াছিল। এই অবস্থায় সুবর্ণমুদ্রার অবনতি ঘটা কিছু অস্বাভাবিক নয়, নকল মুদ্রা চলাও অস্বাভাবিক নয়। আর, রৌপ্যমুদ্রার অবনতিও একই কারণে হইয়া থাকিতে পারে। রূপা বাঙলাদেশের কোথাও পাওয়া যায় না; ইহাও হইতে পারে যে, বিদেশ হইতে রূপার

আমদানি কোনও কারণে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু পালসাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সুবিস্তৃত হইবার পরও সুবর্ণমুদ্রার প্রচলন ঘটিল না কেন, রৌপ্য-মুদ্রাই বা স্বগৌরবে ও যথার্থ মূল্যে প্রতিষ্ঠিত হইল না কেন, এ তথ্য অন্যতম বিস্ময়কর। পালরাজ্যের আদান-প্রদান ও যোগাযোগ ছিল উত্তর-ভারত জুড়িয়া এবং হয়তো দক্ষিণ-ভারতেও; সমসাময়িক কালে অন্যান্য প্রতিবেশী রাজ্য-গুলিতে সুবর্ণমুদ্রার প্রচলনও ছিল অল্পবিস্তর। আনুমানিক একাদশ শতকে জনৈক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কামরূপের রাজা জয়পালের নিকট হইতে (হেম্নাম্ শতানি নব) নয়শত সুবর্ণ (মুদ্রা) দান গ্রহণ করিয়াছিলেন, সিলিমপুর লিপিতে এ তথ্য পাওয়া যাইতেছে। অথচ, বাঙলাদেশে তখন সুবর্ণমুদ্রার প্রচলন একেবারে নাই, পরেও নাই। পাল ও সেন-বংশের মতন সমৃদ্ধ ও সচেতন রাজবংশ সুবর্ণমুদ্রার প্রচলনে প্রয়াসী হইলেন না কেন? বৈদেশিক বাণিজ্যের মধ্যে কি এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইতে পারে?

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের প্রারম্ভেই আরবী মুসলমানেরা সিন্ধুদেশ অধিকার করে। ইহাদের পূর্বদেশাভিযান আগেই আরম্ভ হইয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমদেশাভিযানও চলিয়াছিল। দেখিতে দেখিতে ইহারা একদিকে স্পেন ও অন্যদিকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত নিজেদের রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব, এবং চীনদেশ পর্যন্ত বাণিজ্যপ্রভুত্ব বিস্তার করে। ভূমধ্যসাগর হইতে আরম্ভ করিয়া ভারত-মহাসাগরের দক্ষিণ-পূর্বশায়ী দ্বীপগুলি পর্যন্ত যে সামুদ্রিক বাণিজ্য ছিল এক সময় রোম ও মিশর-দেশীয় বণিকদের করতলগত সেই সুবিস্তৃত বাণিজ্য-ভার চলিয়া যায় আরব বণিকদের হাতে। অবশ্য একদিনে তা হয় নাই; সপ্তম শতকের মাঝামাঝি হইতেই এই বিবর্তনের সূত্রপাত এবং দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে আসিয়া চরম পরিণতি। এই বিবর্তন-ইতিহাসের বিস্তৃত উল্লেখের স্থান এখানে নয়, কিন্তু সংক্ষেপত এই কথা বলা যায়, এই সুবৃহৎ বাণিজ্যে উত্তর-ভারতীয়দের যে অংশ ছিল তাহা ক্রমশ খর্ব হইতে আরম্ভ করে। প্রথম পশ্চিম-ভারতের বন্দরগুলি চলিয়া যায় আরবদেশীয় বণিকদের হাতে, এবং পরে পূর্ব-ভারতের। দক্ষিণ-ভারতীয় পল্লব, চোল ও অন্য ২।১টি রাজ্য প্রায় চতুর্দশ শতক পর্যন্ত সামুদ্রিক বাণিজ্যে নিজেদের প্রভাব বজায় রাখিয়াছিল, কিন্তু পরে তাহাও চলিয়া যায়। মুঘল আমলে তো প্রায় সমস্ত ভারতীয় সামুদ্রিক বাণিজ্যটাই আরব ও পারস্যদেশীয় বণিকদের হাতে ছিল; সেই বাণিজ্য লইয়াই তো পরে পর্তুগীজ-ওলন্দাজ-দিনেমার-ফরাসী-ইংরেজে কাড়াকাড়ি মারামারি।

যাহাই হউক, আমি আগেই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, এই সামুদ্রিক বাণিজ্য হইতে প্রাচীন বাঙলাদেশে প্রচুর অর্থাগম হইত। গঙ্গাবন্দর ও তাম্রলিপ্তি হইতে জাহাজ বোঝাই হইয়া মাল বিদেশে রপ্তানি হইত, এবং তাহার বদলে দেশে প্রচুর সুবর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা আমদানি হইত; এই সুবর্ণ রোমক দিনার এবং রৌপ্য রোমক দ্রম্ম হওয়াই সম্ভব। খ্রীষ্টপূর্ব শতক

হইতেই এই সমৃদ্ধির সূচনা দেখা দিয়াছিল এবং সমানে চলিয়াছিল প্রায় খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতক পর্যন্ত। কিন্তু তারপরেই এই সমৃদ্ধ বাণিজ্যস্রোতে যেন ভাঁটা পড়িয়া গেল। ভারতীয় দ্রব্যসম্ভারের কাছে পশ্চিমের সুবিস্তৃত হাট বন্ধ হইয়া গেল। যখন আবার সেই হাট খুলিল তখন বাণিজ্যকর্তৃত্ব চলিয়া গিয়াছে আরব বণিকদের হাতে এবং সেই হাটেরও চেহারা বদলাইয়া গিয়াছে। পশ্চিমের বাজারে যে-সব জিনিসের চাহিদা ছিল তাহাও অনেক কমিয়া গিয়াছে। অন্তত এই সুসমৃদ্ধ বাণিজ্যে বাঙলাদেশের যে অংশ ছিল তাহা যে খর্ব হইয়া গিয়াছে, এ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। বাঙলাদেশের প্রধান বন্দর ছিল তাম্রলিপ্তি; সেই তাম্রলিপ্তির বাণিজ্যসমৃদ্ধির কথা সকলের মুখে মুখে, পুঁথির পাতায় পাতায়। সপ্তম শতকে য়ুয়ান্-চোয়াঙ ও ই-ৎসিঙ্ তাম্রলিপ্তির সমৃদ্ধির বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু সামুদ্রিক বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে বা কোনও হিসাবেই তাম্রলিপ্তির উল্লেখ অষ্টম শতকের পর হইতে আর পাইতেছি না। যে নদীর উপরে ছিল তাম্রলিপ্তির অবস্থিতি পলি পড়িয়া পড়িয়া সেই নদীটির মুখ বন্ধ হইয়া গেল অথবা নদীটি খাত পরিবর্তন করিল। তাম্রলিপ্তির সৌভাগ্য-সূর্য অস্তমিত হইল, এবং আশ্চর্য এই, অষ্টম হইতে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত বাঙলাদেশে আর কোথাও সামুদ্রিক বাণিজ্যকেন্দ্র গড়িয়া উঠিল না! চতুর্দশ শতকে দেখিতেছি সরস্বতী-তীরবর্তী সপ্তগ্রাম তাম্রলিপ্তির স্থান অধিকার করিতেছে এবং পূর্ব-দক্ষিণতম বাঙলায় নূতন দুইটি বন্দর বেঙ্গলী ও চট্টগ্রাম গড়িয়া উঠিতেছে। সত্যই এই সুদীর্ঘ ছয়-সাত শত বৎসর সামুদ্রিক বাণিজ্যে বাঙলাদেশের বিশেষ কোনও স্থান নাই। এবং সেই হেতু বাহির হইতে সোনারূপার আমদানিও কম। ভারতের অন্তর্বাণিজ্যে বাঙলার অংশ নিঃসন্দেহে আছে; বাঙলাদেশ বিদেশেও ভারতবর্ষে তাহার বস্ত্রসম্ভার, চিনি, গুড়, লবণ, নারিকেল, পান, সুপারি ইত্যাদি রপ্তানি করিতেছে প্রচুর, কিন্তু তাহার নিজস্ব কোনও সামুদ্রিক বন্দর নাই; যেটুকু তাহার অংশ তাহা শুধু আন্তর্দেশিক ব্যবসাবাণিজ্যে: সেই সূত্রে সোনারূপায় দাম সে পাইতেছে কিনা বলা কঠিন, পাইলেও বোধহয় তাহা আগেকার মতন আর লাভজনক নয়, সুপ্রচুরও নয়। স্বর্ণ-দ্বারা অর্থমান নির্ণয় করিবার মতন ইচ্ছা বা অবস্থা পরবর্তী পাল বা সেন রাষ্ট্রের আর নাই, স্পষ্টতই বোঝা যাইতেছে। অথবা, যেহেতু বৈদেশিক সামুদ্রিক বাণিজ্য তাঁহাদের আর নাই, সেই হেতু স্বর্ণমানের প্রয়োজনও নাই। অথচ পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে দেখিতেছি, সাধারণ গৃহস্থও ভূমি কেনাবেচা করিতেছেন স্বর্ণমুদ্রার সাহায্যে। সেন আমলের শেষ পর্যন্ত অন্তত স্বীকারত রৌপ্যই হয়তো অর্থমান নির্ণক, কিন্তু তৎসত্ত্বেও পাল আমলে রৌপ্যমুদ্রার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, সেন আমলে মৃত। ভিন্ন প্রদেশের সঙ্গে আদানপ্রদানের জন্যই হয়তো রৌপ্যমান বজায় রাখা প্রয়োজন হইয়াছিল। মুদ্রার অবস্থা যাহাই হউক, এ তথ্য অনস্বীকার্য যে, অষ্টম শতক ও তাহার পর হইতেই ভারতীয় সামুদ্রিক বহির্বাণিজ্যে বাঙলাদেশের আর কোনও বিশেষ স্থান ছিল না, এবং অন্তর্বাণিজ্যে অপ্রতিহত আধিপত্য থাকা সত্ত্বেও সেই

হেতু বণিককুল ও ব্যবসায়ীদের সমাজে ও রাষ্ট্রে সে প্রভাব ও প্রতিপত্তি আর থাকে নাই। অষ্টম শতক হইতে দেখা যাইবে—পরবর্তী এক অধ্যায়ে আমি তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি—বঙ্গীয় সমাজ ক্রমশ কৃষি-নির্ভর হইয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছে, এবং কৃষকেরাই সমাজদৃষ্টির সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে দেখিতেছি, বণিক ও ব্যবসায়ী সমাজের প্রতিপত্তিও হ্রাস পাইয়াছে। রাষ্ট্রের অধিষ্ঠানাধিকরণগুলিতে শ্রেষ্ঠী, সার্থবাহ, কুলিক ও ব্যাপারী প্রভৃতিদের যে আধিপত্য পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকে দেখা যায় অষ্টম শতকে ও তাহার পর আর তাহা নাই।

কিন্তু স্বর্ণমুদ্রার অনস্তিত্ব এবং রৌপ্যমুদ্রার অবনতি ও অনস্তিত্ব শুধু বহির্বাণিজ্যের অবনতি ও বিলুপ্তিদ্বারা সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা যায় না। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা পাল ও সেন আমলে খুব যে নামিয়া গিয়াছিল মনে হয় না। এই দুই আমলের লিপিগুলি এবং সমসাময়িক সাহিত্য—রামচরিত, পবনদূত, গীতগোবিন্দের মতন কাব্য, সদুক্তিকর্ণামৃতের মতন সংকলন গ্রন্থে উদ্ধৃত সমসাময়িক বাঙালী কবিদের রচনা—পাঠ করিলে, নানা বিচিত্র অলংকারশোভিত মূর্তিগুলি দেখিলে, অসংখ্য সুদৃশ্য সুউচ্চ মন্দির-রচনার কথা স্মরণ করিলে, যাগযজ্ঞে পূজানুষ্ঠানে রাজারাজড়া এবং অন্যান্য সমৃদ্ধ লোকদের দানধ্যানের কথা স্মরণ করিলে মনে হয় না লোকের, অন্তত সমাজের উচ্চতর আর্থিক শ্রেণীগুলির, ধনসমৃদ্ধির কিছু অভাব ছিল। মণিমুক্তাখচিত সোনারূপার অলংকারের যে-সব পরিচয় লিপিগুলিতে, সমসাময়িক সাহিত্যে এবং শিল্পে পড়া ও দেখা যায় তাহাতে তো মনে হয় সোনারূপাও দেশে যথেষ্ট ছিল। তৎসত্ত্বেও এই দুই রাজবংশ সুবর্ণমুদ্রা, এমনকি সেনরাজারা রৌপ্য-মুদ্রার প্রচলন করিলেন না। আন্তর্ভারতীয় বাণিজ্য এবং অন্যান্য ব্যাপারে কিসের সাহায্যে নিষ্পন্ন হইত? ভিন্নদেশীরা তো নিশ্চয়ই কড়ি গ্রহণ করিতেন না! রাষ্ট্রকে বিনিময়ে সোনা ও রূপা নিশ্চয়ই দিতে হইত। সেন আমলে স্বর্ণ বা রৌপ্য-মুদ্রা কিছুই তো ছিল না; তবে কি বিনিময় ব্যাপারটা সোনা বা রূপার তালের সাহায্যে নিষ্পন্ন হইত? রাজকোষে যে অর্থ সঞ্চয় হইত তাহাও কি সোনা ও রূপার তাল? আন্তর্ভারতীয় বাণিজ্য, ভিন্নদেশীর সঙ্গে আর্থিক লেনদেন প্রভৃতি কি রাষ্ট্রের মারফতে বা মধ্যবর্তিতায় নিষ্পন্ন হইত?

মুদ্রা-সংক্রান্ত এইসব অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রশ্নের উত্তর ঐতিহাসিক গবেষণার বর্তমান অবস্থায় একরূপ অসম্ভব বলিলেই চলে।

তৃতীয় অধ্যায়ের গ্রন্থপঞ্জী

১। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়—গৌড়লেখমালা (পাল লিপিমালার জন্য দ্রষ্টব্য)।

২। আচারাঙ্গ সূত্র—Sacred Books of the East Series, Jaina Sutras, ২৩২-৩৩ পৃ।

৩। আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প—ed. by Ganapati Sastri, ২২ পটল, ২৩২-৩৫ পৃ। Sastri's edn. p. 11-13

৪। এনামুল হক্—আরাকান রাজসভায় বাঙলা সাহিত্য।

৫। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৭, ১৩-১৮।

৬। রাজতরঙ্গিণী, ৪।৪৬৮।

৭। কালিদাস—রঘুবংশম্‌, ৪।৩৫ ; :।:৬-৩৭।

৮। কৌটিল্য—অর্থশাস্ত্র, ed by Shamasastri, ২।১৩।

৯। কৃত্তিবাস—রামায়ণ, আদিকাণ্ড, নলিনীকান্ত ভট্টশালী সং, ৯৯ পৃ।

১০। কৃষ্ণমিশ্র—প্রবোধচন্দ্রোদয়, ২য় অঙ্ক।

১১। গোবিন্দদাসের কড়চা, ক-বি সং।

১২। ঘনারাম—ধর্মমঙ্গল।

১২ক। জয়ানন্দ—চৈতন্যমঙ্গল।

১৩। ত্রিপুরা রাজমালা, বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত, ৪৯ পৃ।

১৪। দশকুমারচরিতম্‌, মিত্রগুপ্ত চরিত, ৬ষ্ঠ উচ্ছ্বাস।

১৫। দীনেশচন্দ্র সেন—বৃহৎবঙ্গ, ১ম খণ্ড।

১৬। দেবী ভাগবত—বঙ্গবাসী সং, ৩৯২ পৃ।

১৭। ধোয়ী—পবনদূত, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ সং, :৫-৩৮।

১৮। পঞ্চপুষ্প মাসিক পত্রিকা, ১৩৩৯, ৩৬৯ পৃ।

১৯। পাণিনি—পাণিনিসূত্র, Kielhorn's edn II, p. 269, 282।

২০। পদ্মনাথ ভট্টাচার্য—কামরূপ শাসনাবলী, ভূমিকা।

২০ক। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪১, ৭৮-৭৯ পৃ ; ১৩৪৮, ৪৬ পৃ ; ১৩১৭, ২৩২-২৩৪ পৃ।

২১। বসুমতী মাসিক পত্রিকা, মাঘ, ১৩৪০, ৬১৩ পৃ।

২২। বরাহমিহির—বৃহৎসংহিতা, ১৪।৮ ; ১৪।৬-৭।

২৩। বাঙলা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, তৃতীয় খণ্ড, ২, ৫৯ পৃ।

২৪। বায়ুপুরাণ, ৯৯, :৯, ৮৫ হইতে।

২৫। বাৎস্যায়ন—কামসূত্র, ৬।৪৯ ; tr. by Burton, pp. 59-58, p. 236 ; Chowkhamba edn. pp. 115, 294.

২৬। বোধায়ন—ধর্মসূত্র, ed. by Srinivasacharya, ১, ১, ২৫—৩১।

২৭। বৃহদ্ধর্মপুরাণ, Bib Ibd. edn., p. 409।

২৮। ভবিষ্যপুরাণ, ব্রহ্মখণ্ড।

২৯। ভারতঅমিত্রক—চন্দ্রপ্রভা, ৩১ পৃ।

৩০। ভাগবত পুরাণ, ২।৪।১৮।

৩১। মৎস্যপুরাণ ৪৮ ; ১২১।

৩২। মহাভাগবতপুরাণ, গুজরাতী সং, ৭০ অধ্যায়, ১৭৫ পৃ।

৩৩। মহাভারত, বনপর্ব, তীর্থযাত্রা অধ্যায় ; ২।৩০ ; ৮৩।২-৪ ; সভাপর্ব, ৫২।১৭।

৩৪। মিতাক্ষরা, নির্ণয়সাগর প্রেস সং, ২৫০ পৃ।

৩৫। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, কবিকঙ্কণ—চণ্ডীমঙ্গল, ক-বি সং, ১, ২০ পৃ।

৩৬। যশোধর—(কামসূত্রের) জয়মঙ্গল নামীয় টীকা, Benares edn , ২৯৪-৯৫ পৃ।

৩৭। রাজশেখর—কর্পূরমঞ্জরী, Konow and Lehman's edn , ২২৬-২৭ পৃ। কাব্যমীমাংসা।

৩৮। রামায়ণ, ২, ১০, ৩৬-৩৭।

৩৯। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—বৌদ্ধগান ও দোঁহা, ভূমিকা এবং ৪৯ পদের টীকা ও অর্থ।

৪০। হেমচন্দ্র—অভিধান চিন্তামণি, ভূমিকাও।

৪১। শব্দকল্পদ্রুম, গৌড় ও বরেন্দ্রী শব্দ দ্রষ্টব্য।

৪২। সতীশচন্দ্র মিত্র—যশোহর ও খুলনার ইতিহাস, ৪, ১০২ পৃ।

৪৩। সদুক্তিকর্ণামৃত—শ্রীধরদাস : ২।৮৪।৬ ; ২।১৩৫।৫ ; ৫।৩১।২।

৪৪। সন্ধ্যাকর নন্দী—রামচরিত, বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি সং, Intro. and text, ২।৫,৭,৮।

৪৫। সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ৮০-৮৭ পৃ, ১০৪-১১৯ পৃ, ৫৭৭-৭৮ পৃ, ১০১ পৃ, ৪০৪ পৃ।

৪৬। Ain-i-Akbari, tr. by Jarrett, II. p 120, 141. "The original name of Bengal was Bang. Its former rulers raised mounds measuring ten yards in height and twenty in breadth throughout the province which were called *al*. From this suffix the name Bengal took its rise and currency"।

৪৭। Aitareya Aranyaka, Keith's edn. 101, 200।

৪৮। Annual Report of the Arch. Survey of Burma. 1921-22, pp. 61 62 , 1922-23, pp 31-32।

৪৯। Annual Rep. of the Archaeological Survey of India, 1922-23 p. 109।

৫০। Bagchi, P. C.—Materials for a critical edition of the Bengali Caryapadas, in Journ. of the Dept. of Letters, C.U.।
৫১। Baharistan-i-Ghaybi, ed. & tr. by Borah. I, pp. 45-64।
৫২। Berry, J. W. E.—The waterways in East Bengal, in A.B. Patrika, 15th June, 1938।
৫৩। Bhattasali. N. K.—Antiquity of the Lower Ganges, in Science and Culture, VII, 1941, pp. 233-39।
৫৪। Bulletin l' E' cole Francaise Extreme Orient, IV. p, 131 ff., pp. 142-43।
৫৫। Carey—Good old days of the John Company, II, p. 157।
৫৬। Chakladar, H. C—Social life in Ancient India : Studies in Vatsyayana's Kamasutra, pp. 64-67।
৫৭। Corpus Inscriptionum Indicarm, III (সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তি লিপি, মহাকূট লিপি, মেহেরৌলি স্তম্ভলিপি)।
৫৮। Dacca University—History of Bengal, I, pp. 2-29।
৫৯। Dasgupta, J N.—Bengal in the Sixteenth century, C.U.। Some facts about old Dacca, in Bengal Past and Present, Jan-March, 1936।
৬০। Datta, K.—Antiquity of Khari, V. R. Soc. Memoir।
৬১। District Gazetteer, 24 Parganas, ed. by O' Malley, 1914।
৬২। Elliot and Dowsor—History of Muhammadan India as told by its own historians, III, p 295।
৬৩। Epigraphia Birminica, III, pt 1, p. 185।
৬৪। Epigraphia Carnatica, V Intro. 14n. 19, Cn. 179; VI, Cm 137; VII, Intro. 30th sloka, 119; IX Bu. 96.
৬৫। Epigraphia Indica, II, p. 345ff; V, p. 29, 257 Vi, p. 103, XIV, p. 117; XX, p. 61; XXI, p. 78ff, p. 250ff, 218ff; XXII. 150ff, 135; XXIII, p. 283; XXIV, p. 43ff; XV, p. 134ff; XVII, pp. 189-95, XVIII, p. 74ff, p. 155ff; p. 74' p. 105 19ff, 141ff p. 345ff,
৬৬। Fa hien—Travels, tr. and end. by Legge।
৬৭। Hunter, W. W.—A statistical account of Bengal।
৬৮। Ibn Batuta—ed. and tr by Gibb, p,267-77।

৬৯। I-tsing—A record of the Buddhist religion, ed by Takakusu।
৭০। Indian Antiquary, 1891, p 375, 413; 1877, p. 58; IX, p. 333ff; XIII, 134, 1910, p 193ff; XIX, p. 7ff।
৭১। Indian Historical Quarterly, II, p. 6; IX. p 724ff; X, p 58; XII, p 77; XIII, p. 151ff; 1932, p. 521ff; 1937, p 162; 1928, p 239।
৭২। Inscriptions of the Madras Presidency, I, p. 353।
৭৩। Journal of the Andhra Research Soc, VI, p. 215।
৭৪। Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1895, p. 1-24; 1873, p. 236; 1907, p. 157; 1908, p. 279ff; 1912, p. 341; N.S., XII, p 293; 1874, p. 150; 1896, p. 1ff।
৭৫। Journal of the Royal Asiatic Society, 1935, p. 99, p. 73ff, p 85ff.
৭৫ক। L'Iconographie Bouddhique de l'Inde, I, p. 200, no 55; p 192, no 17; p. 199, pl VIII. fig 4; p. 102. pl. IV, fig 3।
৭৬। Mahavamsa, ed by Geiger, P T S. edn, intro.।
৭৭। Majumdar, N. G.—Inscriptions of Bengal, I I (সেন, চন্দ্র ও বর্মণ লিপিমালার জন্য দ্রষ্টব্য)।
৭৮। Majumdar R. C. Physical features of ancient Bengal, in D R. Bhandarkar Volume।
৭৯। Majumdar, S C.—Rivers of the Bengal Delta, C.U।
৮০। Malalasekera—Dictionary of Pali proper names, II, p. 1252।
৮১। Martin—Eastern India, III, p. 15।
৮২। Mukherji, R. K—Changing face of Bengal, C U।
৮৩। Ocean of Story, trs. by Tavney, ed. by Panzer, VII, 204।
৮৪। Paul, P L.—Early history of Bengal, I, p iii-iv।
৮৫। Periplus of the Erythrean Sea, ed. and tr. by Schoff।
৮৬। Ptolemy—Ancient India, ed by S N. Majumdar (McCrindle), p 75
৮৭। Roy, H C—Dynastic history of Northern India, I, C.U।
৮৮। Ray, Niharranjan—Sanskrit Buddhism in Burma, C U.।
Theravada Buddhism in Burma, C.U.।
৮৯। Sastri, K. A. Nilakanta—The Colas, I, p. 249।
৯০। Tabaqat-i-Nasiri, ed. & tr. by Raverty, pp. 584 86; p. 558. মিনহাজের মতে গঙ্গার পশ্চিমতীরে রাল্ (= রাঢ়) এবং লখ্‌নওর (= লক্ষ্মণাবতী), পূর্বতীরে, বরিন্দ্ (= বরেন্দ্রী) এবং দিবকোট্ (= কোটীবর্ষ)

নগর। বাঙলার আর এক অংশে তখন লক্ষ্মণসেনের পুত্রেরা রাজা ; সে অংশটি বঙ্ (= পূর্ববঙ্গ)।

১১। Watters—On Yuan Chwang, II, (পুণ্ড্রবর্ধন, কামরূপ, সমতট, তাম্রলিপ্ত, কর্ণসুবর্ণ, কজঙ্গল দ্রষ্টব্য)।

১২। এই অধ্যায়ে বাঙলার যে সব লিপি হইতে সংবাদ আহরণ করা হইয়াছে, তাহাদের তালিকা ও গ্রন্থপঞ্জীর জন্য গ্রন্থশেষে পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

চতুর্থ অধ্যায়ের পাঠনির্দেশ

তৃতীয় অধ্যায়ের পাঠপঞ্জীতে যা বলেছি, যে-সব প্রাচীন গ্রন্থ ও প্রকীর্ণ রচনাদির উল্লেখ করেছি, এই অধ্যায়ের তথ্যাদিও প্রায়শ সে-সব গ্রন্থ ও রচনাদি থেকেই সংগ্রহ করা হয়েছে। তবু, তারই ভেতর সবচেয়ে বেশি তথ্য আহরণ করা হয়েছে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, বাৎস্যায়নের কামসূত্র, রাজশেখরের কাব্যমীমাংসা, গ্রীক ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক এবং চীনা পরিব্রাজকদের বিবরণ-বৃত্তান্ত, Periplus of the Eryhrean Sea, বৌদ্ধগ্রন্থ মহানির্দেশ ও মিলিন্দপঞহ, প্রাকৃতপৈঙ্গল, প্লিনির (Pliny) Natural History, XII, 18, চীন পরিব্রাজক মা-হুয়ানের ভ্রমণবৃত্তান্ত (Philip, G. Mahuan's acconut of the Kingdom of Bengal, in Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, London, 1895, pp. 520 33), মধ্যযুগীয় মার্কো পোলোর ভ্রমণবৃত্তান্ত (*ed* and *trans*. Yule, II, p 115), আইন-ই-আকবরী, বাঙলা মঙ্গলকাব্য সমূহ গ্রন্থ থেকে।

প্রাচীন লিপিমালা থেকেও (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) প্রচুর তথ্য আহরণ করা হয়েছে।

নীচে এমন ক'একটি আধুনিক গ্রন্থের উল্লেখ করা হচ্ছে যাতে ধন-সম্বল সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়।

Ghoshal, U. N., The agrarian system in ancient India, Calcutta, 1930.

Gopal, Lalanji, The economic life of northern India, Varanasi, 1963.

Majumdar, R. C. (*ed*), History of Bengal, I, Dacca, 1943.

Majumdar, R. C., History of ancient Bengal, Chap. X, Calcutta, 2nd edn, 1974.

Majumdar, Bhakat Prasad, The socio-economic history of northern India, Calcutta, 1962.

Niyogi, Pushpa, Contributions to the economic history of India, Calcutta, 1962.

Sharma, Ram Sharan, Indian Feudalism: C. 300-1200 A D, Calcutta, 1963

Sircar, D. C., Land system and feudalism in ancient India, Calcutta, 1966.

পঞ্চম অধ্যায়

ভূমি-বিন্যাস

১

যুক্তি

কৃষিপ্রধান সভ্যতায় ভূমি-ব্যবস্থা সমাজ-বিন্যাসের গোড়ার কথা। প্রাচীন বাঙলায় কৃষিই ছিল অন্যতম প্রধান ধনসম্বল। কৃষি ভূমি-নির্ভর; কাজেই ভূমি ব্যবস্থার উপরই নির্ভর করে গ্রামের সংস্থান, শ্রেণী-বিন্যাস, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির অথবা সমাজ ও ব্যক্তির পারস্পরিক সম্বন্ধ, বিভিন্ন প্রকারের ভূমির তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন প্রকারের দায় ও অধিকার ইত্যাদি। সেইজন্য কৃষি-নির্ভর সমাজে জনসাধারণের ইতিহাস জানিতে হইলে ভূমি-ব্যবস্থার ইতিহাসের পরিচয় লওয়া প্রয়োজন।

প্রাচীন বাঙলার ভূমি-ব্যবস্থার এই পরিচয় অতি দুর্লভ ব্যাপার; প্রায় দুঃসাধ্য বলিলেও চলে। প্রথমত, ভূমি দান-বিক্রয় ব্যাপার উপলক্ষে যে কয়টি রাজকীয় শাসনের খবর আমাদের জানা আছে, তাহাই এ বিষয়ে আমাদের একমাত্র নির্ভরযোগ্য উপাদান। ইহা ছাড়া পরোক্ষ সংবাদ হয়তো কিছু কিছু পাওয়া যায় প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্র জাতীয় সংস্কৃত গ্রন্থাদি হইতে। কিছু উপকরণ বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও পালি জাতক গ্রন্থাদি হইতেও সংগৃহীত হইয়াছে। কোনো কোনো পণ্ডিত এইসব উপকরণ অবলম্বন করিয়া প্রাচীন ভারতের ভূমি ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু কিছু সার্থক গবেষণাও করিয়াছেন। কেহ কেহ আবার সুবিস্তৃত এই দেশের বিস্তৃততর শাসন-লিপিবদ্ধ সংবাদ লইয়া সমগ্র ভারতবর্ষের ভূমি-ব্যবস্থার পরিচয় লইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই উভয় চেষ্টারই মূলে একটু ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। স্মৃতিশাস্ত্র অথবা অর্থশাস্ত্র জাতীয় গ্রন্থাদিতে যে সব সংবাদ পাওয়া যায় তাহা বাস্তবক্ষেত্রে কতটা প্রযোজিত হইয়াছিল, কতটা হয় নাই, সে সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। এ কথা হয়তো সহজেই অনুমান করা চলে, প্রচলিত বিধি ব্যবস্থাগুলিই এইসব গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, অন্তত চেষ্টাটা সেই দিকেই হইয়াছিল, অথবা, বিধি ব্যবস্থাপকদের আদর্শটাকেই তাঁহারা রূপ দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তখনই প্রশ্ন উঠিবে, এই সুবিস্তৃত দেশের সর্বত্রই কি একই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, অথবা খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে যাহা ছিল, খ্রীষ্টপরবর্তী দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শতকেও কি তাহাই ছিল? অথবা, যাহা ছিল আদর্শ, সর্বত্র সকল সময়ে বা কোনো কালে কোনো স্থানেই তাহা কর্মের মধ্যে রূপ লাভ করিয়াছিল কি? এই যে একটির পর একটি বিদেশী জাতি ভারতবর্ষে আসিয়া বসবাস করিয়াছে, রাজত্ব করিয়াছে, তাহারা যদি রাষ্ট্রীয় শাসনযন্ত্রের, রাষ্ট্রাদর্শের অদলবদল করিয়া থাকিতে পারে, এবং তাহা

যে করিয়াছে সে প্রমাণের অভাব নাই. তাহা হইলে ভূমি-ব্যবস্থার অদলবদল হয় নাই, সে কথা কেমন করিয়া বলা যাইবে ? স্মৃতিশাস্ত্রগুলি সব একই সময়ে রচিত হয় নাই, যদিও মোটামুটি তাহাদের কাল আমাদের একেবারে অজ্ঞাত নয়। তাহা সত্ত্বেও ইহা তো অনস্বীকার্য যে, স্মৃতিশাস্ত্রের সমাজ-ব্যবস্থা আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থার দিকে যতটা ইঙ্গিত করে, বাস্তব সমাজ-ব্যবস্থার দিকে ততটা নয়। সমসাময়িক সমাজ-ব্যবস্থার বাস্তব চিত্র তাহাতে প্রতিফলিত হইয়াছিল কিনা, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। আর, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে এ সন্দেহ যদি উত্থাপন না-ই করা যায়, তাহা হইলেও এই জিজ্ঞাসা নিশ্চয়ই করা চলে যে, ইহার সাক্ষ্যপ্রমাণ কি পরবর্তী কাল সম্বন্ধেও প্রযোজ্য ? অথচ রাষ্ট্রের প্রয়োজন, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং সামাজিক দাবির প্রয়োজনে ভূমি-ব্যবস্থা যে পরিবর্তিত হয় তাহা তো একেবারে স্বতঃসিদ্ধ। স্মৃতিশাস্ত্র ইত্যাদি সম্বন্ধে যে সব কথা বলা যায়, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ইত্যাদি সম্বন্ধে সে কথা তো আরও বেশি প্রযোজ্য। তাহা ছাড়া এই জাতীয় গ্রন্থের সাক্ষ্যপ্রমাণ কোনোটিই আমরা প্রাচীন বাঙলাদেশে নিঃসন্দেহে প্রয়োগ করিতে পারি না, কারণ কোন সাক্ষ্যপ্রমাণই নির্দিষ্টভাবে বাঙলাদেশের দিকে ইঙ্গিত করে না। বাঙলার বাহিরের শাসনলিপির প্রমাণও বাঙলার ভূমি-ব্যবস্থার পরিচয়ে ব্যবহার করা চলে না, যদিও সে চেষ্টা পণ্ডিতদের মধ্যে হইয়াছে। চোখের সম্মুখেই আমরা দেখিতেছি, মাদ্রাজে অথবা ওড়িশায়, আসামে অথবা গুজরাতে যে ভূমি-ব্যবস্থা আজ প্রচলিত, বাঙলাদেশের সঙ্গে তাহার কোনো যোগ নাই। বস্তুত, বর্তমান কালে এক প্রদেশের ভূমি-ব্যবস্থা হইতে অন্য প্রদেশের ভূমি-ব্যবস্থা বিভিন্ন। প্রাচীন কালেও এই বিভিন্নতা ছিল না, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় কি ? ভূমির শ্রেণীবিভাগ নির্ভর করে প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর ; ভাগ, ভোগ, কর ইত্যাদি নির্ভর করে ভূমিলব্ধ আয়ের উপর, সে আয়ের তারতম্য ভূমির প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। তাহা ছাড়া, সবচেয়ে যাহা বড় কথা, ভূমির উপর অধিকার এবং সে অধিকারের স্বরূপ, তাহাও এই সুবিস্তৃত দেশে বিভিন্ন কালে একই প্রকার ছিল, এই অনুমানই বা কী করিয়া করা যায় ? যে জাতীয় গ্রন্থের উল্লেখ আগে করা হইয়াছে, এইসব গ্রন্থ প্রায় সমস্তই ব্রাহ্মণ্য আদর্শের দ্বারা শাসিত সমাজের সৃষ্টি ; কিন্তু এই সমাজের বাহিরে অনার্য, আর্যপূর্ব সমাজ ও সেই সমাজের অগণিত লোক আমাদের দেশে বাস করিত ; 'শিষ্টদেশ'-বহির্ভূত এই বাঙলাদেশে তাহাদের সংখ্যা ও প্রভাব কম ছিল না। আমাদের ধর্ম, ধ্যানধারণা, আচারব্যবহার, সমাজ-ব্যবস্থা ইত্যাদিতে এখনও সেইসব প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আমাদের ভূমি-ব্যবস্থায় সেই প্রভাব পড়ে নাই, এ কথা কে বলিবে ? সেই প্রভাব ভারতবর্ষের সর্বত্র এক ছিল না। আর্য সভ্যতার কেন্দ্রস্থল বর্তমান যুক্তপ্রদেশে এই প্রভাবকে ঠেকাইয়া রাখা হয়তো সম্ভব হইয়াছিল, কিন্তু বাঙলাদেশে তাহা হইয়াছিল কি ? পিতৃপ্রধান আর্য সমাজসংস্থান এবং মাতৃপ্রধান আর্যপূর্ব অথবা অনার্য সমাজসংস্থানে ভূমি-ব্যবস্থার

তারতম্য থাকিতে বাধ্য ; এবং এই তারতম্য প্রাচীন ভারতের ভূমি-ব্যবস্থাকে বিভিন্ন দেশখণ্ডে বিভিন্ন ভাবে রূপ দান করে নাই, এ কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় কি ? এইসব কারণে কেবলমাত্র পূর্বোক্ত গ্রন্থগুলি অবলম্বনে ভূমি-ব্যবস্থার ইতিহাস রচনা করা খুব যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। বিশেষ ভাবে, প্রাচীন বাঙলার ভূমি-ব্যবস্থার পরিচয়ে এই জাতীয় উপাদানের উপর কিছুতেই পুরাপুরি নির্ভর করা চলে না।

অন্যক্ষেত্রে যেমন এক্ষেত্রেও তেমনই, এই ভূমি-ব্যবস্থার পরিচয়ে আমি আমাদের প্রাচীন ভূমি-দানবিক্রয় সম্বন্ধীয় তাম্র-পট্টোলীগুলিকেই নির্ভরযোগ্য উপাদান বলিয়া মনে করি। প্রথমত, ইহাদের সাক্ষ্যপ্রমাণ সম্বন্ধে অবাস্তবতার আপত্তি তুলিবার উপায় নাই ; বস্তুত, যাহা প্রচলিত ছিল, যে রীতি ও পদ্ধতি যখন অনুসৃত হইত, তাহাই যথাযথ ভাবে এই পট্টোলীগুলিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, ইহাদের উৎস ও কালনির্দেশ সম্বন্ধে কোনো অনিশ্চয়তা নাই। অবশ্য এ কথা সত্য যে, ভূমি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে-সব সংবাদ জানা একান্তই প্রয়োজন তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় এইসব উপাদানে পাওয়া যায় না। কিন্তু যাহা যতটুকু পাওয়া যায়, যতটুকু বুঝা যায়, ততটুকুই মূল্যবান ও নির্ভরযোগ্য ; যাহা পাওয়া যায় না তাহা লইয়া অভিযোগ করা চলে, কিন্তু কল্পনার সাহায্যে পূরণ করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য বুদ্ধিসাধ্য, যুক্তিসাধ্য অনুমানে বাধা নাই, যতক্ষণ সে অনুমান সমাজ-বিবর্তনের সাধারণ ইতিহাস-সম্মত নিয়ম, সমসাময়িক সমাজ-ব্যবস্থার ইঙ্গিত অতিক্রম করিয়া না যায়। তাহা ছাড়া, এইসব প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যপ্রমাণের মধ্যে এমন কিছু কিছু ইঙ্গিত আছে, যাহা খুব সুবোধ্য নয় ; এমন সব শব্দ ও পদের ব্যবহার আছে যাহা সমসাময়িককালে নিশ্চয়ই খুব সহজবোধ্য ছিল, কিন্তু আমাদের কাছে এখন আর তেমন নয়। এইসব ক্ষেত্রে স্মৃতিশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র জাতীয় উপাদানের সাহায্য লওয়া যাইতে পারে, আমিও লইয়াছি ; তাহার একমাত্র কারণ, এইসব গ্রন্থে পূর্বোক্ত শব্দ বা পদের বা দুর্বোধ্য ও কষ্টবোধ্য রীতি-পদ্ধতিগুলির সুবোধ্য ও বিস্তৃততর ব্যাখ্যা অনেক সময় পাওয়া যায়।

২

ভূমিদান এবং ক্রয়-বিক্রয়ের রীতি ও ক্রম

ভূমি-ব্যবস্থা সম্পর্কিত যে-সব পট্টোলী প্রাচীন বাঙলায় এ-পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, সেগুলিকে মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা যায়। খ্রীষ্টোত্তর পঞ্চম হইতে অষ্টম শতক পর্যন্ত লিপিগুলি সমস্ত ভূমি-দানবিক্রয় সম্বন্ধীয় ; এই লিপিগুলিতে ভূমি-দানবিক্রয় রীতির ক্রমও কমবেশি বিস্তৃতভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহার

ফলে ভূমি-সম্পর্কিত দায় ও অধিকার, ভূমির প্রকারভেদ ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক প্রকার সংবাদ এই লিপিগুলিতে পাওয়া যায়। এই রীতি-ক্রমের একটু পরিচয় এইখানে লওয়া যাইতে পারে। রাজাকর্তৃক ব্রাহ্মণকে কিংবা দেবতার উদ্দেশ্যে ভূমি-দানের লিপি বা দলিল প্রাচীন ভারতে অজ্ঞাত নয়; কিন্তু প্রাচীন বাঙলার এই পর্বের লিপিগুলি ঠিক এই জাতীয় ব্রহ্মদেয় বা দেবোত্তর ভূমি-দানের পট্ট বা দলিল নয়। এই শাসনগুলি একটু বিস্তৃত ভাবে বিশ্লেষণ করিলে প্রাচীন বাঙলার ভূমি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে এমন সব সংবাদ পাওয়া যায় যাহা সাধারণত প্রাচীন ভারতের ভূমি-দানসম্পর্কিত শাসনগুলিতে বেশি দেখা যায় না।

প্রথমেই দেখিতেছি, ভূমি-ক্রয়েচ্ছু যিনি তিনি স্থানীয় রাজসরকারের কাছে আবেদন বিজ্ঞাপিত করিতেছেন। ক্রয়েচ্ছু একজনও হইতে পারেন, একজনের বেশিও হইতে পারেন, এবং একাধিক ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তি একই সঙ্গে ক্রয়ের ইচ্ছা বিজ্ঞাপিত করিতে পারেন। যেমন, বৈগ্রাম তাম্রপট্টোলীতে দেখা যায় একই সঙ্গে দুই ভাই, ভোয়িল ও ভাস্কর, একত্র রাজসরকারে ভূমি-ক্রয়ের আবেদন জানাইতেছেন। পাহাড়পুর পট্টোলীতে দেখি, ব্রাহ্মণ নাথশর্মা ও তাঁহার স্ত্রী রামী একই সঙ্গে আবেদন উপস্থিত করিতেছেন। ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা সাধারণ গৃহস্থও হইতে পারেন, অথবা রাজসরকারের কর্মচারী বা তৎসম্পর্কিত ব্যক্তি বা অধিকরণের সভ্যও হইতে পারেন। ধনাইদহ তাম্রপট্টোলীতে দেখা যাইতেছে ভূমি-ক্রেতা হইতেছেন একজন আয়ুক্তক বা রাজকর্মচারী; ৫নং দামোদরপুর তাম্রশাসনে উল্লিখিত নগরশ্রেষ্ঠী রিভুপাল স্থানীয় অধিষ্ঠানাধিকরণের একজন সভ্য; বৈন্যগুপ্তের গুণাইঘর পট্টোলীতে আবেদন-কর্তা হইতেছেন মহারাজ রুদ্রদত্ত যিনি মহারাজ বৈন্যগুপ্তের পদদাস, তবে রুদ্রদত্ত মূল্য দিয়া ভূমি ক্রয় করিয়াছিলেন, না বিনামূল্যেই তাহা লাভ করিয়াছিলেন, স্পষ্ট করিয়া শাসনে বলা হয় নাই; ধর্মাদিত্যের ১নং পট্টোলীতে ভূমি-ক্রেতার নাম বটভোগ যিনি ছিলেন সাধনিক, এবং এই উপাধি হইতে মনে হয় তিনি রাজকর্মচারী ছিলেন; গোপচন্দ্রের পট্টোলীতে ভূমি-ক্রেতা হইতেছেন বৎসপাল যিনি ছিলেন বারকমণ্ডলের বিষয়-ব্যাপারের কর্তা, রাষ্ট্রের বিনিযুক্তক (বারক বিষয়-ব্যাপারায় বিনিযুক্তক বৎসপাল স্বামিনা), অর্থাৎ রাষ্ট্রযন্ত্র-সম্পর্কিত ব্যক্তি; ত্রিপুরা জেলায় প্রাপ্ত লোকনাথের পট্টোলীতেও ব্রাহ্মণ মহাসামন্ত প্রদোষশর্মণ এই জাতীয় জনৈক রাষ্ট্রযন্ত্র-সম্পর্কিত ব্যক্তি, কিন্তু তিনি মূল্য দিয়া ভূমি লাভ করিয়াছিলেন কিনা তাহা শাসনে সুস্পষ্ট উল্লিখিত হয় নাই। রাজসরকার বলিতে সাধারণত যে অধিষ্ঠান বা বিষয়ে প্রস্তাবিত ভূমির অবস্থিতি সেই অধিষ্ঠানের আয়ুক্তক ও অধিষ্ঠানাধিকরণ, অথবা বিষয়ের বিষয়পতি ও বিষয়াধিকরণ এবং স্থানীয় প্রধান প্রধান লোকদের বুঝায়। দুই-একটি পট্টোলীতে মাঝে মাঝে ইহার অল্পবিস্তর ব্যতিক্রম যে নাই তাহা বলা চলে না, তবে তাহা খুব উল্লেখযোগ্য নয়, এই কারণে যে, সর্বত্রই ভূমির প্রকৃত অধিকারীর পক্ষে স্থানীয়

প্রতিনিধিদের বিজ্ঞাপিত করাটাই ছিল সাধারণ নিয়ম। রাজসরকারের উল্লেখ-প্রসঙ্গে তদানীন্তন রাজার এবং ভুক্তিপতি বা উপরিকের নামও উল্লেখ করার রীতি প্রচলিত ছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে শাসনের এই অংশে লিপির তারিখও দেওয়া হইয়াছে।

এই সাধারণ বিজ্ঞপ্তির পরই দেখিতেছি, ভূমি-ক্রয়ের বিশেষ উদ্দেশ্যটি কী, তাহা আবেদন-কর্তা সাধারণত প্রথম পুরুষেই বিজ্ঞাপিত করিতেছেন, এবং তিনি যে, ক্ষেত্র, খিল, অথবা বাস্তুভূমির স্থানীয় প্রচলিত রীতি অনুযায়ী মূল্য দিতে প্রস্তুত আছেন, তাহাও বলিতেছেন। দেখা যাইতেছে, সর্বত্রই ভূমি-ক্রয়ের প্রেরণা ক্রীত-ভূমি দেবকার্য বা ধর্মাচরণোদ্দেশে দানের ইচ্ছা।

তৃতীয় পর্বে পুস্তপাল বা দলিল-রক্ষকের বিবৃতি। ভূমি-ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তির আবেদন রাজসরকারে পৌঁছিলেই রাজসরকার তাহা পুস্তপাল বা পুস্তপালদের দপ্তরে পাঠাইতেছেন; পুস্তপাল বা পুস্তপালেরা প্রস্তাবিত ভূমি আর কাহারও ভোগ্য কিনা, আর কাহারও অধিকারে আছে কিনা, অন্য কেহ সেই ভূমি ক্রয়ের ইচ্ছা জানাইয়াছে কিনা, ভূমির মূল্য যথাযথ নির্ধারিত হইয়াছে কিনা, রাজসরকারের কোন স্বার্থ তাহাতে আছে কিনা ইত্যাদি জ্ঞাতব্য তথ্য নির্ণয় করিতেছেন তাঁহার বা তাঁহাদের দপ্তরে রক্ষিত কাগজপত্র, শাসন ইত্যাদির সাহায্যে, এবং কোনও প্রকার আপত্তি না থাকিলে প্রস্তাবিত ভূমি বিক্রয়ের সম্মতি জানাইতেছেন। যে কয়েকটি শাসনের খবর আমরা জানি তাহার প্রত্যেকটিতে পুস্তপাল-দপ্তরের সম্মতিই বিজ্ঞাপিত হইয়াছে; এই কারণে অনুমান করা স্বাভাবিক যে, ব্যাপারটা নেহাতই কার্যক্রমগত। কিন্তু, বোধহয়, এই অনুমান সর্বত্র সংগত নয়। ৫নং দামোদরপুর পট্টোলীতে বিষয়পতির সঙ্গে পুস্তপালের একটু বিরোধের ([বিষয়পতিনা কশ্চিদ্বিরোধঃ) ইঙ্গিত যেন আছে! কী লইয়া বিরোধী বাধিয়াছিল তাহা সুস্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই; তবে অনুমান হয় যে, বিষয়পতির পক্ষ হইতে কোন আপত্তি উঠিয়াছিল। যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত মহারাজাধিরাজের নিকটে গিয়া বিষয়পতির আপত্তি টেঁকে নাই।

চতুর্থ পর্বে রাষ্ট্রের অনুমতি। যথানির্ধারিত মূল্য গ্রহণের পর রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে স্থানীয় রাজসরকার ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের ভূমি বিক্রয়ের অনুমতি দিতেছেন, এবং প্রস্তাবিত ভূমি যে-গ্রামে অবস্থিত সেই গ্রামের প্রধান প্রধান ব্যক্তি ও ব্রাহ্মণ-কুটুম্বদের ও রাজপুরুষদের সম্মুখে বিক্রীত ভূমির সীমা নির্দেশ করিয়া, অন্য ভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, স্থানীয় প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ভূমির মাপজোখ করিয়া বিক্রীত ভূমি ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তি বা ব্যক্তিদিগকে হস্তান্তরিত করিয়া দিতেছেন। কী শর্তে তাহা দিতেছেন, তাহাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইতেছে। দেখা যাইতেছে প্রায় সর্বত্রই এই শর্ত অক্ষয়নীবীধর্মানুযায়ী।

পঞ্চম পর্বে ক্রেতার বা বিক্রেতার পক্ষ হইতে ক্রীত অথবা বিক্রীত ভূমি-দানের বিবৃতি। এই পর্বে ক্রেতা অথবা বিক্রেতা কাহাকে বা কাহাদের কী উদ্দেশ্যে, কোন্ শর্তে

ক্রীত ভূমি দান করিতেছেন তাহা বলা হইতেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্রেতার পক্ষ হইতে বিক্রেতাও তাহা করিয়াছেন।

ষষ্ঠ অথবা সর্বশেষ পর্বে এই জাতীয় দত্ত ভূমি রক্ষণাপহরণের পাপপুণ্যের বিবৃতি দেওয়া হইতেছে এবং শাস্ত্রোক্ত শ্লোকে তাহা সমাপ্ত হইতেছে। কোনো কোন ক্ষেত্রে এই পর্বে শাসনের তারিখ উল্লিখিত আছে। স্থানীয় রাজসরকারের সীলমোহরদ্বারা এইসব পট্টোলী নিয়মানুযায়ী পট্টীকৃত বা আধুনিক ভাষায় রেজেষ্টী করা হইত।

সমস্ত তাম্রশাসনেই যে সব ক'টি পর্বের উল্লেখ একই ভাবে আছে, তাহা নয়। কোনো কোনো তাম্রপট্টে সব ক'টি পর্বের বিস্তৃত উল্লেখ নাই, কোনো পর্বের আভাসমাত্র আছে, আবার কোথাও কোথাও একেবারে বাদও দেওয়া হইয়াছে। তাহা ছাড়া, কোনো কোনো ক্ষেত্রে জমির মাপজোখ ও সীমানির্দেশ রাজসরকার হইতে না করিয়া গ্রামপ্রধানদের তাহা করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে, যেমন পাহাড়পুর পট্টোলীতে। এইরূপ অল্পস্বল্প ব্যতিক্রম কোথাও কোথাও থাকা সত্ত্বেও মোটামুটি পট্টোলীগুলি একই ধরনের।

কিন্তু এই পঞ্চম হইতে অষ্টম শতক পর্যায়ে একেবারে অন্য ধরনের ভূমি-দানের পট্টোলীও যে নাই তাহা বলা চলে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বৈন্যগুপ্তের গুণাইঘর পট্টোলী (৬ষ্ঠ শতক), জয়নাগের বপ্পঘোষবাট পট্টোলী (৭ম শতক), লোকনাথের ত্রিপুরা পট্টোলী (৭ম শতক), এবং দেবখড়্গের আস্রফপুরের দুটি পট্টোলীর (৮ম শতক) উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাদের প্রত্যেকটিই ভূমি-দানের শাসন, দত্তভূমি ক্রয়ের কোনও উল্লেখই ইহাদের মধ্যে নাই; কাজেই পূর্বোক্ত শাসনগুলির ক্রমের সঙ্গে এই পট্টোলীগুলির তুলনা করা চলে না। বৈন্যগুপ্তের গুণাইঘর তাম্রপট্টোলীতে মহারাজ রুদ্রদত্তের অনুরোধে মহারাজ বৈন্যগুপ্ত স্বয়ং কিছু ভূমি দান করিতেছেন মহাযানী সম্প্রদায়ের অবৈবর্তিক ভিক্ষুসংঘকে; লোকনাথের ত্রিপুরা পট্টোলীতে রাজকর্মচারী ব্রাহ্মণ মহাসামন্ত প্রদোষশর্মণ এক অনন্তনারায়ণের মন্দির নির্মাণ ও মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য এবং তাহার দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহের জন্য মহারাজ লোকনাথের কাছে কিছু ভূমি প্রার্থনা করিতেছেন, এবং রাজা সেই ভূমিদান করিতেছেন। জয়নাগের বপ্পঘোষবাট পট্টোলী ও দেবখড়্গের আস্রফপুর পট্টোলী দুটিতে ভূমিদানের অনুরোধ বা প্রার্থনা কেহ জানাইতেছেন, এমন উল্লেখও নাই; রাজা নিজেই যথাক্রমে ভট্ট ব্রহ্মবীর স্বামী ও কোনো বৌদ্ধসংঘকে ভূমিদান করিতেছেন, এইটুকুই শুধু আমরা জানিতে পারিতেছি। কামরূপরাজ ভাস্কর-বর্মণের নিধনপুর লিপিতে আর একটি প্রয়োজনীয় তথ্য জানা যাইতেছে। ভাস্করবর্মার জনৈক ঊর্ধ্বতন পুরুষ রাজা ভূতিবর্মণ একবার কয়েকজন ব্রাহ্মণকে প্রচুর ভূমিদান করিয়া দানকর্ম রাজসরকারে পট্টীকৃত করিয়া তাম্রপট্টগুলি ব্রাহ্মণদের হাতে অর্পণ করিয়াছিলেন। পরে কোনো সময়ে অগ্নিদাহে সেই তাম্রপট্টগুলি নষ্ট হইয়া যায়। তাহার ফলে ভূমির

ভোগাধিকার লইয়া পাছে কোনও প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, বোধহয় এই আশঙ্কাতেই সেই ব্রাহ্মণদের বংশধরেরা ভাস্করবর্মণের নিকট হইতে পুরাতন দানক্রিয়া নূতন করিয়া পট্টীকৃত করিয়া লন। ভাস্করবর্মণানুমোদিত তাম্রপট্টই বর্তমানে নিধনপুর পট্টোলী বলিয়া খ্যাত; কিন্তু মূলত এই ব্রহ্মদেয় ভূমি রাজা ভূতিবর্মার দান।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, আগে যে দানবিক্রয়-সম্পর্কিত পট্টোলীগুলির উল্লেখ করিয়াছি সেগুলি সদ্যোক্ত পট্টোলীগুলি হইতে বিভিন্ন। পূর্বোক্ত পট্টোলীগুলি প্রথমত ভূমি-ক্রয়বিক্রয়ের শাসন এবং দ্বিতীয়ত ভূমি-দানের শাসনও বটে। সদ্যোক্ত পট্টোলীগুলি শুধুই ভূমি-দানের শাসন। ভূমি-ক্রয়ের শাসন কাহাকে বলে বার্হস্পত্য ধর্মশাস্ত্রে তাহার উল্লেখ আছে। বৃহস্পতি বলেন, ন্যায্য মূল্য দিয়া কোনো ব্যক্তি যখন কোনো বাস্তু, ক্ষেত্র অথবা অন্য কোনো প্রকার ভূমি-ক্রয় করেন এবং মূল্যের উল্লেখসমেত ক্রয়কার্যের একটি শাসন লিপিবদ্ধ করিয়া লন, তখনই সে শাসনকে বলা হয় ভূমি-ক্রয়ের শাসন। পূর্বোক্ত লিপিগুলি যে বৃহস্পতি কথিত ভূমি-ক্রয়ের শাসন এ সম্বন্ধে তাহা হইলে কোনো সন্দেহ নাই। জার্মান পণ্ডিত য়লি (Jolly) মনে করেন, বৃহস্পতি খ্রীষ্টোত্তর ৬ষ্ঠ অথবা ৭ম শতকের লোক; যদি তাহা হয় তাহা হইলে বৃহস্পতি পূর্বোক্ত পট্টোলীগুলির প্রায় সমসাময়িক। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের বাস্তু ও বাস্তু-বিক্রয় অধ্যায়ে সর্বপ্রকার ভূমি, ঘরবাড়ি, উদ্যান, পুষ্করিণী, হ্রদ, ক্ষেত্র ইত্যাদি বিক্রয়ের ক্রম ও রীতির উল্লেখ আছে; এই অধ্যায় হইতে আমরা জানিতে পাই, এই ধরনের ক্রয়-বিক্রয় কুটুম্ব, প্রতিবাসী এবং সম্পন্ন ব্যক্তিদের সম্মুখে হওয়া উচিত, এবং যিনি সর্বোচ্চ মূল্য দিয়া ভূমি ডাকিয়া লইয়া ক্রয় করিতে রাজী হইবেন তাঁহার কাছেই প্রস্তাবিত ভূমি বিক্রয় করিতে হইবে। ভূমির মূল্যের উপর ক্রেতাকে রাজসরকারে একটা করও দিতে হইবে, এ কথাও কৌটিল্য বলিতেছেন। মূল্যের উপর কোনও প্রকার করের উল্লেখ আমাদের লিপিগুলিতে নাই; ইহার কারণ সহজেই অনুমেয়। ক্রীত ভূমিখণ্ডগুলি প্রায় সমস্তই ধর্মাচরণোদ্দেশে দানের জন্য, এবং সেই হেতুই তাহা কররহিত। তবে, ভূমি-বিক্রয়ের ব্যাপারটা যে কুটুম্ব, প্রতিবাসী এবং সমৃদ্ধ ব্যক্তিদের সম্মুখেই নিষ্পন্ন হইত তাহার উল্লেখ প্রায় প্রত্যেক লিপিতেই পাওয়া যায়। কতকটা পূর্বোক্ত শাসনানুরূপ ভূমি-বিক্রয়ের অন্তত একটি পাথুরে প্রমাণের সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে। এই লিপিটি নাসিকের একটি বৌদ্ধ-গুহার প্রাচীরে উৎকীর্ণ, এবং ইহার তারিখ খ্রীষ্টোত্তর দ্বিতীয় শতকের প্রথমার্ধ। ইহাতে উল্লেখ আছে যে, ক্ষপে নহপানের জামাতা, দীনীকপুত্র উষবদাত জনৈক ব্রাহ্মণের নিকট হইতে ৪,০০০ কার্ষাপণ মুদ্রায় কিছু ক্ষেত্রভূমি ক্রয় করিয়াছিলেন, এবং তাহা গুহাবাসী ভিক্ষুসংঘকে দান করিয়াছিলেন। উষবদাত ভূমি ক্রয় করিয়াছিলেন জনৈক গৃহস্থের নিকট হইতে, রাজা বা রাষ্ট্রের নিকট হইতে নয়, কাজেই সে-ক্ষেত্রে যে সুবিবৃত ক্রমের উল্লেখ প্রাচীন বাঙলার পূর্বোক্ত লিপিগুলিতে আছে তাহার কোনো প্রয়োজনই হয় নাই। আমাদের লিপিগুলিতে কিন্তু

সাধারণ ভাবে একটি দৃষ্টান্তও পাইতেছি না যেখানে কোনও গৃহস্থ কোনো ভূমি বিক্রয় করিতেছেন ; সর্বত্রই যে ভূমি বিক্রীত হইতেছে, তাহা রাজা বা রাষ্ট্রকর্তৃকই হইতেছে। এ প্রশ্ন স্বভাবতই মনকে অধিকার করে, প্রাচীন বাঙলার সুদীর্ঘ কালের মধ্যে কোনও গৃহস্থই কি ভূমি বিক্রয় করেন নাই ? সে অধিকার কি তাঁহার ছিল না ? যদি করিয়া থাকেন, যদি সে-অধিকার থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা কী উপায়ে বিধিবদ্ধ হইত ? সে বিষয়ে রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্বন্ধে কিরূপ ছিল ? কৌটিল্যের ইঙ্গিতানুযায়ী ভূমির মূল্যের উপর রাজাকে বা রাষ্ট্রকে কিছু প্রণামী দিতে হইত কি, না রাষ্ট্র রাজস্ব লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিত ? এইসব অত্যন্ত সংগত ও স্বাভাবিক প্রশ্নের কোনো উত্তর পাইবার সূত্রও লিপিগুলিতে আবিষ্কার করা যায় না।

এ-পর্যন্ত খ্রীষ্টোত্তর অষ্টম শতক পর্যন্ত লিপিগুলির কথাই বলিলাম। এইবার অষ্টম হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত লিপিগুলি একটু বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে। প্রথমেই বলা যায়, যতগুলি শাসনের সংবাদ আমরা জানি, তাহার সব ক'টিই ভূমি-দানের শাসন, ভূমি ক্রয়-বিক্রয়ের শাসন একটিও নয়। এই পর্বের শাসনগুলিকে সেই জন্য পূর্বোক্ত গুণাইঘর, বপ্পঘোষবাট, লোকনাথ বা আস্রফপুর লিপিগুলির সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে, যদিও পাল ও সেন আমলের লিপিগুলি অনেকটা দীর্ঘায়ত। অন্য কারণেও এই পর্বের কোনো কোনো শাসনের সঙ্গে গুণাইঘর লিপি অথবা লোকনাথের লিপিটির কতকটা তুলনা করা চলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধর্মপালের খালিমপুর লিপিটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। মহাসামন্তাধিপতি শ্রীনারায়ণ বর্মা একটি নারায়ণ-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ; সেই মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ ও পূজার দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি যুবরাজ ত্রিভুবনপালকে দিয়া রাজার কাছে চারিটি গ্রাম প্রার্থনা করিয়াছিলেন, এবং প্রার্থনানুযায়ী রাজা তাহা দান করিয়াছিলেন। এই ধরনের দৃষ্টান্ত আরো দু'একটি উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ শাসনে এইরূপ প্রার্থনা বা অনুরোধের কোনও উল্লেখ নাই, রাজা যেন স্বেচ্ছায় ভূমি দান করিতেছেন, এই রকম ধারণা জন্মায়। অথবা, এমনও হইতে পারে, অনুরোধ বা প্রার্থনা করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা আর বাহুল্য অনুমানে উল্লিখিত হয় নাই। এই ধরনের লিপিগুলির সঙ্গে বপ্পঘোষবাট ও আস্রফপুর লিপি দুইটির তুলনা করা যাইতে পারে। পাল-আমলে দেখা যায়, কোথাও কোথাও ভূমি দান করা হইতেছে কোনো ধর্মপ্রতিষ্ঠানের উদ্দেশে, যদিও ব্যক্তিগতভাবে ব্রাহ্মণকে ভূমি-দানের দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। কিন্তু, সেন-আমলে প্রায় সব দানই ব্যক্তিগত দান, এবং সেন-রাজাদের যে কয়টি ভূমি-দানের সংবাদ আমরা শাসনে পাই তাহার সব কয়টিরই দান-গ্রহীতা হইতেছেন ব্রাহ্মণ এবং দানের উপলক্ষ হইতেছে কোনো ধর্মানুষ্ঠানের আচরণ। এই ধরনের দান কতকটা ব্রাহ্মণ-দক্ষিণা জাতীয়, এবং এ-সব ক্ষেত্রে ভূমি-দান গ্রহণের কোনো অনুরোধ-জ্ঞাপনের প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

আমার তো মনে হয়, যে-সব ক্ষেত্রে কোনো ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের জন্য ভূমি প্রয়োজন হইয়াছে, সেইখানেই প্রতিষ্ঠানের স্থাপয়িতা রাজাকে ভূমি দানের অনুরোধ জানাইয়াছেন, এবং রাজাও সেই অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন ; গুণাইঘর, লোকনাথ ও খালিমপুর লিপির সাক্ষ্য এই অনুমানের দিকেই ইঙ্গিত করে। আর, যেখানে রাজা অথবা রাষ্ট্র নিজেই প্রতিষ্ঠানের স্থাপয়িতা, অথবা যেখানে পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত কোনও আয়তনের প্রয়োজন রাজা নিজেই অনুভব করিয়াছেন, অথবা রাষ্ট্র-কর্মচারীর বা জনপদ-প্রধানদের মুখ হইতে শুনিয়াছেন, সেখানে রাজা নিজেই স্বেচ্ছায় ভূমি দান করিয়াছেন, কোনো অনুরোধের অপেক্ষা বা অবসর সেখানে নাই। শেষোক্ত ক্ষেত্রে আমার এই অনুমানের সাক্ষ্য অষ্টম শতকের আস্রফপুর লিপি দুইটিতে আছে। ইহার সাক্ষ্য এই যে, রাজা দেবখড়্গ নিজেই আচার্য সংঘমিত্রের বিহারের ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রচুর ভূমি দান করিয়াছিলেন, কোনও অনুরোধের উল্লেখ সেখানে নাই। শ্রীহট্ট জেলার ভাটেরা গ্রামে প্রাপ্ত গোবিন্দকেশবদেবের লিপির সাক্ষ্যও একই প্রকারের।

এই পর্বের লিপিগুলিতে দেখিলাম, ভূমিদান করিতেছেন সর্বত্রই রাজা স্বয়ং, কিন্তু সপ্তম-অষ্টম শতকের আগেকার লিপিগুলিতে দেখিয়াছি, ধর্মপ্রতিষ্ঠানের ব্যয়নির্বাহের জন্য ভূমিদান গৃহস্থ ব্যক্তিরাই করিতেছেন, এবং দানের পূর্বে সেই ভূমি মূল্য দিয়া রাজার নিকট হইতে কিনিয়া লইতেছেন। দু'চার ক্ষেত্রে রাজাও ভূমিদান করিতেছেন, কিন্তু তাহাও ক্রেতার পক্ষ হইতেই ; তিনি শুধু দানকার্যের পুণ্যের ষষ্ঠভাগ (ধর্মষড়ভাগং) লাভ করিতেছেন। এ প্রশ্ন স্বাভাবিক যে, আগেকার পর্বে অর্থাৎ সপ্তম শতকের পূর্বে ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের যত ভূমিদান তাহা অধিকাংশ গৃহস্থ ব্যক্তিরাই করিতেছেন কেন, আর উত্তর-পর্বে ভূমিদান শুধু রাজাই করিতেছেন কেন ? এই প্রশ্নের উত্তর কি এই যে, ধর্মপ্রতিষ্ঠান-গুলির প্রতিষ্ঠা ও ভরণপোষণের দায়িত্ব আগে ব্যক্তিগতভাবে পুরজনপদবাসী গৃহস্থরাই করিতেন, এবং পরে ক্রমশ সেই দায়িত্ব রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে রাজাই গ্রহণ করিয়াছিলেন ? ব্যক্তিগত ভাবে ব্রাহ্মণদের যে-সব ভূমিদান করা হইত, সে-সব দান সম্বন্ধে এ ধরনের কোন প্রশ্নের বা উত্তরের অবকাশ নাই। এইরূপ ব্যক্তিগত দানের পরিচয় ঘাঘরাহাটি এবং বপ্পঘোষবাট পট্টোলী দুইটিতে পাওয়া যায়। পাল ও সেন আমলের লিপিতে এই পরিচয় প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়।

গুপ্ত আমল হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত ভূমি দান-বিক্রয়ের পট্টোলীতেই দেখা যায় পুস্তপাল (record-keeper) নামক জনৈক রাজপুরুষের উল্লেখ। কেন্দ্রীয় ভুক্তি-সরকারে যেমন, আহার এবং মণ্ডল-অধিষ্ঠানেও তেমনই পুস্তপাল-নামীয় একজন রাজপুরুষ নিযুক্ত থাকাই যেন ছিল রীতি। পট্টোলীগুলি একটু অভিনিবেশে পাঠ করিলেই মনে হয়, ভূমি-সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্রের দপ্তরের মালিকই ছিলেন তিনি, এবং তাঁহার প্রথম ওপ্রধান কর্তব্য ছিল তাঁহার অধীন সমস্ত ভূমির সীমা, স্বত্ব, অধিকার,

বিভাগ, অর্থাৎ জরিপ সম্বন্ধীয় সমস্ত সংবাদ ও হিসাব সংগ্রহ করা এবং তাহা প্রস্তুত রাখা। খুবই সম্ভব, এইসব সংবাদ লিপিবদ্ধ থাকিত তালপাতায় কিংবা ঐ জাতীয় কোনও বস্তুর উপর; আজ আর সে-সব দপ্তর উদ্ধারের কোন উপায় নাই! জমি যখন দান-বিক্রয় করা হইত এবং রাজসরকারে পট্টীকৃত বা রেজেস্ট্রী করা হইত, কেবল তখনই প্রয়োজন হইত তাম্রশাসনের; তাহারই দুই চারিটি ইতস্তত আমাদের হাতে আসিতেছে। পাল-আমলে না হউক অন্ততঃ সেন আমলে যে কোনো প্রকার পুঙ্খানুপুঙ্খ জমি-জরিপের বন্দোবস্ত ছিল এবং সমস্ত জমির সীমা, স্বত্ব, অধিকার, শস্যোৎপত্তির গড়পড়তা পরিমাণ, কর বা খাজনা ইত্যাদির পরিপূর্ণ সংবাদ পুস্তপালের দপ্তরে মজুত থাকিত, এ অনুমান প্রায় ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। শুধু যে দত্ত ভূমি সম্বন্ধেই এই জরিপ করা হইত তাহা মনে হয় না; রাজ্যের সমস্ত বাস্তু ক্ষেত্র ও খিল এবং সমস্ত জমিই এই ধরনের জরিপের অন্তর্গত ছিল, এই অনুমানও সহজেই করা চলে। সেন আমলের পট্টোলীগুলিতে জমি সংক্রান্ত সংবাদ এমন সুসংবদ্ধ সুনির্দিষ্ট ও পুঙ্খানুপুঙ্খ-ভাবে দেওয়া হইয়াছে যে, এই ধরনের জরিপের সম্ভাব্য অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করা কঠিন।

৩

ভূমিদানের শর্ত

ভূমিদান কী কী শর্তে করা হইত, কী কী দায় ও অধিকার বহন করিত তাহা এইবার আলোচনা করা যাইতে পারে। এ বিষয়ে পূর্ব পর্বের লিপিগুলির সংবাদ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। যথামূল্যে প্রস্তাবিত ভূমি ক্রয়ের জন্য গৃহস্থ আবেদন যখন জানাইতেছেন, তখন তিনি ভূমি ক্রয় করিতে চাহিতেছেন, সোজাসুজি এ কথা বলিতেছেন না; বলিতেছেন, 'আপনি আমার নিকট হইতে যথারীতি যথানির্দিষ্ট হারে মূল্য গ্রহণ করিয়া এই ভূমি আমাকে দান করুন।' এই যে ক্রয়ের প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে দানের প্রার্থনাও করা হইতেছে, ইহার অর্থ কী? যে ভূমির জন্য মূল্য দেওয়া হইতেছে, তাহাই আবার দানের আকারে প্রার্থনা করা হইতেছে কেন, এ কথার উত্তর পাইতে হইলে ভূমি কী শর্তে দান বিক্রয় হইতেছে, তাহা জানা প্রয়োজন। ধনাইদহ লিপিতে আবেদক ভূমি প্রার্থনা করিতেছেন, "নীবীধর্মক্ষয়েণ"; দামোদরপুরের ১নং লিপিতে আছে, "শাশ্বতাচন্দ্রার্কতারক-ভোজ্যতয়া নীবীধর্মেণ দাতুমিতি", ২নং লিপিতে "অপ্রদাক্ষয়নীবী [বী]-মর্য্যাদয়া দাতুমিতি"; ৩নং লিপিতে "শিলাকুট্টস্য গৃহ্য সমুদয়-বাহ্যাপ্রদাখিলক্ষেত্রানাং প্রসাদং কর্তুমিতি…"; ৫নং লিপিতে "অপ্রদাধর্মেণ…শাশ্বতকালভোগ্যা", পাহাড়পুর-পট্টোলীতে আছে, শাশ্বতকালোপভোগ্যাক্ষয়নীবী সমুদয়বাহ্যাপ্রতিকর…"; বৈগ্রাম-পট্টোলীতে "সমুদয়বাহ্যাদি…অকিঞ্চিৎ প্রতিকরাণাম্ শাশ্বতাচন্দ্রার্কতারক-ভোজ্যানাম্ অক্ষয়নীব্যা…";

বপ্পঘোষবাট গ্রামের পট্টোলীতে আছে, "অক্ষয়ানী[বী]-ধর্মণাপ্রদত্তঃ"। অন্যান্য লিপি-গুলিতে শুধু ক্রয়-বিক্রয়ের কথাই আছে, কোনও শর্তের উল্লেখ নাই। যাহা হউক, যে-সব লিপিতে শর্তের উল্লেখ পাইতেছি, দেখিতেছি সেই শর্ত একাধিক প্রকারের: (১) নীবী ধর্মের শর্ত, (২) অপ্রদা ধর্মের শর্ত, (৩) অক্ষয়নীবী (ধর্মের) শর্ত এবং (৪) অপ্রদাক্ষয়নীবীর শর্ত। বৈগ্রাম ও পাহাড়পুর-পট্টোলী দুটিতে অক্ষয়নীবী ধর্মের শর্তের সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি শর্তের উল্লেখ আছে, সেটি হইতেছে, "সমুদয়-বাহ্যাপ্রতিকর" বা "সমুদয়বাহ্যাদি···অকিঞ্চিত প্রতিকর", অর্থাৎ ভূমি প্রার্থনা করা হইতেছে এবং ভূমি দান করা হইতেছে অক্ষয়নীবীধর্মানুযায়ী এবং সকল প্রকার রাজস্ব-বিবর্জিত ভাবে। ইহার অর্থ এই যে, ভূমি-গ্রহীতা সুচিরকাল, চন্দ্রসূর্যতারার স্থিতিকাল পর্যন্ত ভূমি ভোগ করিতে পারিবেন, কোনও রাজস্ব না দিয়া। রাজা বা রাষ্ট্র যে সুচিরকালের জন্য রাজস্ব হইতে ক্রেতা ও ক্রেতার বংশধরদের মুক্তি দিতেছেন, এইখানেই হইতেছে দান কথার অন্তর্নিহিত অর্থ। ভূমির প্রচলিত মূল্য গ্রহণ করিয়া রাজা যে ভূমি বিক্রয় করেন; সেই ভূমিই যখন অক্ষয়নীবীধর্মানুযায়ী "সমুদয় বাহ্যাপ্রতিকর" করিয়া দেন, তখন তাহা দানও করেন, এবং তাহা করেন বলিয়াই ভূমি বিক্রয় করিয়াও তিনি "ধর্মষড়্ভাগের" অর্থাৎ দানপুণ্যের এক ষষ্ঠ ভাগের অধিকারী হন। রাজা ভূমির আয়ের এক ষষ্ঠ ভাগের অধিকারী, সেই এক ষষ্ঠ ভাগের অধিকার যখন তিনি পরিত্যাগ করেন, তখন তিনি দানপুণ্যের এক ষষ্ঠ ভাগের অধিকারী হইবেন, ইহাই তো যুক্তিযুক্ত। এই অর্থে ছাড়া পাহাড়পুর-পট্টোলীর 'যৎ পরম-ভট্টারক-পাদানাম্ অর্থপচয়ো ধর্মষড়্ভাগোপ্যায়নঞ্চ ভবতি" এ কথার কোনও সংগত যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। বৈগ্রাম-পট্টোলীতে এই কথাই আরও পরিষ্কার করিয়া বলা হইয়াছে। ৩নং দামোদরপুর-পট্টোলীতেও পরমভট্টারক মহারাজের পুণ্যলাভের যে ইঙ্গিত আছে, তাহাও তিনি "সমুদয়-বাহ্যাপ্রদ" অর্থাৎ সর্বপ্রকারের দেয়-বিবর্জিত করিয়া ভূমি বিক্রয় করিতেছেন বলিয়াই।

এইবার নীবীধর্ম, অক্ষয়-নীবীধর্ম বা নীবীধর্মাক্ষয় এবং অপ্রদাধর্ম কথা কয়টির অর্থ কী, তাহা জানিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। বাঙলাদেশের বাহিরে গুপ্তযুগের যে লিপির খবর আমরা জানি, তাহার মধ্যে অন্তত দুইটিতে অক্ষয়নীবী ধর্মের উল্লেখ আছে। কোষকারদের মতে নীবী করার অর্থ মূলধন বা মূলদ্রব্য। কোনো ভূমি যখন নীবীধর্মানুযায়ী দান বা বিক্রয় করা হইতেছে, তখন ইহাই বুঝান হইতেছে যে, দত্ত বা বিক্রীত ভূমিই মূলধন বা মূলদ্রব্য; সেই ভূমির আয় বা উৎপাদিত ধন ভোগ বা ব্যবহার করা চলিবে, কিন্তু মূলধনটি কোন উপায়েই নষ্ট করা চলিবে না। তাহা হইলে নীবীধর্ম কথাটি দ্বারা যাহা সূচিত হইতেছে, অক্ষয়-নীবীধর্ম দ্বারা তাহাই আরও সুস্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে, এই অনুমান অতি সহজেই করা চলে। যে ভূমি সম্পর্কে এই শর্তের উল্লেখ

আছে, সেই ভূমিই কেবল "শাশ্বতাচন্দ্রার্ক'তারকা" ভোগ করিতে পারা যায়, ইহাও খুবই স্বাভাবিক। লিপিগুলিতেও তাহাই দেখিতেছি। বস্তুত যে-সব ক্ষেত্রে নীবী বা অক্ষয়-নীবী ধর্মের উল্লেখ আছে, সেইসব ক্ষেত্রে প্রায় সর্বত্রই সঙ্গে সঙ্গে শাশ্বতাচন্দ্রার্ক'তারকা ভোগের শর্তও আছে ; যে-ক্ষেত্রে নাই, যেমন বপ্পঘোষবাট গ্রামের লিপিটিতে, সে-ক্ষেত্রেও তাহা সহজেই অনুমেয়। ধনাইদহ-লিপিতে আছে, নীবীধর্মক্ষয়েণ ; এক্ষেত্রেও ভূমি বিক্রয় করা হইতেছে মূলধন অক্ষত রাখিবার রীতি অনুযায়ী, অর্থাৎ ক্রেতা স্বেচ্ছায় ঐ ভূমি দান-বিক্রয় করিয়া হস্তান্তরিত করিতে পারিবেন না, ইহাই সূচিত হইতেছে। দামোদরপুরের ৩নং লিপিতে শর্তটি হইতেছে "অপ্রদাধর্মেণ"। লক্ষ করিবার বিষয় এই যে, এই শর্তের সঙ্গে "শাশ্বতচন্দ্রার্কতারকা" ভোগের শর্ত নাই। যাহা হউক, অনুমান হয়, এই শর্তানুযায়ী যে ভূমি বিক্রয় করা হইতেছে, সেই ভূমিও দান অথবা বিক্রয়ের অধিকার ভোক্তার ছিল না। স্বেচ্ছামত ফিরাইয়া লইবার অধিকার দাতার অথবা রাজার ছিল কি না, তাহা বুঝা যাইতেছে না। যাহা হউক, মোটামুটিভাবে নীবীধর্ম, অক্ষয়-নীবীধর্ম ও অপ্রদাধর্ম বলিতে একই শর্ত বুঝা যাইতেছে ; অন্তত আমাদের লিপিগুলিতে তাহা অনুমান করিতে বাধা নাই, যদিও মনে হয়, অপ্রদাধর্মের সঙ্গে নীবী বা অক্ষয়নীবী ধর্মের সূক্ষ্ম পার্থক্য হয়তো কিছু ছিল।

একটি জিনিস একটু লক্ষ্য করা যাইতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যাইতেছে, যে ভূমি কোন ধর্মপ্রতিষ্ঠানকে দান করা হইতেছে, সেই সম্পর্কেই শুধু অপ্রদাধর্ম বা অক্ষয় নীবীধর্মের উল্লেখ পাইতেছি। ইহার কারণ তো খুবই সহজবোধ্য। তাহা ছাড়া, সেইসব ক্ষেত্রেই কেবল রাজা রাজস্বের অধিকার ছাড়িয়া দিতেছেন, ইহাও কিছু অস্বাভাবিক নয়। ব্যতিক্রম দু'একটি আছে ; কিন্তু সে ক্ষেত্রেও দানের পাত্র কোনো ব্রাহ্মণ এবং তিনি দান গ্রহণ করিতেছেন কোনো ধর্মাচরণোদ্দেশ্যে। কোনো গৃহস্থ যেখানে ব্যক্তিগত ভোগের জন্য ভূমি ক্রয় অথবা দান গ্রহণ করিতেছেন, সে ক্ষেত্রে না আছে কোন চিরস্থায়ী শর্তের উল্লেখ, না আছে নিষ্কর করিয়া দিবার উল্লেখ।

এ-পর্যন্ত শুধু সপ্তমশতকপূর্ববর্তী লিপিগুলির কথাই বলিলাম। এই বিষয়ে পরবর্তী লিপিগুলির সাক্ষ্য জানা প্রয়োজন। অষ্টম হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত যত রাজকীয় ভূমি-দানলিপির খবর আমরা জানি, তাহার প্রত্যেকটিতেই ভূমি-দানের শর্ত মোটামুটি একই প্রকার। শর্তাংশটি যে কোনো লিপি হইতে উদ্ধার করা যাইতে পারে। খালিমপুর লিপিতে আছে, "সদশপচারাঃ অকিঞ্চিৎপ্রগ্রাহ্যাঃ পরিহৃত-সর্বপীড়াঃভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন আচন্দ্রার্কক্ষিতিসমকালং" ; শ্রীচন্দ্রের রামপাল-লিপিতে আছে, "সদশপরাধা সচৌরোদ্ধরণা পরিহৃতসর্বপীড়া অচাটভটপ্রবেশ অকিঞ্চিৎপ্রগ্রাহ্য। সমস্ত-রাজভোগকরহিরণ্যপ্রত্যায়সহিতা...আচন্দ্রার্কক্ষিতিসমকালং যাবৎ ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন।" বিজয়সেনের বারাকপুর-লিপিতে আছে, "সহ্যদশাপরাধা পরিহৃতসর্বপীড়া অচট্টভট্টপ্রবেশা

অকিঞ্চিৎপ্রগ্রাহ্য সমস্তরাজভোগকরহিরণ্যপ্রত্যায়সহিতা।...আচন্দ্রার্কক্ষিতিসমকালং যাবৎ ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন তাম্রশাসনীকৃত্য প্রদত্তাস্মাভিঃ।" দেখা যাইতেছে, ধর্মপালের খালিমপুর-লিপিতে যাহা আছে, তাহাই পরবর্তী লিপিগুলিতে বিস্তৃততরভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে মাত্র।

সদশপচারাঃ বা সহ্যদশাপরাধাঃ। আমাদের দণ্ডশাস্ত্রে দশ প্রকারের অপচার বা অপরাধের উল্লেখ আছে। তিনটি কায়িক অপরাধ, যথা—চুরি, হত্যা এবং পরস্ত্রীগমন; চারিটি বাচনিক অপরাধ, যথা—কটুভাষণ, অসত্যভাষণ, অপমানজনক ভাষণ এবং বস্তুহীন ভাষণ; তিনটি মানসিক অপরাধ, যথা—পরধনে লোভ, অধর্ম চিন্তা, এবং অসত্যানুরাগ। এই দশটি অপরাধ রাজকীয় বিচারে দণ্ডনীয় ছিল; এবং সেই অপরাধ প্রমাণিত হইলে অপরাধী ব্যক্তিকে জরিমানা দিতে হইত। রাষ্ট্রের অন্যান্য আয়ের মধ্যে ইহাও অন্যতম। কিন্তু রাজা যখন ভূমি দান করিতেছেন, তখন সেই ভূমির অধিবাসীদের জরিমানা হইতে যে আয়, তাহা ভোগ করিবার অধিকারও দান-গ্রহীতাকে অর্পণ করিতেছেন।

সচোরোদ্ধরণা। চোর-ডাকাতের হাত হইতে রক্ষণাবেক্ষণ করিবার দায়িত্ব হইতেছে রাজার; কিন্তু তাহার জন্য জনসাধারণকে একটা কর দিতে হইত। কিন্তু রাজা যখন ভূমি দান করিতেছেন, তখন দানগ্রহীতাকে সেই কর ভোগের অধিকার দিতেছেন।

পরিহৃতসর্বপীড়া। সর্বপ্রকার পীড়া বা অত্যাচার হইতে রাজা দত্ত ভূমির অধিবাসীদের মুক্তি দিতেছেন। কোনো কোনো পণ্ডিত পারিশ্রমিক না দিয়া আবশ্যিক শ্রম গ্রহণ করা অর্থে এই শব্দটি অনুবাদ করিয়াছেন। আমার কাছে এঅর্থ খুব যুক্তিযুক্ত মনে হইতেছে না, যদিও বহু প্রকারের রাজকীয় পীড়া বা অত্যাচারের মধ্যে ইহাও হয়তো একপ্রকার পীড়া বা অত্যাচার ছিল, এ অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু পরিহৃতসর্বপীড়াঃ বলিতে যথার্থ কী বুঝাইত, তাহার সুস্পষ্ট ও সুবিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রতিবাসী কামরূপ রাজ্যের একাধিক লিপিতে আছে। বলবর্মার নওগাঁ-লিপিতে অনুরূপ প্রসঙ্গেই উল্লিখিত আছে, "রাজ্ঞীরাজপুত্ররাণকরাজবল্লভমহল্লকপ্রৌঢ়িকাহাস্তিবন্ধিকনৌবান্ধিকচৌরোদ্ধরণিক-দাণ্ডিকদাণ্ডপাশিক-ঔপরিকরিক-ঔৎখেটিকচ্ছত্রবাসাদ্যুপদ্রবকারিণামপ্রবেশা।" রত্নপালের প্রথম তাম্রশাসনে আছে, "হস্তিবন্ধনৌকাবন্ধচৌরোদ্ধরণদণ্ডপাশোপরিকরনানানিমিত্তোৎখেটন-হস্ত্যশ্বোষ্ট্রগোমহিষাজাবিকপ্রচারপ্রভৃতিনাং বিনিবারিতসর্বপীড়া..."। কামরূপের অন্যান্য দু'একটি লিপিতেও অনুরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা হইলে সর্বপীড়া বলিতে কী কী পীড়া বা অত্যাচার বুঝায়, তাহার ব্যাখ্যা কতকটা সবিস্তারেই পাওয়া যাইতেছে। রাজ্ঞী হইতে আরম্ভ করিয়া রাজপরিবারের লোকেরা, ও রাজপুরুষেরা যখন সফরে বাহির হইতেন, তখন সঙ্গের নৌকা, হাতি, ঘোড়া, উট, গরু, মহিষের রক্ষক যাহারা তাহারা গ্রামবাসীদের ক্ষেত, ঘর-বাড়ি, মাঠ, পথ, ঘাটের উপর নৌকা এবং পশু ইত্যাদি বাঁধিয়া ও চরাইয়া উৎপাত অত্যাচার ইত্যাদি করিত। অপহৃত দ্রব্যের উদ্ধারকারী যাহারা, তাহারা; দাণ্ডিক ও দাণ্ডপাশিক অর্থাৎ যাহারা চোর ও অন্যান্য অপরাধীদের ধরিয়া বাঁধিয়া

আনিত, যাহারা দণ্ড দিত, তাহারাও সময়ে অসময়ে গ্রামবাসীদের উপর অত্যাচার করিত। যাহারা প্রজাদের নিকট হইতে কর এবং অন্যান্য নানা ছোটখাট শুল্ক আদায় করিত, তাহারাও প্রজাদের উৎপীড়ন করিতে ত্রুটি করিত না। ইহারা কার্যোপলক্ষে গ্রামে অস্থায়ী ছত্রাবাস (camp) স্থাপন করিয়া বাস করিত বলিয়া অনুমান হয়, এবং শুধু গ্রামবাসীরাই নয়, রাজা নিজেও বোধ হয়, ইহাদের উপদ্রবকারী বলিয়াই মনে করিতেন; বস্তুত রাজকীয় লিপিতেই ইহাদের উপদ্রবকারী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। আমাদের বাঙলাদেশের লিপিগুলিতে এইসব উপদ্রবের বিস্তারিত উল্লেখ নাই, পরিহৃতসর্বপীড়াঃ বলিয়াই শেষ করা হইয়াছে। তবে, একটি উৎপাতের উল্লেখ দৃষ্টান্তস্বরূপ করা হইয়াছে; যে ভূমি দান করা হইতেছে, বলা হইতেছে সে ভূমি অচাটভাট অথবা অচট্টভট্টপ্রবেশ, চট্টভট্টরা সেই ভূমিতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। চাট অথবা চট্ট বলিতে খুব সম্ভব, এক ধরনের অস্থায়ী সৈনিকদের বুঝাইত বলিয়া অনুমান হয়। চাম্বা প্রদেশের কোনো কোনো লিপিতে পরগনা বা চারকর্তা অর্থে চাট কথাটির ব্যবহার পাওয়া যায়। ভট্ট বা ভাট কথাটি ভাঁড় অর্থে কেহ কেহ ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু রাজার ভৃত্য বা সৈনিক অর্থে কথাটি গ্রহণ করাই নিরাপদ। যাহা হউক, চট্টভট্ট দুইই রাজভৃত্য অর্থে গ্রহণ করা চলিতে পারে।

অকিঞ্চিৎপ্রগ্রাহ্য। দত্ত ভূমি হইতে আয়স্বরূপ কোনো কিছু গ্রহণ করিবার অধিকারও রাজা ছাড়িয়া দিতেছেন, এই শর্তটির উল্লেখ লিপিতে আছে। এইসব অধিকারের ফলভোগী হইতেছেন দানগ্রহীতা; সেই জন্যই ইহার পর বলা হইতেছে—'সমস্তরাজভাগ-ভোগকরহিরণ্যপ্রত্যায়সহিত', অর্থাৎ সেই ভূমি হইতে ভাগ, ভোগ, কর, হিরণ্য ইত্যাদি যে-সব আয় আইনত রাজার অথবা রাষ্ট্রেরই ভোগ্য, সেইসব সমেত ভূমি দান করা হইতেছে, এবং বলা হইতেছে, দানগ্রহীতা "আচন্দ্রার্কক্ষিতিসমকালং" অর্থাৎ শাশ্বত কাল পর্যন্ত সেই ভূমি ভোগ করিতে পারিবেন।

সর্বশেষ শর্ত হইতেছে ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন। ভূমি দান করা হইতেছে ভূমিচ্ছিদ্র ন্যায় বা যুক্তি অনুযায়ী। এই কথাটির নানা জনে নানা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৈজয়ন্তী-গ্রন্থমতে যে ভূমি কর্ষণের অযোগ্য, সেই ভূমি ভূমিচ্ছিদ্র; এই অর্থে কৌটিল্যও কথাটির ব্যবহার করিয়াছেন। বৈদ্যদেবের কমৌলি-লিপিতে আছে, "ভূমিচ্ছিদ্রাশ্চ অকিঞ্চিৎকর-গ্রাহ্যাম্" অর্থাৎ কর্ষণের অযোগ্য ভূমির কোন কর বা রাজস্ব নাই। কর বা রাজস্ব নাই, এই যে রীতি অর্থাৎ রাজস্ব-মুক্তির রীতি অনুযায়ী যে ভূমি-দান, তাহাই ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়ানুযায়ী দান, এবং লিপিগুলিতে এই শর্তেই ভূমি দান করা হইয়াছে, সমস্ত কর হইতে ভোক্তাকে মুক্তি দিয়া।

লিপিগুলির স্বরূপ বিস্তৃত ভাবে উপরে ব্যাখ্যা করা হইল। সঙ্গে সঙ্গে ভূমি-দান ও ক্রয়-বিক্রয় সম্বন্ধে আমরা অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য জানিলাম। এইবার ভূমি-সম্পর্কিত অন্যান্য সংবাদ লওয়া যাইতে পারে। ভূমি-সম্পর্কিত কী কী সংবাদ স্বভাবতই আমাদের

জানিবার ঔৎসুক্য হয়, তাহার তালিকা করিয়া লইলে তথ্য নির্ধারণ সহজ হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয়ে জ্ঞাতব্য তথ্যের হিসাব লওয়া যাইতে পারে।

১। ভূমি প্রকারভেদ

২। ভূমির মাপ ও মূল্য

৩। ভূমির চাহিদা

৪। ভূমির সীমা-নির্দেশ

৫। ভূমির উপস্বত্ব, কর, উপরিকর ইত্যাদি

৬। ভূমিস্বত্বাধিকারী কে? রাজার ও প্রজার অধিকার। খাস প্রজা, নিম্ন প্রজা ইত্যাদি।

৪

ভূমির প্রকারভেদ

অষ্টমশতকপূর্ববর্তী লিপিগুলিতে আমরা প্রধানত তিন প্রকার ভূমির উল্লেখ পাইতেছি; বাস্তু, ক্ষেত্র ও খিলক্ষেত্র। যে ভূমিতে লোকে ঘরবাড়ি তৈরি করিয়া বাস করিত অথবা বাসযোগ্য যে ভূমি, তাহা বাস্তুভূমি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে, যেমন বৈগ্রাম-পট্টোলীতে, বাস্তুভূমিকে স্থলবাস্তুভূমিও বলা হইয়াছে। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকের কোনো কোনো লিপিতে "ব্যাভূ" বলিয়া বাস্তুভূমি নির্দেশ করা হইয়াছে, যথা, দামোদর দেবের অপ্রকাশিত চট্টগ্রাম-লিপিতে, বিশ্বরূপ সেনের সাহিত্য-পরিষৎ লিপিতে। ব্যাভূ "চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন বাস্তুভূমি", অর্থাৎ সীমানির্দিষ্ট বসবাস করিবার ভূমি।

যে ভূমি কর্ষণযোগ্য ও কর্ষণাধীন, সে ভূমি ক্ষেত্রভূমি। যেখানে দান-বিক্রয় হইতেছে, এ কথা সহজেই অনুমেয় যে, সেখানে ভূমি পূর্বেই অন্য লোকের দ্বারা কর্ষিত ও ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা রাজার পক্ষ হইতেই হউক বা অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা বা ব্যক্তির পক্ষ হইতেই হউক। ক্ষেত্রভূমি দান-বিক্রয় যেখানে হইতেছে, সেখানে ভূমি হস্তান্তরিতও হইতেছে। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকের কোনো কোনো লিপিতে কর্ষণযোগ ক্ষেত্রভূমি বুঝাইতে "নালভূ" বা "নাভূ" কথাটির ব্যবহার করা হইয়াছে, যেমন পূর্বোক্ত দামোদর দেবের অপ্রকাশিত চট্টগ্রাম-লিপিতে। নালজমি কথা তো এই অর্থে এখনো প্রচলিত।

ভূমি কর্ষণযোগ্য ও কর্ষণাধীন যেমন হইতে পারে, তেমনই কর্ষণযোগ্য কিন্তু অকর্ষিতও হইতে পারে। এ কথা বলিতে বুঝিতেছি, কোন নির্দিষ্ট ভূমি চাষের উপযুক্ত, কিন্তু যে কারণেই হোক, যখন সে ভূমি দান-বিক্রয় হইতেছে, তখন কেহ সে ভূমি চাষ করিতেছে না। এমন যে ক্ষেত্র বা ভূমি, তাহা খিলক্ষেত্র। চাষ করিয়া করিয়া যে

ভূমির উর্ব্বরতা নষ্ট হইয়া যায়, সে ভূমি অনেক সময় দু'চার বৎসর ফেলিয়া রাখা হয়, তাহাতে ভূমির উর্বরতা বাড়ে, এবং পরে তাহা আবার চাষযোগ্য হয়। খিলক্ষেত্র বলিতে খুব সম্ভব, এই ধরনের ভূমির দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। আর, যে ভূমি শুধু খিল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা কর্ষণের অযোগ্য ভূমি। অষ্টম-শতকোত্তর কোনো কোনো লিপিতে নালভূমির সঙ্গে খিলভূমির উল্লেখ হইতেও (সখিলনালা, সবাস্তুনালখিলা) এই অনুমানই সত্য বলিয়া মনে হয়। এখনো পূর্ববাঙলা ও শ্রীহট্টে কোন কোন স্থান খিল-জমি বলিতে অনুর্বর, কর্ষণের অযোগ্য জলাভূমিকেই বুঝায়। ইহার একটু পরোক্ষ ঐতিহাসিক প্রমাণও আছে বৈন্যগুপ্তের গুণাইঘর-লিপিতে। এই ক্ষেত্রে বিশেষ একখণ্ড খিলভূমি উল্লিখিত হইতেছে 'হজ্জিক খিলভূমি' বলিয়া (water-logged waste land)। হজ্জিক = হাজা, শুখা বা শুখ্নার বিপরীত অর্থ জলাভূমি। তবে, এমনও হইতে পারে, খিল ও খিলক্ষেত্র বলিতে একই প্রকারের ভূমি নির্দেশ করা হইতেছে। দুই ভিন্ন অর্থে কথা দুইটি ব্যবহৃত হইতেছে কি না, লিপিগুলির সাক্ষ্য হইতে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। কোন কোন লিপিতে, যেমন ১নং দামোদরপুর-লিপিতে, খিল-ভূমিকেই আবার বিশেষিত করা হইতেছে 'অপ্রহত' অর্থাৎ অকৃষ্ট বলিয়া। অমরকোষের মতে খিল ও অপ্রহত একার্থক (২, ১০, ৫) এবং হলায়ুধ খিল অর্থে বুঝিয়াছেন পতিত জমি। যাদবপ্রকাশ তাঁহার বৈজয়ন্তী গ্রন্থে (একাদশ শতক) এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন, "খিলমপ্রহতং স্থানমুষবত্ত্বাষরোরিণৌ" (১২৪ পৃ)। তিনিও তাহা হইলে খিল ও অপ্রহত সমার্থক বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছেন এবং খিলভূমি বলিতে কর্ষণযোগ্য অথচ অকৃষ্ট ভূমির প্রতিই যেন ইঙ্গিত করিতেছেন। নারদ-স্মৃতির মতে যে ভূমি এক বছর চাষ করা হয় নাই, তাহা অর্ধখিল, যাহা তিন বছর চাষ করা হয় নাই, তাহা খিল (১১, ২৬)। ক্ষেত্র ও খিলভূমির পূর্বোক্ত পার্থক্য পরবর্তী কালেও দেখা যায়। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে ভূমির প্রকারভেদ প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে: (১) যে ভূমি কর্ষণাধীন, তাহা 'পোলজ' ভূমি; ইহাই প্রাচীন বাঙলার ক্ষেত্রভূমি। (২) যে ভূমি কর্ষণযোগ্য, কিন্তু এক বা দুই বৎসরের জন্য কর্ষণ করা হইতেছেনা, উর্বরতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে, সেই ভূমি 'পরৌতি' ভূমি; (৩) এই ভাবে যে ভূমি তিন বা চার বৎসর ফেলিয়া রাখা হইয়াছে, তাহা 'চচর' ভূমি; (৪) এবং যাহা পাঁচ বা ততোধিক বৎসর ফেলিয়া রাখা হইয়াছে, তাহা 'বঞ্জর' ভূমি। আকবরের কালের ২, ৩ ও ৪নং ভূমিই খুব সম্ভব প্রাচীন বাঙলার খিলভূমি।

এই প্রধান তিন-চার প্রকার ভূমি ছাড়া অন্যান্য প্রকারের ভূমির উল্লেখও লিপি-গুলিতে দেখা যায়। একে একে সেগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

তল, বাটক, উদ্দেশ, আলি। বৈগ্রাম-পট্টোলীতে 'তলবাটক' কথা এক সঙ্গেই ব্যবহৃত হইয়াছে। যিনি ভূমি ক্রয় করিতেছেন, তিনি বাস্তুভূমিই ক্রয় করিতেছেন; উদ্দেশ্য,

ঘরবাড়ি তৈরি করা, এবং ঘরবাড়ি করিয়া বাস করিতে হইলেই পায়ে চলিবার পথ এবং জল চলাচলের পথও তৈরি করা প্রয়োজন। খালিমপুর-লিপির "তলপাটক" নিঃসন্দেহে "তলবাটক", এবং বৈগ্রাম-লিপিতে কথাট যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, এখানেও ঠিক তাহাই। এখনও বাঙলাদেশের অনেক জায়গায় পথ অর্থে বাট কথাটির ব্যবহার প্রচলিত আছে; বাঙলার বাহিরেও আছে। এই পথের অর্থাৎ বাটকের সঙ্গে তল কথার উল্লেখ যেখানেই আছে, সেখানে তলের অর্থ নালা বা প্রণল্লী, এক কথায় নর্দমা বা জল নিঃসরণের পথ। নালা এবং প্রণল্লী, এই দুইটি শব্দের উল্লেখ অষ্টমশতকোত্তর লিপিতেও আছে। সাধারণত পথের ধারে ধারেই থাকিত জল নিঃসরণের পথ। তাহা ছাড়া কথা দুইটি বিপরীতার্থব্যঞ্জক; সেই জন্যই তল এবং বাটক প্রায় সর্বত্রই একত্র উল্লিখিত হইয়াছে। অষ্টমশতকোত্তর লিপিগুলিতে অনেক স্থলে তলের সঙ্গে উদ্দেশ কথাটিরও ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় (স্তলঃ সোদ্দেশঃ)। সে-ক্ষেত্রেও তল অর্থে পয়ঃপ্রণালী বুঝাইতে কোন আপত্তি নাই; কারণ, উদ্দেশ বা উৎ+দেশ অর্থে উচ্চ ভূমি, অর্থাৎ বাঁধ, ঢিপি, জমির আলি (আইল, ধর্মপালের খালিমপুর-লিপি দ্রষ্টব্য; বান্ধাইল বরেন্দ্রভূমিতে এখনও প্রচলিত) ইত্যাদি বুঝায়, এবং বাঁধ বা জমির আলির পাশে পাশেই তো এখনও দেখা যায় ক্ষেতের জল নিঃসরণের বা জলসেচনের প্রণালী। কেহ কেহ তল বলিতে সাধারণভাবে গ্রামের নিম্ন জলাভূমি বুঝিয়াছেন; আমার কাছে এই অর্থ সমীচীন মনে হয় না। কারণ বাটক বা উদ্দেশ উভয়ের সঙ্গেই পয়ঃপ্রণালী অর্থে তল কথাটির ব্যবহার সার্থকতর, তাহাতে সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই।

জোলা, জোলক, জোটিকা, খাট, খাটা, খাটিকা, খাড়ি, খাড়কা, যানিকা, স্রোতিকা, গাঙ্গিনিকা, হজ্জিক, খাল, বিল ইত্যাদি। এই প্রত্যেকটি শব্দই প্রাচীন বাঙলার লিপিগুলিতে পাওয়া যায়। দত্ত অথবা বিক্রীত ভূমির সীমানির্দেশ উপলক্ষেই এইসব কথা ব্যবহারের প্রয়োজন হইয়াছে। জোলা কথাটি তো এখনো উত্তর ও পূর্ববাঙলায় বহুল ব্যবহৃত; যে অনতিপ্রসার খালের পথ দিয়া বিল, পুষ্করিণী, গ্রাম ইত্যাদির জল চলাচল করে, তাহারই নাম জোলা। জোলক, জোটিকা প্রভৃতি শব্দ জোলা শব্দেরই সমার্থক। খাট, খাটা, খাটিকা, খাড়ি ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে খাল অর্থে। যে জনপদ খালবহুল, তাহাই খাড়িমণ্ডল, আর চব্বিশ পরগনার দক্ষিণাংশে যে খালবহুল, তাহা তো সকলেই জানেন। আর, খাদা বা খাটার পারে পারে যে জনপদ, তাহাই খাদা(?)পার বা খাটাপার বিষয় (ধনাইদহ-লিপি)। যানিকা, স্রোতিকা, গাঙ্গিনিকাও খাড়ি-খাটিকা কথার সমার্থক বলিয়াই মনে হয়। মরা নদীর খাত অর্থে গাঙ্গিনিকা শব্দ উত্তরবঙ্গে এখনও ব্যবহৃত হয় বলিয়া অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বলিয়াছেন; কিন্তু গাঙ্গিনিকার অপভ্রংশ গাঙ্গিনা উত্তর ও পূর্ববাঙলায় এখনও যে-কোনও মরা পুরাতন খালকেই বুঝায়। হজ্জিকা যে নিম্ন জলাভূমি, তাহার ইঙ্গিত তো আগেই করিয়াছি। ঠিক এই অর্থে জলা

বা জলা কথা মৈমনসিংহ, শ্রীহট্ট, কুমিল্লা প্রভৃতি জেলায় আজও প্রচলিত। খাল, খাটা, খাটিকা, খাড়িকা ইত্যাদি শব্দ সমার্থক। বিল কথার উল্লেখ দামোদরদেবের অপ্রকাশিত একটি লিপিতে আছে।

হট্ট, হট্টিকা, ঘট্ট, তর। হট্ট, হট্টিকা সহজবোধ্য এবং আমাদের হাট, বাজার অর্থেই সর্বত্র ইহার ব্যবহার। ঘট্ট = ঘাট, এবং তর = পারঘাট বা খেয়াপারাপারের ঘাট।

গর্ত, উষর (সগর্তোষর)—গর্ত তো সহজবোধ্য। বদ্ধ ডোবা, অনতিগভীর অনতি-প্রসার কর্ষণ-অযোগ্য ভূমি অর্থেই এই শব্দটির ব্যবহার লিপিতে আছে। উষর অর্থে অনুর্বর কর্ষণ-অযোগ্য উচ্চভূমি। প্রতি গ্রামেই এই ধরনের গর্ত ও উষর ভূমি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আজও দেখিতে পাওয়া যায়। গর্ত এবং উষরভূমিসহ যেমন ভূখণ্ড দান-বিক্রয় করা হইয়াছে, তেমনই জলস্থলসহও হইয়াছে। একই লিপিতে একই ভূখণ্ড "সগর্তোষর" এবং 'সজলস্থল' দানের উল্লেখ লিপিগুলিতে অপ্রতুল নয়। কাজেই জল অর্থে এ-ক্ষেত্রে গর্ত বুঝাইতে পারে না; খুব সম্ভবত জলাশয়, পুষ্করিণী, কুণ্ড, বাপী ইত্যাদি বুঝায়, এবং ইহাদের উল্লেখও কোথাও কোথাও আছে।

গোমার্গ, গোবাট, গোপথ, গোচর ইত্যাদি। গোচর সোজাসুজি গোচারণভূমি, যে ভূমিতে গরুমহিষ চরিয়া বেড়ায়। গোচরভূমি সুপ্রাচীন কাল হইতেই গ্রামবাসীদের সাধারণ সম্পত্তি, এবং সাধারণত গ্রামের বহিঃসীমায়ই তাহার অবস্থিতি। এ সম্বন্ধে কৌটিল্য এবং ধর্মশাস্ত্র-রচয়িতাদের সাক্ষ্য উল্লেখযোগ্য। কৌটিল্যের মতে গ্রামের চারিদিকে ১০০ ধনু (৪০০ হাত) অন্তর অন্তর বেড়া দেওয়া গোচরভূমি থাকা প্রয়োজন; মনু এবং যাজ্ঞবল্ক্যের বিধানও অনুরূপ। ইহা কিছু আশ্চর্য নয় যে, লিপিগুলির ইঙ্গিতও তাহাই। যে পথে গ্রামের ভিতর হইতে গরু মহিষ প্রভৃতি গোচরভূমিতে যাতায়াত করে, সেই পথই গোমার্গ, গোবাট অথবা গোপথ। গোবাট (পূর্ববাঙলায় কোথাও কোথাও এখনও গোপাট), গোপথ প্রভৃতি শব্দ এই অর্থে এখনও বাঙলাদেশের অনেক জায়গায় প্রচলিত।

যে গোচরের কথা এইমাত্র বলিলাম, অনেকগুলি লিপিতে, বিশেষত অষ্টমশতকোত্তর লিপিগুলিতে, তাহার সঙ্গেই উল্লেখ আছে তৃণযূতি অথবা তৃণপূতি কথাটির। সীমা নির্দেশ উপলক্ষেই কথাটির ব্যবহার; যে-ভূমি দান করা হইতেছে, তাহার সীমা অনেক ক্ষেত্রেই "স্বসীমা (বচ্ছিন্না) তৃণযূতি (অথবা তৃণপূতি) গোচর পর্যন্ত"। এ কথা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, গোচরের মতো তৃণযূতির বা তৃণপূতির অবস্থানও গ্রামসীমায় বা ভূভূমির একান্ত সীমায়। তৃণযূতি এবং তৃণপূতি ও তাহাদের অর্থ লইয়া পণ্ডিতমহলে অনেক তর্কবিতর্ক হইয়া গিয়াছে। প্রাচীনতর লিপিতে, যেমন সমুদ্রসেনের নিরমানণ্ড তাম্রপট্টে কথাটি হইতেছে তৃণ...যূতি। কিন্তু সেখানে তৃণ ও যূতির মধ্যে আরও দুইটি শব্দ

আছে, কাজেই তৃণযূতি একটি কথা নয়। চাম্বা প্রদেশের লিপিতে একই প্রসঙ্গে গোযূতির উল্লেখ আছে; এবং গরু যেখানে বাঁধা হয় সেই স্থানকেই বুঝাইতেছে। পাল আমলের লিপিগুলিতে কিন্তু তৃণ এবং যূতি কথা দুইটি এক সঙ্গে এক কথা বলিয়াই পাইতেছি। সেন আমলের লিপিগুলির তৃণপূতি কথাটি কি তৃণ-যূতি কথাটির অশুদ্ধ রূপ? সমসাময়িক নাগর লিপিতে "য" ও "প" বর্ণে পার্থক্য খুব বেশি নয়। যদি তাহা হয়, তাহা হইলে গোচরের সঙ্গেই তৃণ-যূতির উল্লেখ খুব অসার্থক নয়। গ্রামসীমায় যে তৃণাস্তীর্ণ ভূমিতে গরু মহিষ বাঁধিয়া রাখা এবং ঘাস খাওয়ান হইত তাহাই তৃণযূতি এবং তাহারই পাশে গরু মহিষ চরিয়া বেড়াইবার গোচারণ ভূমি। আর, যদি তৃণপূতি কথাটি শুদ্ধ অবিকৃতরূপে আমরা পাইয়া থাকি, তাহা হইলে, কথাটিকে গোচরের বিশেষণরূপে ধরিয়া লওয়া যায় কি? কোষকারদের মতে পূতি এক ধরনের ঘাস, কাজেই তৃণ ও পূতি প্রায় সমার্থক। তৃণ পূতিপূর্ণ যে গোচরভূমি, তাহাই তৃণপূতিগোচর এবং তাহা যে গ্রামসীমায় বা ক্ষেত্র ও খিলভূমির সীমায় অবস্থিত থাকিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কী?

বন, অরণ্য ইত্যাদি। বন, অরণ্য সকল ক্ষেত্রেই গ্রামের বাহিরে। একাধিক লিপিতে বনভূমি, অরণ্যভূমি দানের উল্লেখ আছে। অরণ্যভূমি পরিষ্কার করিয়া কী করিয়া গ্রামের পত্তন করা হইত, তাহার পরিচয় অন্তত একটি লিপিতে আছে। লোকনাথের ত্রিপুরা-পট্টোলীতে দেখিতেছি সুব্বুঙ্গ বিষয়ে রাজা লোকনাথ সর্প-মহিষ ব্যাঘ্র-বরাহাধ্যুষিত আটবী ভূখণ্ডে চতুর্বেদবিদ্যাবিশারদ দুই শত এগার জন ব্রাহ্মণ বসাইবার জন্য প্রচুর ভূমি দান করিয়াছিলেন; দানের প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন ব্রাহ্মণ প্রদোষশর্মা। কৌটিল্যের বিধানে বন, অরণ্য ইত্যাদি ছিল রাষ্ট্রসম্পত্তি; ধর্মাচরণোদ্দেশ্যে অরণ্যভূমি ব্রাহ্মণকে দান করা যাইতে পারে, কৌটিল্য এই বিধানও দিয়াছেন। অরণ্যভূমি পরিষ্কার করিয়া কী করিয়া নূতন জনপদের পত্তন করিতে হয়, কৌটিল্য তাহারও ইঙ্গিত রাখিয়া গিয়াছেন। লোকনাথের লিপিটি কৌটিল্যের বিধানের অন্যতম ঐতিহাসিক প্রমাণ।

মার্গ, বাট দুইই জনপদের লোক ও যানবাহন চলাচলের পথ। ইর্দা তাম্রপট্টের আবষ্করস্থান তো আস্তাকুড় এবং সেই হেতু উষর ভূমির সঙ্গেই তাহার উল্লেখ।

৫

ভূমির মাপ ও মূল্য

পঞ্চম হইতে সপ্তম শতক পর্যন্ত প্রাচীন বাঙলার লিপিগুলিতে ভূমির মাপের ক্রম খুব সহজেই ধরিতে পারা যায়। সর্বোচ্চ ভূমিমান হইতেছে কুল্য অথবা কুল্যবাপ, তার পর দ্রোণ বা দ্রোণবাপ এবং সর্বনিম্ন মাপ আঢ়বাপ। কুল্য, দ্রোণ এবং আঢ় (পরবর্তী

লিপিগুলির আঢক, বর্তমান পূর্ববাঙলার আঢ়া) সমস্তই শস্যমান ; এই শস্যমান দ্বারাই ভূমিমান নিরূপিত হইয়াছিল, ইহা কিছু অস্বাভাবিক নয়।

কুল্য বা কুল্যবাপ। যে ভূমিতে বপন করা হয়, তাহা বাপক্ষেত্র ; "উপ্যতেঽস্মিন্ ইতি বাপঃক্ষেত্রম্"। যে পরিমাণ বাপক্ষেত্রে এক কুল্য বীজ শস্য বপন করা যায়, সেই পরিমাণ ভূমি এক কুল্যবাপ ভূমি। দ্রোণবাপ এবং আঢ়বাপও যথাক্রমে এক দ্রোণ ও এক আঢ় বা আঢক শস্য বপনযোগ্য ভূমি। কাহারও কাহারও মতে কুল্য পূর্ববাঙলার কুলা ; এক কুল্য শস্য অর্থাৎ একটি কুলায় যত ধান বা শস্য ধরে তাহার বীজ যতটা পরিমাণ ভূমিতে বপন করা হয় তাহাই কুল্যবাপ। মৈমনসিংহ-শ্রীহট্ট কাছাড় অঞ্চলে এখনও কুলুবায় কথা প্রচলিত, তাহাও কুল্যবাপ কথারই ভগ্ন রূপ।

দ্রোণবাপ ও আঢ়বাপ। দ্রোণ (= কলস) বর্তমানে বাঙলার বহু জেলার পল্লীগ্রামে দোনে বা ডোনে রূপান্তরিত হইয়াছে। আঢ় এখনও আঢ়া নামে প্রচলিত। প্রাচীন আর্যা ও কোষকারদের মতে এক কুল্যবাপ ভূমি আট দ্রোণবাপের সমান, এক দ্রোণবাপ চার আঢ়বাপের সমান, এক আঢ়বাপ চার প্রস্থের সমান। এক কুল্যবাপ যে আট দ্রোণের সমান, তাহা লিপিপ্রমাণ দ্বারাও সমর্থিত হয়। পাহাড়পুর-লিপিতে ১২ দ্রোণবাপ যে ১½ কুল্যবাপের সমান, তাহা পরিষ্কার ধরা যায়। বৈগ্রাম-লিপির ইঙ্গিতও তাহাই।

এই ইঙ্গিত প্রাচীন সাহিত্য-ঐতিহ্য দ্বারাও সমর্থিত হয়। কুল্যই হোক্ আর দ্রোণই হোক্, এ সমস্তই ধান্যের আধার, যেহেতু ধান্যই বাঙলার প্রধানতম শস্য। মনুসংহিতায় দ্রোণ বলিতেই ধান্যদ্রোণের উল্লেখ, এবং এই ধানদ্রোণেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন বাঙালী কুল্লুকভট্ট। এই কুল্লুকভট্ট, রঘুনন্দন এবং শব্দকল্পদ্রুম কোষ-সংকলয়িতার মতে

৮ মুষ্টি = ১ কুঞ্চি
৮ কুঞ্চি = ১ পুষ্কল
৪ পুষ্কলে = ১ আঢ়ক (আঢ়)
৪ আঢ়কে = ১ দ্রোণ

এবং মেদিনীকোষের মতে ৭ দ্রোণ = ১ কুল্য। শব্দকল্পদ্রুমে বলা হইয়াছে, এক আঢ়কে সাধারণত ১৬ হইতে ২০ সের ধান ধরে, অর্থাৎ এক দ্রোণে ৬৪ হইতে ৮০ সের, এক কুল্যে ৫১২ হইতে ৬৪০ সের অর্থাৎ ১২ মন ৩২ সের হইতে ১৮ মন। এই পরিমাণ ধানের বীজ যে পরিমাণ ভূমিতে বপন করা হইত সেই পরিমাণ ভূমি হয়তো এক কুল্যবাপ। কিন্তু এ সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয় করিয়া কিছু বলিবার উপায় নাই।

কুল্যবাপই হোক, আর দ্রোণবাপ বা আঢ়বাপ যাহাই হোক, মাপা হইত নলের সাহায্যে ; এই নলই হইতেছে প্রাচীন উত্তর ও পূর্ববাঙলার প্রচলিত মানদণ্ড। বৈগ্রাম, পাহাড়পুর এবং ফরিদপুরের তিনটি পট্টোলীতেই বলা হইতেছে ৮, ৯ নলে (অষ্টকনবকনলাভ্যাম্) এক মান। কিন্তু এই মান কি প্রস্থ × দৈর্ঘ্যের মান, ৮ এবং ৯ দুই প্রকার

নলের মান, কুল্যবাপের মান, দ্রোণবাপ না আঢ়বাপের মান, তাহা সঠিক বলিবার উপায় নাই। এই নলেরও দৈর্ঘ্য নির্ভর করিত ব্যক্তিবিশেষের হস্তের দৈর্ঘ্যের উপর বৈগ্রাম-লিপি অনুসারে দরব্বীকর্ম নামক জনৈক ব্যক্তির হাতের মাপে, ফরিদপুর-লিপিত্রয় অনুসারে শিবচন্দ্র নামক কোন ব্যক্তির হাতের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী। অবশ্য ইঁহাদের হাতের মাপ গড়পড়তা সাধারণ হাতের দৈর্ঘ্যের মাপ কিংবা তার চেয়ে একটু বেশি বলিয়া মনে করিলে কিছু অন্যায় করা হইবে না। এই ধরনের ব্যক্তিবিশেষের হাতের মাপের মান অষ্টাদশ শতকের মধ্যপাদেও বাঙলাদেশে প্রচলিত ছিল। রাজসাহীর নাটোর অঞ্চলে রামজীবনী হাতের মান তো সেদিনকার স্মৃতি।

ষষ্ঠ শতক ও অষ্টম শতকের দুইটি লিপিতে ভূমি-মাপের একটি নূতন মানের সংবাদ জানা যাইতেছে। বৈন্যগুপ্তের গুণাইঘরপট্টোলী এবং দেবখড়্গের ১নং আস্রফপুর-পট্টোলীতে পাটক নামে একটি মানের উল্লেখ আছে, এবং তাহার পরের ক্রমেই যে মানের নাম উল্লেখ আছে তাহা দ্রোণবাপ। দ্রোণের সঙ্গে পাটকের সম্বন্ধের ইঙ্গিত এই দুইটি পট্টোলীর দত্ত ভূমির পরিমাণ বিশ্লেষণ করিলে হয়তো পাওয়া যাইতে পারে। আস্রফপুর-পট্টোলীটি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, ৫০ দ্রোণে এক পাটক হয়। কিন্তু আস্রফপুর-পট্টোলীর পাঠের নির্ধারণ সন্দেহাতীত নয়। তাহা ছাড়া, সন্দেহ করিবার আরও কারণ গুণাইঘর লিপির সাক্ষ্য। এই পট্টোলী দ্বারা মহারাজ রুদ্রদত্ত পাঁচটি পৃথক ভূখণ্ডে সর্বশুদ্ধ ১১ পাটক ভূমি দান করিয়াছিলেন. এই পাঁচটি ভূখণ্ডের পরিমাপ তালিকাগত করিলে এইরূপ দাঁড়ায় :

১ম ভূখণ্ড	—	৭ পাটক	৯ দ্রোণবাপ
২য় „	—	×	২৮ „
৩য় „	—	×	২৩ „
৪র্থ „	—	×	৩০ „
৫ম „	—	$১\frac{৩}{৪}$	× „
		$৮\frac{৩}{৪}$	৯০ „

আগেই বলিয়াছি, দত্ত ভূমির মোট পরিমাণ ১১ পাটক। তাহা হইলে ৯০ দ্রোণে হইতেছে $২\frac{১}{৪}$ পাটক, অর্থাৎ ৪০ দ্রোণে এক পাটক, এ কথা সহজেই বলা চলে। আগে দেখিয়াছি, ৮ দ্রোণে এক কুল্যবাপ, তাহা হইলে ৫ কুল্যবাপ = ১ পাটক।

পাটক এখানে নিঃসন্দেহে ভূমি মাপের মান। কিন্তু আস্রফপুর-লিপি দুটিতেই প্রমাণ পাওয়া যাইবে, পাটক কথাটি গ্রাম বা গ্রামাংশ অর্থেও ব্যবহৃত হইত। তলপাটক, মর্কটাসী পাটক, বংসনাগ পাটক, দর পাটক এবং এই জাতীয় পাটকান্ত যত নাম, সমস্তই গ্রাম বা গ্রামাংশের নাম। বস্তুত বাঙলা পাড়া কথাটি পাটক হইতে উদ্ভূত বলিয়াই মনে হয়, অথবা দেশজ পাড়া হইতে পাটক। তলপাটক = তলপাড়া, ভট্টপাটক = ভাটপাড়া,

মধ্যপাটক = মধ্যপাড়া, ইত্যাদি পাটকান্ত নাম তো এখনও বাঙলাদেশের সর্বত্র সুপরিচিত। এ জাতীয় নাম প্রাচীন বাঙলার লিপিগুলি হইতেও জানা যায়। বাঙলার বাহিরেও এই জাতীয় নামের অভাব নাই, যেমন—মূলবর্মপাটক গ্রাম, বিশালপাটক গ্রাম ইত্যাদি। গ্রাম বা গ্রামাংশ (= পাড়া) অর্থে পাট, পাটক কথা উত্তর ও পশ্চিম-ভারতে পদ্র বা পদ্রকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা—বড়পদ্রকাভিধান গ্রাম, শমীপদ্রক গ্রাম, শিরীষপদ্র গ্রাম ইত্যাদি। পাট = পদ্র = গ্রাম ; ক্ষুদ্র গ্রামার্থে ক প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন হয় পাটক = পদ্রক = পাড়া বা গ্রামাংশ বা ছোট গ্রাম।

পাল-সম্রাট্‌দের আমলে ভূমি পরিমাপের মান কী ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দানের বস্তু হইতেছে একটি বা একাধিক সম্পূর্ণ গ্রাম : বোধ হয় ইহা অন্যতম কারণ। একাদশ শতকে শ্রীচন্দ্রের রামপাল তাম্রপট্টে দেখিতেছি, সর্বোচ্চ ভূমি-মান হইতেছে পাটক। অষ্টম শতকে এই মান ফরিদপুরে প্রচলিত ছিল ; একাদশ শতকে বিক্রমপুরেও দেখিলাম। মোটামুটি এই শতকেই শ্রীহট্টে দেখি, উচ্চতম মান হইতেছে হল। কেহ কেহ মনে করেন কুল্যবাপেরই অপর নাম হল বা হাল। যাহাই হউক, গোবিন্দকেশবের ভাটেরা তাম্রপট্টে ২৮টি গ্রামে ২৯৬টি বাস্তুভিটা এবং ৩৭৫ হল জমি ছিল ; নিম্নতম মান ছিল ক্রান্তি। শ্রীহট্টে ভূমি-পরিমাপের বর্তমান ক্রম এইরূপ :

৩ ক্রান্তি	=	১ কড়া
৪ কড়া		,, গণ্ডা
২০ গণ্ডা	=	,, পণ
৪ পণ		,, রেখা
৬ রেখা		,, যষ্ঠী
৭ যষ্ঠী		,, পোয়া
৪ পোয়া	=	,, কেদার বা কেয়ার
১২ কেয়ার	=	১ হল (= ১০½ বিঘা = ৩½ একর)

শ্রীচন্দ্রের রামপাল শাসনে উচ্চতম ভূমিমান দেখিয়াছি পাটক, কিন্তু এই রাজারই ধুল্লা শাসনে উচ্চতম মান দেখিতেছি হল, এবং দত্ত ভূমিগুলি তো বিক্রমপুরে বলিয়াই অনুমান হয়। একাদশ শতকে বিক্রমপুরে কি পাটক ও হল, এই দুই মানই প্রচলিত ছিল ? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে পাটকের সঙ্গে হলের সম্বন্ধ কী ? যাহাই হউক, ধুল্লা শাসন হইতে এই খবরটুকু পাওয়া যাইতেছে যে, হলের নিম্নতর ক্রম হইতেছে দ্রোণ : কিন্তু দ্রোণের সঙ্গে হলের সম্বন্ধ নির্ণয় করা যাইতেছে না। দ্বাদশ শতকে ভোজবর্মার বেলাব লিপিতে উচ্চতম ভূমিমান পাটক এবং নিম্নতর মান দ্রোণ ; এ দুয়ের সম্বন্ধ যে কী, তাহা আগেই দেখিয়াছি। সেন-রাজাদের লিপিগুলিতেও উচ্চতম মান পাটক অথবা ভূপাটক। এই লিপিগুলি বিশ্লেষণ করিয়া ভূমিমানের যে ক্রম পাওয়া যায়, তাহা এইরূপ : (১)

পাটক বা ভূপাটক, (২) দ্রোণ বা ভূদ্রোণ, (৩) আঢ়ক বা আঢ়াবাপ, (৪) উন্মান বা উদান বা উয়ান, (৫) কাক বা কাকিণী বা কাকিণিকা। পাটকের সঙ্গে দ্রোণের এবং দ্রোণের সঙ্গে আঢক বা আঢ়াবাপের সম্বন্ধ ইতিপূর্বেই আমরা জানিয়াছি, কিন্তু আঢকের সঙ্গে উন্মানের বা উন্মানের সঙ্গে কাকের সম্বন্ধের কোনও ইঙ্গিত লিপিগুলিতে পাওয়া যাইতেছে না। লক্ষ্মণসেনের সুন্দরবন পট্টোলীতে উপরোক্ত ক্রমের একটু ব্যতিক্রম পাওয়া যায়; দ্রোণের নিম্নতর ক্রম দেওয়া হইয়াছে খাড়িকা (?), এবং তাহার পর যথারীতি উন্মান ও কাকিণী। খাড়ীকা মান যে ছিল, তাহার প্রমাণ এই রাজারই মাধাইনগর পট্টোলীতেও আছে; সেখানে উচ্চতর মান ভূখাড়ী এবং তাহার পরেই খাড়ীকা। কিন্তু খাড়ীকার সঙ্গে দ্রোণের অথবা ভূখাড়ীর সঙ্গে খাড়ীকার সম্বন্ধনির্ণয়ের কোন ইঙ্গিত লিপিগুলিতে নাই। তবে লক্ষ্মণসেনের সুন্দরবন লিপিতে একটু ইঙ্গিত যাহা আছে তাহা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

১২ অঙ্গুলি = ১ হাত

৩২ হাত = ১ উন্মান (উয়ান)।

এই সম্বন্ধ নির্ণয় এবং এ-পর্যন্ত যে সমস্ত ভূমিমানের উল্লেখ করিয়াছি, তাহার যথাযথ মর্ম গ্রহণ করিতে হইলে প্রাচীন আর্যাশ্লোক এবং প্রচলিত ভূমি-পরিমাপ রীতির একটু পরিচয় লওয়া প্রয়োজন।

এ ইঙ্গিত আমি আগেই করিয়াছি যে, শস্যভাণ্ডমানের সাহায্যেই প্রাচীন কালে ভূমিমান নির্ধারিত হইয়াছিল। কুল্যবাপ, দ্রোণবাপ, আঢ়বাপ ইত্যাদি নামই তাহার প্রমাণ। পাটক বোধ হয় গোড়াতেই ছিল ভূমিমান। হলও তাহাই। খাড়ী (শুদ্ধ, খারী) কিন্তু শস্যভাণ্ডমান বলিয়াই মনে হয়, খাড়ী উচ্চতর মান, খাড়ীকা (ক-প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন, ক্ষুদ্রার্থে) বোধ হয় নিম্নতর মান। খারী যে শস্যমান, তাহার প্রমাণ অমরকোষে আছে:

দ্রোণাঢকাদিবাপাদৌ দ্রৌণিকাঢকিকাদয়ঃ।
খারীবাপস্তু খারীকঃ।

কাক বা কাকিণী গোড়ায় বোধ হয় ছিল মুদ্রামান। শ্রীধরের ত্রিশতিকায় একটি আর্যা আছে:

ষোড়শপণঃ পুরাণঃ পণো ভবেৎ কাকিণীচতুষ্কেণ।
পঞ্চাহতৈশ্চতুর্ভির্বরাটকৈঃ কাকিণী হ্যেকা॥

উন্মান অর্থই বোধ হয় তুলামান। কিন্তু গোড়ায় এইসব মান মুদ্রামান, ভাণ্ডমান, তুলামান বা ভূমিমান যাহাই থাকুক, উত্তর কালে ইহারা ভূমিমান নির্দেশে ব্যবহৃত হইত। উন্মান এবং কাকিণী ছাড়া আর সমস্ত মানই হয় ভূমিমান, না হয় শস্যভাণ্ডমান। সেন আমলের লিপিগুলিতেই প্রথম দেখিতেছি, এই ভূমিমান ও শস্যমানের সঙ্গে তুলামান ও মুদ্রামান সম্পর্কিত করা হইয়াছে। ইহা হইতে একটা অনুমান বোধ হয় সহজেই করা যায়।

প্রাচীনতর কালে ভূমি যখন সুলভ ছিল, চাহিদা যখন খুব বেশি ছিল না, তখন ভূমির মাপের এত চুলচেরা বিচারও ছিল না। পাটকের অর্থাৎ গ্রামাংশের মোটামুটি আয়তন একটা সকলেরই জানা ছিল, দুই-চার বিঘা এদিক ওদিক হইলে বিশেষ কিছু আসিত যাইত না। পরবর্তী কালে ভূমির চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য পাটকের মাপজোখও নিশ্চয়ই সুনির্দিষ্ট হইয়াছিল। কুল্যবাপ, দ্রোণবাপ, আঢ়বাপ, হল ইত্যাদি সম্বন্ধেও এবই কথা বলা চলে। সুলভ ভূমির যুগে কতখানি ভূমিতে মোটামুটি কত বীজ ধান লাগে, কত লাঙ্গল লাগে, এই দিয়াই মোটামুটি জমির পরিমাণ নির্ণীত হইত। ক্রমে চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাপজোখ্ নির্দিষ্টতর হইতে থাকে, এবং ক্রমশ আরও নিম্নতর মান নির্দেশের প্রয়োজন হয়। এই নিম্নতর মান যে তুলামান বা মুদ্রামান দ্বারা নির্ণীত হইয়াছিল, তাহাও জমির ক্রমবর্ধমান চাহিদার দিকে ইঙ্গিত করে।

পাটকের সঙ্গে কুল্যবাপের ও দ্রোণের, কুল্যবাপের সঙ্গে দ্রোণের, দ্রোণের সঙ্গে আঢক বা আঢ়বাপের সম্বন্ধ আমরা আগেই জানিয়াছি। এইবার আঢক বা আঢ়বাপের সঙ্গে উন্মানের এবং উন্মানের সঙ্গে কাকিনীর সম্বন্ধ কী, তাহা জানিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। কোনও আর্যাশ্লোকের মধ্যে এই সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বাঁকুড়ার প্রচলিত রীতি সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় খবর দিতেছেন। মল্লভূমের রাজা চৈতন্যসিংহদেবের তিনখানি দানপত্র তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল, একটি পত্রে তিনি জানকীরাম হাজরাকে দুই দ্রোণ দুই আড়ি তিরিশ উয়ান এক কান ভূমি দেবোত্তর দান করিয়াছিলেন। সমসাময়িক অন্যান্য দানপত্র হইতে জানা যায়,

৪ কাক বা কাকিনী (পূর্ববাঙলায়, চট্টগ্রামে কানি, রাঢ়ে কান)	= ১ উয়ান
৫০ উয়ান	= ১ আড়ি
৪ আড়ি	= ১ দ্রোণ

বাঙলা ১২৩০ সালে লিখিত "সেবক শ্রীসনাতন মণ্ডল দাসস্য" একটি শুভঙ্করী বইয়ে যে আর্যা পাওয়া যায়, তাহাও উপরোক্ত সংবাদ সমর্থন করে।

"খেতে মাঠে রশি না পাই
সোল ছেষে কাহন বলাই ॥
চারি কানে ওয়ান হয়
পঞ্চাশ উয়ানে আড়ি ॥
চারি আড়িতে ডোন হয়
আঠাস হাত দণ্ড ॥"

আড়ি, আড়ি নিঃসন্দেহে আঢ়বাপ, আঢক বা আঢ়কবাপ ; ডোন দ্রোণ বা দ্রোণবাপ। তাহা হইলে এইবার আমরা আঢ়বাপের সঙ্গে উন্মানের এবং উন্মানের সঙ্গে কাকিনীর সম্বন্ধ জানিলাম।

আর একটি ভূমি-মাপের উল্লেখ শুভংকর করিয়াছেন, এবং মাপটি কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত বাঙলাদেশেও প্রচলিত ছিল, এই মাপটির নাম কুড়ব। কেহ কেহ মনে করেন, এই কুড়ব ও কুল্যবাপ সমানার্থক। আমার মনে হয়, এই অনুমান সন্দেহজনক, কারণ, লীলাবতীর আর্যায় আছে,

৪ কুড়ব	= ১ প্রস্থ
৪ প্রস্থ	= ১ আঢ়া (আঢক, আঢ়বাপ)
৪ আঢ়া	= ১ দ্রোণ

অর্থাৎ ৬৪ কুড়বে ১ দ্রোণ, এবং যেহেতু ৮ দ্রোণে এক কুল্যবাপ, সেইহেতু এক কুল্যবাপ ৫১২ কুড়ব বা কুড়বার সমান। অন্তত লীলাবতীর মতে তাহাই হওয়া উচিত। কুড়ব এবং বর্তমান কালে প্রচলিত বিঘা সমপরিমাণ ভূমি নির্দেশ করে কি না বলা কঠিন। যাহাই হউক, এই কুড়বার উল্লেখ বাঙলার প্রাচীন লিপিগুলিতে দেখা যায় না।

এই কুল্যবাপ ভূমির পরিমাণ কতটুকু ছিল তাহা জানিবার কৌতূহল স্বাভাবিক। সে-দিকে চেষ্টাও কিছু কিছু হইয়াছে, কতকটা অনুমানের এবং অনুমানোপম সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া। কুল্যবাপের পরিমাণ যে বর্তমান কালের বিঘা হইতে অনেক বেশি ছিল, এ কথা নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় বহুদিন আগেই বলিয়াছিলেন। কাছাড়ের ইতিবৃত্ত-লেখক উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ মহাশয় বলেন যে, ঐ জেলায় এক কুল্যবাপ ১৪ বিঘার সমান। দীনেশচন্দ্র সরকার মহাশয় অনেক অনুমানসিদ্ধ প্রমাণের সাহায্যে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, এক কুল্যবাপ ভূমি পরিমাণ "অন্তত পক্ষে ৪০—৪২ একর অর্থাৎ প্রায় ১২৫ বিঘার কম ছিল না।" এ সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছুই বলিবার উপায় নাই; তবে লীলাবতীর আর্যার সাক্ষ্য যদি প্রামাণিক হয় এবং কুড়বা যদি বিঘার সমার্থক হয় তাহা হইলে এক কুল্যবাপে ৫১২ বিঘা হওয়া উচিত। কিন্তু কুড়বা ও বিঘা সমার্থক কি না, এ বিষয়ে সন্দেহ আছে।

অষ্টমশতকপূর্ব লিপিগুলিতে দেখিয়াছি, ভূমি পরিমাপের মানদণ্ড ছিল নল; পরবর্তী যুগের মানদণ্ডও ইহাই। লক্ষ্মণসেনের আনুলিয়া-শাসনে প্রদত্ত ভূমি যে নল-মানদণ্ডে মাপা হইয়াছিল, তাহার নাম বৃষভশংকর নল। বৃষভশংকর ছিল রাজা বিজয়সেনের বিরুদ বা অন্যতম উপাধি। মনে হয়, বিজয়সেনের হাতের মাপে যে নলের দৈর্ঘ্য নিরূপিত তাহারই নাম হইয়াছিল বৃষভশংকর নল। আনুলিয়া-শাসন হইতে প্রমাণ হয়, অন্তত লক্ষ্মণসেনের কাল পর্যন্ত এই বৃষভশংকর নলের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। অথচ, বিজয়সেন নিজে কিন্তু ভূমি দান করিয়াছিলেন "সমতটনলেন" অর্থাৎ সমতটমণ্ডলে প্রচলিত মানদণ্ডের পরিমাপে। সমতটীয় নল পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির খাড়ি-বিষয়েও প্রচলিত ছিল (বারাকপুর শাসন)। এই সমতট নলই পরে বৃষভশংকর নল নামে পরিচিত হইয়াছিল কি না, বলা কঠিন। বর্ধমান-ভুক্তির উত্তর-রাঢ় অঞ্চলে এবং পুণ্ড্রবর্ধন-

ভুক্তির ব্যাঘ্রতটী অঞ্চলে এই বৃষভশংকর নল প্রচলিত ছিল। লক্ষ্মণসেনের তর্পণদীঘি-শাসনের সাক্ষ্য হইতে মনে হয়, বাঙলাদেশের বিভিন্ন স্থানের নল-মানদণ্ড বিভিন্ন প্রকারের ছিল। বরেন্দ্রীমণ্ডলে প্রদত্ত ভূমি মাপা হইয়াছিল "তত্রত্যদেশব্যবহারনলেন" অর্থাৎ সেই সেই দেশে প্রচলিত নলের সাহায্যে। সেন-আমলের লিপিগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, ব্যাঘ্রতটীমণ্ডলে অর্থাৎ পশ্চিম-নিম্নবঙ্গে বৃষভশংকর নল প্রচলিত ছিল, কিন্তু বরেন্দ্রীমণ্ডলে অর্থাৎ উত্তর-বঙ্গে প্রচলিত ছিল অন্য প্রকারের নলমানদণ্ড। গোবিন্দপুর-তাম্রশাসনের সাক্ষ্য যদি প্রামাণিক হয়, তাহা হইলে বর্ধমান-ভুক্তির পশ্চিম-খাটিকা অঞ্চল বেতড্ড চতুরকে (বেতড়, হাওড়া) প্রচলিত নলের মাপ ছিল ৫৬ হাত। লক্ষ্মণসেনের ভাওয়াল লিপিতে দেখি ২২ হাতের আর-এক নলের উল্লেখ। ঢাকা জেলার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে এই নলের প্রচলন ছিল বলিয়া মনে হয়। বাঙলার বাহিরেও নলমানদণ্ডের প্রচলন যে ছিল তাহার একাধিক প্রমাণ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় তৈলের নীলগুণ্ড লিপিতে ভূমি-পরিমাপের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে "রাজমানেন দণ্ডেন"। উড়িষ্যার নৃসিংহদেবের একটি পট্টোলীতে দেখিতেছি, রাজকর্মচারীদের হাতের মাপেও নলমান নির্ধারিত হইত। এই লিপিতে ভূমি-পরিমাপের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে "চন্দ্রদাসকরণস্য নলপ্রমাণেন" এবং "শ্রীকরণীশবদাসনামকনলপ্রমাণেন"। কিন্তু এই নলমানদণ্ড কিসের মান—পাটকের না কুল্যবাপের, দ্রোণের না আঢকের, উন্মান না কাকিনীর? এই প্রশ্নের উত্তরের কোন ইঙ্গিত লিপিগুলিতে নাই।

ভূমির মূল্য কিরূপ ছিল, তাহা এইবার আলোচনা করা যাইতে পারে। কিন্তু এ সম্বন্ধে যাহা কিছু সংবাদ, তাহা অষ্টমশতকপূর্ব লিপিগুলিতেই শুধু পাওয়া যায়। পরবর্তী লিপিগুলিতে ভূমির মূল্য কোথাও দেওয়া হয় নাই ; কারণ, এই যুগের পট্টোলীগুলি দানের পট্টোলী, ক্রয়-বিক্রয়ের নয়। সেন-আমলের লিপিগুলিতে ভূমির উৎপত্তির যথাযথ পরিমাণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে মূল্য নিরূপণের সাহায্য যাহা পাওয়া যায় তাহা পরোক্ষ। দামোদরপুরের ১, ২, ৪ এবং ৫নং পট্টোলী শতাধিক বৎসর জুড়িয়া বিস্তৃত। এই চারিটি পট্টোলী বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, শতাধিক বৎসর ধরিয়া পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির কোটিবর্ষ-বিষয়ে এক কুল্যবাপ ভূমির মূল্য ছিল তিন দীনার। ফরিদপুরের পট্টোলীগুলি তিনটি রাজার রাজত্বকাল অর্থাৎ মোটামুটি পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া বিস্তৃত। পূর্ববাঙলার এই অঞ্চলে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া ভূমির মূল্য ছিল প্রতি কুল্যবাপে চারি দীনার। বৈগ্রাম-পট্টোলীরদত্ত ভূমির অবস্থিতি ছিল পঞ্চনগরী-বিষয়ে এবং সেখানে প্রতি কুল্যবাপের মূল্য ছিল দুই দীনার। বৈগ্রাম উত্তর-বঙ্গে দিনাজপুর ও বগুড়া জেলার সীমান্তে, দামোদরপুরও দিনাজপুর জেলায় ; কিন্তু প্রথমটি কোটিবর্ষ-বিষয়ে, দ্বিতীয়টি পঞ্চনগরী-বিষয়ে, এবং দুই স্থানে প্রতি কুল্যবাপের মূল্যের পার্থক্য এক দীনার। ৩নং দামোদরপুর পট্টোলীর চণ্ডগ্রাম কোন্ বিষয়ে অবস্থিত ছিল, তাহার

উল্লেখ নাই ; কিন্তু প্রতি কুল্যবাপের মূল্য দুই দীনার দেখিয়া অনুমান হয় চংগ্রাম ছিল পঞ্চনগরী-বিষয়ে। এই অনুমানের অন্যতম কারণ, চংগ্রাম বৈগ্রাম বা বায়ীগ্রামের একেবারে পাশাপাশি গ্রাম। পাহাড়পুর পট্টোলীর দত্তভূমিও কোন্ বিষয়ে অবস্থিত তাহার উল্লেখ নাই ; কিন্তু এক্ষেত্রেও ভূমির মূল্য দুই দীনার ; এবং পাহাড়পুর বৈগ্রাম হইতে মাত্র উনিশ-কুড়ি মাইল। অনুমান করা চলে, পাহাড়পুরও পঞ্চনগরী-বিষয়েই অবস্থিত ছিল। যাহা হউক, এ কথা সহজেই বুঝা যাইতেছে, এক এক বিষয়ে ভূমির মূল্য ছিল এক এক প্রকার—যেমন, পঞ্চনগরী-বিষয়ে দুই দীনার, কোটিবর্ষ-বিষয়ে তিন দীনার, ফরিদপুর অঞ্চলে চারি দীনার। ইহার অন্য একটি প্রমাণ দেখিতেছি, প্রায় প্রত্যেকটি পট্টোলীতেই "ইহ বিষয়ে···দীনারিক্যবিক্রয়োনুবৃত্তঃ" বা এই জাতীয় কোনো পদের উল্লেখের মধ্যে। ভূমির মূল্যবৃদ্ধির হার কিরূপ ছিল তাহা বলিবার কোনো উপায় নাই, তবে ভূমির চাহিদা যে-ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছিল, তাহাতে মূল্যও যে ক্রমশ বাড়িতেছিল, এরূপ অনুমান করিলে খুব অন্যায় হয় না। কিন্তু এই মূল্যবৃদ্ধি সম্ভবত খুব তাড়াতাড়ি হয় নাই। আমরা তো আগেই দেখিয়াছি, কোটিবর্ষ-বিষয়ে শতাধিক বর্ষ ধরিয়া জমির দাম একই ছিল ; সে প্রমাণও ধর্মাদিত্য এবং গোপচন্দ্রের পট্টোলী তিনটিতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন অঞ্চলে দামের পার্থক্যও আগেই দেখিয়াছি। এই পার্থক্য খানিকটা যে ভূমির উর্বরতা, চাহিদা এবং স্থানীয় জীবিকামান-সমৃদ্ধির উপর নির্ভর করিত, এ অনুমান সহজেই করা চলে। পঞ্চনগরী-বিষয়ের তুলনায় কোটিবর্ষ-বিষয়ের সমৃদ্ধি নিশ্চয়ই বেশি ছিল, এবং কোটিবর্ষের তুলনায় প্রাক্‌সমুদ্রশায়ী দেশগুলি সমৃদ্ধতর ছিল। ধর্মাদিত্য এবং গোপচন্দ্রের পট্টোলী তিনটিতে ভূমির দাম প্রতি কুল্যবাপে চারি দীনার। ১নং পট্টোলীতে স্পষ্ট বলা হইয়াছে, প্রাক্‌সমুদ্রশায়ী দেশগুলিতে ইহাই ছিল প্রচলিত মূল্য ; ২নং এবং ৩নং পট্টোলীতেও পূর্বদেশে ভূমি ক্রয়-বিক্রয়ের ('প্রাক্‌-ক্রিয়মাণক" এবং "প্রাক্‌-প্রবৃত্তি") এই নিয়মের প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। "প্রাক্‌" বলিতে এই তিন ক্ষেত্রেই পূর্বাঞ্চলের সাগরশায়ী দেশগুলিকে বুঝাইতেছে, নিঃসংশয়ে এই অনুমান করা চলে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হইতেছে, সর্বত্র খিল, ক্ষেত্র এবং বাস্তুভূমির একই মূল্য। বাস্তুভূমি অপেক্ষা ক্ষেত্রভূমি, ক্ষেত্রভূমি অপেক্ষা খিলভূমির মূল্য অপেক্ষাকৃত কম হওয়াই তো স্বাভাবিক, অথচ একটি লিপিতেও তেমন ইঙ্গিত নাই, বরং সর্বত্র সকল প্রকার ভূমির দাম একই, এই কথারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। *

অর্থনীতির মূল তত্ত্ব সম্বন্ধে যাঁহাদের কিছুমাত্র পরিচয় আছে তাঁহারাই জানেন মুদ্রার মূলগত মূল্য নির্ভর করে ক্রয়শক্তির তারতম্যের উপর। আজিকার দিনে এক টাকায় বা

* নারদ ও বৃহস্পতির মতে ১ দীনার = ১২ ধানক, ১ ধানক = ৪ আণ্ডিকা, ১ আণ্ডিকা = ১ কার্ষাপণ (তাম্রমুদ্রা)। অমরকোষের মতে—১ দীনার = ১ নিষ্ক। বৃহস্পতির মতে—১ নিষ্ক = ৪ সুবর্ণ।

কোনো বস্তু যে পরিমাণ ক্রয় করা যায়, ১০০ বৎসর আগে তাহার অনেক বেশি পাওয়া যাইত, এবং ঐতিহাসিক মোরল্যাণ্ড দেখাইয়াছেন, আকবরের আমলে ১৯১২ খ্রীষ্টশতকের চেয়ে অন্তত ছয়গুণ বেশি পাওয়া যাইত। সেই হেতু অনুমান করা চলে, প্রাচীন বাঙলায় একটি রৌপ্যমুদ্রার ক্রয়শক্তি আকবরের আমল অপেক্ষাও অন্তত কয়েকগুণ বেশি ছিল। প্রাচীন বাঙলায় ১৬টি রৌপ্যকে ছিল ১ দীনার, অর্থাৎ তখনকার ১ দীনার বর্তমান ভারতবর্ষের অন্তত ৯৬ টাকার কম কিছুতেই ছিল না, এ কথা জোর করিয়াই বলা যায়। বর্তমানের মুদ্রায় পঞ্চনগরী-বিষয়ের এক কুল্যবাপ ভূমির মূল্য সেই হেতু অন্তত ১৯২ টাকা, কোটিবর্ষ-বিষয়ে অন্তত ২৮৮ টাকা, এবং ফরিদপুর অঞ্চলে অন্তত ৩৮৪ টাকার কম কিছুতেই ছিল না। তখনকার দিনে এই মুদ্রা-পরিমাণ কম নয়।

পরবর্তী যুগে অর্থাৎ পাল ও সেন-আমলে ভূমির মূল্য কিরূপ ছিল, তাহা বলিবার উপায় বিশেষ নাই; তবে বিশ্বরূপসেনের একটি লিপিতে এবং কেশবসেনের ইদিলপুর-লিপিতে এই মূল্যের খানিকটা ইঙ্গিত আছে বলিয়া যেন মনে হয়। রাজা কেশবসেন ইদিলপুর-শাসনদ্বারা জনৈক ব্রাহ্মণকে পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির অন্তর্গত বঙ্গের বিক্রমপুর ভাগে তালপড়া-পাটক নামে একটি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। এই গ্রামের ভূমির পরিমাণ কত ছিল, তাহার উল্লেখ নাই, তবে চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন এই গ্রামটির বার্ষিক আয় (না, মোট মূল্য?) যে ২০০ শত মুদ্রা ছিল, তাহার উল্লেখ আছে। এই মুদ্রা খুব সম্ভব কপর্দকপুরাণ। বিশ্বরূপসেনের সাহিত্য-পরিষদ্ লিপিতে ৩৩৬$\frac{1}{2}$ উন্মান ভূমি দানের উল্লেখ আছে; ছয়টি গ্রামে এগারটি ভূখণ্ডে এই পরিমাণ ভূমির মোট বার্ষিক আয় (না, মোট মূল্য?) ছিল পাঁচ শত পুরাণ। সমসাময়িক অন্যান্য লিপির সাক্ষ্য দেখিয়া মনে হয়, সর্বত্রই আমরা যাহা পাইতেছি, তাহা দত্ত ভূমির বার্ষিক আয়, ভূমির মোট মূল্য নয়, এবং এই আয়ের পরিমাণ দেওয়া হইতেছে পুরাণ অথবা কপর্দকপুরাণ মুদ্রায়। লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুর-তাম্রশাসনে এবং আরও দুই-একটি শাসনে পরিষ্কার বলা হইয়াছে, প্রতি দ্রোণের বার্ষিক আয় মোটামুটি ১৫ পুরাণ হিসাবে ৬০ দ্রোণ ১৭ উন্মান ভূমির বিড্ডার-শাসন গ্রামের মোট বার্ষিক আয় ৯০০ পুরাণ (ইত্থং চতুঃসীমাবচ্ছিন্নো তদ্দেশীয়সংব্যবহার-ষট্‌পঞ্চাশৎহস্তপরিমিতনলেন সপ্তদশোন্মানধিকষষ্টি-ভূ-দ্রোণাত্মক প্রতি দ্রোণে পঞ্চদশ-পুরাণোৎপত্তি-নিয়মে বৎসরেণ নবশতোৎপত্তিকঃ বিড্ডারশাসনঃ...)। এই বার্ষিক আয় হইতে ভূমির মোট মূল্য কী হইতে পারে, তাহা অনুমান করা খুব কঠিন হয়তো নয়।

৬

ভূমির চাহিদা

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভূমির চাহিদা বাড়ে, বিশেষভাবে কৃষিপ্রধান দেশে, ইহা তো প্রায় স্বতঃসিদ্ধ। প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছু না থাকিলেও এই অনুমান কিছু কঠিন নয় যে, প্রাচীন বাঙলায়ও জনসংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভূমির চাহিদা বাড়িতেছিল। যে সময় হইতে লিপি-প্রমাণ আমরা পাইতেছি, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক হইতে ইহার কিছু কিছু পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। পাহাড়পুর-লিপিতে দেখিতেছি, জনৈক ব্রাহ্মণ নাথশর্মা ও তাহার স্ত্রী রামী ১ কুল্যবাপ ও ৪ দ্রোণবাপ ভূমি কিনিয়া দান করিতেছেন বট-গোহালীর একটি জৈন বিহারে, সেই বিহারের পূজার্চনাদির ব্যয় নির্বাহের জন্য। এই অনুমান খুবই স্বাভাবিক যে, সেই বিহারের নিকটবর্তী ভূমিই এই ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা উপযোগী হইত, আর নিকটবর্তী ভূমি যদি একান্তই পাওয়া সম্ভব না হইত, তাহা হইলে সমগ্র পরিমাণ ভূমি একই জায়গায় একই ভূখণ্ডে পাইলে ভাল হইত। নাথশর্মা কিন্তু তাহা সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারেন নাই; তাঁহাকে ১ কুল্যবাপ ৪ দ্রোণ ভূমি সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল পাশাপাশি চারিটি গ্রাম হইতে; পৃষ্ঠিমপোত্তক, গোষাটপুঞ্জক এবং নিত্বগোহালী গ্রামত্রয় হইতে যথাক্রমে ৪, ৪ এবং ২½ দ্রোণ এবং বটগোহালী গ্রাম হইতে ১½ দ্রোণ বাস্তুভূমি। এই অনুমান অত্যন্ত স্বাভাবিক হইয়া পড়ে যে, ভূমির চাহিদা এত বেশি হইয়াছিল যে, একটি গ্রামে একসঙ্গে ১ কুল্যবাপ ৪ দ্রোণ ভূমি সংগ্রহ করার সুযোগ এই দম্পতি পান নাই। বৈগ্রাম-পট্টোলীতে দেখিতেছি, দুই ভাই ভোয়িল এবং ভাস্কর একই ধর্মপ্রতিষ্ঠানে কিছু ভূমি দান করিলেন; তাহাও দুই জনে সংগ্রহ করিলেন দুই গ্রামে, এক গ্রামে ভোয়িল কিনিলেন তিনি কুল্যবাপ খিলভূমি, আর-এক গ্রামে ভাস্কর কিনিলেন ১ দ্রোণবাপ বাস্তুভূমি। (অবান্তর হইলেও একটা প্রশ্ন এখানে মনকে অধিকার করে। একই পিতার দুই পুত্র পৃথকভাবে পৃথক্ পৃথক্ গ্রামে ভূমি ক্রয় করিলেন কেন, বিশেষত দানের পাত্র এবং উদ্দেশ্য যেখানে এক? একান্নবর্তী পরিবারের আদর্শে কোথাও ফাটল ধরিয়াছিল কি?) গুণাইঘর-লিপিতেও দেখি, ১১ পাটক ক্রয়যোগ্য খিলভূমি যদিও একই গ্রামে পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু তাহা একসঙ্গে এক ভূখণ্ডে পাওয়া যাইতেছে না, যাইতেছে পাঁচটি পৃথক্ ভূখণ্ডে। ৫ নং দামোদরপুর পট্টোলীদ্বারা যে ৫ কুল্যবাপ ভূমি বিক্রীত হইতেছে, তাহাও চারিটি বিভিন্ন গ্রামে। আস্রফপুর-পট্টোলীদ্বারা সংঘমিত্রের বিহারে যে ভূমি দেওয়া হইতেছে, সেখানে দেখিতেছি, প্রথম দফার ৯ পাটক ১০ দ্রোণ ভূমি ৭টি পাড়া বা গ্রামে, দ্বিতীয় দফার ৬ পাটক ১০ দ্রোণ ভূমি ৮টি পাড়া বা গ্রামে। এইসব সাক্ষ্যপ্রমাণ হইতে সহজেই জনসাধারণের মধ্যে ভূমির চাহিদার পরিমাণ অনুমান করিতে পারা যায়। প্রতিষ্ঠিত গ্রাম ও জনপদগুলিতে প্রায় সমগ্র পরিমাণ ভূমিতেই জনপদবাসীদের বসতি এবং চাষবাস ইত্যাদি ছিল, কাজেই কোনো

গ্রামেই এক সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণ ভূমি সহজলভ্য ছিল না, এই অনুমান অসংগত নয়। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যানুযায়ী বন, অরণ্য ইত্যাদি কাটিয়া নূতন গ্রাম ও বসতির পত্তন করাও যে প্রয়োজন হইতেছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় ত্রিপুরা জেলার লোকনাথের পট্টোলীতে।

পরবর্তী কালেও এই ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রমাণ দুর্লভ নয়। ধুল্লা-পট্টোলী দ্বারা রাজা শ্রীচন্দ্র ১৯ হল ৬ দ্রোণ ভূমি দান করিয়াছিলেন শান্তিবারিক ব্যাসগঙ্গশর্মাকে, কিন্তু এই ভূমিও সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল পাঁচটি গ্রাম হইতে। চট্টগ্রাম-পট্টোলীদ্বারা রাজা দামোদরদেব মাত্র পাঁচ দ্রোণ ভূমি দান করিয়াছিলেন, তাহাও দুই গ্রামে। ভাটেরা-লিপিদ্বারা ভট্টপাটকের শিবমন্দিরের সেবার জন্য যে ২৯৬টি বাড়ি এবং ৩৭৫ হল ভূমি দেওয়া হইতেছে, তাহা ২৮টি বিভিন্ন গ্রামে বিস্তৃত। সাহিত্য-পরিষদ্-পট্টোলীদ্বারা রাজা বিশ্বরূপসেন জনৈক আবল্লিক পণ্ডিত হলায়ুধ শর্মাকে ৩৩৬½ উদানভূমি দান করিয়াছিলেন ছয়টি বিভিন্ন গ্রামে, ১১টি পৃথক্ পৃথক্ ভূখণ্ডে। বিশ্বরূপসেনের এই পট্টোলীটির সাক্ষ্য অন্য দিক্ হইতেও খুব উল্লেখযোগ্য। দানসংগ্রহ দ্বারা কোনো কোনো ধর্মপ্রতিষ্ঠান প্রচুর ভূমির অধিকারী হইয়াছে, এমন দৃষ্টান্ত দু-একটি আমাদের লিপিগুলিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষ নিজের জন্য, হয় ক্রয় করিয়া না-হয় দান গ্রহণ করিয়া অথবা উভয় উপায়েই, নিজের প্রয়োজনাধিক ভূমি সংগ্রহ করিয়া ভূমির বড় মালিক হইয়া বসিতেছেন, এমন অন্তত একটি দৃষ্টান্ত বিশ্বরূপসেনের এই লিপিটি হইতে পাওয়া যাইতেছে। আরও আশ্চর্য হইতে হয় এই ভাবিয়া যে, এই ভূম্যধিকারীটি হইতেছেন একজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, সাধারণত আমরা যাঁহাদের সর্বপ্রকারে নির্লোভ এবং বিত্তহীন বলিয়া মনে করি। এই আবল্লিক পণ্ডিতটি কী ভাবে ভূমি-সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার একটু পরিচয় লওয়া যাইতে পারে, এবং এই পরিচয়ের মধ্যে ভূমি-সংগ্রহের ইচ্ছা সমাজের মধ্যে কী ভাবে রূপ লইতেছিল, তাহার একটু আভাসও পাওয়া যাইতে পারে।

১। রামসিদ্ধি পাটকে দুইটি ভূখণ্ড, ৬৬½ উদান পরিমাণ, আয় ১০০ (পুরাণ)। উত্তরায়ণ-সংক্রান্তি উপলক্ষে রাজার দান।

২। বিজয়তিলক গ্রামে ২৫ উদান, আয় ৬০ (পুরাণ)।

৩। অজিকুল পাটকে ১৬৫ উদান, আয় ১৪০ (পুরাণ)। হলায়ুধ নিজে এই ভূখণ্ড কিনিয়াছিলেন।

৪। দেউলহস্তী গ্রামে ২১ উদান, আয় ৫০ (পুরাণ)।

২, ৩ ও ৪ নং ভূমি হলায়ুধ চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে রানীমাতার নিকট হইতে দান গ্রহণ করিয়াছিলেন।

৫। দেউলহস্তী গ্রামে আরও দুইটি ভূখণ্ড, পরিমাণ ১০ উদান, আয় ২৫ (পুরাণ)। হলায়ুধ আগে উহা কিনিয়াছিলেন, পরে কুমার সূর্যসেনের নিকট হইতে দান গ্রহণ করিয়াছিলেন, কুমারের জন্মদিন উপলক্ষে।

৬। দেউলহস্তী গ্রামেই আরও দুইটি ভূখণ্ড, পরিমাণ ৭ উদান, আয় ২৫ (পুরাণ)। হলায়ুধ আগে উহা কিনিয়াছিলেন, পরে সান্ধিবিগ্রহিক নাঞ্ঞীসিংহের নিকট হইতে দান গ্রহণ করিয়াছিলেন।

৭। ঘাব্‌রাকাট্টি পাটকে ১২২/৪ উদান ভূমি, আয় ৫০ (পুরাণ)। হলায়ুধ রাজপণ্ডিত মহেশ্বরের নিকট হইতে উহা কিনিয়াছিলেন।

৮। পাত্তিলাদিবীক গ্রামে ২৪ উদান, আয় ৫০ (পুরাণ)। উত্থানদ্বাদশী তিথি উপলক্ষে কুমার পুরুষোত্তমসেনের দান।

সর্বসুদ্ধ এই ৩৩৬২/৪ উন্মান ভূমির বার্ষিক আয় ছিল ৫০০ শত (পুরাণ); তখনকার দিনে এই অর্থের পরিমাণ কম নয়। ব্রাহ্মণপণ্ডিত হলায়ুধ শর্মা বিভিন্ন গ্রামে বিস্তৃত সমগ্র পরিমাণ এই ভূমি রাজার নিকট হইতে ব্রহ্মত্র দানস্বরূপ গ্রহণ করিয়া ভূম্যধিকারী হইয়া বসিয়াছিলেন; রাষ্ট্রকে তাঁহার কোনও করই দিতে হইত না, অথচ তাঁহার প্রজাদের নিকট হইতে সমস্ত করই তিনি পাইতেন। পাল ও সেন-বংশীয় রাজারা ও অন্যান্য ছোটখাট রাজবংশের রাজারা অনেক সময়ই অনেক ব্রাহ্মণকে যে গ্রামকে-গ্রাম দান করিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত তো ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। প্রয়োজনাধিক ভূমির অধিকারী হওয়ার ইচ্ছা, ব্যক্তিবিশেষকে কেন্দ্র করিয়া ভূমির স্বত্বাধিকার কেন্দ্রীকৃত হওয়ার ঝোঁক সমাজের মধ্যে কী ভাবে বাড়িতেছিল, এইসব সাক্ষ্যপ্রমাণের মধ্যে তাহার সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়।

ভূমির ক্রমবর্ধমান চাহিদার ইঙ্গিত কতকটা ভূমির সূক্ষ্ম সীমা-নির্দেশের মধ্যেও পাওয়া যায়। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের ভূমির সীমা ও পরিমাণ সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন; রাষ্ট্রও এ সম্বন্ধে কম সচেতন ছিল না। ভূমি দান-বিক্রয়কালে অন্য কাহারও ভূমিস্বার্থ যাহাতে আহত না হয়, এ সম্বন্ধে প্রজার ও রাষ্ট্রের দৃষ্টি খুবই সজাগ ছিল। তাহা ছাড়া, প্রত্যেকটি লিপিতেই ভূমি-সীমা এত সূক্ষ্মভাবে ও সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে যে, পড়িলেই মনে হয়, সূচাগ্র ভূমিও কেহ সহজে ছাড়িয়া দিতে রাজী হইতেন না। কালের অগ্রগতির সঙ্গে এই চেতনাও বৃদ্ধি পাইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। অষ্টমশতকপূর্ব লিপিগুলিতে এই সীমা-বিবৃতি খুব বিস্তৃত নয়; কিন্তু পরবর্তী লিপিগুলিতে ক্রমশ এই বিবৃতি দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইবার দিকে ঝোঁক অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

তাহা ছাড়া ভূমির পরিমাপের বর্ধমান সূক্ষ্মতাও ক্রমবর্ধমান চাহিদার দিকে ইঙ্গিত করে। অষ্টমশতকপূর্ব লিপিগুলিতে ভূমি-পরিমাপের নিম্নতম ক্রম হইতেছে আঢবাপ বা অঢ়কবাপ, কিন্তু সেন-আমলের লিপিগুলিতে দেখা যায়, নিম্নতম ক্রম আঢ়বাপ হইতে উদান, উন্মান হইতে কাকিনী পর্যন্ত নামিয়াছে। ভূমির চাহিদা যতই বাড়িতেছিল, লোকেরা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভগ্নাংশ সম্বন্ধেও ক্রমশ সজাগ হইয়া উঠিতেছিল, এই অনুমানই স্বাভাবিক।

৭

ভূমির সীমানির্দেশ

আগেই বলিয়াছি, ভূমি দান-বিক্রয়কালে সীমা-নির্দেশ খুব সূক্ষ্মভাবে ও সবিস্তারেই করা হইত। প্রস্তাবিত ভূমি দান-বিক্রয়ে যাহাতে গ্রামবাসীদের বসতি অথবা কৃষিকর্মের কোনও ব্যাঘাত না ঘটে, তাহা প্রজারা তো দেখিতেনই, স্থানীয় অধিকরণও এ সম্বন্ধে সচেতন থাকিত। পাহাড়পুর পট্টোলীতে পরিষ্কার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, প্রস্তাবিত পরিমাণ ভূমি এমন ভাবে নির্বাচিত ও চিহ্নিত করিতে হইবে, যাহাতে গ্রামবাসীদের কাজকর্মে কোনও প্রকার অসুবিধা না হয় ("স্বকর্মাবিরোধেন")। ভূমির সীমা নির্দেশ কী করিয়া করা হইত, তাহার একটু ইঙ্গিত বৈগ্রাম-পট্টোলীতে পাওয়া যায়। তুষের ছাই ইত্যাদি চিরকালস্থায়ী বস্তুদ্বারা চারিদিকের সীমা চিহ্নিত করাই ছিল প্রচলিত রীতি ("চিরকালস্থায়ি-তুষাঙ্গারাদি-চিহ্নৈশ্চতুর্দিশো নিয়ম্য")। খুব সম্ভব, চারি দিকে লাইন ধরিয়া মাটি খুঁড়িয়া, তুষের ছাই ইত্যাদি দিয়া গর্ত ভরাট করা হইত; তাহার ফলে এই সীমারেখার উপর কোনও ঘাস, গাছ ইত্যাদি জন্মাইত না, এবং এই অপ্রসূ অনুর্বর রেখাই সীমা-নির্দেশের কাজ করিত। মল্লসারুল গ্রামে প্রাপ্ত লিপিতে পদ্মবীচির মালাচিহ্নিত (কমলাঙ্কমালাঙ্কিত) খুঁটি বা কীলক দ্বারা সীমা-নির্দেশ করার আর-এক প্রকার রীতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সীমা চিহ্নিত করিবার এই রীতি তো ছিলই। তাহা ছাড়া গাছ, খাল, নালা, জোলা, নদী, পুষ্করিণী, মন্দির ইত্যাদি দ্বারাও সীমা নির্দিষ্ট হইত। যেখানে সমগ্র গ্রামদান বিক্রয়ের বস্তু, সেখানে গ্রামসীমা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। যেখানে খণ্ড খণ্ড ভূমি দান-বিক্রয় হইতেছে, সেখানেও প্রস্তাবিত ভূমির সীমা অন্য ভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ("অপবিঞ্ছ্য", ৩নং দামোদরপুর-লিপি) কমবেশি সবিস্তারে নির্দেশ করা হইয়াছে। অষ্টমশতকপূর্ব উত্তর-বঙ্গের লিপিগুলিতে এই ধরনের সীমা-নির্দেশ অনুপস্থিত, কিন্তু সমসাময়িক কালের নিম্ন ও পূর্ব-বঙ্গের লিপিগুলিতে ভূমি-সীমা নির্দেশ সুবিস্তারিত। এই সীমা-নির্দেশের দুই-চারিটি দৃষ্টান্তের পরিচয় লওয়া যাইতে পারে।

বৈন্যগুপ্তের গুণাইঘর-পট্টোলীতে পাঁচটি বিভিন্ন ভূমিখণ্ডের সীমা নির্দেশ করা হইয়াছে। প্রথম ভূমিখণ্ডটি ৭ পাটক ৯ দ্রোণ; ইহার পূর্ব দিকে গুণিকাগ্রহার (বর্তমান গুণাইঘর) গ্রামের সীমা এবং বিষ্ণুবর্ধকির ক্ষেত্র; দক্ষিণে মৃদুবিলালের ক্ষেত্র এবং রাজবিহারক্ষেত্র; পশ্চিমে সূরীনশীর পূর্ণেকের ক্ষেত্র; উত্তরে দোষীভোগ পুষ্করিণী এবং বল্পিয়ক ও আদিত্যবন্ধুর ক্ষেত্রসীমা। দ্বিতীয় খণ্ডটি ২৮ দ্রোণবাপ; ইহার পূর্ব দিকে গুণিকাগ্রহার গ্রামসীমা, দক্ষিণে পক্কবিলালের ক্ষেত্র; পশ্চিমে রাজবিহারক্ষেত্র; উত্তরে বৈদ্য···র ক্ষেত্র। তৃতীয় খণ্ডটি ২৩ দ্রোণ; ইহার পূর্বদিকে···র ক্ষেত্র, দক্ষিণে···র ক্ষেত্রসীমা, পশ্চিমে জোলারির ক্ষেত্রসীমা, উত্তরে নাগজোণকের ক্ষেত্র। চতুর্থ খণ্ডটি ৩০

দ্রোণ ; ইহার পূর্বদিকে বুদ্ধকের ক্ষেত্রসীমা, দক্ষিণে কলকের ক্ষেত্রসীমা,...পশ্চিমে সূর্যের ক্ষেত্রসীমা, উত্তরে মহীপালের ক্ষেত্রসীমা। পঞ্চম খণ্ডটি ১½ পাটক ; ইহার পূর্বদিকে খর্দাবিদুগ্‌গরিকের ক্ষেত্র, দক্ষিণে মণিভদ্রের ক্ষেত্র, পশ্চিমে যজ্ঞরাতের ক্ষেত্রসীমা, উত্তরে নাদডদক গ্রামের সীমা। যে মহাযানিক অবৈবর্তিক ভিক্ষুসংঘবিহারে এই ভূমি দান করা হইয়াছিল, সেই বিহারসংলগ্ন কিছু নিম্নভূমি ছিল, তাহার সীমাও সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে : পূর্বে চূড়ামণি ও নগরশ্রী নৌযোগের (নৌকা বাঁধিবার জায়গা) মাঝখানের জোলা, দক্ষিণে গণেশ্বর বিললের পুষ্করিণীর সঙ্গে যুক্ত নৌখাট (নৌকা রাখিবার খাল), পশ্চিমে প্রদ্যুম্নেশ্বর-মন্দিরের মাঠ, উত্তরে প্রডামার নৌযোগখাট। বিহারের কিছু হজ্জিক খিল (হাজা, অনুর্বর) ভূমিও ছিল ; তাহার সীমা পূর্বে প্রদ্যুম্নেশ্বর-মন্দিরের মাঠ, দক্ষিণে বৌদ্ধ আচার্য জিতসেনের বিহারক্ষেত্র সীমা, পশ্চিমে হচাত খাল, উত্তরে দত্তপুষ্করিণী। ধর্মাদিত্যের ১নং ও ২নং পট্টোলীতে, এবং বপ্যঘোষবাট-পট্টোলীতে দত্ত ও বিক্রীত ভূমিসীমা এইভাবে নির্দেশ করা হইয়াছে : ২নং পট্টোলীর ভূমিসীমায় পূর্বে সোগ নামক ব্যক্তির তাম্রপট্টীকৃত ক্ষেত্রের সীমা, দক্ষিণে প্রাচীন পর্কটিক (পর্কটী = পাকুড়) বৃক্ষচিহ্নিত সীমা, পশ্চিমে গোযান চলাচলের রাস্তা এবং উত্তরে গর্গ স্বামীর তাম্রপট্টীকৃত ক্ষেত্রের সীমা। ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রপট্টে দত্ত ক্রৌঞ্চশ্বভ্র গ্রামটির সীমা এবং তৎসংলগ্ন আরও তিনটি গ্রামের নাম সুস্পষ্ট ও সবিস্তারে দেওয়া হইয়াছে ; ইহার সীমা—পশ্চিমে গঙ্গিনিকা বা গাঙ্গিনা, উত্তরে কাদম্বরী (সরস্বতী) দেবমন্দির ও খেজুরগাছ, পূর্বোত্তরে রাজপুত্র দেবটকৃত আলি, [এই আলি] বীজপুরকে গিয়া প্রবিষ্ট হইয়াছে। পূর্বদিকে বিটককৃত আলি খাটক-যানিকাতে গিয়া প্রবেশ করিয়াছে। তাহার পর জম্বুযানিকা আক্রমণ করিয়া জম্বুযানক পর্যন্ত গিয়াছে, তথা হইতে নিঃসৃত হইয়া পুণ্যারাম বিল্বার্ধ-স্রোতিকা পর্যন্ত গিয়াছে। সেখান হইতে নিঃসৃত হইয়া নলচর্মটের উত্তর সীমা পর্যন্ত গিয়াছে। নলচর্মটের দক্ষিণে নামুণ্ড-কায়িকা...হইতে খণ্ডমুণ্ডমুখ পর্যন্ত, তথা হইতে বেদস-বিম্বিকা, তাহার পরে রোহিতবাটী-পিণ্ডারবিটি জোটীকা-সীমা, উজ্জারঘোটের দক্ষিণ এবং গ্রামবিল্বের দক্ষিণ পর্যন্ত দেবিকা সীমাবিটি ধর্মজোটিকা। এই প্রকার মাঢ়াশাল্মলী নামক গ্রাম। তাহার উত্তরেও গঙ্গিনিকার সীমা ; তাহার পূর্বে অর্ধস্রোতিকার সহিত [মিলিত হইয়া] আম্রযানকোলার্ধযানিকা পর্যন্ত গিয়াছে। তাহার দক্ষিণে কালিকাশ্বভ্র, তথা হইতেও নিঃসৃত হইয়া শ্রীফলভিষুক পর্যন্ত গিয়াছে। তাহার পশ্চিমে [গিয়া] বিশ্বঙ্গর্ধস্রোতিকার গাঙ্গিনিকায় গিয়া প্রবিষ্ট হইয়াছে। পালিতকের সীমা দক্ষিণে কাণাদ্বীপিকা, পূর্বে কোষ্ঠিয়া-স্রোত, উত্তরে গঙ্গিনিকা, পশ্চিমে জেনন্দায়িকা ; এই গ্রামের শেষ সীমায় পরকর্মকৃদ্বীপ স্থালীক্কটবিষয়ের অধীন আম্রষণ্ডিকামণ্ডলের অন্তগত গো-পিপ্পলী গ্রামের সীমা, পূর্বে উড্রগ্রামমণ্ডলের * সীমায় অবস্থিত গোপথ। পরবর্তী সেন-আমলের

* উড্রগ্রামমণ্ডলে কি ওড্রদেশবাসীরা অধিকসংখ্যায় বাস করিতেন ? তাঁহাদের কলোনি ?

লিপিগুলিতে গ্রাম অথবা খণ্ডভূমির সীমা কমবেশি সবিস্তারেই দেওয়া হইয়াছে। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সর্বত্রই এই সীমা অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট, কোথাও ভুল হইবার সুযোগ নাই। ভূমির চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভূমি লইয়া বাদ-বিসংবাদও হইত, এ অনুমান স্বভাবতই করা যায়; হয়তো এই কারণেও ভূমি-সীমা সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন হইয়াছিল।

ভূমির এই সূক্ষ্ম, সুস্পষ্ট ও সবিস্তার সীমানির্দেশ, সুনির্দিষ্ট মূল্য, ভূমি-পরিমাপের মানের ক্রমবর্ধমান সূক্ষ্মতা, বার্ষিক আয়ের পরিমাণ, হলমানদণ্ডের উল্লেখ ইত্যাদি একটু গভীর ভাবে বিবেচনা ও বিশ্লেষণ করিলে স্বভাবতই মনে হয়, ভূমি পরিমাপের, পরিমাণ নির্দেশের, জমি-জরিপ এবং জমির বার্ষিক আয়, জমির মূল্য ইত্যাদি নির্ধারণের কোনো না কোনো প্রকার ব্যবস্থা রাষ্ট্রের ছিল, এবং পুস্তপালের দপ্তরে এইসব বিষয়সংক্রান্ত কাগজ-পত্র যথারীতি রক্ষিত হইত। এই কারণে ভূমি ক্রয়-বিক্রয় প্রস্তাবমাত্রই প্রথমে পুস্তপালের দপ্তরে পাঠাইতে হইত, এবং তিনি কাগজপত্র দেখিয়া দান অথবা ক্রয়-বিক্রয়ে সম্মতি দিতেন। পঞ্চম শতকের লিপিতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে এই ব্যবস্থা যে আরও সুনির্দিষ্ট ও সুনিয়মিত হইয়াছিল কর ইত্যাদি ধার্য করিবার উদ্দেশ্যে, মূল্য, আয়, ভূমি-পরিমাণ ইত্যাদি নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যে জরিপ ও ভূ-কর নিয়ামক বিভাগের কাজকর্ম যে আরও সূক্ষ্ম ও বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ করিবার অবকাশ কোথায়?

৮

ভূমির উপস্বত্ব, কর, উপরিকর ইত্যাদি

সপ্তমশতকপূর্ব লিপিগুলির কোনো কোনোটিতে আমরা ভূমি-দানের অন্যান্য শর্তের মধ্যে একটি শর্ত দেখিয়াছি, "সমুদয়বাহ্যাপ্রতিকর" অথবা "সমুদয়বাহ্যাদি...অকিঞ্চিৎপ্রতিকর", অর্থাৎ রাজা ভূমি দান করিতেছেন কেবল তখনই, যখন তিনি তাহা সকল প্রকারের কর-বিবর্জিত করিয়া দিতেছেন; তাহা না হইলে মূল্য লইয়া যে ভূমি বিক্রয় করিতেছেন, তাহাই দান করিতেছেন বলিয়া উল্লেখের আর কোনো অর্থ হয় না। যাহা হউক, রাজা যখন ভূমি কর-বিবর্জিত করিতেছেন, তখন রাজা দান ছাড়া অন্য সকল ক্ষেত্রেই ভূমির ভোক্তাদের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিতেন, ইহা তো প্রায় স্বতঃসিদ্ধ, এবং এই কর যে নানা প্রকারের ছিল, তাহার ইঙ্গিতও "সমুদয়বাহ্য" এই কথার মধ্যে প্রচ্ছন্ন। কর্ষণযোগ্য ও কৃষ্ট ভূমির কর ছিল, বাস্তু-ভূমিরও ছিল, কিন্তু খিল অর্থাৎ কর্ষণের অযোগ্য ভূমির বোধ হয় কোনো কর ছিল না, এই ধরনের ইঙ্গিত আমি আগেই করিয়াছি। বৈদ্যদেবের কমৌলি-লিপিতে তাহার প্রমাণও আছে। কর কত প্রকারের ছিল, কী কী ছিল, তাহা

এই যুগের লিপিগুলি হইতে জানিবার উপায় নাই, তবে উৎপন্ন শস্যের এক ষষ্ঠ ভাগ যে রাষ্ট্রের প্রধান প্রাপ্য ছিল, এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। পাহাড়পুর ও বৈগ্রাম-লিপিতে পরিষ্কার বলা হইয়াছে, কোনও ব্যক্তিবিশেষ যদি রাজার নিকট হইতে ভূমি ক্রয় করিয়া ধর্মাচরণোদ্দেশ্যে সেই ভূমি দান করেন, তাহা হইলে রাজা শুধু যে ভূমির মূল্যটুকুই লাভ করেন তাহা নয়, ক্রেতা ভূমিদানের ফলস্বরূপ যে পুণ্য লাভ করেন, দত্ত ভূমি সর্বপ্রকার কর-বিবর্জিত করিয়া দেওয়াতে রাজা সেই পুণ্যের এক ষষ্ঠ ভাগের অধিকারী হন। অর্থাৎ, সেই ভূমির উপস্বত্বের এক ষষ্ঠ ভাগ যে রাজার তাহা এই উল্লেখের মধ্যে সুস্পষ্ট। ধর্মাদিত্যের ১নং পট্টোলীতে এই কথা আরও স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে। অন্যান্য কর যাহা ছিল তাহার দু-একটি অনুমান করা যাইতে পারে। যে ভূমি বিক্রয় করা হইতেছে এবং পরে ক্রেতা দান করিতেছেন, তাহা অনেক ক্ষেত্রেই লবণাকর, খেয়া পারাপার ঘাট, হাটবাজার অরণ্য ইত্যাদি সম্বলিত। এগুলির উল্লেখ নিরর্থক নয়। কৌটিল্য ও অন্যান্য অর্থশাস্ত্রকারদের মতে লবণ, অরণ্য ইত্যাদিতে রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার ছিল, এবং তাহা হইতে রাজার তথা রাষ্ট্রের নিয়মিত আয় ছিল ; এইসব যাঁহারা ভোগ করিতেন, রাজসরকারে তাঁহাদের কর দিতে হইত। হাটবাজার, খেয়াঘাট হইতেও একপ্রকারের রাজস্ব আদায় হইত, জনসাধারণকেই এই করভার বহন করিতে হইত। রাজা যেখানে ভূমি দান করিতেছেন, এইসব আয়ের স্বার্থ ত্যাগ করিয়াই দান করিতেছেন ; অর্থাৎ, প্রতিপক্ষে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, উৎপাদিত শস্যের এক ষষ্ঠাংশ ছাড়া অন্যপ্রকারের করও ছিল, এবং পূর্বোক্ত করগুলি তাহাদের মধ্যে অন্যতম।

রাজা যখন ভূমি দান করিলেন, তখন তিনি সর্বপ্রকার কর-বিবর্জিত করিয়াই দান করিলেন ; তাহার অর্থ এই যে, যিনি বা যে প্রতিষ্ঠান এই দান গ্রহণ করিলেন, তিনি বা সেই প্রতিষ্ঠান সেই ভূমির সকল প্রকারের উপস্বত্ব ভোগ করিবেন। নিম্নপ্রজা যদি কেহ সেই ভূমি ভোগ করেন, তাহা হইলে তিনি দানগ্রহীতা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সর্বপ্রকার কর, উৎপাদিত শস্যের ভাগ ইত্যাদি নিয়মিতভাবে প্রদান করিবেন, রাজা বা রাষ্ট্রকে নয়। ইহা ছাড়া রাজার ভূমিদানের কোনো অন্য অর্থ হইতে পারে না। এই কথাটা পরবর্তী কালের লিপিগুলিতে খুব স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে।

ভূমির উপস্বত্ব সম্বন্ধে উপরে যাহা বলিয়াছি, তাহার প্রত্যেকটি কথারই সবিস্তার সমর্থন পাওয়া যাইতেছে পরবর্তী কালের লিপিগুলিতে। প্রথমেই দেখিতেছি, রাজা যখন ভূমি দান করিতেছেন, তখন সমস্ত 'রাজভাগভোগকরহিরণ্যপ্রত্যায়' স্বার্থ ত্যাগ করিয়া দান করিতেছেন, অর্থাৎ দানগ্রহীতাকে এসব কিছুই রাষ্ট্রকে বা রাজাকে দিতে হইবে না, সুস্পষ্ট বলিয়া দিতেছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই কথাও বলিয়া দিতেছেন যে, সেই ভূমির ক্ষেত্রকর ইত্যাদি অন্যান্য প্রকারের ভোক্তা যাহারা আছে বা হইবে, তাহারা যেন রাজাজ্ঞা শ্রবণ করিয়া বিধিমত যথোচিত করপিণ্ডকাদি এবং অন্যান্য সকল প্রকার

প্রত্যয় দানগ্রহীতাকে অর্পণ করেন ("প্রতিবাসিভিঃ ক্ষেত্রকরৈশ্চাজ্ঞাশ্রবণবিধেয়ৈর্ভূত্বা সমুচিতকরপিণ্ডকাদিসর্বপ্রত্যায়োপনয়ঃ কার্য ইতি"—খালিমপুর লিপি)। রাজভোগ্য রাষ্ট্রকে দেয় কয়েকটি উপস্বত্বের উল্লেখ এই লিপিগুলিতে পাওয়া যায়: ভাগ, ভোগ, কর, হিরণ্য। এই কথা কয়টির অর্থ জানা প্রয়োজন।

ভাগ। ভাগ বলিতে রাজার বা রাষ্ট্রের প্রাপ্য উৎপাদিত শস্যের ভাগ বুঝায়। ধর্মপালের খালিমপুর-লিপিতে 'ষষ্ঠাধিকৃত' নামে একজন রাজপুরুষের উল্লেখ আছে; খুব সম্ভব, ইনিই রাজার প্রাপ্য এক ষষ্ঠ ভাগ সংগ্রহ করিতেন। শুধু কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র বা অন্যান্য স্মৃতিগ্রন্থেই যে রাজার এই ষষ্ঠ ভাগ প্রাপ্তির উল্লেখ আছে, তাহাই নয়; আগেকার লিপি-প্রমাণের মধ্যেও দেখিয়াছি, উৎপাদিত শস্যের এক ষষ্ঠ ভাগই ছিল রাজার প্রাপ্য।

ভোগ। খুব সম্ভব, ফল ফুল কাঠ ইত্যাদি যে-সব দ্রব্য মাঝে মাঝে রাজাকে তাঁহার ব্যক্তিগত ভোগের জন্য দেওয়া হইত, তাহারই নাম ছিল ভোগ। বাঙলাদেশের লিপিগুলিতে সর্বত্রই উল্লেখ আছে, ভূমিদানকালে তৎসংলগ্ন মহুয়া, আম, কাঁঠাল, সুপারি, নারিকেল প্রভৃতি গাছ ও অন্যান্য ঝাটবিটপ ইত্যাদি সমস্তই সঙ্গে সঙ্গে দান করা হইত। তাহা হইতে এ অনুমান অসংগত নয় যে, এইসব ফল ফুল কাঠ বাঁশ হইতে একটা নিয়মিত আয়ের অংশ রাজার ভোগ্য ছিল।

কর। মুদ্রায় দেয় রাজস্ব অর্থে কর। অর্থশাস্ত্রে তিন প্রকার করের উল্লেখ আছে। (১) রাজার প্রাপ্য শস্যভাগ ছাড়া নির্ধারিত কালে নিয়মিত ভাবে দেয় মুদ্রাকর; (২) আপৎকালে অথবা অত্যায়িক কালে দেয় মুদ্রাকর; (৩) বণিক ও ব্যবসায়ীদের লাভের উপর দেয় কর। প্রাচীন বাঙলায়ও বোধ হয়, এই তিন প্রকার করই প্রচলিত ছিল।

হিরণ্য। হিরণ্য অর্থে স্বর্ণ। এই হিরণ্য সর্বদাই উল্লিখিত হইয়াছে ভাগ-ভোগ-করের সঙ্গে। কিন্তু ইহার সবিশেষ অর্থ বুঝিতে পারা কঠিন। কোনো কোনো পণ্ডিত অর্থ করিয়াছেন, রাজা সব শস্যের ভাগ গ্রহণ করিতেন না, তাহার বদলে গ্রহণ করিতেন মুদ্রা, সেই মুদ্রাই হিরণ্য।

পূর্ববর্তী কালে কী হইত বলা কঠিন, কিন্তু সেনরাজাদের আমলে ভূমি-রাজস্ব যে মুদ্রায় দিতে হইত, এ অনুমান বোধ হয় করা যায়, যদিও সে মুদ্রা যে কী বস্তু তাহা আমরা আজও জানি না। এই আমলের প্রত্যেকটি লিপিতেই ভূমির বার্ষিক আয় প্রচলিত মুদ্রায় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এই রাজস্বের ক্রম ও পরিমাণ জানিবার কোনও উপায় নাই। লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুর-পট্টোলীতে দেখা যাইতেছে, দত্ত ভূমির প্রতি দ্রোণের আয় ছিল ১৫ পুরাণ। কিন্তু বিশ্বরূপসেনের সাহিত্য-পরিষৎ-লিপিতে দেখা যায়, একই জায়গার সমপরিমাণ ভূমির আয় সমান ছিল না। কর্ষণযোগ্য ভূমির উৎপাদিত শস্যসম্পদের কমবেশির উপর আয়ের পরিমাণ নির্ভর করিত, এবং ইহা সহজেই অনুমেয় যে, ভূমির রাজস্বও সেই অনুযায়ীই নির্ধারিত হইত।

যাহাই হউক, ভাগ, ভোগ, কর ও হিরণ্য ছাড়া জনসাধারণকে অন্যান্য করও দিতে হইত। এই জাতীয় সব করের উল্লেখ লিপিগুলিতে নাই। কিন্তু কয়েকটি সম্বন্ধে পরোক্ষ অনুমান সহজেই করা যায়। পাল ও সেন-আমলের প্রায় প্রত্যেকটি লিপিতেই "সচৌরোদ্ধরণ" কথাটির উল্লেখ আছে, অর্থাৎ দানগ্রহীতাকে যে-সব সুবিধা ও ক্ষমতা দান করা হইত, তাহার মধ্যে চৌরোদ্ধরণ একটি। কথাটির অর্থ করা হইয়াছে এই মর্মে যে, অন্যান্য ক্ষমতার সহিত শান্তিরক্ষার ক্ষমতাও দানগ্রহীতাকে অর্পণ করা হইত। কেহ কেহ অর্থ করিয়াছেন, দানগ্রহীতাকে শান্তিরক্ষার জন্য অর্থাৎ চোর-ডাকাতের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য কোনও প্রকার কর রাজাকে দিতে হইত না। শেষোক্ত অর্থটিই যেন সমীচীন মনে হয়।

আগেই দেখিয়াছি, "সঘট্ট-সতর" অর্থাৎ ঘাট, খেয়াপারাপার ঘাট ইত্যাদিসহ ভূমি দান করা হইত। এই খেয়াপারাপার ঘাটের একটা রাজস্ব ছিল, এবং পরোক্ষভাবে জনসাধারণকে তাহা বহনও করিতে হইত। যে-সব রাজকর্মচারী এই কর সংগ্রহ করিতেন এবং এইসব ঘাটের তত্ত্বাবধান করিতেন, তাঁহাদের নাম ছিল তারক অথবা তরপতি। হাট হইতেও এক প্রকারের রাজস্ব আদায় হইত; তাহা সংগ্রহ এবং হাটবাজারের তত্ত্বাবধান যিনি করিতেন, তাঁহার নাম ছিল হট্টপ ত (ঈশ্বরঘোষের রামগঞ্জ-লিপি)। খালিমপুর এবং অন্যান্য আরও দুই-একটি লিপিতে হাটের রাজস্বও যে দান-গ্রহীতার প্রাপ্য, তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। ধর্মমালের খালিমপুর-লিপিতে অন্যান্য করের সঙ্গে পিণ্ডক কথার উল্লেখ আছে। সম্ভবত এই পিণ্ডক এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের পিণ্ডকর একই বস্তু। টীকাকার ভট্টস্বামী বলিতেছেন, সমগ্র গ্রামের উপর যে কর চাপান হইত, তাহাই পিণ্ডকর। বাট, গোবাট, গোচর ইত্যাদির উপরেও বোধ হয় নির্ধারিত হারে কর ছিল; ভূমিদান যখন করা হইতেছে, তখন দানগ্রহীতা এ সমস্তই ভোগের অধিকার পাইতেছেন, অর্থাৎ নিম্ন প্রজাদের দেয় কর রাজার বদলে তিনিই ভোগ করিবার অধিকার পাইতেছেন। দশ প্রকার অপরাধের জন্যও প্রজাকে জরিমানা দিতে হইত, তাহাও একপ্রকারের রাজস্ব; আগেই সে কথা উল্লেখ করিয়াছি। উপরিকর নামে আর একটি করের উল্লেখ লিপিগুলিতে পাওয়া যায়। এই করটি যিনি সংগ্রহ করিতেন, তাঁহার বৃত্তি-নাম ছিল ঔপরিকারক; প্রতিবাসী কামরূপ রাজ্যের নওগাঁ-লিপি হইতে এ কথা জানা যায়, এবং তিনি যে রাষ্ট্রের অন্যতম কর্মচারী ছিলেন, তাহাও ঐ লিপিটিতে সুস্পষ্ট। উপরিকর বোধ হয় additional tax, অর্থাৎ নিয়মিত কর ছাড়া সময়ে অসময়ে রাষ্ট্র যেসব কর নির্ধারণ করিতেন, অথবা ভূমিরাজস্ব ছাড়া অন্যান্য যেসব অতিরিক্ত কর রাষ্ট্রকে দিতে হইত, তাহাই বোধ হয় উপরিকর। অথবা, নিম্নপ্রজাদের নিকট হইতে রাষ্ট্র যেসব কর সংগ্রহ করিতেন, তাহাও হইতে পারে। কেহ কেহ মনে করেন, অস্থায়ী প্রজাকে যে রাজস্ব দিতে হইত তাহাই উপরিকর। যে ভাবেই হউক, এই

উপরিকর রাষ্ট্রের প্রাপ্য ছিল, মধ্যস্বত্বাধিকারীর নয়, তাহা নওগাঁ-লিপিটির সাক্ষ্য হইতেই সপ্রমাণ।

৯

ভূমি-স্বত্বাধিকারী কে? রাজা ও প্রজার অধিকার। খাস ও নিম্ন প্রজা

ভূমি-সংপৃক্ত ব্যাপারে প্রজার দায় যাহা কিছু, তাহার কতকটা পরিচয় পাওয়া গেল। এই ব্যাপারে প্রজার অধিকার কী ছিল, তাহার আলোচনা করা যাইতে পারে। কিন্তু সে আলোচনা করিতে হইলে ভূমি-স্বত্বাধিকারী কে, তাহার আলোচনা অনিবার্য। রাজা বা রাষ্ট্রের সঙ্গে মধ্য-স্বত্বাধিকারী ও প্রজার সম্বন্ধ কী, সে বিচারও প্রসঙ্গত আসিয়া পড়িবে।

ভূমির যথার্থ মূল অধিকারী রাজা, না জনসাধারণ, ইহা লইয়া বহু তর্কবিতর্ক হইয়া গিয়াছে; অতীত কালেও হইয়াছে, এই একান্ত আধুনিক কালেও হইতেছে। ভারতবর্ষেও হইয়াছে, ভারতের বাহিরে অন্যান্য দেশেও হইয়াছে। আমাদের প্রাচীন অর্থশাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্রে এই তর্কের দুই পক্ষেরই বিস্তৃত মতামত পাওয়া খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়। কিন্তু এ তর্ক আমাদের আলোচনায় নিরর্থক। ইহার সন্দেহহীন সুমীমাংসাও কিছু নাই। কাজেই এই বিতর্কের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ার আমার কোন প্রয়োজনও নাই। আমাদের প্রশ্ন, ভূমির মূল অধিকারী কে, এ সম্বন্ধে নয়; ভূমি-স্বত্বাধিকারী কে, সেই প্রশ্নই আমাদের বিচার্য। কারণ, ভূমির মূল অধিকারী কে, এ প্রশ্ন লইয়া যত তর্কই থাকুক, তাহা জিজ্ঞাসু মনের অনুসন্ধান মাত্র, ঐতিহাসিক যুগে ইতিহাসের বাস্তব ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ না-ও থাকিতে পারে। ভূমি-স্বত্বের অধিকারী হইতেছেন কে, এ প্রশ্নের উত্তর পাইলেই ঐতিহাসিকের প্রয়োজন মিটিয়া যায়। যুক্তির দিক্ হইতে ভূমির মূল অধিকারী কে ছিলেন, তাহা জানিবার কৌতূহল স্বাভাবিক, কিন্তু মূল অধিকারী যিনি বা যাঁহারাই হউন, ইতিহাসের বাস্তব ক্ষেত্রে তিনি বা তাঁহারাই যে ভূমি-স্বত্বাধিকারী হইবেন, এমন না-ও হইতে পারে।

ভারতবর্ষে সমাজ-বিবর্তনের স্বাভাবিক ঐতিহাসিক নিয়মে অনুমান করা চলে, অতি প্রাচীন কালে লোকসংখ্যা যখন খুব বেশি ছিল না, এবং ভূমি ছিল প্রচুর, তখন ভূমির অধিকারী কে, এ প্রশ্ন উঠিবার কোনও অবকাশই ছিল না। লোকের যখন ভূমির প্রয়োজন হইত, তখন সে জঙ্গল কাটিয়া, মাটি ভরাট করিয়া নিজের প্রয়োজনমত ভূমি তৈয়ারি করিয়া লইত। পরের ভূমি লোভ করিবার প্রয়োজন হইত না, ভূমি লইয়া বিবাদেরও কোন অবকাশ হইত না; হইলেও গ্রামবাসীরাই পরামর্শ করিয়া তাহা মিটাইয়া ফেলিত। তারপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, কৃষিবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভূমির চাহিদা যতই বাড়িতে লাগিল, ভূমি লইয়া বিবাদ-বিসংবাদও ততই বাড়িবার দিকে চলিল। এদিকে রাজা ও

রাষ্ট্রযন্ত্রেরও একটা বিবর্তন ঘটিতে লাগিল; রাজা ও রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে সমাজ যন্ত্রের একটা ঘনিষ্ঠ যোগ প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ করিল। সমাজের রক্ষক ও পালক হইলেন রাজা; সে রাজা নররূপী দেবতাই হউন বা প্রকৃতিপুঞ্জ দ্বারা নির্বাচিতই হউন, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। শান্তিরক্ষার মূল দায়িত্ব তাঁহার, সমস্ত বিবাদ-বিসংবাদের মূল মীমাংসক তিনি, সকলের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের পাত্র তিনি, সকল ক্ষমতা, দায়িত্ব ও অধিকারের মূল উৎস তিনি। সমাজ-বিবর্তনের যে স্তরে এই নীতি স্বীকৃত হইল, সেই স্তরে এ কথাও সমাজের অন্তরে স্বীকৃত হইয়া গেল, ভূমির উপর অধিকারের উৎসও রাজা এবং তিনিই ভূমি-সম্পর্কিত বাদ-বিসংবাদের শেষ মীমাংসক। কিন্তু রাজা বা রাষ্ট্র তাই বলিয়া ভূমির মূল অধিকারী রূপে নিজেদের দাবি করিলেন না, কারণ, আদি প্রাচীন কালেও যেমন, এক্ষেত্রেও তেমনই, এ প্রশ্ন উঠিবার কোনও অবকাশই ছিল না। রাজা বা রাষ্ট্র ভূমির এবং ভূমি-সংলগ্ন প্রজার ধারক, রক্ষক ও পালক হিসাবে ধারণ, রক্ষণ ও পালনের পরিবর্তে শুধু ভূমিস্বত্বের অধিকারিত্বের দাবি করিলেন। কিন্তু এই বিবর্তনের প্রথমাবস্থায় স্বভাবতই এই দাবিও সর্বজনগ্রাহ্য ছিল না, কিংবা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারও এ সম্বন্ধে ছিল না। ভূমি তখনও খুব দুর্লভ নয়; তাহা ছাড়া গ্রামে গ্রামবাসীদের অনেকটা স্বরাজ্য তো ছিলই। যে পরিমাণ ভূমি ব্যক্তিগত ভাবে লোকেরা ভোগ করিত, তাহার পরিবর্তে গ্রামের সমাজযন্ত্রকে কিছু উপস্বত্ব দিতেই হইত, সেই সমাজযন্ত্র পরিচালনার জন্য; আর যে-সমস্ত ভূমি সমস্ত গ্রামবাসীদেরই প্রয়োজন হইত, যেমন পথ, ঘাট, গোবাট, গোচর ইত্যাদি, তাহা সমগ্র গ্রামেরই যৌথ সম্পত্তি বলিয়া সহজেই লোকেরা মনে করিতে পারিত। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও মূল অধিকারিত্বের কোন প্রশ্ন উঠিবার অবকাশ নাই। বাস্তব ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজিত হইত, তাহাই কালক্রমে প্রয়োগ-ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ হইয়া জনসাধারণ দ্বারা স্বীকৃত হইত। মূল অধিকারিত্বের দাবি যাহা কিছু হইয়াছে, তাহা পরবর্তী কালে রাষ্ট্রযন্ত্রের এবং সমাজযন্ত্রের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। আমাদের দেশে মোটামুটি ভাবে মৌর্যসম্রাটদের আমল হইতেই এই বিবর্তন দেখা দিয়াছিল। মৌর্য আমলেই ভারতবর্ষে একটা কেন্দ্রীকৃত কর্মচারিতন্ত্র শাসনব্যবস্থা গড়িয়া উঠে ক্ষমতাসম্পন্ন চক্রবর্তী সম্রাটদের চেষ্টায় ও প্রেরণায়, এবং সমাজযন্ত্রের সঙ্গে এই রাষ্ট্রযন্ত্রের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্বীকৃত হয়। ভারতবর্ষের সর্বত্রই একই সঙ্গে ইহা হইয়াছিল, তাহা অবশ্য বলা চলে না; তবে, এই বিবর্তন মৌর্য-আমলের পরে উত্তরভারতে সর্বত্রই স্তরে স্তরে ক্রমে ক্রমে দেখা দিতে আরম্ভ করে এবং ক্রমশ সর্বত্র স্বীকৃত হয়। সমাজযন্ত্রের মধ্যে রাষ্ট্রযন্ত্রের পক্ষবিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে এই চেতনা জনসাধারণকে অধিকার করিতে আরম্ভ করে যে, রাজা এবং রাষ্ট্রই সমাজ-ব্যবস্থার ধারক ও নিয়ামক। এই সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে ভূমি-ব্যবস্থা অন্যতম প্রধান উপকরণ। বিবর্তনের যে স্তরে স্বীকৃত হইল যে, রাজা এবং রাষ্ট্রই ভূমির উপর অধিকারের উৎস এবং তিনিই ভূমি-সম্পর্কিত বাদ-বিসংবাদের শেষ মীমাংসক, তাহার পর

হইতেই ক্রমশ ধীরে ধীরে এই চেতনা গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করিল যে, রাজা ও রাষ্ট্র শুধু ভূমি-ব্যবস্থার নিয়ামক নহেন, দেশের ভূসম্পত্তির মালিকও। ইহার অন্যতম কারণ বোধ হয়, সেচন-ব্যবস্থায় রাজার বা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। আমাদের দেশ নদী-মাতৃক হইলেও কৃষিকর্ম বহুল পরিমাণে বারিনির্ভর। এই যে লিপিগুলিতে প্রচুর খাটা, খাড়িকা, খাল ইত্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশ ভূমির উর্বরতা বিধানের জন্য রাষ্ট্রকর্তৃক খনিত, এ অনুমান বোধ হয় করা চলে। তাহা ছাড়া এই প্লাবনের দেশে বাঁধ, আলি ইত্যাদির বিস্তৃত উল্লেখও রাষ্ট্র-সহায়তার দিকেই ইঙ্গিত করে বলিয়া মনে হয়। রাজারা যে এই সেচন-ব্যবস্থার দায়িত্ব পালন করিতেন, তাহার দুই একটি প্রমাণও আছে; যেমন, বাণগড়-লিপিতে রাজ্যপাল সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, তিনি অনেক বড় বড় দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন; "রামচরিতে" রামপাল সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, তিনি নানাপ্রকার জনহিতকর পূর্তকার্য করিয়াছিলেন, খুব বড় বড় পুষ্করিণী খনন করাইয়া দুই ধারে তালগাছ লাগাইয়া পাহাড়ের মতন উঁচু করিয়া বাঁধাইয়া দিয়াছিলেন, দেখিলে মনে হইত, বুঝিবা সমুদ্র।

"স বিশালশৈলমালাতালবন্ধসম্বুধিং সাক্ষাৎ।
অপি পূর্তং পুষ্করিণীভূতং রচয়ম্বভূব ভূপালঃ॥ (৩।৫২)

পালরাজাদের লিপিমালায় রাজা বা রাষ্ট্র কর্তৃক খনিত বহু দীর্ঘির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই ধরনের সুদীর্ঘ বিশালকায় হ্রদোপম পুকুরের চিহ্ন বাঁকুড়া, বীরভূম অঞ্চলে, ত্রিপুরা জেলায়, উত্তর-বঙ্গের প্রায় প্রত্যেক জেলায় এখনও প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। এইসব পুকুরের জল যে চাষ-আবাদের কাজেই ব্যবহৃত হইত, এবং রাজকীয় অথবা রাষ্ট্রের সাহায্যেই যে এগুলি খনিত হইত, সে স্মৃতি উত্তর-রাঢ়ে এবং বরেন্দ্রভূমিতে এখনও বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। ধোয়ী কবির "পবনদূত" কাব্যে দেখিতেছি, সেনরাজ বল্লাল-সেনদেব সুহ্মদেশের কেন্দ্রস্থল গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী সংগমে কোথাও একটি সুবৃহৎ বাঁধ নির্মাণ করাইয়াছিলেন; বাঁধটি তাঁহারই নামের সঙ্গে জড়িত ছিল, এই ইঙ্গিত দিতেও কবি বিস্মৃত হন নাই। যাহাই হউক, মৌর্যযুগের ও পরবর্তী কালের অর্থশাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্র-রচয়িতারাও রাজা ও রাষ্ট্রই যে ভূসম্পত্তির মালিক তাহা প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। কিন্তু এক সময় সমাজই যে ভূমি-ব্যবস্থার নিয়ামক ছিল, সে স্মৃতিও একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল না; থাকিয়া থাকিয়া সে স্মৃতি স্মৃতিশাস্ত্রের পাতায়, টীকাকারের ব্যাখ্যায়, প্রচলিত ব্যবহারের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারিতে লাগিল। সাধারণ ভাবে এই কথা কয়টি মনের পটভূমিতে রাখিয়া, আমাদের প্রাচীন বাঙলার লিপিগুলি বিশ্লেষণ করিয়া, তাহাদের সাক্ষ্য-প্রমাণ কী, দেখা যাইতে পারে।

গুপ্ত আমলের যে কয়টি লিপি বাঙলাদেশে পাওয়া গিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিতেই দেখিতেছি, ভূমি-বিক্রেতা হইতেছেন রাজা বা রাষ্ট্র, এবং বিক্রীত ভূমি ধর্মাচরণোদ্দেশে

দত্ত হইতেছে বলিয়া রাজা দানপুণ্যের এক ষষ্ঠ ভাগের অধিকারীও হইতেছেন। বস্তুত প্রত্যেকটি লিপিতেই ভূমি-বিক্রয়ের আবেদন জানান হইতেছে রাজা বা রাষ্ট্রযন্ত্রকে; দু-এক ক্ষেত্রে রাজা কর্তৃক বিক্রীত ভূমি দানও করিতেছেন রাজা স্বয়ং, ক্রেতার পক্ষ হইতে। তাহা ছাড়া রাজা অনুরুদ্ধ হইয়া অথবা আত্মপ্রেরণায় নিজেও ভূমি দান করিতেন। এই লিপিগুলি ভাল করিয়া বিশ্লেষণ করিলে স্বতই মনে হয়, রাজা বা রাষ্ট্র শুধু ভূমি-স্বত্বেরই অধিকারী নহেন, ভূমির মূল অধিকারীও। এই স্বত্বাধিকারতত্ত্ব বাঙলাদেশে বোধহয় গুপ্ত-আমলের পূর্বেই নির্ধারিত ও স্বীকৃত হইয়া গিয়াছিল, এবং আমরা যে যুগের লিপিগুলির কথা বলিতেছি, সে যুগে এ সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন আর ছিল না। তবে, তিনি অধিকারী ছিলেন বলিয়াই ভূমি দান-বিক্রয়ে যথেচ্ছাচরণ করিতে পারিতেন না, দেখিতে হইত, প্রস্তাবিত ভূমি দত্ত বা বিক্রীত হইলে গ্রামবাসীদের কৃষি ও অন্যান্য কর্মের কোনও অসুবিধা হইবে কি না, অন্য কাহারও ভূমিস্বত্ব আহত হইবে কি না। শুধু রাজা অথবা রাষ্ট্রই যে দেখিতেন, তাহা নয়, গ্রামের প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা, কখনো কখনো সাধারণ ব্যক্তিরাও তাহা দেখিতেন। লিপিগুলিতে যে বার বার ভূমিদান-বিক্রয় স্থানীয় মহত্তর, কুটুম্ব, প্রতিবাসী এবং প্রাকৃতজনকে বিজ্ঞাপিত করা হইতেছে, তাহা প্রধানত এই উদ্দেশ্যেই। বহু ক্ষেত্রে ইঁহারাই ভূমি অন্য ভূমি হইতে পৃথক্ করিয়া সীমা নির্দেশ করিয়া দিতেন। প্রশ্ন উঠিতে পারে, যে-সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ লিপিগুলিতে পাইতেছি, সে-সমস্ত ভূমিই রাজার অথবা রাষ্ট্রের নিজস্ব ভূ-সম্পত্তি অর্থাৎ খাসমহল, এবং সে খাসমহল দান-বিক্রয়ের অধিকার রাজা বা রাষ্ট্রেরই হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কী? এ প্রশ্নের সুযোগ হয়তো আছে, কিন্তু যখন দেখা যায়, সর্বত্রই সকল লিপিতেই রাজা হইতেছেন বিক্রেতা বা দাতা, তখন এই অনুমানই মনকে অধিকার করে যে, রাজ্যের সকল ভূমিরই স্বত্বাধিকারী এবং মূল মালিক, দুই-ই ছিলেন রাজা বা রাষ্ট্র। তাহা ছাড়া, লিপিগুলিতে এমন একটি দৃষ্টান্তও পাইতেছি না; যেখানে রাজা বা রাষ্ট্র মূল অধিকারিত্ব ছাড়িয়া দিতেছেন; যাহা পাইতেছি, তাহা তাঁহার স্বত্বাধিকার। ভূমি যখন শুধু বিক্রয় করিতেছেন, তখন স্বত্বাধিকারের দাবি বজায় রাখিতেছেন কর গ্রহণের ভিতর দিয়া; আর যখন শুধু বিক্রয় নয়, সঙ্গে সঙ্গে ভূমি নিষ্কর করিয়া দান করিয়া দিতেছেন, তখন সেখানে স্বত্বাধিকারিত্বের দাবিও ছাড়িয়া দিতেছেন, কিন্তু সেখানেও তাহার মূল অধিকারিত্ব চলিয়া যাইতেছে না। আমার এই মন্তব্যগুলির সুস্পষ্ট সবিশেষ প্রমাণ অষ্টমশতকপূর্ব বাঙলার অন্তত দুই-তিনটি লিপিতে পাওয়া যাইবে। ফরিদপুর জেলায় প্রাপ্ত গোপচন্দ্রের পট্টোলীতে খবর পাওয়া যায় যে, বৎসপাল স্বামী নামে এক ব্রাহ্মণ এক কুল্যবাপ ভূমি ক্রয় করিয়াছিলেন। লিপিটির অনেক স্থান অবলুপ্ত হইয়া যাওয়ায় পাঠ নিঃসন্দেহ নয়; কিন্তু যাহা আছে, তাহাতে নিঃসংশয়ে বুঝা যায়, যে এক কুল্যবাপ ভূমি বৎসপাল স্বামী কিনিয়াছিলেন তাহা মহাকোট্টিক⋯নামীয় কোন ব্যক্তির বা একাধিক ব্যক্তির

ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল, কিন্তু এই ব্যক্তিগত সম্পত্তি ক্রয়ের এবং দানের আবেদনও জানাইতে হইয়াছিল স্থানীয় রাষ্ট্র-প্রতিনিধি এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের নায়কদের। রাজা বা রাষ্ট্র যে ভূমির মূল অধিকারী বলিয়া স্বীকৃত হইতেন, এ সম্বন্ধে তাহা হইলে আর কোন সন্দেহ রহিল না। সঙ্গে সঙ্গে আমরা ইহাও জানিলাম যে ভূসম্পত্তির ব্যক্তিগত অধিকারও ছিল; কিন্তু সে অধিকার রাষ্ট্রের সুনির্দিষ্ট নিয়ম দ্বারা শাসিত ছিল। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল বলিয়াই কোনো ব্যক্তি যে-কোনা শর্তে যে-কোনো ক্রেতার কাছে ভূমি বিক্রয় করিতে পারিতেন না, কিংবা দানও করিতে পারিতেন না। এই বিক্রয় অথবা দানকর্মের প্রয়োজন হইলে প্রস্তাবিত ক্রেতা বা দানগ্রহীতা রাষ্ট্রের কাছে অর্থাৎ রাষ্ট্রের স্থানীয় অধিকরণ ও প্রধান প্রধান লোকদের কাছে আবেদন করিতেন, এবং তাঁহারাই বিক্রয় ও দানের ব্যবস্থা করিতেন। বস্তুত, কোনো গ্রামে কোনো ক্রেতা বা দানগ্রহীতা ব্যক্তির নবাগমন গ্রামবাসীদের অগোচরে হইতে পারে না; এ ব্যাপারে রাষ্ট্র অপেক্ষা গ্রামের সমষ্টিগত স্বার্থই অধিকতর বিবেচ্য। এই কারণেই সর্বত্র এই দান-বিক্রয়ের ব্যাপার গ্রামবাসীদের গোচরে ও সাক্ষাতে হওয়াই প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। দেবখড়্গের আস্রফপুর-পট্টোলীতেও আমার পূর্বোক্ত মন্তব্যগুলির প্রমাণ পাওয়া যাইবে। রাজা দেবখড়্গ বৌদ্ধ আচার্য সংঘমিত্রের বিহারে প্রথম দফায় ৯ পাটক ১০ দ্রোণ ভূমি দান করিয়াছিলেন, এবং দ্বিতীয় দফায় দান করিয়াছিলেন ৬ পাটক ১০ দ্রোণ। এই ভূমির অধিকাংশই ছিল ব্যক্তিগত অধিকারে, এবং দানের পূর্বাহ্ণ পর্যন্ত বিভিন্ন লোকেরা নিজেদের সম্পত্তি ভোগ করিতেছিলেন।

১।	২ পাটক	...	ভোগ করিতেছিলেন রাজমহিষী শ্রীপ্রভাবতী।
২।	$\frac{১}{২}$ (?) „	...	„ „ শুভংসুকা নামে এক মহিলা।
৩।	১$\frac{১}{২}$ „	...	মিত্রাবলি নামক জনৈক ব্যক্তির ভূমি, কিন্তু ভোগ করিতেছিলেন সামন্ত বর্ণাটিয়োক নামক এক ব্যক্তি।
৪।	১ „	...	ভোগ করিতেছিলেন শ্রীনেত্রভট।
৫।	১ „	...	ভোগ করিতেছিলেন শর্বান্তর নামক এক ব্যক্তি, কিন্তু চাষ করিতেছিলেন মহত্তর, শিখর প্রভৃতি কর্ষকেরা (শ্রীশর্বান্তরেণ ভুজ্যমানক মহত্তরশিখরাদিভিঃ কৃষ্যমান-[কঃ])।
৬।	১ „	...	ভোগ করিতেছিলেন বন্দ্য জ্ঞানমতি।
৭।	১ „	...	দ্রোণমথিকা নামক জনৈক ব্যক্তির ভূমি।
৮।	$\frac{১}{২}$ „	...	ভোগ করিতেছিলেন শর্বুক নামক ব্যক্তি। (ইঁহার এক পাটক ভূমির সবটুকু রাজা গ্রহণ করেন নাই; যে অর্ধপাটকে দুইটি সুপারিবাগান ছিল, সেইটুকু শুধু লইয়া দান করিয়াছিলেন)।

৯। ২০ দ্রোণবাপ অর্থাৎ ½ পাটক—আগে ছিল উপাসক নামক জনৈক ব্যক্তির, অধুনা ভোগ করিতেছিলেন স্বস্তিয়োক নামীয় জনৈক গৃহস্থ (অর্ধপাটক উপাসকেন ভুক্তকাধুনা স্বস্তিয়োকেন ভুজ্যমানক)।

১০। ২৭ দ্রোণবাপ ... ভোগ করিতেছিলেন সুলক্ষ এবং অন্যান্য ব্যক্তিরা।

১১। ১৩ " ... চাষ করিতেছিলেন রাজদাস এবং দুর্গগট নামক দুই ব্যক্তি।

১২। ১ পাটক ... [এক সময়ে] বৃহৎপরমেশ্বর নামক জনৈক ব্যক্তি দান দান করিয়াছিলেন, কিন্তু কাহাকে এবং কী উদ্দেশ্যে দান করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ নাই।

১৩। ১ " ... [এক সময়ে] শ্রীউদীর্ণখড়্গ দান করিয়াছিলেন এবং অধুনা ভোগ করিতেছিলেন শত্রুক নামক জনৈক ব্যক্তি। এই শত্রুক এবং পূর্বোক্ত ৮ নম্বরের শত্রুক যে একই ব্যক্তি, এই অনুমান সহজেই করা যাইতে পারে।

এই সুদীর্ঘ ও সুবিস্তৃত সাক্ষ্য-প্রমাণ হইতে ভূমি ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রয়োজনীয় তথ্য জানা যাইতেছে। একটি একটি করিয়া তাহা উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথমত, রাজা যে-কোনও ব্যক্তিগত সম্পত্তি তাঁহার ইচ্ছামত এবং প্রয়োজনমত কাড়িয়া লইতে পারিতেন। ২নং পট্টোলীটিতে পরিষ্কার বলা হইয়াছে, ৬ পাটক ১০ দ্রোণ ভূমি ব্যক্তিগত অধিকার হইতে কাড়িয়া লইয়া (যথাভুজ্যমানাদপনীয়) সংঘমিত্রের বিহারে দেওয়া হইতেছে। ইহার পরিবর্তে, অধিকারী ব্যক্তিদের যথোচিত মূল্য বা ক্ষতিপূরণ কিছু দেওয়া হইয়াছিল কি না, তাহার উল্লেখ লিপিতে নাই; হইলে তাহার উল্লেখ থাকাটাই বোধ হয় স্বাভাবিক ছিল। রাজা বা রাষ্ট্র যদি ভূমির মূল অধিকারী না হইতেন তাহা হইলে এই জাতীয় অধিকারের প্রয়োগ তিনি কিছুতেই করিতে পারিতেন না। দ্বিতীয়ত, মহিলারাও ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভোগ করিতে পারিতেন (১ ও ২)। তৃতীয়ত, মধ্যস্বত্বাধিকারীর নীচে নিম্নাধিকারী প্রজার একটি স্তর ছিল (৩ ও ৫)। ইঁহাদের অধিকারের স্বরূপ কী ছিল, বলা কঠিন। ৩ নম্বরের মিত্রবলি ভূমিস্বত্বাধিকারী ছিলেন বুঝা যাইতেছে, কিন্তু ভূমির উপস্বত্ব বোধ হয় ভোগ করিতেছিলেন বর্ণটিয়োক। নিম্নপ্রজারূপে এ-সম্পর্কে তাঁহার কী কী দায় ও মিত্রবলিকে কী কী দেয় ছিল, তাহা অনুমান হয়তো করা যাইতে পারে, কিন্তু নিশ্চিতভাবে বলিবার কোনো উপায় নাই। ৫ নম্বরের শর্বান্তর ভূমিস্বত্বাধিকারী ছিলেন, ইহা তো পরিষ্কার, কিন্তু মহত্তর, শিখর প্রভৃতি কৃষক, যাঁহারা শর্বান্তরের এক পাটক ভূমি চাষ করিতেন, তাঁহাদের দায় ও অধিকার কী ছিল? ইঁহারা কি বর্তমান কালের ভাগচাষীদের মতন ছিলেন, না কোন প্রকার করের বিনিময়ে চাষবাস করিতেন? তবে, এইটুকু বুঝা

যাইতেছে, মহত্তর, শিখর প্রভৃতি কৃষকদের সেই এক পাটক ভূমির উপর কোনো অধিকার ছিল না। চতুর্থত, ব্যক্তিগত অধিকারের ভূমি হস্তান্তরিত হইত, দানেই হউক আর বিক্রয়েই হউক (৯, ১২ ও ১৩)। এই হস্তান্তরের জন্য রাষ্ট্রের অনুমোদন প্রয়োজন হইত কি না, বলিবার উপায় এক্ষেত্রে নাই ; তবে পূর্বোক্ত গোপচন্দ্রের পট্টোলীর সাক্ষ্য যদি এ-ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্রানুমোদন ছাড়া এই ধরনের হস্তান্তর সম্ভব ছিল না। পঞ্চমত, একাধিক (দুই বা ততোধিক) ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে একই ভূখণ্ডের অধিকারী হইতে পারিতেন (১০ ও ১১)।

অষ্টমশতকপরবর্তী পাল ও সেন আমলের লিপিগুলি এইবার বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে। আগেই বলিয়াছি, পাল-আমলের প্রায় সব লিপিই সমগ্র গ্রামদানের পট্টোলী, সেন-আমলেরও কয়েকটি পট্টোলী তাহাই। এই গ্রামগুলির সমস্তই রাষ্ট্রের 'খাসমহল' ছিল, এ অনুমান খুব স্বাভাবিক নয় ; বরং ভূমির মূল অধিকারী হিসাবে রাষ্ট্র, রাজ্যের যে-কোনো ভূমি, তাহা গ্রাম বা যে-কোনো ভূমিখণ্ড বা জনপদখণ্ডই হোক, দান-বিক্রয় করিতে পারিতেন, এই মন্তব্যই যুক্তিসংগত, এবং দান যখন করিতেছেন, তখন সেই গ্রামবাসী ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত ভূসম্পত্তি যাহা আছে তাহা সমেতই দান করিতেছেন ; ইহার পর রাজা বা রাষ্ট্রকে যাহা কিছু দেয়, ব্যক্তিগত ভূসম্পত্তির অধিকারীরা তাহা দানগ্রহীতাকে দিবেন, রাষ্ট্রকে আর নয়। কিন্তু এই যে রাজা ইচ্ছা ও প্রয়োজনমত ব্যক্তিগত ভূসম্পত্তিও দান করিয়া দিতেছেন, ইহাও রাষ্ট্রের মূল অধিকারিত্বের দিকেই ইঙ্গিত করে। ভূমির অধিকার ইত্যাদি সম্বন্ধে এ-পর্যন্ত যাহা বলা হইয়াছে, সেন-আমলের লিপিগুলিও তাহাই সমর্থন করে। বিশ্বরূপসেনের সাহিত্য-পরিষৎলিপিতে এক সঙ্গে এই জাতীয় অনেক তথ্য পাওয়া যায় ; সেই হেতু এই লিপিটিই একটু বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে। রাজা বিশ্বরূপসেন জনৈক আবল্লিক পণ্ডিত হলায়ুধ শর্মাকে ১১টি ভূখণ্ডে সর্বসুদ্ধ ৩৩৬½ উন্মান ভূমি দান করিয়াছিলেন ; এই ভূখণ্ড কয়টি হলায়ুধ শর্মা কর্তৃক নানা উপায়ে সংগৃহীত হইয়াছিল।

১। দুইটি ভূখণ্ডে ৬৭½ উন্মান ভূমি উত্তরায়ণ সংক্রান্তি উপলক্ষে [রাজা ?] হলায়ুধকে দান করিয়াছিলেন।

২। ১৬৫ উন্মান ভূমি পূর্বে কোনও সময়ে হলায়ুধ কিনিয়াছিলেন। কাহার নিকট হইতে কিনিয়াছিলেন বলা হয় নাই, তবে ব্যক্তিগত ভূম্যধিকারীর নিকট হইতেই কিনিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা যায়। পরে এই ১৬৫ উন্মান, এবং অন্য দুইটি ভূখণ্ডে ৫০ উন্মান হলায়ুধ শর্মা চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে রাজ-মাতার নিকট হইতে দান গ্রহণ করিয়াছিলেন।

৩। দুইটি ভূখণ্ডে ৩৫ উন্মান পূর্বে কোনও সময়ে হলায়ুধ কিনিয়াছিলেন ; পরে

কুমার সূর্যসেন এই ভূমিখণ্ড দুইটি জন্মদিন উপলক্ষে হলায়ুধকে দান করিয়াছিলেন।

৪। দুইটি ভূখণ্ডে ৭ উন্মান পূর্বে কোনও সময়ে হলায়ুধ কিনিয়াছিলেন ; পরে সান্ধিবিগ্রহিক নাঞ্ৰীসিংহ সেই ভূখণ্ড দুইটি হলায়ুধকে দান করিয়াছিলেন।

৫। ১২¾ উন্মান হলায়ুধ শর্মা রাজপণ্ডিত মহেশ্বরের নিকট হইতে কিনিয়াছিলেন।

৬। ২৪ উন্মান কুমার পুরুষোত্তমসেন উত্থানদ্বাদশী তিথি উপলক্ষে হলায়ুধকে দান করিয়াছিলেন।

পূর্বোক্ত বিশ্লেষণ হইতে কয়েকটি প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যাইতেছে। প্রথমত, ক্রীত ভূমি পরে কাহারও নিকট হইতে দানস্বরূপ গ্রহণ করা যাইত (২, ৩, ৪)। কী উপায়ে তাহা করা হইত লিপিতে বলা হয় নাই, তবে অনুমান হয়, হলায়ুধ কোনো সময়ে মূল্য দিয়া ভূমি কিনিয়াছিলেন, পরে দাতা ক্রীত ভূমির মূল্য হলায়ুধকে অর্পণ করিয়াছিলেন, এবং হলায়ুধ ক্রীত ভূমি দানস্বরূপ স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। দ্বিতীয়ত, এইসব ভূমি ব্যক্তিগত অধিকারেই ছিল, এবং ব্যক্তিগত অধিকারের বলেই বিক্রীতও হইয়াছিল (২, ৩, ৪, ৫)। তৃতীয়ত, ভূমির ব্যক্তিগত অধিকারীরা ভূমি দানও করিতে পারিতেন এবং করিতেনও (২, ৩, ৪, ৫, ৬)। কিন্তু এই দান রাজা যে অর্থে ভূমি দান করেন, সেই অর্থে নয় ; নিষ্কর করিয়া দিবার ক্ষমতা এই ব্যক্তিগত অধিকারীদের নাই, ইঁহারা শুধু ভূমির মধ্যস্বত্বাধিকার অর্থাৎ তাঁহাদের ব্যক্তিগত অধিকার দান করেন, রাজার স্বত্বাধিকার অর্থাৎ করগ্রহণের অধিকার দান করিবার ক্ষমতা ইঁহাদের ছিল না। সেই জন্যই হলায়ুধ যখন সমগ্র ৩০৬½ উন্মান ভূমিই নিষ্কর ভাবে, কোন দায় ঘাড়ে না লইয়া ভোগ করিতে চাহিলেন, তখন রাজার শরণাপন্ন হইলেন এবং রাজাও তাঁহাকে নিষ্কর করিয়া দিয়া সমস্ত ভূমি দান করিলেন, অর্থাৎ, হলায়ুধ শুধু তখনই রাজার ভূমি-স্বত্বাধিকার লাভ করিলেন। এখানেও রাজা যে তাঁহার মূল অধিকার ছাড়িয়া দিলেন, এ কথা বলা যায় না। লক্ষ্মণসেনের শক্তিপুর শাসনে দেখিতেছি, সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে স্নান করিয়া রাজা ব্রাহ্মণ কুবেরকে ৮৯ দ্রোণ ভূমি দান করিয়াছিলেন ; এই সমুদয় জমির আয় ছিল ৫০০ কপর্দক পুরাণ। এই দান করা হইয়াছিল ক্ষেত্রপাটকের বিনিময়ে ; কারণ শেষোক্ত গ্রামটি পিতা বল্লালসেন কর্তৃক জনৈক ব্রাহ্মণ হরিদাসকে দান করা হইয়াছিল। কিন্তু ভুল ধরা পড়িলে রাজা তাহা কোষস্থ অর্থাৎ বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন, এবং তৎপরিবর্তে কুবেরকে উক্ত গ্রাম দান করিয়াছিলেন। লক্ষণীয় এই যে, ভুল ধরা পড়িলে রাজা দত্তভূমি রাজকোষে বাজেয়াপ্ত করিতেন। এ-ক্ষেত্রেও ভূমির মূল অধিকার যে রাজার তাহাই যেন ইঙ্গিত।

পাল-আমলের শাসনগুলিতে দেখা যাইতেছে, প্রস্তাবিত ভূমিদানের সময় রাজা

স্থানীয় প্রধান প্রধান লোকদের কুটুম্ব, প্রতিবাসী, এক কথায় প্রকৃতিপুঞ্জকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "মতমস্তু ভবতাম্" [আমি এই ভূমি দান করিতেছি], আপনাদের সকলের অনুমোদন হউক। কেহ কেহ মনে করেন, গ্রামগোষ্ঠী ভূমির মালিক ছিলেন বলিয়া রাজাকে এই ধরনের অনুমতি লইতে হইত। এ অনুমান কিছুতেই সত্য হইতে পারে না। গ্রামগোষ্ঠী ভূমির মালিক হইলে রাজা সেই ভূমি ক্রয় না করিয়া দান কী ভাবে করিতে পারেন? তবে, এ যুক্তি হয়তো কতকটা সার্থক যে, এই "মতমস্তু ভবতাম্" প্রাচীন গোষ্ঠী-অধিকারের সুদূর স্মৃতি বহন করিতেছে; কিন্তু তাহাও সম্পূর্ণ সার্থক বলিয়া মনে হয় না, যখন দেখা যায়, পরবর্তী কালের শাসনগুলিতে একই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, "বিদিতমস্তু ভবতাম্", 'আপনারা বিজ্ঞাপিত হউন', অর্থাৎ ভূমি-দানের ব্যাপারটি গ্রামবাসীদের বিজ্ঞাপিত করা হইতেছে মাত্র। এই বিজ্ঞাপন করা কেন প্রয়োজন হইত, তাহা তো আগেই সবিস্তারে উল্লেখ করা হইয়াছে। আসল কথা, "মতমস্তু ভবতাম্' এবং "বিদিতমস্তু ভবতাম্" এই দুইয়ের মধ্যে বিশেষ কিছু পার্থক্য ছিল বলিয়া মনে করিবার কোনো কারণ নাই। সেন-আমলে বিজ্ঞাপিত করিবার প্রয়োজনে যে-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে "বিদিতমস্তু", পাল-আমলে সেই প্রসঙ্গেই সৌজন্য প্রকাশ করিয়া বলা হইত "মতমস্তু"।

১০

ভূমি-সংক্রান্ত কয়েকটি সাধারণ মন্তব্য

ভূমির চাহিদা সমাজে ক্রমশ কি করিয়া বাড়িয়াছে তাহার কিছু কিছু সাক্ষ্যপ্রমাণ আগেই উল্লেখ করিয়াছি; এই চাহিদা বৃদ্ধির ইঙ্গিত বাস্তু, ক্ষেত্র, খিল সর্বপ্রকার ভূমি সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। খুব প্রাচীন কালে কি হইয়াছিল, বলা কঠিন; কিন্তু অনুমান করা কঠিন নয় যে, লোকবসতি এবং কৃষিকর্ম সাধারণত নদ-নদীপ্রবাহ অনুসরণ করিয়াই বিস্তৃত ছিল। কৃষিকর্মের উপরই জনসাধারণের জীবিকা নির্ভর করিত, এবং সেই কৃষির প্রধান নির্ভরই ছিল নদনদী। যাহারা এদেশে লাঙ্গল প্রবর্তন করিয়াছিল, ধানকে লোকালয়ের কৃষিবস্তু করিয়াছিল, কলা, বেগুন, পান, হরিদ্রা, লাউ, সুপারি, নারিকেল, তেঁতুল প্রভৃতির সঙ্গে দেশের পরিচয় ঘটাইয়াছিল, সেই আদি-অস্ট্রেলিয় বা অস্ট্রিক্-ভাষাভাষী লোকেদের সময়ই এই অবস্থা কল্পনা করা কঠিন নয়। নদনদী-অনুসারী বসতি ও কৃষিক্ষেত্রের পরই বোধ হয় ছিল হয় বনভূমি বা উষর পার্বত্যভূমি, অথবা নিম্ন হাজক জলাভূমি এবং সেই হেতু খিল বা 'পতিত'। লোকবসতি এবং কৃষি বিস্তার কখন কি গতিতে অগ্রসর হইয়াছে, বলিবার মত প্রমাণ নাই; দেশের সর্বত্র সকল সময়ে একই ভাবে হইয়াছে তাহাও বলা যায় না। শাসন ও বাণিজ্যকেন্দ্র যে-সব জায়গায় গড়িয়া

উঠিয়াছে, সেইখানে লোকবসতি এবং কৃষিক্ষেত্রের বিস্তারও অন্যান্য স্থান অপেক্ষা বেশি হইয়াছে, এরূপ অনুমান করা কঠিন নয়। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইতে আর্যভাষাভাষী লোকেদের এই দেশে বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে ভূমির চাহিদাও ক্রমশ বাড়িয়া গিয়াছে, ইহাও খুব স্বাভাবিক।

এই লোকবসতি ও কৃষিবিস্তারের প্রথম নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া যায় পঞ্চম শতক হইতে; ভূমি সম্পর্কিত কোনও সাক্ষ্য ইহার আগে আর উপস্থিত নাই। লক্ষণীয় এই যে, পঞ্চম হইতে সপ্তম অষ্টম শতক পর্যন্ত যতগুলি ভূমিদান-বিক্রয়ের পট্টোলী আছে, তাহার অধিকাংশ দত্ত এবং বিক্রীত ভূমি 'অপ্রদ' অর্থাৎ যাহা তখনও পর্যন্ত দেওয়া হয় নাই, বিলি বন্দোবস্ত হয় নাই, 'অপ্রহত', অর্থাৎ যাহা তখনও পর্যন্ত কর্ষিত হয় নাই এবং 'খিল', অর্থাৎ যাহা তখনও পর্যন্ত 'পতিত' পড়িয়া আছে। ১নং দামোদরপুর পট্টোলীর ভূমি "অপ্রদাপ্রহতখিল ক্ষেত্র"; ৩নং দামোদরপুর পট্টোলীর ভূমি "অপ্রদখিলক্ষেত্র"; বৈগ্রাম পট্টোলীর ভূমিও পতিত পড়িয়াছিল, রাজার কোন আয় তাহা হইত না; গুণাইঘর পট্টোলীর ভূমি একেবারে "শূন্যপ্রতিকরহজ্জিকখিলভূমি", রাজার কোন আয়বিহীন হাজা পতিত জমি; সমাচারদেবের ঘুগ্রাহাটি পট্টোলীর ভূমিও গর্তপরিপূর্ণ বন্যপশুর আবাসস্থল এবং সেই হেতু রাষ্ট্রের দিক হইতে নিষ্ফল হইয়া পড়িয়া ছিল। ৫ নং দামোদরপুর পট্টোলীর ভূমি তো একেবারে অরণ্যময় প্রদেশে; আর ত্রিপুরা লোকনাথ পট্টোলীর ভূমিও হরিণ-মহিষ-ব্যাঘ্র-বরাহ-সর্প অধ্যুষিত এক অরণ্যের মধ্যে। নূতন নূতন বাস্তু ও ক্ষেত্র-ভূমি যেমন সৃষ্ট ও পত্তন হইতেছে, তেমনই পুরাতন ব্যবহৃত ভূমির উপরও নূতন চাপ পড়িতেছে, এরকম দৃষ্টান্তও দু' একটি এই যুগের লিপিগুলিতে পাওয়া যায়। আস্রফপুর পট্টোলীতে দেখিতেছি, ভোগ করিতেছে এমন লোকের নিকট হইতে ভূমি কাড়িয়া লইয়া (যথা-ভুজ্যমানাদপনীয়) অন্যত্র দান করা হইতেছে। ভূমির চাহিদাবৃদ্ধির ইহাও অন্যতম প্রমাণ।

পাল ও সেন আমলের লিপিগুলি সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। গ্রামগুলির যে আভাস লিপিগুলিতে পাওয়া যায়, ধান্যশস্যের যে ইঙ্গিত ইহাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন এবং "রামচরিতে" সুস্পষ্ট, সুপারি-নারিকেল হইতেই ভূমির আয়ের পরিমাণের যে-আভাস পাওয়া যায়, তাহাতে কোনো সন্দেহ থাকে না যে, এই আমলে লোক বসতি ও কৃষির বিস্তার বেশ বাড়িয়া গিয়াছে। লোক সংখ্যার বৃদ্ধি, রাজা, রাজপরিবার এবং সমৃদ্ধ লোকদের ভূমিদান করিয়া পুণ্যলাভের ইচ্ছা, ব্রাহ্মণপুরোহিতদের ভূমি সংগ্রহের লোভ প্রভৃতির প্রেরণায়ই দেশে ক্রমশ বসতি ও কৃষির বিস্তার হইয়াছে, লিপিমালা ও সমসাময়িক সাহিত্যের ইহাই ইঙ্গিত।

"শাসন" ও "অগ্রহার" অর্থাৎ দত্তভূমি যাঁহারা ভোগ করিতেন তাঁহারা ভূমিদানের সঙ্গে সঙ্গে ভূমি-সম্পর্কিত অন্যান্য কতগুলি অধিকারও রাজা বা রাষ্ট্রের নিকট হইতে লাভ

করিতেন ; এই সব অধিকারের কিছু কিছু বিবরণ আগেই উল্লেখ করিয়াছি। সাধারণ প্রজাদের কি কি দায় ও অধিকার ছিল, তাহার কিছু কিছু আভাসও তাহা হইতেই পাওয়া যায়। ভাগ, ভোগ, কর, হিরণ্য এই চারি প্রকার কর তো তাহাদের দিতেই হইত। উপরিকর নামেও একপ্রকার রাজস্ব দিতে হইত। দশ রকম অপরাধের কোনো অপরাধে অপরাধী হইলে জরিমানা দিতে হইত। হাটবাজার, খেয়াঘাট ইত্যাদির জন্যও কর ছিল। চোরডাকাত হইতে রক্ষণাবেক্ষণের ভার রাষ্ট্র লইত বলিয়া সেজন্যও একটা কর নির্দিষ্ট ছিল। এইগুলি নিয়মিত কর। তাহা ছাড়া, সময় সময় কোনও বিশেষ উপলক্ষেও রাজাকে বা রাষ্ট্রকে অন্যপ্রকারে কর দিতে হইত ; লিপিতে এগুলিকে বলা হইয়াছে 'পীড়া'। পীড়া যে এ-সম্বন্ধে সন্দেহ নাই ! ছোট বড় নানাস্তরের নানা রাজপুরুষেরা বিচিত্র কার্যোপলক্ষ্যে গ্রামে অস্থায়ী ছত্রবাস স্থাপন করিয়া বাস করিতেন ; মনে হয়, তখন গ্রামবাসীদেরই তাহাদের আহার্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা করিতে হইত। সমসাময়িক কামরূপের লিপিতে তো এগুলিকে উপদ্রবই বলা হইয়াছে। চাটভাটেরাও গ্রামে প্রবেশ করিয়া নানাপ্রকার উৎপাত উপদ্রব করিত। রাজপুত্রের জন্ম, রাজকন্যার বিবাহ প্রভৃতি উপলক্ষে রাজাকে প্রজার কিছু দেয় তো চিরাচরিত বিধি। বাঙলা দেশেও যে তাহার ব্যতিক্রম ছিল মনে হয় না। রাজা বা রাষ্ট্র যে ইচ্ছা করিলে বা প্রয়োজন হইলে প্রজার উচ্ছেদ সাধন করিতে পারিতেন এ-সম্বন্ধে তো লিপি-প্রমাণ আগেই উল্লেখ করিয়াছি। ভূমিতে অধিকারবিহীন চাষী প্রজাও যে ছিল, সে-প্রমাণও বিদ্যমান। রাষ্ট্রে ও সমাজে ভূমির ব্যক্তিগত অধিকার স্বীকৃত হইত, ব্যক্তিগত অধিকারের ভূমি হস্তান্তরিত হইত, ভূমির ব্যক্তিগত যৌথ অধিকার (এজমালি স্বত্ব) স্বীকৃত হইত, নারীরা ভূসম্পত্তির অধিকারী হইতে পারিতেন, মধ্যস্বত্বাধিকারিত্বও অস্বীকৃত ছিল না, এই সব তথ্যও সাক্ষ্য প্রমাণসহ আগেই উদ্ধার করা হইয়াছে। যে-ভূমি দান করা হইয়াছে সেই ভূমির উপর ও নীচের সমস্ত স্বত্ব-উপস্বত্বই রাজা ও রাষ্ট্র দান করিয়া দিতেছেন—একেবারে হাট ঘাট আকাশ জলস্থল মাছ গাছ ইত্যাদি সহ—, কিন্তু সাধারণ প্রজারা ভূমির নিচের অধিকার ভোগ করিত কি না, সংলগ্ন জলের অধিকার লাভ করিত কি না, এ-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। কৌটিল্যের মতে ভূগর্ভস্থ খনি, লবণ ইত্যাদি রাষ্ট্রের সম্পত্তি ; ভূমি বিক্রয়কালে রাজা কি ভূগর্ভের অধিকারও বিক্রয় করিতেন ? অবশ্য লিপিগুলি, বিশেষভাবে, অষ্টম-শতকপূর্ব লিপিগুলি পাঠ করিলে মনে হইতে পারে, দান ও বিক্রয় উভয় ক্ষেত্রেই সর্বপ্রকার ভোগাধিকারই প্রজার উপর অর্পিত হইত।

পঞ্চম অধ্যায়ের পাঠপঞ্জী

এ-অধ্যায়ের একান্ত নির্ভর প্রাচীন লিপিমালা (পরিশিষ্ট "খ" দ্রষ্টব্য) ; প্রায় সমস্ত তথ্যই আহরণ করা হয়েছে এই লিপিমালা থেকেই। তবে এক্ষেত্রেও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, মনুসংহিতা ও যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার মত ধর্মশাস্ত্র গ্রন্থ, আইন-ই-আকবরীর মত ইতিহাসগ্রন্থ কোনো কোনো প্রসঙ্গ ব্যবহার করতে হ'য়েছে। আকবরী ভূমিব্যবস্থা প্রসঙ্গে Moreland-র সুপরিচিত গ্রন্থ Agrarian system in Mughal India এবং India at the death of Akbar আমার কাজে লেগেছে। আরও নানাগ্রন্থ ও প্রাচীন রচনা থেকে নানা তথ্য আমাকে প্রাচীন বাঙলার ভূমি-বিন্যাস বুঝতে সাহায্য করেছে, কিন্তু এত সব পাঠনির্দেশে পাঠকের কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না, যেহেতু আমার যুক্তিপর্যায় এ-সব তথ্যনির্ভর নয়। তবে, চতুর্থ অধ্যায়ের পাঠনির্দেশে যে ক'টি আধুনিক গ্রন্থের উল্লেখ করা হয়েছে, তা'তে ভূমি-বিন্যাস সম্বন্ধে কিছু কিছু মূল্যবান তথ্য ও তাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। সে সব গ্রন্থের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বর্ণ-বিন্যাস

যুক্তি

বর্ণাশ্রম প্রথার জন্মের ইতিহাস আলোচনা না করিয়াও বলা যাইতে পারে, বর্ণ-বিন্যাস ভারতীয় সমাজ-বিন্যাসের ভিত্তি। খাওয়া দাওয়া এবং বিবাহ-ব্যাপারের বিধি-নিষেধের উপর ভিত্তি করিয়া আর্যপূর্ব ভারতবর্ষে যে সমাজ-ব্যবস্থার পত্তন ছিল তাহাকে পিতৃপ্রধান আর্যসমাজ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ঢালিয়া সাজাইয়া নূতন করিয়া গড়িয়াছিল। এই নূতন করিয়া গড়ার পশ্চাতে একটা সামাজিক ও অর্থনৈতিক যুক্তি কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সে সব আলোচনা বর্তমান ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। যে-যুগে বাঙলা দেশের ইতিহাসের সূচনা সে-যুগে বর্ণাশ্রম আদর্শ গড়িয়া উঠিয়াছে, ভারতীয় সমাজের উচ্চতর এবং অধিকতর প্রভাবশালী শ্রেণীগুলিতে তাহা স্বীকৃত হইয়াছে, এবং ধীরে ধীরে তাহা পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতবর্ষে বিস্তৃত হইতেছে। বর্ণাশ্রমের এই সামাজিক আদর্শের বিস্তারের কথাই এক হিসাবে ভারতবর্ষে আর্যসংস্কার ও সংস্কৃতির বিস্তারের ইতিহাস; কারণ, ঐ আদর্শের ভিতরই ঐতিহাসিক যুগের ভারতবর্ষের সংস্কার ও সংস্কৃতির সকল অর্থ নিহিত। বর্ণাশ্রমই আর্য-সমাজের ভিত্তি, শুধু ব্রাহ্মণ্য সমাজেরই নয়, জৈন এবং বৌদ্ধ সমাজেরও। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া আর্যপূর্ব ও অনার্যসংস্কার এবং সংস্কৃতি এই বর্ণাশ্রমের কাঠামো এবং আদর্শের মধ্যেই সমন্বিত ও সমীকৃত হইয়াছে। বস্তুত, বর্ণাশ্রমাশ্রিত সমাজ-বিন্যাস এক হিসাবে যেমন ভারত-ইতিহাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য, তেমনই অন্য দিকে এমন সর্বব্যাপী এমন সর্বগ্রাসী এবং গভীর অর্থবহ সমাজ-ব্যবস্থাও পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না। প্রাচীন বাঙলার সমাজ-বিন্যাসের কথা বলিতে গিয়া সেই-জন্য বর্ণ-বিন্যাসের কথা বলিতেই হয়।

বর্ণাশ্রম প্রথা ও অভ্যাস যুক্তিপদ্ধতিবদ্ধ করিয়াছিলেন প্রাচীন ধর্মসূত্র ও স্মৃতিগ্রন্থের লেখকেরা। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র এই চতুর্বর্ণের কাঠামোর মধ্যে তাঁহারা সমস্ত ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থাকে বাঁধিতে চেষ্টা করিয়া ছিলেন। এই চাতুর্বর্ণপ্রথা অলীক উপন্যাস, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। কারণ, ভারতবর্ষে এই চতুর্বর্ণের বাহিরে অসংখ্য বর্ণ, জন ও কোম বিদ্যমান ছিল; প্রত্যেক বর্ণ, জন ও কোমের ভিতর আবার ছিল অসংখ্য স্তর-উপস্তর। ধর্মসূত্র ও স্মৃতিকারেরা নানা অভিনব অবাস্তব উপায়ে এই সব বিচিত্র বর্ণ, জন ও কোমের স্তর-উপস্তর ইত্যাদি ব্যাখ্যা করিতে এবং সব কিছুকেই আদি চাতুর্বর্ণের কাঠামোর যুক্তিপদ্ধতিতে বাঁধিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সেই মনু-যাজ্ঞবল্ক্যের সময় হইতে আরম্ভ

করিয়া পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে রঘুনন্দন পর্যন্ত এই চেষ্টার কখনও বিরাম হয় নাই। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, স্মৃতিকারদের রচনার মধ্যে সমসাময়িক বাস্তব সামাজিক অবস্থার কিছুটা প্রতিফলন হয়তো আছে, সেই অবস্থার ব্যাখ্যার একটা চেষ্টাও আছে; কিন্তু যে-যুক্তিপদ্ধতির আশ্রয়ে তাহা করা হইয়াছে, অর্থাৎ চতুর্বর্ণের বহির্ভূত অসংখ্য বর্ণ ও কোমের নরনারীর সঙ্গে চাতুর্বর্ণাধৃত নরনারীর যৌনমিলনের ফলে সমাজের যে বিচিত্র বর্ণ ও উপবর্ণের, বিচিত্রতর সংকর বর্ণের সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহা একান্তই অনৈতিহাসিক এবং সেই হেতু অলীক। তৎসত্ত্বেও স্বীকার করিতেই হয়, আর্য-ব্রাহ্মণ্য ভারতীয় সমাজ আজও এই যুক্তি পদ্ধতিতে বিশ্বাসী, এবং সুদূর প্রাচীনকাল হইতে আদি চাতুর্বর্ণের যে কাঠামো ও যুক্তিপদ্ধতি অনুযায়ী বর্ণব্যাখ্যা হইয়া আসিয়াছে সেই ব্যাখ্যা প্রয়োগ করিয়া হিন্দুসমাজ আজও বিচিত্র বর্ণ, উপবর্ণ ও সংকর বর্ণের সামাজিক স্থান নির্ণয় করিয়া থাকেন। বাঙলাদেশেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই, আজও হইতেছে না।

এই সব বিচিত্র বর্ণ, উপবর্ণ, সংকর বর্ণ সকল কালে ও ভারতবর্ষের সকল স্থানে এক প্রকারের ছিল না, এখনও নয়; সকল স্মৃতিশাস্ত্রে সেই জন্য এক প্রকারের বিবরণও পাওয়া যায় না। প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থগুলির একটিও বাঙলাদেশে রচিত নয়; কাজেই বাঙলার বর্ণবিন্যাসগত সামাজিক অবস্থার পরিচয়ও তাহাতে পাওয়া যায় না; আশা করাও অযৌক্তিক এবং অনৈতিহাসিক। বস্তুত, একাদশ শতকের আগে, বাঙলাদেশের সামাজিক প্রতিফলন লইয়া একটিও স্মৃতিগ্রন্থ বা এমন কোনও গ্রন্থ রচিত হয় নাই যাহার ভিতর সমসাময়িক কালের বর্ণ-বিন্যাসের ছবি কিছুমাত্র ধরা যাইতে পারে। বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণ স্বীকার করিলে বলিতেই হয়, এই সময় হইতেই বাঙালী স্মৃতি ও পুরাণকারেরা সজ্ঞানে ও সচেতন ভাবে বাঙলার সমাজ ব্যবস্থাকে প্রাচীনতর ব্রাহ্মণ্য স্মৃতির আদর্শ ও যুক্তিপদ্ধতি অনুযায়ী ভারতীয় বর্ণবিন্যাসের কাঠামোর মধ্যে বাঁধিবার চেষ্টা আরম্ভ করেন। কিন্তু এই সজ্ঞান সচেতন চেষ্টার আগেই, বহুদিন হইতেই আর্যপ্রবাহ বাঙলাদেশে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে, এবং আর্যধর্ম ও সংস্কৃতির স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গেই বর্ণাশ্রমের যুক্তি এবং আদর্শও স্বীকৃতি লাভ করে। সেইজন্য প্রাচীন বাঙলার বর্ণবিন্যাসের কথা বলিতে হইলে বাঙলার আর্যীকরণের সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গেই তাহা আরম্ভ করিতে হয়।

২

উপাদান-বিচার

আর্যীকরণের তথা বাঙলার বর্ণ-বিন্যাসের প্রথম পর্বের ইতিহাস নানা প্রকারের সাহিত্যগত উপাদানের ভিতর হইতে খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। সে-উপাদান

রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, মনু-বোধায়ন প্রভৃতি স্মৃতি ও সূত্রকারদের গ্রন্থে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। বৌদ্ধ ও জৈন প্রাচীন গ্রন্থাদিতেও এ-সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য নিহিত আছে। উত্তর-বঙ্গে এবং বাঙলাদেশের অন্যত্র গুপ্তাধিপত্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে আর্যীকরণ তথা বাঙলার বর্ণ-বিন্যাসের দ্বিতীয় পর্বের সূত্রপাত। এই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে ত্রয়োদশ শতকের শেষপর্যন্ত বর্ণ-বিন্যাস ইতিহাসের প্রচুর উপাদান বাঙলার অসংখ্য লিপিমালায় বিদ্যমান। বস্তুত, সন-তারিখযুক্ত এই লিপিগুলির মত বিশ্বাসযোগ্য নির্ভরযোগ্য যথার্থ বাস্তব উপাদান আর কিছু হইতেই পারে না; এইগুলির উপর নির্ভর করিয়াই বাঙলার বর্ণ-বিন্যাসের ইতিহাস রচনা করা যাইতে পারে, এবং তাহা করাই সর্বাপেক্ষা নিরাপদ। সঙ্গে সঙ্গে সমসাময়িক দু-একটি কাব্যগ্রন্থের, যেমন, রামচরিতের সাহায্যও লওয়া যাইতে পারে। ইহাদের ঐতিহাসিকতা অবশ্য স্বীকার্য।

তবে, সেন-বর্মণ আমলে বাঙলাদেশে কিছু কিছু স্মৃতি ও ব্যবহারগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। সেগুলি কখন কোন্ রাজার আমলে ও পোষকতায় কে রচনা করিয়াছিলেন তাহা সুনির্ধারিত ও সুবিদিত। সমস্ত স্মৃতি ও ব্যবহারগ্রন্থ কালের হাত এড়াইয়া আমাদের কালে আসিয়া পৌঁছায় নাই; অনেক গ্রন্থ লুপ্ত হইয়া অথবা হারাইয়া গিয়াছে। কিছু কিছু যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে ভবদেব ভট্টের ও জীমূতবাহনের কয়েকটি গ্রন্থই প্রধান। এই-সব স্মৃতি ও ব্যবহার গ্রন্থের সাক্ষ্য প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিতে কোনও বাধা নাই; এবং লিপিমালায় যে-সব তথ্য পাওয়া যায়, সে-সব তথ্য এই স্মৃতি ও ব্যবহার গ্রন্থের সাহায্যে ব্যাখ্যা করিলে অনৈতিহাসিক বা অযৌক্তিক কিছু করা হইবে না।

স্মৃতি ও ব্যবহারগ্রন্থ ছাড়া অন্তত দুইটি অর্বাচীন পুরাণ-গ্রন্থ, বৃহদ্ধর্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, গোপালভট্ট-আনন্দভট্টকৃত বল্লাল-চরিত, এবং বাঙলার কুলজী গ্রন্থমালায় হিন্দুযুগের শেষ অধ্যায়ের বর্ণ-বিন্যাসের ছবি কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাদের একটিকেও প্রামাণিক সমসাময়িক সাক্ষ্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। সেইজন্য ইতিহাসের উপাদান হিসাবে ইহারা কতখানি নির্ভরযোগ্য সে-বিচার আগেই একটু সংক্ষিপ্ত ভাবে করিয়া লওয়া প্রয়োজন।

বৃহদ্ধর্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ

বৃহদ্ধর্ম ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের ঐতিহাসিক নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে কিছু কিছু বিচারালোচনা হইয়াছে। প্রথমোক্ত পুরাণটিতে পদ্মা ও বাঙলাদেশের যমুনা নদীর উল্লেখ, গঙ্গার তীর্থ-মহিমার সবিশেষ উল্লেখ, ব্রাহ্মণের মাছ-মাংস খাওয়ার বিধান (যাহা ভারতবর্ষের আর কোথাও বিশেষ নাই), ব্রাহ্মণেতর সমস্ত শূদ্রবর্ণের ছত্রিশটি উপ ও সংকর বর্ণে বিভাগ (বাঙলার তথাকথিত 'ছত্রিশ জাত' যাহা ভারতবর্ষে আর কোথাও দেখা যায় না) ইত্যাদি দেখিয়া মনে হয় এই পুরাণটির লেখক বাঙালী না হইলেও বাঙলাদেশের সঙ্গে

[illegible] পরিচয় ছিল। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য বর্ণের পৃথক অনুল্লেখ, 'সৎ' ও 'অসৎ' পর্যায়ে শূদ্রদের দুই ভাগ, ব্রাহ্মণদের পরেই অম্বষ্ঠ (বৈদ্য) এবং করণ (কায়স্থ)-দের স্থান নির্ণয়, শংখকার (শাঁখারী), মোদক (ময়রা), তন্তুবায়, দাস (চাষী), কর্মকার, সুবর্ণবণিক ইত্যাদি উপ ও সংকর বর্ণের উল্লেখ প্রভৃতিও এই অনুমানের সমর্থক। বাঙলাদেশের বাহিরে অন্যত্র কোথাও এই ধরনের বর্ণ-ব্যবস্থা এবং এই সব সংকর বর্ণ দেখা যায় না। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ সম্বন্ধেও প্রায় একই কথা বলা চলে। বস্তুত, বৃহদ্ধর্ম-পুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের বর্ণ-ব্যবস্থার চিত্র প্রায় এক এবং অভিন্ন, এবং তাহা যে বাঙলাদেশ সম্বন্ধেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য ইহাও অস্বীকার করা যায় না। এই দুই গ্রন্থের রচনাকাল নির্ণয় করা কঠিন ; তবে এই কাল দ্বাদশ শতকের আগে নয় এবং চতুর্দশ শতকের পরে নয় বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। এই অনুমান সত্য বলিয়াই মনে হয়। যদি তাহা হয় তাহা হইলে বলা যায়, এই দুই পুরাণে বাঙলার আদিপর্বের শেষ অধ্যায়ের বর্ণ-বিন্যাসের ছবির একটা মোটামুটি কাঠামো পাওয়া যাইতেছে।

বল্লাল-চরিত

বল্লাল-চরিত নামে দুইখানি গ্রন্থ প্রচলিত। একখানির গ্রন্থকার আনন্দভট্ট ; নবদ্বীপের রাজা বুদ্ধিমন্ত খাঁর আদেশে তাঁহার গ্রন্থখানি রচিত হয়। রচনাকাল ১৫১০ খ্রীষ্টশতক। আনন্দভট্টের পিতা দাক্ষিণাত্যাগত ব্রাহ্মণ, নাম অনন্তভট্ট। আর একখানি গ্রন্থ পূর্বখণ্ড, উত্তরখণ্ড ও পরিশিষ্ট এই তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম এবং দ্বিতীয় খণ্ডের রচয়িতার নাম গোপালভট্ট ; গোপালভট্ট বল্লালসেনের অন্যতম শিক্ষক ছিলেন, এবং বল্লালের আদেশানুসারে ১০০০ শকে গ্রন্থখানি রচিত হয়, এইরূপ দাবি করা হইয়াছে। তৃতীয় খণ্ড রাজার ক্রোধোৎপাদনের ভয়ে গোপালভট্ট নিজে লিখিয়া যাইতে পারেন নাই ; কিঞ্চিদধিক দুই শত বৎসর পর আনন্দভট্ট তাহা রচনা করেন। দ্বিতীয় গ্রন্থটিতে নানা কুলজীবিবরণ, বিভিন্ন বর্ণের উৎপত্তিকথা ইত্যাদি তো আছেই, তাহা ছাড়া প্রথম গ্রন্থে বল্লাল কর্তৃক বণিকদের উপর অত্যাচার, সুবর্ণবণিকদের সমাজে 'পতিত' করা এবং কৈবর্ত প্রভৃতি বর্ণের লোকদের উন্নীত করা প্রভৃতি যে-সব কাহিনী বর্ণিত আছে তাহাও পুনরুল্লেখ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় গ্রন্থে বল্লালের যে তারিখ দেওয়া হইয়াছে তাহা বল্লালের যথার্থ কাল নয় ; কাজেই গোপালভট্ট বল্লালের সমসাময়িক ছিলেন একথা সত্য নহে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই গ্রন্থটিকে বলিয়াছিলেন 'জাল' ; আর শাস্ত্রী মহাশয়-সম্পাদিত প্রথম গ্রন্থটিকে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছিলেন 'জাল'।

বল্লাল-চরিতের কাহিনীটি সংক্ষেপে উল্লেখযোগ্য।

সেনরাজ্যে বল্লভানন্দ নামে একজন মস্ত বড় ধনী বণিক ছিলেন। উদন্তপুরীর

রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য বল্লালসেন বল্লভানন্দের নিকট হইতে একবার এক কোটি নিষ্ক ধার করেন। বারবার যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর বল্লাল আর একবার শেষ চেষ্টা করিবার জন্য প্রস্তুত হন, এবং বল্লভানন্দের নিকট হইতে আরও দেড় কোটি সুবর্ণ (মুদ্রা) ধার চাহিয়া পাঠান। বল্লভানন্দ সুবর্ণ পাঠাইতে রাজি হন, কিন্তু তৎপরিবর্তে হরিকেলির রাজস্ব দাবি করেন। বল্লাল ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া অনেক বণিকের ধনরত্ন কাড়িয়া লন এবং নানাভাবে তাহাদের উপর অত্যাচার করেন। ইহার পর আবার সৎশূদ্রদের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসিয়া আহার করিতে তাঁহাদের আপত্তি আছে বলিয়া বণিকেরা রাজপ্রাসাদে এক আহারের আমন্ত্রণ অস্বীকার করেন। এই প্রসঙ্গেই বল্লাল শুনিতে পান যে, বণিকদের নেতা বল্লভানন্দ পালরাষ্ট্রের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিতেছেন। তাহার উপর আবার মগধের রাজা ছিলেন বল্লভানন্দের জামাতা। বল্লাল অতিমাত্রায় ক্রুদ্ধ হইয়া সুবর্ণবণিকদের শূদ্রের স্তরে নামাইয়া দিলেন; তাঁহাদের পূজা অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিলে, তাঁহাদের কাছ হইতে দান গ্রহণ করিলে কিংবা তাঁহাদের শিক্ষাদান করিলে ব্রাহ্মণেরাও 'পতিত' হইবেন, সঙ্গে সঙ্গে এই বিধানও দিয়া দিলেন। বণিকেরা তখন প্রতিশোধ লইবার জন্য দ্বিগুণ ত্রিগুণ মূল্য দিয়া সমস্ত দাসভৃত্যদের হাত করিয়া ফেলিল। উচ্চবর্ণের লোকেরা বিপদে পড়িয়া গেলেন। বল্লাল তখন বাধ্য হইয়া কৈবর্তদিগকে জলচল-সমাজে উন্নীত করিয়া দিলেন, তাঁহাদের নেতা মহেশকে মহামাণ্ডলিক পদে উন্নীত করিলেন। মালাকার, কুম্ভকার এবং কর্মকার, ইহারাও সৎশূদ্র পর্যায়ে উন্নীত হইল। সুবর্ণবণিকদের পৈতা পরা নিষিদ্ধ হইয়া গেল; অনেক বণিক দেশ ছাড়িয়া অন্যত্র পলাইয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে বল্লাল উচ্চতর বর্ণের মধ্যে সামাজিক বিশৃঙ্খলা দেখিয়া অনেক ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কে শুদ্ধিযজ্ঞের বিধান দিলেন। ব্যবসায়ী নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণত্ব একেবারে ঘুচিয়া গেল; তাঁহারা ব্রাহ্মণ-সমাজ হইতে 'পতিত' হইলেন।

কাহিনীটির ঐতিহাসিক যাথার্থ্য স্বীকার করা কঠিন; কিন্তু ইহাকে একেবারে অলীক কল্পনাগত উপন্যাস বলিয়া উড়াইয়া দেওয়াও কঠিন। গ্রন্থ দুটিকেও 'জাল' বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান নাই। সেনবংশ 'ব্রহ্মক্ষত্র' বংশ; বল্লালসেন কলিঙ্গরাজ চোড়গঙ্গের বন্ধু ছিলেন (সমসাময়িক তাঁহারা ছিলেনই); বল্লালের সময়ে কীকট-মগধ পালবংশের করায়ত্ত ছিল এবং তাঁহার আমলেই পালবংশের অবসানও হইয়াছিল; বল্লাল মিথিলায় সমরাভিযানও প্রেরণ করিয়াছিলেন—বল্লালচরিতের এই সব তথ্য অন্যান্য স্বতন্ত্র সুবিদিত নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্যপ্রমাণ দ্বারা সমর্থিত। এই সব হেতু দেখাইয়া কোনও কোনও ঐতিহাসিক যথার্থই বলিয়াছেন, বল্লাল-চরিত 'জাল' গ্রন্থ নয়, এবং ইহার কাহিনী একেবারে ঔপন্যাসিক নয়। তাঁহাদের মতে ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে প্রচলিত লোক-কাহিনীর উপর নির্ভর করিয়া বল্লাল-চরিত এবং এই জাতীয় অন্যান্য গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। কেহ কেহ ইহাও মনে করেন যে, "The *Vallala Charita*

contains the distored echo of an internal disruption caused by the partisans of the Pala dynasty which proved an important factor in the collapse of the Sena rule in Bengal." এই মত সর্বথা নির্ভরযোগ্য। কাহিনীটিকে সাধারণত যতটা বিকৃত প্রতিধ্বনি বলিয়া মনে করা হয় আমি ততটা বিকৃত বলিয়া মনে করি না। আমরা জানি, কৈবর্তরা পালরাষ্ট্রের প্রতি খুব প্রসন্ন ছিলেন না; একবার তাঁহারা বিদ্রোহী হইয়া এক পালরাজকে হত্যা করিয়া বরেন্দ্রী বহুদিন তাঁহাদের করায়ত্তে রাখিয়াছিলেন। কাজেই সেই কৈবর্তদের প্রসন্ন করা এবং তাঁহাদের হাতে রাখিতে চেষ্টা করা বল্লালের পক্ষে অস্বাভাবিক কিছু ছিল না, বিশেষত মগধের পালদের সঙ্গে শত্রুতা যখন তাঁহাদের ছিলই। দ্বিতীয়ত, অন্যান্য সাক্ষ্য-প্রমাণ হইতে সেন-রাষ্ট্রের সামাজিক আদর্শের, এবং স্মৃতি ও পুরাণ গ্রন্থাদিতে সমসাময়িক সমাজ-বিন্যাসের যে-পরিচয় আমরা পাই তাহাতে স্পষ্টই মনে হয়, সমাজে স্বর্ণকার-সুবর্ণবণিকদের স্থান খুব শ্লাঘ্য ছিল না। বৃহদ্ধর্মপুরাণে তাঁতী, গন্ধবণিক, কর্মকার, তৌলিক, (সুপারী ব্যবসায়ী), কুমার, শাঁখারী, কাঁসারী, বারুজীবী, (বারুই), মোদক, মালাকার সকলকে উত্তম-সংকর পর্যায়ে গণ্য করা হইয়াছে, অথচ স্বর্ণকার-সুবর্ণবণিকদের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে ধীবর-রজকের সঙ্গে জল-অচল মধ্যম-সংকর পর্যায়ে। ইহার তো কোনও যুক্তিসংগত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না! বল্লাল-চরিতে এ সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে একটা যুক্তি আছে; রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কারণে এইরূপ হওয়া খুব বিচিত্র নয়। ইহাকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় কি? সেন-বর্মণ আমলে এইরূপ পর্যায়-নির্ণয় যে হইয়াছে স্মৃতিগ্রন্থগুলিই তাহার সাক্ষ্য। লোকস্মৃতি এক্ষেত্রে একেবারে মিথ্যাচরণ করিয়াছে, এমন মনে হইতেছে না। বল্লাল-চরিত-কাহিনী অক্ষরে অক্ষরে সত্য না হইলেও ইহার মূলে যে সমাজেতিহাসের একটি ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ দেখিতেছি না।

কুলজী-গ্রন্থমালা

বল্লাল-চরিতের ঐতিহাসিক ভিত্তি কিছুটা স্বীকার করা গেলেও কুলজীগ্রন্থের ঐতিহাসিকত্ব স্বীকার করা অত্যন্ত কঠিন। বাঙলাদেশে কুলজী গ্রন্থমালা সুপরিচিত, সুআলোচিত। ব্রাহ্মণ-কুলজীগ্রন্থমালায় ধ্রুবানন্দ মিশ্রের মহাবংশাবলী বা মিশ্রগ্রন্থ, নুলো পঞ্চাননের গোষ্ঠীকথা, বাচস্পতি মিশ্রের কুলরাম, ধনঞ্জয়ের কুলপ্রদীপ, মেলপর্যায় গণনা, বারেন্দ্র কুলপঞ্জিকা, কুলার্ণব, হরিমিশ্রের কারিকা, এড়ু মিশ্রের কারিকা, মহেশের নির্দোষ কুলপঞ্জিকা এবং সর্বানন্দ মিশ্রের কুলতত্ত্বার্ণব প্রভৃতি গ্রন্থ সমধিক প্রসিদ্ধ। ধ্রুবানন্দের মহাবংশাবলী পঞ্চদশ শতকের রচনা বলিয়া অনুমিত, নুলো পঞ্চানন এবং বাচস্পতি মিশ্রের গ্রন্থের কাল ষোড়শ-সপ্তদশ শতক হইতে পারে। বাকী কুলজীগ্রন্থ সমস্তই

অর্বাচীন। বস্তুত, কোন কুলজী গ্রন্থেরই রচনাকাল পঞ্চদশ শতকের আগে নয়; অধিকাংশ কুলজীগ্রন্থ এখনও পাণ্ডুলিপি আকারেই পড়িয়া আছে, এবং নানা উদ্দেশ্যে নানা জনে ইহাদের পাঠ অদলবদলও করিয়াছেন, এমন প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। বৈদ্য-কুলজীগ্রন্থের মধ্যে রামকান্তের কবিকণ্ঠহার এবং ভরতমল্লিকের চন্দ্রপ্রভা সমধিক খ্যাত; ইহাদের রচনাকাল যথাক্রমে ১৬৫৩ ও ১৬৭৩ খ্রীষ্ট শতক। কায়স্থ এবং অন্যান্য বর্ণেরও কুলজী-ইতিহাস পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলি কিছুতেই সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের আগেকার রচনা বলিয়া মনে করা যায় না। ঊনবিংশ শতকের শেষপাদ হইতে আরম্ভ করিয়া একান্ত আধুনিক কাল পর্যন্ত বাঙলাদেশের অনেক পণ্ডিত এইসব পাণ্ডুলিপি ও মুদ্রিত কুলজী-গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া সামাজিক ইতিহাস রচনার প্রয়াস পাইয়াছেন, এবং এখনও অনেক কৌলীন্যমর্যাদাগর্বিত ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ বংশ এই সব কুলজী-গ্রন্থের সাক্ষ্যের উপরই নিজেদের বংশমর্যাদা প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন। বস্তুত, বাঙলার কৌলীন্য-প্রথা একমাত্র এই কুলশাস্ত্র বা কুলজী-গ্রন্থমালার সাক্ষ্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

একান্ত সাম্প্রতিককালে উচ্চ শ্রেণীর সামাজিক মর্যাদা যে-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাকে আঘাত করা অত্যন্ত কঠিন। নানা কারণেই ঐতিহাসিকেরা এই সব কুলজী-গ্রন্থ-মালার সাক্ষ্য বৈজ্ঞানিক যুক্তিপদ্ধতিতে আলোচনার বিষয়ীভূত করেন নাই, যদিও অনেকে তাঁহাদের সন্দেহ ব্যক্ত করিতে দ্বিধা করেন নাই। ইহাদের ঐতিহাসিক মূল্য প্রথম বিচার করেন স্বর্গত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়। খুব সাম্প্রতিককালে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় এই সব কুলজী-গ্রন্থের বিস্তৃত ঐতিহাসিক বিচার করিয়াছেন; তাঁহার সুদীর্ঘ বিচারালোচনার যুক্তিবত্তা অনস্বীকার্য। কাজেই এখানে একই আলোচনা পুনরুত্থাপন করিয়া লাভ নাই। আমি শুধু মোটামুটি নির্ধারণগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি মাত্র।

প্রথমত, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে যখন কুলশাস্ত্রগুলি প্রথম রচিত হইতে আরম্ভ করে তখন মুসলমানপূর্ব যুগের বাঙলার সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় ইতিহাস সম্বন্ধে বাঙালীর জ্ঞান ও ধারণা খুব অস্পষ্ট ছিল। কোনো কোনো পারিবারিক ইতিহাসের অস্তিত্ব হয়তো ছিল, কিন্তু আজ সেগুলির সত্যাসত্য নির্ধারণ প্রায় অসম্ভব। এই সব বংশাবলী এবং প্রচলিত অস্পষ্ট রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া, অর্ধসত্য অর্ধকল্পনার নানা কাহিনীতে সমৃদ্ধ করিয়া এই কুল শাস্ত্রগুলি রচনা করা হইয়াছিল। পরবর্তীকালে এই সব গ্রন্থোক্ত কাহিনী ও বিবরণ বংশমর্যাদাবোধসম্পন্ন ব্যক্তিদের হাতে পড়িয়া নানা উদ্দেশ্যে নানাভাবে পাঠ-বিকৃতি লাভ করে এবং নূতন নূতন ব্যাখ্যা ও কাহিনীদ্বারা সমৃদ্ধতর হয়। কাজেই, ঐতিহাসিক সাক্ষ্য হিসাবে ইহাদের উপর নির্ভর করা কঠিন। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে, প্রায় দুই শত আড়াই শত বৎসরের মুসলমানাধিপত্যের পর বর্ণ-

হিন্দুসমাজ নিজের ঘর নূতন করিয়া গুছাইতে আরম্ভ করে ; রঘুনন্দন তখনই নূতন স্মৃতিগ্রন্থাদি রচনা করিয়া নূতন সমাজনির্দেশ দান করেন; চারিদিকে নূতন আত্মসচেতনতার আভাস সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। কুলশাস্ত্রগুলির রচনাও তখনই আরম্ভ হয়, এবং প্রচলিত ধর্ম ও সমাজ-ব্যবস্থাকে প্রাচীনতর কালের স্মৃতিশাসনের সঙ্গে যুক্ত করিয়া তাহার একটা সুসংগত ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টাও পণ্ডিতদের মধ্যে উদগ্র হইয়া দেখা দেয়। সেন-বর্মণ আমলই স্মৃতিরচনা ও স্মৃতিশাসনের প্রথম সুবর্ণযুগ, কাজেই কুলশাস্ত্রকারেরা সেই যুগের সঙ্গে নিজেদের ব্যবস্থা-ইতিহাস যুক্ত করিবেন তাহাও কিছু আশ্চর্য নয় !

দ্বিতীয়ত, কুলশাস্ত্রকাহিনীর কেন্দ্রে বসিয়া আছেন রাজা আদিশূর। আদিশূর কর্তৃক কোলাঞ্চ-কনৌজ (অন্যমতে, কাশী) হইতে পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়নের সঙ্গেই ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ ও অন্যান্য কয়েকটি বর্ণ-উপবর্ণের কুলজী-কাহিনী এবং কৌলীন্যপ্রথার ইতিহাস জড়িত ! কৌলীন্যপ্রথার বিবর্তনের সঙ্গে বল্লাল ও লক্ষ্মণসেনের নামও জড়িত হইয়া আছে, এবং রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ কুলজীর সঙ্গে আদিশূরের পৌত্র ক্ষিতিশূরের এবং ক্ষিতিশূরের পুত্র ধরাশূরের। বৈদিক-ব্রাহ্মণ কুলকাহিনীর সঙ্গে বর্মণরাজ শ্যামলবর্মণ এবং হরিবর্মণের নামও জড়িত। একাদশ শতকে দক্ষিণরাঢ়ে এক শূরবংশ রাজত্ব করিতেন, এবং রণশূর নামে অন্তত একজন রাজার নাম আমরা জানি। আদিশূর, ক্ষিতিশূর এবং ধরাশূরের নাম আজও ইতিহাসে অজ্ঞাত। সেন ও বর্মণ রাজবংশদ্বয় তো খুবই পরিচিত। কিন্তু, আদিশূরই বাঙলায় প্রথম ব্রাহ্মণ আনিলেন, তাঁহার আগে ব্রাহ্মণ ছিল না, বেদের চর্চা ছিল না, কুলজী-গ্রন্থগুলির এই তথ্য একান্তই অনৈতিহাসিক, অথচ ইহারই উপর সমস্ত কুলজী-কাহিনীর নির্ভর। অন্তত পঞ্চম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙলাদেশে ব্রাহ্মণের কিছু অভাব ছিল না, বেদ-বেদাঙ্গচর্চাও যথেষ্টই ছিল ; অষ্টম শতকের আগেই বাঙলার সর্বত্র অসংখ্য বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের বসবাস হইয়াছিল। আর, অষ্টম হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ শতক পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে অসংখ্য ব্রাহ্মণ যেমন বাঙলায় আসিয়া বসবাস আরম্ভ করিয়াছিলেন, তেমনই বাঙলার ব্রাহ্মণ-কায়স্থেরা বাঙলার বাহিরে গিয়াও বিচিত্র সম্মাননা লাভ করিতেছিলেন। বঙ্গজ ব্রাহ্মণদের কোনও কাহিনী কুলশাস্ত্রগুলিতে নাই, অথচ পূর্ব বঙ্গেও অনেক ব্রাহ্মণ গিয়া বসবাস করিয়াছিলেন, এ-সম্বন্ধে লিপিপ্রমাণ বিদ্যমান। রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র এবং সম্ভবত বৈদিক ও গ্রহবিপ্র ব্রাহ্মণদের অস্তিত্বের খবর অন্যতর স্বতন্ত্র সাক্ষ্যপ্রমাণ হইতেও পাওয়া যায় ; রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র একান্তই ভৌগোলিক সংজ্ঞা ; বৈদিক ব্রাহ্মণদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আদিশূর-পূর্ব লিপিপ্রমাণ বিদ্যমান ; আর গ্রহবিপ্রেরা তো বাহির হইতে আগত শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ বলিয়াই মনে হয়। ইহাদের সম্পর্কে কুলজীর ব্যাখ্যা অপ্রাসঙ্গিক এবং অনৈতিহাসিক। বৈদ্য ও কায়স্থদের ভৌগোলিক বিভাগ সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। কৌলীন্যপ্রথার সঙ্গে বল্লাল ও লক্ষ্মণসেনের নাম অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত, অথচ এই দুই রাজার আমলে যে-সব স্মৃতি ও ব্যবহারগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল,

ইহাদের নিজেদের যে-সব লিপি আছে তাহার একটিতেও এই প্রথা সম্বন্ধে একটি ইঙ্গিতমাত্রও নাই, উল্লেখ তো দূরের কথা। তাহা ছাড়া, এই যুগের ভবদেব ভট্ট, হলায়ুধ, অনিরুদ্ধ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং অসংখ্য অপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণের যে-সব উল্লেখ সমসাময়িক গ্রন্থাদি ও লিপিমালায় পাওয়া যায় তাঁহাদের একজনকেও ভুলিয়াও কুলীন কেহ বলেন নাই। বল্লাল ও লক্ষ্মণের নাম কৌলীন্যপ্রথা উদ্ভবের সঙ্গে জড়িত থাকিলে তাঁহারা নিজেরা কেহ তাহার উল্লেখ করিলেন না, সমসাময়িক গ্রন্থ ও লিপিমালায় তাহার উল্লেখ পাওয়া গেল না, ইহা খুবই আশ্চর্য বলিতে হইবে! আদিশূর-কাহিনী এবং কৌলীন্যপ্রথার সঙ্গে ব্রাহ্মণদের গাঞী বিভাগও অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। গাঞীর উদ্ভব গ্রাম হইতে; যে গ্রামে যে-ব্রাহ্মণ বসতি স্থাপন করিতেন তিনি সেই গ্রামের নামানুযায়ী গাঞী পরিচয় গ্রহণ করিতেন। বন্দ্য, ভট্ট, চট্ট প্রভৃতি গ্রামের নামের সঙ্গে উপাধ্যায় বা আচার্য জড়িত হইয়া বন্দ্যোপাধ্যায়, ভট্টাচার্য, চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি পদবীর সৃষ্টি। বস্তুতঃ বন্দ্য, ভট্ট, চট্ট ব্রাহ্মণদের এই সব গ্রামনামার পরিচয় অষ্টম শতক-পূর্ব লিপিগুলিতেই দেখা যাইতেছে। কাজেই এই সব গাঞীপর্যায়-পরিচয় স্বাভাবিক ভৌগোলিক কারণেই উদ্ভূত হইয়াছিল এবং তাহার সূচনা ষষ্ঠী-সপ্তম শতকেই দেখা গিয়াছিল; আদিশূর-কাহিনী বা কৌলীন্যপ্রথার সঙ্গে উহাকে যুক্ত করিবার কোনও সংগত কারণ নাই। বৈদ্য এবং কোনও কোনও ব্রাহ্মণ কুলজীতে আদিশূর এবং বল্লালসেনকে বলা হইয়াছে বৈদ্য। এ তথ্য একান্তই অনৈতিহাসিক। সেনেরা নিঃসন্দেহে ব্রহ্মক্ষত্রিয়; ইঁহারা এবং সম্ভবত শূরেরাও অবাঙালী। কাজেই বাঙালী বৈদ্য-সংকরবর্ণের সঙ্গে ইহাদের যুক্ত করিবার কারণ নাই।

কুলজী-গ্রন্থগুলিতে নানা প্রকার গালগল্প ও বিচিত্র অসংগতি তো আছেই; সাম্প্রতিক পণ্ডিতেরা তাহা সমস্তই অঙ্গুলি নির্দেশে দেখাইয়া দিয়াছেন। আমি শুধু কয়েকটি ঐতিহাসিক যুক্তি সংক্ষেপে উল্লেখ করিলাম। এই সব কারণে কুলশাস্ত্রের সাক্ষ্য ঐতিহাসিক আলোচনায় নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। তবে, ইহাদের ভিতর দিয়া লোকস্মৃতির একটি ঐতিহাসিক ইঙ্গিত প্রত্যক্ষ করা যায়, এবং সে-ইঙ্গিত অস্বীকার করা কঠিন। পঞ্চদশ-ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে যে বর্ণ-উপবর্ণগত সমাজ-ব্যবস্থা, যে-স্মৃতিশাসন বাঙলাদেশে প্রচলিত ছিল তাহার একটা প্রাচীনতর ইতিহাস ছিল, এবং লোকস্মৃতি সেই ইতিহাসকে যুক্ত করিয়াছিল শূর, সেন ও বর্মণ রাজবংশগুলির সঙ্গে—পাল, চন্দ্র বা অন্য কোনো রাজবংশের সঙ্গে নয়, ইহা লক্ষণীয়। আমরা নিঃসংশয়ে জানি, সেন ও বর্মণ বংশদ্বয় অবাঙালী; শূরবংশও সম্ভবত অবাঙালী; ইহাও আমরা জানি, সেন এবং বর্মণ রাষ্ট্র ও রাজবংশ দুটির ছত্রছায়ায়ই এবং তাঁহাদের আমলেই বাঙলাদেশে ব্রাহ্মণ্য-স্মৃতি ও ব্যবহারশাসন, পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মানুশাসন সমস্ত পরিবেশ ও বাতাবরণ, সমস্ত খুঁটিনাটি সংস্কার লইয়া সর্বব্যাপী প্রসার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কুলজী-গ্রন্থগুলির ইঙ্গিতও তাহাই।

এই হিসাবে লোকস্মৃতি মিথ্যাচরণ করিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে না। দ্বিতীয়ত, কোনও কোনও বংশের প্রাচীনতর ইতিহাস পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে বিদ্যমান ছিল বলিয়া মনে হয়, এবং কুলজী-গ্রন্থাদিতে তাহা ব্যবহৃতও হইয়াছে। এই রকম কয়েকটি বংশের সাক্ষ্য স্বাধীন স্বতন্ত্র প্রমাণদ্বারা সমর্থনও করা যায়। কুলজী-গ্রন্থে রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, বৈদিক ও গ্রহবিপ্র, ব্রাহ্মণদের এই চারি পর্যায়ের বিভাগও স্বতন্ত্র প্রমাণদ্বারা সমর্থিত। কুলশাস্ত্র-গ্রন্থমালায় ব্রাহ্মণদের বিভিন্ন শাখার বিচিত্র গাঞী বিভাগের অন্তত কয়েকটি গাঞীর নাম লিপিমালায় এবং সমসাময়িক স্মৃতি-সাহিত্যে পাওয়া যায়। এই সব কারণে মনে হয়, কুলজী-গ্রন্থমালার পশ্চাতে একটা অস্পষ্ট লোকস্মৃতি বিদ্যমান ছিল, এবং এই লোক-স্মৃতি একেবারে পুরোপুরি মিথ্যাচারী নয়। তবে, কুলশাস্ত্রগুলির ঐতিহাসিক ইঙ্গিত-টুকু মাত্রই গ্রাহ্য, তাহাদের বিচিত্র খুঁটিনাটি তথ্য ও বিবরণগুলি নয়।

চর্যাগীতি

এই সব ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থাদি ছাড়া আর একটি উপাদানের উল্লেখ করিতে হয়, এই উপাদান সহজিয়াতন্ত্রের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের একটি গ্রন্থ, চর্যাচর্যবিনিশ্চয় বা চর্যাগীতি। এই গ্রন্থ বিভিন্ন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য কর্তৃক গুহ্যতান্ত্রিক সাধনা সম্বন্ধীয় সন্ধাভাষায় রচিত কয়েকটি (৫০ টি) পদের সমষ্টি। পদগুলি প্রাচীনতম বাঙলা ভাষার নিদর্শন, ইহাদের তিব্বতী ভাষারূপও কিছুদিন হইল পাওয়া গিয়াছে। যাহাই হউক, ইহাদের রচনার কাল দশম হইতে দ্বাদশ শতকের মধ্যে বলিয়া বহুদিন পণ্ডিতসমাজে স্বীকৃত হইয়াছে। এই পদগুলির যত গুহ্য অর্থই থাকুক, কিছু কিছু সমাজ-সংবাদও ইহাদের মধ্যে ধরা পড়িয়াছে, এবং বিশেষভাবে ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি তথাকথিত অন্ত্যজ পর্যায়ের বর্ণ-সংবাদ; সমসাময়িক সাক্ষ্য হিসাবে ইহাদের মূল্য অস্বীকার করা যায় না।

৩

বাঙালীর ইতিহাসের যে অস্পষ্ট উষাকালের কথা আমরা জানি তাহা হইতে বুঝা যায়, আর্যীকরণের সূচনার আগে এই দেশ অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়ভাষাভাষী—অস্ট্রিক ভাষা-ভাষীই অধিকসংখ্যক,—খুব স্বল্পসংখ্যক অন্যান্য ভাষাভাষী কৃষি ও শিকারজীবী, গৃহ ও অরণ্যচারী অসংখ্য কোমে বিভক্ত লোকেদের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। সাম্প্রতিক নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় এই তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে যে, এইসব অসংখ্য বিচিত্র কোমদের ভিতর বিবাহ ও আহার-বিহারগত ধর্ম ও আচারগত নানাপ্রকার বিধিনিষেধ বিদ্যমান ছিল, এবং এই সব বিধিনিষেধকে কেন্দ্র করিয়া বিচিত্র কোমগুলির পরস্পরের ভিতর যৌন ও আহার-বিহার সম্বন্ধগত বিভেদ-প্রাচীরেরও অন্ত ছিল না। পরবর্তী আর্য-ব্রাহ্মণ্য

বর্ণ-বিন্যাসের মূল অনেকাংশে এই সব যৌন ও আহার বিহার সম্বন্ধগত বিধিনিষেধকে আশ্রয় করিয়াছে, তাহা প্রায় অনস্বীকার্য। তবে, আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও সংস্কৃতি গুণ ও কর্মকে ভিত্তি করিয়া তাহাদের চিন্তা ও আদর্শানুযায়ী এইসব বিধিনিষেধকে ক্রমে ক্রমে কালানুযায়ী প্রয়োজনে, যুক্তি ও পদ্ধতিতে প্রথাশাসনগত করিয়া গড়িয়াছে, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সমাজ ও নৃতাত্ত্বিক গবেষণার নির্ধারণানুযায়ী বিচার করিলে ভারতীয় বর্ণবিন্যাস আর্যপূর্ব ও আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও সংস্কৃতির সাম্মিলিত প্রকাশ। অবশ্যই এই মিলন একদিনে হয় নাই; বহু শতাব্দীর নানা বিরোধ, নানা সংগ্রাম বিচিত্র মিলন ও আদান-প্রদানের মধ্য দিয়া এই সমন্বয় সম্ভব হইয়াছে। এই সমন্বয়-কাহিনীই এক হিসাবে ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতির এবং কতকাংশে ভারতীয় মুসলমান সংস্কৃতিরও ইতিহাস। যাহাই হউক, বাঙলা দেশে এই বিরোধ-মিলন-সমন্বয়ের সূচনা কি ভাবে হইয়াছিল তাহার কিছু কিছু আভাস প্রাচীন আর্য-ব্রাহ্মণ্য ও আর্য-বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, এই সব গ্রন্থের সাক্ষ্য একপক্ষীয়, এবং তাহাতে পক্ষপাত দোষ নাই এমনও বলা চলে না; আর্যপূর্ব জাতি ও কোমদের পক্ষ হইতে সাক্ষ্য দিবার মতন কোনও অকাট্য প্রমাণ উপস্থিত নাই। তাহা ছাড়া, বাঙলাদেশ উত্তর-ভারতের পূর্বপ্রত্যন্ত দেশ; আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও সংস্কৃতির স্পর্শ ও প্রভাব এদেশকে আক্রমণ করিয়াছে সকলের পরে; তখন তাহা উত্তর-ভারতের আর প্রায় সর্বত্রই বিজয়ী, সুপ্রতিষ্ঠিত ও শক্তিমান। অন্যদিকে, তখন সমগ্র বাঙলাদেশে আর্যপূর্ব-সংস্কার ও সংস্কৃতিসম্পন্ন বিচিত্র কোমদের বাস, তাহারাও কম শক্তিমান নয়। তাহাদের নিজস্ব সংস্কার ও সংস্কৃতিবোধ গভীর ও ব্যাপক। কাজেই এই দেশে আর্য ব্রাহ্মণ্য-সংস্কার ও সংস্কৃতির বিজয়াভিযান বিনা বিরোধ ও বিনা সংঘর্ষে সম্পন্ন হয় নাই। বহু শতাব্দী ধরিয়া এই বিরোধ-সংঘর্ষ চলিয়াছিল, ইহা যেমন স্বভাবতই অনুমান করা চলে, তেমনিই ঐতিহাসিক সাক্ষ্য দ্বারাও তাহা সমর্থিত। লিপিপ্রমাণ হইতে মনে হয়, গুপ্তআমলে আর্য ব্রাহ্মণ্য রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে ব্রাহ্মণ্য বর্ণ-বিন্যাস, ধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতি এদেশে সম্যক স্বীকৃতই হয় নাই। তাহার পরেও ব্রাহ্মণ্য বর্ণ-বিন্যাসের নিম্নস্তরে ও তাহার বাহিরে সংস্কার ও সংস্কৃতির সংঘর্ষ বহুদিন চলিয়াছিল। সেন-বর্মন আমলে (একাদশ-দ্বাদশ শতকে) বর্ণ-সমাজের উচ্চস্তরে আর্যপূর্ব লোক-সংস্কৃতির পরাভব প্রায় সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বাঙালী সমাজের অন্তঃপুরে এবং একান্ত নিম্নস্তরে এই সংস্কার ও সংস্কৃতির প্রভাব আজও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। ব্রাহ্মণ্য বর্ণ-বিন্যাসের আদর্শ সেখানে শিথিল; দৈনন্দিন জীবনে ধর্মে, লোকাচারে, ব্যবহারিক আদর্শে, ভাবনা-কল্পনায় আজও সেখানে আর্যপূর্ব সমাজের বিচিত্র স্মৃতি ও অভ্যাস সুস্পষ্ট। মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যে, শিল্পে, ধর্মে, এমন কি বর্তমান বাঙালীর ধ্যানে মননে আচারে ব্যবহারেও এখনও সেই স্মৃতি বহমান, এ কথা কখনও ভুলিলে চলিবে না।

ঐতরেয় আরণ্যক গ্রন্থের "বয়াংসি বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদা" এই পদে কেহ কেহ বঙ্গ, মগধ, চের এবং পাণ্ড্য কোমের উল্লেখ আছে বলিয়া মনে করেন। এই সব কোমকে বলা হইয়াছে বয়াংসি বা 'পক্ষী-বিশেষাঃ' এবং ইহারা যে আর্য-সংস্কৃতির বহির্ভূত তাহাও ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এই পদটির পাঠ ও ব্যাখ্যা এইভাবে হইতে পারে কিনা এ-সম্বন্ধে মতভেদের অবসর বিদ্যমান। কিন্তু ঐতরেয় ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে পুণ্ড্র প্রভৃতি জনপদের লোকদিগকে যে 'দস্যু' বলা হইয়াছে এ-সম্বন্ধে সন্দেহের কোনো কারণ নাই। এই দুইটি ছাড়া আর কোনো প্রাচীনতম গ্রন্থেই প্রাচীন বাঙলার কোনও কোমের উল্লেখ নাই। বুঝা যাইতেছে, সেই প্রাচীনকালে আর্যভাষীরা তখন পর্যন্ত সমগ্র বাঙলাদেশের সঙ্গে পরিচিত হন নাই; পরবর্তী সংহিতা ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থাদি রচনার সময় তাঁহারা পুণ্ড্র, বঙ্গ, ইত্যাদি কোমের নাম শুনিতেছেন মাত্র। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের একটি গল্প এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ঋষি বিশ্বামিত্র একটি ব্রাহ্মণ বালককে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন; দেবতার প্রীত্যর্থে যজ্ঞে বালকটিকে আহুতি দিবার আয়োজন হইয়াছিল, সেইখান হইতে বিশ্বামিত্র তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছিলেন। যাহা হউক, পিতার এই পোষ্যপুত্রগ্রহণ বিশ্বামিত্রের পঞ্চাশটি পুত্রের সমর্থন লাভ করেন নাই। ক্রুদ্ধ বিশ্বামিত্র পুত্রদের অভিসম্পাত দেন যে, তাঁহাদের সন্তানেরা যে উত্তরাধিকার লাভ করিবে তাহা একেবারে পৃথিবীর প্রান্ততম সীমায় (বিকল্পে, তাঁহাদের বংশধরেরা একেবারে সর্বনিম্ন বর্ণ প্রাপ্ত হইবেন)। ইহারাই 'দস্যু' আখ্যাত অন্ধ্র, পুণ্ড্র, শবর, পুলিন্দ, এবং মুতিব কোমের জন্মদাতা। এই গল্পের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মহাভারতের এবং কতিপয় পুরাণের একটি গল্পেও শুনিতে পাওয়া যায়। মহাভারতের অন্যত্র, ভীমের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে বাঙলার সমুদ্রতীরবাসী কোমগুলিকে বলা হইয়াছে 'ম্লেচ্ছ'; ভাগবত পুরাণে কিরাত, হূণ, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কস, আভীর, যবন, খস এবং সুহ্ম কোমের লোকেদের বলা হইয়াছে 'পাপ'! বোধায়নের ধর্মসূত্রে আরট্ট (পঞ্জাব), পুণ্ড্র, (উত্তর-বঙ্গ) সৌবীর (দক্ষিণ পঞ্জাব ও সিন্ধুদেশ), বঙ্গ (পূর্ব-বাঙলা), কলিঙ্গ প্রভৃতি কোমের লোকদের অবস্থিতি নির্দেশ করা হইয়াছে আর্য-বহির্ভূত দেশের প্রত্যন্ততম সীমায়; ইহাদের বলা হইয়াছে "সংকীর্ণ যোনয়ঃ", ইহারা একেবারে আর্য সংস্কৃতির বাহিরে; এই সব জনপদের কেহ স্বল্পকালের প্রবাসে গেলেও ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, বোধায়নের কালে বাঙলাদেশের সঙ্গে পরিচয় যদি বা হইয়াছে, যাতায়াতও হয়তো কিছু কিছু আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু তখনও আর্য-ব্রাহ্মণ্য-সংস্কারের দৃষ্টিতে এই সব অঞ্চলের লোকেরা ঘৃণিত এবং অবজ্ঞাত। এই ঘৃণা ও অবজ্ঞা প্রাচীন আর্য, জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতেও কিছু কিছু দেখা যায়। আচারঙ্গ—আয়ারঙ্গ সূত্রের একটি গল্পে পথহীন রাঢ়দেশে মহাবীর এবং তাঁহার শিষ্যদের লাঞ্ছনা ও উৎপীড়নের যে-বর্ণনা

আছে, বজ্রভূমিতে যে অখাদ্য-কুখাদ্য ভক্ষণের ইঙ্গিত আছে তাহাতে এই ঘৃণা ও অবজ্ঞা সুস্পষ্ট। বৌদ্ধ আর্যমঞ্জুশ্রীমূল কল্প-গ্রন্থে গৌড়, পুণ্ড্র, সমতট ও হরিকেলের লোকেদের ভাষাকে বলা হইয়াছে 'অসুর' ভাষা। এইসব বিচিত্র উল্লেখ হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, ইহারা এমন একটি সুদীর্ঘকালের স্মৃতি-ঐতিহ্য বহন করে যে-কালে আর্যভাষা-ভাষী এবং আর্য-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক উত্তর ও মধ্যভারতের লোকেরা, পূর্বতম ভারতের বঙ্গ, পুণ্ড্র, রাঢ়, সুহ্ম প্রভৃতি কোমদের সঙ্গে পরিচিত ছিল না, যে-কালে এইসব কোমদের ভাষা ছিল ভিন্নতর, আচার-ব্যবস্থা অন্যতর। এই অন্যতর জাতি অন্যতর আচার-ব্যবহার, অন্যতর সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং অন্যতর ভাষাভাষী লোকেদের সেইজন্যই বিজেতা, উন্নত ও পরাক্রান্ততর জাতিসুলভ দর্পিত উন্নাসিকতায় বলা হইয়াছে 'দস্যু', 'ম্লেচ্ছ', 'পাপ, 'অসুর' ইত্যাদি।

কিন্তু এই দর্পিত উন্নাসিকতা বহুকাল স্থায়ী হয় নাই। নানা বিরোধ-সংঘর্ষের ভিতর দিয়া এইসব দস্যু, ম্লেচ্ছ, অসুর, পাপ কোমের লোকেদের সঙ্গে আর্যভাষাভাষী লোকেদের মেলামেশা হইতেছিল। এই সব বিরোধ-সংঘর্ষের কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত নানা পৌরাণিক গল্পে—রামায়ণে রঘুর দিগ্বিজয়, মহাভারতের কর্ণ, ও ভীমের দিগ্বিজয়, আচারঙ্গসূত্রে মহাবীরের রাঢ়দেশে জৈনধর্ম প্রচার ইত্যাদি প্রসঙ্গে। ইহাদের মধ্য দিয়াই আর্য ও আর্যপূর্ব সংস্কৃতির মিলনপথ প্রশস্ত হইতেছিল এবং আর্যপূর্ব সংস্কৃতির 'ম্লেচ্ছ' ও 'দস্যু'রা আর্যসমাজে স্বীকৃতি লাভ করিতেছিল। এই স্বীকৃতিলাভ ও আর্যসমাজে অন্তর্ভুক্তির দুইটি দৃষ্টান্ত আহরণ করা যাইতে পারে। রামায়ণে দেখা যাইতেছে, মৎস্য-কাশী কোশল কোমের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গ-অঙ্গ-মগধ কোমের রাজবংশগুলি অযোধ্যা রাজবংশের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইতেছেন। ইহাপেক্ষাও আর একটি অর্থবহ গল্প আছে বায়ু ও মৎস্যপুরাণে, মহাভারতে। এই গল্পে অসুররাজ বলির স্ত্রীর গর্ভে বৃদ্ধ অন্ধ ঋষি দীর্ঘতমসের পাঁচটি পুত্র উৎপাদনের কথা বর্ণিত আছে, এই পাঁচপুত্রের নাম অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র এবং সুহ্ম; ইহাদের নাম হইতেই পাঁচ পাঁচটি কোম জনপদের নামের উদ্ভব।

প্রাথমিক পরাভব ও যোগাযোগের পর বাঙলাদেশের এইসব দস্যু ও ম্লেচ্ছ কোমগুলি ধীরে ধীরে আর্যসমাজ ব্যবস্থায় কথঞ্চিৎ স্বীকৃতি ও স্থান লাভ করিতে আরম্ভ করিল। এই স্বীকৃতি ও স্থানলাভ যে একদিনে ঘটে নাই তাহা তো সহজেই অনুমেয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া একদিকে বিরোধ ও সংঘর্ষ অন্যদিকে স্বীকৃতি ও অন্তর্ভুক্তি চলিয়াছিল—কখনও ধীর শান্ত, কখনও দ্রুত তির্যক প্রবাহে, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক পরাভব ঘটিয়াছিল আগে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরাভব ঘটিয়াছিল ক্রমে ক্রমে, অনেক পরে, এ সম্বন্ধেও সন্দেহের অবসর কম। মানব ধর্মশাস্ত্রে আর্যাবর্তের সীমা দেওয়া হইয়াছে পশ্চিম সমুদ্র হইতে পূর্ব সমুদ্রতীর পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রাচীন বাঙলাদেশের

অন্তত কিয়দংশও আর্যাবর্তের অন্তর্গত, এই যেন ইঙ্গিত। মনু পুণ্ড্র কোমের লোকেদের বলিতেছেন, ব্রাত্য বা পতিত ক্ষত্রিয়, এবং তাহাদের পংক্তিভুক্ত করিতেছেন দ্রাবিড়, শক, চীন প্রভৃতি বৈদেশিক জাতিদের সঙ্গে। মহাভারতের সভাপর্বে কিন্তু বঙ্গ ও পুণ্ড্রদের যথার্থ ক্ষত্রিয় বলা হইয়াছে, জৈন প্রজ্ঞাপনা-গ্রন্থেও বঙ্গ এবং লাঢ় কোম দুটিকে আর্য কোম বলা হইয়াছে। শুধু তাহাই নয়, মহাভারতেই দেখিতেছি, প্রাচীন বাঙলার কোনও কোনও স্থান তীর্থ বলিয়া স্বীকৃত ও পরিগণিত হইতেছে, যেমন পুণ্ড্রভূমিতে করতোয়া তীর, সুহ্মদেশের ভাগীরথী সাগর-সঙ্গম। অর্জুন অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের তীর্থস্থানসমূহ পরিভ্রমণকালে ব্রাহ্মণদিগকে নানাপ্রকারে উপহৃত করিয়াছিলেন ; বাৎস্যায়ন তাঁহার কামসূত্রে (৩য়-৪র্থ শতক) গৌড়-বঙ্গের ব্রাহ্মণদের উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ, বাঙলা এবং বাঙালীর আর্যীকরণ ক্রমশ অগ্রসর হইতেছে, ইহাই এই সব পুরাণকথার ইঙ্গিত। এই ইঙ্গিতের সমর্থন পাওয়া যায় মহাভারত ও পুরাণগুলিতে। বায়ু ও মৎস্যপুরাণে, মহাভারতে বঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্রদের তো ক্ষত্রিয়ই বলা হইয়াছে, এমন কি শবর, পুলিন্দ এবং কিরাতদেরও। কোনও কোনও বংশ যে ব্রাহ্মণ পর্যায়েও স্বীকৃত ও অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, ঋষি দীর্ঘতমসের গল্পটি তাহার কতকটা প্রমাণ বহন করে। কিন্তু অধিকাংশ বিজিত লোকই স্বীকৃত ও অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল শূদ্রবর্ণ পর্যায়ে, এ-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। মনু বলিতেছেন, পৌণ্ড্রক ও কিরাতেরা ক্ষত্রিয় ছিল, কিন্তু বহুদিন তাহারা ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সংস্পর্শে না আসায় ব্রাহ্মণ্য পূজাচার প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়াছিল, এবং সেই হেতু তাহাদের শূদ্র পর্যায়ে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। অন্যান্য কোমদের ক্ষেত্রেও বোধ হয় এইরূপ হইয়া থাকিবে। মনু কৈবর্তদের বলিয়াছেন সংকর বর্ণ, কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ তাহাদের বলিতেছে "অব্রহ্মণ্য," অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য সমাজ বহির্ভূত। কিন্তু, এক দিকে স্বীকৃতি-অন্তর্ভুক্তি এবং আর একদিকে উন্নীত-অবনীতকরণ যাহাই চলিতে থাকুক না কেন, এ-তথ্য সুস্পষ্ট যে আর্য-সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আর্য বর্ণ-বিন্যাসও বাঙলা দেশে ক্রমশ তাহার মূল প্রতিষ্ঠিত করিতেছিল। শুধু ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বীরাই যে আর্য-সংস্কৃতি ও সমাজ-ব্যবস্থা বাঙলাদেশে বহন করিয়া আনিয়াছিলেন তাহাই নয়, জৈন ও বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরাও এ-সম্বন্ধে সমান কৃতিত্বের দাবি করিতে পারেন। তাঁহারা বেদবিরোধী ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু আর্য সমাজ-ব্যবস্থা বিরোধী ছিলেন না, এবং বর্ণ-ব্যবস্থাও একেবারে অস্বীকার করেন নাই।

মৌর্য ও শুঙ্গাধিপত্যের সঙ্গে সঙ্গে এবং তাহাকে আশ্রয় করিয়া আর্য-সংস্কৃতি ও সমাজ-ব্যবস্থা ক্রমশ বাঙলাদেশে অধিকতর প্রসার লাভ করিয়াছিল সন্দেহ নাই, বিশেষত ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী রাষ্ট্রের আধিপত্যকালে। কিন্তু, মহাস্থান লিপির গলদন পুরাদস্তুর দেশজ বাঙলা নাম বলিয়াই মনে হইতেছে ; গলদনকে সংস্কৃত গলর্দন করিলেও তাহার দেশজ রূপ অপরিবর্তিতই থাকিয়া যায়। লিপিটির ভাষা প্রাকৃত ; মৌর্য আমলের

সব লিপির ভাষাই তো তাহাই ; কিন্তু রাষ্ট্রে যে আর্য সামাজিক আদর্শ গৃহীত ও স্বীকৃত হইতেছিল তাহা সুস্পষ্ট। বোধ হয় এই সময় হইতেই ব্যবসা-বাণিজ্য, ধর্মপ্রচার, রাষ্ট্রকর্ম প্রভৃতিকে আশ্রয় করিয়া অধিকতর সংখ্যায় উত্তর ভারতীয় আর্যভাষীরা বাঙলাদেশে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করিতে থাকে। কিন্তু আর্য, বৌদ্ধ, জৈন এবং সর্বোপরি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির পুরোপুরি প্রতিষ্ঠা গুপ্তকালের আগে হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না, এবং আর্য-ব্রাহ্মণ্য বর্ণ-ব্যবস্থাও বাঙলাদেশে বোধ হয় তাহার আগে দানা বাঁধিয়া গড়িয়া উঠে নাই।

৪

বাঙলাদেশের অধিকাংশ জনপদ গুপ্তসাম্রাজ্যভুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী সমাজ উত্তর-ভারতীয় আর্য-ব্রাহ্মণ্য বর্ণ-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হইতে আরম্ভ করে। এই যুগের লিপিমালাই তাহার নিঃসংশয় সাক্ষ্য বহন করিতেছে। লিপিগুলি বিশ্লেষণ করিলে অনেকগুলি তথ্য জানা যায়।

গুপ্ত পর্বের বর্ণ-বিন্যাস

প্রথমেই সংবাদ পাওয়া যাইতেছে অগণিত ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণ্য প্রতিষ্ঠানের। ১নং দামোদরপুর লিপিতে (খ্রীষ্ট শতক ৪৪৩-৪৪) জনৈক কর্পটিকনামীয় ব্রাহ্মণ অগ্নিহোত্র যজ্ঞকার্য সম্পাদনের জন্য ভূমি ক্রয় প্রার্থনা করিতেছেন ; ২ নং পট্টোলী দ্বারা (৪৪৮-৪৯) পঞ্চ মহাযজ্ঞের জন্য আর এক ব্রাহ্মণকে ভূমি দেওয়া হইতেছে, ধনাইদহ পট্টোলীর (৪৩২-৩৩) বলে কর্কনিবাসী এক ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ কিছু ভূমি লাভ করিতেছেন ; ৩ নং দামোদরপুর লিপিতে (৪৮২-৮৩) পাইতোহি নাভক নামে এক ব্যক্তি কয়েকজন প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ বসাইবার জন্য কিছু ভূমি ক্রয় করিতেছেন ; ৪ নং দামোদরপুর লিপিতে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, নগরশ্রেষ্ঠী রিভুপাল হিমালয়ের পাদদেশে ডোঙ্গাগ্রামে কোকামুখস্বামী, শ্বেতবরাহস্বামী এবং নামলিঙ্গের পূজা ও সেবার জন্য ভূমি ক্রয় করিতেছেন ; বৈগ্রাম পট্টোলীর (৪-৭-৪৮) সংবাদ, ভোয়িল এবং ভাস্কর নামে দুই ভাই গোবিন্দস্বামীর নিত্য পূজার জন্য ভূমি ক্রয় করিতেছেন ; ৫ নং দামোদর পট্টোলীতে (৫৩৩-৪৪) দেখিতেছি শ্বেতবরাহস্বামীর মন্দির সংস্কারের জন্য ভূমি ক্রয় করিতেছেন অযোধ্যাবাসী কুলপুত্রক অমৃতদেব। এই সব ক'টি লিপি পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্গত ভূমি সম্বন্ধীয়। এই অনুমান নিঃসংশয় যে, পঞ্চম শতকে উত্তরবঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্ম স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে, এই ধর্মের দেবদেবীরা পূজিত হইতেছেন, ব্রাহ্মণদের বসবাস বিস্তৃত হইতেছে, অব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণদের ভূমিদান

করিতেছেন, আনিয়া বসবাস করাইতেছেন, এবং অযোধ্যাবাসী ভিন্-প্রদেশিরাও আসিয়া এই দেশে মন্দির সংস্কার করাইবার জন্য ভূমি ক্রয় করিতেছেন। যে-সব ব্রাহ্মণেরা আসিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে বেদবিদ্ ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণও আছেন। উত্তর-বঙ্গের সংবাদ বোধ হয় আরও পাওয়া যায় কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার নিধনপুর লিপিতে। লিপিটি সপ্তম শতকের; পট্টোলী কর্ণসুবর্ণ জয়স্কন্ধাবার হইতে নির্গত; দত্তভূমি চন্দ্রপুরি বিষয়ের ময়ূরশাল্মলাগ্রহার ক্ষেত্র, এবং এই ভূমিদানকার্য ভাস্করের চারি পুরুষ পূর্বে বৃদ্ধপ্রপিতামহ ভূতিবর্মাদ্বারা (আনুমানিক ষষ্ঠ শতকের প্রথম পাদ) প্রথম সম্পাদিত হইয়াছিল। চন্দ্রপুরি বিষয় বা ময়ূরশল্মল অগ্রহার কোথায় তাহা আজও নিঃসংশয়ে নির্ণীত হয় নাই, তবে উত্তর-বঙ্গের পূর্বতম সীমায় (রংপুর জেলায়) কিংবা একেবারে শ্রীহট্ট জেলার পঞ্চম খণ্ড লিপির আবিষ্কার স্থান-অঞ্চল, এ-দুয়ের এক জায়গায় হওয়াই সম্ভব, যদিও রংপুর অঞ্চল হওয়াই অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। যাহাই হউক, এই লিপিতে দেখা যাইতেছে, ময়ূরশাল্মল অগ্রহারে ভূতিবর্মা ভিন্ন ভিন্ন বেদের ৫৬টি বিভিন্ন গোত্রীয় অন্তত ২০৫ জন 'বৈদিক' বা 'সাম্প্রদায়িক' ব্রাহ্মণের বসতি করাইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেরা সকলেই বাজসনেয়ী, ছান্দোগ্য, বাহ্বৃচ্য, চারক্য এবং তৈত্তিরীয়, এই পাঁচটি বেদ-পরিচয়ের অন্তর্গত, তবে যজুর্বেদীয় বাজসনেয়ী-পরিচয়ের সংখ্যাই অধিক। চারক্য এবং তৈত্তিরীয়েরাও যজুর্বেদীয়; বাহ্বৃচ্য ঋগ্বেদীয়; ছান্দোগ্য সামবেদীয়। ইঁহাদের অধিকাংশের পদবী স্বামী। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, ষষ্ঠ শতকের গোড়াতেই উত্তরপূর্ব বাঙলায় (ভিন্ন মতে, শ্রীহট্ট অঞ্চলে) পুরাদস্তুর ব্রাহ্মণ-সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। পূর্বোক্ত অন্যান্য লিপির সাক্ষ্যও তাহাই। ভূমি দানবিক্রয় যে সব গ্রামবাসীর উপস্থিতিতে নিষ্পন্ন হইতেছে তাহাদের মধ্যে অনেক ব্রাহ্মণের দর্শন মিলিতেছে; ইঁহাদের নামপদবী শর্মা এবং স্বামী দুইই পাওয়া যাইতেছে।

পশ্চিমবঙ্গের খবর পাওয়া যাইতেছে বিজয়সেনের মল্লসারুল লিপি (ষষ্ঠ শতক) এবং জয়নাগের বপ্যঘোষবাট লিপিতে (সপ্তম শতক)। শেষোক্ত লিপিটিদ্বারা মহা-প্রতীহার সূর্যসেন বপ্যঘোষবাটনামক একটি গ্রাম ভট্ট ব্রহ্মবীর স্বামী নামে এক ব্রাহ্মণকে দান করিতেছেন; এই লিপিতেই খবর পাওয়া যাইতেছে কুক্কুট গ্রামের ব্রাহ্মণদের; ভট্ট উন্মীলন স্বামী এবং ভর্গাণ স্বামী নামে আরও দুইটি ব্রাহ্মণের দেখা এখানেই মিলিতেছে: এক্ষেত্রেও নাম-পদবী স্বামী। মল্লসারুল লিপিতে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, দৈনিক পঞ্চ-মহাযজ্ঞ নিষ্পন্নের জন্য মহারাজ বিজয়সেন বৎসস্বামী নামক জনৈক ঋগ্বেদীয় ব্রাহ্মণকে কিছু ভূমি দান করিতেছেন। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, রাঢ়-রাষ্ট্রেও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও বর্ণব্যবস্থা ষষ্ঠ সপ্তম শতকেই স্বীকৃত ও প্রসারিত হইয়াছে। এই তথ্যের প্রমাণ আরও পাওয়া যায়, সম্প্রতি আবিষ্কৃত শশাঙ্কের মেদিনীপুর লিপি দুইটিতে। মেদিনীপুর

জেলায় দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে দণ্ডভুক্তিদেশেও যে ব্রাহ্মণ্য বর্ণব্যবস্থা স্বীকৃত হইয়াছিল, তাহা সিদ্ধান্ত করা যায় ইহাদের সাক্ষ্যে।

মধ্য ও পূর্ববঙ্গেও এই যুগে অনুরূপ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। গোপচন্দ্রের একটি পট্টোলীদত্ত ভূমির দানগ্রহীতা হইতেছেন, লৌহিত্য-তীরবাসী জনৈক কাণ্বগোত্রীয় ব্রাহ্মণ, ভট্টগোমীদত্ত স্বামী। যে মণ্ডলে (বারকমণ্ডলে, ফরিদপুর জেলায়) দত্ত ভূমির অবস্থিতি তাহার শাসনকর্তাও ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ, তাঁহার নাম বৎসপাল স্বামী। এই বংশের আর এক রাজা ধর্মাদিত্যের একটি পট্টোলীদত্ত ভূমির দানগ্রহীতা হইতেছেন ব্রাহ্মণ চন্দ্রস্বামী, আর একটির জনৈক বসুদেব স্বামী। শেষোক্ত পট্টোলীতে গর্গস্বামী নামে আর এক ব্রাহ্মণের ভূমিরও খবর পাওয়া যাইতেছে। তখনও বারকমণ্ডলের শাসনকর্তা একজন ব্রাহ্মণ, নাম গোপালস্বামী। ধর্মাদিত্যের প্রথম পট্টোলীটিতে গ্রামবাসীদের মধ্যেও দুইজন ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে বলিয়া মনে হয়; একজনের নাম বৃহচ্চট্ট, আর একজনের, কুলস্বামী। মহারাজ সমাচারদেবের ঘুগ্রাহাটি লিপির দত্তভূমির দানগ্রহীতাও একজন ব্রাহ্মণ, নাম সুপ্রতীক স্বামী এবং দান-গ্রহণের উদ্দেশ্য বলিচরুসত্র প্রবর্তন। ষষ্ঠ শতকের ফরিদপুর ও সপ্তম শতকের ত্রিপুরার লোকনাথ লিপির সাক্ষ্যও একই প্রকার; এখানেও দেখিতেছি জনৈক ব্রাহ্ম. মহাসামন্ত প্রদোষশর্মণ অনন্তনারায়ণ মন্দির প্রতিষ্ঠা এবং ২১১ জন চতুর্বেদবিদ্যা ব্রাহ্মণ বসতি করাইবার জন্য পশুসংকুল বনপ্রদেশে ভূমিদান গ্রহণ করিতেছেন। গ্রামকূটাম্ব অর্থাৎ গৃহস্থদের মধ্যে শর্মা ও স্বামী পদবীযুক্ত অনেক নাম পাইতেছি, যথা মঘশর্মা, হরিশর্মা, বুষ্টশর্মা, অহিশর্মা, গুপ্তশর্মা, ব্রহ্মশর্মা, শুক্রশর্ম, কৈবর্তশর্মা, হিমশর্মা, লক্ষ্মণশর্মা, নাথশর্মা, অলাতস্বামী, ব্রহ্মস্বামী, মহাসেনভট্টস্বামী, বামনস্বামী, ধনস্বামী, জীবস্বামী, ইত্যাদি।

শুধু যে ব্রাহ্মণেরাই ভূমিদান লাভ করিতেছেন তাহাই নয়; জৈন ও বৌদ্ধ আচার্যরা এবং তাঁহাদের প্রতিষ্ঠানগুলিও অনুরূপ ভূমিদান লাভ করিয়াছেন। পঞ্চম শতকে উত্তরবঙ্গে পাহাড়পুর অঞ্চলে প্রাপ্ত একটি লিপিতে দেখিতেছি (৪৭৮-৭৯ খ্রী) জনৈক ব্রাহ্মণ নাথশর্মা এবং তাঁহার স্ত্রী রামী এক জৈন আচার্য গুহনন্দির বিহারে দানের জন্য কিছু ভূমি ক্রয় করিতেছেন। ষষ্ঠ শতকে (গুনাইঘর লিপি, ৫০৭-৮ খ্রী) ত্রিপুরা জেলার জনৈক মহাযানাচার্য শান্তিদেব প্রতিষ্ঠিত আর্য অবলোকিতেশ্বরের আশ্রম-বিহারের মহাযানিক অবৈবর্তিক ভিক্ষুসংঘের জন্য মহারাজ বুদ্ধদত্ত কিছু ভূমি দান করিতেছেন। এই লিপিটিতেও একজন ব্রাহ্মণ কুমারামাত্য বেৎসজ স্বামীর সংবাদ পাইতেছি। সপ্তম-অষ্টম শতকে ঢাকা জেলার আস্রফপুর অঞ্চলে দেখিতেছি জনৈক বৌদ্ধ আচার্য বন্দ্য সংঘমিত্র তাঁহার বিহার ইত্যাদির জন্য স্বয়ং রাজার নিকট হইতে প্রচুর ভূমিদান লাভ করিতেছেন।

ব্রাহ্মণদের পদবী ও গাঁঞি (?) পরিচয়

উপরোক্ত তথ্য বিশ্লেষণ হইতে দেখা যাইতেছে শর্মা ও স্বামী পদবী ছাড়া ব্রাহ্মণদের বোধ হয় অন্য পদবী-পরিচয়ও ছিল। যেমন, বৃহচ্চট্ট নামে চট্ট; ভট্ট গোমিদত্ত স্বামী, ভট্ট ব্রহ্মবীর স্বামী, ভট্ট উন্মীলন স্বামী, ভট্ট বামন স্বামী, মহাসেন ভট্ট স্বামী এবং শ্রীনেত্র ভট (ভট্ট) প্রভৃতির নামে ভট্ট; এবং বন্দ্য জ্ঞানমতি ও বন্দ্য সংঘমিত্র নামে বন্দ্য। বৃহচ্চট্টের চট্ট নামের অংশমাত্র বলিয়া মনে হইতেছে না। ব্রহ্মবীর, উন্মীলন, বামন এবং মহাসেন যে ব্রাহ্মণ তাহা তাঁহাদের স্বামী পদবীতেই পরিষ্কার; কিন্তু তাহার পরেও যখন তাঁহাদের নামের পূর্বে অথবা মধ্যে অথবা পরে ভট্ট ব্যবহৃত হইতেছে তখন ভট্ট তাঁহাদের "গাঁঞি" পরিচয় হইলেও হইতে পারে। অথবা, পণ্ডিত বা আচার্য অর্থেও 'ভট্ট' কথা ব্যবহৃত হইয়া থাকিতে পারে। পরবর্তীকালের 'ভাট' অর্থ এই ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। শ্রীনেত্র ভট স্পষ্টই শ্রীনেত্র ভট্ট, এবং এক্ষেত্রে ভট্ট ব্যবহৃত হইয়াছে নামের পরে। বন্দ্য পূজনীয় অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকিতে পারে, অন্তত আচার্য বন্দ্য সংঘমিত্রের ক্ষেত্রে। কিন্তু বন্দ্য জ্ঞানমতির ক্ষেত্রেও কি তাহাই? এক্ষেত্রে বন্দ্য "গাঁঞি" পরিচয় হওয়া অসম্ভব নয়। চট্ট এবং বন্দ্য যে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের অসংখ্য "গাঁঞি"-পরিচয়ের মধ্যে দু'টি, এ-তথ্য পরবর্তী স্মৃতি ও কুলজী-গ্রন্থে জানা যায়। 'ভট্ট' সম্বন্ধে কিছু জোর করিয়া বলা যায় না। যাহাই হউক, ষষ্ঠ সপ্তম শতকেই এই "গাঁঞি" পরিচয়ের রীতি প্রচলিত হইয়াছিল, ইহা অসম্ভব এবং অনৈতিহাসিক না ও হইতে পারে।

ব্রাহ্মণদের শর্মা পদবী-পরিচয় বাঙলাদেশে আজও সুপ্রচলিত। কিন্তু স্বামী পদবী-পরিচয় মধ্যযুগের সূচনা হইতেই অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে। নিধনপুর-লিপির সাক্ষ্য ও শ্রীহট্ট অঞ্চলের লোকস্মৃতি হইতে মনে হয়, ঐ লিপির দুই শতাধিক স্বামী পদবীযুক্ত ব্রাহ্মণেরা বৈদিক (পরবর্তী কালের, সাম্প্রদায়িক) ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। অনুমান হয়, ইঁহারা সকলেই বাঙলাদেশের বাহির হইতে, পশ্চিম বা দক্ষিণ হইতে, আসিয়াছিলেন। ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে তো এখনও ব্রাহ্মণদের স্বামী পদবী সুপ্রচলিত; প্রাচীনকালেও তাহাই ছিল। উত্তর-ভারতেও যে তাহা ছিল তাহার প্রমাণ গুপ্তযুগের লিপিমালায়ই পাওয়া যায়। পরবর্তীকালের কুলজী-গ্রন্থে বৈদিক ব্রাহ্মণদের দুই শাখার পরিচয় পাওয়া যায়: পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য। এই সব স্বামী পদবীযুক্ত ব্রাহ্মণেরা পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ হওয়া অসম্ভব নয়। ধনাইদহ পট্টোলীর দানগ্রহীতা বরাহস্বামী ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ, এবং তিনি আসিয়াছিলেন উড়িষ্যান্তর্গত কটক অঞ্চল হইতে। গোপচন্দ্রের একটি পট্টোলীর দানগ্রহীতা ব্রাহ্মণটির নাম গোমিদত্ত স্বামী; তিনি কাশ্বগোত্রীয় এবং লৌহিত্যতীরবাসী। লৌহিত্য-তীরবর্তী কামরূপের ব্রাহ্মণেরা তো আজও নিজেদের পাশ্চাত্য বৈদিক বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। অবশ্য, স্বামী পদবীর উপর নির্ভর করিয়া এ-সম্বন্ধে নিঃসংশয় সিদ্ধান্ত কিছু করা চলে না।

বাহির হইতে ব্রাহ্মণেরা যে বাঙলাদেশে আসিতেছেন তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ অযোধ্যাবাসী কুলপুত্রক অমৃতদেব স্বয়ং।

এই সব ব্রাহ্মণদের ছাড়া পঞ্চম হইতে অষ্টম শতক পর্যন্ত লিপিগুলিতে রাজকর্মচারী, গ্রামবাসী গৃহস্থ, প্রধান প্রধান লোক, নগরবাসী শ্রেষ্ঠী, সার্থবাহ এবং অন্যান্য লোকের নাম-পরিচয়ও পাওয়া যাইতেছে। কয়েকটি নামের উল্লেখ করা যাইতে পারে ঃ যথা চিরাতদত্ত বেত্রবর্মা, ধৃতিপাল, বন্ধুমিত্র, ধৃতিমিত্র শাম্বপাল, রিশিদত্ত (লক্ষণীয় এই যে, নামটির বানান ঋষিদত্ত হওয়া উচিত ছিল; সংস্কৃত রীতিপদ্ধতি তখনও অভ্যস্ত হয় নাই বলিয়া মনে করা চলে), জয়নন্দি, বিভুদত্ত, গুহনন্দি, দিবাকরনন্দি, ধৃতিবিষ্ণু, বিরোচন, রামদাস, হরিদাস, শশিনন্দী, দেবকীর্তি, ক্ষেমদত্ত, গোষ্ঠক, বর্গপাল, পিঙ্গল, সুংকুক, বিষ্ণুভদ্র, খাসক, রামক, গোপাল, শ্রীভদ্র, সোমপাল, রাম, পত্রদাস, স্থায়নপাল, কপিল, জয়দত্ত, শণ্ডক, রিভুপাল, কুলবৃদ্ধি, গোয়িল, ভাস্কর, নবনন্দী, জয়নন্দী, ভটনন্দী, শিবনন্দী, দুর্গাদত্ত, হিমদত্ত, অর্কদাস, রুদ্রদত্ত, ভীম, ভামহ, বৎসভোজিক, নরদত্ত, বরদত্ত, বাম্পিয়ক, আদিত্যবন্ধু, জোলারি, নাগিজোদক, বুদুক, কলক, সূর্য, মহীপাল, খন্দাবিদুর্গগরিক, মণিভদ্র, যজ্ঞরাত, নাদভদক, গণেশ্বর, জিতসেন, রিভুপাল, স্থাণুদত্ত, মতিদত্ত, বিপ্রপাল, স্কন্দপাল, জীবদত্ত, পবিত্রুক, দামুক, বৎসকুণ্ড, শুচিপালিত, বিহিতঘোষ, শূরদত্ত, প্রিয়দত্ত, জনার্দন, কুণ্ড, করণিক, নয়নাগ, কেশব, ইটিত, কুলচন্দ্র, গরুড়, আলুক, অনাচার, ভাশৈত্য, শুভদেব, ঘোষচন্দ্র, অনমিত্র, গুণচন্দ্র, কলসখ, দুর্লভ, সত্যচন্দ্র, প্রভুচন্দ্র, রুদ্রদাস, অর্জুনবপ্প (সোজাসুজি অর্জুনের বাপের সংস্কৃত রূপ; এই ধরনের ডাক নাম আজও বাঙলার পাড়াগাঁয়ে প্রচলিত), কুণ্ডলিপ্ত, নাগদেব, নয়সেন সোমঘোষ, জন্মভূতি, সূর্যসেন, লক্ষ্মীনাথ, শ্রীমিত্রাবলি, বর্ণটিয়োক, শর্বান্তর, শিখর, পুরদাস, শন্ডুক, উপাশক, স্বস্তিয়োক, সুলব্ধ, রাজদাস, দুর্গগট্ট ইত্যাদি। এই নামগুলি বিশ্লেষণ করিলে কয়েকটি তথ্য গোচর হয়। প্রথমত, অধিকাংশ নামের রূপ সংস্কৃত। কতকগুলি নামের দেশজ রূপ হইতে সংস্কৃতীকরণ হইয়াছে, যেমন বাম্পিয়ক, খন্দাবিদুর্গগরিক, অর্জুনবপ্প, বর্ণটিয়োক, দুর্গগট্ট ইত্যাদি; আর কতকগুলি নামরূপ দেশজই থাকিয়া গিয়াছে, যেমন, জোলারি, নাগিজোদক, কলক, নাদভদক, দামুক, আলুক, কলসখ, ইটিত, সংখুড়, খাসক ইত্যাদি। 'অক্' বা 'ওক্' প্রত্যয় জুড়িয়া দিয়া দেশজ বা ভাষা শব্দের নামকে সংস্কৃত ক-কারান্ত পদরূপে দেখাইবার যে রীতি আমরা পরবর্তীকালে বাঙলাদেশে প্রচলিত দেখিতে পাই (যেমন সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থে গৌড়-বঙ্গের কবিদের নাম-পরিচয়ে, এবং অন্যত্র) তাহাও এই যুগেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, যথা, খাসক, রামক, বাম্পিয়ক, বর্ণটিয়োক, নাগিজোদক, নাদভদক, স্বস্তিয়োক ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিগত নামে জনসাধারণ সাধারণত কোনও পদবী ব্যবহার করিত না, শুধু পূর্বনামেই পরিচিত হইত (তেমন নামের সংখ্যাই অধিক), যেমন, পিঙ্গল, গোপাল, শ্রীভদ্র, রাম, কপিল, বিরোচন,

দেবকীর্তি, গোষ্ঠক, শণ্ডক,ভোয়িল, ভাস্কর, ভামহ, বুদ্ধক, সূর্য, পবিত্রুক, করণিক, কেশব, গরুড় অনাচার ভাশৈত্য, দুর্লভ, শঠান্তর, শিখর, শত্রুক, উপাসক, সুলম্ব, গরুড় ইত্যাদি। তৃতীয়ত, এই নামগুলির মধ্যে কতকগুলি অন্ত্যনামের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে যেগুলি এখনও বাঙলাদেশে নাম পদবী হিসাবে ব্যবহৃত হয়, যেমন, দত্ত, পাল, মিত্র, নন্দি-নন্দী, বর্মণ, দাস, ভদ্র, সেন, দেব, ঘোষ, কুণ্ড, পালিত, নাগ, চন্দ্র, এমন কি দাম (দাঁ), ভূতি, বিষ্ণু, যশ, শিব, রুদ্র ইত্যাদি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে এগুলি অন্ত্যনাম এ-সম্বন্ধে সন্দেহ করা চলে না; তবে কোন কোন ক্ষেত্রে নামেরই অংশ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, এই অনুমানও হয়তো করা চলে। চতুর্থত, এই সব অন্ত্যনাম আজকাল যেমন বর্ণজ্ঞাপক, পঞ্চম-অষ্টম শতকে তেমন ছিল না, তবে ব্রাহ্মণেতর বর্ণের লোকেরাই এই অন্ত্যনামগুলি ব্যবহার করিতেন; ব্রাহ্মণেরা শুধু শর্মা বা স্বামী পদবী এবং ভট্ট, চট্ট, বন্দ্য প্রভৃতি "গাঞি"-পরিচয় গ্রহণ করিতেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত বোধ হয় করা যায়। বাঙলাদেশে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য তথাকথিত 'ভদ্র' জাতের মধ্যে (বৃহদ্ধর্মপুরাণোক্ত উত্তম-সংকর ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণোক্ত সৎশূদ্র জাতের মধ্যে) চন্দ্র, গুপ্ত, নাগ, দাস, আদিত্য, নন্দী, মিত্র, শীল, ধর, কর, দত্ত, রক্ষিত, ভদ্র, দেব, পালিত প্রভৃতি নামাংশ বা পদবীর ব্যবহার এই সময় হইতে আরম্ভ হইয়া হিন্দু আমলের শেষেও যে চলিতেছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় সদুক্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থের গৌড়-বঙ্গীয় কবিদের নামের মধ্যে। একথা সত্য, বাঙলার বাহিরে, বিশেষভাবে গুজরাত, কাথিয়াবাড় অঞ্চলে, প্রাচীন কালে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের মধ্যেও দত্ত, নাগ, মিত্র, ঘোষ, এবং বর্মা ইত্যাদি অন্ত্যনামের ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু বাঙলার এই লিপিগুলিতে এই সব অন্ত্যনাম যে-সব ক্ষেত্রে ব্যবহার হইতেছে, তাঁহাদের একজনকেও ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে হইতেছে না; ব্রাহ্মণেরা যেন সর্বত্রই শর্মা বা স্বামী এই অন্ত্যনামে পরিচিত হইতেছেন, অথবা ভট্ট, চট্ট, বন্দ্য প্রভৃতি উপ বা অন্ত্যনামে।

লিপিগুলিতে অনেক ব্যক্তি-নামের উল্লেখ যেমন আছে, তেমনই আছে অনেক স্থান-নামের উল্লেখ। এই নামগুলি বিশ্লেষণ করিলেও দেখা যায়, কতকগুলি নামের রূপ পুরাপুরি সংস্কৃত, যেমন, পুণ্ড্রবর্ধন, কোটীবর্ষ, পঞ্চনগরী, নব্যাবকাশিকা, সুবর্ণবীথি, ঔদম্বরিক (বিষয়), চণ্ডগ্রাম, কর্মান্তবাসক, শিলাকুণ্ড, পলাশবৃন্দক, স্বচ্ছন্দপাটক ইত্যাদি। কতকগুলি নামের দেশজরূপ হইতে সংস্কৃতীকরণ হইয়াছে, যেমন, বায়িগ্রাম, পৃষ্ঠিম-পোট্টক গোষাটপুঞ্জক, খাড়া(টা)পার, ত্রিবৃতা, ত্রিঘট্টিক, রোল্লবায়িকা ইত্যাদি। আবার, কতকগুলির নাম এখনও দেশজ রূপেই থাকিয়া গিয়াছে, যেমন কুট্‌কুট্, নাগিরট্ট, ডোঙ্গা (গ্রাম), কণমোটিকা ইত্যাদি। মনে হয়, ব্যক্তি নামের ক্ষেত্রে যেমন স্থান-নামের ক্ষেত্রেও তেমনই আর্যীকরণ দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

কায়স্থ-করণ

উপরোক্ত অন্ত্যনামগুলি যাঁহাদের ব্যক্তিনামের সঙ্গে ব্যবহৃত হইতেছে তাঁহারা কোন বর্ণ বা উপবর্ণের স্থির করিবার কোনও উপায় নাই, একথা আগেই বলিয়াছি। এই যুগের লিপিগুলিতে কায়স্থ নামে পরিচিত এক শ্রেণীর রাজকর্মচারীর সংবাদ পাওয়া যায়, যেমন প্রথম-কায়স্থ শাম্বপাল, স্কন্দপাল, বিপ্রপাল, করণ-কায়স্থ নরদত্ত, কায়স্থ প্রভুচন্দ্র, রুদ্রদাস, দেবদত্ত, কৃষ্ণদাস, জ্যেষ্ঠকায়স্থ নলসেন, ইত্যাদি। ইঁহারা যে রাজ-কর্মচারী এ-সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই। কায়স্থ বলিতে মূলত কোনও বর্ণ বা উপবর্ণ বুঝাইত না। কোষকার বৈজয়ন্তী (একাদশ শতক) কায়স্থ অর্থে বলিতেছেন লেখক, এবং কায়স্থ ও করণ সমার্থক, ইহাও বলিতেছেন। ক্ষীরস্বামী কৃত অমরকোষের টীকায়ও করণ বলিতে কায়স্থদের মতই একশ্রেণীর রাজকর্মচারীকে বুঝান হইয়াছে। গাহড়বালরাজ গোবিন্দচন্দ্রের দুইটি পট্টোলীর লেখক জল্হণ একটিতে নিজের পরিচয় দিতেছেন কায়স্থ বলিয়া, আর একটিতে তিনি "কর্ণাণিকোদ্গতো"। চান্দেল্লরাজ ভোজবর্মার অজয়গড় লিপিতেও করণ ও কায়স্থ সমার্থকবলিয়া ধরা হইয়াছে। কায়স্থরা যে রাজকর্মচারী তাহা প্রাচীন বিষ্ণু ও যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিদ্বারাও সমর্থিত। বিষ্ণু-স্মৃতিমতে তাঁহারা রাজকীয় দলিল-পত্রাদির লেখক ছিলেন, যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির টীকাকার বলেন কায়স্থরা ছিলেন লেখক ও হিসাবরক্ষক। এখনও তো বিহার অঞ্চলে হিসাব রাখার লিখনপদ্ধতির যে বিশিষ্ট ধরন তাহাকে বলা হয় "কাইথী" লিপি। করণ শব্দও লেখক ও হিসাবরক্ষক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; সমস্ত পরবর্তী সাক্ষ্যের ইঙ্গিতই এই-রূপ *। দু'এক ক্ষেত্রে মাত্র করণ ও কায়স্থ দুইটি শব্দ পৃথক পৃথক ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, যেমন ৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের পুরমৃহা তাম্র পট্টোলীতে। বৃহদ্ধর্মপুরাণে কিন্তু করণ ও কায়স্থ সমার্থক বলা হইয়াছে। উত্তর-বিহারে করণ সম্প্রদায় এখনও কায়স্থদেরই একটি শাখা বলিয়া পরিগণিত; উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থরা আজও অনেকে নিজেদের করণ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। মেদিনীপুর, ওড়িষ্যা ও মধ্য প্রদেশের করণরা চিত্রগুপ্তকেই তাঁহাদের আদিপুরুষ বলিয়া মনে করেন; বাঙালী কায়স্থরাও তো তাহাই করেন। প্রাচীনকালে যাহাই হউক, পরবর্তীকালে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় নবম-দশম শতক নাগাদ বাঙলাদেশে করণ ও কায়স্থ সমার্থক বলিয়াই বিবেচিত হইত; ভারতের অন্যত্রও হইত। বাঙলাদেশে করণেরা ক্রমে কায়স্থ নামের মধ্যেই বিলীন হইয়া গিয়াছিলেন।

---

* করণ কথার মূল অর্থ, খোদাই যন্ত্র, কাটিবার যন্ত্র; এই অর্থে 'করুণ' কথাটি আজও ব্যবহৃত হয়। ইতিহাসের গোড়ার দিকে লেখার কাজটা নতুন জাতীয় কোন খোদাই যন্ত্রদ্বারাই বোধ হয় নিষ্পন্ন হইত। সেই অর্থে পরবর্তীকালে লেখক মাত্রেই সম্ভবত 'করণ' নামে পরিচিত হইতেন। কোন সময় হইতে করণ ও কায়স্থ সমার্থক বলিয়া ধরা হইতে আরম্ভ করে তাহা বলা কঠিন।

যাহাই হউক, আমরা যে-যুগের আলোচনা করিতেছি অর্থাৎ মোটামুটি গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগে বাঙলার লিপিগুলিতে কায়স্থ শব্দের ব্যবহার যেমন পাইতেছি, তেমনই পাইতেছি করণ শব্দেরও। এ তথ্য মোটামুটি নিঃসংশয় বলিয়া মনে করা যাইতে পারে যে, এই যুগের লিপিগুলিতে কায়স্থ কোনও বর্ণ বা উপবর্ণজ্ঞাপক শব্দ নয়—বৃত্তিবাচক শব্দ, অর্থাৎ কায়স্থরা এই যুগে এখনও বর্ণ বা উপবর্ণ হিসাবে গড়িয়া উঠেন নাই। এই যুগের অন্তত দুইটি লিপিতে করণদের উল্লেখ পাইতেছি। গুণাইঘর পট্টোলীর লেখক সান্ধিবিগ্রহাধিক নরদত্ত ছিলেন করণ কায়স্থ, এবং ত্রিপুরার লোকনাথ পট্টোলীর মহারাজ লোকনাথও নিজের পরিচয় দিতেছেন করণ বলিয়া। করণ কায়স্থ বলিয়া নরদত্তের আত্মপরিচয় লক্ষণীয়; করণ এবং কায়স্থ একেবারে সমার্থক একথা স্পষ্ট না হইলেও উভয়ের মধ্যে যে একটা ঘনিষ্ঠ যোগ বিদ্যমান তাহা এই ধরনের উল্লেখের মধ্যে যেন সুস্পষ্ট। লোকনাথের করণ-পরিচয়ও অন্যদিক দিয়া উল্লেখযোগ্য। তাঁহার মাতামহ কেশবকে বলা হইয়াছে 'পারশব', পিতামহ 'দ্বিজবর', প্রপিতামহ 'দ্বিজসত্তম', এবং বৃদ্ধপ্রপিতামহ নাকি ছিলেন মুনি ভরদ্বাজের বংশধর। 'পারশব কেশব' কথার অর্থ তো এই যে, কেশবের ব্রাহ্মণ পিতা একজন শূদ্রাণীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। অথচ, কেশব ছিলেন রাজার সেনাধ্যক্ষ, এবং সমসাময়িক রাষ্ট্রে ও সমাজে তিনি যথেষ্ট মান্যও ছিলেন! ব্রাহ্মণ বর ও শূদ্র কন্যার বিবাহ বোধ হয় তখনও সমাজে নিন্দনীয় ছিল না; পরবর্তীকালেও নিন্দনীয় না হউক অপ্রচলিত যে ছিল না তাহা তো স্মৃতিকার ভবদেব ভট্ট এবং জীমূতবাহনের রচনা হইতেই জানা যায়। লোকনাথের নিজের করণ-পরিচয়ের কারণ বলা বড় কঠিন। বুঝা যাইতেছে, লোকনাথের পিতা একজন পারশব-দুহিতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, এই জন্যই কি লোকনাথ বর্ণসমাজে নীচে নামিয়া গিয়াছিলেন, অথবা, তাঁহার পিতাও ছিলেন করণ? এক্ষেত্রে করণ বর্ণ না বৃত্তিবাচক শব্দ তাহাও কিছু নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতেছে না। যাহা হউক, এইটুকু বুঝা গেল, করণ বা কায়স্থ এখনও নিঃসন্দেহে বর্ণ বা উপবর্ণ হিসাবে বিবেচিত হইতেছে না। এই দুই শব্দেরই ব্যবহার মোটামুটি বৃত্তিবাচক, তবে বৃত্তি ক্রমশ বর্ণে বিধিবদ্ধ হইবার দিকে ঝুঁকিতেছে।

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য

উপরে আলোচিত ও বিশ্লেষিত নামগুলির মধ্যে আর কোন্ কোন্ বর্ণ বা উপবর্ণ আত্মগোপন করিয়া আছে তাহা বলিবার উপায় নাই; অন্তত বিশেষ ভাবে কোনও বর্ণ বা উপবর্ণ উল্লিখিত হইতেছে না। অন্ত্যনাম হিসাবে বর্মা কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাওয়া যাইতেছে, যেমন বেত্রবর্মা, সিংহবর্মা, চন্দ্রবর্মা ইত্যাদি। এই যুগে বর্মণান্ত্য নাম উত্তর ভারতের অন্যত্র ক্ষত্রিয়ত্ব জ্ঞাপক; কিন্তু বেত্রবর্মা, চন্দ্রবর্মা, ক্ষত্রিয় কিনা বলা কঠিন,

অন্তত তেমন দাবি কেহ করিতেছেন না। রাজা-রাজন্যরা তো সাধারণত ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি করিয়াই থাকেন, কিন্তু সমসাময়িক বাঙলার রাজা-রাজন্যদের পক্ষ হইতেও তেমন দাবিও কেহ জানান নাই। পরবর্তী পাল রাজাদের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবিও নিঃসংশয় নয়; কেবল বিদেশাগত কোনও কোনও রাজবংশ এই দাবি করিয়াছেন। বস্তুত, বাঙলার স্মৃতি-পুরাণ-ঐতিহ্যে ক্ষত্রিয়-বর্ণের সবিশেষ দাবি কাহারও যেন নাই! নগরশ্রেষ্ঠী, সার্থবাহ, ব্যাপারী-ব্যবসায়ীর উল্লেখ এ-যুগে প্রচুর; কিন্তু তাহাদের পক্ষ হইতেও বৈশ্যত্বের দাবি কেহ করিতেছেন না; সমসাময়িক কালে তো নয়ই, পরবর্তী কালেও নয়। বাঙলার স্মৃতি-পুরাণ-ঐতিহ্যে বিশিষ্ট পৃথক বর্ণ হিসাবে বৈশ্যবর্ণের স্বীকৃতি নাই। বল্লাল-চরিত-গ্রন্থে বণিক-সুবর্ণ-বণিকদের বৈশ্যত্বের দাবি করা হইয়াছে, কিন্তু এ-সাক্ষ্য কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য, বলা কঠিন। অন্যত্র কোথাও কাহারও সে দাবি নাই; স্মৃতি গ্রন্থাদিতে নাই, বৃহদ্ধর্ম ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে পর্যন্ত নাই। বস্তুত, বাঙলাদেশে কোনও কালেই ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সুনির্দিষ্ট বর্ণহিসাবে গঠিত ও স্বীকৃত হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয় না; অন্তত তাহার সপক্ষে বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিক কোনও প্রমাণ নাই। ইহার কারণ কি বলা কঠিন। বহুদিন আগে রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় বলিয়াছিলেন, বাঙলার আর্যীকরণ ঋগ্বেদীয় আর্য সমাজব্যবস্থানুযায়ী হয় নাই, সেই জন্য ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য শূদ্র লইয়া যে চাতুর্বর্ণ্য-সমাজ, বাঙলাদেশে তাহার প্রচলন নাই। বাঙলার বর্ণসমাজ অ্যালপীয় আর্য সমাজব্যবস্থানুযায়ী গঠিত এবং অ্যালপীয় আর্যভাষীরা ঋগ্বেদীয় আর্যভাষী হইতে পৃথক। চন্দ মহাশয়ের এই মত যদি সত্য হয় তাহা হইলে ইহার মধ্যে বাঙলার ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণের প্রায়ানুপস্থিতির কারণ নিহিত থাকা অসম্ভব নয়। বাঙলার বর্ণবিন্যাস ব্রাহ্মণ এবং শূদ্রবর্ণ ও অন্ত্যজ-ম্লেচ্ছদের লইয়া গঠিত; করণ-কায়স্থ, অম্বষ্ঠ-বৈদ্য এবং অন্যান্য সংকর বর্ণ সমস্তই শূদ্র-পর্যায়ে; সর্বনিম্নে অন্ত্যজ বর্ণের লোকেরা। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের এই বর্ণবিন্যাস পঞ্চম-অষ্টম শতকে খুব সুস্পষ্টভাবে দেখা না দিলেও তাহার মোটামুটি কাঠামো এই যুগেই গড়িয়া উঠিয়াছিল, এই অনুমান করা চলে। কারণ, এই যুগের লিপিগুলিতে তিনটি দ্বিজবর্ণের মধ্যে কেবল ব্রাহ্মণদেরই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ধরা পড়িতেছে; আর যাঁহারা, তাঁহারা এবং অন্যান্যেরা বিচিত্র জীবন-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া শূদ্রান্তর্গত বিভিন্ন উপবর্ণ গড়িয়া তুলিতেছেন মাত্র। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণের কোন ইঙ্গিত-আভাস কিছুই নাই।

৫

পাল যুগ : বর্ণ-বিন্যাসের তৃতীয় পর্ব

বর্ণ হিসাবে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণের ইঙ্গিত-আভাস পরবর্তী পাল আমলেও দেখা যাইতেছে না। একমাত্র "রামচরিত" গ্রন্থের টীকাকার পাল-বংশকে ক্ষত্রিয়-বংশ বলিয়া দাবি করিয়াছেন। কিন্তু এই ক্ষত্রিয় কি বর্ণ অর্থে ক্ষত্রিয় ? রাজা-রাজন্য মাত্রই তো ক্ষত্রিয়, সমসাময়িককালে সব রাজবংশই তো ক্ষত্রিয় বলিয়া নিজেদের দাবি করিয়াছেন, এবং একে অন্যের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে। রাজা-রাজন্যের বিবাহ-ব্যাপারে কোনও বর্ণগত বাধা-নিষেধ কোনো কালেই ছিল না। তারনাথ তো বলিতেছেন, গোপাল ক্ষত্রিয়াণীর গর্ভে জনৈক বৃক্ষদেবতার পুত্র ; এ-গল্প নিঃসন্দেহে টটেম-স্মৃতিবহ। আবুল ফজল বলেন, পাল রাজারা কায়স্থ ; মঞ্জুশ্রীমূলকল্প-গ্রন্থ তাঁহাদের সোজাসুজি বলিয়াছে দাসজীবী। পালেরা বৌদ্ধ ছিলেন, এবং মনে রাখা দরকার, তারনাথ এবং মঞ্জুশ্রীমূলকল্পের গ্রন্থকার দুইজনই বৌদ্ধ। পালেরা যে বর্ণ-হিসাবে দ্বিজশ্রেণীর কেহ ছিলেন না, তারনাথ, আবুল ফজল এবং শেষোক্ত গ্রন্থের লেখক সকলের ইঙ্গিতই যেন সেই দিকে। ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বর্ণের নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক উল্লেখ আর কোথাও দেখিতেছি না। তবে রাজা, রাণক, রাজন্যক প্রভৃতিরা ক্ষত্রিয় বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিতেন, এমন অনুমান হয়তো অসম্ভব নয়, কিন্তু বর্ণ হিসাবে তাঁহারা যথার্থই ক্ষত্রিয় ছিলেন কিনা সন্দেহ। ক্ষত্রিয়-পরিবারে বিবাহ অনেক রাজাই করিয়াছেন, কিন্তু শুধু তাহাই ক্ষত্রিয়ত্ব জ্ঞাপক হইতে পারে না।

করণ কায়স্থ

করণ-কায়স্থদের অস্তিত্বের প্রমাণ অনেক পাওয়া যাইতেছে। রামচরিতের কবি সন্ধ্যাকার নন্দীর পিতা ছিলেন "করণানামগ্রণী", অর্থাৎ করণকুলের শ্রেষ্ঠ ; তিনি ছিলেন পালরাষ্ট্রের সান্ধিবিগ্রহিক। শব্দপ্রদীপ নামে একখানি চিকিৎসা-গ্রন্থের লেখক আত্মপরিচয় দিতেছেন 'করণান্বয়' অর্থাৎ করণ-বংশজাত বলিয়া ; তিনি নিজে রাজবৈদ্য ছিলেন, তাঁহার পিতা ও প্রপিতামহ যথাক্রমে পালরাজ রামপাল ও বঙ্গালরাজ গোবিন্দ-চন্দ্রের রাজবৈদ্য ছিলেন। ন্যায়কন্দলী-গ্রন্থের লেখক শ্রীধরের (৯৯১ খ্রী) পৃষ্ঠপোষক ছিলেন পাণ্ডুদাস ; তাঁহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে 'কায়স্থ কুলতিলক' বলিয়া। পাণ্ডুদাসের বাড়ী বাঙলাদেশে বলিয়াই তো মনে হইতেছে, যদিও এ সম্বন্ধে নিঃসংশয় প্রমাণ নাই। তিব্বতী গ্রন্থ পাগ্-সাম-জোন্-জাং (Pag-Sam Jon Zang) পাল-সম্রাট ধর্মপালের এক কায়স্থ রাজকর্মচারীর উল্লেখ করিতেছেন, তাঁহার নাম গঙ্গদাস। জড্ঢ নামে গৌড়দেশবাসী এক করণিক খাজুরাহোর একটি লিপির (৯৫৪) লেখক।

যুক্তপ্রদেশের পিলিভিট্ জেলায় প্রাপ্ত দেবল প্রশস্তির (৯৯২) লেখক তক্ষাদিত্যও ছিলেন একজন গৌড়দেশবাসী করণিক। চাহমানরাজ রায়পালের নাডোল লিপির লেখক ছিলেন (১১৪১) ঠকুর পেথড নামে জনৈক গৌড়াম্বয় কায়স্থ। বীসলদেবের দিল্লী-শিবালিক স্তম্ভলিপির (১১৬৩) লেখক শ্রীপতিও ছিলেন একজন গৌড়াম্বয় কায়স্থ। সমসাময়িক উত্তর ও পশ্চিম ভারতে করণ-কায়স্থেরা পৃথক স্বতন্ত্র বর্ণ বা বংশ বলিয়া গণ্য হইত, এ-সম্বন্ধে অনেক লিপিপ্রমাণ বিদ্যমান। রাষ্ট্রকূট অমোঘবর্ষের একটি লিপিতে (নবম শতক) বলভ-কায়স্থ বংশের উল্লেখ, ১১৮৩ বা ১১২৩ খ্রীষ্টাব্দের একটি লিপিতে কায়স্থ বংশের উল্লেখ প্রভৃতি হইতে মনে হয় নবম-দশম-একাদশ শতকে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের সর্বত্রই কায়স্থরা বর্ণহিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছিলেন। বাস্তু হইতে উদ্ভূত এই অর্থে বাস্তব্য কায়স্থের উল্লেখও একাধিক লিপিতে পাওয়া যাইতেছে; একাদশ শতকের আগে এই বাস্তব্য কায়স্থেরা কালঞ্জর নামক স্থানে বাস করিতেন, এই তথ্যও এই লিপিগুলি হইতে জানা যাইতেছে। বুদ্ধগয়ায় প্রাপ্ত এই আমলের একটি লিপিতে পরিষ্কার বলা হইয়াছে যে, বাস্তব্য কায়স্থেরা করণবৃত্তি অনুসরণ করিত; এবং তাহাদের বর্ণ বা উপবর্ণকে যেমন বলা হইয়াছে কায়স্থ তেমনই বলা হইয়াছে করণ, অর্থাৎ করণ এবং কায়স্থ যে বর্ণহিসাবে সমার্থক ও অভিন্ন তাহাই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। নবম-দশম শতক নাগাদ বাঙলাদেশেও করণ-কায়স্থেরা বর্ণ-হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছিলেন, এই সম্বন্ধে অন্তত একটি লিপিপ্রমাণ বিদ্যমান। শাকম্ভরীর চাহমানাধিপ দুর্লভরাজের কিনসরিয়া লিপির (৯৯৯) লেখক ছিলেন গৌড়-দেশবাসী মহাদেব; মহাদেবের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে "গৌড়কায়স্থবংশ" বলিয়া।

কায়স্থদের বর্ণগত উদ্ভব সম্বন্ধে লিপিমালায় এবং অর্বাচীন স্মৃতিগ্রন্থাদিতে নানা প্রকার কাহিনী প্রচলিত দেখা যায়। বেদব্যাস স্মৃতিমতে কায়স্থরা শূদ্রপর্যায়ভুক্ত। উদয়সুন্দরীকথা-গ্রন্থের লেখক কবি সোঢ্ঢল (একাদশ শতক) কায়স্থবংশীয় ছিলেন; তাঁহার যে বংশ-পরিচয় পাওয়া যাইতেছে তাহাতে দেখা যায় কায়স্থরা ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত বলিয়া দাবি করিতেন। ১০৪৯ খ্রীষ্টাব্দের কলচুরীরাজ কর্ণের জনৈক কায়স্থ মন্ত্রীর একটি লিপিতে কায়স্থদের বলা হইয়াছে 'দ্বিজ' (৩৪ শ্লোক); অন্য স্থানে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, তাঁহারা ছিলেন শূদ্র। ব্রাহ্মণেরাও যে করণবৃত্তি গ্রহণ করিতেন তাহার একাধিক লিপি-প্রমাণ বিদ্যমান। ভাস্করবর্মার নিধনপুর লিপি-কথিত জনৈক ব্রাহ্মণ জনার্দন স্বামী ছিলেন ন্যায়-করণিক। এই লিপিতে জনৈক কায়স্থ দুন্দুনাথেরও উল্লেখ আছে। উদয়পুরের ধোড়লিপিতে (১১৭১) এক করণিক ব্রাহ্মণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। করণিক শব্দ এইসব ক্ষেত্রে যে বৃত্তিবাচক সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই; তবে, সাম্প্রতিক কালে কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে, বাঙলার কায়স্থরা নাগর ব্রাহ্মণদের বংশধর, এবং এইসব নাগর ব্রাহ্মণ পাঞ্জাবের নগরকোট, গুজরাট,

কাথিয়াবাড়ের আনন্দপুর (অন্য নাম নগর) প্রভৃতি অঞ্চল হইতে আসিয়াছিলেন ; এই মত সকলে স্বীকার করেন না ; এ-সম্বন্ধে একাধিক বিরুদ্ধ-যুক্তি যে আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। বিদেশ হইতে নানাশ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা বাঙলাদেশে আসিয়া বসবাস করিয়াছেন, তাহার প্রাচীন ঐতিহাসিক প্রমাণ বিদ্যমান ; কিন্তু পৃথক পৃথক বর্ণস্তর গড়িয়া তুলিবার মতন এত অধিক সংখ্যায় তাঁহারা কখনো আসিয়াছিলেন, এমন প্রমাণ নাই।

বৈদ্য অম্বষ্ঠ

পাল আমলের সুদীর্ঘ চারিশত বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের অন্যত্র বৈদ্যবংশও পৃথক উপবর্ণ হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থাদিতে বর্ণহিসাবে বৈদ্যের উল্লেখ নাই ; অর্বাচীন স্মৃতি-গ্রন্থে চিকিৎসাবৃত্তিধারী লোকেদের বলা হইয়াছে বৈদ্যক। বৃহদ্ধর্মপুরাণে বৈদ্য ও অম্বষ্ঠ সমার্থক বলিয়া ধরা হইয়াছে ; কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য দুই পৃথক উপবর্ণ বলিয়া ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণ পিতা ও বৈশ্য মাতার সহবাসে উৎপন্ন অম্বষ্ঠ সংকর বর্ণের উল্লেখ একাধিক স্মৃতি ও ধর্মসূত্র গ্রন্থে পাওয়া যায়। বৃহদ্ধর্মপুরাণোক্ত অম্বষ্ঠ-বৈদ্যের অভিন্নতা পরবর্তীকালে বাঙলাদেশে স্বীকৃত হইয়াছিল ; চন্দ্রপ্রভা-গ্রন্থ এবং ভট্টিটীকার বৈদ্য লেখক ভরতমল্লিক (সপ্তদশ শতক) অম্বষ্ঠ এবং বৈদ্য বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু বাঙলার বাহিরে সর্বত্র এই অভিন্নতা স্বীকৃত নয়। বর্তমান বিহার এবং যুক্তপ্রদেশের কোনও কোনও কায়স্থ সম্প্রদায় নিজেদের অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন, এবং অন্তত একটি অর্বাচীন সংহিতায় (সূত-সংহিতা) অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্যদের অভিন্ন বলিয়া ইঙ্গিত করা হইয়াছে। যাহা হউক, দক্ষিণতম ভারতে অষ্টম শতকেই—কোন কোন লিপি সাক্ষ্য অনুযায়ী আরো কিছু আগেই—বৈদ্য-উপবর্ণের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। জনৈক পাণ্ড্যরাজার তিনটি লিপিতে কয়েকজন বৈদ্য সামন্তের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে, এবং ইঁহারা প্রত্যেকেই সমসাময়িক রাষ্ট্র ও সমাজে সম্ভ্রান্ত ও পরাক্রান্ত বলিয়া গণিত হইতেন, তাহা বুঝা যাইতেছে। ইঁহাদের একজনের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে বৈদ্য এবং "বৈদ্যশিখামণি" বলিয়া ; তিনি একজন প্রখ্যাত সেনানায়ক এবং রাজার অন্যতম উত্তরমন্ত্রী ছিলেন। আর একজনের জন্মের ফলে বঙ্গলগুর বৈদ্যকুল উজ্জ্বল হইয়াছিল ; তিনি ছিলেন গীতবাদ্যে সুনিপুণ। আরও একজনের পরিচয় বৈদ্যক হিসাবে ; তিনি ছিলেন একাধারে কবি, বক্তা এবং শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত। এই লিপিগুলির 'বৈদ্যকুল', 'বৈদ্য' বৈদ্যক' শব্দগুলি ভিষক্‌বৃত্তিবাচক বলিয়া মনে হইতেছে না, এবং বৈদ্যকুল বলিতে যেন কোনো উপবর্ণই বুঝাইতেছে। বাঙলার সমসাময়িক কোনো লিপি বা গ্রন্থে এই অর্থে বা অন্য কোনো অর্থে বৈদ্যক, বা বৈদ্যকবংশ বা বৈদ্যকুলের কোনো

উল্লেখ নাই। বস্তুত, তেমন উল্লেখ পাওয়া যায় পরবর্তী পাল ও সেন-বর্মণ যুগে, একাদশ শতকের পাল লিপিতে, দ্বাদশ শতকে শ্রীহট্টজেলায় রাজা ঈশানদেবের ভাটেরা লিপিতে। ঈশানদেবের অন্যতম পট্টনিক বা মন্ত্রী বনমালী কর ছিলেন "বৈদ্যবংশ প্রদীপ"। পাল-চন্দ্রযুগে কিন্তু দেখিতেছি শব্দপ্রদীপ-গ্রন্থের লেখক, তাঁহার পিতা এবং প্রপিতামহ, যাঁহারা সকলেই ছিলেন রাজবৈদ্য বা চিকিৎসক, তাঁহাদের আত্মপরিচয় 'করণ' বলিয়া। সেইজন্য মনে হয়, একাদশ-দ্বাদশ শতকের আগে, অন্তত বাঙলাদেশে, বৃত্তিবাচক বৈদ্য, বৈদ্যক শব্দ বর্ণ বা উপবর্ণ-বাচক বৈদ্য শব্দে বিবর্তিত হয় নাই, অর্থাৎ বৈদ বৃত্তিধারীরা বৈদ্য-উপবর্ণে গঠিত ও সীমিত হইয়া উঠেন নাই।

কিন্তু পূর্বোক্ত পাণ্ড্যরাজার একটি লিপিতে যে বঙ্গলত্তের বৈদ্যকুলের কথা বলা হইয়াছে, এই বঙ্গলত্ত কোথায়? এই বঙ্গলত্তের সঙ্গে কি বঙ্গ-বঙ্গালজনের বা বঙ্গাল-দেশের কোনও সম্বন্ধ আছে? আমার যেন মনে হয়, আছে। এই বৈদ্যকুল বঙ্গ বা বঙ্গালদেশ (দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গ) হইতে দক্ষিণ প্রবাসে যান নাই তো? বাঙলাদেশে বৈদ্যকুল এখনও বিদ্যমান; দক্ষিণতম ভারতে কিন্তু নাই, মধ্যযুগেও ছিল বলিয়া কোনো প্রমাণ নাই। তাহা ছাড়া পূর্বোক্ত তিনটি লিপিই একটি রাজার রাজত্বের, এবং যে-তিনটি বৈদ্য-প্রধানের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহারা যেন একই পরিবারভুক্ত। এইসব কারণে মনে হয়, বৈদ্যকুলের এই পরিবারটি বঙ্গ-বঙ্গালদেশ হইতে দক্ষিণ-ভারতে গিয়া হয়তো বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। বঙ্গলত্ত হয়ত পাণ্ড্যদেশে বঙ্গ-বঙ্গাল দেশবাসীর একটি উপনিবেশ, অথবা একেবারে মূল বঙ্গ-বঙ্গালভূমি। যদি এই অনুমান সত্য হয় তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়, অষ্টম শতকেই বাঙলাদেশে বৈদ্য উপবর্ণ গড়িয়া উঠিয়াছিল।

কৈবর্ত

পাল আমলে কৈবর্তদের প্রথম ঐতিহাসিক উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। বরেন্দ্রী-কৈবর্তনায়ক দিব্য বা দিব্বোক পালরাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান সামন্ত কর্মচারী ছিলেন বলিয়া মনে হয়; অনন্তসামন্তচক্রের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও পালরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহপরায়ণ হইয়া রাজা দ্বিতীয় মহীপালকে হত্যা করেন, এবং বরেন্দ্রী কাড়িয়া লইয়া সেখানে কৈবর্তাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। বরেন্দ্রী কিছুদিনের জন্য দিব্য, রুদোক ও ভীম এই তিন কৈবর্ত-রাজার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। এই ঐতিহাসিক ঘটনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, সমসাময়িক উত্তরবঙ্গ-সমাজে কৈবর্তদের সামাজিক প্রভাব ও আধিপত্য, জনবল ও পরাক্রম যথেষ্ট ছিল। বিষ্ণুপুরাণে কৈবর্তদের বলা হইয়াছে অব্রহ্মণ্য, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য সমাজ ও সংস্কৃতি বহির্ভূত। মনুস্মৃতিতে নিষাদ-পিতা এবং আয়োগব মাতা হইতে জাত সন্তানকে বলা হইয়াছে মার্গব বা দাস; ইহাদের অন্য নাম কৈবর্ত। মনু

বলিতেছেন, ইঁহাদের উপজীবিকা নৌকার মাঝিগিরি। এই দুইটি প্রাচীন সাক্ষ্য হইতেই বুঝা যাইতেছে, কৈবর্তরা কোনও আর্যপূর্ব কোম বা গোষ্ঠী ছিলেন, এবং তাহারা ক্রমে আর্য-সমাজের নিম্নস্তরে স্থানলাভ করিতেছিলেন। বৌদ্ধ জাতকের গল্পেও মৎস্যজীবিদের বলা হইয়াছে কেবত্ত=কেবর্ত। আজ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের কৈবর্তরা নৌকাজীবী বা মৎস্যজীবী। দ্বাদশ শতকে বাঙালী স্মৃতিকার ভবদেব ভট্ট সমাজে কৈবর্তদের স্থান নির্দেশ করিতেছেন অন্ত্যজ পর্যায়ে, রজক, চর্মকার, নট, বরুড়, মেদ এবং ভিল্লদের সঙ্গে; স্মরণ রাখা প্রয়োজন ভবদেব রাঢ়দেশের লোক। অমরকোষেও দেখিতেছি, দাস ও ধীবরদের বলা হইতেছে কৈবর্ত। মনুস্মৃতি এবং বৌদ্ধজাতকের সাক্ষ্য একত্র যোগ করিলেই অমরকোষের সাক্ষ্যে' ইঙ্গিত সুস্পষ্ট ধরা পড়ে। দ্বাদশ শতকের গোড়ায় ভবদেব ভট্টের সাক্ষ্যও প্রামাণিক। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে ঐ সময়েও কৈবর্তদের সঙ্গে মাহিষ্যদের যোগা-যোগের কোনও সাক্ষ্য উপস্থিত নাই এবং মাহিষ্য বলিয়া কৈবর্তদের পরিচয়ের কোনও দাবিও নাই, স্বীকৃতিও নাই। পরবর্তী পর্বে সেই দাবি স্বীকৃতির স্বরূপ ও পরিচয় পাওয়া যাইবে, কিন্তু এই পর্বে নয়। কৈবর্তদের জীবিকাবৃত্তি যাহাই হউক, পালরাষ্ট্রের উদার সামাজিক আদর্শ কৈবর্তদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতালাভ ও সঞ্চয়ের পথে কোনও বাধার সৃষ্টি করে নাই; করিলে দিব্য এত পরাক্রান্ত হইয়া উঠিতে পারিতেন না। সন্ধ্যাকর নন্দী পালরাষ্ট্রের প্রসাদভোজী, রামপালের কীর্তিকথার কবি; তিনি দিব্যকে দস্যু বলিয়াছেন, উপধিব্রতী বলিয়াছেন, কুৎসিত কৈবর্ত নৃপ বলিয়াছেন, তাঁহার বিদ্রোহকে অলীক ধর্ম-বিপ্লব বলিয়াছেন, এই ডমর উপপ্লবকে 'ভবস্য আপদম' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—শত্রু এবং শত্রুবিদ্রোহকে পক্ষপাতী লোক তাহা বলিয়াই থাকে—কিন্তু কোথাও তাঁহার বা তাঁহার শ্রেণীর বৃত্তি বা সামাজিক স্থান সম্বন্ধে কোনও ইঙ্গিত তিনি করেন নাই। মনে হয়, সমাজে তাঁহাদের বৃত্তি বা স্থান কোনটাই নিন্দনীয় ছিল না। কৈবর্তরা যে মাহিষ্য, এ-ইঙ্গিতও সন্ধ্যাকর কোথাও দিতেছেন না। একাদশ-দ্বাদশ শতকেও কৈবর্তরা বাংলা-দেশে কেবট্ট বলিয়া পরিচিত হইতেন এবং তাঁহাদের মধ্যে অন্তত কেহ কেহ সংস্কৃতচর্চা করিতেন, কাব্যও রচনা করিতেন, এবং ব্রাহ্মণ্যধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতির ভক্ত অনুরাগীও ছিলেন। সদুক্তিকর্ণামৃত নামক কাব্যসংকলন গ্রন্থে (১২০৬) কেবট্ট পপীপ অর্থাৎ কেওট বা কৈবর্ত কবি পপীপ রচিত গঙ্গাস্তবের একটি পদ আছে। পদটি বিনয়-মধুর, সুন্দর!

বর্ণসমাজের নিম্নস্তর

পালরাজাদের অধিকাংশ লিপিতে সমসাময়িক বর্ণসমাজের নিম্নতমস্তরের কিছু পরোক্ষ সংবাদ পাওয়া যায়। লিপিগুলির যে অংশে ভূমিদানের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হইতেছে সেখানে রাজপাদোপজীবী বা রাজকর্মচারীদের সুদীর্ঘ তালিকার পরেই উল্লেখ করা হইতেছে

ব্রাহ্মণদের, তাহার পরে প্রতিবাসী ও ক্ষেত্রকর বা কৃষকদের এবং কুটুম্ব ; অর্থাৎ স্থানীয় প্রধান প্রধান গৃহস্থ লোকেদের (লক্ষণীয় যে, ক্ষত্রিয় বৈশ্যদের কোনও উল্লেখ নাই) ; ইঁহাদের পরই অন্যান্য যে-সব স্তরের লোক তাহাদেয় সকলকে একত্র করিয়া গাঁথিয়া উল্লেখ করা হইতেছে মেদ, অন্ধ্র ও চণ্ডালদের। চণ্ডালরাই যে সমাজের নিম্নতম স্তর তাহা লিপির এই অংশটুকু উল্লেখ করিলেই বুঝা যাইবে ঃ প্রতিবাসিনশ্চ ব্রাহ্মণোত্তরান্ মহত্তর-কুটুম্বেপুরোগমেদান্ধ্রকচণ্ডালপর্যন্তান্। ভবদেব ভট্টের স্মৃতিশাসনে চণ্ডাল ও অন্ত্যজ এই দুই-ই সমার্থক। মেদরাও ভবদেবের মতে অন্ত্যজ পর্যায়ের। মেদ ও চণ্ডালদের সঙ্গে অন্ধ্রদের উল্লেখ হইতে মনে হয়, ইঁহাদেরও স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল বাঙালী সমাজের নিম্নতম স্তরে। কিন্তু, কেন এইরূপ হইয়াছিল, বুঝা কঠিন। বেতনভুক সৈন্য হিসাবে মালব, খস, কুলিক, হূণ, কর্ণাট, লাট প্রভৃতি বিদেশী ও ভিনপ্রদেশী অনেক লোক পালরাষ্ট্রের সৈন্যদলে ভর্তি হইয়াছিল ; এই তালিকায় অন্ধ্রদের দেখা পাওয়া যায় না। ইঁহারা বোধ হয় জীবিকার্জনের জন্য নিজের দেশ ছাড়িয়া বাংলাদেশে আসিয়া এদেশের বাসিন্দা হইয়া গিয়াছিলেন, এবং সামাজিক দৃষ্টিতে হেয় বা নীচ এমন কোনও কাজ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন।

ইঁহাদের ছাড়া চর্যাগীতি বা চর্যাচর্যবিনিশ্চয় গ্রন্থে আরও কয়েকটি তথাকথিত নীচ জাতের খবর পাওয়া যাইতেছে, যথা ডোম বা ডোম্ব, চণ্ডাল, শবর ও কাপালি। ডোম্বপত্নী অর্থাৎ ডোমনী বা ডোম্বি ও কাপালি বা কাপালিক সম্বন্ধে কহ্নুপাদের একটি পদের কিয়দংশ উদ্ধার করা যাইতে পারে।

নগর বাহিরি রে ডোম্বি তোহেরি কুড়িআ (কুঁড়ে ঘর)।
ছোই ছোই জাহ সো ব্রাহ্মণ নাড়িআ (নেড়ে ব্রাহ্মণ) ॥
আলো (ওলো) ডোম্বি তোএ সম করিব ম সঙ্গ।
নিঘিন (নিঘৃণ=ঘৃণা নাই যার) কাহ্ন কাপালি জোই (যোগী) লাংগ (উলঙ্গ)…
তান্তি (তাঁত) বিকণঅ ডোম্বি অবরনা চাংগেড়া (বাঁশের চাঙাড়ি)।
তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড় পেড়া ॥

ডোমেরা যে সাধারণত নগরের বাহিরে কুঁড়ে বাঁধিয়া বাস করিতেন, বাঁশের তাঁত ও চাঙাড়ি তৈরি করিয়া বিক্রয় করিতেন এবং ব্রাহ্মণস্পর্শ যে তাহাদের নিষিদ্ধ ছিল, এই পদে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ডোম পুরুষ ও নারী নৃত্যগীতে সুপটু ছিল। কপালী বা কাপালিরাও নিম্নস্তরের লোক বলিয়া গণ্য হইতেন ; এই পদে তাহারও ইঙ্গিত বিদ্যমান। ভবদেব ভট্ট চণ্ডাল ও পুক্কশদের সঙ্গে কাপালিকদেরও অন্ত্যজ পর্যায়-ভুক্ত করিয়াছেন। কাপালিকরা ছিলেন লজ্জাঘৃণাবিরহিত, গলায় পরিতেন হাড়ের মালা, দেহগাত্র থাকিত প্রায় উলঙ্গ। শবরেরা বাস করিতেন পাহাড়ে জঙ্গলে, ময়ূরের পাখ ছিল তাহাদের পরিধেয়, গলায় গুঞ্জা বীচির মালা, কর্ণে বজ্রকুণ্ডল।

উঁচা উঁচা পাবত তহি বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী ॥...
একেলী শবরী এ বন হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডলবজ্রধারী!
তিঅ ধাউ খাট পাড়িলা সবরো মহাসুখে সেজি ছাইলী।
সবোর ভুজঙ্গ নৈরামণি দারী পেক্ষরাতি পোহাইলী ॥

শবর-শবরীদের গানের একটা বিশিষ্ট ধরন ছিল, সেই ধরন শবরী রাগ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া ছ। কয়েকটি চর্যাগীতি যে এই শবরী রাগে গীত হইত সে প্রমাণ এই গ্রন্থেই পাওয়া যাইতেছে। এই চর্যাগীতিটির মধ্যেই আমরা বজ্রযান বৌদ্ধদেবতা পর্ণশবরীর রূপাভাস পাইতেছি, এ তথ্যের ইঙ্গিতও সুস্পষ্ট। একাধিক চর্যাগীতির ইঙ্গিতে মনে হয় ডোম ও চণ্ডাল অভিন্ন (১৮ ও ৫৭ সংখ্যক পদ); কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে ডোম ও চণ্ডাল উভয়ই অন্ত্যজ অস্পৃশ্য পর্যায়ভুক্ত, কিন্তু পৃথক পৃথক ভাবে উল্লিখিত। চর্যাপদের সাক্ষ্য হইতে এই ধারণা করা চলে যে, সমাজের উচ্চতর শ্রেণী ও বর্ণের দৃষ্টিতে ইহাদের যৌনাদর্শ ও অভ্যাস শিথিল ছিল। পরবর্তী পর্বে দেখা যাইবে, এই শৈথিল্য উচ্চশ্রেণীর ধর্মকর্মকেও স্পর্শ করিয়াছিল। পাহাড়পুরের ধ্বংস-স্তূপের পোড়ামাটির ফলকগুলিতে বাঙালী সমাজের নিম্নস্তরের এইসব গোষ্ঠী ও কোমদের দৈহিক গঠনাকৃতি, দৈনন্দিন আহার-বিহার, বসন-ব্যসনের কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়। বৃক্ষপত্রের পরিধান, গলায় গুঞ্জাবীচির মালা এবং পাতা ও ফুলের নানা অলঙ্কার দেখিলে শবরী মেয়েদের চিনিয়া লইতে দেরী হয় না।

ব্রাহ্মণ

পাল চন্দ্র-কম্বোজ পর্বের ব্রাহ্মণেতর অন্যান্য বর্ণ উপবর্ণ সম্বন্ধে যে-সব সংবাদ পাওয়া যায় তাহা একত্রে গাঁথিয়া মোটামুটি একটা চিত্র দাঁড় করাইবার চেষ্টা করা গেল। দেখা যাইতেছে এ-যুগের রাষ্ট্রদৃষ্টি বর্ণসমাজের নিম্নতম স্তর চণ্ডাল পর্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য বর্ণসমাজের মাপকাঠি ব্রাহ্মণ স্বয়ং এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও ধর্ম। সমাজে ইঁহাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তির বিস্তার ও গভীরতার দিকে তাকাইলেই বর্ণসমাজের ছবি স্পষ্টতর ধরিতে পারা যায়। এক্ষেত্রেও রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতার তারতম্য এবং বিশিষ্টতা অনেকাংশে কোন বিশেষ ধর্ম ও ধর্মগত সংস্কার ও সমাজ-ব্যবস্থার প্রসারতার দ্যোতক।

পঞ্চম-ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতির প্রসার আগেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। সমাজে ব্রাহ্মণ্য বর্ণব্যবস্থাও সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ প্রসারিত হইতেছিল। য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ ও মঞ্জুশ্রীমূলকল্পের গ্রন্থকার শশাঙ্ককে বলিয়াছেন বৌদ্ধবিদ্বেষী। সত্যই শশাঙ্ক তাহা ছিলেন কিনা সে-বিচার এখানে অবান্তর। এই দুই সাক্ষ্যের একটু ক্ষীণ

প্রতিধ্বনি নদীয়া বঙ্গসমাজের কুলজীগ্রন্থেও আছে, এবং সেই সঙ্গে আছে শশাঙ্ক কর্তৃক সরযূনদীর তীর হইতে বারোজন ব্রাহ্মণ আনয়নের গল্প। শশাঙ্ক এক উৎকট ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিলেন; ব্যাধিমুক্তির উদ্দেশ্যে গৃহযজ্ঞ করিবার জন্যই এই ব্রাহ্মণদের আগমন। রাজানুরোধে এই ব্রাহ্মণেরা গৌড়ে বসবাস আরম্ভ করেন এবং গ্রহবিপ্র নামে পরিচিত হন; পরে তাঁহাদের বংশধরেরা রাঢ়ে-বঙ্গেও বিস্তৃত হইয়া পড়েন এবং নিজ নিজ গাঞী নামে পরিচিত হন। বাঙলার বাহির হইতে ব্রাহ্মণাগমনের যে ঐতিহ্য কুলজীগ্রন্থে বিধৃত তাহার সূচনা দেখিতেছি শশাঙ্কের সঙ্গে জড়িত। কুলজীগ্রন্থের অন্য অনেক গল্পের মত এই গল্পও হয়তো বিশ্বাস্য নয়, কিন্তু এই ঐতিহ্য-ইঙ্গিত সর্বথা মিথ্যা না-ও হইতে পরে। মঞ্জুশ্রীমূলকল্পের গ্রন্থকার বলিতেছেন, শশাঙ্ক ছিলেন ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণের পক্ষে ব্রাহ্মণপ্রীতি কিছু অস্বাভাবিক নয়, এবং বহুযুগস্মৃত শশাঙ্কের বৌদ্ধবিদ্বেষ কাহিনীর মূলে এতটুকু সত্যও নাই, এ-কথাই বা কি করিয়া বলা যায়! সমসাময়িক কাল যে প্রাগ্রসরমান ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতিরই কাল তাহা তো নানাদিক হইতে সুস্পষ্ট। আগেই তাহা উল্লেখ করিয়াছি। য়ুয়ান্-চোয়াঙ, ইৎসিঙ, সেংচি প্রভৃতি চীন ধর্ম-পরিব্রাজকেরা যে সব বিবরণী রাখিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে অনুমান করা চলে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির অবস্থাও বেশ সমৃদ্ধই ছিল; কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ-তথ্য অনস্বীকার্য যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির অবস্থা তাহার চেয়েও অনেক বেশি সমৃদ্ধতর ছিল। বাঙলার সর্বত্র ব্রাহ্মণ দেবপূজকদের সংখ্যা সৌগতদের সংখ্যাপেক্ষা অনেক বেশি ছিল, এ-তথ্য য়ুয়ান্-চোয়াঙই রাখিয়া গিয়াছেন। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কারের তথা বর্ণব্যবস্থার প্রসার বাড়িয়াই চলিয়াছিল, এ-সম্বন্ধে দেবদেবীর মূর্তি-প্রমাণই যথেষ্ট। জৈন ধর্ম ও সংস্কার তো ধীরে ধীরে বিলীন হইয়াই যাইতেছিল। আর, বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কারও ব্রাহ্মণ্য সমাজাদর্শকে যে ধীরে ধীরে স্বীকার করিয়া লইতেছিল, পালচন্দ্র-কম্বোজ রাষ্ট্রের সামাজিক আদর্শের দিকে তাকাইলেই তাহা সুস্পষ্ট ধরা পড়ে। য়ুয়ান্-চোয়াঙ কামরূপ প্রসঙ্গে বলিতেছেন, কামরূপের অধিবাসীরা দেবপূজক ছিল, বৌদ্ধধর্মে তাঁহারা বিশ্বাস করিত না; দেবমন্দির ছিল শত শত, এবং বিভিন্ন ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের লোকসংখ্যা ছিল অগণিত; মুষ্টিমেয় যে কয়েকটি বৌদ্ধ ছিল তাহারা ধর্মানুষ্ঠান করিত গোপনে। এই তো সপ্তম শতকের কামরূপের অবস্থা; বাংলাদেশেও তাহার স্পর্শ লাগে নাই, কে বলিবে? মঞ্জুশ্রীমূলকল্পের গ্রন্থকার স্পষ্টই বলিতেছেন, মাৎস্যন্যায়ের পর গোপালের অভ্যুদয়কালে সমুদ্রতীর পর্যন্ত স্থান তীর্থিক(ব্রাহ্মণ ?)দের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল; বৌদ্ধমঠগুলি জীর্ণ হইয়া পড়িতেছিল; লোকে ইহাদেরই ইটকাঠ কুড়াইয়া লইয়া ঘরবাড়ী তৈয়ার করিতেছিল। ছোটবড় ভূস্বামীরাও তখন অনেকে ব্রাহ্মণ। গোপাল নিজেও ব্রাহ্মণানুরক্ত, এবং বৌদ্ধ গ্রন্থকার সেজন্য গোপালের উপর একটু কটাক্ষপাতও করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের ক্রমবর্ধমান প্রসার ও প্রভাব সম্বন্ধে কোনও সন্দেহই আর করা চলে না।

পাল রাষ্ট্রের সামাজিক আদর্শ

পাল-চন্দ্র-কম্বোজ যুগের সমসাময়িক অবস্থাটা দেখা যাইতে পারে। এ-তথ্য সুবিদিত যে পাল রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন—পরমসুগত। বৌদ্ধধর্মের তাঁহারা পরম পৃষ্ঠপোষক; ওদন্তপুরী, সোমপুর এবং বিক্রমশীল মহাবিহারের তাঁহারা প্রতিষ্ঠাতা; নালন্দা মহাবিহারের তাঁহারা ধারক ও পোষক, বজ্রাসনের বিপুল করুণা পরিচালিত দলবল পালরাষ্ট্রের রক্ষক। বাঙলাদেশে যত বৌদ্ধ মূর্তি ও মন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা প্রায় সমস্তই এই যুগের: যত অসংখ্য বিহারের উল্লেখ পাইতেছি নানা জায়গায়, জগদ্দল-বিক্রমপুরী-ফুল্লহরি-পট্টিকের-দেবীকোট-হৈকূটক- পণ্ডিত-সন্নগর, এই সমস্ত বিহারও এই যুগের। দেশ-বিদেশ-প্রখ্যাত যে-সব বৌদ্ধ পণ্ডিতাচার্যদের উল্লেখ পাইতেছি তাঁহারাও এই যুগের। চন্দ্রবংশও বৌদ্ধ; জিন (বুদ্ধ), ধর্ম ও সংঘের স্বস্তি উচ্চারণ করিয়া চন্দ্রবংশীয় লিপিগুলির সূচনা; ইঁহাদের রাজ্য হরিকেল তো বৌদ্ধতান্ত্রিক পীঠগুলির অন্যতম পীঠ। ভিন্ন-প্রদেশাগত কম্বোজ রাজবংশও বৌদ্ধ, পরমসুগত।

অথচ, ইঁহাদের প্রত্যেকেরই সমাজাদর্শ একান্তই ব্রাহ্মণ্য সংস্কারানুসারী, ব্রাহ্মণ্যা-দর্শানুযায়ী। এই যুগের লিপিগুলি তো প্রায় সবই ভূমিদান সম্পর্কিত; এবং প্রায় সর্বত্রই ভূমিদান লাভ করিতেছেন ব্রাহ্মণেরা, এবং সর্বাগ্রে ব্রাহ্মণদের সম্মাননা না করিয়া কোন দানকার্যই সম্পন্ন হইতেছে না। তাঁহাদের সম্মান ও প্রতিপত্তি রাষ্ট্রের ও সমাজের সর্বত্র। হরিচরিত নামক গ্রন্থের লেখক চতুর্ভুজ বলিতেছেন, তাঁহার পূর্ব-পুরুষেরা বরেন্দ্রভূমির করঞ্জগ্রাম ধর্মপালের নিকট হইতে দানস্বরূপ লাভ করিয়াছিলেন। এই গ্রামের ব্রাহ্মণেরা বেদবিদ্যাবিদ এবং স্মৃতিশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। এই ধর্মপাল প্রসিদ্ধ পাল-নরপতি হওয়াই সম্ভব, যদিও কেহ কেহ মনে করেন ইনি রাজেন্দ্রচোল-পরাজিত ধর্মপাল। বৌদ্ধ নরপতি শূরপাল (প্রথম বিগ্রহপাল) মন্ত্রী কেদারমিশ্রের যজ্ঞস্থলে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া অনেকবার শ্রদ্ধা-সলিলাপ্লুতহৃদয় নতশিরে পবিত্র শান্তিবারি গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাদল প্রস্তরলিপিতে শাণ্ডিল্যগোত্রীয় এক ব্রাহ্মণ-মন্ত্রীবংশের প্রশস্তি উৎকীর্ণ আছে; এই বংশের তিনপুরুষ বংশপরম্পরায় পালরাষ্ট্রের মন্ত্রিত্ব করিয়াছিলেন। দর্ভপাণিপুত্র মন্ত্রী কেদারমিশ্র সম্বন্ধে এই লিপিতে আরও বলা হইয়াছে, "তাঁহার [হোমকুণ্ডোত্থিত] অবক্রভাবে বিরাজিত সুপুষ্ট হোমাগ্নিশিখাকে চুম্বন করিয়া দিকচক্রবাল যেন সন্নিহিত হইয়া পড়িত।" তাহা ছাড়া, তিনি চতুর্বিদ্যা-পয়োনিধি পান করিয়াছিলেন (অর্থাৎ চারি বেদবিদ ছিলেন)। কেদারমিশ্রের পুত্র মন্ত্রী গুরবমিশ্রের "বাগ্‌বৈভবের কথা, আগমে ব্যুৎপত্তির কথা, নীতিতে পরম নিষ্ঠার কথা, জ্যোতিষে অধিকারের কথা এবং বেদার্থচিন্তাপরায়ণ অসীম তেজসম্পন্ন তদীয় বংশের কথা ধর্মাবতার ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।" পরমসুগত প্রথম মহীপাল বিষুবসংক্রান্তির শুভতিথিতে গঙ্গাস্নান করিয়া এক ভট্ট ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। তৃতীয় বিগ্রহপালও

আমগাছি লিপিদ্বারা এক ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। মদনপালের মহনলি লিপিতে বলা হইয়াছে, শ্রীবটেশ্বর স্বামীশর্মা বেদব্যাসপ্রোক্ত মহাভারত পাঠ করায় মদনপালের পট্টমহাদেবী চিত্রমতিকা ভগবান বুদ্ধভট্টারককে উদ্দেশ করিয়া অনুশাসন দ্বারা ব্রাহ্মণ বটেশ্বরকে নিষ্কর গ্রাম দান করিয়াছেন। বৈদ্যদেবের কমৌলি লিপিতে দেখিতেছি, বরেন্দ্রীর অন্তর্গত ভাবগ্রামে ভরত নামক ব্রাহ্মণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন; "তাঁহার যুধিষ্ঠির নামক বিপ্র(কুল)তিলক পণ্ডিতাগ্রগণ্য পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি শাস্ত্রজ্ঞানপরিশুদ্ধবুদ্ধি এবং শ্রোত্রিয়ত্বের সমুজ্জ্বল যশোনিধি ছিলেন।" যুধিষ্ঠিরের পুত্র ছিলেন দ্বিজাধীশ-পূজ্য শ্রীধর। তীর্থভ্রমণে, বেদাধ্যয়নে, দানাধ্যাপনায়, যজ্ঞানুষ্ঠানে, ব্রতাচরণে, সর্বশ্রোত্রীয়শ্রেষ্ঠ শ্রীধর প্রাতঃ, নক্ত, অযাচিত এবং উপবসন (নামক বিবিধ কৃচ্ছ্রসাধন) করিয়া মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়াছিলেন; এবং কর্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ডবিৎ পণ্ডিতগণের অগ্রগণ্য সর্বাকার-তপোনিধি এবং শ্রৌতস্মার্তশাস্ত্রে গুপ্তার্থবিৎ বাগীশ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। পবিত্র ব্রাহ্মণ্যবংশোদ্ভব কুমারপাল-মন্ত্রী বৈদ্যদেব বৈশাখে বিষুবসংক্রান্তি একাদশী তিথিতে ধর্মাধিকার পদাভিষিক্ত শ্রীগোনন্দন পণ্ডিতের অনুরোধে এই ব্রাহ্মণ শ্রীধরকে শাসনদ্বারা ভূমিদান করিয়াছিলেন। কিন্তু, আর দৃষ্টান্ত উল্লেখের প্রয়োজন নাই; লিপিগুলিতে ব্রাহ্মণ্য দেবদেবী এবং মন্দির ইত্যাদির যে সব উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় তাহারও আর বিবরণ দিতেছি না। বস্তুত পালযুগের লিপিমালা পাঠ করিলেই এ-তথ্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠে যে, এইসব লিপির রচনা আগাগোড়া পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারতের গল্প, ভাবকল্পনা, এবং উপমালঙ্কার দ্বারা আচ্ছন্ন; ইহাদের ভাবাকাশ একান্তই ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংসারের আকাশ। তাহা ছাড়া, বৌদ্ধ পালরাষ্ট্র যে ব্রাহ্মণ্য সমাজ ও বর্ণব্যবস্থা পুরাপুরি স্বীকার করিত তাহার অন্তত দুটি উল্লেখ পাল-লিপিতেই আছে। দেবপালদেবের মুঙ্গের লিপিতে ধর্মপাল সম্বন্ধে বলা হইয়াছে ধর্মপাল "শাস্ত্রার্থের অনুবর্তী শাসনকৌশলে (শাস্ত্রশাসন হইতে) বিচলিত (ব্রাহ্মণাদি) বর্ণসমূহকে স্ব স্ব শাস্ত্রনির্দিষ্ট ধর্মে প্রতিস্থাপিত করিয়াছিলেন"। এই শাস্ত্র যে ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্র এই সম্বন্ধে তো কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। স্ব স্ব ধর্মে প্রতিস্থাপিত করিবার অর্থও নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ্য বর্ণবিন্যাসে প্রত্যেক বর্ণের যথানির্দিষ্ট স্থানে ও সীমায় বিন্যস্ত করা। মাৎস্যন্যায়ের পরে নূতন করিয়া শাস্ত্রশাসনানুযায়ী বিভিন্ন বর্ণগুলিকে সুবিন্যস্ত করার প্রয়োজন বোধ হয় সমাজে দেখা দিয়াছিল। আমগাছি লিপিতেও দেখিতেছি তৃতীয় বিগ্রহপালকে "চাতুর্বর্ণ-সমাশ্রয়" বা বর্ণাশ্রমের আশ্রয়স্থল বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

চন্দ্র ও কম্বোজ রাষ্ট্রের সামাজিক আদর্শ

পালরাষ্ট্র সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, চন্দ্র ও কম্বোজরাষ্ট্র সম্বন্ধেও তাহা সমভাবে প্রযোজ্য। দেখিতেছি, বৌদ্ধ রাজা শ্রীচন্দ্র যথারীতি পবিত্র বারি স্পর্শ করিয়া কোটি হোমকর্তা শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ত্রিঋষিপ্রবর শান্তিবারিক ব্রাহ্মণ পীতবাস গুপ্তশর্মাকে ভূমিদান করিতেছেন; আর একবার দেখিলাম, এই রাজাই হোমচতুষ্টয়ক্রিয়াকালে অদ্ভুতশান্তি নামক মঙ্গলানুষ্ঠানের পুরোহিত কাণ্বশাখীয় বার্দ্ধকৌশিকগোত্রীয় ত্রিঋষিপ্রবর শান্তিবারিক ব্রাহ্মণ ব্যাসগঙ্গশর্মাকে ভূমিদান করিলেন ; উভয় ক্ষেত্রেই দানকার্যটি সম্পন্ন হইল বুদ্ধভট্টারকের নামে এবং ধর্মচক্রদ্বারা শাসনখানা পট্টীকৃত করিয়া। কম্বোজরাজ পরমসুগত নয়পালদেব একটি গ্রাম দান করিলেন ভট্ট দিবাকশর্মার প্রপৌত্র, উপাধ্যায় প্রভাকরশর্মার পৌত্র এবং উপাধ্যায় অনুকূল মিশ্রের পুত্র, ভট্টপুত্র পণ্ডিত অশ্বত্থশর্মাকে ; এই দানকার্যের যাঁহারা সাক্ষী রহিলেন তাঁহাদের মধ্যে পুরোহিত, ঋত্বিক এবং ধর্মজ্ঞ অন্যতম। এই দুই রাষ্ট্রের ঋত্বিক, ধর্মজ্ঞ, পুরোহিত, শান্তিবারিক ইত্যাদি ব্রাহ্মণেরা রাজপুরুষ, এই তথ্যও লক্ষণীয়।

বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য আদর্শ

বস্তুত, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। পূর্ব পূর্ব যুগে যাহাই হউক, এই যুগে সমাজ-ব্যবস্থা ব্যাপারে বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণে কিছু পার্থক্য ছিল না। সামাজিক ব্যাপারে বৌদ্ধরাও মনুর শাসন মানিয়া চলিতেন, ঠিক আজও বৌদ্ধধর্মানুসারী ব্রহ্ম ও শ্যামদেশ সামাজিক শাসনানুশাসনের ক্ষেত্রে যেমন ব্রাহ্মণ্য শাসনব্যবস্থা, কতকটা মানিয়া চলে। তারনাথের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস এবং অন্যান্য তিব্বতী বৌদ্ধগ্রন্থের সাক্ষ্য হইতেও অনুমান হয়, বর্ণাশ্রমী হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে কোন সামাজিক পার্থক্যই ছিল না। যাঁহারা বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা লইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতেন, বিহারে সংঘারামে বাস করিতেন তাঁহাদের ক্ষেত্রে বর্ণাশ্রম-শাসন প্রযোজ্য ছিল না, থাকিবার কোন প্রয়োজনও ছিল না। কিন্তু যাঁহারা উপাসক মাত্র ছিলেন, গৃহী বৌদ্ধ ছিলেন তাঁহারা সাংসারিক ক্রিয়াকর্মে প্রচলিত বর্ণ-শাসন মানিয়াই চলিতেন। বৌদ্ধপণ্ডিতে ব্রাহ্মণপণ্ডিতে ধর্ম ও সামাজিক মতামত লইয়া দ্বন্দ্ব-কোলাহলের প্রমাণ কিছু কিছু আছে, কিন্তু বৌদ্ধরা পৃথক সমাজ সৃষ্টি করিয়াছিলেন এমন কোনও প্রমাণ নাই। বরং সমসাময়িক কাল সম্বন্ধে তারনাথ এবং অন্যান, বৌদ্ধ আচার্যরা যাহা বলিতেছেন, তাহাতে মনে হয়, পালযুগের মহাযানী বৌদ্ধধর্ম ক্রমশ তন্ত্রধর্মের কুক্ষিগত হইয়া পড়িতেছিল, এবং ধর্মাদর্শ ও ধর্মানুষ্ঠান, পূজাপ্রকরণ প্রভৃতি ব্যাপারে নূতন নূতন মত ও পথের উদ্ভব ঘটিতেছিল। তন্ত্রধর্মের স্পর্শে ব্রাহ্মণ্যধর্মেরও অনুরূপ বিবর্তন ঘটিতেছিল, এবং বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভেদ কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঘুচিয়া যাইতেছিল।

সমাজের গতি ও প্রকৃতি

ব্রাহ্মণ্য বর্ণ-বিন্যাস পাল-চন্দ্র-কম্বোজ যুগে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, এবং বর্ণাশ্রম রক্ষণ ও পালনের দায়িত্ব এই যুগের বৌদ্ধরাষ্ট্রও স্বীকার করিত, এ-সম্বন্ধে সন্দেহের কোনও অবকাশ সত্যই নাই। কিন্তু বর্ণবিন্যাস এবং প্রত্যেক বর্ণের সীমা পরবর্তীকালে যতটা দৃঢ়, অনমনীয় এবং নানা বিধিনিষেধের সূত্রে শক্ত ও সুনির্দিষ্ট রূপে বাঁধা পড়িয়াছিল, এই যুগে তাহা হয় নাই। তাহার প্রধান কারণ, বাঙলাদেশ তখনও পর্যন্ত তাহার নিজস্ব স্মৃতিশাসন গড়িয়া তোলে নাই; বস্তুত, স্মৃতিশাস্ত্র রচনার সূত্রপাতই তখনও হয় নাই। দ্বিতীয়ত, এই যুগের সব ক'টি রাষ্ট্র এবং রাজবংশই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী এবং বৌদ্ধ সংস্কারাশ্রয়ী: ইঁহারা ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক এবং ব্রাহ্মণ্য-সমাজ-ব্যবস্থার ধারক ও পালক হইলেও (হিন্দু রাষ্ট্রীয় আদর্শে রাজার অন্যতম কর্তব্যই প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার ধারণ ও পালন) উত্তর বা দক্ষিণ-ভারতের ব্রাহ্মণ্য স্মৃতিশাসন ইঁহাদের নিকট একান্ত হইয়া উঠিতে পারে নাই। তৃতীয়ত, পালরাজবংশ উচ্চবর্ণোদ্ভব নয়; বর্ণ-হিসাবে ইঁহাদের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি রামচরিত ছাড়া আর কোথাও নাই, এবং তাহা রামপালের পিতা সম্বন্ধে। গোপাল বা ধর্মপাল বা দেবপাল সম্বন্ধে এ-দাবি কেহ করেন নাই; দশ-বারো পুরুষ রাজত্ব করার পর একজন রাজা ও তাঁহার বংশ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিগণিত হইবেন ইহা কিছু আশ্চর্য নয়। যাহাই হউক, পালবংশ উচ্চবর্ণোদ্ভব ছিলেন না বলিয়াই বোধ হয় তাঁহারা বর্ণশাসনের স্মৃতিসুলভ সুদৃঢ় আচার-বিচার বা স্তর-উপস্তরভেদ সম্বন্ধে খুব নিষ্ঠাপরায়ণও ছিলেন না। চতুর্থত, বাঙালী সমাজের অধিকাংশ লোকই তখনও বর্ণাশ্রম-বহির্ভূত; অল্প সংখ্যক উচ্চশ্রেণীর লোকেরাই বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত ছিলেন, যদিও তাহার সীমা ক্রমশই প্রসারিত হইয়া চলিয়াছিল। কিন্তু ক্রমবর্ধমান সীমার মধ্যে যাহারা আসিয়া অন্তর্ভুক্ত হইতেছিলেন তাহারা সকলেই আর্যপূর্ব কোম-সমাজের ও সেই সমাজগত সংস্কার ও সংস্কৃতির লোক। ব্রাহ্মণ্য সমাজ-ব্যবস্থা, সংস্কার ও সংস্কৃতি তাহারা মানিয়া লইতেছিলেন অর্থনৈতিক আধিপত্যের চাপে পড়িয়া। ব্রাহ্মণ্য বর্ণবিন্যাসের সূত্রের মধ্যে তাঁহাদের গাঁথিয়া লওয়া খুব সহজ হয় নাই; অন্তত পাল ও চন্দ্ররাষ্ট্র সচেতন ও সক্রিয়ভাবে সেদিকে চেষ্টা কিছু করিয়াছিল বলিয়া তো মনে হয় না, প্রমাণও কিছু নাই। রাষ্ট্রীয় চাপ সেদিকে কিছু ছিল না; রাষ্ট্রের সামাজিক দৃষ্টিও এ-বিষয়ে উদার ছিল। আমরা এই শেষোক্ত অনুমানের সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট প্রমাণ কিছু নাই; তবে সমসাময়িক রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থায় সমাজ-ব্যবস্থার গতি-প্রকৃতি যাহা হওয়া সম্ভব ও স্বাভাবিক তাহাই অনুমানের রূপে ও আকারে ব্যক্ত করিলাম। হিন্দুধর্ম ও সমাজের স্বাঙ্গীকরণক্রিয়া আজও যে যুক্তি-পদ্ধতি অনুসারে চলিতেছে বিভিন্ন আর্যপূর্ব গোষ্ঠী ও কোমগুলিতে, সেই যুক্তি-পদ্ধতিই এই অনুমানের সাক্ষ্যও সমর্থক। তাহা ছাড়া, এই অনুমানের পশ্চাতে

রহিয়াছে, পরবর্তী যুগের, বিশেষভাবে সেন-বর্মণ আমলের বাঙলার বর্ণ ও সমাজ-বিন্যাসের ইতিহাস এবং বাংলার মধ্যযুগের ইতিহাস ও সংস্কৃতির সাক্ষ্য।

৭

সেন-বর্মণ যুগ : বর্ণ-বিন্যাসের চতুর্থ পর্ব

পাল-চন্দ্ররাষ্ট্রে ও তাঁহাদের কালে ব্রাহ্মণ্য বর্ণ-বিন্যাসের আদর্শ ছিল উদার ও নমনীয় : কম্বোজ-সেন-বর্মণ আমলে সেন-বর্মণ রাষ্ট্রের সক্রিয় সচেতন চেষ্টার ফলে সেই আদর্শ হইল সুদৃঢ়, অনমনীয় ও সুনির্দিষ্ট। যে বর্ণবিন্যস্ত সমাজব্যবস্থা আজও বাঙলা-দেশে প্রচলিত ও স্বীকৃত তাহার ভিত্তি স্থাপিত হইল এই যুগে দেড় শতাব্দীর মধ্যে। বাংলার সমাজ-ব্যবস্থার এই বিবর্তন প্রায় হাজার বৎসরের বাঙলাদেশকে ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজাইয়াছে। কি করিয়া এই আমূল সংস্কার, এত বড় পরিবর্তন সাধিত হইল তাহা একে একে দেখা যাইতে পারে।

কম্বোজ-রাজবংশকে অবলম্বন করিয়াই এই বিবর্তনের সূচনা অনুসরণ করা যাইতে পারে। এই পার্বত্য কোমটি বোধ হয় বাঙলা দেশে আসার পর আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতি আশ্রয় করেন। প্রথম রাজা রাজ্যপাল ছিলেন পরমসুগত অর্থাৎ বৌদ্ধ ; কিন্তু তাঁহার পুত্র নারায়ণপাল হইলেন বাসুদেবের ভক্ত। নারায়ণপালের ছোট ভাই সম্রাট নয়পাল একবার নবমী দিবসে পূজাস্নান করিয়া শঙ্কর ভট্টারকের (শিবের) নামে জনৈক ব্রাহ্মণকে বর্ধমানভুক্তিতে কিছু ভূমি দান করেন। বৌদ্ধ রাজার বংশধরদের ব্রাহ্মণধর্মের ছত্রছায়ায় আশ্রয় লইতে দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যায় সমাজচক্র কোন্ দিকে ঘুরিতেছে। পালবংশের শেষের দিকেও একই চিহ্ন সুস্পষ্ট। শেষ অধ্যায়ে পালরাষ্ট্রও এই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও ব্রাহ্মণ তান্ত্রিক সমাজশাসনের স্পর্শে আসিয়াছিল। পালবংশ ও পালরাষ্ট্রকে বিলুপ্ত করিয়া সেনবংশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইল ; চন্দ্রবংশকে বিলুপ্ত করিয়া হইল বর্মণবংশের প্রতিষ্ঠা। যে দু'টি বংশ ও রাষ্ট্র বিলুপ্ত হইল তাহারা উভয়েই বাঙালী ও বৌদ্ধ, এবং যে দু'টি বংশ ও রাষ্ট্র নূতন প্রতিষ্ঠিত হইল তাহারা উভয়েই ভিন্ন প্রদেশাগত, উভয়েই অত্যন্ত নৈষ্ঠিক ও গোঁড়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতির ধারক ও পোষক। বাঙালীর সামাজিক ইতিহাসের দিক হইতে এই দু'টি তথ্যই অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক অর্থবহ।

সেন রাজবংশ কর্ণাটাগত ; তাঁহারা আগে ছিলেন ব্রাহ্মণ, পরে যোদ্ধৃবৃত্তি গ্রহণ করিয়া হইলেন ক্ষত্রিয়, এবং পরিচিত হইলেন ব্রহ্মক্ষত্র রূপে। বর্মণ বংশ কলিঙ্গাগত বলিয়া অনুমিত, অন্তত ভিন্নপ্রদেশী এবং দক্ষিণাগত, সন্দেহ নাই, এবং বর্ণহিসাবে

ক্ষত্রিয়। দক্ষিণদেশ সাতবাহন এবং তৎপরবর্তী সালঙ্কায়ন, বৃহৎফলায়ন, আনন্দ, পল্লব, কদম্ব প্রভৃতি রাজবংশের সময় হইতেই নৈষ্ঠীক ব্রাহ্মণ্যধর্মের কেন্দ্র, যাগযজ্ঞহোম প্রভৃতি নানাপ্রকার ব্রাহ্মণ্য পূজানুষ্ঠানে গভীর বিশ্বাসী, এবং প্রচলিত বর্ণাশ্রমের উৎসাহী প্রতিপালক। দক্ষিণদেশের এই নিষ্ঠাপূর্ণ ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার লইয়া সেন ও বর্মণ রাজবংশ বাঙলাদেশে আসিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। পাল বংশের শেষের দিকে এবং কম্বোজ রাজবংশে ব্রাহ্মণ্য বিবর্তনের সূত্রপাত কিছু কিছু দেখা দিয়াছিল। এখন, দেখিতে দেখিতে বাঙলা দেশ যাগ-যজ্ঞ-হোম ক্রিয়ার ধূমে ছাইয়া গেল, নদ-নদীর ঘাটগুলি বিচিত্র পুণ্যস্নানার্থীর মন্ত্র-উচ্চারণে মুখরিত হইয়া উঠিল, ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর পূজা, বিভিন্ন পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ব্রতানুষ্ঠান দ্রুত প্রসারিত হইল। সহজ স্বাভাবিক বিবর্তনের ধারায় এই দ্রুত পরিবর্তন সাধিত হয় নাই; পশ্চাতে ছিল রাষ্ট্রের ও রাজবংশের সক্রিয় উৎসাহ, অমোঘ ও সচেতন নির্দেশ। এই যুগের লিপিমালা, অসংখ্য পুরাণ, স্মৃতি, ব্যবহার ও জ্যোতিষগ্রন্থ ইত্যাদিই তাহার প্রমাণ।

ব্রাহ্মণ তান্ত্রিক স্মৃতি-শাসনের সূচনা

লিপি প্রমাণগুলিই আগে উল্লেখ করা যাইতে পারে। বর্মণ বংশ পরম বিষ্ণুভক্ত। এই রাজবংশের যে বংশাবলী ভোজবর্মার বেলাবলিপিতে পাওয়া যাইতেছে তাহার গোড়াতেই ঋষি অত্রি হইতে করিয়া আরম্ভ পৌরাণিক নামের ছড়াছড়ি, ইঁহাদেরই বংশে নাকি বর্মণ পরিবারের অভ্যুদয়। রাজা জাতবর্মা অনেক দেশ বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে দিব্যকেও পর্যুদস্ত করিয়াছিলেন বলিয়া দাবি করিয়াছেন। এই দিব্য যে বরেন্দ্রীর কৈবর্তনায়ক দিব্য ইহা বহুদিন স্বীকৃত হইয়াছে। দিব্যর সৈন্য আক্রমণকালে জাতবর্মাকে নিশ্চয়ই উত্তরবঙ্গে অভিযান করিতে হইয়াছিল। এই অভিযানের একটু ক্ষীণ প্রতিধ্বনি বোধ হয় নালন্দায় একটি লিপিতে পাওয়া যায়। সোমপুরের বৌদ্ধ মহাবিহার জাতবর্মার সৈন্যরা পুড়াইয়া দিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। "সোমপুরের একটি বৌদ্ধ ভিক্ষুর গৃহ যখন বঙ্গাল-সৈন্যরা পুড়াইয়া দিতেছিল, ভিক্ষুটি তখন বুদ্ধের চরণ-কমল আশ্রয় করিয়া পড়িয়াছিলেন; সেইখানে সেই অবস্থাতেই তিনি স্বর্গত হইলেন।" বৌদ্ধধর্ম ও সংঘের প্রতি বর্মণ রাষ্ট্রের মনোভাব কিরূপ ছিল লিপিবর্ণিত এই ঘটনা হইতে তাহার কিছু পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। শুধু মাত্র এই ঘটনাটি হইতেই এতটা অনুমান নিশ্চয়ই করা চলিত না; কিন্তু যুগের মনোভাবটাই ছিল এইরূপ। পরবর্তী সাক্ষ্য হইতে ক্রমশ তাহা আরও সুস্পষ্ট হইবে। এই বর্মণ রাষ্ট্রেরই অন্যতম মন্ত্রী স্মার্ত ভট্ট ভবদেব অগস্ত্যের মত বৌদ্ধ-সমুদ্রকে গ্রাস করিয়াছিলেন, এবং পাষণ্ডবৈতণ্ডিকদের (বৌদ্ধদের নিশ্চয়ই, বোধ হয় নাথপন্থীদেরও) যুক্তিতর্ক খণ্ডনে অতিশয় দক্ষ ছিলেন বলিয়া গর্ব অনুভব করিয়াছেন।

সেই রাষ্ট্রের সৈন্যরা যুদ্ধব্যপদেশ বৌদ্ধবিহারও ধ্বংস করিবে ইহা কিছু বিচিত্র নয়। জাতবর্মার পরবর্তী রাজা সামলবর্মা কুলজীগ্রন্থের রাজা শ্যামলবর্মণ; স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এই শ্যামলবর্মার নামের সঙ্গেই এবং অন্যমতে তাঁহারই পূর্ববর্তী রাজা হরিবর্মার সঙ্গে কান্যকুব্জাগত বৈদিক ব্রাহ্মণদের শকুনশত্র যজ্ঞের কিংবদন্তী জড়িত। সামলবর্মার পুত্র ভোজবর্মা সাবর্ণ গোত্রীয়, ভৃগু-চ্যবন-আপ্নুবান-ঔর্ব-জামদগ্নি প্রবর, বাজসনেয় চরণ এবং যজুর্বেদীয় কাণ্বশাখ, শান্ত্যাগারাধ্যক্ষ ব্রাহ্মণ রামদেবশর্মাকে পৌণ্ড্র-ভুক্তিতে কিছু ভূমিদান করিয়াছিলেন। রামদেব শর্মার পূর্বপুরুষ মধ্যদেশ হইতে আসিয়া উত্তর-রাঢ়ের সিদ্ধল-গ্রামে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। সিদ্ধলগ্রামে সাবর্ণ গোত্রীয় ব্রাহ্মণদের বসতির কথা বর্মণ-রাজ হরিবর্মা-দেবের মন্ত্রী ভট্ট ভবদেবের লিপিতেও দেখা যাইতেছে। এই লিপিতে সমসাময়িক কালের ভাবাদর্শ, সমাজ ও শিক্ষাদর্শ ইত্যাদি সংক্রান্ত অনেক খবর পাওয়া যায়। ভবদেবের মাতা সাঙ্গোক ছিলেন জনৈক বন্দ্যঘটীয় ব্রাহ্মণের কন্যা। এই সময়ে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের "গাঞী"-পরিচয় বিভাগ সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্টরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, এ-সম্বন্ধে আর তাহা হইলে কোনও সন্দেহই রহিল না। ভবদেব সমসাময়িককালের বাঙালী চিন্তানায়কদের অন্যতম, তিনি ব্রহ্মবিদ্যাবিদ, সিদ্ধান্ত-তন্ত্র-গণিত-ফলসংহিতায় সুপণ্ডিত, হোরাশাস্ত্রের একটি গ্রন্থের লেখক, কুমারিলভট্টের মীমাংসাগ্রন্থের টীকাকার, স্মৃতিগ্রন্থের প্রখ্যাত লেখক, অর্থশাস্ত্র, আয়ুর্বেদ, আগমশাস্ত্র, অস্ত্রবেদেও তিনি সুপণ্ডিত। রাঢ়দেশে তিনি একটি নারায়ণ মন্দির স্থাপন করিয়া তাহাতে নারায়ণ, অনন্ত ও নৃসিংহের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কুমারিলভট্টের তন্ত্রবার্তিক নামক মীমাংসাগ্রন্থের ভবদেবকৃত তৌতাতিতমত-তিলক নামক টীকাগ্রন্থের পাণ্ডুলিপির কিছু অংশ আজও বর্তমান। তাঁহার কর্মানুষ্ঠানপদ্ধতি ও প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণ নামক দুইখানি স্মৃতিগ্রন্থ আজও প্রচলিত। পরবর্তী বাঙালী স্মৃতি ও মীমাংসা লেখকেরা ভবদেবের উক্তি ও বিচার বারবার আলোচনা করিয়াছেন। বস্তুত, বাঙালীর দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্ম, বিবাহ, জন্ম, মৃত্যু, শ্রাদ্ধ, বিভিন্ন বর্ণের বিচিত্র স্তর উপস্তর বিভাগের সীমা-উপসীমা, প্রত্যেকের পারস্পরিক আহার-বিহার, বিবাহ-ব্যাপারে নানা বিধি-নিষেধ, এক কথায় সর্বপ্রকার সমাজকর্মের রীতিপদ্ধতি বিধিনিয়ম সুনির্দিষ্ট সূত্রে গ্রথিত হইয়া সমাজশাসনের একান্ত ব্রাহ্মণ-তান্ত্রিক, পুরোহিত-তান্ত্রিক নির্দেশ সর্বপ্রথম দেখা দিল। ভবদেবভট্ট পালযুগের শেষ আমলের লোক; এই সময় হইতেই এই একান্ত ব্রাহ্মণ তান্ত্রিক সমাজশাসনের সূচনা এবং ভবদেবভট্টই তাহার আদিগুরু। বর্মণরাষ্ট্রকে অবলম্বন করিয়াই এই ব্রাহ্মণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা বাঙলাদেশে প্রসারিত হইতে আরম্ভ করিল। ভূমি প্রস্তুত হইয়াই ছিল; রাষ্ট্রের সহায়তা এবং সক্রিয় সমর্থন পাইয়া সেই ভূমিতে এই শাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে বিলম্ব হইল না। এই শাসনের প্রথম কেন্দ্রস্থল হইল একদিকে রাঢ়দেশ, এবং কিছু পরবর্তী কালে, আর একদিকে বিক্রমপুর।

বর্মণ-রাষ্ট্রে যাহার সূচনা সেন-রাষ্ট্রে তাহার প্রতিষ্ঠা। ব্রাহ্মণ্য সমাজ এই সময় হইতেই আত্মসংরক্ষণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও দৃঢ়কর্ম হইয়া উঠিল। এই সংরক্ষণী মনোবৃত্তির একটা কারণ অনুমান করা কঠিন নয়। আগে দেখিয়াছি, ভবদেব ভট্ট বৌদ্ধদের প্রতি মোটেই শ্রদ্ধিত ছিলেন না; এই 'পাষণ্ডবৈতণ্ডিকদের' বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ-তন্ত্রের সংরক্ষণী মনোবৃত্তি ভবদেব ভট্টের রচনাতেই সুস্পষ্ট। সেন-আমলে এই মনোবৃত্তি তীব্রতর হইয়া দেখা দিল। পাল আমলে বৌদ্ধ দেবদেবীরা কিছু কিছু ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া যাইতেছিলেন, এবং শেষোক্ত দেবদেবীরাও বৌদ্ধ ও শৈবতন্ত্রে স্থান পাইতেছিলেন। বৌদ্ধসাধনমালায় ব্রাহ্মণ্য মহাকাল ও গণপতির স্থান এবং বৌদ্ধতন্ত্রে ব্রাহ্মণ্য লিঙ্গ এবং শৈব দেবদেবীদের স্থানলাভ পাল-যুগেই ঘটিয়াছিল। তাহা ছাড়া, বৌদ্ধ তান্ত্রিক বজ্রযান, মন্ত্রযান, কালচক্রযান, সহজযান ইত্যাদির আচারানুষ্ঠান, সাধনপদ্ধতি, সাধনাদর্শ প্রভৃতি ক্রমশ ব্রাহ্মণ্যধর্মের পূজানুষ্ঠান প্রভৃতিকেও স্পর্শ করিতেছিল। ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিভূদের কাছে তাহা ভাল লাগিবার কথা নয়, বিশেষত ভিন্নপ্রদেশাগত বর্মণ ও সেনরাষ্ট্রের প্রভুদের কাছে। বাঙলাদেশের তন্ত্রধর্মের সমাজ-প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞানও খুব সুস্পষ্ট থাকিবার কথা নয়। যে-ভাবেই হউক, সেন-আমলের ব্রাহ্মণ্য সমাজ এইখানেই হয়তো ভবিষ্যৎ বিপদের সম্ভাবনা, এবং সমসাময়িককালের ব্রাহ্মণ্যসমাজের সম্ভাব্য সামাজিক নেতৃত্ব-হীনতার কারণ খুঁজিয়া পাইয়া থাকিবেন।

স্মৃতি ও ব্যবহার শাসনের বিস্তার

যাহাই হউক, ধর্মশাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্র রচনাকে আশ্রয় করিয়াই ব্রাহ্মণ্যসমাজের এই সংরক্ষণী মনোবৃত্তি আত্মপ্রকাশ করিল। আদি ধর্মশাস্ত্র লেখক জিতেন্দ্রিয় ও বালকের কোনও রচনা আজ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত নাই; কিন্তু শুভাশুভকাল, প্রায়শ্চিত্ত, ব্যবহার ইত্যাদি সম্বন্ধে এই দুইজনেরই মতামত আলোচনা করিয়াছেন জীমূতবাহন, শূলপাণি, রঘুনন্দন প্রভৃতি পরবর্তী বাঙালী স্মার্ত ও ধর্মশাস্ত্র লেখকেরা। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ পারিভদ্রীয় গাঞী মহামহোপাধ্যায় জীমূতবাহনও এই যুগেরই লোক, এবং তিনি সুবিখ্যাত ব্যবহারমাতৃকা, দায়ভাগ এবং কালবিবেক গ্রন্থের রচয়িতা। কুলজীগ্রন্থের মতে পারিহাল শাণ্ডিল্য গোত্রীয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের অন্যতম গাঞী। জীমূতবাহনের পরেই নাম করিতে হয় বল্লালসেনের গুরু, হারলতা এবং পিতৃদয়িতা গ্রন্থদ্বয়ের রচয়িতা অনিরুদ্ধভট্টের। তিনি শুধু মহামহোপাধ্যায় রাজগুরু ছিলেন না, সেন রাষ্ট্রের ধর্মাধ্যক্ষও ছিলেন। অনিরুদ্ধের বসতি ছিল বরেন্দ্রীর অন্তর্গত চম্পাহিটি গ্রামে এবং তিনি চম্পাহিটি-মহামহোপাধ্যায় আখ্যায় পরিচিত ছিলেন। কুলজীগ্রন্থের মতে চম্পটি শাণ্ডিল্য গোত্রীয় বারেন্দ্র গাঞীদের অন্যতম গাঞী। অনিরুদ্ধশিষ্য রাজা বল্লালসেন স্বয়ং

একাধিক স্মৃতিগ্রন্থের লেখক। তদ্রচিত আচারসাগর ও প্রতিষ্ঠাসাগর আজও অনাবিষ্কৃত; কিন্তু দানসাগর ও অদ্ভুতসাগর বিদ্যমান। দানসাগর তিনি রচনা করিয়াছিলেন গুরু অনিরুদ্ধের আদেশে; অসম্পূর্ণ অদ্ভুতসাগর পিতার আদেশে সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন পুত্র লক্ষ্মণসেন। ছান্দোগ্য মন্ত্রভাষ্য রচয়িতা গুণবিষ্ণুও এই যুগের লোক। কিন্তু এই সব স্মৃতি-ব্যবহার-ধর্মশাস্ত্র রচয়িতাদের মধ্যে সর্বপ্রধান হইতেছেন ধর্মাধ্যক্ষ ধনঞ্জয়ের পুত্র লক্ষ্মণসেনের মহাধর্মাধ্যক্ষ হলায়ুধ। হলায়ুধের এক ভাই ঈশান আহ্নিকপদ্ধতি সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ এবং অপর ভ্রাতা পশুপতি দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন, একখানি শ্রাদ্ধপদ্ধতি এবং অন্য একখানি পাকযজ্ঞ সম্বন্ধে। হলায়ুধ স্বয়ং সুবিখ্যাত ব্রাহ্মণসর্বস্ব, মীমাংসাসর্বস্ব, বৈষ্ণবসর্বস্ব, শৈবসর্বস্ব এবং পণ্ডিতসর্বস্ব প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। কিন্তু আর, নামোল্লেখের প্রয়োজন নাই। এক কথায় বলা যাইতে পারে, যে ব্রাহ্মণ্য স্মৃতি ও ব্যবহার শাসন পরবর্তীকালে শূলপাণি-রঘুনন্দন কর্তৃক আলোচিত ও বিধিবদ্ধ হইয়া আজও বাঙলাদেশে প্রচলিত তাহার সূচনা এই যুগে, বর্মণ ও সেন-রাষ্ট্রের ছত্রছায়ায়। এই যুগে রচিত স্মৃতি ও ব্যবহারগ্রন্থগুলিতে ব্রাহ্মণসমাজের সংরক্ষণী মনোবৃত্তি সুস্পষ্ট। দন্তধাবন, আচমন, স্নান, সন্ধ্যা, তর্পণ, আহ্নিক, যাগযজ্ঞ, হোম, পূজানুষ্ঠান, ক্রিয়াকর্মের শুভাশুভ-কালবিচার, অশৌচ, আচার, প্রায়শ্চিত্ত, বিচিত্র অপরাধ ও তাহার শাস্তি, কৃচ্ছ্র, তপস্যা, গর্ভাধান-পুংসবন হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রাদ্ধ পর্যন্ত সমস্ত ব্রাহ্মণ্য সংস্কার, উত্তরাধিকার, স্ত্রীধন, সম্পত্তি-বিভাগ, আহার-বিহারের বিচিত্র বিধিনিষেধ, বিচিত্র দানের বিবৃতি, দান-কর্মের বিচিত্রতর বিধিনিষেধ, তিথিনক্ষত্রের ইঙ্গিত বিচার, দৈবিক, বায়বিক ও পার্থিব বিচিত্র উৎপাত, লক্ষণাদির শুভাশুভ নির্ণয়, বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রপাঠের নিয়ম ও কাল, এক কথায় দ্বিজবর্ণের জীবনশাসনের কোনও নির্দেশই এইসব গ্রন্থ হইতে বাদ পড়ে নাই। সমাজের বিচিত্র স্তর ও উপস্তরের, বিচিত্রতর বর্ণ ও উপবর্ণের পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয়, বিশেষভাবে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধের অসংখ্য বিধিনিষেধও এইসব স্মৃতিকর্তাদের আলোচনার বিষয়। শুধু তাহাই নয়, ইঁহাদের নির্দেশ অমোঘ ও সুনির্দিষ্ট। এই যুগের স্মৃতি-শাসনই পরবর্তী বাংলার ব্রাহ্মণতন্ত্রের ভিত্তি।

ব্রাহ্মণ-তান্ত্রিক সেনরাষ্ট্র

রাষ্ট্রে এই একান্ত ব্রাহ্মণ-তান্ত্রিক স্মৃতিশাসনের প্রতিফলন সুস্পষ্ট। তাহা না হইবারও কারণ নাই, কারণ ভবদেবের বংশ, হলায়ুধের বংশ, অনিরুদ্ধ ইঁহারা তো সকলেই রাষ্ট্রেরই সৃষ্টি এবং সে-রাষ্ট্রের নায়ক হরিবর্মা, সামল (শ্যামল) বর্মা, বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেন। শেষোক্ত দুইজন তো নিজেরাই ভাবাদর্শে, সমাজাদর্শে অনিরুদ্ধ-

হলায়ুধের সমগোত্রীয়, নিজেরাই স্মৃতিশাসনের রচয়িতা। তাহা ছাড়া শান্ত্যাগারিক, শান্ত্যাগারাধিকৃত, শান্তিবারিক, পুরোহিত, মহাপুরোহিত, ব্রাহ্মণ-রাজপণ্ডিত, ইঁহারা রাজপুরুষ হিসাবে স্বীকৃত হইতেছেন এই যুগেই—কম্বোজ-বর্মণ-সেন রাষ্ট্রে। পাল আমলে কিন্তু রাষ্ট্রযন্ত্রে সাক্ষাৎভাবে ইঁহাদের কোনও স্থান নাই। রাষ্ট্রে ইঁহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়িতেছে, ইঁহারা রাষ্ট্রের অজস্র কৃপালাভ করিতেছেন, নানা উপলক্ষ্যে অপরিমিত ভূমিদান ইঁহারাই লাভ করিতেছেন। কাজেই রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণ-তান্ত্রিক স্মৃতি-শাসনের প্রতিফলন দেখা যাইবে, ইহা তো বিচিত্র নয়।

বিজয়সেন ও বল্লালসেন উভয়েই ছিলেন পরমমাহেশ্বর, অর্থাৎ শৈব ; লক্ষ্মণসেন কিন্তু পরম বৈষ্ণব এবং পরম নারসিংহ (অর্থাৎ বৈষ্ণব) ; লক্ষ্মণসেনের দুই পুত্র বিশ্বরূপ ও কেশব উভয়েই সৌর, অর্থাৎ সূর্যভক্ত। সেন-বংশের আদিপুরুষ সামন্তসেন শেষ বয়সে গঙ্গাতীরস্থ আশ্রমে বানপ্রস্থে কাটাইয়াছিলেন। এই সব আশ্রম-তপোবন ঋষি-সন্ন্যাসী দ্বারা অধ্যুষিত এবং যজ্ঞাগ্নিসেবিত ঘৃতধূমের সুগন্ধে পরিপূরিত থাকিত ; সেখানে মৃগশিশুরা তপোবন-নারীদের স্তনদুগ্ধ পান করিত এবং শুকপাখীরা সমস্ত বেদ আবৃত্তি করিত! কবিকল্পনা সন্দেহ নাই, কিন্তু বস্তুসম্পর্ক বিচ্যুত, ভাবাকাশ বিহারী কবিকল্পনাও রাষ্ট্রের সমাজাদর্শকেই ব্যক্ত করিতেছে এবং প্রাচীন তপোবনাদর্শের দিকে সমাজের মনকে প্রলুব্ধ করিবার, সেই স্মৃতি জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে, সে-বিষয়েও সন্দেহ নাই। সামন্তসেনের পৌত্র বিজয়সেন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের উপর এত কৃপা বর্ষণ করিয়াছিলেন এবং সেই কৃপায় তাঁহারা এত ধনের অধিকারী হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের পত্নীদিগকে নাগরিক রমণীরা মুক্তা, মরকত, মণি, রৌপ্য, রত্ন এবং কাঞ্চনের সঙ্গে কার্পাস বীজ, শাকপত্র, অলাবুপুষ্প, দাড়িম্ববীচি এবং কুষ্মাণ্ডলতাপুষ্পের পার্থক্য শিক্ষা দিত। যজ্ঞকার্যে বিজয়সেনের কখনও কোনও ক্লান্তি ছিল না। একবার তাঁহার মহিষী মহাদেবী বিলাসদেবী চন্দ্রগ্রহণের সময়ে কনক-তুলাপুরুষ অনুষ্ঠানের হোমকার্যে দক্ষিণা-স্বরূপ রত্নাকর দেবশর্মার প্রপৌত্র, রহস্কব দেবশর্মার পৌত্র, ভাস্কর দেবশর্মার পুত্র, মধ্যদেশাগত, বৎসগোত্রীয়, ভার্গব-চ্যবন-আপ্নবান-ঔর্ব-জামদগ্ন্যপ্রবর ঋগ্বেদীয় আশ্বলায়ন শাখার ষড়ঙ্গাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ উদয়কর দেবশর্মাকে কিছু ভূমিদান করিয়াছিলেন। বল্লালসেনের নৈহাটি লিপি আরম্ভ হইয়াছে অর্ধনারীশ্বরকে বন্দনা করিয়া। তাঁহার মাতা বিলাসদেবী একবার সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে গঙ্গাতীরে হেমাশ্বমহাদান অনুষ্ঠানের দক্ষিণাস্বরূপ ভরদ্বাজ গোত্রীয়, ভরদ্বাজ-আঙ্গিরস-বার্হস্পত্য প্রবর, সামবেদীয় কৌথুম-শাখাচরণানুষ্ঠায়ী ব্রাহ্মণ শ্রীওবাসুদেবশর্মাকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। বল্লালসেন এই লিপি দ্বারা এই দান অনুমোদিত ও পট্টিকৃত করেন। লক্ষ্মণসেনের আনুলিয়া লিপির ভূমিদান গ্রহীতা হইতেছেন কৌশিক গোত্রীয়, বিশ্বামিত্র-বন্ধুল-কৌশিক প্রবর, যজুর্বেদীয় কাণ্বশাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত রঘুদেব শর্মা। লক্ষ্মণসেন যে অসংখ্য ব্রাহ্মণকে ধান্যশস্য-

প্রসূ উপবনসমৃদ্ধ বহু গ্রামদান করিয়াছিলেন তাহাও এই লিপিতে উল্লিখিত আছে। এই রাজার গোবিন্দপুর পট্টোলীর ভূমিদান গ্রহীতাও একজন ব্রাহ্মণ, উপাধ্যায় ব্যাসদেব শর্মা—বৎসগোত্রীয় এবং সামবেদীয় কৌঠমশাখাচরণানুষ্ঠায়ী। এই ভূমিদান কার্য প্রথম করা হইয়াছিল লক্ষ্মণসেনের অভিষেক উপলক্ষে। সামবেদীয়, কৌঠমশাখাচরণানুষ্ঠায়ী, ভরদ্বাজ গোত্রীয় আর এক ব্রাহ্মণ ঈশ্বরদেবশর্মণও কিছু ভূমিদান লাভ করিয়াছিলেন রাজা কর্তৃক হেমাশ্বরথমহাদান যজ্ঞানুষ্ঠানে আচার্যক্রিয়ার দক্ষিণাস্বরূপ। এই ভূমির সীমানির্দেশ প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, পূর্বদিকে বৌদ্ধ বিহারদেবতার এক আঢ়বাপ নিষ্কর ভূমির পূর্বসীমা আলি (বৌদ্ধবিহারীদেবতা নিকরদেয়ম মালভূম্যাঢ়াবাপ-পূর্বালিঃ)। সেন-বংশের লিপিমালার মধ্যে এই একটি মাত্র স্থানে বৌদ্ধধর্মের উল্লেখ পাওয়া গেল; বরেন্দ্রীতে তাহা হইলে দ্বাদশ শতকের শেষপাদেও বৌদ্ধধর্মের প্রকাশ্য অস্তিত্ব ছিল। লক্ষ্মণসেনের মাধাইনগর লিপি সর্বত্র সুস্পষ্ট ও সুপাঠ্য নয়; মনে হয়, রাজা তাঁহার মূল অভিষেকের সময় ঐন্দ্রীমহাশান্তি যজ্ঞানুষ্ঠান উপলক্ষে কৌশিকগোত্রীয়, অথর্ববেদীয় পৈপ্পলাদশাখাধ্যায়ী শান্ত্যাগারিক ব্রাহ্মণ গোবিন্দদেবশর্মাকে যে ভূমিদান করিয়াছিলেন তাহাই এই শাসন দ্বারা অনুমোদিত ও পাট্টিকৃত করা হইয়াছে। আর একবার এই রাজাই সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে জনৈক কুবের নামীয় ব্রাহ্মণকে কিছু ভূমিদান করিয়াছিলেন। এই রাজার সুন্দরবন লিপিতেও কয়েকজন শান্ত্যাগারিক ব্রাহ্মণকে ভূমিদানের খবর পাওয়া যায়, যথা, প্রভাস, রামদেব, বিষ্ণুপাণি গড়োলি, কেশব গড়োলি এবং বৃষধর দেবশর্মা; ইঁহারা প্রত্যেকেই শান্ত্যাগারিক। শেষোক্তটি গার্গগোত্রীয় এবং ঋগ্বেদীয় আশ্বলায়নশাখাধ্যায়ী। লক্ষ্মণসেনের পুত্র কেশবসেন ধান্য শস্যক্ষেত্র ও অট্টালিকাপূর্ণ বহু প্রসিদ্ধ গ্রাম ব্রাহ্মণদের দান করিয়াছিলেন। তদনুষ্ঠিত যজ্ঞাগ্নির ধূম চারিদিকে এমন বিকীর্ণ হইত যেন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া যাইত! তিনি একবার তাঁহার জন্মদিনে দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া একটি গ্রাম বাৎস্যগোত্রীয় নীতিপাঠক ব্রাহ্মণ ঈশ্বরদেবশর্মাকে দান করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেনের আর এক পুত্র বিশ্বরূপসেন শিবপুরাণোক্ত ভূমিদানের ফললাভের আকাঙ্ক্ষায় বাৎস্যগোত্রীয় নীতিপাঠক ব্রাহ্মণ বিশ্বরূপ দেবশর্মাকে কিছু ভূমিদান করিয়াছিলেন। এই রাজারাই অন্য আর একটি লিপিতে দেখিতেছি হলায়ুধ নামে বাৎস্যগোত্রীয়, যজুর্বেদীয়, কাম্বশাখাধ্যায়ী জনৈক ব্রাহ্মণ আবল্লিক পণ্ডিত, রাজপরিবারের ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান রাজকর্মচারীদের নিকট হইতে প্রচুর ভূমিদান লাভ করিতেছেন—উত্তরায়ণ-সংক্রান্তি চন্দ্রগ্রহণ, উত্থানদ্বাদশীতিথি, জন্মতিথি ইত্যাদি বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে।

ত্রিপুরা-নোয়াখালি-চট্টগ্রাম অঞ্চলের দেববংশের লিপিগুলিতেও অনুরূপ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। এই রাজবংশ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কারাশ্রয়ী এবং বিষ্ণুভক্ত। এই বংশের অন্যতম রাজা দামোদর একবার জনৈক যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণ পৃথ্বীধরশর্মাকে কিছু

ভূমিদান করিয়াছিলেন। বোধ হয়, এই বংশেরই আর একজন রাজা, অরিরাজ-দনুজমাধব শ্রীদশরথদেবের (=কুলজীগ্রন্থের 'দনুজমাধব=মুসলমান' ঐতিহাসিকদের সোনারগাঁর রাজা, দনুজ রায়) আদাবাড়ী লিপি দ্বারা যে সমস্ত ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করা হইয়াছে তাঁহাদের গাঞী পরিচয়ে জানা যায়, যথা, সন্ধ্যাকর, শ্রীমাক্তি (দিণ্ডী গাঞী), শ্রীশক্র, শ্রীসুগন্ধ (পালি গাঞী), শ্রীসোম (সিউ গাঞী), শ্রীবাদ (পালি গাঞী), শ্রীপণ্ডিত (মাসচটক গাঞী), শ্রীমাণ্ডী (মূল গাঞী), শ্রীরাম (দিণ্ডী গাঞী), শ্রীনেধু (সেহন্দায়ী গাঞী), শ্রীদক্ষ (পুতি গাঞী), শ্রীচট্ট (সেউ গাঞী), শ্রীবালি (মহান্তিয়াড়া গাঞী), শ্রীবাসুদেব (করঞ্জ গাঞী) শ্রীমিকো (মাসচড়ক গাঞী), ইত্যাদি। গাঞীপ্রথার প্রচলন ভবদেব ভট্টের কালেই আমরা দেখিয়াছি; বোধ হয় তাহারও বহু পূর্বে গুপ্ত আমলেই এই প্রথা প্রবর্তিত হইয়া থাকিবে (গুপ্ত আমলের লিপিগুলিতে বন্দ্য, চট্ট, প্রভৃতি ব্রাহ্মণ পদবী-পরিচয় গাঞী-পরিচয় হওয়াই সম্ভব, একথা আগেই বলিয়াছি)। ত্রয়োদশ শতকে এই প্রথা একেবারে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। আদাবাড়ী লিপির গাঞী তালিকায় রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র উভয় গাঞী পরিচয়ই মিলিতেছে।

বৌদ্ধধর্ম ও সংঘের প্রতি ব্রাহ্মণ-তন্ত্রের ব্যবহার

এই সুবিস্তৃত লিপি-সংবাদ হইতে কয়েকটি তথ্য সুস্পষ্ট দেখা দিতেছে। প্রথমত, বিভিন্ন রাষ্ট্রের ও রাজবংশের সুদীর্ঘ দান-তালিকায় বৌদ্ধধর্ম ও সংঘে একটি দানের উল্লেখও নাই। অথচ বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব তখনও ছিল, লক্ষ্মণসেনের তর্পণদীঘি লিপিতেই তাহার প্রমাণ আমরা দেখিয়াছি। তাহা ছাড়া, রণবঙ্কমল্ল হরিকাল দেবের (১২২০) পট্টিকেরা লিপিও তাহার অন্যতম সাক্ষ্য; এই লিপিতে হরিকাল কর্তৃক পট্টিকেরা নগরীর এক বৌদ্ধবিহারে একখণ্ড ভূমিদানের উল্লেখ আছে। এই লিপিতেই দুর্গোত্তারা নামক বৌদ্ধ এক দেবীমূর্তির এবং সহজধর্মেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আরও প্রমাণ আছে। পঞ্চরক্ষা নামক মহাযানগ্রন্থের একটি পাণ্ডুলিপির পুষ্পিকা অংশে "পরমেশ্বর-পরমসৌগত-পরমমহারাজাধিরাজ শ্রীমদ্. গৌড়েশ্বর-মধুসেন-দেবপাদানাং বিজয়রাজ্যে", ১২১১ শকে (=১২৮৯) মধুসেন নামক একজন বৌদ্ধ রাজা গৌড়ে রাজত্ব করিতেছিলেন। বর্মণ রাষ্ট্রেও বৌদ্ধ মহাযান মতের অস্তিত্ব ছিল। লঘুকালচক্র নামক মহাযান গ্রন্থের বিমলপ্রভা নামীয় টীকার একটি পুঁথি লেখা হইয়াছিল হরিবর্মা দেবের ৩৯ রাজ্যাঙ্কে, অর্থাৎ সাত বৎসর পর; "পূর্বোত্তর দিশাভাগে বেংগনদ্যাস্তথা কূলে" গৌরী নামে একটি (বৌদ্ধ?) মহিলা স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়াছিলেন গ্রন্থটি নিয়মিত বাচনের জন্য। এই বেংগ নদী, মনে হয়, যশোর কি ফরিদপুর জেলার কোনও নদী। এই অঞ্চলেই পঞ্চদশ শতকেও বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্বের

খবর পাওয়া যায় ১৪৯২ সংবতের (=১৪৩৬) মহাযান মতের বিখ্যাত গ্রন্থ বোধিচর্যাবতারের একটি অনুলিপি হইতে। এই অনুলিপিটি প্রস্তুত করিয়াছিলেন সোহিথতরী গ্রামনিবাসী কুটুম্বিক, উচ্চমহত্তম শ্রীমাধবমিত্রের পুত্র, মহত্তম শ্রীরামদেবের স্বার্থ-পরার্থের জন্য, "সদ্‌বৌদ্ধ করণকায়স্থ ঠক্কুর" শ্রীঅমিতাভ। কোন এক সময়ে পুঁথিখানা গুণকীর্তি "ভিক্ষুপাদানাং" অধিকারে ছিল। পাল-চন্দ্র রাষ্ট্রের আমলে বৌদ্ধ রাজবংশের যে-ঔদার্য ছিল সেন বর্মণ রাষ্ট্রে সে-ঔদার্যের এতটুকু চিহ্ন কোথাও দেখা যাইতেছে না। কান্তিদেবের পিতা বৌদ্ধ ধনদত্ত একজন পরম শিবভক্ত রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং নিজের সুভাষিত-রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণে ব্যুৎপত্তির কথা বলিতে গিয়া গর্বানুভব করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র কান্তিদেব নিজে বৌদ্ধ হইয়াও তাঁহার রাজকীয় শীলমোহরে বৌদ্ধ পিতা ও শৈব মাতা উভয়ের ধর্মের সমন্বিত রূপ উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। এই ধরনের বহু দৃষ্টান্ত আগেও উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু রাষ্ট্রের সামাজিক আদর্শের সেই উদারতার যুগ আর ছিল না। সেন-বর্মণদের আমলে এই ঔদার্যের এতটুকু দৃষ্টান্ত কোথাও নাই। দ্বিতীয়ত, সেন-বর্মণ-দেবরাষ্ট্র ও রাজবংশ বাঙলার অতীত সামাজিক বিবর্তনের ধারা, বিশেষভাবে, গৌরবময় পালচন্দ্র যুগের ধারা, গতি-প্রকৃতি ও আদর্শ একেবারে অস্বীকার করিয়া বৈদিক, স্মার্ত ও পৌরাণিক যুগ বাঙলাদেশে পুনঃপ্রবর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন। এই যুগের ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রতিনিধি হলায়ুধ সন্দেহ নাই। তাঁহার ব্রাহ্মণসর্বস্বের গোড়াতেই আত্মপ্রশস্তিমূলক কয়েকটি শ্লোক আছে : তাহার একটি এই :

> পাত্রং দারুময়ং ক্বচিদ্ বিজয়তে ক্বচিৎ ভাজনং
> কুত্রাপ্যস্তি দুকূলমিন্দুধবলং কুত্রাপি কৃষ্ণাজিনম্।
> ধূপঃ ক্বাপি বষট্‌কৃতাহুতিকৃতো ধূমঃ পরঃ ক্বাপ্যভূদ্
> অগ্নে কর্মফলং চ তস্য যুগপজ্জাগর্তি যন্মন্দিরে ॥

[হলায়ুধের নিজের গৃহে] কোথায়ও কাঠের [যজ্ঞ] পাত্র [ছড়াইয়া আছে] ; কোথাও বা স্বর্ণপাত্র [ইত্যাদি]। কোথাও ইন্দুধবল দুকূলবস্ত্র ; কোথাও কৃষ্ণমৃগচর্ম। কোথাও ধূপের [গন্ধময় ধূম] ; কোথাও বষট্‌কার ধ্বনিময় আহুতির ধূম। [এইভাবে তাঁহার গৃহে] অগ্নির এবং [তাঁহার নিজের] কর্মফল যুগপৎ জাগ্রত।

ইহাই ব্রাহ্মণ্য সেন রাষ্ট্রের ভাবপরিমণ্ডল। হলায়ুধ-গৃহের ভাবকল্পনাই সমসাময়িক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ভাবকল্পনা।

কনক-তুলাপুরুষ মহাদান, ঐন্দ্রীমহাশান্তি, হেমাশ্বমহাদান, হেমাশ্বরথদান প্রভৃতি যাগযজ্ঞ ; সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, উত্থানদ্বাদশীতিথি, উত্তরায়ণ সংক্রান্তি প্রভৃতি উপলক্ষে স্নান, তর্পণ, পূজানুষ্ঠান ; শিবপুরাণোক্ত ভূমিদানের ফলাকাঙ্ক্ষা ; বিভিন্ন বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণের পুঙ্খানুপুঙ্খ উল্লেখ ; গোত্র, প্রবর, গায়ত্রী প্রভৃতির বিশদ্ বিবৃত পরিচয়োল্লেখ ;

দুর্বাতৃণ লইয়া দানকার্য সমাপন ; নীতিপাঠক শান্ত্যাগারিক প্রভৃতি ব্রাহ্মণদের উপর রাষ্ট্রের কৃপাবর্ষণ ইত্যাদির সামাজিক ইঙ্গিত অত্যন্ত সুস্পষ্ট; সে-ইঙ্গিত পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য আদর্শের প্রচলন এবং পাল-চন্দ্র যুগের সমন্বয় ও সমীকরণাদর্শের বিলোপ। বিভিন্ন বর্ণ, বিভিন্ন ধর্মাদর্শের সহজ স্বাভাবিক বিবর্তিত সমন্বয় নয়, ঔদার্যময় বিন্যাস নয়, এক বর্ণ, এক ধর্ম ও সমাজাদর্শের একাধিপত্যই সেন-বর্মণ যুগের একতম কামনা ও আদর্শ। সে-বর্ণ, ব্রাহ্মণ বর্ণ। সে-ধর্ম ব্রাহ্মণ্য ধর্ম। এবং সে-সমাজাদর্শ পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য সমাজের আদর্শ। এই কালের স্মৃতি-ব্যবহার-মীমাংসা গ্রন্থে আগেই, দেখিয়াছি, ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্যাদর্শের জয়জয়কার ; লিপিমালায়ও তাহাই দেখিলাম। সেই আদর্শই হইল সমাজ ব্যবস্থার মাপকাঠি। রাষ্ট্রের শীর্ষে যাঁহারা আসীন সেই রাজারা, এবং রাষ্ট্রের যাঁহারা প্রধানতম সমর্থক সেই ব্রাহ্মণেরা দুইয়ে মিলিয়া এই আদর্শ ও মাপকাঠি গড়িয়া তুলিলেন; পরস্পরের সহযোগিতায়, পোষকতায় ও সমর্থনে মূর্তিতে-মন্দিরে, রাজকীয় লিপি-মালায়, স্মৃতি-ব্যবহার ও ধর্মশাস্ত্রে, সর্বথা, সর্ব উপায়ে এই আদর্শ ও মাপকাঠি সবলে সোৎসাহে প্রচার করিলেন। পশ্চাতে যেখানে রাষ্ট্রের সমর্থন সেখানে এই প্রচারকার্য ও ঈপ্সিত সমাজব্যবস্থার দ্রুত প্রচলন সার্থক হইবে, ইহা কিছু বিচিত্র নয়।

পরিণতি

ভিন্ন-প্রদেশী বর্মণ-সেনাধিপত্য সূচনার সঙ্গে সঙ্গেই (তখন পাল-পর্বের শেষ অধ্যায়) বাঙলার ইতিহাস-চক্র সম্পূর্ণ আবর্তিত হইয়া গেল। বৈদিক, আর্য ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতি বাঙলাদেশে গুপ্ত আমল হইতেই সবেগে প্রবাহিত হইতেছিল, সে-প্রমাণ আমরা আগেই পাইয়াছি। তিনশত সাড়ে তিনশত বৎসর ধরিয়া এই প্রবাহ চলিয়াছে। বৌদ্ধ খড়্গ-পাল-চন্দ্র রাষ্ট্রের কালেও তাহা ব্যাহত হয় নাই ; বরং আমরা দেখিয়াছি, সামাজিক আদর্শ ও অনুশাসনের ক্ষেত্রে এইসব রাষ্ট্র ও রাজবংশ ব্রাহ্মণ্য আদর্শ ও অনুশাসনকেই মানিয়া চলিত, কারণ সেই আদর্শ ও অনুশাসনই ছিল বৃহত্তর জনসাধারণের, অন্তত উচ্চতর স্তরসমূহের লোকেদের আদর্শ ও অনুশাসন। কিন্তু, বৌদ্ধ বলিয়াই হউক বা অন্য সামাজিক বা অর্থনৈতিক কারণেই হউক, পাল-চন্দ্র রাষ্ট্রের সামাজিক আদর্শ ও অনুশাসনের একটা ঔদার্য ছিল—তাহার দৃষ্টান্ত সত্য সত্যই অফুরন্ত—ব্রাহ্মণ্য সামাজিক আদর্শকেই একটা বৃহত্তর সমন্বিত ও সমীকৃত আদর্শের রূপ দিবার সজাগ চেষ্টা ছিল ; অন্যতর সামাজিক যুক্তিপদ্ধতি ও আদর্শকে অস্বীকার করার কোনও চেষ্টা ছিল না, কোনও সংরক্ষণী মনোবৃত্তি সক্রিয় ছিল না। সেন-বর্মণ আমলে কিন্তু তাহাই হইল, সমাজ ব্যবস্থায় কোনও ঔদার্য, অন্যতর আদর্শ ও ব্যবস্থার কোনও স্বীকৃতিই আর রহিল না ; ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতি এবং তদনুযায়ী সমাজ ও বর্ণব্যবস্থা

একান্ত হইয়া উঠিল ; তাহারই সর্বময় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল, রাষ্ট্রের ইচ্ছায় ও নির্দেশে।

ফল যাহা ফলিবার সঙ্গে সঙ্গেই ফলিল। বর্ণ-বিন্যাসের ক্ষেত্রে তাহার পরিপূর্ণরূপ দেখিতেছি সমসাময়িক স্মৃতি-গ্রন্থাদিতে, বৃহদ্ধর্মপুরাণে, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে, সমসাময়িক লিপিমালায় এবং কিছু কিছু পরবর্তী কুলজীগ্রন্থমালায়।

ব্রাহ্মণ

ব্রাহ্মণ-তান্ত্রিক বর্ণব্যবস্থার চূড়ায় থাকিবেন স্বয়ং ব্রাহ্মণেরা ইহা তো খুবই স্বাভাবিক। নানা গোত্র, প্রবর ও বিভিন্ন বৈদিক শাখানুষ্ঠায়ী ব্রাহ্মণেরা যে পঞ্চম-ষষ্ঠ-সপ্তম শতকেই উত্তর-ভারত হইতে বাঙলাদেশে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা তো আমরা আগেই দেখিয়াছি ; "মধ্যদেশ-বিনির্গত" ব্রাহ্মণদের সংখ্যা অষ্টম শতক হইতে ক্রমশ বাড়িয়াই যাইতে আরম্ভ করিল ; ক্রোড়াঞ্চি-কোড়ঞ্জ (=কোলাঞ্চ), তর্কারি (যুক্তপ্রদেশের শ্রাবস্তী অন্তর্গত), মৎস্যাবাস, কুন্তীর, চন্দবার (এটোয়া জেলার বর্তমান চান্দোয়ার), হস্তিপদ, মুক্তাবাস্তু, এমন কি সুদূর লাট (গুজরাত) দেশ হইতে ব্রাহ্মণ পরিবারদের বাঙলাদেশে আসিয়া বসবাসের দৃষ্টান্ত এ-যুগের লিপিগুলিতে সমানেই পাওয়া যাইতেছে। ইঁহারা এদেশে আসিয়া পূর্বাগত ব্রাহ্মণদের এবং তাঁহাদের অগণিত বংশধরদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছিলেন, এইরূপ অনুমানই স্বাভাবিক।

গাঞী বিভাগ

কুলজীগ্রন্থের আদিশূর-কাহিনীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বর্ণকাহিনী রচনার প্রয়োজন নাই ; লিপিমালা ও সমসাময়িক স্মৃতি-গ্রন্থাদির সাক্ষ্যই যথেষ্ট। পঞ্চম-ষষ্ঠ-সপ্তম শতকেই দেখিতেছি চট্ট, বন্দ্য ইত্যাদি গ্রামের নামে পরিচয় দিবার একটি রীতি ব্রাহ্মণদের মধ্যে দেখা যাইতেছে ; নিঃসংশয়ে বলিবার উপায় নাই, কিন্তু মনে হয় গাঞী পরিচয় রীতির তখন হইতেই প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু তখনও বিধিবদ্ধ, প্রথাবদ্ধ হয় নাই। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে কিন্তু এই রীতি একেবারে সুনির্দিষ্ট সীমায় প্রথাবদ্ধ নিয়মবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ভবদেব ভট্টের মাতা বন্দ্যঘটীয় ব্রাহ্মণ-কন্যা ; টীকাসর্বস্ব গ্রন্থের রচয়িতা আর্তিহরপুত্র সর্বানন্দ (১১৫৯-৬০) বন্দ্যঘটীয় ব্রাহ্মণ ; ভবদেব স্বয়ং এবং শান্ত্যাগরাধিকৃত ব্রাহ্মণ রামদেবশর্মা উভয়েই সাবর্ণগোত্রীয় এবং সিদ্ধল-গ্রামীয় ; বল্লালগুরু অনিরুদ্ধভট্ট চম্পাহিটী বা চম্পহট্টীয় মহামহোপাধ্যায় ; মদনপালের মনহলি লিপির দানগ্রহীতা বটেশ্বরও চম্পহট্টীয় ; জীমূতবাহন আত্মপরিচয় দিয়াছেন পারিভদ্রীয় বলিয়া। দশরথদেবের আদাবাড়ী লিপিতে দিণ্ডী, পালি বা পালী, সেউ, মাসচটক বা মাসচড়ক, মূল, সেহন্দায়ী, পূতি, মহান্তিয়াড়া এবং করঞ্জ প্রভৃতি গাঞী

পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। হলায়ুধের মাতৃপরিচয় গোচ্ছাষণ্ডী-গ্রামীয়রূপে ; লক্ষ্মণসেনের অন্যতম সভাকবি শ্রীনিবাসের মহিন্তাপনীবংশ-পরিচয় ও গাঞী পরিচয়। বরেন্দ্রীর তটক, মৎস্যাবাস ; রাঢ়ার ভূরিশ্রেষ্ঠী, পূর্বগ্রাম, তালবাটী, কাঞ্জিবিল্লী এবং বাঙলাদেশের অন্যান্য অনেক গ্রামের (যথা ভট্টশালী, শকটী, রত্নমালী, তৈলপাটী, হিজ্জলবল, চতুর্থ খণ্ড, বাপড়ল্মা) ব্রাহ্মণদের উল্লেখ সমসাময়িক লিপি ও গ্রন্থাদিতে পাওয়া যাইতেছে। সংকলয়িতা শ্রীধর দাসের সদুক্তিকর্ণামৃত (১২০৬)-গ্রন্থে দেখিতেছি বাঙালী ব্রাহ্মণদের নামের সঙ্গে—বর্তমান ক্ষেত্রে নামের পূর্বে—গ্রামের নাম অর্থাৎ গাঞী পরিচয় ব্যবহারের রীতি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, যথা, ভট্টশালীয় পীতাম্বর, তৈলপাটীয় গাঙ্গোক, কেশর-কোলীয় নাথোক, বন্দ্যঘটীয় সর্বানন্দ, ইত্যাদি। এইসব গাঞী-পরিচয় অল্পবিস্তর পরিবর্তিতরূপে কুলজী-গ্রন্থমালার রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের পঞ্চগোত্রে বিভক্ত ১৫৬টি গাঞী-পরিচয়ের মধ্যেই পাওয়া যায়। কালক্রমে এই গাঞী-পরিচয়প্রথা বিস্তৃত হইয়াছে, বিধিবদ্ধ হইয়াছে এবং সুনির্দিষ্ট সীমায় সীমিত হইয়াছে : এই সীমিত, বিধিবদ্ধ প্রথারই অস্পষ্ট পরিচয় আমরা পাইতেছি কুলজী-গ্রন্থমালায়।

ভৌগোলিক বিভাগ

কিন্তু গাঞী বিভাগ অপেক্ষাও সামাজিক দিক হইতে গভীর অর্থবহ বিভাগ ব্রাহ্মণদের ভৌগোলিক বিভাগ। এক্ষেত্রেও কুলজীগ্রন্থের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া লাভ নাই ; কারণ রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, বৈদিক ও অন্যান্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের উদ্ভব সম্বন্ধে এইসব গ্রন্থে যে-বিবরণ পাওয়া যাইতেছে তাহা বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু হলায়ুধের ব্রাহ্মণসর্বস্ব প্রামাণ্যগ্রন্থ এবং তাহার রচনাকালও সুনির্দিষ্ট। এই গ্রন্থে হলায়ুধ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন যে, রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা যথার্থ বেদবিদ্ ছিলেন না ; ব্রাহ্মণদের বেদচর্চার সমধিক প্রসিদ্ধি ছিল, তাঁহার মতে, উৎকল ও পাশ্চাত্যদেশসমূহে। যাহাই হউক, হলায়ুধের সাক্ষ্য হইতে দেখিতেছি, দ্বাদশ শতকেই জনপদ বিভাগানুযায়ী ব্রাহ্মণদের রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে ; লিপিসাক্ষ্য হইতে জানা যায়, এই সব ব্রাহ্মণেরা রাঢ় ও বরেন্দ্রীর বাহিরে পূর্ববঙ্গেও বসতি স্থাপন করিতেছেন। বরেন্দ্রীর তটকগ্রামীয় একজন ব্রাহ্মণ বিক্রমপুরে গিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন, অন্তত এই একটি দৃষ্টান্ত আমরা জানি। কুলজী-গ্রন্থমালায় দেখা যায় কায়স্থ, বৈদ্য, বারুই প্রভৃতি অব্রাহ্মণ উপবর্ণদের ভিতরও রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র এবং বঙ্গজ প্রভৃতি ভৌগোলিক বিভাগ প্রচলিত হইয়াছিল, কিন্তু এ-সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিক প্রমাণ কিছু নাই।

বৈদিক ব্রাহ্মণ

রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র বিভাগ ছাড়া ব্রাহ্মণদের আর একটি শ্রেণী—বৈদিক—বোধ হয় এই যুগেই উদ্ভূত হইয়াছিল। কুলজী-গ্রন্থমালায় এ-সম্বন্ধে দুইটি কাহিনী আছে ; একটি

কাহিনীর মতে, বাঙলাদেশে যথার্থ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ না থাকায় এবং যজ্ঞাগ্নি যথানিয়মে রক্ষিত না হওয়ায় রাজা শ্যামলবর্মা (বোধ হয়, বর্মণরাজ সামলবর্মা) কান্যকুব্জ (কোনও কোনও গ্রন্থমতে, বারাণসী) হইতে ১০০১ শকাব্দে পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। অপর কাহিনীমতে, সরস্বতী নদীতীরস্থ বৈদিক ব্রাহ্মণেরা যবনাক্রমণের ভয়ে ভীত হইয়া বাঙলাদেশে পলাইয়া আসেন, এবং বর্মণরাজ হরিবর্মার পোষকতায় ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়ায় বসবাস আরম্ভ করেন। উত্তর-ভারত হইতে আগত এই সব বৈদিক ব্রাহ্মণেরাই পাশ্চাত্য বৈদিক নামে খ্যাত। বৈদিক ব্রাহ্মণদের আর এক শাখা আসেন উৎকল ও দ্রাবিড় হইতে; ইঁহারা দাক্ষিণাত্য বৈদিক নামে খ্যাত। এই কুলজী-কাহিনীর মূল বোধ হয় হলায়ুধের ব্রাহ্মণসর্বস্ব-গ্রন্থে পাওয়া যাইতেছে। এই গ্রন্থ-রচনার কারণ বর্ণনা করিতে গিয়া হলায়ুধ বলিতেছেন, রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা বেদপাঠ করিতেন না এবং সেই হেতু বৈদিক যাগযজ্ঞানুষ্ঠানের রীতি-পদ্ধতিও জানিতেন না; যথার্থ বেদজ্ঞান তাঁহার সময়ে উৎকল ও পাশ্চাত্যদেশেই প্রচলিত ছিল। বাঙলার ব্রাহ্মণেরা নিজেদের বেদজ্ঞ বলিয়া দাবি করিলেও যথার্থত বেদচর্চার প্রচলন বোধ হয় সত্যই তাঁহাদের মধ্যে ছিল না। হলায়ুধের আগে বল্লালগুরু অনিরুদ্ধ ভট্টও তাঁহার পিতৃদয়িতা গ্রন্থে বাঙলাদেশে বেদচর্চার অবহেলা দেখিয়া দুঃখ করিয়াছেন। যাহা হউক, পাশ্চাত্য বলিতে হলায়ুধ এক্ষেত্রে উত্তর-ভারতকেই বুঝাইতেছেন, সন্দেহ নাই। বাঙলা দেশে উৎকল ও পাশ্চাত্যদেশাগত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা বসবাস তখন করিতেছিলেন কিনা এ-সম্বন্ধে হলায়ুধ কোনও কথা বলেন নাই; তবু, সামলবর্মা ও হরিবর্মার সঙ্গে কুলজী-কাহিনীর সম্বন্ধ, তাঁহাদের মোটামুটি তারিখ, অনিরুদ্ধ ভট্ট এবং হলায়ুধ কথিত রাঢ়ে-বরেন্দ্রীতে বেদচর্চার অভাব এবং সঙ্গে সঙ্গে উৎকল ও পশ্চিম দেশসমূহে বেদজ্ঞানের প্রসার, পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য এই দুই শাখায় বৈদিক ব্রাহ্মণের শ্রেণীবিভাগ, এই সব বিচিত্র হেতু-সমাবেশ দেখিয়া মনে হয় সেন-বর্মণ আমলেই বাঙলায় বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের উদ্ভব দেখা দিয়াছিল।

এই সব শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছাড়া আরও দুই তিন শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের সংবাদ এই যুগেই পাওয়া যাইতেছে। গয়াজেলার গোবিন্দপুর গ্রামে প্রাপ্ত একটি লিপিতে (১০৫৯ শক =১১৩৭) দেখিতেছি, শাকদ্বীপাগত মগব্রাহ্মণ-পরিবার সম্ভূত জনৈক ব্রাহ্মণ গঙ্গাধর জয়পাণি নামে গৌড়রাষ্ট্রের একজন কর্মচারীর কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই লিপি এবং বৃহদ্ধর্ম-পুরাণগ্রন্থের সাক্ষ্য হইতে দেবল বা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণদের পরিচয় জানা যায়। শেষোক্ত গ্রন্থে স্পষ্টই বলা হইতেছে, দেবল ব্রাহ্মণেরা শাকদ্বীপ হইতে আসিয়াছিলেন, এবং সেই হেতু তাঁহারা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। বল্লালসেনের দানসাগর গ্রন্থে সারস্বত নামে আর এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণের খবর পাওয়া যাইতেছে। কুলজী-গ্রন্থের মতে ইঁহারা আসিয়াছিলেন সরস্বতী নদীর তীর হইতে, অন্ধ্ররাজ

শূদ্রকের আহবানে। শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণদের উদ্ভব সম্বন্ধে কুলজী-গ্রন্থে কিন্তু অন্য কাহিনী দেখা যাইতেছে; এই মতে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণদের পূর্বপুরুষেরা গ্রহবিপ্র নামে পরিচিত ছিলেন, এবং ইঁহারা বাঙলাদেশে প্রথম আসিয়াছিলেন গৌড়রাজ শশাঙ্কের আমলে, শশাঙ্কেরই আহবানে, তাঁহার রোগমুক্তি উদ্দেশে গ্রহযজ্ঞ করিবার জন্য। বৃহদ্ধর্মপুরাণে দেখিতেছি, দেবল অর্থাৎ শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ পিতা এবং বৈশ্য মাতার সন্তানেরা গ্রহবিপ্র বা গণক নামে পরিচিত হইতেছেন। যাহাই হউক, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ-গ্রন্থে সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে, গণক বা গ্রহবিপ্রা (এবং সম্ভবত, দেবল-শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণেরাও) ব্রাহ্মণ-সমাজে সম্মানিত ছিলেন না; গণক-গ্রহবিপ্রা তো 'পতিত' বলিয়াই গণ্য হইতেন, এবং সেই পাতিত্যের কারণ বৈদিক ধর্মে তাঁহাদের অবজ্ঞা, জ্যোতিষ ও নক্ষত্রবিদ্যায় অতিরিক্ত আসক্তি এবং জ্যোতির্গণনা করিয়া দক্ষিণাগ্রহণ। এই গণক বা গ্রহবিপ্রদেরই একটি শাখা অগ্রদানী ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত ছিলেন; ইঁহারাও 'পতিত' বলিয়া গণ্য হইতেন, কারণ তাঁহারাই সর্বপ্রথম শূদ্রকের নিকট হইতে এবং শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে দান গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেই ভট্ট ব্রাহ্মণ নামে আর এক নিম্ন বা 'পতিত' শ্রেণীর ব্রাহ্মণের খবর পাওয়া যাইতেছে; সূত পিতা এবং বৈশ্য মাতার সন্তানেরাই ভট্ট ব্রাহ্মণ, এবং অন্যলোকের যশোগান করাই ইঁহাদের উপজীবিকা, এ-সংবাদও এই গ্রন্থে পাওয়া যাইতেছে। ইঁহারা নিঃসন্দেহে বর্তমান কালের ভাট ব্রাহ্মণ। এখানেও 'পতিত' ব্রাহ্মণদের তালিকা শেষ হইতেছে না। বৃহদ্ধর্মপুরাণে দেখিতেছি শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা উত্তম সংকর পর্যায়ের ২০টি উপবর্ণ ছাড়া (ইঁহারা সকলেই শূদ্র) আর কাহাদেরও পূজানুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিতে পারিতেন না; মধ্যম ও অধম সংকর বা অন্ত্যজ পর্যায়ের কাহারও পৌরোহিত্য করিলে তিনি 'পতিত' হইয়া যজমানের বর্ণ বা উপবর্ণ প্রাপ্ত হইতেন। মধ্যযুগের ও বর্তমান কালের 'বর্ণ-ব্রাহ্মণ'দের উৎপত্তি এইভাবেই হইয়াছে। স্মার্ত ভবদেব ভট্ট বলিতেছেন, এই সব ব্রাহ্মণদের স্পৃষ্ট খাদ্য যথার্থ বা সংব্রাহ্মণদের খাওয়া নিষেধ, খাইলে যে-অপরাধ হয় তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ কৃচ্ছ্রসাধনের বিধানও তিনি দিয়াছেন। এই বিধি-নিষেধ ক্রমশ কঠোরতর হইয়া মধ্যযুগেই দেখা গেল, পতিত বর্ণব্রাহ্মণ ও শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণদের মধ্যে বৈবাহিক আদান-প্রদান দূরে থাক তাঁহাদের স্পৃষ্ট জলও সংব্রাহ্মণেরা পান করিতেন না। তাহা ছাড়া, কতকগুলি বৃত্তিও ছিল ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ; ভবদেব ভট্ট তাহার এক সুদীর্ঘ তালিকা দিয়াছেন। ব্রাহ্মণদের তো প্রধান বৃত্তিই ছিল ধর্মকর্মানুষ্ঠান এবং অন্যের ধর্মানুষ্ঠানে পৌরোহিত্য, শাস্ত্রাধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা; অধিকাংশ ব্রাহ্মণই তাহা করিতেন, সন্দেহ নাই। তাঁহাদের মধ্যে অল্প-সংখ্যক রাজা ও রাষ্ট্র, ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায়ের কৃপালাভ করিয়া দান ও দক্ষিণা-স্বরূপ প্রচুর অর্থ ও ভূমির অধিকারী হইতেন, এমন প্রমাণেরও অভাব নাই। আবার অনেক ব্রাহ্মণ ছোট-বড় রাজকর্মও করিতেন; ব্রাহ্মণ রাজবংশের খবরও পাওয়া যায়।

পাল-আমলে দর্ভপাণি-কেদারমিশ্রের বংশ, বৈদ্যদেবের বংশ, বর্মণরাষ্ট্রে ভবদেব ভট্টের বংশ, সেনরাষ্ট্রে হলায়ুধের বংশ একদিকে যেমন উচ্চতম রাজপদ অধিকার করিতেন, তেমনই আর একদিকে শাস্ত্রজ্ঞানে, বৈদিক যাগযজ্ঞ আচারানুষ্ঠানে, পাণ্ডিত্যে ও বিদ্যাবত্তায় সমাজেও তাঁহাদের স্থান ছিল খুব সম্মানিত। ব্রাহ্মণেরা যুদ্ধে নায়কত্ব করিতেন, যোদ্ধৃ-ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতেন, এমন প্রমাণও পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু ভবদেবের পূর্বোক্ত তালিকায় দেখিতেছি, অনেক নিষিদ্ধবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণদের পক্ষে শূদ্রবর্ণের অধ্যাপনা, তাঁহাদের পূজানুষ্ঠানে পৌরোহিত্য, চিকিৎসা ও জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা, চিত্র ও অন্যান্য বিভিন্ন শিল্পবিদ্যার চর্চা প্রভৃতি বৃত্তিও নিষিদ্ধ ছিল; করিলে 'পতিত' হইতে হইত। কিন্তু কৃষিবৃত্তি নিষিদ্ধ ছিল না; যুদ্ধবৃত্তিতে আপত্তি ছিল না; মন্ত্রী, সান্ধি-বিগ্রহিক, ধর্মাধ্যক্ষ বা সেনাধ্যক্ষ হইলে কেহ পতিত হইত না! অথচ বর্ণবিশেষের অধ্যাপনা বা পৌরোহিত্য নিষিদ্ধ ছিল।

ব্রাহ্মণেতর বর্ণবিভাগ

বৃহদ্ধর্মপুরাণে দেখা যাইতেছে, ব্রাহ্মণ ছাড়া বাঙলাদেশে আর যত বর্ণ আছে, সমস্তই সংকর, চতুর্বর্ণের যথেচ্ছ পারস্পরিক যৌনমিলনে উৎপন্ন মিশ্রবর্ণ, এবং তাঁহারা সকলেই শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণদ্বয়ের উল্লেখই এই গ্রন্থে নাই। ব্রাহ্মণেরা এই সমস্ত শূদ্র সংকর উপবর্ণগুলিকে তিনশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকটি উপবর্ণের স্থান ও বৃত্তি নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। এই বর্ণ ও বৃত্তিসমূহের বিবরণ দিতে গিয়া বৃহদ্ধর্মপুরাণ বেণ রাজা সম্বন্ধে যে-গল্পের অবতারণা করিয়াছেন, কিংবা উত্তম, মধ্যম ও অধম সংকর এই তিন পর্যায়-বিভাগের যে-ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহার উল্লেখ বা আলোচনা অবান্তর। কারণ, স্মৃতিগ্রন্থের বর্ণ-উপবর্ণ ব্যাখ্যার সঙ্গে বাস্তব ইতিহাসের যোগ আবিষ্কার করা বড় কঠিন। যাহা হউক, এই গ্রন্থ তিন পর্যায়ে ৩৬টি উপবর্ণ বা জাতের কথা বলিতেছে, যদিও তালিকাভুক্ত করিতেছে ৪১টি জাত। বাঙলাদেশের জাত-সংখ্যা বলিতে আজও আমরা বলি ছত্রিশ জাত। ৩৬টিই বোধ হয়, ছিল আদি সংখ্যা, পরে আরও ৫টি উপবর্ণ এই তালিকায় ঢুকিয়া পড়িয়া থাকিবে।

উত্তম-সংকর

উত্তম-সংকর পর্যায়ে ২০টি উপবর্ণ:

১। করণ—ইঁহারা লেখক ও পুস্তকর্মদক্ষ, এবং সৎশূদ্র বলিয়া পরিগণিত।

২। অম্বষ্ঠ—ইঁহাদের বৃত্তি চিকিৎসা ও আয়ুর্বেদচর্চা, সেই জন্য ইঁহারা বৈদ্য বলিয়া পরিচিত। ঔষধ প্রস্তুত করিতে হয় বলিয়া ইঁহাদের বৃত্তি বৈশ্যের, কিন্তু ধর্মকর্মানুষ্ঠানের ব্যাপারে ইঁহারা শূদ্র বলিয়াই গণিত।

৩। উগ্র—ই'হাদের বৃত্তি ক্ষত্রিয়ের, যুদ্ধবিদ্যাই ধর্ম।

৪। মাগধ—হিংসামূলক যুদ্ধব্যবসায়ে অনিচ্ছুক হওয়ায় ইহাদের বৃত্তি নির্দিষ্ট হইয়াছিল সূত বা চারণের এবং সংবাদবাহীর।

৫। তন্ত্রবায় (তাঁতী)।

৬। গান্ধিক বণিক (গন্ধদ্রব্য বিক্রয় যে-বণিকের বৃত্তি ; বর্তমানের গন্ধবণিক)।

৭। নাপিত।

৮। গোপ—(লেখক)।

৯। কর্মকার (কামার)।

১০। তৈলিক বা তৌলিক—(গুবাক-ব্যবসায়ী ?)।

১১। কুম্ভকার (কুমোর)।

১২। কংসকার (কাঁসারী)।

১৩। শাংখিক বা শংখকার (শাঁখারী)।

১৪। দাস—কৃষিকার্য ই'হাদের বৃত্তি, অর্থাৎ চাষী।

১৫। বারুজীবী (বারুই)—(পানের বরজ ও পান উৎপাদন করা ই'হাদের বৃত্তি)।

১৬। মোদক (ময়রা)।

১৭। মালাকার।

১৮। সূত—(বৃত্তি উল্লিখিত হয় নাই, কিন্তু অনুমান হয় ই'হারা চারণ-গায়ক)।

১৯। রাজপুত্র—(বৃত্তি অনুল্লিখিত ; রাজপুত ?)

২০। তাম্বুলী (তামলী)—পানবিক্রেতা।

মধ্যম-সংকর

মধ্যম-সংকর পর্যায়ে ১২টি উপবর্ণ :

২১। তক্ষণ—খোদাইকর।

২২। রজক (বর্তমানের ধোপা)।

২৩। স্বর্ণকার—(সোনার অলঙ্কার ইত্যাদি প্রস্তুতকারক)।

২৪। সুবর্ণবণিক—সোনা-ব্যবসায়ী।

২৫। আভীর (আহীর)—(গোয়ালা, গোরক্ষক)।

২৬। তৈলকার—(তেলী)।

২৭। ধীবর—(মৎস্যব্যবসায়ী)।

২৮। শৌণ্ডিক—(শুঁড়ি)।

২৯। নট—যাহারা নাচ, খেলা ও বাজি দেখায়।

৩০। শাবাক, শাবক, শারক, শাবার (?)—(ইঁহারা কি বৌদ্ধ শ্রাবকদের বংশধর ?)।

৩১। শেখর (?)।
৩২। জালিক (জেলে, জালিয়া)।

অধম-সংকর বা অন্ত্যজ

অধম সংকর বা অন্ত্যজ পর্যায়ে ৯টি উপবর্ণ ; ইঁহারা সকলেই বর্ণাশ্রম-বহির্ভূত। অর্থাৎ, ইঁহারা অস্পৃশ্য, এবং ব্রাহ্মণ্য বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থার মধ্যে ইঁহাদের কাহারও কোনও স্থান নাই।

৩৩। মলেগ্রহী (বঙ্গবাসী সং : মলেগ্রাহি)।

৩৪। কুড়ব (?)।

৩৫। চণ্ডাল (চাঁড়াল)।

৩৬। বরুড় (বাউড়ী ?)।

৩৭। তক্ষ (তক্ষণকার ?)।

৩৮। চর্মকার (চামার)।

৩৯। ঘট্টজীবী (পাঠান্তরে ঘণ্টজীবী—খেয়াঘাটের রক্ষক, খেয়াপারাপার মাঝি ; বর্তমান, পাটনী ?)।

৪০। ডোলাবাহি—ডুলি-বেহারা, বর্তমান দুলিয়া, দুলে' (?)।

৪১। মল্ল (বর্তমান মালো ?)।

ম্লেচ্ছ

এই ৪১টি জাত ছাড়া ম্লেচ্ছ পর্যায়ে আরও কয়েকটি দেশি ও ভিন্‌প্রদেশি আদিবাসি কোমের নাম পাওয়া যায় ; স্থানীয় বর্ণ-ব্যবস্থার মধ্যে ইঁহাদেরও কোনও স্থান ছিল না, যথা, পুক্কশ, পুলিন্দ, খস, থর, কম্বোজ, যবন, সুহ্ম, শবর ইত্যাদি।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেও অনুরূপ বর্ণ-বিন্যাসের খবর পাওয়া যাইতেছে। 'সৎ' ও 'অসৎ' (উচ্চ ও নিম্ন) এই দুই পর্যায়ে শূদ্রবর্ণের বিভাগের আভাস বৃহদ্ধর্মপুরাণেই পাওয়া গিয়াছে ; করণদের বলা হইয়াছে 'সৎশূদ্র'। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে সমস্ত সংকর বা মিশ্র উপবর্ণগুলিকে সৎ ও অসৎ শূদ্র এই দুই পর্যায়ে ভাগ করা হইয়াছে। সৎশূদ্র পর্যায়ে যাঁহাদের গণ্য করা হইয়াছে তাঁহাদের নিম্নলিখিতভাবে তালিকাগত করা যাইতে পারে। এই ক্ষেত্রেও সর্বত্র পৃথক সূচীনির্দেশ দেওয়া হইতেছে না। এই অধ্যায়ে আহৃত অধিকাংশ সংবাদ এই গ্রন্থের প্রথম অর্থাৎ ব্রহ্মখণ্ডের দশম পরিচ্ছেদে পাওয়া যাইবে ; ১৬-২১ এবং ৯০-১৩৭ শ্লোক বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। ২।৪টি তথ্য অন্যত্র বিক্ষিপ্তও যে নাই তাহা নয়। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের মিশ্রবর্ণেরও সম্পূর্ণ তালিকা এক্ষেত্রে উদ্ধার করা হয় নাই, করিয়া লাভও নাই ; কারণ, এই পুরাণই বলিতেছে, মিশ্রবর্ণ অসংখ্য, কে তাহার সমস্ত

নাম উল্লেখ ও গণনা করিতে পারে (১।১০।১২২) ? সংশূদ্রদের তালিকাও যে সম্পূর্ণ নয়, তাহার আভাসও এই গ্রন্থেই আছে (১।১০।১৮)।

লক্ষণীয় যে, এই পুরাণ বৈদ্য ও অম্বষ্ঠদের পৃথক উপবর্ণ বলিয়া উল্লেখ করিতেছে, এবং উভয় উপবর্ণের যে উৎপত্তি-কাহিনী দিতেছে, তাহাও পৃথক।

সংশূদ্র

১। করণ।
২। অম্বষ্ঠ (দ্বিজ পিতা এবং বৈশ্যমাতার সন্তান)।
৩। বৈদ্য (জনৈক ব্রাহ্মণীর গর্ভে অশ্বিনীকুমারের ঔরসে জাত সন্তান ; বৃত্তি চিকিৎসা)।
৪। গোপ।
৫। নাপিত।
৬। ভিল্ল—(ইঁহারা আদিবাসি কোম ; কি করিয়া সংশূদ্র পর্যায়ে পরিগণিত হইলেন, বলা কঠিন)।
৭। মোদক।
৮। কুবর—?
৯। তাম্বুলী (তাম্‌লী)।
১০। স্বর্ণকার ও অন্যান্য বণিক } ইঁহারা পরে ব্রাহ্মণের অভিশাপে 'পতিত,' হইয়া 'অসংশূদ্র' পর্যায়ে নামিয়া গিয়াছিলেন ; স্বর্ণকারদের অপরাধ ছিল সোনাচুরি।
১১। মালাকার।
১২। কর্মকার।
১৩। শংখকার।
১৪। কুবিন্দক (তন্তুবায়)।
১৫। কুম্ভকার।
১৬। কংসকার।
১৭। সূত্রধার।
১৮। চিত্রকার (পটুয়া)।
১৯। স্বর্ণকার।

সূত্রধার ও চিত্রকার কর্তব্যপালনে অবহেলা করায় ব্রাহ্মণের অভিশাপে 'পতিত' হইয়া অসংশূদ্র পর্যায়ে গণ্য হইয়াছিলেন। স্বর্ণকারও 'পতিত' হইয়াছিলেন, এ কথা আগেই বলা হইয়াছে।

অসংশূদ্র

পতিত্..বা অসংশূদ্র পর্যায়ে যাঁহাদের গণনা করা হইত তাঁহাদের তালিকাগত করিলে এইরূপ দাঁড়ায় :

স্বর্ণকার। [সুবর্ণ] বণিক। সূত্রধার (বৃহদ্ধর্মপুরাণের তক্ষণ)। চিত্রকার। ২০। অট্টালিকাকার। ২১। কোটক (ঘরবাড়ি তৈয়ার করা যাঁহাদের বৃত্তি)। ২২। তীবর। ২৩। তৈলকার। ২৪। লেট। ২৫। মল্ল। ২৬। চর্মকার। ২৭। শুঁড়ি। ২৮। পৌণ্ডক (পোদ ?)। ২৯। মাংসচ্ছেদ (কসাই)। ৩০। রাজপুত্র (পরবর্তী কালের 'রাউত' ?) ৩১। কৈবর্ত (কলিযুগের ধীবর)। ৩২। রজক। ৩৩। কোয়ালী। ৩৪। গঙ্গাপুত্র (লেট-তীবরের বর্ণ-সংকর সন্তান)। ৩৫। যুঙ্গি (যুগী ?) ৩৬। আগরী (বৃহদ্ধর্মপুরাণের উগ্র ? বর্তমানের আগুরী)।

অসংশূদ্রেরও নিম্ন পর্যায়ে, অর্থাৎ অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য পর্যায়ে যাঁহাদের গণনা করা যায় তাঁহাদের তালিকাগত করিলে এইরূপ দাঁড়ায় :

ব্যাধ, ভড় (?), কাপালী, কোল (আদিবাসি কোম), কোঞ্চ (কোচ, আদিবাসি কোম), হড্ডি (হাড়ি), ডোম, জোলা, বাগতীত (বাগ্‌দী ?) শরাক (প্রাচীন শ্রাবকদের অবশেষ ?) ব্যালগ্রাহী (বৃহদ্ধর্মপুরাণের মলেগ্রাহী ?) চণ্ডাল ইত্যাদি।

এই দুইটি বর্ণবিভাগের তালিকা তুলনা করিলে দেখা যায় প্রথমোল্লিখিত গ্রন্থের সংকর পর্যায় এবং দ্বিতীয় গ্রন্থের সংশূদ্র পর্যায় এক এবং অভিন্ন ; শুধু মগধ, গন্ধবণিক, তৌলিক বা তৈলিক, দাস, বারজীবী, এবং সূত দ্বিতীয় গ্রন্থের তালিকা হইতে বাদ পড়িয়াছে ; পরিবর্তে পাইতেছি ভিল্ল ও কুবর এই দুইটি উপবর্ণের উল্লেখ, এবং বৈদ্যদের উল্লেখ। তাহা ছাড়া, প্রথম গ্রন্থের উত্তম সংকর বর্ণের রাজপুত্র দ্বিতীয় গ্রন্থের অসংশূদ্র পর্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে। প্রথম গ্রন্থের মধ্যম সংকর পর্যায় এবং দ্বিতীয় গ্রন্থের অসংশূদ্র পর্যায় এক এবং অভিন্ন ; শুধু বৃহদ্ধর্মপুরাণের আভীর, নট, শাবাক (শ্রাবক ?), শেখর ও জালিক দ্বিতীয় গ্রন্থের তালিকা হইতে বাদ পড়িয়াছে ; পরিবর্তে পাইতেছি অট্টালিকাকার, কোটক, লেট, মল্ল, চর্মকার, পৌণ্ডক, মাংসচ্ছেদ, কৈবর্ত গঙ্গাপুত্র, যুঙ্গি, আগরী এবং কোয়ালী। ইঁহাদের মধ্যে মল্ল ও চর্মকার বৃহদ্ধর্মপুরাণের অধম সংকর বা অন্ত্যজ পর্যায়ের। বৃহদ্ধর্মপুরাণে ধীবর ও জালিক, মৎস্য-ব্যবসাগত এই দুইটি উপবর্ণের খবর পাইতেছি ; ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে পাইতেছি শুধু কৈবর্তদের। কৈবর্তদের উদ্ভব সম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে একটি ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে : কৈবর্ত ক্ষত্রিয় পিতা ও বৈশ্য মাতার সন্তান, কিন্তু কলিযুগে তীবরদের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে ইঁহারা ধীবর নামে পরিচিত হন এবং ধীবর বৃত্তি গ্রহণ করেন। ভবদেব ভট্টের মতে কৈবর্তরা অন্ত্যজ পর্যায়ের। ভবদেবের অন্ত্যজ পর্যায়ের তালিকা উপরোক্ত দুই পুরাণের তালিকার

সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে ঃ রজক, চর্মকার, নট, বরুড়, কৈবর্ত, মেদ এবং ভিল্ল ভবদেবের মতে চণ্ডাল ও অন্ত্যজ সমার্থক। চণ্ডাল, পুক্কস, কাপালিক, নট, নর্তক, তক্ষণ (বৃহদ্ধর্মপুরাণোক্ত মধ্যম সংকর পর্যায়ের তক্ষ ?), চর্মকার, সুবর্ণকার, শৌণ্ডিক, রজক এবং কৈবর্ত প্রভৃতি নিম্নতম উপবর্ণের এবং পতিত ব্রাহ্মণদের স্পৃষ্ট খাদ্য ব্রাহ্মণদের অভক্ষ্য বলিয়া ভবদেব ভট্ট বিধান দিয়াছেন, এবং খাইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, তাহাও বলিয়াছেন।

দেখা যাইতেছে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে উল্লিখিত তিনটি সাক্ষ্যে অল্পবিস্তর বিভিন্নতা থাকিলেও বর্ণ-উপবর্ণের স্তর-উপস্তর বিভাগ সম্বন্ধে ইঁহাদের তিনজনেরই সাক্ষ্য মোটামুটি একই প্রকার। এই চিত্রই সেন-বর্মণদের আমলের বাঙলাদেশের বর্ণ-বিন্যাসের মোটামুটি চিত্র।

করণ কায়স্থ

প্রথমেই দেখিতেছি করণ ও অম্বষ্ঠদের স্থান। করণরা কিন্তু কায়স্থ বলিয়া অভিহিত হইতেছেন না ; এবং ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে বৈদ্যদের স্পষ্টতই অম্বষ্ঠ হইতে পৃথক বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। করণদের সম্বন্ধে পাল-পর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে এবং করণ ও কায়স্থরা যে বর্ণহিসাবে এক এবং অভিন্ন তাহাও ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এই অভিন্নতা পাল পর্বেই স্বীকৃত হইয়া গিয়াছিল ; বৃহদ্ধর্মপুরাণে বা ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে কেন যে সে ইঙ্গিত নাই তাহা বলা কঠিন। হইতে পারে, ব্রাহ্মণ্য সংস্কারে তখনও তাহা সম্পূর্ণ স্বীকৃত হইয়া উঠে নাই।

অম্বষ্ঠ বৈদ্য

বৃহদ্ধর্মপুরাণে বর্ণহিসাবে বৈদ্যদেরও উল্লেখ নাই, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে আছে ; কিন্তু সেখানেও বৈদ্য ও অম্বষ্ঠ দুই পৃথক উপবর্ণ, এবং উভয়ের উদ্ভব-ব্যাখ্যাও বিভিন্ন। এই গ্রন্থের মতে দ্বিজ পিতা ও বৈশ্য মাতার সঙ্গমে অম্বষ্ঠদের উদ্ভব ; কিন্তু বৈদ্যদের উদ্ভব সূর্যতনয় অশ্বিনীকুমার এবং জনৈকা ব্রাহ্মণীর আকস্মিক সঙ্গমে। বৈদ্য ও অম্বষ্ঠরা যে এক এবং অভিন্ন এই দাবি সপ্তদশ শতকে ভরতমল্লিকের আগে কেহ করিতেছেন না ; ইনিই সর্বপ্রথম নিজে বৈদ্য এবং অম্বষ্ঠ বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিতেছেন। তবে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের উল্লেখ হইতে বুঝা যায়, দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে বৈদ্যরা উপবর্ণ হিসাবে বিদ্যমান, এবং বৃহদ্ধর্মপুরাণ ও সদ্যোক্ত পুরাণটির সাক্ষ্য একত্র করিলে ইহাও বুঝা যায় যে অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য উভয়েই সাধারণত একই বৃত্তিঅনুসারী ছিলেন। বোধ হয়, এক এবং অভিন্ন এই চিকিৎসাবৃত্তিই পরবর্তীকালে এই দুই উপবর্ণকে এক এবং অভিন্ন উপবর্ণে বিবর্তিত করিয়াছিল, যেমন করিয়াছিল করণ এবং কায়স্থদের।

কৈবর্ত মাহিষ্য

পাল-পর্বে কৈবর্ত-মাহিষ্য প্রসঙ্গে বলিয়াছি, তখন পর্যন্ত কৈবর্তদের সঙ্গে মাহিষ্যদের যোগাযোগের কোনও সাক্ষ্য উপস্থিত নাই এবং মাহিষ্য বলিয়া কৈবর্তদের পরিচয়ের কোনও দাবিও নাই, স্বীকৃতিও নাই। সেন-বর্মণ-দেব পর্বেও তেমন দাবি কেহ উপস্থিত করিতেছেন না; এই যুগের কোনও পুরাণ বা স্মৃতিগ্রন্থেও তেমন উল্লেখ নাই। বস্তুত, মাহিষ্য নামে কোনও উপবর্ণের নামই নাই। কৈবর্তদের উদ্ভবের ব্যাখ্যা দিতে গিয়া ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের সংকলয়িতা বলিতেছেন, ক্ষত্রিয় পিতা ও বৈশ্য-মাতার সঙ্গমে কৈবর্তদের উদ্ভব। লক্ষণীয় এই যে, গৌতম ও যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহাদের প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থে মাহিষ্যদের উদ্ভব সম্বন্ধে এই ব্যাখ্যাই দিতেছেন, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের লেখক কৈবর্ত সম্বন্ধে এই ব্যাখ্যা কোথায় পাইলেন, বলা কঠিন; কোনও প্রাচীনতর গ্রন্থে কৈবর্ত সম্বন্ধে এই ব্যাখ্যা নাই, সমসাময়িক বৃহদ্ধর্মপুরাণ বা কোনো স্মৃতিগ্রন্থেও নাই। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেও ব্যাখ্যা যদি বা পাইতেছি মাহিষ্য ব্যাখ্যা অনুযায়ী, কিন্তু কলিযুগে ইঁহাদের বৃত্তি নির্দেশ দেখিতেছি ধীবরের, মাহিষ্যের নয়। সুতরাং মনে হয়, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের ব্যাখ্যার মধ্যেই কোনও গোলমাল রহিয়া গিয়াছে। দ্বাদশ শতকে ভবদেব ভট্ট কৈবর্তদের স্থান নির্দেশ করিতেছেন অন্ত্যজ পর্যায়ে। বৃহদ্ধর্মপুরাণ ধীবর ও মৎস্যব্যবসায়ী অন্য একটি জাতের অর্থাৎ জালিকদের স্থান নির্দেশ করিতেছেন মধ্যম সংকর পর্যায়ে, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ধীবর ও কৈবর্তদের স্থান নির্দেশ করিতেছেন অসৎশূদ্র পর্যায়ে; এবং ইঁহাদের প্রত্যেকেরই ইঙ্গিত এই যে, ইঁহারা মৎস্যজীবী, কৃষিজীবী নন। তবে, স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ-সংকলয়িতা ইঁহাদের যে উদ্ভব-ব্যাখ্যা দিতেছেন, এই জাতীয় ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করিয়াই পরবর্তীকালে কৈবর্ত ও মাহিষ্যদের এক এবং অভিন্ন বলিয়া দাবি সমাজে প্রচলিত ও স্বীকৃত হয়। যাহাই হউক বর্তমানকালে পূর্ববঙ্গের হালিক দাস এবং পরাশর দাস এবং হুগলী-বাঁকুড়া-মেদিনীপুরের চাষী কৈবর্তরা নিজেদের মাহিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। আবার পূর্ববঙ্গে (ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ, ঢাকা অঞ্চলে) মৎস্যজীবী ধীবর ও জালিকরা কৈবর্ত বলিয়া পরিচিত। বুঝা যাইতেছে, কালক্রমে কৈবর্তদের মধ্যে দুইটি বিভাগ রচিত হয়, একটি প্রাচীন কালের ন্যায় মৎস্যজীবীই থাকিয়া যায় (যেমন পূর্ববঙ্গে আজও), আর একটি কৃষি (হালিক) বৃত্তি গ্রহণ করিয়া মাহিষ্যদের সঙ্গে এক এবং অভিন্ন বলিয়া পরিগণিত হয়। বল্লালচরিতে যে বলা হইয়াছে, রাজা বল্লালসেন কৈবর্ত (এবং মালাকার, কুম্ভকার ও কর্মকার) দিগকে সমাজে উন্নীত করিয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে কৈবর্তদের এক শ্রেণীর বৃত্তি পরিবর্তনের (চাষী-হালিক হওয়ার) এবং মাহিষ্যদের সঙ্গে অভিন্নতা দাবির যোগ থাকা অসম্ভব নয়।

বর্ণ ও শ্রেণী

উপরোক্ত উভয় পুরাণের মতেই করণ-কায়স্থ এবং বৈদ্য-অম্বষ্ঠদের পরেই গোপ, নাপিত, মালাকার, কুম্ভকার, কর্মকার, শংখকার, কংসকার, তন্তুবায়-কুবিন্দক, মোদক এবং তাম্বুলীদের স্থান। গন্ধবণিক, তৈলিক, তৌলিক (সুপারি-ব্যবসায়ী), দাস (চাষী), এবং বারজীবী (বারুই), সামাজিক দিক হইতে ইঁহাদেরও সদ্যোক্ত জাতগুলির সমপর্যায়ে বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। ইঁহাদের মধ্যে কৃষিজীবী দাস ও বারজীবী, এবং শিল্পজীবী কুম্ভকার, কর্মকার, শংখকার, কংসকার ও তন্তুবায় ছাড়া আর কাহাকেও ধনোৎপাদক শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করা করা যায় না। গোপ, নাপিত, মালাকার, ই'হারা সমাজ-সেবকমাত্র। মোদক, তাম্বুলী (তামলী), তৈলিক, তৌলিক এবং গন্ধবণিকেরা ব্যবসায়ী শ্রেণী, এবং সেই হেতু অর্থোৎপাদক শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে; তবে ই'হাদের মধ্যে মোদক বা ময়রার ব্যবসায় বিস্তৃত বা যথাযথভাবে ধনোৎপাদক ছিল, এমন বলা যায় না। গুবাক, পান এবং গন্ধদ্রব্যের ব্যবসায় যে সুবিস্তৃত ছিল তাহা অন্যত্র নানা প্রসঙ্গে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। করণ ও অম্বষ্ঠদের বৃত্তিও ধনোৎপাদক বৃত্তি নয়। করণরা সোজাসুজি কেরাণী, পুস্তপাল, হিসাবরক্ষক, দপ্তর-কর্মচারী; অম্বষ্ঠ-বৈদ্যরা চিকিৎসক। উভয়ই মধ্যবিত্ত শ্রেণী। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের সাক্ষ্য হইতে স্পষ্টই মনে হয়, স্বর্ণকার ও অন্যান্য বণিকেরা আগে উত্তম সংকর বা সৎশূদ্র পর্যায়েই গণ্য হইতেন, কিন্তু বৃহদ্ধর্ম ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ রচনাকালে তাঁহারা কিছুটা নীচে নামিয়া গিয়াছেন।

আশ্চর্য এই যে, সমাজের ধনোৎপাদক শিল্পী, ব্যবসায়ী ও শ্রমিক সম্প্রদায়ের লোকেরা সৎশূদ্র বা উত্তম সংকর বলিয়া গণিত হন নাই। ই'হাদের মধ্যে স্বর্ণকার, সুবর্ণবণিক, তৈলকার, সূত্রধার, শৌণ্ডিক বা শুঁড়ি তক্ষণ, ধীবর-জালিক কৈবর্ত, অট্টালিকাকার, কোটক প্রভৃতি জাতের নাম করিতেই হয়; ই'হারা সকলেই মধ্যম সংকর বা অসৎশূদ্র পর্যায়ের। বুঙ্গি-যুগীরা এবং চর্মকারেরাও অর্থোৎপাদক শিল্পী শ্রেণীর অন্যতম; ই'হারাও অসৎশূদ্র বা মধ্যম সংকর। নট সেবক মাত্র; ভবদেব ভট্টের মতে নট নর্তক। চর্মকার, শুঁড়ি, রজক, ই'হারা সকলেই নিম্নজাতের লোক। ইঁহারা প্রয়োজনীয় সামাজিক স্তর সন্দেহ নাই, কিন্তু শৌণ্ডিক ও চর্মকার ছাড়া অন্য দুইটিকে ঠিক অর্থোৎপাদক স্তরের লোক বলা চলে কিনা সন্দেহ। বৃহদ্ধর্মপুরাণের মতে চর্মকারেরা একেবারে অন্ত্যজ পর্যায়ে পরিগণিত, তাঁহাদের বৃত্তির জন্য সন্দেহ নাই। অসৎশূদ্র পর্যায়ভুক্ত মল্ল (=মালো, মাঝি?) এবং রজক প্রয়োজনীয় সমাজ-শ্রমিক। বৃহদ্ধর্মপুরাণের মতে মল্ল অন্ত্যজ পর্যায়ভুক্ত।

সমাজ-শ্রমিকেরা কিন্তু প্রায় অধিকাংশই অন্ত্যজ বা ম্লেচ্ছ পর্যায়ে; বর্ণাশ্রমের বাহিরে তাঁহাদের স্থান। চণ্ডাল, বরুড় (বাউড়ী), ঘট্টজীবী (পাটনী?), ডোলাবাহী (দুলিয়া,

দুলে') মল্ল (মালো ?), হড্‌ডি (হাড়ি), ডোম, জোলা, বাগতীত (বাগদী ?)—ই'হারা সকলেই তো সমাজের একান্ত প্রয়োজনীয় শ্রমিক-সেবক ; অথচ ই'হাদের স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল সমাজের একেবারে নিম্নতম স্তরে। অন্ত্যজ পর্যায়ের আর একটি বর্ণের খবর দিতেছেন বন্দ্যঘটীয় আর্তিহর পুত্র সর্বানন্দ (১১৬০)। ই'হারা বেদে বা বাদিয়া; বাদিয়ারা সাপখেলা দেখাইয়া বেড়াইত (ভিক্ষার্থং সর্পধারিণি বাদিয়া ইতি খ্যাত)। চর্যাগীতি লি হইতে ডোম, চণ্ডাল, শবর প্রভৃতি নিম্ন অন্ত্যজ বর্ণ ও কোমের নরনারীর বৃত্তির একটা মোটামুটি ধারণা করা যায় ; বাঁশের তাঁত ও চাঙারি বোনা, কাঠ কাটা, নৌকার মাঝিগিরি করা, নৌকা ও সাঁকো তৈরি করা, মদ তৈরি করা জুয়া খেলা, তুলা ধুনা, হাতী পোষা, পশু শিকার নৃত্যগীত যাদুবিদ্যা ভোজবাজী, সাপ নাচানো ইত্যাদি ছিল ইঁহাদের বৃত্তি। এই সব বস্তু আশ্রয় করিয়াই বৌদ্ধ সহজ-সাধকদের গভীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধি প্রকাশ পাইয়াছে।

শ্রীহট্ট জেলার ভাটেরা গ্রামে প্রাপ্ত একটি লিপিতে সৎ ও অসৎশূদ্র উভয় পর্যায়েরই কয়েকজন ব্যক্তির সাক্ষাৎ মিলিতেছে। কয়েকটি অজ্ঞাতনামা গোপ, জনৈক কাংসকার গোবিন্দ, নাপিত গোবিন্দ, এবং দন্তকার রাজবিগা—ইঁহারা সৎশূদ্র পর্যায়ের সন্দেহ নাই, কিন্তু রজক সিরুপা অসৎশূদ্র পর্যায়ের ; নাবিক দ্যোজে কোন্ পর্যায়ের বলা যাইতেছে না।

মনে রাখা দরকার, বর্ণ ও শ্রেণীর পরস্পর সম্বন্ধের যেটুকু পরিচয় পাওয়া গেল তাহা একান্তই আদিপর্বের শেষ অধ্যায়ের। পূর্ববর্তী বিভিন্ন পর্যায়ে এ পরিচয় খুব সুস্পষ্ট নয়। তবে প্রাচীনতর স্মৃতি ও অর্থশাস্ত্রগুলিতে বর্ণের সঙ্গে শ্রেণীর সম্বন্ধের একটা চিত্র মোটামুটি ধরিতে পারা যায়, এবং অনুমান করা সহজ যে, অন্তত গুপ্ত আমল হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙলা দেশেও অনুরূপ সম্বন্ধ প্রবর্তিত হইয়াছিল। সেখানে দেখিতেছি, অনেকগুলি অর্থোৎপাদক শ্রেণী—তাহাদের মধ্যে স্বর্ণকার, সুবর্ণবণিক, তৈলকার, গন্ধবণিক ইত্যাদিরাও আছেন—বর্ণ হিসাবে সমাজে উচ্চস্থান অধিকার করিয়া নাই, বরং কতকটা অবজ্ঞাতই। আর, সমাজ-শ্রমিক যাঁহারা তাঁহারা তো বরাবর নিম্নবর্ণস্তরে, কেহ কেহ একেবারে অন্ত্যজ অস্পৃশ্য পর্যায়ে। তবে, সমাজ যতদিন পর্যন্ত ব্যবসা-বাণিজ্যপ্রধান ছিল, যতদিন অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যই ছিল সামাজিক ধনোৎপাদনের প্রধান উপায় ততদিন পর্যন্ত বর্ণস্তর হিসাবে না হউক, অন্ততঃ রাষ্ট্রে এবং সেই হেতু সামাজিক মর্যাদায় বণিক-ব্যবসায়ীদের বেশ প্রতিষ্ঠাও ছিল। কিন্তু সপ্তম-অষ্টম শতক হইতে বাঙালী সমাজ প্রধানত কৃষি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহশিল্পনির্ভর হইয়া পড়িতে আরম্ভ করে, তখন হইতেই অর্থোৎপাদক ও শ্রমিক শ্রেণীগুলি ক্রমশ সামাজিক মর্যাদাও হারাইতে আরম্ভ করে। হাতের কাজই ছিল যাঁহাদের জীবিকার উপায় তাঁহারা স্পষ্টতই সমাজের নিম্নতর ও নিম্নতম বর্ণস্তরে ; অথচ বুদ্ধিজীবী ও মসীজীবী যাঁহারা তাঁহারাই উপরের বর্ণস্তর অধিকার করিয়া আছেন। এমন কি, কৃষিজীবী দাস-সম্প্রদায়ও অনেক ক্ষেত্রে বণিক-ব্যবসায়ী

এবং অতি প্রয়োজনীয় সমাজ-শ্রমিক সম্প্রদায়গুলির উপরের বর্ণস্তরে অধিষ্ঠিত। মধ্য ও উত্তর ভারতে বর্ণস্তরে দৃঢ় ও অনমনীয় সংবদ্ধতা এবং সমাজের অর্থোৎপাদক ও শ্রমিক শ্রেণীস্তরগুলি সম্বন্ধে একটা অবজ্ঞা খ্রীষ্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতক হইতেই দেখা দিতেছিল; সঙ্গে সঙ্গে বর্ণের সঙ্গে শ্রেণীর পারস্পরিক সম্বন্ধও ক্রমশ তীব্রতর হইতেছিল। বাঙলা দেশে, মনে হয়, মোটামুটি ভাবে পাল আমল পর্যন্ত, এই বিরোধ খুব তীব্র হইয়া দেখা দেয় নাই: পাল আমলের শেষের দিকে, বিশেষ ভাবে সেন-বর্মণ আমলে উত্তর ও মধ্যভারতের বর্ণ ও শ্রেণীগত সামাজিক আদর্শ, এই দুইয়ের সুস্পষ্ট বিরোধ রূপ ধরিয়া ফুটিয়া উঠিল।

১০

বর্ণ ও কোম

উল্লিখিত তালিকাগুলিতে এবং সমসাময়িক লিপি ও স্মৃতিগ্রন্থে কতকগুলি আদিবাসি আরণ্য ও পার্বত্য কোমের এবং বিদেশি বা ভিন্ন-প্রদেশি কোমের নাম পাওয়া যাইতেছে: যথা ভিল্ল, মেদ, আভীর, কোল, পৌণ্ড্রক (পোদ), পুলিন্দ, পুক্কশ, খস, খর, কম্বোজ, যবন, সুহ্ম, শবর, অন্ধ্র ইত্যাদি। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ভিল্লদের সৎশূদ্র পর্যায়ে কি করিয়া গণ্য করা হইয়াছিল বলা কঠিন; ভবদেব ইঁহাদের মেদদের সঙ্গে বিন্যস্ত করিয়াছেন অন্ত্যজ পর্যায়ে। পৌণ্ড্রকেরা অসৎশূদ্র পর্যায়ে পরিগণিত হইয়াছিলেন; বাকী সমস্ত কোমই হয় অন্ত্যজ, না হয় ম্লেচ্ছ পর্যায়ে। কোলেরা পুরাণোক্ত কোল্ল সন্দেহ নাই। পুরাণোক্ত কোল্ল-ভীল্লের দর্শন তাহা হইলে এখানেও পাওয়া যাইতেছে। পুলিন্দরাও প্রাচীন কোম এবং ইঁহাদের উল্লেখ বল্লালসেনের নৈহাটি লিপিতেও পাওয়া যাইতেছে। খসদের উল্লেখ পালদের লিপিতেই পাওয়া যাইতেছে গৌড়-মালব-কুলিক-হূণ-কর্ণাট-লাট প্রভৃতি বেতনভুক্ সৈন্যদের সঙ্গে। খর, পুক্কশ, ইঁহারাও পুরাণোক্ত আদিবাসি কোম। আভীররা বিদেশাগত প্রাচীন কোম এবং ভারতেতিহাসে সুবিদিত। বৃহদ্ধর্মপুরাণ মতে উঁহারা মধ্যমসংকর পর্যায়ভুক্ত। আর কোনও বিদেশি কোমের পক্ষে কিন্তু এতটা সৌভাগ্য ঘটে নাই। কম্বোজরা উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তের সুপরিচিত কোম হইতে পারে অথবা আসাম-ব্রহ্ম সীমান্তের বা ভোট অঞ্চলের পার্বত্য কোমও হইতে পারে; শেষোক্ত কোম হওয়াই অধিকতর সম্ভব। এক কম্বোজ রাজবংশ বাঙলাদেশে কিছুকাল রাজত্বও করিয়াছিলেন। আমার ধারণা, আমরা যাঁদের কোচ বলি, তাঁহারা এই কম্বোজদেরই বংশধর। যবনরা বর্তমান আলোচনার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে মুসলমান। অন্ধ্রদের কথা তো পাদপর্বে নিম্নতম স্তরের জাতগুলির আলোচনা প্রসঙ্গেই বলা হইয়াছে। সুহ্মরা

বাঙলার প্রাচীনতম আদিবাসি কোমগুলির অন্যতম। শবররাও তাহাই। ইঁহাদের কথাও পালপর্বে বলা হইয়াছে; বল্লালসেনের নৈহাটি লিপিতে পুলিন্দদের সঙ্গে ইঁহাদেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। শবর-নারীদের মতন পুলিন্দ নারীরাও গুঞ্জাবীচির মালা পরিতে খুব ভালবাসিতেন; নৈহাটি লিপিতে এ-কথার ইঙ্গিত আছে। যাহা হউক, উপরোক্ত বিশেষণ হইতে বুঝা যাইতেছে, হিন্দু বর্ণসমাজে ধীরে ধীরে যে স্বাঙ্গীকরণ ক্রিয়া চলিতেছিল তাহার ফলে কোন কোন আদি বাঙালী কোম এবং বিদেশি কোম বর্ণাশ্রমের অন্তর্ভুক্ত হইতেছিল, যেমন পৌণ্ড্রকে এবং আভীররা এবং ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের সাক্ষ্য সত্য হইলে, ভিল্লরাও; কোনও কোনও আদিবাসি কোম বর্ণাশ্রমের বাহিরে অন্ত্যজ পর্যায়ে স্থান পাইয়াছিল, যেমন, মেদ, ভিল্ল, কোল প্রভৃতি; আবার কেহ কেহ একেবারে ম্লেচ্ছ পর্যায়ে পুক্কশ, খস, খর, কম্বোজ, যবনদের সঙ্গে, যেমন সুহ্ম, শবর, পুলিন্দ প্রভৃতি। অনুমান করা কঠিন নয়, ব্যাধ, হড্ডি (হাড়ি), ডোম, জোলা, বাগতীত (বাগদী?), চণ্ডাল, মল্ল, ডোলাবাহী (দুলিয়া, দুলে), ঘট্টজীবী (পাটনী?), বরুড় (বাউরী) প্রভৃতিরাও আদিবাসি কোম। হিন্দু সমাজের সামাজিক স্বাঙ্গীকরণ ক্রিয়ার যুক্তপদ্ধতিতে ইঁহারাও ক্রমশ সমাজের নিম্নতম স্তরে স্থান পাইয়াছিল। পাল আমলের লিপিগুলিতে "মেদান্ধ্রচণ্ডালপর্যন্তান" পদাংশ হইতে মনে হয় এই স্বাঙ্গীকরণ পালযুগেই সুপরিণতি লাভ করিয়া গিয়াছিল। সেন-আমলে সামাজিক নিম্নতম স্তর তো রাষ্ট্রের দৃষ্টির অন্তর্ভুক্তই ছিল না, অন্তত রাজকীয় দলিলপত্রে ইঁহাদের কোনও উল্লেখ নাই।

১১

ব্রাহ্মণদের সঙ্গে অন্যান্য বর্ণের সম্বন্ধ

ব্রাহ্মণদের সঙ্গে অন্যান্য বর্ণ-উপবর্ণের সম্বন্ধ ও যোগাযোগ সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্যের সংবাদ লওয়া যাইতে পারে। প্রথমেই আহার-বিহার লইয়া বিধি-নিষেধের কথা বলা যাক। ভবদেব ভট্টের প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ এ-সম্বন্ধে প্রামাণিক ও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। সমস্ত বিধিনিষেধের উল্লেখের প্রয়োজন নাই; দুই চারটি নমুনাস্বরূপ উল্লেখই যথেষ্ট।

রজক, কর্মকার, নট, বরুড়, কৈবর্ত, মেদ, ভিল্ল, চণ্ডাল, পুক্কশ, কাপালিক, নর্তক, তক্ষণ, সুবর্ণকার, শৌণ্ডিক এবং পতিত ও নিষিদ্ধ বৃত্তিজীবী ব্রাহ্মণদের দ্বারা স্পৃষ্ট বা পক্ব খাদ্য ব্রাহ্মণদের পক্ষে ভক্ষণ নিষিদ্ধ ছিল; এই নিষেধ অমান্য করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। শূদ্রপক্ব অন্ন ভক্ষণও নিষিদ্ধ ছিল; নিষেধ অমান্য করিলে পূর্ণ কৃচ্ছ্র-প্রায়শ্চিত্তের বিধান ছিল; প্রাচীন স্মৃতিকারদের এই বিধান ভবদেবও মানিয়া লইয়াছেন, তবে টীকা ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়পক্ব অন্ন গ্রহণ করিলে কৃচ্ছ্র-প্রায়শ্চিত্তের অর্ধেক

পালন করিলেই চলিবে ; আর, বৈশ্যপক্ক অন্ন গ্রহণ করিলে তিন চতুর্থাংশ। ক্ষত্রিয় যদি শূদ্রপক্ক অন্ন গ্রহণ করে তাহাকে পূর্ণ কৃচ্ছ্র-প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, কিন্তু বৈশ্যপক্ক অন্ন গ্রহণ করিলে অর্ধেক প্রায়শ্চিত্ত করিলেই চলিবে ; বৈশ্য শূদ্রপক্ক অন্ন গ্রহণ করিলেও অর্ধেক প্রায়শ্চিত্তেই চলিতে পারে। শূদ্রহস্তে তৈলপক্ক ভর্জিত (শস্য) দ্রব্য, পায়স, কিংবা আপৎকালে শূদ্রপক্ক দ্রব্য ইত্যাদি ভোজন করিতে ব্রাহ্মণের কোনও বাধা নাই ; শেষোক্ত অবস্থায় মনস্তাপপ্রকাশরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিলেই দোষ কাটিয়া যায়। ভবদেবের সময়ে দ্বিজবর্ণের মধ্যে বাঙলাদেশে এইসব বিধি-নিষেধ কিছু স্বীকৃত ছিল, কিছু নূতন গড়িয়া উঠিতেছিল বলিয়া মনে হইতেছে। শূদ্রের পাত্রে রক্ষিত অথবা শূদ্রদত্ত জলপানও ব্রাহ্মণদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল, অবশ্য স্বল্প প্রায়শ্চিত্তেই সে দোষ কাটিয়া যাইত ; তবে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র কেহই চণ্ডাল ও অন্ত্যজস্পৃষ্ট বা তাঁহাদের পাত্রে রক্ষিত জল পান করিতে পারিতেন না, করিলে পুরোপুরি প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। নট ও নর্তকদের সম্বন্ধে ভবদেবের বিধি-নিষেধ দেখিয়া মনে হয়, উচ্চতর বর্ণসমাজে ইঁহারা সম্মানিত ছিলেন না। বৃহদ্ধর্মপুরাণে নটেরা অধম সংকর পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু সমসাময়িক অন্য প্রমাণ হইতে মনে হয়, যাঁহারা নট-নর্তকের বৃত্তি অনুসরণ করিতেন সমাজে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা কম ছিল না। নট গাঙ্গো বা গাঙ্গোক রচিত কয়েকটি শ্লোক সুপ্রসিদ্ধ সদুক্তি-কর্ণামৃত-গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। "পদ্মাবতীচরণচারণ-চক্রবর্তী" জয়দেবের পত্নী প্রাক্‌বিবাহ জীবনে দেবদাসী-নটী ছিলেন, এইরূপ জনশ্রুতি আছে। জয়দেব নিজেও সঙ্গীতপারঙ্গম ছিলেন ; সেক শুভোদয়া-গ্রন্থে এই সম্বন্ধে একটি গল্পও আছে।

অন্ত্যজ জাতেরা বোধ হয় এখনকার মতো তখনও অস্পৃশ্য বলিয়া পরিগণিত হইতেন। ডোম-ডোম্বীরা যে ব্রাহ্মণদের অস্পৃশ্য ছিলেন তাহার একটু পরোক্ষ প্রমাণ চর্যাগীতে পাওয়া যায় (১০ নং গীত)। ভবদেবের প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ-গ্রন্থের সংসর্গ প্রকরণাধ্যায়ে অস্পৃশ্য-স্পর্শদোষ সম্বন্ধে নাতিবিস্তৃত আলোচনা দেখিয়াও মনে হয়, স্পর্শবিচার সম্বন্ধে নানাপ্রকার বিধি-নিষেধ সমাজে দানা বাঁধিয়া উঠিতেছিল।

বিবাহ-ব্যাপারেও অনুরূপ বিধি-নিষেধ যে গড়িয়া উঠিতেছিল তাহার পরিচয়ও সুস্পষ্ট। পালপর্বে এই প্রসঙ্গে রাজা লোকনাথের পিতৃ ও মাতৃবংশের পরিচয়ে দেখা গিয়াছে, উচ্চবর্ণ পুরুষের সঙ্গে নিম্নবর্ণ নারীর বিবাহ, ব্রাহ্মণ বর ও শূদ্রকন্যার বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল না। সবর্ণে বিবাহই সাধারণ নিয়ম ছিল, এই অনুমান সহজেই করা চলে ; কিন্তু সেন-বর্মণ-দেব আমলেও চতুর্বর্ণের মধ্যে, উচ্চবর্ণ বর ও নিম্নবর্ণ কন্যার বিবাহ নিষিদ্ধ হয় নাই, এমন কি শূদ্রকন্যার ব্যাপারেও নহে ; ভবদেব ও জীমূতবাহন উভয়ের সাক্ষ্য হইতেই তাহা জানা যায়। ব্রাহ্মণের বিবাহিতা শূদ্রা স্ত্রীর কথা ভবদেব উল্লেখ করিয়াছেন ; জীমূতবাহন ব্রাহ্মণের শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানের উত্তরাধিকারগত রীতিনিয়মের কথা বলিয়াছেন ; যজ্ঞ ও ধর্মানুষ্ঠান ব্যাপারে সমবর্ণা স্ত্রী বিদ্যমান না

থাকিলে অব্যবহিত নিম্নবর্তী বর্ণের স্ত্রী হইলেও চলিতে পারে, এইরূপ বিধানও দিয়াছেন। এইসব উল্লেখ হইতে মনে হয়, শূদ্রবর্ণ পর্যন্ত ব্রাহ্মণ পুরুষের যে কোনও নিম্নবর্ণে বিবাহ সমাজে আজিকার মতন একেবারে নিষিদ্ধ হইয়া যায় নাই। অবশ্য কোনও পুরুষই উচ্চবর্ণে বিবাহ করিতে পারিতেন না। তবে, দ্বিজবর্ণের পক্ষে শূদ্রবর্ণে বিবাহ সমাজে নিন্দনীয় হইয়া আসিতেছিল, ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কারণ, এই প্রথা যে নিন্দনীয় এ-সম্বন্ধে মনু ও বিষ্ণুস্মৃতির মত উল্লেখ করিয়া জীমূতবাহন বলিতেছেন, শঙ্খস্মৃতি দ্বিজবর্ণের ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা স্ত্রীর কথাই বলিয়াছেন, শূদ্রা স্ত্রীর কথা উল্লেখই করেন নাই। যজ্ঞ ও ধর্মানুষ্ঠানে স্ত্রীর অধিকার সম্বন্ধে জীমূতবাহনের যে-মত একটু আগে উদ্ধার করা হইয়াছে, সেই প্রসঙ্গে জীমূতবাহন মনুর মত সমর্থন করিয়া বলিতেছেন, সবর্ণা স্ত্রীই এই অধিকারের অধিকারী, তবে সবর্ণা স্ত্রী বিদ্যমান না থাকিলে ক্ষত্রিয়া স্ত্রী যজ্ঞভাগী হইতে পারেন, কিন্তু বৈশ্য বা শূদ্র নারী ব্রাহ্মণের বিবাহিতা হইলেও তিনি তাহা হইতে পারেন না, অর্থাৎ যথার্থ স্ত্রীত্বের অধিকারী তিনি হইতে পারেন না। এই টিপ্পনী হইতে স্বভাবতই এই অনুমান করা চলে যে, ব্রাহ্মণ বৈশ্যানী এমন কি শূদ্রাণীও বিবাহ করিতে পারিতেন, করিতেনও, কিন্তু তাঁহারা সর্বদা স্ত্রীর অধিকার লাভ করিতেন না। এই অনুমানের প্রমাণ জীমূতবাহনই অন্যত্র দিতেছেন : বলিতেছেন, ব্রাহ্মণ শূদ্রাণীর গর্ভে সন্তানের জন্মদান করিলে তাহাতে নৈতিক কোনও অপরাধ হয় না ; স্বল্প সংসর্গদোষ তাহাকে স্পর্শ করে মাত্র, এবং নামমাত্র প্রায়শ্চিত্ত করিলেই সে অপরাধ কাটিয়া যায়। শূদ্রাণীর সঙ্গে বিবাহ যে সমাজে ক্রমে নিন্দনীয় হইয়া আসিতেছিল তাহা জীমূতবাহনের মন্তব্য হইতে বুঝা যাইতেছে ; বিভিন্ন বর্ণের স্ত্রীদের মর্যাদা সম্বন্ধেও যে পার্থক্য করা হইতেছিল তাহাও পরিষ্কার, বিশেষত শূদ্রা বিবাহিতা পত্নী সম্বন্ধে। বর্ণাশ্রম-বহির্ভূত যে-সব জাত ছিল তাঁহাদের সঙ্গে বিবাহ-সম্বন্ধের কোনও প্রশ্ন বিবেচনার মধ্যেই আসে নাই, অর্থাৎ তাহা একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল, এমন কি শূদ্রের পক্ষেও।

দ্বিজবর্ণ (এবং বোধ হয় উচ্চ জাতের শূদ্রবর্ণের মধ্যেও) সপিণ্ড, সগোত্র এবং সমান-প্রবরের বিবাহই সাধারণত প্রচলিত ছিল ; ভবদেবভট্টের সম্বন্ধ-বিবেক গ্রন্থে তাহার উপর বেশ জোরই দেওয়া হইয়াছে। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, এবং প্রাজাপাত্য বিবাহে কন্যা বরের মায়ের দিক হইতে পঞ্চম পুরুষের মধ্যে কিম্বা পিতার দিক হইতে সপ্তম পুরুষের মধ্যে হইলে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। বর এবং কন্যা সগোত্র কিম্বা সপ্রবরের হইলেও বিবাহ হইতে পারিত না। আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস এবং পৈশাচ বিবাহে কন্যা বরের মায়ের দিক হইতে তিন পুরুষ, কিংবা পিতার দিক হইতে পঞ্চম পুরুষের বাহিরে হইলে বিবাহ হইতে পারিত, কিন্তু তাঁহারা সমাজে শূদ্র পর্যায়ে পতিত বলিয়া গণ্য হইতেন।

উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে বুঝা যায়, এইসব বর্ণগত বিধি-নিষেধ সাধারণত ব্রাহ্মণের সম্বন্ধেই সবিশেষ প্রযোজ্য ছিল, এবং তাহাও ব্রাহ্মণের সঙ্গে নিম্নতর, এবং বিশেষ-

ভাবে নিম্নতম বর্ণের আহার-বিহার-বিবাহ ব্যাপারে যোগাযোগ সম্বন্ধে। কালক্রমে এই সব বিধি-নিষেধই সামাজিক আভিজাত্যের মাপকাঠি হইয়া দাঁড়ায় এবং বৃহত্তর সমাজে বিস্তৃত হইয়া অন্যান্য বর্ণ ও জাতের মধ্যেও স্বীকৃতি লাভ করে। শেষ পর্বে আসিয়া যে-অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে তাহা তো সাম্প্রতিককালে বাঙালী হিন্দুসমাজে অত্যন্ত সুস্পষ্ট। যাহা হউক, সমসাময়িক স্মৃতিগ্রন্থে সেন-বর্মণ-দেব আমলের বর্ণগত বিধি-নিষেধের যে-চিত্র দৃষ্টিগোচর হইতেছে তাহাতে স্পষ্টই দেখা যায়, এই সময়েই ব্রাহ্মণেরা বৃহত্তর সমাজের অন্যান্য বর্ণ ও জাত্ হইতে প্রায় পৃথক ও বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিলেন। এক প্রান্তে মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়, অন্য প্রান্তে স্বাঙ্গীকৃত ও স্বাঙ্গীক্রিয়মান, স্পর্শচ্যুত, অধিকারলেশহীন অন্ত্যজ ও ম্লেচ্ছ সম্প্রদায়, আর মধ্যস্থলে বৃহৎ শূদ্র সম্প্রদায়। প্রত্যেকের মধ্যে দৃঢ় ও দুরতিক্রম্য প্রাচীর। ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ও নানা ভৌগোলিক এবং অন্যান্য বিভেদ-প্রাচীরে বিভক্ত, আহার-বিহার-বিবাহ-ব্যাপারে নানা বিধি-নিষেধের সূত্রে দৃঢ় করিয়া বাঁধা; যোগাযোগের বাধাও বিচিত্র। বৃহৎ শূদ্র সম্প্রদায়ও নানা জাতে নানা স্তরে বিভক্ত, এবং প্রত্যেক স্তর দৃঢ় ও দুর্লঙ্ঘ্য সীমায় সীমিত। অন্ত্যজ ও ম্লেচ্ছ পর্যায় তো একান্তই রাষ্ট্র ও সমাজের দৃষ্টির বাহিরে।

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণের উল্লেখ ভবদেব ভট্ট, জীমূতবাহন ও অন্যান্য স্মৃতিকারেরা বারবার করিয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা একান্তই ঐতিহ্য-সংস্কারগত উল্লেখ বলিয়া মনে হয়—উত্তর-ভারতীয় প্রাচীনতর স্মৃতিকথিত বর্ণ-বিন্যাসের প্রথাগত অনুকরণ। পূর্বতন কালে অথবা বাঙলার আদি স্মৃতিগ্রন্থগুলির সমসাময়িক কালে এই অঞ্চলে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণের উপস্থিতির কোন নিঃসংশয় সাক্ষ্য আজও আমরা জানি না।

প্রাচীন বাঙলায় বর্ণ-বিন্যাসের পরিণতির কথা বলিতে গিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের History of Bengal Vol. I -গ্রন্থে একটি উক্তি করা হইয়াছে; উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য।

"An important factor in the evolution of this final stage is the growing fiction that almost all non-Brahmaṇas were Śudras The origin of this fiction is perhaps to be traced to the extended significance given to the term Śudra in the Purāṇas, where it denotes not only the members of the fourth caste, but also those members of the three higher castes who accepted any of the heretical religions or were influenced by Tantric rites. The predominance of Buddhism and Tantric Saktism in Bengal as compared with other parts of India, since the eighth century A. D. perhaps explains why all the notable castes in Bengal were degraded in the Brihad-dharma Purāṇa and other texts as Śudras and the story of Veṇa and Pritha might be mere echo of a large scale re-conversion of the Buddhists and Tantric

elements of the population into the orthodox Brahmanical fold." (p. 578).

১২

বর্ণ ও রাষ্ট্র

বিভিন্ন পর্বে বর্ণ-বিন্যাসের সঙ্গে রাষ্ট্রের এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে বিভিন্ন বর্ণের সম্বন্ধের কথা না বলিয়া বর্ণ-বিন্যাস প্রসঙ্গ শেষ করা উচিত হইবে না।

বাঙলাদেশে গুপ্তাধিপত্যের আগে এই সম্বন্ধের কোনও কথাই বলিবার উপায় নাই ; তথ্যই অনুপস্থিত। গুপ্তাধিকারের কালে ভুক্তির রাষ্ট্রযন্ত্রে অথবা বিষয়াধিকরণে কিংবা স্থানীয় অন্য রাষ্ট্রাধিকরণের কর্তৃপক্ষদের মধ্যে যাঁহাদের নামের তালিকা পাইতেছি তাঁহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ প্রায় নাই বলিলেই চলে। ভুক্তিপতি বা উপরিকদের মধ্যে যাঁহাদের দেখা মিলিতেছে তাঁহারা কেহ চিরাতদত্ত, কেহ ব্রহ্মদত্ত, কেহ জয়দত্ত, কেহ রুদ্রদত্ত, কেহ কুলবৃদ্ধি ইত্যাদি ; ইঁহাদের একজনকেও ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে হয় না। বিষয়পতিরা বা তৎস্থানীয়রা কেহ বেত্রবর্মণ, কেহ স্বয়ম্ভুদেব, কেহ শণ্ডক ; ইহাদের মধ্যে বেত্রবর্মণ ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি করিতে পারেন ; স্বয়ম্ভুদেব সম্বন্ধে কিছু বলা কঠিন, ব্রাহ্মণ হইলে হইতেও বা পারেন ; শণ্ডক যে অব্রাহ্মণ এ-অনুমান সহজেই করা চলে। তারপরেই নিঃসন্দেহে যাঁহারা রাজকর্মচারী তাঁহারা হইতেছেন পুস্তপাল এবং জ্যেষ্ঠ বা প্রথম কায়স্থ। ইঁহাদের কাহারও নাম শাম্বপাল, কাহারও কাহারও নাম দিবাকরনন্দী, পত্রদাস, দুর্গাদত্ত, অর্কদাস, করণ-কায়স্থ নরদত্ত, স্কন্দপাল ইত্যাদি। এই সব নামও ব্রাহ্মণেতর বর্ণের, সন্দেহ করিবার কারণ নাই। অন্তত একজন করণ-কায়স্থ নরদত্ত যে সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন, সে-পরিচয় পাইতেছি। কুমারামাত্যদের মধ্যে একটি নাম পাইতেছি বেত্রস্বামী ; তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া কতকটা নিঃসংশয়ে বলা চলে। পুস্তপাল ও জ্যেষ্ঠ বা প্রথম কায়স্থদের সঙ্গে যাঁহারা স্থানীয় অধিকরণের রাষ্ট্রকার্য পরিচালনায় সহায়তা করিতেন তাঁহারা হইতেছেন নগরশ্রেষ্ঠী, প্রথম সার্থবাহ এবং প্রথম কুলিক ; ইহাদের নামের তালিকায় পাওয়া যায় ধৃতিপাল, বন্ধুমিত্র, রিভুপাল, স্থানুদত্ত, মতিদত্ত, ইত্যাদি ব্যক্তিকে ; ইঁহাদের একজনকেও ব্রাহ্মণ বলা যায় না। বস্তুত, এই সব নামাংশ বা পদবী পরবর্তী কালের ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়েতর অন্য 'ভদ্র'বর্ণের।

ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে (পূর্ব) বঙ্গেও এই একই অবস্থা দেখিতেছি। শুধু, সুবর্ণবীথি অন্তর্গত বারকমণ্ডলের বিষয়াধিনিযুক্তক ব্যক্তিদের মধ্যে দুইবার দুইজনের নাম পাইতেছি, গোপালস্বামী ও বৎসপালস্বামী ;- এই দুইজন ব্রাহ্মণ ছিলেন, সন্দেহ নাই। জ্যেষ্ঠকায়স্থ,

পুস্তপাল ইত্যাদির নামের মধ্যে পাইতেছি বিনয়সেন, নয়ভূতি, বিজয়সেন, পুরদাস ইত্যাদিকে ; ইঁহারা অব্রাহ্মণ, তাহাতেও সন্দেহ নাই।

অর্থাৎ, সপ্তম শতক পর্যন্তও রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণদের কোনও প্রাধান্য দেখা যাইতেছে না ; বরং পরবর্তী কালে যাঁহারা করণ-কায়স্থ, অম্বষ্ঠ-বৈদ্য ইত্যাদি সংকর শূদ্রবর্ণ বলিয়া গণ্য হইয়াছেন তাঁহাদের প্রাধান্যই দেখিতেছি বেশি, বিশেষভাবে করণ-কায়স্থদের। শ্রেণী হিসাবে শিল্পী ও বণিক-ব্যবসায়ী শ্রেণীর প্রাধান্যও যথেষ্ট দেখা যাইতেছে ; বর্ণ হিসাবে ইঁহারা বৈশ্যবর্ণ বলিয়া গণিত হইতেন কিনা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। বৈশ্য বলিয়া কোথাও ইহাদের দাবি সমসাময়িক কাল বা পরবর্তীকালেও কোথাও দেখিতেছি না, এই-টুকুই মাত্র বলা যায়। অনুমান হয়, পরবর্তীকালে যে-সব শিল্পী ও বণিক-ব্যবসায়ী শ্রেণী শূদ্র উত্তম ও মধ্যম সংকর বর্ণ পর্যায়ভুক্ত বলিয়া পাইতেছি, তাঁহারাই এই যুগে শ্রেষ্ঠী, সার্থবাহ, কুলিক ইত্যাদির বৃত্তি অনুসরণ করিতেন। বুঝা যাইতেছে, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতি এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য বর্ণব্যবস্থা বিস্তৃতি লাভ করিলেও রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণেরা এখনও প্রাধান্য লাভ করিতে পারেন নাই ; তাঁহারা সম্ভবত এখনও নিজেদের বর্ণানুযায়ী বৃত্তিতেই সীমাবদ্ধ ছিলেন। অন্যান্য বর্ণের লোকেদের সম্পর্কে মোটামুটি বলা যায় যে, তাঁহারাও নিজেদের নির্দিষ্ট বৃত্তিসীমা অতিক্রম করেন নাই। রাষ্ট্রে করণ-কায়স্থদের প্রতিপত্তি বৃত্তিগত স্বাভাবিক কারণেই ; শিল্পী ও বণিক-ব্যবসায়ীদের প্রতিপত্তির কারণ অর্থনৈতিক। শেষোক্ত কারণের ব্যাখ্যা অন্যান্য প্রসঙ্গে একাধিক বার করিয়াছি।

কিন্তু, ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও বর্ণ-ব্যবস্থার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে, রাষ্ট্রের সক্রিয় পোষকতার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে ক্রমশ ব্রাহ্মণেরা প্রতিপত্তিশীল হইয়া উঠিতে আরম্ভ করেন ; ভূমিদান অর্থদান ইত্যাদি কৃপালাভের ফলে অনেক ব্রাহ্মণ ক্রমশ ব্যক্তিগতভাবে ধনসম্পদের অধিকারীও হইতে থাকেন। এই সামাজিক প্রতিপত্তি রাষ্ট্রে প্রতিফলিত হইতে বিলম্ব হয় নাই। করণ-কায়স্থেরাও রাজসরকারে চাকুরি করিয়া করিয়া রাষ্ট্রের কৃপালাভে বঞ্চিত হয় নাই ; গ্রামে, বিষয়াধিকরণে, ভুক্তির রাষ্ট্রকেন্দ্রে সর্বত্র যাঁহারা মহত্তর, কুটুম্ব ইত্যাদি বলিয়া গণ্য হইতেছেন, রাজকার্যে সহায়তার জন্য যাঁহারা আহূত হইতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে করণ-কায়স্থ এবং অন্যান্য 'ভদ্র' বর্ণের লোকই সংখ্যায় বেশি বলিয়া মনে হইতেছে। প্রচুর ভূমির অধিকারী রূপে, শিল্প ব্যবসায়ে অর্জিত ধনবলে, সমাজের সংস্কার, সংস্কৃতি ও বর্ণ-ব্যবস্থার নায়করূপে যে সব বর্ণ সমাজে প্রতিপত্তিশীল হইয়া উঠিতেছেন তাঁহারা রাষ্ট্রে নিজেদের প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট হইবেন, ইহা কিছু বিচিত্র নয়। রাষ্ট্রেরও স্বার্থ হইল সেই সব প্রতিপত্তিশালী বর্ণ বা বর্ণসমূহকে সমর্থকরূপে নিজের সঙ্গে যুক্ত রাখা।

সাধারণত অধিকাংশ লোকই নিজেদের বর্ণবৃত্তি অনুশীলন করিতেন, এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই সত্য, কিন্তু ব্যক্তিগত রুচি, প্রভাব-প্রতিপত্তি কামনা, অর্থনৈতিক-

প্রেরণা ইত্যাদির ফলে প্রত্যেক বর্ণেরই কিছু কিছু লোক বৃত্তি পরিবর্তন করিত, তাহাও সত্য। স্মৃতিগ্রন্থাদিতে যে নির্দেশই থাকুক বাস্তবজীবনে দৃঢ়বদ্ধ রীতিনিয়ম সর্বদা অনুসৃত যে হইত না তাহার প্রমাণ অসংখ্য লিপি ও সমসাময়িক গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়। পাল-চন্দ্র এবং সেন-বর্মণ আমলে যথেষ্ট ব্রাহ্মণ রাজা, সামন্ত, মন্ত্রী, ধর্মাধ্যক্ষ, সৈন্য-সেনাপতি, রাজকর্মচারী, কৃষিজীবী ইত্যাদির বৃত্তি অবলম্বন করিতেছেন ; অম্বষ্ঠ বৈদ্যেরা মন্ত্রী হইতেছেন ; দাসজীবীরা রাজকর্মচারী, সভাকবি ইত্যাদি হইতেছেন, করণ-কায়স্থেরা সৈনিকবৃত্তি চিকিৎসাবৃত্তি ইত্যাদি অনুসরণ করিতেছেন ; কৈবর্তরা রাজকর্মচারী ও রাজ্যশাসক হইতেছেন ; এ ধরনের দৃষ্টান্ত অষ্টম হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত অনবরতই পাওয়া যাইতেছে।

পাল রাষ্ট্রযন্ত্র বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় রাষ্ট্র ও সমাজপদ্ধতির পূর্বোক্ত রীতিক্রম সুস্পষ্ট ও সক্রিয়। প্রথমেই দেখিতেছি, রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণদের প্রভাব ও আধিপত্য বাড়িয়াছে। দ্বিজশ্রেষ্ঠ শ্রীদর্ভপাণি, পৌত্র কেদারমিশ্র ও প্রপৌত্র গুরবমিশ্র রাজা ধর্মপালের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর চারিজন পালসম্রাটের অধীনে পালরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীর পদ অলংকৃত করিয়াছিলেন। ইঁহারা প্রত্যেকেই ছিলেন বেদবিদ্ পরমশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এবং সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ ও রাজনীতিকুশল। আর একটি ব্রাহ্মণ বংশের—শাস্ত্রবিদ্‌শ্রেষ্ঠ যোগদেব, পুত্র তত্ত্ববোধভূ বোধিদেব এবং তৎপুত্র বৈদ্যদেব —এই তিনজন যথাক্রমে তৃতীয় বিগ্রহপাল, রামপাল এবং কুমারপালের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। এই পরিবারও পাণ্ডিত্যে, শাস্ত্রজ্ঞানে, এক কথায় ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতিতে যেমন কুশলী ছিলেন তেমনই ছিলেন রাজনীতি ও রণনীতিতে। নারায়ণপালের ভাগলপুর লিপির দূতক ভট্ট গুরব ব্রাহ্মণ ছিলেন, সন্দেহ নাই। প্রথম মহীপালের বাণগড়লিপির দূতক ছিলেন ভট্ট শ্রীবামন মন্ত্রী ; ইনিও অন্যতম প্রধান রাজপুরুষ সন্দেহ নাই। এই রাজার রাজগুরু ছিলেন শ্রীবামরাশি ; ইনি বোধ হয় একজন শৈব সন্ন্যাসী ছিলেন। বৌদ্ধরাজার লিপি "ওঁ নমো বুদ্ধায়" বলিয়া আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু প্রথম দুই শ্লোকেই বলা হইতেছে, "সরসীসদৃশ বারাণসী ধামে, চরণাবনত-নৃপতি-মস্তকাবস্থিত কেশপাশ সংস্পর্শে শৈবালাকীর্ণরূপে প্রতিভাত শ্রীবামরাশি নামক গুরুদেবের পাদপদ্মের আরাধনা করিয়া, গৌড়াধিপ মহীপাল [যাঁহাদিগের দ্বারা] ঈশান-চিত্রঘণ্টাদি শতকীর্তিরত্ন নির্মাণ করাইয়াছিলেন…"। কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন "চিত্রঘণ্টেশী" নবদুর্গার একতম রূপ ; কাজেই, ঈশান চিত্রঘণ্টাদি অর্থে নবদুর্গার বিভিন্ন রূপ সূচিত হইয়া থাকা অসম্ভব নয়। শ্রীবামরাশি নামটিও যেন শৈব বা শাক্ত লক্ষণের সূচক।

একটি ক্ষত্রিয়বর্ণ প্রধান রাজপুরুষের নাম বোধ হয় পাওয়া যাইতেছে ধর্মপালের খালিমপুর লিপিতে ; ইনি মহাসামন্তাধিপতি নারায়ণবর্মা। এই সামন্ত নরপতিটি যেন অবাঙালী বলিয়াই মনে হইতেছে। কিছু কিছু বণিকের নাম পাইতেছি, যেমন বণিক

লোকদত্ত, বণিক বুদ্ধমিত্র ; নামাংশ বা পদবী দেখিয়া মনে হয়, ইঁহারা পরবর্তীকালের 'ভদ্র, সংকরবর্ণীয়, বৃত্তি অবশ্যই বৈশ্যের ; কিন্তু রাষ্ট্রে বর্ণ হিসাবে বা শ্রেণী হিসাবে ইঁহাদের কোনও প্রাধান্য নাই। করণ-কায়স্থদের প্রভাব ব্রাহ্মণদের প্রভাবের সঙ্গে তুলনীয় না হইলেও খুব কম ছিল না। রামচরিত-রচয়িতা সন্ধ্যাকরনন্দীর পিতা প্রজাপতিনন্দী ছিলেন করণদের মধ্যে অগ্রণী এবং রামপালের কালে পালরাষ্ট্রের সান্ধিবিগ্রহিক। আর এক করণ-শ্রেষ্ঠ শব্দপ্রদীপ গ্রন্থের রচয়িতা ; তিনি স্বয়ং, তাঁহার পিতা ও পিতামহ সকলেই ছিলেন রাজবৈদ্য ; দুইজন পাল-রাজসভার, একজন চন্দ্র-রাজসভার। বৈদ্যদেবের কমৌলি-লিপিতে ধর্মাধিকার-পদাভিষিক্ত জনৈক শ্রীগোনন্দন এবং মদনপালের মনহলি-লিপিতে সান্ধিবিগ্রহিক দূতক জনৈক ভীমদেবের সংবাদ পাইতেছি ; ইঁহারাও করণ-কায়স্থকুলসম্ভূত বলিয়া মনে হইতেছে। কৈবর্ত দিব্য বিদ্রোহী হইবার আগে পাল রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান রাজপুরুষ বা সামন্ত ছিলেন, সে কথা তো আগেই একাধিকবার বলা হইয়াছে। সামন্ত নরপতিদের মধ্যেও করণ-কায়স্থদের দর্শন মিলিতেছে। ত্রিপুরা পট্টোলীর মহারাজা লোকনাথ নিজেই ছিলেন করণ। কিন্তু করণদের প্রভাব পাল রাষ্ট্রের যতই থাকুক, ঠিক আগেকার পর্বের মতন আর নাই। পঞ্চম হইতে সপ্তম শতকের রাষ্ট্রে সর্বত্রই যেন ছিল করণ-কায়স্থদের প্রভাব, অন্তত নামাংশ বা পদবী হইতে তাহাই মনে হয়। পালচন্দ্র-পর্বে ঠিক ততটা প্রভাব নাই ; পরিবর্তে ব্রাহ্মণ প্রভাব বর্ধমান।

কম্বোজ-সেন-বর্মণ পর্বের রাষ্ট্রে এই ব্রাহ্মণ প্রভাব ক্রমশ বাড়িয়াই গিয়াছে। ভবদেবভট্ট ও হলায়ুধের বংশের কথা পূর্বেই একাধিকবার উল্লেখ করিয়াছি ; এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। একাধিক পুরুষ ব্যাপিয়া সেন-বর্মণ রাষ্ট্রে এই দুই পরিবারের প্রভাব ছিল অত্যন্ত প্রবল। তাহা ছাড়া, অনিরুদ্ধভট্টের মত ব্রাহ্মণ রাজগুরুদের প্রভাবও কিছু কম ছিল না। অধিকন্তু, পুরোহিত, মহাপুরোহিত, শান্ত্যাগারিক, শান্ত্যাগারাধিকৃত, শান্তিবারিক, তন্ত্রাধিকৃত, রাজপণ্ডিত প্রভৃতিরও প্রভাব এই পর্বের রাষ্ট্রগুলিতে সুপ্রচুর, এবং ইঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ। ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য প্রভাবের পরিচয় বিশেষভাবে কিছু পাওয়া যাইতেছে না ; বরং বল্লাল-চরিত, বৃহদ্ধর্ম ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের বর্ণতালিকা হইতে মনে হয়, শিল্পী ও ব্যবসায়ী শ্রেণীভুক্ত অনেক বর্ণ রাষ্ট্রের অকৃপাদৃষ্টি লাভ করিয়া সমাজে নামিয়া গিয়াছিল। বণিক ব্যবসায়ীদের প্রতি সেন রাষ্ট্র বোধ হয় খুব প্রসন্ন ছিল না। একমাত্র বিজয়সেনের দেবপাড়া লিপিতে পাইতেছি বারেন্দ্রক-শিল্পীগোষ্ঠী চূড়ামণি রাণক শূলপাণিকে। বৈদ্যদের প্রভাব-পরিচয়ের অন্তত একটি দৃষ্টান্ত আমাদের জানা আছে ; বৈদ্যবংশ প্রদীপ বনমালীকর রাজা ঈশান-দেবের পট্টনিক বা মন্ত্রী ছিলেন ; কিন্তু সংবাদটি বঙ্গের পূর্বতম অঞ্চল শ্রীহট্ট হইতে পাওয়া যাইতেছে যেখানে আজও বৈদ্য-কায়স্থে বর্ণ-পার্থক্য খুব সুস্পষ্ট নয়। একই

অঞ্চলে দেখিতেছি, দাস-কৃষিজীবীরা রাজকর্মচারী এবং সভাকবিও হইতেন। কিন্তু ব্রাহ্মণদের পরেই রাষ্ট্রে যাঁহাদের প্রভাব সক্রিয় ছিল তাঁহারা করণ কায়স্থ; ইঁহাদের প্রভাব হিন্দু আমলে কখনও একেবারে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না; করণ-কায়স্থদের বর্ণগত বৃত্তিই বোধ হয় তাহার কারণ। সেন-রাজসভার কবিদের মধ্যে অন্তত একজন করণ-কায়স্থ উপবর্ণের লোক ছিলেন বলিয়া মনে হয়; তিনি উমাপতিধর। মেরুতুঙ্গের প্রবন্ধচিন্তামণি-গ্রন্থের সাক্ষ্য প্রামাণিক হইলে স্বীকার করিতে হয়, উমাপতি লক্ষ্মণসেনের অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন। সদুক্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থের সংকলয়িতা কবি শ্রীধরদাসও বোধ হয় করণ-কায়স্থ ছিলেন; শ্রীধর নিজে ছিলেন মহামাণ্ডলিক, তাঁহার পিতা বটুদাস ছিলেন মহাসামন্তচূড়ামণি। বিজয়সেনের বারাকপুর লিপির দূত শালাঙ্কনাগ, বল্লালসেনের সান্ধিবিগ্রহিক হরিঘোষ, লক্ষ্মণসেনের মহাসান্ধিবিগ্রহিক নারায়ণদত্ত, এই রাজারই অন্যতম প্রধান রাজকর্মচারী শঙ্করধর, বিশ্বরূপসেনের সান্ধিবিগ্রহিক নাঞ্ঞী সিংহ এবং কোপিবিষ্ণু, ইত্যাদি সকলকেই করণ-কায়স্থ বলিয়াই মনে হইতেছে। লক্ষ্মণসেনের অন্যতম সভাকবি ধোয়ী কিন্তু ছিলেন জাতে তন্তুবায়; তন্তুবায় কুবিন্দকেরা উত্তম-সংকর বা সৎশূদ্র পর্যায়ের লোক, একথা স্মরণীয়।

রাষ্ট্রে বিভিন্ন বর্ণের প্রভাবের মোটামুটি যে পরিচয় পাওয়া গেল তাহা হইতে অনুমান হয়, ব্রাহ্মণ ও করণ-কায়স্থদের প্রভাব-প্রতিপত্তিই সকলের চেয়ে বেশি ছিল। করণ-কায়স্থদের প্রভাবের কারণ সহজেই অনুমেয়; ভূমির মাপ-প্রমাপ, হিসাবপত্র রক্ষণা-বেক্ষণ, পুস্তপালের কাজকর্ম, দপ্তর ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ, লেখকের কাজ প্রভৃতি ছিল ইঁহাদের বৃত্তি। স্বভাবতই, তাঁহারা রাষ্ট্রে এই বৃত্তিপালনের যতটা সুযোগ পাইতেন অন্যত্র তাহা সম্ভব হইত না। কাজেই এক্ষেত্রে বর্ণ ও শ্রেণী প্রায় সমার্থক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে তাহা বলা চলে না, ইঁহারা বৃত্তিসীমা অতিক্রম করিয়াই মন্ত্রী, সেনাধ্যক্ষ, ধর্মাধ্যক্ষ, সান্ধিবিগ্রহিক ইত্যাদি পদ অধিকার করিতেন। রাজগুরু, রাজপণ্ডিত, পুরোহিত, শান্ত্যাগারিক ইত্যাদিরা অবশ্যই নিজেদের বৃত্তিসীমা রক্ষা করিয়া চলিতেন, বলা যাইতে পারে। কোন্ সামাজিক রীতিক্রমানুযায়ী ব্রাহ্মণেরা রাষ্ট্রে প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন তাহা তো আগেই বলিয়াছি। বৈশ্যবৃত্তিধারী বর্ণ-উপবর্ণ সম্বন্ধে বলা যায়, যতদিন শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা উন্নত ছিল, ধনোৎপাদনের প্রধান উপায় ছিল শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য, ততদিন রাষ্ট্রেও তাঁহাদের প্রভাব অনস্বীকার্য ছিল, কিন্তু একাধিক প্রসঙ্গে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, সপ্তম শতকের পরে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার কমিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রেও বৈশ্যবৃত্তিধারী লোকেদের প্রভাব কমিয়া যাইতে থাকে। পাল-রাষ্ট্রই তাহার চিহ্ন সুস্পষ্ট। বল্লাল-চরিতের ইঙ্গিত সত্য হইলে সেন-রাষ্ট্র তাঁহাদের প্রতি সক্রিয়ভাবে অপ্রসন্নই ছিল। তাহা ছাড়া,

বৃহদ্ধর্ম-ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণও সে-ইঙ্গিত সমর্থন করে। রাষ্ট্রে ইঁহাদের প্রভাব থাকিলে সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে ইঁহারা এতটা অবজ্ঞাত, অবহেলিত হইতে পারিতেন না।

যাহা হউক, এ-তথ্য সুস্পষ্ট যে, ব্রাহ্মণ ও করণ-কায়স্থদের প্রভাবই রাষ্ট্রে সর্বাপেক্ষা বেশি কার্যকরী ছিল। অম্বষ্ঠ-বৈদ্যদের প্রভাবও হয়তো সময়ে সময়ে কিছু কিছু ছিল, কিন্তু সর্বত্র সমভাবে ছিল এবং খুব সক্রিয় ছিল, এমন মনে হয় না। বৈশ্যবৃত্তিধারী বর্ণের লোকেরা রাষ্ট্রে অষ্টম শতক পর্যন্ত প্রভাবশালীই ছিলেন, কিন্তু পরে তাঁহাদের প্রভাব কমিয়া যায় এবং তাঁহাদের কোনও কোনও সম্প্রদায় সংশূদ্র পর্যায় হইতেও পতিত হইয়া পড়েন। কৈবর্তদের একটি সম্প্রদায় কিছুদিন রাষ্ট্রে খুব প্রভাবশালীই ছিলেন, এবং পরেও সে-প্রভাব খুব সম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। আর কোনও বর্ণের কোনও প্রভাব রাষ্ট্রে ছিল বলিয়া মনে হয় না।

১৩

ভাব-দৃষ্টি

যে বিচিত্র বর্ণভেদ-বিন্যাসের কথা এতক্ষণ বলিলাম, পঞ্চম শতকের পর হইতেই এই ভেদ-বিন্যাস ক্রমশ বিস্তৃত হইতে আরম্ভ করে এবং সেন-বর্মণ পর্বে তাহা দৃঢ় ও অনমনীয় হইয়া সমাজকে স্তরে-উপস্তরে বিভক্ত করিয়া সমগ্র সমাজ-বিন্যাস গড়িয়া তোলে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দেশে এমন মানুষ, এমন সাধক ছিলেন যাঁহারা মানুষে মানুষে এই ভেদ-সংঘাত অস্বীকার করিয়া তাহার ঊর্ধ্বে উঠিতে পারিয়াছিলেন। জাত্‌ভেদ, বর্ণভেদের দুর্ভেদ্য প্রাচীর তাঁহাদের উদার সমদৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। সমস্ত জাত্‌ বর্ণ ভেদ করিয়া, তাহাকে অতিক্রম করিয়া মানুষের মানব-মহিমা ঘোষণাই ছিল তাঁহাদের অধ্যাত্মচিন্তা ও জীবন-সাধনার আদর্শ। এই আদর্শ সব চেয়ে বেশি প্রচার করিয়াছেন ভাগবতধর্মী এবং সহজযানী সাধকেরা। সমাজে তাঁহাদের আদর্শ কতটা অনুসৃত হইয়াছিল বলা কঠিন, খুব যে হইয়াছিল, এমন প্রমাণ নাই, কিন্তু, সে আদর্শ যে অধ্যাত্মচিন্তায় এবং কিছু কিছু লোকের জীবন সাধনার কাজে লাগিয়াছিল, সে-সম্বন্ধে সন্দেহ করা চলে না। অন্তত বিশেষ বিশেষ ধর্মগোষ্ঠীতে জাত্‌ভেদ বর্ণভেদের কোন বালাই-ই ছিল না, একথা মানিতেই হয়। ভাগবত্‌ তো খুব জোরের সঙ্গেই বলিয়াছেন, ভগবানের কাছে সকলেরই সমান অধিকার, এমন কি কিরাত, হূণ, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কস, আভীর, শুহ্ম, যবন, খসদেরও। প্রাচীন বাঙলায় এ-কথাটা খুব ভাল করিয়া জোরের সঙ্গে বলিয়াছেন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরা এবং ভবিষ্যপুরাণের ব্রহ্মপর্ব যদি বাঙলাদেশে রচিত হইয়া থাকে তাহা হইলে

ঐ ভাবের ভাবুকেরাও। বজ্রসূচিকোপনিষৎ নামে একটি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল বোধ হয় বাঙলাদেশেই, এবং মনে হয় এই উপনিষদটি বজ্রযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের রচনা। গ্রন্থটি ৯৭৩-৯৮১ খ্রীষ্ট তারিখে চীনা ভাষায় অনূদিত হয়। এই গ্রন্থেও প্রচণ্ড যুক্তিতর্কে জাত্‌ভেদের যুক্তি খণ্ডন করা হইয়াছে।

সরহপাদের দোহাকোষের প্রথমেই বলা হইয়াছে, ব্রাহ্মণ [সহজধর্মের] রহস্য জানে না। সংস্কৃত টীকাকার বলিতেছেন, দ্বিজবর্ণের সংস্কার পালনেই যদি জাতি হয় তবে সংস্কার পালন তো সকলেরই হইতে পারে, তাহাতে জাতি সিদ্ধ হয় না—তস্মাৎ ন সিধ্যতি জাতিঃ। দোহাকোষের টীকার অন্যত্র আছে, শূদ্র বা ব্রাহ্মণ বলিয়া বিশেষ কিছু জাতি নাই, সমস্ত লোক একই জাতিতে নিবদ্ধ, ইহাই সহজ ভাব—তস্মা ন শূদ্রং ব্রাহ্মণাদি জাতি-বিশেষং ভবতি সিদ্ধং। সর্বে লোকা একজাতি নিবদ্ধাশ্চ সহজেনেতি ভাবঃ॥ ভবিষ্য-পুরাণের ব্রহ্মপর্বে জাতিভেদের বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ যুক্তি দেওয়া হইয়াছে এবং সর্বশেষে বলা হইয়াছে, চার বর্ণই যখন এক পিতার সন্তান তখন সকলেরই একই জাতি; সব মানুষের পিতা যখন এক তখন এক পিতার সন্তানদের মধ্যে জাতিভেদ থাকিতেই পারে না। বজ্রসূচিকোপনিষদেও খুব জোরের সঙ্গে বংশ-ব্রাহ্মণত্বের দাবি অস্বীকার করা হইয়াছে। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের বেশির ভাগ সম্বন্ধই তো শবর-শবরী, ডোম-ডোম্‌নী, চণ্ডাল-চণ্ডালিনীদের সঙ্গে।

কিন্তু, এই উদার সমদৃষ্টি ও অধ্যাত্ম-ভাবনা সামাজিকভাবে সমাজে গৃহীত হয় নাই, ব্যক্তিগত অধ্যাত্ম ও ধর্মসাধনার ক্ষেত্রেই যেন সীমাবদ্ধ ছিল। ব্যক্তিজীবনে এই উদার আদর্শের ধ্যান ও স্পর্শ অনেক মানুষকে জীবনসাধনায় অগ্রসর করিয়াছে, প্রাচীন বাঙলায় এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। পাল-যুগে বৌদ্ধ সহজধর্মের উদার আদর্শ কিছুটা সামাজিক জীবনেও সক্রিয় ছিল, কিন্তু সাধারণভাবে আমাদের দৈনন্দিন সামাজিক আচার, বিচার ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে এবং সমাজ-বিন্যাসে এই উদার মানবাদর্শের স্বীকৃতি বিশেষ ছিল বলিয়া মনে হয় না।

সপ্তম অধ্যায়

শ্রেণী-বিন্যাস

১

যুক্তি

প্রাচীন বাঙলার সমাজ যেমন বিভিন্ন বর্ণে তেমনই বিভিন্ন অর্থনৈতিক শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল[১]। সামাজিক ধনের উৎপাদন ও বণ্টনানুযায়ী সমাজে অর্থনৈতিক শ্রেণীর উদ্ভব ও স্তরভেদ দেখা দেয়। যে-সমাজের উৎপাদিত ধনের উপর সকলের সমান অধিকার, ব্যক্তিগত ধনাধিকার যে সমাজে স্বীকৃত নয়, সেই সমাজে শ্রেণী-বিন্যাসের প্রশ্ন অবান্তর। কিন্তু, প্রাচীন বাঙলার সমাজে ব্যক্তিগত ধনাধিকার যেমন আজিকার মতই স্বীকৃত হইত—সমগ্র ভারতবর্ষেই হইত, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও হইত—তেমনই অস্বীকৃত হইত উৎপাদিত ধনের উপর সকলের সমান অধিকার। বস্তুত, বহু প্রাচীন কাল হইতেই ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম চিন্তায় অন্নের উপর সকলের সমানাধিকার, অর্থাৎ সকলেরই খাইয়া বাঁচিবার অধিকার স্বীকৃত হইলেও[২], বাস্তব দৈনন্দিন জীবনের ক্ষেত্রে সামাজিক ধনের উপর সকলের সমানাধিকার কখনও স্বীকৃত হয় নাই। বিংশ শতকের আগে মঠ-মন্দির-বিহার-সংঘারাম ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও এই স্বীকৃতি ছিল না। কৌম সমাজের ধনসাম্য-ব্যবস্থার কথা বাদ দিলে, ঐতিহাসিক পর্বে ব্যক্তিগত ধনাধিকারবাদ স্বীকৃতির উপরই ছিল প্রাচীন সমাজের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু ধন উৎপাদন যাঁহারা করিতেন তাঁহারাই যে উৎপাদিত ধন ভোগ করিতে পারিতেন তাহা নয়। সামাজিক ধন কাহারা বেশী ভোগ করিতেন, কাহারা কম করিতেন, কাহারা কায়ক্লেশে জীবনধারণ করিতেন, কিংবা উৎপাদিত ধন একেবারেই ভোগ করিবার সুযোগ পাইতেন না, তাহা নির্ভর করিত উৎপাদিত ধনের বণ্টন ব্যবস্থার উপর।

---

১ এই অধ্যায়ে পাঠনির্দেশ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। যে-সব সাক্ষ্য-প্রমাণ ও তথ্য বর্তমান অধ্যায়ে ব্যবহার করা হইয়াছে তাহার প্রায় সমস্তই অন্যান্য অধ্যায়ে, বিশেষভাবে বর্ণ-বিন্যাস, ভূমি-বিন্যাস, ধনসম্বল, ধর্মকর্ম এবং রাজবৃত্ত অধ্যায়গুলিতে একাধিকবার উদ্ধৃত হইয়াছে। পাঠনির্দেশও সেই সঙ্গে পাওয়া যাইবে। তবু, ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ের একটি সংক্ষিপ্ত পাঠপঞ্জী এই অধ্যায়ের শেষে দেওয়া হইল।

২ অন্নাদ্যাদেঃ সংবিভাগো ভূতেভ্যশ্চ যথার্হতঃ। ভাগবত, ৭,১১,১০

সর্বভূতে যথাযোগ্যভাবে অন্নাদির সম্যক বিভাগও ধর্ম; এই ভাগবতেই অন্যত্র (৭,১৪,৮) পাইতেছি:

যাবদ্‌ভ্রিয়েত জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাম্।
অধিকং যোঽভিমন্যেত স স্তেনো দণ্ডমর্হতি॥

ক্ষুধার ও প্রয়োজনের অনুরূপ অন্ন পাওয়া দেহী মাত্রেরই অধিকার; তাহার বেশি যে অধিকার করে সে দণ্ডার্হ।

এই বণ্টন কাহারা করিতেন ? প্রাচীন বাঙলায় ধনোৎপাদনের ছিল তিন উপায়—কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য। কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যই এই তিন উপায়ের মধ্যে ধনাগমের প্রধান দুই উপায় ছিল বলিয়া মনে হয়। কৃষি ভূমিনির্ভর ; ভূমির ব্যক্তিগত অধিকার এবং ব্যক্তিগত অধিকারের উপর রাষ্ট্রের অধিকার প্রাচীন বাঙলায় স্বীকৃত ছিল, এ-তথ্য পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে জানা গিয়াছে। কাজেই, কৃষিদ্রব্য ক্ষেত্রকর বা কর্ষকরা উৎপাদন করিলেও বণ্টন-ব্যবস্থাটা ছিল ভূম্যধিকারী এবং রাষ্ট্রের হাতে। ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল বণিকদের হাতে, শিল্প ছিল শিল্পীদের হাতে ; এই দুই উপায়ে উৎপাদিত অর্থের বণ্টন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ইঁহাদের হাতে না থাকিলেও—খানিকটা তো রাষ্ট্রের হাতে ছিলই—অধিকাংশ ইঁহাদেরই করায়ত্ত ছিল। ধনোৎপাদনের তিন উপায় অবলম্বন করিয়া স্বভাবতই বাঙলায় তিনটি শ্রেণী গড়িয়া উঠিবে, ইহা কিছু আশ্চর্য নয় ; এবং উৎপাদিত ও বণ্টিত ধনের তারতম্যানুযায়ী প্রত্যেক শ্রেণীতে নানা স্তর থাকিবে তাহাও আশ্চর্য নয়।

কিন্তু, সমাজে এমন বহু লোক বাস করেন যাঁহারা ধন উৎপাদন করেন না, বণ্টনের অধিকারও যাঁহাদের নাই। ধন উৎপাদন ও বণ্টন ছাড়াও সমাজের অনেক কর্তব্য আছে যাহা সমাজের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় এবং কল্যাণকর। এই সব কর্তব্যের তালিকা সুদীর্ঘ ; ইহাদের একপ্রান্তে যেমন মিলিবে জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্মকর্ম শিল্পকলা, ভাষা সাহিত্য, এক কথায় সমাজের মানস-জীবনের নায়কদের, শিক্ষা ও ধর্মজীবীদের, তেমনই অন্যপ্রান্তে পাওয়া যাইবে সমাজের অঙ্গ-নির্গত আবর্জনা-পরিষ্কারক রজক-চণ্ডাল-বাউড়ী-পোদ-বাগ্‌দী ইত্যাদিদের। এইখানেই আসিয়া পড়ে সমাজের বর্ণ-বিন্যাসের কথা, এবং শ্রেণী-বিন্যাসের সঙ্গে তাহা জড়াইয়া যায়। বস্তুত, ভারতীয় সমাজে বর্ণ ও শ্রেণী অঙ্গাঙ্গী জড়িত, একটিকে আর একটি হইতে পৃথক করিয়া দেখিবার উপায় নাই ; বাঙলাদেশেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। বর্ণ-বিন্যাস অধ্যায়ে দেখা গিয়াছে, বৃত্তি বা জীবিকা বর্ণনির্ভর, এবং বর্ণ জন্মনির্ভর। বিশেষ বর্ণের কেহ নির্ধারিত বৃত্তির সীমা অতিক্রম করিতেন না এমন নয়, কিন্তু তাহা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ; অধিকাংশ লোক নিজ নিজ বৃত্তিসীমা রক্ষা করিয়াই চলিতেন। ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া অন্ত্যজ চণ্ডাল পর্যন্ত অগণিত স্তরের অগণিত বৃত্তি, এবং বৃত্তি অনুযায়ী যেমন বর্ণের সামাজিক মর্যাদা, তেমনই বর্ণানুযায়ী বৃত্তির নির্দেশ। বৃত্তি বা জীবিকা যেখানে বর্ণ অনুযায়ী সেখানে বর্ণ ও শ্রেণী একে অন্যের সঙ্গে জড়াইয়া থাকিবে, ইহা কিছু বিচিত্র নয়, এবং শ্রেণীর মর্যাদাও সেই সমাজে বর্ণ ও বৃত্তি অনুযায়ী হইবে তাহাও বিচিত্র নয়। উৎপাদিত ধন উৎপাদক ও বণ্টকেরা তো ভোগ করিতেনই, বিশেষভাবে করিতেন উৎপাদন ও বণ্টন যাঁহারা নিয়ন্ত্রণ করিতেন তাঁহারা, যাঁহারা তাঁহাদের সহায়ক ও সমর্থক ছিলেন তাঁহারা, এবং সমাজের অন্যান্য বিচিত্র কর্তব্যে যাঁহারা নিয়োজিত ছিলেন তাঁহারাও। সমানাধিকারবাদের স্বীকৃতি যখন ছিল

না, তখন সকলে সমভাবে সামাজিক ধন ভোগ করিতে পাইতেন না, তাহাও স্বাভাবিক। তাহার উপর এই বণ্টন আবার নিয়মিত হইত বর্ণ ও বৃত্তির মর্যাদানুযায়ী ; কাজেই, ধনোৎপাদনের প্রধান তিন উপায়ানুযায়ী তিনটি শ্রেণী ছাড়া আরও অনেক অর্থনৈতিক শ্রেণী থাকিবে ইহা অস্বাভাবিক নয়।

সব শ্রেণী-উপশ্রেণী একসঙ্গে গড়িয়া উঠিয়াছিল এমন মনে করিবার কারণ নাই ; সমাজের গঠন-বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে, সমাজকর্মের জটিলতা ও কর্মবিভাগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণী উপশ্রেণীর সংখ্যা বাড়িয়াছে, ইহাই যুক্তিসঙ্গত অনুমান। তবে, এই অনুমান অনেকটা নিঃসংশয়ে করা চলে যে, খ্রীষ্টপূর্ব শতকগুলিতেই ধনাগমের পূর্বোক্ত তিন প্রধান উপায় অবলম্বন করিয়া তিনটি প্রধান শ্রেণী প্রাচীন বাঙলায় গড়িয়া উঠিয়াছিল। সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নাই, কিন্তু ষষ্ঠ-পঞ্চম-চতুর্থ খ্রীষ্টপূর্ব শতকগুলিতে প্রতিবেশী অঙ্গ-মগধের সাক্ষ্য যদি আংশিকতও পুণ্ড্র-রাঢ়-সুহ্ম-বঙ্গ সম্বন্ধে প্রযোজ্য হয়, এবং এই সব জনপদের কৃষি-শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে যদি সমসাময়িক সাক্ষ্য প্রামাণিক হয়, তাহা হইলে এই অনুমান অস্বীকার করা যায় না। তবে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক হইতেই এ-বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায় ; তাহার আগে সবটাই অনুমান। পঞ্চম শতক-পরবর্তী বাঙলার লিপিমালা পূর্বোক্ত অনুমান সমর্থন করে, এবং সদ্যকথিত তিনটি ও অন্যান্য শ্রেণীগুলি যে তাহার আগেই তাহাদের বিশেষ বিশেষ বৃত্তি লইয়া কোথাও অস্পষ্ট, কোথাও সুস্পষ্ট সীমারেখায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল, ইহার কিছু কিছু ইঙ্গিতও পাওয়া যায়। কিন্তু সে-কথা বলিবার আগে শ্রেণী-বিন্যাস সংক্রান্ত উপকরণগুলি সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলিয়া লওয়া প্রয়োজন।

২

উপাদান বিবৃতি। ভূমি দান-বিক্রয়ের পট্টোলি

শ্রেণী-বিন্যাস সম্বন্ধে আমাদের প্রধান উপকরণ ভূমিদান-বিক্রয়ের পট্টোলী, এবং সমর্থক ও আনুষঙ্গিক উপকরণ—পাল ও সেন আমলে—সমসাময়িক সাহিত্য, বিশেষভাবে বৌদ্ধ চর্যাগীতি, বৃহদ্ধর্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, ও বাঙলার স্মৃতিগ্রন্থাদি। শেষোক্ত গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে বর্ণ-বিন্যাস অধ্যায়ে আলোচনা করা হইয়াছে। বর্তমান প্রসঙ্গে পট্টোলীগুলির স্বরূপ বিশেষভাবে জানা প্রয়োজন।

মহাস্থান শিলাখণ্ডলিপি বা চন্দ্রবর্মার শুশুনিয়া লিপি আমাদের বিশেষ কোনও কাজে লাগিতেছে না। যদি অনুমান করা যায় যে, মৌর্যকালে বাঙলাদেশ অথবা তাহার কতকাংশ মৌর্য সম্রাটদের করতলগত ছিল, এবং মৌর্যশাসন-পদ্ধতি এ দেশেও প্রচলিত ছিল, তাহা হইলে ধরিয়া লইতে হয় যে, মৌর্যরাষ্ট্রে আমরা যে-সব রাজপুরুষদের

পরিচয় অশোকের লিপিমালা, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও মেগাস্থিনিসের ইণ্ডিকা-গ্রন্থ হইতে পাই, সেই সব রাজপুরুষেরা এদেশেও বিদ্যমান ছিলেন, এবং মৌর্য প্রাদেশিক-শাসনের যন্ত্র পুদনগলের (পুণ্ড্রনগরের) মহামাত্যের নির্দেশে বাঙলা দেশেও পরিচালিত হইত। কিন্তু তাহা হইলেও এই অনুমান বা প্রমাণ হইতে আমরা একমাত্র রাজপুরুষশ্রেণী বা সরকারী চাকুরীয়া ছাড়া আর কোনও শ্রেণীর খবর পাইলাম না। পরবর্তী যুগেও কতকটা তাহাই; উত্তর-ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সমসাময়িক লিপিগুলি অধিকাংশই তো রাজরাজড়ার বংশপরিচয় ও যুদ্ধ-জয়বিজয়ের এবং অন্যান্য কীর্তিকলাপের বিবরণ। এই সব লিপিতেও রাজপুরুষশ্রেণী ছাড়া আর কাহারও খবর বড় একটা নাই। সমসাময়িক সংস্কৃত-সাহিত্যে, যেমন শূদ্রকের মৃচ্ছকটিকে, ভাসের দু'একটি নাটকে, কালিদাসের শকুন্তলায় পরোক্ষ ভাবে সমাজের অন্যান্য বৃত্তি ও শ্রেণীর খবরাখবর কিছু কিছু পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাও অত্যন্ত অস্পষ্ট। শুঙ্গ আমলের ভরহুত স্তূপের বেষ্টনীতে কিংবা কিছু পরবর্তী কালের সাঁচীর শিলালিপিগুলিতে ও মথুরায় প্রাপ্ত কোনও কোনও লিপিতে, কোনও কোনও প্রাচীন মুদ্রায়ও এই ধরনের পরোক্ষ কিছু কিছু খবর আছে; শিল্পী-বণিক্-ব্যবসায়ী শ্রেণীর আভাস তাহাতে আছে। বস্তুত, একমাত্র জাতক-গ্রন্থ ছাড়া আর কোন উপাদানের ভিতরই প্রাচীন ভারতের শ্রেণী-বিন্যাসের সুস্পষ্ট চেহারা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পঞ্চম শতক পর্যন্ত বাঙলাদেশের ইতিহাস সম্বন্ধেও এ কথা প্রযোজ্য। তবে, অনুমান করিয়া একটা অস্পষ্ট চেহারা আঁকিয়া লওয়া যায়। কিন্তু সে-চেষ্টা করিয়া লাভ নাই।

পঞ্চম হইতে সপ্তম শতক পর্যন্ত বাঙলাদেশ-সংক্রান্ত পট্টোলীগুলি সমস্তই ভূমি দান-বিক্রয়ের দলিল। এই পট্টোলীগুলির মধ্যে আমরা শ্রেণী-সংবাদ যে খুব বেশী পাইতেছি, তাহা নয়; তবে দুইটি শ্রেণী বেশ পরিষ্কার হইয়া উঠিতেছে, এ কথা সহজেই বলা চলে, একটি রাজপুরুষ শ্রেণী, আর একটি বণিক্-ব্যবসায়ী শ্রেণী। তাহা ছাড়া, মহত্তরাঃ, ব্রাহ্মণাঃ, কুটুম্বিনঃ, ব্যবহারিণঃ প্রভৃতি, এবং সাধারণ ভাবে 'অক্ষুদ্র প্রকৃতি' অর্থাৎ গণ্যমান্য জনসাধারণের সঙ্গেও আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে। ব্রাহ্মণদের বৃত্তি কি ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। মহত্তর (মহত্তর=মাহাতো=মাতব্বর লোক, অর্থাৎ সম্পন্ন গৃহস্থ), কুটুম্ব (অর্থাৎ গ্রামবাসী সাধারণ গৃহস্থ) এবং 'অক্ষুদ্রপ্রকৃতি' জনসাধারণ কিংবা যে সমস্ত 'সদ্ব্যবহারী' কোনও বিশেষ প্রয়োজনে নিজেদের মতামত দিবার জন্য স্থানীয় অধিকরণের (তথা রাষ্ট্রের) সাহায্য-নিমিত্ত আহূত হইতেন, তাঁহাদের বৃত্তি কি ছিল, তাঁহারা কোন্ শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত ছিলেন, এ-সম্বন্ধে সুস্পষ্ট কোনো আভাস এই লিপিগুলিতে পাওয়া না গেলেও অনুমান করা খুব কঠিন নয়। ভূমি দান-বিক্রয় উপলক্ষে যাঁহাদের সাহায্যের প্রয়োজন হইতেছে, যাঁহাদের এই দান-বিক্রয় বিজ্ঞাপিত করা প্রয়োজন হইতেছে, তাঁহাদের মধ্যে শ্রেণী হিসাবে কোনো শ্রেণীর উল্লেখ নাই; তবে যাঁহারা এই ব্যাপারে প্রধান তাঁহাদের মধ্যে রাজপুরুষশ্রেণী এবং বণিক-ব্যবসায়ীশ্রেণীর লোকেদেরই নিঃসংশয় উল্লেখ দেখিতে

পাওয়া যায়। অন্য যাঁহাদের উল্লেখ আছে, তাঁহারা কোনো সুনির্দিষ্ট শ্রেণীপর্যায়ভুক্ত বলিয়া উল্লিখিত হন নাই, কিন্তু উল্লেখের রীতি দেখিয়া মনে হয়, শ্রেণীর ইঙ্গিত বর্তমান। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে রাখা দরকার যে, রাজপুরুষদের উল্লেখ তাঁহাদিগের অধিকৃত পদমর্যাদার জন্যই। সুস্পষ্ট সীমারেখায় আবদ্ধ একটা বিশেষ শ্রেণীভুক্ত করিয়া তাঁহাদিগকেও উল্লেখ করা হইতেছে না ; তেমন উল্লেখের প্রয়োজনও হয় নাই।

অষ্টম শতক হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত লিপিগুলির স্বরূপ একটু ভিন্ন প্রকারের। এইগুলি সবই ভূমিদানের দলিল। পঞ্চম হইতে সপ্তম শতকের দলিলগুলিতে ভূমি কি ভাবে বিক্রীত হইতেছে, এবং পরে কি ভাবে দান করা হইতেছে, তাহার ক্রমের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। অষ্টম শতক-পরবর্তী দলিলগুলিতে ভূমি ক্রয়ের যে ক্রম তাহা আমাদের দৃষ্টির বাহিরে ; আমরা শুধু দেখি, রাজা ভূমি দান করিতেছেন, এবং সেই ভূমিদান বিজ্ঞাপিত করিতেছেন। এই বিজ্ঞাপন যাঁহাদের নিকট করা হইতেছে, তাঁহাদের উপলক্ষ্য করিয়া সমসাময়িক প্রায় সমস্ত শ্রেণীর লোকেদের কথাই উল্লিখিত হইয়াছে। যাঁহাদিগকে বিজ্ঞাপিত করার কোনও প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় না, তাঁহাদেরও জানান হইতেছে. যেমন, যে-গ্রামে ভূমিদান করা হইতেছে, সেই গ্রামের এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামের সমস্ত শ্রেণীর লোকেদের নিশ্চয়ই জানান প্রয়োজন, সেই গ্রাম যে বীথী বা মণ্ডল বা বিষয় বা ভুক্তিতে অবস্থিত তাহার রাজপুরুষদের জানান প্রয়োজন, কিন্তু রাজনক, রাজপুত্র, রাজামাত্য, সেনাপতি ইত্যাদি সকল রাজপুরুষদের জানাইবার কোনও প্রয়োজন বাস্তবক্ষেত্রে আছে বলিয়া তো মনে হয় না। কিংবা মালব, খস, হূণ, কর্ণাট, লাট ইত্যাদি ভিন্নদেশাগত বেতনভোগী সৈন্যদের বিজ্ঞাপিত করিবার কারণও কিছু বুঝা যায় না। পঞ্চম হইতে সপ্তম শতক পর্যন্ত লিপিগুলিতে এই ধরনের সর্বশ্রেণীর, সকল বৃত্তিধারী লোকের উল্লেখ নাই ; সেখানে যে-বিষয়ে অথবা মণ্ডলে ভূমি দান-বিক্রয় করা হইতেছে, সেই বিষয়ের অথবা মণ্ডলের রাজপুরুষ, বণিক ও ব্যবসায়ী, মহত্তর, ব্রাহ্মণ, কুটুম্ব ইত্যাদির বাহিরে আর কাহারও উল্লেখ করা হইতেছে না।

৩

এইবার একে একে লিপিগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাক প্রাচীন বাঙলার শ্রেণী-বিভাগের চেহারাটা ধরিতে পারা যায় কিনা। বলা বাহুল্য, পঞ্চম শতকের পূর্বে এ-বিষয়ে স্থির করিয়া কিছু বলিবার উপাদান আমাদের নাই।

উপাদান বিশ্লেষণ

প্রথম কুমারগুপ্তের ধনাইদহ (৪৩২-৩৩ খ্রী) লিপিতে দেখিতেছি, ভূমি-বিক্রয়ের ব্যাপারটি বিজ্ঞাপিত করা হইতেছে গ্রামের কুটুম্ব, অর্থাৎ অন্যান্য গৃহস্থদের, ব্রাহ্মণদের এবং

মহত্তর, অর্থাৎ প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের ; বিজ্ঞাপন দিতেছেন একজন রাজপুরুষ। এই সম্রাটের ১নং দামোদরপুর-লিপিতে (৪৪৩-৪৪ খ্রী) রাজপুরুষ হইতেছেন কোটিবর্ষ বিষয়ের বিষয়পতি কুমারামাত্য বেত্রবর্মা এবং ভূমি-বিক্রয় ব্যাপারে তাঁহার সহায়ক ও পরামর্শদাতা হইতেছেন নগরশ্রেষ্ঠী, প্রথম সার্থবাহ, প্রথম কুলিক এবং প্রথম বা জ্যেষ্ঠ কায়স্থ। ইঁহারা সকলেই অবশ্য রাজপুরুষ নহেন ; প্রথম কায়স্থ খুব সম্ভব একজন রাজপুরুষ ; বাকী তিনজনের দুই জন বণিক ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের এবং একজন শিল্পীশ্রেণীর প্রতিনিধি। কয়েকজন পুস্তপালের উল্লেখ আছে, ইঁহারাও রাজপুরুষ। বৈগ্রাম পট্টোলী (৪৮৭-৪৮ খ্রী) মতে কুমারামাত্য কুলবৃদ্ধি ছিলেন পঞ্চনগরী বিষয়ের বিষয়পতি ; কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁহার সহায়ক নগরশ্রেষ্ঠী, প্রথম সার্থবাহ, প্রথম কুলিক অথবা প্রথম কায়স্থের সাক্ষাৎ পাইতেছি না ; পরিবর্তে ভূমি-বিক্রয়ের ব্যাপারটি যেখানে জানান হইয়েছে, সেখানে বিষয়াধিকরণকেও জানাইবার ইঙ্গিত আছে। অন্যান্য সমসাময়িক লিপি হইতে আমরা জানি যে, পূর্বোল্লিখিত নগরশ্রেষ্ঠী, প্রথম সার্থবাহ, প্রথম কুলিক এবং প্রথম বা জ্যেষ্ঠ কায়স্থ, ইঁহারাই বিষয়াধিকরণ গঠন করিতেন। ইঁহাদের ছাড়া বিক্রীত ভূমিসংপৃক্ত দুই গ্রামের কুটুম্ব, ব্রাহ্মণ ও সংব্যবহারীদিগকেও বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন দেওয়া হইতেছে। এই সংব্যবহারীরা বিষয়, মণ্ডল বা গ্রামের রাজপ্রতিনিধির সহায়ক, কিন্তু রাজপুরুষ ঠিক নহেন। কোনো বিশেষ কারণে বা উপলক্ষে প্রয়োজন হইলে ইঁহারা আহূত হন এবং স্থানীয় রাজপ্রতিনিধিকে সাহায্য করেন। ২নং দামোদরপুর-লিপির সাক্ষ্য (৪৪৭-৪৮ খ্রী) প্রথম কুমারগুপ্তের ১নং দামোদরপুর-লিপিরই অনুরূপ। পাহাড়পুর পট্টোলীতেও (৪৭৮-৭৯ খ্রী) আয়ুক্তক ও পুস্তপালের উল্লেখ পাইতেছি, অধিষ্ঠানাধিকরণের উল্লেখও আছে এবং ভূমি মাপিয়া সীমা ঠিক করিয়া দিতে বলা হইয়াছে গ্রামের ব্রাহ্মণ, মহত্তর ও কুটুম্বিদিগকে। ৩নং ও ৪নং দামোদরপুর-লিপির (৪৮২-৮৩ খ্রী ; দ্বিতীয়টির তারিখ অজ্ঞাত) সাক্ষ্যও এইরূপই। বৈন্যগুপ্তের গুণাইঘর-লিপিতে (৫০৭-৮ খ্রী) পঞ্চাধিকরণোপরিক, পুরপালোপরিক, সান্ধিবিগ্রহাধিকরণ, কায়স্থ ইত্যাদি রাজপুরুষদের উল্লেখ দেখিতেছি ; অন্য কোনো শ্রেণীর লোকেদের উল্লেখ নাই। দত্ত ভূমি কোনও ব্যক্তিবিশেষ ক্রয় করিয়া পরে দান করিতেছেন কি না, সে-খবর উল্লিখিত অন্যান্য লিপিগুলিতে যেমন আছে, এই লিপিটিতে তেমন নাই ; শুধু আছে, নৈক মহারাজ রুদ্রদত্তের অনুরোধে মহারাজ বৈন্যগুপ্ত শাসন-নির্দিষ্ট ভূমি দান করিতেছেন। পরবর্তী শতকে ত্রিপুরায় প্রাপ্ত লোকনাথের পট্টোলিও ঠিক গুণাইঘর-লিপিরই অনুরূপ। ঠিক এই ক্রমটি দেখা যায় পাল ও সেন-যুগের লিপিগুলিতে। গুপ্তযুগের লিপিগুলি একটু অন্যরূপ ; সেখানে কোনও ব্যক্তিবিশেষ রাজসরকারের নিকট হইতে ভূমি কিনিয়া দান করিতেছেন এবং সেক্ষেত্রে রাজসরকারের অর্থলাভ এবং পুণ্যলাভ

দুইই হইতেছে (বৈগ্রাম-লিপি ও পাহাড়পুর-লিপি দ্রষ্টব্য ; "···অর্থোপচয়ো ধর্ম্মষড়্-ভাগাপ্যায়নঞ্চ ভবতি"—পাহাড়পুর-লিপি)। পাল ও সেন যুগে দানটা কিন্তু করিতেছেন রাজা স্বয়ং, কোনও ব্যক্তিবিশেষের অনুরোধে (ধর্মপালের খালিমপুর-লিপি এবং দামোদরদেবের চট্টগ্রাম-পট্টোলী দ্রষ্টব্য)। যাহাই হউক, গুণাইঘর-লিপি এবং সপ্তম শতকের লোকনাথের লিপি, ইহাদের উভয়েরই ধারাটা যেন পরবর্তী পাল ও সেন আমলের ; গুপ্ত আমলের অন্যান্য লিপি-নির্দিষ্ট ধারা যেন নয় ! গোপচন্দ্রের মল্লসারুল-লিপি সম্বন্ধেও মোটামুটি একই কথা বলা যাইতে পারে। যাহাই হউক, গুপ্ত আমলের লিপিগুলিতে আবার ফিরিয়া যাওয়া যাক। দামোদরপুরের ৫নং লিপি বক্ষ্যমাণ বিষয়ের সাক্ষ্য ব্যাপারে এই-স্থানে প্রাপ্ত অন্যান্য লিপির অনুরূপ। ফরিদপুরের ধর্মাদিত্য গোপচন্দ্র ও সমাচারদেব প্রভৃতির তাম্রপট্টোলীর সাক্ষ্য একটু অন্য প্রকার। ধর্মাদিত্যের ১নং শাসনে ভূমি-ক্রয়েচ্ছা জ্ঞাপন করা হইতেছে বিষয়-মহত্তরদিগকে, অর্থাৎ, বিষয়ের প্রধান প্রধান লোকেদের এবং অন্যান্য সাধারণ লোকেদের গ্রামীয় ভূমির দান-বিক্রয়ের খবর দেওয়া হইল। ধর্মাদিত্যের ২নং লিপিতে নূতন খবর কিছু নাই। গোপচন্দ্রের লিপিতে বিজ্ঞাপিত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রধানব্যাপারিণঃ অর্থাৎ স্থানীয় প্রধান ব্যাপারীদের উল্লেখ আছে। সমাচারদেবের ঘুগ্রাহাটি পট্টোলিতে নূতন খবর কিছু নাই। জয়নাগের বপ্যঘোষবাট পট্টোলীতেও তাহাই। লোকনাথের ত্রিপুরা-লিপিতে রাজপুরুষদের ছাড়া বিজ্ঞাপিত ব্যক্তিদের মধ্যে 'সপ্রধান-ব্যবহারিজনপদান্' অর্থাৎ স্থানীয় প্রধান ব্যবহারী ও জানপদদের নাম করা হইতেছে। অষ্টম শতকের খড়্গবংশীয় দেবখড়্গের আস্রফপুর-পট্টোলীতে বিষয়পতিদের সঙ্গে সঙ্গে কুটুম্ব-গৃহস্থদিগকেও বিজ্ঞাপিত করা হইতেছে।

এই বিশ্লেষণ হইতে আমরা যাহা পাইলাম, তাহা হইতে এক শ্রেণীর লোক আমরা পাইতেছি যাঁহারা রাজপুরুষ, রাজপ্রতিনিধি। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, কোথাও তাঁহাদের রাজপুরুষ বা রাজপ্রতিনিধি বলা হইতেছে না, এবং সেই ভাবে বিশেষ কোনও একটি শ্রেণীভুক্তও করা হইতেছে না। আর এক ধরনের লোকের উল্লেখ পাইতেছি, যাঁহারা বিশেষ প্রয়োজনে আহূত হইলে রাষ্ট্রব্যাপারে রাজপুরুষদের সহায়তা করিয়া থাকেন; ইঁহাদিগকে কোথাও ব্যবহারিণঃ, কোথাও সংব্যবহারিণঃ, বিষয়ব্যবহারিণঃ, প্রধান-ব্যবহারিণঃ ইত্যাদি বলা হইয়াছে। ইঁহাদের বৃত্তি কি ছিল, আমরা জানি না ; তবে ইহাই অনুমেয় যে, নানা বৃত্তির প্রধান প্রধান লোকেদেরই আহ্বান করা হইত ; বিষয় বা অধিষ্ঠান-অধিকরণের সভ্য, নগরশ্রেষ্ঠী, প্রথম সার্থবাহ, প্রথম কুলিক, ইঁহারাও সেই হিসাবে সংব্যবহারী, এবং কোনো কোনো পট্টোলীতে তাঁহারাও এই আখ্যায়ই উল্লিখিত হইয়াছেন। মহত্তর অর্থাৎ প্রধান প্রধান সম্পন্ন গৃহস্থ, কুটুম্ব অর্থাৎ সাধারণ গৃহস্থ, (তাঁহারা বিষয়েরই হোন্ বা গ্রামেরই হোন্ বা জনপদেরই হোন্), অক্ষুদ্রপ্রকৃতি বা শুধু প্রকৃতি অর্থাৎ প্রধান প্রধান অধিবাসি অথবা সাধারণ অধিবাসি প্রভৃতি যাঁহাদের উল্লেখ পাইতেছি, তাঁহাদের কাহারও

কি বৃত্তি ছিল, অনুমানের উপায় থাকিলেও সুনির্দিষ্টভাবে বলিবার উপায় নাই, কিংবা ইঁহারা কে কোন্ শ্রেণীর লোক, তাহাও জানা যায় না। তবে, রাজপুত্র ও রাজপ্রতিনিধি ছাড়া এমন কতকগুলি ব্যক্তির খবর পাওয়া গেল যাঁহাদের বৃত্তি সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নাই, যেমন, নগরশ্রেষ্ঠী, প্রথম সার্থবাহ ও প্রথম কুলিক। ইঁহাদের কথা আগেই বলিয়াছি। যে-ভাবে ইঁহাদের উল্লেখ পাইতেছি, তাহাতে ইঁহারা যে এক একটি বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর প্রতিভূ তাহা বুঝা যাইতেছে, এবং তাহা সমর্থিত হইতেছে গোপচন্দ্রের একটি পট্টোলিতে 'প্রধান-ব্যাপারিণঃ' বা প্রধান প্রধান ব্যবসায়ীদের উল্লেখ দ্বারা। রাজপুরুষ ও এই বণিক-ব্যবসায়ী-শিল্পীশ্রেণী ছাড়া আর একটি শ্রেণীর পরোক্ষ উল্লেখও আছে; সেটি ব্রাহ্মণদের। ইঁহাদের বৃত্তি কি ছিল, তাহাও সহজেই অনুমেয়; পূজা, ধর্মকর্ম ইত্যাদির জন্যই তো ইঁহারা ভূমিদান গ্রহণ করিতেছেন। অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনাও ইঁহাদের অন্যতম বৃত্তি ছিল। অবশ্য, ইঁহাদের মধ্যে অনেকে রাজপুরুষের বৃত্তি কিংবা অন্যান্য বৃত্তিও গ্রহণ করিতেন, লিপিগুলিতে তাহার প্রমাণও আছে, কিন্তু তাহা ব্যতিক্রম মাত্র; সাধারণ ভাবে এই সব বৃত্তি তাঁহাদের ছিল না এবং সর্বদাই লিপিগুলিতে তাঁহারা পৃথক্ ভাবে বর্ণবদ্ধ শ্রেণী হিসাবেই উল্লিখিত হইয়াছেন।

এইবার অষ্টম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত লিপিগুলি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এই দুই পর্বের, অর্থাৎ, পঞ্চম হইতে অষ্টম, এবং অষ্টম হইতে ত্রয়োদশ শতকের লিপিগুলির স্বরূপের মধ্যে পার্থক্য কোথায়, তাহা আগেই ইঙ্গিত করিয়াছি। এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

ধর্মপালের খালিমপুর শাসনে দেখিতেছি, নরপতি ধর্মপাল দুইটি গ্রাম দান করিতেছেন। দানের প্রার্থনা জানাইতেছেন মহাসামন্তাধিপতি শ্রীনারায়ণ বর্মা; দানের হেতু হইতেছে নারায়ণ বর্মা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নারায়ণবিগ্রহের পূজা এবং বিগ্রহের পূজারী লাট (গুজরাট) দেশীয় ব্রাহ্মণদের এবং মন্দির-ভৃত্যদের ব্যবহার। যাহাই হউক, এই দান এইভাবে বিজ্ঞাপিত করা হইতেছে:

"এষু চতুর্ষু গ্রামেষু সমুপগতান্ সর্বানেব রাজ-রাজনক-রাজপুত্র-রাজামাত্য-সেনাপতি-বিষয়পতি-ভোগপতি-ষষ্ঠাধিকৃত-দণ্ডশক্তি-দণ্ডপাশিক-চৌরোদ্ধরণিক-দৌঃসাধসাধনিক-দূতখোল-সমাগমিকা-ভিত্বরমাণ-হস্ত্যশ্ব-গোমহিষাজাবিকাধ্যক্ষ-নাকাধ্যক্ষ-বলাধ্যক্ষ-তরিক-শৌল্কিক-গৌল্মিক-তদাযুক্তক-বিনিযুক্তকাদি রাজপাদোপজীবিনোঽন্যাংশ্চাকীর্তিতান্ চাটভাটজাতীয়ান্ যথাকালাধ্যাসিনো জ্যেষ্ঠকায়স্থ-মহামহত্তর-দাশগ্রামিকাদি-বিষয়ব্যবহারিণঃ সকরণান্ প্রতিবাসিনঃ ক্ষেত্রকরাংশ্চ ব্রাহ্মণমাননাপূর্বকং যথার্হং মানয়তি বোধয়তি সমাজ্ঞাপয়তি চ।"

এই সূত্রটি খালিমপুর-লিপিতে প্রথম পাইলাম। ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত ভূমিদানের যত পট্টোলী আছে, তাহার প্রায় সবটিতেই এই ধরনের একটি সূত্র উল্লিখিত আছে; প্রভেদের মধ্যে দেখা যায়, কোথাও রাজপুরুষদের তালিকাটি সংক্ষিপ্ত, কোথাও বিস্তৃততর। এই বিস্তৃততর তালিকার আর উল্লেখ করিয়া লাভ নাই; তবে একটু আধটু নূতন

সংযোজনা কোথাও কোথাও আছে, সেগুলি আমাদের কাজে লাগিবার সম্ভাবনা আছে। কাজেই, যেখানে এই ধরনের নূতন সংযোজনা পাওয়া যাইবে, তাহাদের উল্লেখ করা প্রয়োজন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, দেবপালের মুঙ্গের-লিপিতে রাজপাদোপজীবীদের (এ ক্ষেত্রে বলা হইয়াছে, স্বাপদপদ্মোপজীবিনঃ) তালিকায় চাটভাটজাতীয় সেবকদের সঙ্গে উল্লেখ করা হইতেছে—"গৌড়-মালব-খস-হূণ-কুলিক-কর্ণাট লাট-চাটভাট-সেবকাদীন্-অন্যাংশ্চাকীর্তিতান্"; এবং প্রতিবাসি ও ব্রাহ্মণোত্তরদের সঙ্গে উল্লেখ করা হইতেছে,—"মহত্তর-কুটুম্ব-পুরোগমেদান্ধ্রকচণ্ডালপর্যন্তান্"। নারায়ণপালের ভাগলপুর-লিপিতেও ঠিক এই ধরনের উল্লেখ আছে। বস্তুত পালরাজাদের সমস্ত লিপিই এইরূপ। শুধু গৌড়-মালব-খস-হূণ প্রভৃতিদের সঙ্গে কোথাও কোথাও চোড়দেরও (মদনপালের মনহলিলিপি দ্রষ্টব্য) উল্লেখ আছে। চাটভাটদের জায়গায় চট্টভট্ট অথবা চাটভটদের উল্লেখ পাওয়া যায়; বৈদ্যদেবের কমৌলি-লিপিতে "ক্ষেত্রকরান্"-এর পরিবর্তে পাওয়া যায় "কর্ষকান্"। কিন্তু দশম শতকের কম্বোজরাজ নয়পালদেবের ইর্দা পট্টোলিতে বিজ্ঞাপিত ব্যক্তিদের নামের তালিকা একটু অন্যরূপ। এখানে উল্লেখ পাইতেছি, স্থানীয় "সকরণান্ ব্যবহারিণঃ"দের (কেরাণীকুল সহ অন্যান্য রাষ্ট্রসহায়কদের), কৃষক ও কুটুম্বদিগকে এবং ব্রাহ্মণদের। অন্যত্র যেমন, এখানেও তাহাই; ব্রাহ্মণদের যে বিজ্ঞাপিত করা হইতেছে ঠিক তাহা নয়, তাঁহাদের সম্মান জ্ঞাপনের পর (মাননাপূর্বকং) অন্যদের বিজ্ঞাপিত করা হইতেছে। আর, রাজমহিষী, যুবরাজ, মন্ত্রী, পুরোহিত, ঋত্বিক্, প্রাদেষ্টৃবর্গ, সকল শাসনাধ্যক্ষ, করণ (বা কেরাণী), সেনাপতি, সৈনিক সংঘমুখ্য, দূতবর্গ, গূঢ়পুরুষবর্গ, মন্ত্রপালবর্গ এবং অন্যান্য রাজকর্মচারীদের বলা হইতেছে এই দান মান্য করিবার জন্য।

সেনরাজাদের এবং সমসাময়িক অন্যান্য রাজবংশের লিপিগুলি সম্বন্ধে বলিবার বিশেষ কিছু নাই; বক্ষ্যমাণ বিষয়ে তাহাদের সাক্ষ্য পাল-লিপিগুলিরই অনুরূপ। তবে পাল ও সমসাময়িক অন্য রাজাদের লিপিতে যেখানে পাইতেছি প্রতিবাসিদের কথা, পরবর্তী লিপিগুলিতে ঠিক সেইখানেই আছে জনপদবাসি(জনপদান্ কিংবা জানপদান্)দের কথা। কিন্তু, একটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে করি। পাল ও সমসাময়িক অনেকগুলি লিপিতে দেখা যায়, বিজ্ঞাপিত ব্যক্তিদের মধ্যে ক্ষেত্রকর ইত্যাদির পরেই নিম্নস্তরের যে অগণিত লোক তাঁহাদিগকে সব একসঙ্গে গাঁথিয়া দিয়া বলা হইতেছে, "মেদান্ধ্রচণ্ডালপর্যন্তান্" অথবা "আচণ্ডালান্", অর্থাৎ, নিম্নতর স্তরের চণ্ডাল পর্যন্ত; অর্থাৎ বর্ণ-বিন্যাস অধ্যায়ে ম্লেচ্ছ ও অন্ত্যজ পর্যায়ে যতগুলি উপবর্ণের উল্লেখ আমরা পাইয়াছি তাহারা সকলেই ঐ "মেদান্ধ্রচণ্ডাল" পদের মধ্যেই উক্ত হইয়াছে। পরবর্তী লিপিগুলিতে, অর্থাৎ কম্বোজ-বর্মণ-সেন আমলের লিপিগুলিতে কিন্তু এই পদটি কোথাও নাই; চণ্ডাল পর্যন্ত নিম্নতম শ্রেণী ও বর্ণের অন্যান্য লোকেরা একেবারে অনুল্লিখিত। পাল

যুগের পরে সেন-আমলে রাষ্ট্রের ও সমাজের উচ্চস্তরের, অর্থাৎ, এক কথায় উৎপাদন ও বণ্টন কর্তাদের দৃষ্টিভঙ্গি যেন বদ্লাইয়া গিয়াছিল। এই অনুমান অস্বীকার করা কঠিন।

সমসাময়িক সাহিত্য

সমসাময়িক সাহিত্যেও এই শ্রেণী-বিন্যাসের চেহারা কিছুটা ধরিতে পারা যায়; পূর্ববর্তী বর্ণ-বিন্যাস অধ্যায়ে বর্ণ ও শ্রেণী এবং বর্ণ ও কোম প্রসঙ্গে তাহার আভাস দিতে চেষ্টা করিয়াছি। বৌদ্ধ চর্যাগীতিতে কয়েকটি আদিবাসি কোম ও উপবর্ণ এবং তাঁহাদের বৃত্তির ইঙ্গিত আছে; সেন আমলের দুই একটি লিপিতেও আছে। সমসাময়িক বঙ্গীয় স্মৃতি ও পুরাণে ইহারা অন্ত্যজ বা ম্লেচ্ছ পর্যায়ভুক্ত, এবং শুধু বর্ণ হিসাবেই নয়, অর্থনৈতিক শ্রেণী হিসাবেও ইহারা সমাজের নিম্নতম শ্রেণীর লোক; ইঁহাদের অনুসৃত বৃত্তিতেই তাহা পরিষ্কার। মেদ, অন্ধ্র, ও চণ্ডালদের মত কোল, পুলিন্দ, পুক্কস, শবর, বরুড় (বাউড়ী ?), চর্মকার, ঘট্টজীবী, ডোলাবাহী (দুলিয়া, দুলে') ব্যাধ, হড্ডি (হাড়ি), ডোম, জোলা, বাগাতীত (বাগ্দী ?), ইত্যাদি সকলেই সমাজের শ্রমিক-সেবক, আজিকার দিনের ভাষায় দিনমজুর, এবং আজিকার মতই ভূমি-হীন প্রজা। ইঁহাদের অব্যবহিত উপরের স্তরেই আর একটি শ্রেণীর আভাস ধরিতে পারা যায়; ইঁহারা বিভিন্ন উপবর্ণে বিভক্ত, প্রত্যেকের পৃথক পৃথক বৃত্তি ও উপজীবিকা। কিন্তু লক্ষ্যণীয় এই যে, ইঁহারা প্রায় সকলেই বৃহদ্ধর্মপুরাণের মধ্যম-সংকর এবং ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণের অসৎশূদ্র পর্যায়ভুক্ত। ইঁহাদের মধ্যে শিল্পজীবীও আছেন, কৃষিজীবীও আছেন, এমন কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীও নাই, এমন নয়; শিল্পজীবী, যেমন, তক্ষণ, সূত্রধার, চিত্রকার, অট্টালিকাকার, কোটক ইত্যাদি; কৃষিজীবী, যেমন রজক, আভীর (বিদেশী কোম), নট, পৌণ্ডক (পোদ ?), কোয়ালী, মাংসচ্ছেদ ইত্যাদি, ব্যবসায়ী, যেমন, তৈলকার, শৌণ্ডিক (শুঁড়ি), ধীবর-জালিক ইত্যাদি। নিজ নিজ বৃত্তিই ইঁহাদের জীবিকা সন্দেহ নাই, কিন্তু জীবিকার জন্য ইঁহারা কমবেশী আংশিকত কৃষিনির্ভরও ছিলেন, এরূপ অনুমান অত্যন্ত স্বাভাবিক। ইঁহাদের বৃত্তিগুলির প্রত্যেকটিই সামাজিক কর্তব্য; সেই কর্তব্যের বিনিময়ে ইঁহারা ভূমির উপর অথবা ভূমিলব্ধ দ্রব্যাদির উপর আংশিক অধিকার ভোগ করিতেন, এই অনুমানও স্বাভাবিক। ইঁহারাই অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের অস্থায়ী প্রজা, ভাগ-চাষী ইত্যাদি। অস্থায়ী প্রজা ও ভাগচাষের প্রজা যে ছিল, তাহা তো ভূমি বিন্যাস অধ্যায়েই আমরা দেখিয়াছি। উন্নত সমাজাধিকার বা উৎপাদন ও বণ্টন-কর্তৃত্ব যে ইঁহাদের নাই তাহা বর্ণ-বিন্যাসের স্তর হইতেও কতকটা অনুমান করা যায়। ইঁহাদেরই অব্যবহিত উপরের স্তরে ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারী, ভূমিস্বত্ববান কৃষক বা ক্ষেত্রকর, শিল্পী, ব্যবসায়ী, করণ-কায়স্থ-বৈদ্যক-গোপ-যুদ্ধ-চারণ প্রভৃতি বৃত্তিধারী বিভিন্ন লোক লইয়া

একটি বৃহৎ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের পরিচয়ও বৃহদ্ধর্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের বর্ণতালিকায় মধ্যে ধরিতে পারা কঠিন নয়। তাহা ছাড়া, শিক্ষাদীক্ষা-ধর্মকর্মবৃত্তিধারী ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ যতি সম্প্রদায় তো ছিলেনই।

৪

বিবর্তন ও পরিণতি, রাজপাদোপজীবী শ্রেণী

এই বিশ্লেষণের ফলে কি পাওয়া গেল, তাহা এইবার দেখা যাইতে পারে। রাজপুরুষদের লইয়াই আরম্ভ করা যাক। পঞ্চম হইতে সপ্তম শতক পর্যন্ত লিপি-গুলিতে দেখিয়াছি, বিভিন্ন রাজপুরুষদের উল্লেখ আছে। মহারাজাধিরাজের অধীনে রাজা, রাজক, রাজনক-রাজন্যাক, সামন্ত-মহাসামন্ত, মাণ্ডলিক-মহামাণ্ডলিক, এই সব লইয়া যে অনন্ত সামন্তচক্র ইঁহারাও রাজপাদোপজীবী। রাজা-রাজনক রাজপুত্র হইতে আরম্ভ করিয়া তরিক-শৌল্কিক-গৌল্মিক প্রভৃতি নিম্নস্তরের রাজকর্মচারী পর্যন্ত সকলের উল্লেখই শুধু নয়, তাঁহাদের সকলকে একত্রে একমালায় গাঁথিয়া বলা হইয়াছে "রাজপাদোপজীবিনঃ", এবং সুদীর্ঘ তালিকায়ও যখন সমস্ত রাজপুরুষের নাম শেষ হয় নাই, তখন তাহার পরই বলা হইয়াছে "অধ্যক্ষপ্রচারোক্তানিহকীর্তিতান", অর্থাৎ আর যাঁহাদের কথা এখানে কীর্তিত বা উল্লিখিত হয় নাই কিন্তু তাঁহাদের নাম (অর্থশাস্ত্র জাতীয় গ্রন্থের) অধ্যক্ষ পরিচ্ছেদে উল্লিখিত আছে। এই যে সমস্ত রাজপুরুষকে একসঙ্গে গাঁথিয়া একটি সীমিত শ্রেণীতে উল্লেখ করা, তাহা পাল আমলেই যেন প্রথম আরম্ভ হইল ; অথচ আগেও রাজপুরুষ, রাজপাদোপজীবীরা ছিলেন না, তাহা তো নয়। বোধ হয়, এইরূপভাবে উল্লেখের কারণ আছে। মোটামুটি সপ্তম শতকের সূচনা হইতে গৌড় স্বাধীন, স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় সত্তা লাভ করে ; বঙ্গ এই সত্তার পরিচয় পাইয়াছিল ষষ্ঠ শতকের তৃতীয় পাদ হইতে। যাহা হউক, সপ্তম শতকেই সর্বপ্রথম বাঙলাদেশ নিজস্ব রাষ্ট্র লাভ করিল, নিজস্ব শাসনতন্ত্র গড়িয়া তুলিল। গৌড় ও কর্ণসুবর্ণাধীপ শশাঙ্ককে আশ্রয় করিয়াই তাহার সূচনা দেখা গেল ; কিন্তু তাহা স্বল্পকালের জন্য মাত্র। কারণ, তাহার পরই অর্ধ শতাব্দীরও অধিককাল ধরিয়া সমস্ত দেশ জুড়িয়া রাষ্ট্রীয় আবর্ত, মাৎস্যন্যায়ের উৎপীড়ন। এই মাৎস্যন্যায় পর্বের পর পাল রাষ্ট্র ও পাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই বাঙলাদেশ আবার আত্মসম্বিৎ ফিরিয়া পাইল, নিজের রাষ্ট্র ও রাজ্য লাভ করিল, রাষ্ট্রীয় স্বাজাত্য ফিরিয়া পাইল, এবং পাইল পূর্ণতর বৃহত্তর রূপে। মর্যাদায় ও আয়তনে, শক্তিতে ও ঐক্যবোধে বাঙলাদেশ নিজের এই পূর্ণতর বৃহত্তর রূপ আগে কখনও দেখে নাই। বোধ হয়, এই কারণেই রাষ্ট্র ও রাজপাদপোজীবীদের শুধু সবিস্তার উল্লেখই নয়, শাসনযন্ত্রের যাঁহারা পরিচালক ও সেবক, তাঁহারা নূতন এক মর্যাদার অধিকারী হইলেন, এবং তাঁহাদিগকে

একত্র গাঁথিয়া স্বসীমায় সুনির্দিষ্ট একটি শ্রেণীর নামকরণ করাটাও সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া উঠিল। যাহাই হউক, সোজাসুজি রাজপাদপোজীবী অর্থাৎ সরকারী চাকুরীয়াদের একটা সুস্পষ্ট শ্রেণীর খবর এই আমরা প্রথম পাইলাম।

ভূম্যধিকারীর শ্রেণীস্তর

রাজপাদপোজীবী সকলেই আবার একই অর্থনৈতিক স্তরভুক্ত ছিলেন না, ইহা তো সহজেই অনুমেয়। ইহাদের মধ্যে সকলের উপরে ছিলেন রাণক, রাজনক, মহাসামন্ত, সামন্ত, মাণ্ডলিক, মহামাণ্ডলিক ইত্যাদি সামন্ত প্রভুরা; স্ব স্ব নির্দিষ্ট জনপদে ইঁহাদের প্রভুত্ব মহারাজাধিরাজাপেক্ষা কিছু কম ছিল না। সর্বপ্রধান ভূস্বামী মহাসামন্ত-মহা-মাণ্ডলিকেরা; তাঁহাদের নীচেই সামন্ত-মাণ্ডলিকেরা—সামন্তসৌধের দ্বিতীয় স্তর। তৃতীয় স্তরে মহামহত্তরেরা—বৃহৎভূস্বামীর দল; চতুর্থ স্তরে মহত্তর ইত্যাদি, অর্থাৎ, ক্ষুদ্র ভূস্বামীর দল এবং তাহার পর ধাপে ধাপে নামিয়া কুটুম্ব অর্থাৎ সাধারণ গৃহস্থ বা ভূমিবান্‌প্রজা, ভাগীপ্রজা, ভূমিবিহীন প্রজা ইত্যাদি। মহাসামন্ত, মহামাণ্ডলিক, সামন্ত, মাণ্ডলিক—ইঁহারা সকলেই সাক্ষাৎভাবে রাজপাদপোজীবী: কিন্তু মহামহত্তর, মহত্তর, কুটুম্ব প্রভৃতিরা রাজপাদপোজীবী নহেন, রাজসেবক মাত্র। রাষ্ট্রের প্রয়োজনে আহূত হইলে রাজপুরুষদের সহায়তা ইঁহারা করিতেন, এমন প্রমাণ পঞ্চম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় সকল লিপিতেই পাওয়া যায়।

রাজসেবক শ্রেণী

পূর্বোক্ত রাজপাদোপজীবী শ্রেণীর বাহিরে আর একটি শ্রেণীর খবর আমরা পাইতেছি; অষ্টম শতক-পূর্ব লিপিগুলিতে এই শ্রেণীর লোকেদের খবর পাওয়া যায়। ইঁহারা রাজসরকারে চাকুরি করিতেন কিনা ঠিক বলা যায় না, তবে রাষ্ট্রের প্রয়োজনে আহূত হইলে রাজপুরুষদের সহায়তা করিতেন, তাহা বুঝা যায়; ইঁহাদের উল্লেখ আগেই করা হইয়াছে। পাল ও সেন আমলের লিপিগুলিতেও ইহাদের উল্লেখ আছে, কিন্তু এখানে ইঁহারা উল্লিখিত হইতেছেন রাষ্ট্রসেবকরূপে। ইঁহারা হইতেছেন, জ্যেষ্ঠকায়স্থ, মহামহত্তর, মহত্তর, দাশগ্রামিক, করণ, বিষয়-ব্যবহারী ইত্যাদি। কোনো কোনো লিপিতে মহত্তর, মহামহত্তর ইত্যাদি স্থানীয় ব্যক্তিদের এই শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে উল্লেখ করা হয় নাই, কিন্তু চাটভাট ইত্যাদি অন্যান্য নিম্নস্তরের রাজকর্মচারীরা সর্বদাই সেবকাদি অর্থাৎ (রাজ)-সেবকরূপে উল্লিখিত হইয়াছেন। অষ্টম শতক-পূর্ব লিপিগুলির জ্যেষ্ঠ-কায়স্থ বা প্রথম কায়স্থ তো রাজপুরুষ বলিয়াই মনে হয়; যে পাঁচ জন মিলিয়া স্থানীয় অধিকরণ গঠন করেন, তিনি ছিলেন তাঁহাদের একজন। পরবর্তীকালে রাজপুরুষ না হইলেও তিনিও যে একজন রাজসেবক, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই (রাজ)-সেবকদের

মধ্যে গৌড়-মালব-খস-হূণ-কুলিক-কর্ণাট-লাট-চোড় ইত্যাদি জাতীয় ব্যক্তিদের উল্লেখ পাইতেছি। ইঁহারা কাহারা ? এটুকু বুঝিতেছি, ইঁহারাও কোনো উপায়ে রাষ্ট্রের সেবা করিতেন। যে-ভাবে ইঁহাদের উল্লেখ পাইতেছি, আমার তো মনে হয়, এই সব ভিন্-প্রদেশ লোকেরা বেতনভুক্ সৈন্যরূপে রাষ্ট্রের সেবা করিতেন। পুরোহিতরূপে লাট বা গুজরাটদেশীয় ব্রাহ্মণদের উল্লেখ তো খালিমপুর-লিপিতেই আছে। কিন্তু ঐ দেশীয় সৈন্যরাও এদেশে রাজসৈনিকরূপে আসিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। বিভিন্ন সময়ে অন্য প্রদেশ হইতে যে-সব যুদ্ধাভিযান বাঙলা দেশে আসিয়াছে, যেমন কর্ণাটীদের, তাহাদের কিছু কিছু সৈন্য এদেশে থাকিয়া যাওয়া অসম্ভব নয়। অবশ্য, অন্যান্য বৃত্তি অবলম্বন করিয়াও যে তাঁহারা আসেন নাই, তাহাও বলা যায় না। তবে, যে ভাবেই হউক, এদেশে তাঁহারা যে-বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা রাজসেবকের বৃত্তি। অবশ্য, সমাজের সঙ্গে ইঁহাদের সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ ছিল বলিয়া মনে হয় না।

যাহাই হউক, রাজপাদোপজীবী শ্রেণীরই আনুষঙ্গিক বা ছায়ারূপে পাইলাম রাজসেবকশ্রেণী। এই দুই শ্রেণীর সমস্ত লোকেরাই এক স্তরের ছিলেন না, পদমর্যাদা এবং বেতনমর্যাদাও এক ছিল না, তাহা তো সহজেই অনুমান করা যায়। উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন স্তরের বিত্ত ও মর্যাদার লোক এই উভয় শ্রেণীর মধ্যেই ছিল ; কিন্তু যে স্তরেরই হউক, ইঁহাদের স্বার্থ ও অস্তিত্ব রাষ্ট্রের সঙ্গেই যে একান্তভাবে জড়িত ছিল, তাহা স্বীকার করিতে কল্পনার আশ্রয় লইবার প্রয়োজন নাই।

আমলাতন্ত্রের শ্রেণীস্তর

রাজপাদোপজীবী শ্রেণীর বিভিন্ন স্তরগুলি ধরিতে পারা কঠিন নয়। মহাসামন্ত, মহামাণ্ডলিক, সামন্ত, মাণ্ডলিক প্রভৃতির কথা আগেই বলিয়াছি। ইঁহাদের নীচের স্তরেই পাইতেছি উপরিক বা ভুক্তিপতি, বিষয়পতি, মণ্ডলপতি, অমাত্য, সান্ধিবিগ্রহিক, মন্ত্রী, মহামন্ত্রী, ধর্মাধ্যক্ষ, দণ্ডনায়ক, মহাদণ্ডনায়ক, দৌঃসাধসাধনিক, দূত, দূতক, পুরোহিত, শান্ত্যাগারিক, রাজপণ্ডিত, কুমারামাত্য, মহাপ্রতীহার, মহাসেনাপতি, রাজামাত্য, রাজস্থানীয়, ইত্যাদি। সুবৃহৎ আমলাতন্ত্রের ইঁহারাই উপরতম স্তর এবং ইঁহাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ, অর্থাৎ, শ্রেণীস্বার্থ একদিকে যেমন রাষ্ট্রের সঙ্গে জড়িত, তেমনই অন্যদিকে ক্ষুদ্র বৃহৎ ভূস্বামীদের সঙ্গে। এই উপরতম স্তরের নীচেই একটি মধ্যবিত্ত, মধ্যক্ষমতাধিকারী রাজকর্মচারীর স্তর ; এই স্তরে বোধ হয় অগ্রহারিক, ঔদ্রঙ্গিক, আবসথিক, চৌরোদ্ধরণিক, বলাধ্যক্ষ, নাবাধ্যক্ষ, দাণ্ডিক, দণ্ডপাশিক, দণ্ডশক্তি, দশাপরাধিক, গ্রামপতি, জ্যেষ্ঠকায়স্থ, খণ্ডরক্ষ, খোল, কোট্টপাল, ক্ষেত্রপ, প্রমাতৃ, প্রান্তপাল, ষষ্ঠাধিকৃত ইত্যাদি। ইঁহাদের নিম্নবর্তী স্তরে শৌল্কিক, গৌল্মিক, গ্রামপতি, হট্টপতি, লেখক, শিরোরক্ষিক, শান্তিকিক, বাসাগারিক, পিলুপতি, ইত্যাদি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রে এই সব

রাজপুরুষদের ক্ষমতা ও মর্যাদার তারতম্য হইত, ইহা সহজেই অনুমেয়। সর্বনিম্ন স্তরও একটি নিশ্চয়ই ছিল ; এই স্তরে স্থান হইয়াছিল ক্ষুদ্রতম রাষ্ট্রসেবকদলের, এবং এই দলে হূণ-মালব-খস-লাট-কর্ণাট-চোড় ইত্যাদি বেতনভুক্ সৈন্যরা ছিলেন, ক্ষুদ্র করণ বা কেরাণীরা ছিলেন, চাটভাটেরা ছিলেন এবং ছিলেন আরও অনেকে।

মহামহত্তর, মহত্তর, কুটুম্ব, প্রতিবাসি, জনপদবাসি ইত্যাদিরা কোন্ শ্রেণীর লোক ছিলেন, ইঁহাদের বৃত্তি কি ছিল ? ইঁহাদের অধিকাংশই যে বিভিন্ন স্তরের ভূম্যধিকারী ছিলেন, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার অবসর কম। শাসনাবলীতে উল্লিখিত রাজপাদোপজীবী, ক্ষেত্রকর, ব্রাহ্মণ এবং নিম্নস্তরের চণ্ডাল পর্যন্ত লোকেদের বাদ দিলে যাঁহারা বাকী থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ ভূমিসম্পদে, এবং অল্পসংখ্যক ব্যক্তিগত গুণে ও চরিত্রে সমাজে মান্য ও সম্পন্ন হইয়াছিলেন ; তাঁহারাই মহামহত্তর ইত্যাদি আখ্যায় ভূষিত হইয়াছেন এরূপ মনে করিলে অন্যায় হয় না। কুটুম্ব, প্রতিবাসি, জনপদবাসি—ইঁহারা সাধারণভাবে স্বল্পভূমিসম্পন্ন গৃহস্থ ; কৃষি, গৃহ-শিল্প ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসা ইঁহাদের বৃত্তি ও জীবিকা। কৃষি ইঁহাদের বৃত্তি বলিলাম বটে, কিন্তু ইঁহারা নিজেরা নিজেদের হাতে চাষের কাজ করিতেন বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না যদিও ভূমির মালিক তাঁহারা ছিলেন। চাষের কাজ নিজে যাঁহারা করিতেন, তাঁহারা ক্ষেত্রকর, কর্ষক, কৃষক বলিয়াই পৃথকভাবে উল্লিখিত হইয়াছেন। অষ্টম শতকের দেবখড়্গের আস্রফপুর লিপির একটি স্থানে দেখিতেছি, ভূমি ভোগ করিতেছেন একজন, কিন্তু চাষ করিতেছে অন্য লোকেরা—"শ্রীশর্বান্তরেণ ভুজ্যমানকঃ মহত্তরেশিখরাদিভিঃ কৃষ্যমাণকঃ" (এখানে মহত্তরে একজন ব্যক্তির নাম)। এই ব্যবস্থা শুধু এখন নয়, প্রাচীন কালে এবং মধ্যযুগেও প্রচলিত ছিল। বস্তুত, যিনি ভূমির মালিক, তাঁহার পক্ষে নিজের হাতেই সমস্ত ভূমি রাখা এবং নিজেরাই চাষ করা কিছুতেই সম্ভব ছিল না। জমি নানা শর্তে বিলিবন্দোবস্ত করিতেই হইত, সে ইঙ্গিত পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে ইতিপূর্বেই করিয়াছি। সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত বিশ্বরূপসেনের এক লিপিতে দেখিতেছি, হলায়ুধ শর্মা নামক জনৈক আবল্লিক মহাপণ্ডিত ব্রাহ্মণ একা নিজের ভোগের জন্য নিজের গ্রামের আশে পাশে তিন চারিটি ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে ৩৩৬½ উন্মান ভূমি রাজার নিকট হইতে দানস্বরূপ পাইয়াছিলেন ; এই ভূমির বার্ষিক আয় ছিল ৫০০ কপর্দক পুরাণ। এই ৩৩৬½ উন্মানের মধ্যে অধিকাংশ ছিল নালভূমি অর্থাৎ চাষের ক্ষেত্র। ইহা তো সহজেই অনুমেয় যে, এই সমগ্র ভূমি হলায়ুধ শর্মার সমগ্র পরিবার পরিজনবর্গ লইয়াও নিজেদের চাষ করা সম্ভব ছিল না, এবং হলায়ুধ শর্মা ক্ষেত্রকর বলিয়া উল্লিখিতও হইতে পারেন না। তাঁহাকে জমি নিম্নপ্রজাদের মধ্যে বিলি বন্দোবস্ত করিয়া দিতেই হইত। এই নিম্নপ্রজাদের মধ্যে যাঁহারা নিজেরা চাষ-বাস করেন, তাঁহারাই ক্ষেত্রকর। এইখানে এই ধরনের একটা অনুমান যদি করা যায় যে,

সমাজের মধ্যে ভূমি-সম্পদে ও শিল্প-বাণিজ্যাদি সম্পদে সমৃদ্ধ নানা স্তরের একটা শ্রেণীও ছিল এবং এই শ্রেণীরই প্রতিনিধি হইতেছেন মহত্তর, মহামহত্তর, কুটুম্ব ইত্যাদি ব্যক্তিরা, তাহা হইলে ঐতিহাসিক তথ্যের বিরোধী বোধ হয় কিছু বলা হয় না। বরং যে প্রমাণ আমাদের আছে, তাহার মধ্যে তাহার ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন, এ-কথা স্বীকার করিতে হয়।

ধর্ম ও জ্ঞানজীবী শ্রেণী

ব্রাহ্মণেরা বর্ণ হিসাবে যেমন শ্রেণী হিসাবেও তেমনই পৃথক শ্রেণী ; এবং এই শ্রেণীর উল্লেখ তো পরিষ্কার। দান-ধ্যান-ক্রিয়াকর্ম যাহা কিছু করা হইতেছে, ইঁহাদের সম্মাননা করার পর। ভূমিদান ইঁহারাই লাভ করিতেছেন, ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ রাজপাদোপজীবী শ্রেণীতে উল্লিখিত হইয়াছেন ; মন্ত্রী, এমন কি, সেনাপতি, সামন্ত, মহাসামন্ত, আবস্থিক, ধর্মাধ্যক্ষ ইত্যাদিও হইয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহারা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। সাধারণ নিয়মে ইঁহারা পুরোহিত, ঋত্বিক, ধর্মজ্ঞ, নীতিপাঠক, শান্ত্যাগারিক, শান্তিবারিক, রাজপণ্ডিত, ধর্মজ্ঞ, স্মৃতি ও ব্যবহারশাস্ত্রাদির লেখক, প্রশস্তিকার, কাব্য, সাহিত্য ইত্যাদির রচয়িতা। ইঁহাদের উল্লেখ পাল ও সেন আমলের লিপিগুলিতে, সমসাময়িক সাহিত্যে বারংবার পাওয়া যায়। এই ব্রাহ্মণ-শাসিত ব্রাহ্মণ্যধর্ম ছাড়া পাল আমলের শেষ পর্যন্ত বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রাধান্যও কম ছিল না। ব্রাহ্মণেরা যেমন শ্রেণী-হিসাবে সমাজের ধর্ম, শিক্ষা, নীতি ও ব্যবহারের ধারক ও নিয়ামক ছিলেন, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মসংঘগুলিও ঠিক তেমনই সমাজের কতকাংশের ধর্ম, শিক্ষা ও নীতির ধারক ও নিয়ামক ছিল, এবং তাঁহাদের পোষণের জন্যও রাজা ও অন্যান্য সমর্থ ব্যক্তিরা ভূমি ইত্যাদি দান করিতেন; ভূমিদান, অর্থদান ইত্যাদি গ্রহণ করিয়া তাঁহারা প্রচুর ভূমি ও অর্থ সম্পদের অধিকারী হইতেন, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। এই বৌদ্ধ-জৈন স্থবির ও সংঘ-সভ্যদের এবং ব্রাহ্মণদের লইয়া প্রাচীন বাঙলার বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞান-ধর্মজীবী শ্রেণী।

কৃষক বা ক্ষেত্রকর শ্রেণী

ক্ষেত্রকর শ্রেণীর কথা তো প্রসঙ্গক্রমে আগেই বলা হইয়াছে। অষ্টম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া যতগুলি লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের প্রায় প্রত্যেকটিতেই ক্ষেত্রকরদের বা কৃষক-কর্ষকদের উল্লেখ আছে। অথচ আশ্চর্য এই, অষ্টম শতকের আগে প্রায় কোনও লিপিতেই ইঁহাদের উল্লেখ নাই, যদিও উভয় যুগের লিপিগুলি, একাধিকবার বলিয়াছি, ভূমি ক্রয়-বিক্রয় ও দানেরই পট্টোলী। এ তর্ক করা চলিবে না যে, ক্ষেত্রকর বা কৃষক পূর্ববর্তী যুগে ছিল না, পরবর্তী যুগে হঠাৎ দেখা দিল। খিল অথবা ক্ষেত্রভূমি দান ক্রয়-বিক্রয় যখন হইতেছে, চাষের জন্যই হইতেছে। এ-সম্বন্ধে তর্কের সুযোগ কোথায় ? আর, ভূমি দান বিক্রয় যদি মহত্তর, কুটুম্ব, শিল্পী, ব্যবসায়ী, রাজপুরুষ, সাধারণ ও

অসাধারণ (প্রকৃতয়ঃ এবং অক্ষুদ্র-প্রকৃতয়ঃ) লোক, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি সকলকে বিজ্ঞাপিত করা যায়, তাহা হইলে ভূমিব্যাপারে যাঁহার স্বার্থ সকলের চেয়ে বেশি, সেই কর্ষকের উল্লেখ নাই কেন? আর, অষ্টম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী লিপিগুলিতে তাঁহাদের উল্লেখ আছে কেন? তর্ক তুলিতে পারা যায়, পূর্ববর্তী যুগের লিপিগুলিতে কৃষকদের অনুল্লেখের কথা যাহা বলিতেছি, তাহা সত্য নয়; কারণ তাঁহারা হয় তো ঐ গ্রামবাসি কুটুম্ব, গৃহস্থ, প্রকৃতয়ঃ অর্থাৎ সাধারণ লোক, ইঁহাদের মধ্যেই তাঁহাদের উল্লেখ আছে। ইহার উত্তর হইতেছে, তাহা হইলে এই সব কুটুম্ব, প্রতিবাসি, জনপদবাসি জনসাধারণের কথা তো অষ্টম শতক-পরবর্তী লিপিগুলিতেও আছে, তৎসত্ত্বেও পৃথক্‌ভাবে ক্ষেত্রকরদের, কৃষকদের উল্লেখ আছে কেন? আমার কিন্তু মনে হয়, পঞ্চম হইতে সপ্তম শতক পর্যন্ত লিপিগুলিতে কৃষকদের অনুল্লেখ এবং পরবর্তী লিপিগুলিতে প্রায় আবশ্যিক উল্লেখ একেবারে আকস্মিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। ইহার একটা কারণ আছে এবং এই কারণের মধ্যে প্রাচীন বাঙলার সমাজ-বিন্যাসের ইতিহাসের একটু ইঙ্গিত আছে। একটু বিস্তারিত-ভাবে সেটি বলা প্রয়োজন।

ভূমি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে পূর্বতন একটি অধ্যায়ে আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, লোক-সংখ্যা বৃদ্ধির জন্যই হউক বা অন্য কোনো কারণেই হউক—অন্যতম একটি কারণ পরে বলিতেছি—সমাজে ভূমির চাহিদা ক্রমশ বাড়িতেছিল, সমাজের মধ্যে ব্যক্তিবিশেষকে কেন্দ্র করিয়া ভূমি কেন্দ্রীকৃত হইবার দিকে একটা ঝোঁক একটু একটু করিয়া দেখা দিতেছিল। সামাজিক ধনোৎপাদনের ভারকেন্দ্রটি ক্রমশ যেন ভূমির উপরই আসিয়া পড়িয়াছিল; পাল ও বিশেষ করিয়া সেন-আমলের লিপিগুলি তন্ন তন্ন করিয়া পড়িলে এই কথাই মনের মধ্যে জুড়িয়া বসিতে চায়। কোন্ ভূমির উৎপন্ন দ্রব্য কি, কোন্ ভূমির দাম কত, বার্ষিক আয় কত, ইত্যাদি সংবাদ খুঁটিনাটি সহ সবিস্তারে যে-ভাবে দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে সমাজের কৃষি-নির্ভরতার ছবিটাই যেন দৃষ্টি ও বুদ্ধি অধিকার করিয়া বসে। তাহা ছাড়া জনসংখ্যা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন ভূমির আবাদ, জঙ্গল কাটিয়া গ্রাম বসাই-বার ও চাষের জন্য জমি বাহির করিবার চেষ্টাও চোখে পড়ে। বস্তুত, তেমন প্রমাণও দু'একটি আছে; দৃষ্টান্তস্বরূপ সপ্তম শতকের লোকনাথের ত্রিপুরা-পট্টোলীর উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই ক্রমবর্ধমান কৃষিনির্ভরতার প্রতিচ্ছবি সামাজিক শ্রেণী-বিন্যাসের মধ্যে ফুটিয়া উঠিবে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই, এবং পাল ও সেন-আমলের লিপিগুলিতে তাহাই হইয়াছে। সপ্তম শতক পর্যন্ত লিপিগুলিতে বর্ণিত ও উল্লিখিত ব্যক্তিদের মধ্যে পৃথক ও সুনির্দিষ্টভাবে কৃষক বা ক্ষেত্রকর বলিয়া যে কাহারও উল্লেখ নাই তাহার কারণ এই নয় যে, তখন কৃষক ছিল না, কৃষিকর্ম হইত না; তাহার যথার্থ ঐতিহাসিক কারণ, সমাজ তখন একান্তভাবে কৃষিনির্ভর হইয়া উঠে নাই, এবং কৃষক বা ক্ষেত্রকর সমাজের মধ্যে থাকিলেও তাঁহারা তখনও একটা বিশেষ অথবা উল্লেখযোগ্য

শ্রেণী হিসাবে গড়িয়া উঠেন নাই। আমার এই যে অনুমান তাহার সবিশেষ সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ঐতিহাসিক গবেষণার বর্তমান অবস্থায় দেওয়া সম্ভব নয়; কিন্তু আমি যে-যুক্তির মধ্যে এই অনুমান প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিলাম তাহা সমাজতাত্ত্বিক যুক্তি নিয়মের বহির্ভূত, পণ্ডিতেরা আশা করি তাহা বলিবেন না।

যাহাই হউক, এই পর্যন্ত শ্রেণী-বিন্যাসের যে-তথ্য আমরা পাইলাম তাহাতে দেখিতেছি, রাজপাদোপজীবীরা একটি সুসংবদ্ধ, সুস্পষ্ট সীমারেখায় নির্দিষ্ট একটি শ্রেণী, এবং তাঁহাদেরই আনুষঙ্গিক ছায়ারূপে আছেন (রাজ)-সেবক শ্রেণী। ইঁহারা রাষ্ট্রযন্ত্রের পরিচালক ও সহায়ক। ইঁহাদের মধ্যে আবার বিভিন্ন অর্থনৈতিক স্তর বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞান-ধর্মজীবীরা আর একটি শ্রেণী; ইঁহারা সাধারণভাবে জ্ঞান-ধর্ম-সংস্কৃতির ধারক ও নিয়ামক। ইঁহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণদের সংখ্যাই অধিক; বৌদ্ধ এবং জৈনধর্মের সংঘগুরু এবং যতিরাও আছেন, সিদ্ধাচার্যরা আছেন, এবং স্বল্পসংখ্যক করণ-কায়স্থ, বৈদ্য, এবং উত্তম-সংকর বা সংশূদ্র পর্যায়ের কিছু কিছু লোকও আছেন। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, লক্ষ্মণসেনের অন্যতম সভাকবি ধোয়ী তন্তুবায় ছিলেন, এবং সমসাময়িক অন্য আর একজন কবি, জনৈক পপীপ, জাতে ছিলেন কেবট্ট বা কৈবর্ত। ব্রহ্মদেয় অথবা ধর্মদেয় ভূমি, দক্ষিণালব্ধ ধন ও সাময়িক পুরস্কার হইল এই শ্রেণীর প্রধান আর্থিক নির্ভর। ভূম্যধিকারীর একটি শ্রেণীও অল্পবিস্তর সুস্পষ্ট, এবং এই শ্রেণীও বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত। সর্বোপরি স্তরে সামন্ত শ্রেণী এবং নীচে স্তরে স্তরে মহামহত্তর, মহত্তর ইত্যাদি ভূমিসম্পৃক্ত অভিজাত শ্রেণী হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে কুটুম্ব ও প্রধান প্রধান গৃহস্থ পর্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূস্বামীর স্তর। ইঁহারা, বিশেষভাবে নিম্নতর স্তরের ভূস্বামীরাই শাসনোক্ত 'অক্ষুদ্র প্রকৃতয়ঃ'। চতুর্থ একটি শ্রেণী হইতেছে ক্ষেত্রকর বা কৃষকদের লইয়া। দেশের ধনোৎপাদনের অন্যতম উপায় ইঁহাদের হাতে; কিন্তু বণ্টন ব্যাপারে ইঁহাদের কোন হাত নাই; ইঁহারা অধিকাংশই স্বল্পমাত্র ভূমির অধিকারী অথবা ভাগচাষী ও ভূমিহীন চাষী। পাল ও সেন লিপিতে পঞ্চম একটি শ্রেণীর উল্লেখ আছে; এই শ্রেণীর লোকেরা সমাজের শ্রমিক-সেবক, অধিকাংশই ভূমি-বঞ্চিত, রাষ্ট্রীয়-সামাজিক অধিকার বঞ্চিত। এই শ্রেণী তথাকথিত অন্ত্যজ ও ম্লেচ্ছবর্ণের ও আদিবাসি কোমের নানা বৃত্তিধারী লোকেদের লইয়া গঠিত। লিপিগুলিতে বিশদভাবে ইহাদের কথা বলা হয় নাই, এবং যেটুকু বলা হইয়াছে তাহাও পালপর্বের লিপিমালাতেই। অষ্টম শতকের আগে ইঁহাদের উল্লেখ নাই; পালপর্বের পরেও ইহাদের উল্লেখ নাই। পালপর্বেও ইঁহাদের সকলকে লইয়া নিম্নতম বৃত্তি ও স্তরের নাম পর্যন্ত করিয়া এক নিশ্বাসে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, "মেদান্ধ্রচণ্ডাল-পর্যন্তান্"—একেবারে চণ্ডাল পর্যন্ত। কিন্তু পাল ও সেন-আমলের সমসাময়িক সাহিত্যে —কাব্যে, পুরাণে, স্মৃতিগ্রন্থে—ইঁহাদের বর্ণ ও বৃত্তিমর্যাদা সম্বন্ধে বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায়। আগেই বর্ণ-বিন্যাস ও বর্তমান অধ্যায়ে সে-সাক্ষ্য উপস্থিত করিয়াছি। লিপি-

প্রমাণদ্বারাও সমসাময়িক সাহিত্যের সাক্ষ্য সমর্থিত হয়। রজক ও নাপিতরাও সমাজ-শ্রমিক, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা আবার কর্ষক বা ক্ষেত্রকরও বটে। জনৈক রজক সিরুপা ও নাপিত গোবিন্দের উল্লেখ পাইতেছি শ্রীহট্ট জেলার ভাটেরা গ্রামে প্রাপ্ত গোবিন্দকেশবের লিপিতে। মেদ, অন্ধ্র, চণ্ডাল ছাড়া আরও দু'একটি অন্ত্যজ ও ম্লেচ্ছ পর্যায়ের, অর্থাৎ, নিম্নতম অর্থনৈতিক স্তরের লোকেদের খবর সমসাময়িক লিপিতে পাওয়া যায়, যেমন পুলিন্দ, শবর ইত্যাদি। চর্যাপদে যে ডোম্, ডোম্বী বা ডোম্নী, শবর-শবরী, কাপালিক ইত্যাদির কথা বার বার পাওয়া যায় তাঁহারাও এই শ্রেণীর। একটি পদে স্পষ্টই বলা হইয়াছে, ডোম্বীর কুঁড়িয়া (কুঁড়ে ঘর) নগরের বাহিরে; এখনও তো তাঁহারা গ্রাম ও নগরের বাহিরেই থাকে। বাঁশের চাংগাড়ী ও বাঁশের তাঁত তৈরী করা তখন যেমন ছিল ইঁহাদের কাজ, এখনও তাহাই। শিল্পীশ্রেণীর মধ্যে তন্তুবায় সম্প্রদায়ের খবরও চর্যাগীতিতে পাওয়া যায়; সিদ্ধাচার্য তন্ত্রীপাদ সিদ্ধিপূর্বজীবনে এই সম্প্রদায়ের লোক এবং তাঁতগুরু ছিলেন বলিয়াই তো মনে হয়।

শিল্পী বণিক-ব্যবসায়ী শ্রেণী

কিন্তু অষ্টমশতক হইতে আরম্ভ করিয়া এই যে বিভিন্ন শ্রেণীর সুস্পষ্ট ও অস্পষ্ট ইঙ্গিত আমরা পাইলাম, ইহার মধ্যে শিল্পী, বণিক-ব্যবসায়ী শ্রেণীর উল্লেখ কোথায়? এই সময়ের ভূমি দান-বিক্রয়ের একটি পট্টোলীতেও ভুল করিয়াও বণিক ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর কোনও ব্যক্তির উল্লেখ নাই; ইহা আশ্চর্য নয় কি? অষ্টম শতক-পূর্ববর্তী লিপিগুলিও ভূমি দান-বিক্রয়ের দলিল, সেখানে তো দেখিতেছি, স্থানীয় অধিকরণ উপলক্ষেই যে শুধু নগরশ্রেষ্ঠী, প্রথম সার্থবাহ ও প্রথম কুলিকের নাম করা হইতেছে, তাহাই নয়, কোন কোনও লিপিতে প্রধানব্যাপারিণঃ বা প্রধান ব্যবসায়ীদেরও উল্লেখ করা হইতেছে, অন্যান্য শ্রেণীর ব্যক্তিদের সঙ্গে বণিক ও ব্যবসায়ীদেরও বিজ্ঞাপিত করা হইতেছে। রাষ্ট্র-ব্যাপারেও তাঁহাদের বেশ কতকটা আধিপত্য দেখা যাইতেছে। কিন্তু অষ্টম শতকের পর এমন কি হইল, যাহার ফলে পরবর্তী লিপিগুলিতে এই শ্রেণীটির কোনো উল্লেখই রইল না? ভূমিদানের ব্যাপারে শিল্পী, বণিক ও ব্যবসায়ীদের বিজ্ঞাপিত করিবার কোনও প্রয়োজন হয় নাই, এই তর্ক উঠিতে পারে। এ যুক্তি হয় তো কতকটা সত্য, কিন্তু প্রয়োজন কি একেবারেই নাই? যে-গ্রামে ভূমিদান করা হইতেছে, সে-গ্রামের সকল শ্রেণী ও সকল স্তরের লোক, এমন কি চণ্ডাল পর্যন্ত সকলের উল্লেখ করা হইতেছে, অথচ শ্রেণী হিসাবে শিল্পী, বণিক ও ব্যবসায়ীদের কোনও উল্লেখই হইতেছে না। এতগুলি গ্রাম ও তৎসংপৃক্ত ভূমিদানের উল্লেখ আমরা পাইতেছি, অথচ তাহার মধ্যে একটি গ্রামেও শিল্পী, বণিক ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোক কি ছিলেন না? আর, যেখানে রাজসেবকদের উল্লেখ করা হইতেছে, সেখানেও তো নগরশ্রেষ্ঠী বা সার্থবাহ বা কুলিক

ইত্যাদির কাহারও উল্লেখ পাইতেছি না। অথচ, সপ্তম শতক পর্যন্ত তাঁহারাই তো স্থানীয় অধিকরণের প্রধান সহায়ক, তাঁহারা এবং ব্যাপারীরাই স্থানীয় রাষ্ট্রযন্ত্রের সংব্যবহারী। অথচ ইঁহাদেরও কোনো উল্লেখ নাই। এখানেও আমার মনে হয়, এই অনুল্লেখ আকস্মিক নয়। অষ্টম শতকের পরে শিল্পী, বণিক ও ব্যবসায়ী ছিলেন না, এইরূপ অনুমান মূর্খতা মাত্র। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে, খালিমপুর লিপির "প্রত্যাপণে মানপৈঃ"—দোকানে দোকানে মানপদের দ্বারা ধর্মপালের যশ কীর্তনের কথা, তারনাথ কথিত শিল্পী ধিমান ও বীটপালের কথা, শিল্পী মহীধর, শিল্পী শশিদেব, শিল্পী কর্ণভদ্র, শিল্পী তথাগতসর, সূত্রধার বিষ্ণুভদ্র এবং আরও অগণিত শিল্পী যাঁহারা পাল লিপিমালা ও অসংখ্য দেবদেবীর মূর্তি উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের কথা; বণিক বুদ্ধমিত্র ও বণিক লোকদত্তের কথা। মহারাজাধিরাজ মহীপালের রাজত্বের যথা-ক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ রাজ্যাঙ্কে বিলকিন্দক (ত্রিপুরা জেলার বিলকান্দ) গ্রামবাসি শেষোক্ত দুই বণিক একটি নারায়ণ ও একটি গণেশমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। শুধু পাল আমলেই তো নয়; সেন আমলেও শিল্পী-বণিক-ব্যবসায়ীদের অপ্রাচুর্য ছিল না। শিল্পীদের তো গোষ্ঠীই ছিল, এবং বিজয়সেনের আমলে জনৈক রাণক শিল্পীগোষ্ঠীর অধিনায়ক ছিলেন। পূর্বোক্ত ভাটেরা গ্রামের গোবিন্দকেশবের লিপিতে এক কাংসকার (কাঁসারী) এবং দন্তকারের (হাতির দাঁতের কাজ যাঁহারা করেন) খবর পাওয়া যাইতেছে। বল্লালচরিতে বণিক ও বিশেষভাবে সুবর্ণবণিকদের উল্লেখ তো সুস্পষ্ট। আর, বৃহদ্ধর্ম ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ দুটিতে তো শিল্পী, বণিক ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর অগণিত উপবর্ণের তালিকা পাওয়া যাইতেছে। শিল্পীদের মধ্যে উল্লেখ করা যায়, তন্তুবায়-কুবিন্দক, কর্মকার, কুম্ভকার, কংসকার, শংখকার, তক্ষণ-সূত্রধার, স্বর্ণকার, চিত্রকার, অট্টালকাকার, কোটক ইত্যাদি; বণিক-ব্যবসায়ীদের মধ্যে দেখা পাইতেছি, তৈলিক, তৌলিক, মোদক, তাম্বুলী, গান্ধিকবণিক, সুবর্ণবণিক, তৈলকার, ধীবর ইত্যাদির।

শিল্পী, বণিক ও ব্যবসায়ী সমাজে তাহা হইলে নিশ্চয়ই ছিলেন; কিন্তু অষ্টম শতকের পূর্বে শ্রেণী হিসাবে তাঁহাদের যে প্রাধান্য রাষ্ট্রে ও সমাজে ছিল, সেই প্রাধান্য ও আধিপত্য সপ্তম শতকের পর হইতেই কমিয়া গিয়াছিল। বণিক ও ব্যবসায়ী বৃত্তিধারী যে-সব বর্ণের তালিকা উপরোক্ত দুই পুরাণ হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে, লক্ষ্যণীয় এই যে, ইঁহারা সকলেই ক্ষুদ্র বণিক ও ব্যবসায়ী, স্থানীয় দেশান্তর্গত ব্যবসা-বাণিজ্যেই যেন ইঁহাদের স্থান। প্রাচীনতর কালের, অর্থাৎ পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকের এবং হয়তো তাহারও আগেকার কালের শ্রেষ্ঠী ও সার্থবাহরা কোথায় গেলেন? ইঁহাদের উল্লেখ সমসাময়িক সাহিত্যে বা লিপিতে নাই কেন? আমি এই অধ্যায়েই পূর্বে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, ঠিক এই সময় হইতেই অর্থাৎ মোটামুটি অষ্টম শতক হইতেই প্রাচীন বাঙলার সমাজ কৃষিনির্ভর হইয়া পড়িতে আরম্ভ করে, এবং ক্ষেত্রকর-কর্ষকেরাও বিশেষ একটি শ্রেণীরূপে

গড়িয়া উঠেন, এবং সেইভাবেই সমাজে স্বীকৃত হন। অষ্টম শতকের আগে তাঁহাদের সুনির্দিষ্ট শ্রেণী হিসাবে গড়িয়া উঠিবার কোনও প্রমাণ নাই। শিল্পী, বণিক ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর পক্ষে হইল ঠিক ইহার বিপরীত। পঞ্চম হইতে সপ্তম শতক পর্যন্ত দেখি—বোধহয় খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয়-দ্বিতীয় শতক হইতেই—বিশেষভাবে শ্রেণী হিসাবে তাঁহাদের উল্লেখ না থাকিলেও রাষ্ট্র ও সমাজে ইঁহারাই ছিলেন প্রধান, তাঁহাদেরই আধিপত্য ছিল অন্যান্য শ্রেণীর লোকেদের অপেক্ষা বেশী। ইহার একমাত্র কারণ, তদানীন্তন বাঙালী সমাজ প্রধানত শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য নির্ভর। এই তিন উপায়ই ধনোৎপাদনের প্রধান তিন পথ, এবং সামাজিক ধন বণ্টনও অনেকাংশে নির্ভর করিত ইঁহাদের উপর। কৃষিও তখন ধনোৎপাদনের অন্যতম উপায় বটে, কিন্তু প্রধান উপায় শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য। অষ্টম শতক হইতে সমাজ অধিকতর কৃষিনির্ভর, এবং উত্তরোত্তর এই নির্ভরতা বাড়িয়াই গিয়াছে; শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য ধনোৎপাদনের প্রধান ও প্রথম উপায় আর থাকে নাই, এবং সেই জন্যই রাষ্ট্র ও সমাজে ইঁহাদের প্রাধান্যও আর থাকে নাই। ব্যক্তি হিসাবে কাহারও কাহারও মর্যাদা স্বীকৃত হইলেও শ্রেণী হিসাবে সপ্তম শতক-পূর্ব মর্যাদা আর তাঁহারা ফিরিয়া পান নাই। লক্ষ্যণীয় যে, অনেক শিল্পী ও বণিক-ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোক বৃহদ্ধর্ম ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে মধ্যম-সংকর বা অসৎশূদ্র পর্যায়ভুক্ত; যাঁহারা উত্তম-সংকর বা সৎশূদ্র পর্যায়ভুক্ত তাঁহাদেরও মর্যাদা কারণ-কায়স্থ, বৈদ্য-অম্বষ্ঠ, গোপ, নাপিত প্রভৃতির নীচে। ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণের সাক্ষ্যে দেখিতেছি, শিল্পী, স্বর্ণকার, সূত্রধার ও চিত্রকার এবং কোনো কোনো বণিক সম্প্রদায়কে মধ্যম সংকর পর্যায়ে স্থান দেওয়া হইয়াছে। বল্লাল-চরিতের সাক্ষ্য প্রামাণিক হইলে স্বীকার করিতে হয়, বণিক ও বিশেষ ভাবে সুবর্ণ বণিকদের তিনি সমাজে পতিত করিয়া দিয়াছিলেন। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, রাষ্ট্র ও সমাজে ইঁহাদের প্রাধান্য থাকিলে, ধনোৎপাদন ও বণ্টন ব্যাপারে ইঁহাদের আধিপত্য থাকিলে এইরূপ স্থান নির্দেশ বা অবনতিকরণ কিছুতেই সম্ভব হইত না।

সদ্যোক্ত মন্তব্য ঐতিহাসিক অনুমান সন্দেহ নাই, তবু আমার যুক্তিটি যদি ঐতিহাসিক মর্যাদার বিরোধী না হয়, এবং ধনসম্বল অধ্যায়ে সামাজিক ধনের বিবর্তনের ইঙ্গিত, মুদ্রার ইঙ্গিত আমি যে-ভাবে নির্দেশ করিয়াছি, ভূমি-বিন্যাস অধ্যায়ে আমি যাহা বলিয়াছি তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এই অনুমানও ঐতিহাসিক সত্যের দাবি রাখে, সবিনয়ে আমি এই নিবেদন করি। তবে, এই অনুমানের স্বপক্ষে সমসাময়িক যুগের (দ্বাদশ শতক) একটি কবির একটি শ্লোক আমি উদ্ধার করিতে পারি। এই শ্লোক ঐতিহাসিক দলিলের মূল্য ও মর্যাদা দাবি করে না সত্য, কিন্তু আমার ধারণা, এই শ্লোকটিতে উপরোক্ত সামাজিক বিবর্তনের অর্থাৎ বণিক-ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের অবনতি এবং কৃষক-ক্ষেত্রকর সম্প্রদায়ের উন্নতির ইঙ্গিত অত্যন্ত সুস্পষ্ট। গোবর্ধন আচার্য ছিলেন লক্ষ্মণসেনের

অন্যতম সভাকবি ; তাঁহারই রচনা এই পদটি। প্রাচীনকালে শ্রেষ্ঠীরা শক্রধ্বজোত্থান পূজা (ইন্দ্রের ধ্বজার পূজা) উৎসব করিতেন ; দ্বাদশ শতকেও উৎসবটি হইত, কিন্তু তখন শ্রেষ্ঠীরা আর ছিলেন না।

তে শ্রেষ্ঠীনঃ ক্ক সম্প্রতি শক্রধ্বজ যৈঃ কৃতস্তুবোচ্ছায়ঃ।
ঈষাং বা মেঢ়িং বাধুনাতনাস্ত্বাং বিধিৎসন্তি ॥

হে শক্রধ্বজ ! যে শ্রেষ্ঠীরা (একদিন) তোমাকে উন্নত করিয়া গিয়াছিলেন, সম্প্রতি সেই শ্রেষ্ঠীরা কোথায় ! ইদানীংকালে লোকেরা তোমাকে (লাঙ্গলের) ঈষ অথবা মেঢ়ি (গরু বাঁধিবার গোঁজ) করিতে চাহিতেছে।

এই একটি শ্লোকে ব্যবসা-বাণিজ্যের অবনতিতে এবং একান্ত কৃষিনির্ভরতায় বাঙালী সমাজের আক্ষেপ গোবর্ধন আচার্যের কণ্ঠে যেন বাণীমূর্তি লাভ করিয়াছে। একটু প্রচ্ছন্ন শ্লেষও কি নাই।

৫

সার সংক্ষেপ

প্রমাণ ও যুক্তিসিদ্ধ অনুমানের সাহায্যে আমরা যাহা পাইলাম তাহার সার মর্ম এখন এইভাবে আমরা প্রকাশ করিতে পারি। সুপ্রাচীন বাঙলার শ্রেণী-বিন্যাস সম্বন্ধে পঞ্চম শতকের আগে উপাদানের অভাবে কিছু বলা কঠিন। তবে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, জাতকের গল্প, মিলিন্দপঞ্হ, পেরিপ্লাস-গ্রন্থ, টলেমির বিবরণ, কথা-সরিৎসাগরের গল্প, বাৎস্যায়নের কামসূত্র, মহাভারতের গল্প, গ্রীক ঐতিহাসিকদের বিবরণ, এবং সমসাময়িক সাহিত্যে প্রাচীন বাঙলার শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যের সমৃদ্ধির যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে মনে হয়, শিল্পী, বণিক ও ব্যবসায়ীদের একাধিক সুসমৃদ্ধ সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক শ্রেণী দেশে বিদ্যমান ছিল, এবং রাষ্ট্রে ও সমাজে তাঁহাদের প্রভাব এবং আধিপত্যও ছিল যথেষ্ট। ধনোৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থায় এই শ্রেণীগুলির প্রভুত্বও সহজেই অনুমেয়। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে গৌড়, বঙ্গ, পুণ্ড্রে যে নাগর-সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায় তাহা যে সদাগরী ধনতন্ত্রেরই সৃষ্টি এ-সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশের কোনো কারণ দেখি না। ধর্ম ও অধ্যাপনাজীবী একটি শ্রেণীর আভাসও পাওয়া যায়, এবং এই শ্রেণী জৈন এবং বৌদ্ধ যতি ও ব্রাহ্মণদের লইয়া গঠিত। অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের ব্রাহ্মণদিগকে অর্জুন অনেক ধনরত্ন উপহার দিয়াছিলেন, এ-তথ্য মহাভারতেই উল্লিখিত আছে (১।২১৬)। বাৎস্যায়নও গৌড়-বঙ্গের ব্রাহ্মণদের কথা বলিতেছেন (৬।৩৮,৪১);

সদাগরী ধনতন্ত্রপুষ্ট নাগর-সভ্যতা তাঁহাদেরও স্পর্শ করিয়াছিল। বাঙলায় স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র তখন ছিল না কিন্তু কোম সমাজযন্ত্রের কথা ছাড়িয়া দিলেও কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের রাষ্ট্রযন্ত্র তো একটা ছিলই; মহাস্থান শিলাখণ্ড লিপিই তাহার প্রমাণ। সেই রাষ্ট্রযন্ত্রকে কেন্দ্র করিয়া যত ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণই হউক, রাজপাদোপজীবীদের একটি শ্রেণীও গড়িয়া উঠিয়াছিল, এই অনুমান অসঙ্গত নয়। ইঁহাদেরই অভিজাত প্রতিনিধি হইতেছেন গলদন—বাঙলায় মৌর্যরাষ্ট্রের প্রতিনিধি অর্থাৎ মহামাত্র। সর্বনিম্ন শ্রেণীস্তরের একটু আভাসও পাওয়া যাইতেছে বাৎস্যায়নের কামসূত্রে; এই স্তরে ছিল ক্রীতদাসেরা। বাৎস্যায়ন এই ক্রীতদাসদের কথা বলিয়াছেন (৬।৩৮)। পৃথিবীর সর্বত্রই সদাগরী ধনতন্ত্রের সঙ্গে ক্রীতদাস প্রথা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত; বাঙলাদেশেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। হিন্দু আমলের শেষ পর্যন্ত এই প্রথা বাঙলাদেশে প্রচলিত ছিল, জীমূতবাহন তাঁহার দায়ভাগ গ্রন্থে সেই সাক্ষ্য দিতেছেন। বাঙলায় দাস ক্রয়-বিক্রয়ের প্রথা অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকেও প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণ স্বরূপ পট্টিকৃত দলিলপত্র আজও বাঙলার সর্বত্র পাওয়া যায়। ক্রমপ্রসারমাণ আর্য-ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ সমাজ ও সংস্কৃতির প্রান্তসীমায় যে-সমস্ত আদিবাসি কোম স্থান পাইতেছিল তাঁহারাও অর্থনৈতিক শ্রেণী সমূহের নিম্নস্তরেই নিবদ্ধ হইতেছিল, এ-অনুমানও খুব অসঙ্গত নয়।

পঞ্চম—সপ্তম শতক পর্ব

পঞ্চম শতকের গোড়া হইতে প্রায় অষ্টম শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত শ্রেণীবিন্যাসগত সামাজিক চেহারাটা সুস্পষ্ট ধরিতে পারা অনেক সহজ। এই পর্বে বাঙালী সমাজ প্রধানত শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যনির্ভর; অর্থনৈতিক শ্রেণী হিসাবে শিল্পী-বণিক-ব্যবসায়ীর উল্লেখ না থাকিলেও সমাজে ও রাষ্ট্রে তাঁহাদের প্রাধান্য পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে। কৃষক, ক্ষেত্রকর, কৃষিকর্ম, সবই সমাজে রহিয়াছে, কৃষিকর্মের বলে সমাজে ধনোৎপাদনও হইতেছে, কিন্তু যেহেতু সমাজ প্রথমত ও প্রধানত শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য নির্ভর, এবং ভূমি সম্পদ ও কৃষিকর্ম সামাজিক ধনের স্বল্প অংশ মাত্র, সেই হেতু কৃষকরা তখনও সুসমৃদ্ধ-সুসম্বদ্ধ শ্রেণী হিসাবে গড়িয়া উঠিবার অবকাশ পান নাই, এবং সেইভাবে রাষ্ট্রে ও সমাজে স্বীকৃতিলাভও করিতে পারেন নাই। কিন্তু ষষ্ঠ শতকেই সামন্ত প্রথা স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছে, ভূমির চাহিদা বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে; বুঝা যাইতেছে, সমাজ ভূমিসম্পদকেই যেন প্রধান সম্পদ বলিয়া মানিয়া লইবার দিকে অগ্রসর হইতেছে। সপ্তম শতকের শেষার্ধ ও অষ্টম শতকের প্রথমার্ধ প্রায় জুড়িয়া রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক আবর্ত এবং পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের দ্রুত অগ্রগতির স্রোতে এই বিবর্তন যেন সম্পূর্ণ হইল; শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য যেন ধনোৎপাদনের প্রথম ও প্রধান উপায় আর রহিল না। ইহার কারণ একাধিক; ভূমি-বিন্যাস, বর্ণবিন্যাস, ধনসম্বল,

রাজবৃত্ত প্রভৃতি অধ্যায়ে নানা প্রসঙ্গে আমি এই সব কারণের উল্লেখ করিয়াছি ; এখানে পুনরুল্লেখ করিয়া লাভ নাই। যাহা হউক, এই পর্বে অভিজাত ও অনভিজাত রাজপুরুষ, সংব্যবহারী ও রাজসেবকদের দেখা পাইতেছি ; কিন্তু স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র দেশে তখনও গড়িয়া উঠে নাই বলিয়া রাজকর্মচারী বা রাজসেবকদের সুনির্দিষ্ট শ্রেণী তখনও গড়িয়া উঠে নাই ; তাহার সূচনামাত্র দেখা যাইতেছে। জৈন, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কৃতির ধারক ও নিয়ামক বুদ্ধি-বিদ্যা-জ্ঞান-ধর্মজীবী শ্রেণীর পরিচয় এই যুগে সুস্পষ্ট। তাঁহাদের মর্যাদা ও সম্মাননা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, এবং তাঁহারা যে রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতিপাল্য সেই দাবিও স্বীকৃত হইয়াছে। নিম্নতর শ্রেণীস্তরের লোকেরা তো নিশ্চয়ই ছিলেন ; কিন্তু তাঁহারা সমাজের প্রধান শ্রেণীগুলির বাহিরে। অর্থনৈতিক শ্রেণী হিসাবে তাঁহারা গড়িয়া উঠেন নাই, সেই হিসাবে তাঁহাদের কোনো মূল্য স্বীকৃতও হয় নাই ; উল্লেখও সেই হেতু নাই।

অষ্টম-ত্রয়োদশ শতক পর্ব

অষ্টম হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত, অর্থাৎ আদিপর্বের শেষ পর্যন্ত বাঙালী সমাজ প্রধানত ও প্রথমত কৃষিনির্ভর। সামন্তপ্রথা সুপ্রতিষ্ঠিত, ভূমিই সমাজের প্রধান সম্পদ, এবং সেই ভূমির অধিকারের বিচিত্র ক্রমসংকুচীয়মান স্তর লইয়াই এই যুগের সমাজ। ইহার একপ্রান্তে জনপদজোড়া ভূমির অধিকার লইয়া দোর্দণ্ড প্রতাপে দণ্ডায়মান মুষ্টিমেয় মহামাণ্ডলিক-মহাসামন্তরা ; অন্যদিকে লেশমাত্র ভূমিবিহীন অসংখ্য প্রজার দল ; মধ্যস্থলে ভূমিস্বত্বাধিকারের নানা স্তর। এই বিচিত্র স্তরই প্রধানত শ্রেণী নির্দেশের দ্যোতক। ইহাই এই যুগের প্রথম ও প্রধান সামাজিক বৈশিষ্ট্য। যেহেতু সমাজ প্রধানত ভূমিনির্ভর সেই হেতু এই পর্বে কৃষক-ক্ষেত্রকর শ্রেণীও সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট সীমারেখ লইয়া চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। একই কারণে গ্রাম্য সমাজে ভূমিসম্পদসমৃদ্ধ একটি ভূম্যধিকারী, এবং আর একটি কৃষিসম্পদ সমৃদ্ধ গ্রাম্য কুটুম্ব, গৃহস্থ, ভদ্র শ্রেণীও গড়িয়া উঠিয়াছে। ইঁহাদের ঠিক পৃথক একটি শ্রেণী বলা হয়তো উচিত নয়, বরং একই শ্রেণীর বিভিন্ন স্তর বলিলেই যথার্থ বলা হয়। শিল্পী, বণিক এবং ব্যবসায়ীরাও সমাজে আছেন ; শিল্পকর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্যও চলিতেছে। কিন্তু ভূমিনির্ভর, কৃষিনির্ভর সমাজে শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য ধনোৎপাদনের অন্যতম উপায় মাত্র, প্রধান উপায় আর নহে। সেইজন্য শ্রেণী হিসাবে এই শ্রেণীদের অস্তিত্বের খবর নাই, রাষ্ট্রে এবং সমাজে তাঁহাদের প্রাধান্যও আর নাই। স্বতন্ত্র স্বাধীন স্বসীমাবদ্ধ রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিবার ফলে রাজপাদোপজীবী বলিয়া একটি বিশেষ সুস্পষ্ট শ্রেণী এই পর্বে গড়িয়া উঠিয়াছে। ইঁহাদের মধ্যেও আবার বিভিন্ন স্তর ; একপ্রান্তে উপরিক, রাজস্থানীয়, মহাসেনাপতি, মহাধর্মাধ্যক্ষ, মহামন্ত্রী ইত্যাদি ; অন্যপ্রান্তে তরিক, শৌল্কিক, গৌল্মিক, চাটভাট, ক্ষুদ্র

করণ, বেতনভুক সৈন্য, প্রহরী ইত্যাদি। যাহাই হউক, রাজপাদোপজীবী শ্রেণীরই আনুষঙ্গিক ছায়ারূপে রাষ্ট্রসেবক শ্রেণীর আভাসও সুস্পষ্ট। ইঁহাদের মধ্যে ভূমিসম্পদ-নির্ভর শ্রেণীস্তর সমূহের লোকেদের দর্শনও মিলিতেছে। বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞান-ধর্মজীবী শ্রেণীও সুস্পষ্ট; এই শ্রেণীতেও বিভিন্ন স্তর। একপ্রান্তে তৈলবিড়িপত্র ও শাকান্নভুক্ বিনয়নম্র ব্রাহ্মণ পুরোহিত বা পণ্ডিত; অন্যপ্রান্তে প্রভূত অর্থসমৃদ্ধ রাজপণ্ডিত বা পুরোহিত, পৌরোহিত্য ও অধ্যাপনার ছদ্মবেশে সমৃদ্ধ ভূম্যধিকারী। ভূমিহীন সমাজ শ্রমিকশ্রেণীও সুস্পষ্ট; ইঁহারা অধিকাংশ অন্ত্যজ বা ম্লেচ্ছ বর্ণবদ্ধ, স্বল্পসংখ্যক মধ্যম-সংকর বা অসৎশূদ্র পর্যায়ের নিম্নস্তরে। পালপর্বে চণ্ডাল পর্যন্ত সমাজের নিম্নতম শ্রমিক শ্রেণীস্তর সমাজদৃষ্টির সম্মুখে উপস্থিত; কিন্তু সেন-আমলে ব্রাহ্মণ্য সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির অত্যুচ্চারণের ফলে, সমাজ ও রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক দৃষ্টির আচ্ছন্নতার ফলে তাঁহাদিগকে সমাজদৃষ্টির বাহিরে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। বৌদ্ধ মহাযান-বজ্রযান-মন্ত্রযান-সহজযানে ডোম-ডোম্বী, শবর-শবরীদেরও স্বীকৃতি ছিল; চর্যাগীতিই তাহার প্রমাণ। ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও সংস্কৃতিতে তাহা ছিল না, কাজেই সেন-আমলে সমাজ-শ্রমিক শ্রেণীর এই অবজ্ঞা কিছু অস্বাভাবিক নয়।

৬

শ্রেণী ও রাষ্ট্র

বর্ণ ও শ্রেণীর পারস্পরিক সম্বন্ধের কথা বর্ণ-বিন্যাস অধ্যায়ে এবং বর্তমান অধ্যায়ে কতকটা সবিস্তারেই বলা হইয়াছে। রাষ্ট্র ও শ্রেণীর পরস্পর সম্বন্ধের ইঙ্গিতও এই অধ্যায়ের ইতস্তত ইতিপূর্বেই প্রসঙ্গক্রমে দেওয়া হইয়াছে। এইখানে সেই সব ইঙ্গিত সংক্ষেপে একটু ফুটাইয়া তোলা যাইতে পারে। পঞ্চম শতকের আগে এ-সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলিবার উপায় নাই। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে দেখা যাইতেছে একটি শ্রেণী বরাবর রাষ্ট্রের আনুকূল্য লাভ করিতেছে; রাষ্ট্রযন্ত্রে এই শ্রেণীর প্রভাব অক্ষুণ্ণ—ইঁহারা শিল্পী, শ্রেষ্ঠী, সার্থবাহ, ব্যাপারী ইত্যাদি। দেখিয়াছি, ইঁহারাই ছিলেন সেই যুগের প্রধান ধনোৎপাদক শ্রেণী; কাজেই রাষ্ট্রের পক্ষে ইঁহাদের আনুকূল্য খুবই স্বাভাবিক। আর একটি শ্রেণীও রাষ্ট্রের আনুকূল্য লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল; ইঁহারা জ্ঞান-ধর্মজীবী শ্রেণীর জৈন-বৌদ্ধ যতি সম্প্রদায় ও ব্রাহ্মণ। কিন্তু এই শ্রেণী এখনও সম্পূর্ণ গড়িয়া উঠিয়া রাষ্ট্রের সঙ্গে পরস্পর স্বার্থের সম্বন্ধে আবদ্ধ হয় নাই; তাহার সূচনা দেখা যাইতেছে মাত্র।

ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে ভূমি-নির্ভর সামন্তপ্রথার স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠার এবং ব্রাহ্মণ্যধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দুইটি শ্রেণীর সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ

হইল, একটি বহুস্তরবদ্ধ ভূম্যধিকারী শ্রেণী, এবং আর একটি জ্ঞান-ধর্মজীবী শ্রেণীর সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ। সামন্তচক্র ছিল রাষ্ট্রের শক্তি ও নির্ভর; এবং এই সামন্তচক্রকে আশ্রয় করিয়াই ভূম্যধিকারী শ্রেণীর অস্তিত্ব। কাজেই এই শ্রেণীর সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। জ্ঞান ধর্মজীবী ব্রাহ্মণদের জীবিকানির্ভর ছিল ধর্মদেয়, ব্রহ্মদেয় ভূমি ও দক্ষিণা-পুরস্কারলব্ধ অর্থ। এই ভূমি ও অর্থপ্রাপ্তি নির্ভর করিত একদিকে রাষ্ট্র ও অন্যদিকে অভিজাত ভূম্যধিকারী শ্রেণীর কৃপার উপর। কাজেই ব্রাহ্মণেরা এই দুয়েরই পোষক ও সমর্থক হইবেন, ইহাই তো স্বাভাবিক। তবে এই পর্বের রাষ্ট্রযন্ত্রে ব্রাহ্মণদের প্রভুত্ব বা আধিপত্য বড় একটা এখনও দেখা যাইতেছে না। ব্রাহ্মণেরা সংখ্যায় তখনও স্বল্প, দেশে নবাগত অথবা নববর্ধিত; ব্রহ্মদেয়, ধর্মদেয় ভূমি লইয়া পূজা, যাগযজ্ঞ, অধ্যয়ন, অধ্যাপনাতেই প্রধানত তাঁহারা নিযুক্ত; কাজেই প্রভুত্ব বিস্তারের সময় তখনও আসে নাই। পরে সংখ্যা ও ক্ষমতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রে ও সমাজে তাঁহাদের আধিপত্য বিস্তৃত হয়, এবং মোটামুটি সপ্তম অষ্টম শতক হইতেই পৌর ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তাঁহাদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়; সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের ক্ষমতা এবং অধিকারও হ্রাস পাইতে থাকে।

অষ্টম শতক হইতে শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ভূম্যধিকারী শ্রেণীর সঙ্গে রাষ্ট্রের পারস্পরিক স্বার্থবন্ধন আরও ঘনিষ্ঠ হয়; আদিপর্বের শেষ পর্যন্ত এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অটুট ও অক্ষুন্ন ছিল। এই ব্যাপারে পাল-চন্দ্র রাষ্ট্রের সঙ্গে কম্বোজ-বর্মণ-সেন রাষ্ট্রের কোনো পার্থক্য ছিল না! একান্তভাবে সামন্ততন্ত্রনির্ভর রাষ্ট্রে এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক এবং সমাজ-বিবর্তনের ইহাই নিয়ম। পাল ও চন্দ্র বংশ বৌদ্ধরাজবংশ হওয়া সত্ত্বেও, আগেই দেখিয়াছি, এই দুই রাষ্ট্রেই ব্রাহ্মণ-শ্রেণীর প্রাধান্য ছিল; কেন, কি কারণে ছিল তাহা বর্ণ-বিন্যাস, ধর্মকর্ম ও রাজবৃত্ত অধ্যায়ে সবিস্তারেই আলোচনা করিয়াছি। সেন-বর্মণ রাষ্ট্রে এই প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি বাড়িয়াই গিয়াছিল এবং ভূম্যধিকারীতন্ত্র ও ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রে স্বার্থগ্রন্থিবন্ধন দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইয়াছিল। বস্তুত, সেন ও বর্মণ রাজবংশ যে সমাজাদর্শ ও আবেষ্টনের মধ্যে তাঁহাদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন, যে-আদর্শ ও আবেষ্টনের মধ্যে ভূম্যধিকারতন্ত্র অটুট ও অক্ষুন্ন থাকা সহজ ও সম্ভব সেই আদর্শ ও পরিবেশ রচনা এবং প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছিল জ্ঞান-বুদ্ধিজীবী ব্রাহ্মণদের উপর। পরমসুগত বৌদ্ধ পাল ও চন্দ্ররাজবংশের ক্ষেত্রেও ইহার অন্যথা হয় নাই, কারণ অর্থ ও রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সমাজপদ্ধতির এই নিয়মই তখন কার্যকরী ছিল! দেশের ভূমিবান্ বিত্তবান্ সম্ভ্রান্ত অধিকাংশ লোকই ছিলেন ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও সংস্কৃতি আশ্রয়ী, এবং বৌদ্ধ গৃহীরাও তাহাই। কাজেই পাল-চন্দ্র যুগে ভূমি নির্ভর কৃষিতান্ত্রিক সমাজপদ্ধতির কিছু ব্যতিক্রম হয় নাই। তবে, বৌদ্ধ রাষ্ট্রের সামাজিক দৃষ্টি ছিল উদার এবং সর্বত্র প্রসারী এবং সেই হেতু পরবর্তী

সেন-বর্মণ আমলের মত পাল-চন্দ্র-আমলে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের প্রভাব ও আধিপত্য এমন দুর্জয় ও সর্বগ্রাসী হইয়া উঠিতে পারে নাই। পাল-চন্দ্র ও সেন বর্মণ-আমলে ভূমি নির্ভর কৃষিতন্ত্রেরই প্রাধান্য অর্থাৎ ভূম্যধিকারী শ্রেণীই রাষ্ট্রের প্রধান সহায় ও পোষক, এবং রাষ্ট্রও ইঁহাদের সহায় ও পোষক। সেন-বর্মণ রাষ্ট্র উপরন্তু ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রেরও পোষক ও সহায়ক; পাল-চন্দ্র রাষ্ট্রের উদার সর্বত্র প্রসারী দৃষ্টিও ইঁহাদের ছিল না। ইহার ফলেই বোধ হয় সেন-বর্মণ রাষ্ট্র সমাজের সকল শ্রেণীর সমর্থন ও পোষকতা লাভ করিতে পারে নাই। সমসাময়িক স্মৃতি, পুরাণ ও পরবর্তীকালের বল্লাল-চরিতের সাক্ষ্য যদি এক্ষেত্রে প্রামাণিক হয় তাহা হইলে অনুমান করা কঠিন নয় যে, শিল্পী, বণিক ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর একটা বৃহৎ অংশের সমর্থন ও পোষকতা সেন-বর্মণ রাষ্ট্র লাভ করিতে পারেন নাই। ভূমিনির্ভর কৃষিপ্রধান সমাজে ও রাষ্ট্রে শিল্পী-বণিক-ব্যবসায়ী শ্রেণী অবজ্ঞাত হইবে, ইহা কিছু বিচিত্র নয়। শশাঙ্কের বৌদ্ধ-বিদ্বেষ কাহিনী সম্বন্ধে কোনো বাস্তব, ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা উপযুক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাবে নিশ্চয় করিয়া হয়তো দেওয়া কঠিন (রাজবৃত্ত এবং ধর্মকর্ম অধ্যায়ে শশাঙ্ক-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য); কিন্তু বল্লাল-চরিতে বণিক-সুবর্ণ-বণিকদের সঙ্গে বল্লালসেনের রাষ্ট্রের যে সংঘর্ষের কাহিনী বর্ণিত আছে তাহার পশ্চাতে একদিকে ব্রাহ্মণ ও ভূম্যধিকারী শ্রেণী এবং অন্যদিকে বণিক-ব্যবসায়ী শ্রেণী এই দুইয়ের সংঘর্ষের ইঙ্গিত লুকাইয়া নাই, জোর করিয়া এমন কথা বলা যায় না। সংঘর্ষের কারণ যে ছিল তাহা তো সমসাময়িক স্মৃতি ও পুরাণেই জানা যাইতেছে। তাহা ছাড়া, অন্ত্যজ ও ম্লেচ্ছ পর্যায়ভুক্ত যে সুবৃহৎ নিম্নতম সমাজ-শ্রমিক তাহারাও বোধ হয় সেন-বর্মণ রাষ্ট্রের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। ইঁহাদের অনেকেই বজ্রযান-কালচক্রযান সহযান-মন্ত্রযান তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম, শৈব তান্ত্রিক ধর্ম, নাথ ধর্ম ইত্যাদির নানা সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন; সেন বর্মণ রাষ্ট্রের ধর্ম ও সমাজগত আদর্শ এই সব অবৈদিক, অস্মার্ত, অপৌরাণিক ধর্ম ও আচার সুনজরে দেখিত না, এই তথ্য অজানা নয়। ভূম্যধিকারী শ্রেণীপ্রধান, ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রপ্রধান, কৃষিপ্রধান সমাজে এই সব ভূমিবিহীন কৃষক ও অসংখ্য ম্লেচ্ছ, অন্ত্যজ সমাজ-শ্রমিকের কোনো অধিকারই যে ছিল না, ইহা অনুমান করিতে কল্পনার আশ্রয় লইবার দরকার হয় না। সমসাময়িক স্মৃতি-পুরাণই তাহার প্রমাণ। কাজেই, সেন-বর্মণ রাষ্ট্র ও সেই রাষ্ট্রের ধারক ও পোষক সমসাময়িক উচ্চতর শ্রেণীগুলির উপর ইঁহাদের প্রসন্ন থাকিবার কোনো কারণ নাই।

ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ের পাঠপঞ্জী

এই দুই অধ্যায়েরই, বিশেষ করে সপ্তম অধ্যায়ের প্রধান নির্ভর লিপিমালা (পরিশিষ্ট "খ" দ্রষ্টব্য)। তা'ছাড়া, অন্যান্য যে-সব উপাদান-উপকরণ থেকে তথ্যাদি আহরণ করা হয়েছে, দুই অধ্যায়েরই ২ নং প্রকরণে সে সব উপাদান-উপকরণের উল্লেখ এবং তাদের উপর মন্তব্য করা হয়েছে। পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে উল্লিখিত কিছু কিছু প্রাচীন গ্রন্থাদির আধুনিক সংস্করণ (কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনুবাদ ও টীকাটিপ্পনীসহ) এখনও প্রচলিত। তেমন কয়েকটি গ্রন্থের নামও নীচে একই সঙ্গে উল্লেখ করা হচ্ছে। কয়েকটি আধুনিক গ্রন্থের নামও প্রাচীন গ্রন্থাদির তালিকার শেষে দেওয়া হচ্ছে।

অনিরুদ্ধ ভট্ট, পিতৃদয়িত; আচারঙ্গ সূত্র, Sacred Books of the East series, XXII; আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প, গণপতি শাস্ত্রী সং। Trivandrum Sanskrit series, Trivandrum, চর্যাগীতি, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সং (হাজার বছরের পুরাণো বাঙলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ, জীমূতবাহন, কালবিবেক, প্রমথনাথ তর্কভূষণ সং Bibliotheca Indica Series, Calcutta, 1905; জীমূতবাহন, দায়ভাগ, trans H. T. Colebrooke, Calcutta, 1868; বল্লালচরিত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সং, কলিকাতা, ১৯০৪; বল্লালসেন, অদ্ভুতসাগর, কলিকাতা; বল্লালসেন, দানসাগর, কলিকাতা; বাৎস্যায়ন, কামসূত্রম, চৌখাম্বা সংস্কৃত গ্রন্থমালা; বায়ু, বিষ্ণু ও মৎস্যপুরাণ, বঙ্গবাসী সং, কলিকাতা; বৃহদ্ধর্মপুরাণ, পঞ্চানন তর্করত্নসং, কলিকাতা, ১৮২৭ শক; ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, হরপ্রসাদশাস্ত্রী সং, Bibliotheca Indica Series, কলিকাতা, ১৮৯৭; ভরতমল্লিক, চন্দ্রপ্রভা, কলিকাতা সং; হলায়ুধ, টীকাসর্বস্ব, Trivandrum Sanskrit series, Trivandrum; হলায়ুধ, ব্রাহ্মণসর্বস্ব, কলকাতা সং; শ্রীধরদাস, ন্যায়কন্দলী, Journal of the Andhra Research Society, IV, pp. 158-62; শ্রীধরদাস সদুক্তিকর্ণামৃত, *ed* Ramavatara Sharma and Haradatta Sharma; সন্ধ্যাকরনন্দী, রামচরিত, বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি সং, রাজসাহী ১৯৩৯; বাণী চক্রবর্তী, সমাজ-সংস্কারক রঘুনন্দন, কলকাতা, ১৯৬৪; সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, কলিকাতা; সুকুমার সেন, প্রাচীন বাঙলা ও বাঙালী, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালা, বিশ্বভারতী; ক্ষিতিমোহন সেন, জাতিভেদ, বিশ্বভারতী; Bagchi, P. C, Materials for a critical edition of the Bengali *Caryapadas*, in Journal of the Department of Letters, Calcutta Univ. XXX; Hazra, R.C., Studies in the Upapurāṇas, 2 vols, Calcutta, 1958; Hazra, R. C., Studies in Puranic records on Hindu rites and customs,

Dacca, 1940 ; Chattopadhyaya, Sudhakar, Social life in ancient India, Calcutta, 1965 ; Fick, Richard, Social organization of N. rth Eastern India in Buddha's time, Calcutta, ; Chakladar, H. C., Social life in ancient India, Calcutta ; Majumdar, R. C., *ed.* History of Bengal, I, Dacca, 1943 ; Majumdar, R. C., History of ancient Bengal, Chap. XII Calcutta, 1974 ; Majumdar, Bhakatprasad, The socio-economic history of Northern India, Calcutta, 1960 ;

অষ্টম অধ্যায়

গ্রাম ও নগর-বিন্যাস

১

যুক্তি

প্রাচীন বাঙলার সমাজ-বিন্যাসের বাস্তব উপাদান-বিবৃতি প্রসঙ্গে আমাদের বাস্তব সভ্যতার প্রাক্‌-আর্য ভিত্তির কথা বলিয়াছি। কৃষিজীবী অস্ট্রিক্‌ ভাষাভাষী কৌমগুলির সভ্যতা ও সমাজ-ব্যবস্থা ছিল একান্তই গ্রামীণ; গ্রামকে কেন্দ্র করিয়াই ইহাদের জীবন-যাত্রা রূপায়িত হইত; অন্তত অস্ট্রিক্‌ ভাষাতত্ত্ব আলোচনায় এই সিদ্ধান্তই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। তাহা ছাড়া, সমাজতত্ত্বেরও আলোচনায় দেখা যায়, একান্ত কৃষিনির্ভর এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীরশিল্পনির্ভর সমাজে গ্রামগুলি সাধারণত খুব বড় হয় না, এবং সংখ্যায়ও বেশি থাকে না। কৃষিক্ষেত্র ও কৃষিকর্ম চালনার জন্য ঘরবাড়ী তৈরী ও দেহাবরণ রচনার জন্য যে-সব শিল্প একান্ত প্রয়োজন তাহার জন্য প্রচুর আসবাব বা উপাদানের প্রয়োজন হয় না, বহুসংখ্যক লোকেরও প্রয়োজন হয় না। উপরন্তু কৃষিযোগ্য ভূমি কোথাও এত সুপ্রচুর থাকে না যে নগরের মত সীমাবদ্ধ স্বল্পস্থানে বহুসংখ্যক লোককে পালন করিতে পারে। সেই জন্যই গ্রাম যত বৃহৎই হউক না কেন আয়তনে বা লোকসংখ্যায় কিছুতেই নগরের সঙ্গে সমকক্ষতা করিতে পারিত না, আজও পারে না। অধিকন্তু, নগরের প্রয়োজন মিটাইবার মত কোথাও সুবিস্তৃত কৃষিক্ষেত্র থাকে না, থাকিতে পারে না; নগরের বাহিরে দেশের জনপদ জুড়িয়া সেই কৃষিক্ষেত্র বিস্তৃত থাকে, এবং সেই বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্রে কৃষিকর্ম যাঁহাদের চালাইতে হয় তাঁহাদিগকে কৃষিক্ষেত্র আশ্রয় করিয়া নিকটেই বাস করিতে হয়। তাঁহাদের বসতিস্থানগুলিই গ্রাম। কৃষিনির্ভর সভ্যতা সেই জন্য গ্রামকেন্দ্রিক হইতে বাধ্য। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহশিল্পগুলিও গ্রামকেন্দ্রিক, কারণ সেগুলি কৃষিকর্মেরই আনুষঙ্গিক, এবং কৃষিজীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। কৃষিকর্ম পরিচালনার জন্য প্রধান ও প্রথম প্রয়োজন জল; জল যেখানে সহজলভ্য কৃষিকর্মও সেখানে সমৃদ্ধ। প্রাচীন বাঙলায় তাহাই দেখিতেছি। গ্রামগুলির পত্তনও সেইজন্যই সর্বত্র নদী, নালা, খাটিকা, খাল, বিল ইত্যাদির তীরে তীরে। খাদ্য ও পানীয় যেখানে সহজলভ্য সেইখানেই তো মানুষের বসতি; কাজেই সেই বসতি জলপ্রবাহকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিবে, ইহা কিছু বিচিত্র নয়। গ্রাম্য কৃষিসভ্যতার বিকাশও সেইজন্য নদী, খাল, বিল, খাটিকার তীরে তীরে। প্রাচীন বাঙলায়ও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই।

নগরসভ্যতা সম্বন্ধেও একথা সত্য; কিন্তু তাহা অন্য প্রয়োজনে। পানীয় জলের

প্রয়োজন একটা নগরেও থাকে, কিন্তু সে পানীয় নদনদীর জলপ্রবাহ ছাড়া অন্য উপায়েও মিটান যায়; যেমন, কূপের সাহায্যে খুব সুপ্রাচীন কালেও হইয়াছে। তবু, যেখানে স্বল্পমাত্র স্থান আশ্রয় করিয়া বহুলোক বাস করে সেখানে জলপ্রবাহের একটা প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কিন্তু, ইহা ছাড়াও, নগরসভ্যতা নদী ও প্রশস্ত যাতায়াত পথকে আশ্রয় করিবার অন্য একাধিক কারণ প্রাচীন কালে ছিল। নগর এক প্রকারের নয়, কিংবা একই প্রয়োজনে গড়িয়া উঠে নাই। রাষ্ট্রীয় শাসনকার্য পরিচালনার জন্য দেশের নানা জায়গায় কতকগুলি কেন্দ্র রচনার প্রয়োজন হইত; রাজকর্মচারীরা সেইখানে বাস করিতেন, রাজ-কর্মের জন্য সেখানে লোকেদের যাওয়া আসা প্রয়োজন হইত, এবং এই সব বসতি ও যাতায়াত-পথ আশ্রয় করিয়া শাসনাধিষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে হাট-বাজার ইত্যাদিও গড়িয়া উঠিত। প্রধানত যাতায়াতের সুবিধার জন্যই এইসব শাসনাধিষ্ঠানের কেন্দ্রগুলি গড়িয়া উঠিয়াছিল হয় নদীর তীরে, অথবা সুপ্রশস্ত রাজপথের পার্শ্বে, অথবা দুয়েরই আশ্রয়ে। রাজামহারাজদের রাজধানী ও জয়স্কন্ধাবারগুলি সম্বন্ধেও একই যুক্তি প্রযোজ্য; এবং এগুলিও গড়িয়া উঠিয়াছিল নদী বা রাজপথ বা উভয়েরই আশ্রয়ে। সৈন্যচালনা এবং সামরিক প্রয়োজনেও রাজধানী ও জয়স্কন্ধাবারগুলি নদী এবং প্রশস্ত রাজপথ আশ্রয় করিত। আর এক শ্রেণীর নগর গড়িয়া উঠিত একান্তই ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বৃহত্তর শিল্পের প্রয়োজনে, যে-সব শিল্প প্রধানত বৃহত্তর ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে অচ্ছেদ্য-ভাবে যুক্ত অন্তত সেই সব শিল্পের প্রয়োজনে, যেমন নৌ-শিল্প, সমৃদ্ধ বস্ত্রশিল্প ইত্যাদি। এই সব ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র প্রশস্ত স্থলপথ বা জলপথ বা উভয়ই আশ্রয় না করিয়া গড়িয়া উঠিতে পারে না; এবং শুধু তাহাই নয়, সাধারণত দুইপথের সঙ্গম স্থলেই এই সব ব্যবসা-বাণিজ্যকেন্দ্রের অবস্থিতি দেখা যায়। দুই পথ উভয়ই স্থলপথ বা উভয়ই জলপথ হইতে পারে, একটি স্থলপথ অপরটি জলপথ হইতে পারে; আবার সামুদ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্যকেন্দ্র হইলে একটি স্থল বা জলপথ, অপরটি সমুদ্রপথ হইতে পারে। তবে, সব নগরই যে একটি পৃথক পৃথক কারণে গড়িয়া উঠে তাহা নয়; বরং প্রাচীন বাঙলায় দেখা যায়, একাধিক কারণে এক একটি নগরের পত্তন হইয়াছিল। শাসনাধিষ্ঠান বা রাজধানী বা বিজয়স্কন্ধাবার একই সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যকেন্দ্র হওয়াও বিচিত্র নয়। প্রাচীন বাঙলায়ও তাহা হইয়াছিল। সদ্যবর্ণিত প্রয়োজন ছাড়া অন্য প্রয়োজনেও কোনো কোনো নগর গড়িয়া উঠে; যেমন, এক একটি স্থানের এক একটি বিশেষ তীর্থমহিমা থাকে, এবং শুধু বিশেষ তিথি-পর্ব উপলক্ষে নয়, সম্বৎসর ধরিয়াই তীর্থপুণ্য কামনায় বহুলোক সেখানে যাতায়াত করে। এই সব তীর্থস্থানকে কেন্দ্র করিয়া বহু লোকের বসতি প্রতিষ্ঠিত হয়, শিল্প ও ব্যবসাকর্ম বিস্তৃতি লাভ করে এবং ধীরে ধীরে নগর গড়িয়া উঠে, এবং পরে হয়তো প্রয়োজন হইলে শাসনাধিষ্ঠানও প্রতিষ্ঠিত হয়। এইসব তীর্থকেন্দ্রে বৃহৎ শিক্ষাকেন্দ্রও সময় সময় গড়িয়া উঠিতে দেখা যায়, বিশেষভাবে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ও

সংস্কৃতির কেন্দ্র। বৃহৎ বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রগুলির পত্তন হইত গ্রাম ও নগর হইতে একটু দূরে, বিহার ও সংঘগুলি আশ্রয় করিয়া। এগুলি ঠিক নগর নয়, কিন্তু নগরোপম। প্রাচীন বাঙলার এই রকম নগরোপম বৌদ্ধ-মহাবিহারের কিছু কিছু বিবরণও পাওয়া যায়। কিন্তু শিক্ষাকেন্দ্রই হউক আর তীর্থকেন্দ্রই হউক, এগুলিরও আশ্রয় ছিল নদনদী প্রভৃতি জলপ্রবাহ এবং প্রশস্ত যাতায়াত পথ। সমাজতত্ত্বের আলোচনায় দেখা যায়, যে-প্রয়োজনেই নগর গড়িয়া উঠুক না কেন, প্রধানত তাহাদের অর্থনৈতিক নির্ভর বৃহৎশিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য ; এবং শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির উপরই নগর-সভ্যতার উন্নতি-অবনতি অনেকাংশে নির্ভর করে, যেমন কৃষির উন্নতি-অবনতির উপর নির্ভর করে গ্রামের উন্নতি-অবনতি।

প্রধানত কৃষিনির্ভর গ্রাম সভ্যতা এবং প্রধানত ব্যবসা-বাণিজ্যনির্ভর নগর-সভ্যতা এ দুয়ের আকৃতি শুধু নয়, প্রকৃতিও বিভিন্ন। গ্রামের যাঁহাদের বাস করিতে হইত, তাঁহারা সাধারণত কৃষিনির্ভর ভূম্যধিকারী, মহত্তর, কুটুম্ব, কৃষক বা ক্ষেত্রকর, সমাজ-শ্রমিক, ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিক, এবং কিছু কিছু কৃষি ও গৃহস্থ কর্মসম্পৃক্ত শিল্পী। ইঁহাদের জীবনের কামনা বাসনা, ভাবনা-কল্পনা, ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি সমস্তই কৃষিকর্ম এবং গ্রাম্য গার্হস্থ্য ধর্মকে আশ্রয় করিয়াই গড়িয়া উঠিত। নগরে যাঁহারা বাস করিতেন, তাঁহারা ক্ষুদ্র বৃহৎ সামন্ত, ক্ষুদ্র বৃহৎ রাজকর্মচারী শ্রেষ্ঠী, সার্থবাহ, শিল্পী, বণিক ইত্যাদি, এবং ইঁহাদেরই অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিকে আশ্রয় করিয়া, উপলক্ষ করিয়া স্থায়ী-অস্থায়ী অন্যান্য বহুতর লোক। শুধু ইঁহারাই নন্, ইঁহাদের দৈনন্দিন গার্হস্থ্য প্রয়োজন এবং অন্যান্য আরও বহুতর প্রয়োজন মিটাইবার জন্য বহুতর সমাজ-শ্রমিকও। গ্রামে যে-সব কৃষি ও শিল্পদ্রব্য ইত্যাদি উৎপন্ন হইত তাহাদের ক্রয়-বিক্রয়কেন্দ্র গ্রাম হইতে দূরে, নগরে-বন্দরে ; কাজেই উৎপাদিত ধনের বণ্টনকেন্দ্র গ্রামে নয়। শাসনকেন্দ্রও নগরে, বাণিজ্যকেন্দ্রও তাহাই। কাজেই সামাজিক ধনের বৃহত্তর গতি-কেন্দ্রই হইতেছে নগর ; বণ্টন-ব্যবস্থাও প্রায় সবটাই নগরে। এই ব্যবস্থায় জাগতিক সুখ-সুবিধা যাহা কিছু, তাহাও বেশি ভোগ করিত নগরগুলিই ; বিশেষত শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য যতদিন ধনাগমের প্রথম ও প্রধান উপায় ততদিন তো নগরগুলিই দেশের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টার কেন্দ্রস্থল। অবশ্য, সমাজ যে পরিমাণে কৃষিনির্ভর সেই পরিমাণে গ্রামগুলিও প্রাধান্য লাভ করে। প্রাচীন বাঙলায়ও বোধ হয় তাহা হইয়াছিল ; যে-সব প্রমাণ বিদ্যমান তাহা হইতে এই অনুমান করা চলে। তাহা ছাড়া, ইহাই সমাজ-বিবর্তনের গতি-প্রকৃতির ধারা।

এইসব কারণেই প্রাচীন বাঙলার সমাজ-বিন্যাসের পূর্ণতর পরিচয় পাইতে হইলে গ্রাম ও নগর-বিন্যাস সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব সমস্ত তথ্যই জানা প্রয়োজন। দুঃখের বিষয়, অন্যান্য অনেক বিষয়ের মতন এ-বিষয়েও যথেষ্ট তথ্য-সাক্ষ্য আমাদের সম্মুখে উপস্থিত নাই। যাহা আছে তাহার মধ্যে লিপিগুলিই প্রধান এবং প্রামাণিক ; কিছু কিছু সাক্ষ্য-

প্রমাণ সমসাময়িক সাহিত্য গ্রন্থাদি হইতেও পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া, ধনসম্বল অধ্যায়ে ও সমাজ-বিন্যাস খণ্ডের বিভিন্ন অধ্যায়ে যে-সব তথ্যের আলোচনা করা হইয়াছে তাহা হইতে যুক্তিসিদ্ধ কিছু কিছু অনুমানও করা চলে। গ্রাম ও নগর সম্বন্ধে অনেক কথাই প্রসঙ্গক্রমে এই সব অধ্যায়ে বলা হইয়াছে; এই অধ্যায়ে সে-সবের পুনরাবৃত্তি না করিয়া মোটামুটি ভাবে গ্রাম ও নগরের সংস্থান, কিছু কিছু গ্রাম-নগরের বিবরণ, গ্রাম ও নগরের সম্বন্ধ, গ্রাম্য ও নাগর সভ্যতা ও সংস্কৃতির পার্থক্য ইত্যাদি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাইতে পারে।[১]

২

গ্রাম ও গ্রামের সংস্থান

বাঙলার লিপিগুলিতে রাজসরকার হইতে বিক্রীত বা দত্ত ভূমিগুলির বিবরণ ও তৎসংলগ্ন গ্রামগুলির বিবরণ যে-ভাবে পাইতেছি তাহা হইতে বাঙলার গ্রামের সংস্থান ও সংগঠন সম্বন্ধে কতকগুলি সুস্পষ্ট ধারণা করিতে পারা যায়। মহাস্থান লিপি (খৃষ্টপূর্ব তৃতীয়-দ্বিতীয় শতক, আনুমানিক) এবং চন্দ্রবর্মার শুশুনিয়া লিপির (খ্রীষ্টোত্তর চতুর্থ শতক) কথা ছাড়িয়া দিয়া পঞ্চম শতক হইতেই আলোচনা আরম্ভ করা যাইতে পারে। এই শতকের সাত আটখানা লিপির প্রত্যেকটিতেই দেখিতেছি, বাস্তুভূমির চেয়ে খিলভূমির চাহিদা অনেক বেশি, এবং খিলভূমি যে চাষের জন্যই দান-বিক্রয় হইতেছে এ সম্বন্ধেও সন্দেহ নাই; পরবর্তী লিপিগুলির সাক্ষ্যও তাহাই। বস্তুত, আদিপর্বের শেষ পর্যন্ত সমস্ত সাক্ষ্যেই দেখিতেছি, কৃষিযোগ্য এবং কৃষিভূমির উপরই গ্রাম্য সমাজের নির্ভর, এবং তাহার চাহিদাই উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। এমন কি খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয়-দ্বিতীয় শতকের মহাস্থান লিপিতে যে-ধান্যকে দেখিতেছি লোকের প্রাণধারণের প্রধান উপায় সেই ধান্যও তো স্থানীয় অর্থাৎ এই দেশেরই কৃষিক্ষেত্রলব্ধ সম্পদ বলিয়া মনে না করিবার কোনো কারণ নাই। লিপিগুলির বিশ্লেষণে স্পষ্টতই দেখা যাইতেছে, এই সব খণ্ড খণ্ড কৃষিক্ষেত্র সমস্তই একে অন্যের সঙ্গে সংলগ্ন, এক খিলক্ষেত্রের সীমা আর এক ক্ষেত্রের সীমার একেবারে গায়েলাগ; বিচ্ছিন্ন ক্ষেত্রভূমি প্রায় নাই বলিলেই চলে। অনেক দৃষ্টান্ত এমনও আহরণ করা যায়, যেখানে একই ব্যক্তি যে-পরিমাণ ক্ষেত্রভূমি চাহিতেছেন তাহা এক গ্রামে পাওয়া যাইতেছে না, বিভিন্ন গ্রাম হইতে সংগ্রহ করিতে হইতেছে। আবার নূতন গ্রামের

১। এই অধ্যায়ে বাঙলার লিপি-সাক্ষ্যের এবং ইতিপূর্বে উল্লিখিত অন্যান্য সাক্ষ্যের পাদটীকা দেওয়া হইতেছে না।

পত্তন যেখানে হইতেছে সেখানে সমস্ত বাস্তু ও ক্ষেত্রভূমি একত্র নেওয়া হইতেছে, বিচ্ছিন্নভাবে নয়।

কয়েকটি দৃষ্টান্ত আহরণ করা যাইতে পারে। পঞ্চম শতকের পাহাড়পুর পট্টোলীতে দেখিতেছি, এক ব্রাহ্মণদম্পতি ১ কুল্যবাপ ২½ দ্রোণবাপ ক্ষেত্রভূমি ক্রয় করিতেছেন তিনটি বিভিন্ন গ্রাম হইতে। এই শতকেরই বৈগ্রাম লিপিতে দেখা যাইতেছে, ভোয়িল নামে জনৈক গৃহস্থ বায়িগ্রামের ত্রিবৃতা নামক পাড়ায় (?) ৩ কুল্যবাপ খিলক্ষেত্র এবং এক দ্রোণবাপ বাস্তুভূমি কিনিয়াছিলেন শ্রীগোহালী পাড়ায় (?); ভোয়িলের সহোদর ভ্রাতা ভাস্করও একই সঙ্গে কিছু বাস্তুভূমি কিনিয়াছিলেন শেষোক্ত গ্রামে। স্পষ্টতই বোঝা যাইতেছে শ্রীগোহালীতে খিলভূমি সহজলভ্য আর ছিল না। ত্রিবৃতা পাড়ায় যে ভূমিখণ্ড কিনিয়াছিলেন তাহার সম্বন্ধে স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, ঐ ভূমি হইতে রাজার কোনও আয় এ-যাবৎ হইতেছিল না, অর্থাৎ ভূমিখণ্ডটি পতিত পড়িয়াছিল। ষষ্ঠ শতকের গুণাইঘর পট্টোলীতে একসঙ্গে অনেকগুলি খবর পাওয়া যাইতেছে। মহারাজ রুদ্রদত্তের অনুরোধে শ্রীমহারাজ বৈন্যগুপ্ত উত্তরমণ্ডলের অন্তর্গত কান্তেড়দক গ্রামে মহাযানিক অবৈবর্তিক ভিক্ষুসংঘকে পাঁচটি পৃথক ভূখণ্ডে ১১ পাটক কর্ষণযোগ্য অক্ষত অকৃষ্ট ভূমিদান করিয়াছিলেন। প্রথম ভূখণ্ডের সীমার পূর্বদিকে গুণিকাগ্রহার গ্রাম এবং বিষ্ণুবর্ধকির (?) ক্ষেত্র, দক্ষিণে মৃদুবিলাল (?) নামক জনৈক গৃহস্থের ক্ষেত্র এবং রাজবিহারের ক্ষেত্র, পশ্চিমে সূরীনশীর-পূর্ণকের ক্ষেত্র; উত্তরে দোষীভোগ পুষ্করিণী— এবং বাম্পিয়ক ও আদিত্যবন্ধুর ক্ষেত্রসীমা। দ্বিতীয় ভূখণ্ডের সীমায় পূর্বদিকে গুণিকা-গ্রহার গ্রাম, দক্ষিণে পক্কবিললের ক্ষেত্র, পশ্চিমে রাজবিহার, উত্তরে বৈদ্যনাম গৃহস্থের ক্ষেত্র। তৃতীয় ভূখণ্ডের সীমায় পূর্বদিকে জনৈক গৃহস্থের ক্ষেত্রভূমি, দক্ষিণে আর একজন গৃহস্থের ক্ষেত্রসীমা; পশ্চিমে জোলারির ক্ষেত্রসীমা; উত্তরে নাগজোদকের ক্ষেত্রসীমা। চতুর্থ ভূমিখণ্ডের সীমায়, পূর্বে বুদুকের ক্ষেত্রসীমা, দক্ষিণে কলবের ক্ষেত্রসীমা; পশ্চিমে সূর্যের ক্ষেত্রসীমা, উত্তরে মহীপালের ক্ষেত্রসীমা। পঞ্চম ভূমিখণ্ডের পূর্বসীমায় খণ্ডবিদুগ্-গুরিকের ক্ষেত্র, দক্ষিণে মণিভদ্রের ক্ষেত্র, পশ্চিমে যজ্ঞরাতের ক্ষেত্র, উত্তরে নাদডদক গ্রাম। সপ্তম শতকে জয়নাগের বপ্যঘোষবাট পট্টোলী দ্বারা বপ্যঘোষবাট গ্রামখানা ব্রাহ্মণ ভট্ট বীরস্বামীকে দান করা হইয়াছিল। এই গ্রামের পশ্চিম সীমায় কুক্কুট গ্রামের ব্রাহ্মণদিগকে প্রদত্ত ক্ষেত্রভূমির সীমা; উত্তরে নদীর খাত্; পূর্বে একই নদীর খাত্ এবং এই খাত্ হইতে আরম্ভ করিয়া আম্রপণ্ডিক গ্রামের পশ্চিম সীমা স্পর্শ করিয়া যে সর্পযানক একেবারে চলিয়া গিয়াছে ভট্ট উন্মীলনস্বামীর ক্ষেত্রভূমি পর্যন্ত; সেইখান হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে সোজা ভরাণিস্বামীর ক্ষেত্র পর্যন্ত এবং সেখান হইতে সোজা লম্বমান হইয়া ভট্ট উন্মীলনস্বামীর ক্ষেত্রসীমায় অবস্থিত বথটসূমালিকার পুষ্করিণী ভেদ করিয়া কুক্কুট গ্রামের ব্রাহ্মণদিগকে প্রদত্ত ভূমিসীমা পর্যন্ত বিলম্বিত। এই শতকেরই ত্রিপুরার লোকনাথ পট্টোলীতে দেখিতেছি, জনৈক ব্রাহ্মণ মহাসামন্ত প্রদোষশর্মা দুই শতাধিক

ব্রাহ্মণের বসবাসের জন্য সুহ্ম বিষয়ের অরণ্যময় প্রদেশে বাস্তু ও ক্ষেত্রভূমি রাজার নিকট হইতে দানস্বরূপ গ্রহণ করিতেছেন। এক্ষেত্রে স্পষ্টতই বনভূমি পরিষ্কার করিয়া নূতন গ্রামের পত্তন হইতেছে, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে না। অষ্টম হইতে ত্রয়োদশ শতকের শেষাশেষি পর্যন্ত লিপি প্রমাণ অপর্যাপ্ত, এবং সমগ্র বাঙলাদেশ জুড়িয়া, শ্রীহট্ট হইতে মেদিনীপুর, এবং বরেন্দ্র হইতে খাড়ীমণ্ডল এই সব লিপির ব্যাপ্তি। যে সব ক্ষেত্রভূমি, বাস্তুভূমি এবং গ্রামের বর্ণনা এই লিপিগুলিতে পাওয়া যায় তাহাতে দেখা যাইতেছে, ক্ষেত্রভূমি ক্ষেত্রভূমির সঙ্গে, এবং বাস্তুভূমি বাস্তুভূমির সঙ্গে একেবারে সংলগ্ন, এবং কোথাও কোথাও গ্রামও গ্রামের সংলগ্ন।

কিন্তু দৃষ্টান্ত উল্লেখের আর প্রয়োজন নাই। উদ্ধৃত দৃষ্টান্ত হইতে দুইটি তথ্য পরিষ্কার। প্রথমত, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাস্তু ও কৃষিক্ষেত্র বিস্তৃত হইয়াছে, সর্বপ্রকার ভূমির চাহিদা বাড়িয়াছে, বন-অরণ্যভূমি পরিষ্কার নূতন গ্রামের পত্তন হইয়াছে, পতিত অথচ কর্ষণযোগ্য ভূমি কর্ষণাধীন করা হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, বাস্তু ও ক্ষেত্রভূমি লইয়া প্রত্যেকটি গ্রাম পৃথক অথচ ঘনসন্নিবিষ্ট, দৃঢ়সংবদ্ধ, অর্থাৎ গ্রামান্তর্গত গৃহস্থবাড়ীগুলি এবং কৃষিক্ষেত্রখণ্ডগুলি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত নয়। তাহা না হইবার কারণও আছে। যে ভূমি-নির্ভর সমাজের জীবিকা প্রধানত শুধু পশুপালন এবং পশুচারণ, সেখানে চারণভূমি যেমন দেখা যায় দূরে দূরে বিক্ষিপ্ত তেমনই বাস্তুও থাকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন। কিন্তু একান্ত ভাবে কৃষিনির্ভর গ্রামে তাহা হইতে পারে না. বরং প্রবণতা দেখা যায় ঠিক তাহার বিপরীত দিকে। তাহা ছাড়া, কৃষিজীবী সমাজে নূতন গ্রামের যখন পত্তন হয়, তখন প্রথমেই বৃহৎ বসতি ও ক্ষেত্রভূমির বিস্তার দেখা যায় না। কয়েকটি গৃহস্থ বাড়ী ও তাহাদের প্রয়োজন মত ক্ষেত্রভূমি লইয়া গ্রামের পত্তন হয়; তাহার পর গ্রামের লোকবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই কয়েকটি বাড়ী ও ক্ষেত্রভূমিকে কেন্দ্র করিয়া দুয়েরই ক্রমবিস্তার ঘটিতে থাকে। লিপিস বদ্ধ সংবাদ একটু সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিলে প্রাচীন বাঙলার গ্রামগুলির এই গঠন-প্রকৃতি ধরিতে পারা কঠিন নয়। তাহা ছাড়া. গ্রামগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট ও দৃঢ়সংবদ্ধ হইবার অন্য কারণও আছে। ভয়-ভীতি, নানাপ্রকারের বিপদ-উৎপাত প্রভৃতি হইতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেও গ্রামবাসীরা ঘনসন্নিবিষ্ট হইয়া বাস করিত, এবং সাধারণত এক এক বৃত্তি আশ্রয় করিয়া সমশ্রেণীর লোকেদের লইয়া এক একটি পাড়া গড়িয়া উঠিত। এই ধরনের পাড়া ও গ্রামের গঠন প্রাচীন কৌমসমাজেরই দান।

প্রাচীন লিপিমালায় অসংখ্য গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। সব গ্রামের আয়তন ও লোক-সংখ্যা সমান ছিল না, ইহাতো সহজেই অনুমেয়; প্রকৃতিও একপ্রকার ছিল না, এরূপ অনুমানেও বাধা নাই। ছোট ছোট গ্রাম বা গ্রামাংশের নাম ছিল পাটক (বা পাড়া)। বৈগ্রাম পট্টোলীতে তো স্পষ্টই দেখিতেছি, বায়িগ্রামের অন্তত দুইটি ভাগ ছিল, ত্রিবৃতা ও শ্রীগোহালী, যদিও ইহাদের পাটক বলা হইতেছে না। কিন্তু ষষ্ঠ শতকের

৫নং দামোদরপুর পট্টোলীতে পরিষ্কার স্বচ্ছন্দ পাটক এবং পুরাণ-বৃন্দকহারি অন্তর্গত আর একটি পাটকের উল্লেখ দেখিতেছি। মল্লসারুল লিপিতে বাটক নামে একটি জনপদ বিভাগের নাম পাওয়া যাইতেছে, যেমন, নির্বৃত-বাটক, কপিস্থ-বাটক, শাল্মলী-বাটক, মধু-বাটক ইত্যাদি। এই বাটক ও পাটক সমার্থক, এবং একই শব্দ বলিয়া মনে হইতেছে। এই লিপিরই খণ্ডজোটিকা বোধ হয় কোনো জোটিকা বা খাড়ীকা তীরবর্তী গ্রাম। যাহা হউক, এই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া আদিপর্বের শেষ পর্যন্ত এই পাটক বিভাগ বিদ্যমান। যে-সব গ্রামের অবস্থিতি প্রশস্ত জল ও স্থলপথের উপর, বাস্তুক্ষেত্র ও কৃষিক্ষেত্র যেখানে সুলভ ও সুপ্রচুর, যে-সব গ্রামে শিল্প-বাণিজ্যের সুযোগ ও প্রচলন বেশি, কিংবা যে-সব গ্রামে শাসনকার্য পরিচালনার কোনো কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত থাকিত, শিক্ষা, সংস্কৃতি বা ধর্মকর্মের কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত হইত, সেই সব গ্রাম সদ্যোক্ত এক বা একাধিক কারণে আয়তনে, লোকসংখ্যায় এবং মর্যাদায় অন্যান্য গ্রামাপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বলাভ করিত, সন্দেহ নাই। এই রকম দুই চারিটি বৃহৎ এবং মর্যাদা সম্পন্ন গ্রামের খবর লিপিমালা ও সমসাময়িক সাহিত্যে পাওয়া যায়; পরে তাহাদের কথা বলিতেছি। আকৃতি ও প্রকৃতির এই পার্থক্য সত্ত্বেও প্রত্যেক গ্রামই কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্যে এক প্রকার; যেমন, প্রত্যেক গ্রামই কয়েকটি সুনির্দিষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বিভক্ত। বাস্তুভূমি ও ক্ষেত্রভূমি দুই প্রধান অঙ্গ; ইহা ছাড়া প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই উষরভূমি, মালভূমি, গর্তভূমি, তলভূমি, গোচরভূমি, বাটক-বাট, গোপথ-গোবাট-গোমার্গভূমি ইত্যাদির উল্লেখ পাইতেছি, একেবারে পঞ্চম হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত। তাহা ছাড়া, খাল, বিল, খাটিকা, খাটা, পুষ্করিণী, নদী, নদীর খাত, গাঙ্গিনিকা ইত্যাদির উল্লেখ তো আছেই। গোচর বা গোচারণভূমি সর্বদাই গ্রামের ক্ষেত্রভূমির প্রান্তসীমানায় অথবা একেবারে এক পাশে, এবং সেইখান হইতে গ্রামের সীমা ঘেঁষিয়া গ্রামের ভিতর পর্যন্ত গোবাট-গোমার্গ-গোপথ। কোনো কোনো গ্রামে হট্ট, হট্টীয়গৃহ, আপণ ইত্যাদির উল্লেখ পাইতেছি; নানা দেবতার মন্দির, দেবকুল, জৈন ও বৌদ্ধ বিহার ইত্যাদির উল্লেখও আছে। সব গ্রামে হাট, বাজার, মন্দির ইত্যাদি থাকিত না; লিপিতেও তেমন উল্লেখ নাই; যে-সব গ্রামে ছিল সে সব ক্ষেত্রেই উল্লেখ পাইতেছি মাত্র। কোনো কোনো গ্রামে বনজঙ্গল, ঝাড়, বড় বড় গাছ ইত্যাদিও ছিল (সবন, সঝাটবিটপ ইত্যাদি); লিপিতে তাহাও উল্লিখিত হইয়াছে। এই সব বনজঙ্গল হইতে লোকে জ্বালানি কাঠ, ঘর-বাড়ী প্রস্তুত করিবার জন্য বাঁশ, খুঁটি ইত্যাদি সংগ্রহ করিত। বিক্রীত ও দত্তভূমির শ্রেণী বিভাগের যে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ লিপিগুলিতে পাওয়া যায় তাহাতে এ-তথ্য সুস্পষ্ট যে, পঞ্চম শতকের আগেই বাঙলার গ্রাম্য কৃষিনির্ভর সমাজ সুশৃঙ্খল সুবিন্যস্ত ভাবে সমস্ত অধিগম্য ও প্রয়োজনীয় ভূমিকে সামাজিক স্বার্থসাধনের বিষয়ীভূত করিয়াছিল।

গ্রামগুলির আপেক্ষিক আয়তন সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত সেন-আমলের লিপিগুলিতে

পাওয়া যায়। বল্লালসেনের নৈহাটি লিপিতে দেখি, বাল্লহিট্‌ঠা গ্রামের আয়তন ৭ ভূপাটক ৭ দ্রোণ ১ আঢক ৩৪ উন্মান এবং ৩ কাক (বাস্তু, ক্ষেত্র, পতিত্‌ ভূমি এবং খাল সহ), এবং বার্ষিক উৎপত্তিক ৫০০ কপর্দকপুরাণ। এই গ্রাম ছিল বর্ধমানভুক্তির উত্তররাঢ় মণ্ডলের স্বল্পদক্ষিণবীথীর অন্তর্গত। লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুর লিপিতে দেখিতেছি, একই বর্ধমানভুক্তির পশ্চিম খাটিকার অন্তর্ভুক্ত বেতড্ডচতুরকের অন্তর্গত বিড্ডারশাসনগ্রামের আয়তন (অরণ্য, জল, স্থল, গর্তভূমি, উষরভূমি, ইত্যাদি সহ) ৬০ ভূদ্রোণ ১৭ উন্মান ; দ্রোণ প্রতি ১৫ পুরাণ হিসাবে বার্ষিক উৎপত্তিক ৯০০ পুরাণ। এই রাজারই তর্পণদীঘি লিপিতে দেখিতেছি, বিক্রমপুরের অন্তর্গত বেলহিষ্টী গ্রামের আয়তন মাত্র ১২০ আঢ়াবাপ (আঢক) ৫ উন্মান ; বার্ষিক উৎপত্তিক মাত্র ১৫০ কপর্দক পুরাণ। স্পষ্টতই দেখা যাইতেছে, তিনটি ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম তিন বিভিন্ন আয়তনের। পাল ও সেন আমলের, এমন কি আগেকার পর্বের লিপিগুলি বিশ্লেষণ করিলেও দেখা যাইবে, অধিকাংশ গ্রামই কোনও নদনদী, খাল, বিল, খাটিকা, খাড়ীকা প্রভৃতির তীরে অবস্থিত। অধিকাংশ গ্রামে ঘাট (সঘট্ট), পুষ্করিণী ইত্যাদিও দেখা যায়। কোটালিপাড়ার একটি পট্টোলীতে গ্রামের প্রান্তে বলদের গাড়ীর রাস্তাও একটি ভূমির সীমারূপে উল্লিখিত হইয়াছে।

গ্রামসমাজ যে কৃষিপ্রধান-সমাজ তাহা তো বারবারই বলিয়াছি। কিন্তু ইহার অর্থ এ নয় যে, গ্রামে শিল্পীদের বাস ছিল না। বাঁশ ও বেতের শিল্প, কাষ্ঠশিল্প, মৃৎশিল্প, কার্পাস ও অন্যান্য বস্ত্রশিল্প, লৌহশিল্প ইত্যাদির কেন্দ্র তো গ্রামেই ছিল, এরূপ অনুমান সহজেই করা যায়। কৃষিকর্মের প্রয়োজনীয় বাঁশ ও বেতের নানাপ্রকার পাত্র ও ভাণ্ড, ঘরবাড়ী ও নৌকা, মাটির হাঁড়িভাণ্ড প্রভৃতি, দা'-কুড়াল-কোদাল, লাঙ্গলের ফলা, খন্তা ইত্যাদি নিত্য ব্যবহার্য কৃষিযন্ত্রাদি ইত্যাদির প্রয়োজন তো গ্রামেই ছিল বেশি। কার্পাস ফুল ও বীচি, তাঁত, তূলা তূলাধুনা ইত্যাদির সঙ্গে পরিচয় যে গ্রামের লোকদেরই বেশি তাহার ইঙ্গিত পাইতেছি বিজয়সেনের দেওপাড়া লিপিতে, চর্যাগীতিগুলিতে এবং সদুক্তিকর্ণামৃতগ্রন্থের দু'একটি শ্লোকে। শেষোক্ত গ্রন্থের একটি শ্লোকে কবি শুভাংক বলিতেছেন, নির্ধন শ্রোত্রিয়গণের বাটিকাবিহিত কুটীর প্রাঙ্গণ কার্পাস বীজ দ্বারা আকীর্ণ থাকিত। সূতাকাটা দরিদ্র ব্রাহ্মণ-গৃহস্থবাড়ীর মেয়েদেরও দৈনন্দিন কর্ম ছিল ; কাপড় বুনিতেন তন্তুবায়-কুবিন্দকেরা, যুঙ্গি বা যুগীরা। কিন্তু এই সব শিল্প ছাড়া কোন কোন গ্রামে দুই একটি সমৃদ্ধতর শিল্পও প্রচলিত ছিল। শ্রীহট্ট জেলার ভাটেরা গ্রামে প্রাপ্ত গোবিন্দকেশবের লিপিতে দেখিতেছি, এক কাংসকার (বা কাঁসারী) গোবিন্দ, এক নাবিক দোয়জে এবং এক দন্তকার (হাতীর দাঁতের শিল্পী) রাজবিগা নিজ নিজ গ্রামে বসিয়াই তাঁহাদের স্বীয় বৃত্তি অভ্যাস করিতেন। কাংসকার গোবিন্দ বেশ সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন বলিয়া মনে হয় ; তাঁহার বাড়ীতে পাঁচখানা ঘর ছিল।

নাবিক গ্যোজ্জেরও ছিল দুইখানা ঘর। অথচ অন্যান্য সকলেরই প্রায় দেখিতেছি এক একখানা ঘর। দুই চারিজন ছোটখাট ব্যবসায়ীও যে গ্রামে বাস করিতেন না তাহা নয়; পাল-সম্রাট মহারাজাধিরাজ মহীপালের রাজত্বের তৃতীয়-চতুর্থ বৎসরে যে দুই বণিক যথাক্রমে একটি নারায়ণ ও একটি গণেশ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেই দুইজনই ছিলেন ত্রিপুরা জেলার বিলকীন্দক গ্রামবাসী। ষষ্ঠ শতকের কোটালিপাড়ার দুইটি পট্টোলীতে উল্লিখিত ভূমিসীমা প্রসঙ্গে যে "নৌদণ্ডক", "ঘাট" এবং "নাবাতাক্ষেণী"র উল্লেখ পাইতেছি তাহাতে মনে হয়, কোনো কোনো গ্রাম সমৃদ্ধ নৌ-বাণিজ্যের কেন্দ্রও ছিল।

গ্রামে কাহারা প্রধানত বাস করিতেন তাহাও অনুমান করা কঠিন নয়; লিপিগুলিতে তাহার ইঙ্গিতও পাওয়া যায়, একেবারে পঞ্চম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত। তাহা ছাড়া, বৃহদ্ধর্ম ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেও তাহার কিছু কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। গ্রামবাসী ছিলেন সাধারণত ব্রাহ্মণেরা, ভূমিবান্ মহামত্তর, মহত্তর, কুটুম্বরা; ক্ষেত্রকরেরা, বারজীবিরা, ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকেরা; তন্তুবায়-কুবিন্দক, কর্মকার, কুম্ভকার, কাংসকার, মালাকার, চিত্রকার, তৈলকার, সূত্রধার প্রভৃতি শিল্পীরা; তৌলিক, মোদক, তাম্বুলী, শৌণ্ডিক, ধীবর-জালিক প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা; গোপ, নাপিত, রজক, আভীর, নট-নর্তক প্রভৃতি সমাজ-সেবকেরা; বরুড় (বাউড়ী), চর্মকার, ঘট্টজীবি (পাটনী), ডোলবাহী (ডুলে, ডুলিয়া), ব্যাধ, হড্ডি (হাড়ি), ডোম, জোলা, বাগতীত (বাগ্দী ?), বেদিয়া (বেদে), মাংসচ্ছেদ, চর্মকার, চণ্ডাল, কোল, ভীল্ল, শবর, পুলিন্দ, মেদ, পৌণ্ড্রক (পোদ ?) প্রভৃতি অন্ত্যজ ও আদিবাসি পর্যায়ের লোকেরা। শেষোক্ত পর্যায়ের লোকেরা সাধারণত বাস করিতেন গ্রামের এক প্রান্তে, আজও যেমন করিয়া থাকেন। ভাটেরা গ্রামের পূর্বোক্ত লিপিটিতে গ্রামবাসীদের মধ্যে পাইতেছি কয়েকজন গোপ, অন্তত একজন রজক এবং একজন নাপিতকে। কোনো কোনো গ্রামে সমৃদ্ধ শ্রেষ্ঠীরাও বাস করিতেন বলিয়া মনে হইতেছে, যেমন দক্ষিণরাঢ় দেশের ভূরিসৃষ্টি বা বর্তমান ভুরসুট গ্রামে। এই গ্রামটি ব্রাহ্মণদের একটি বড় কেন্দ্রস্থল তো ছিলই, তাহা ছাড়া বহু সংখ্যক শ্রেষ্ঠীজনের আশ্রয়ও ছিল। শ্রীধরাচার্যের ন্যায়কন্দলী গ্রন্থে (৯১১ ৯২) আছে,

আসীদ্দক্ষিণরাঢ়ায়াং দ্বিজানাং ভূরিকর্মণাম।
ভূরিসৃষ্টিরিতি গ্রামো ভূরিশ্রেষ্ঠিজনাশ্রয়ঃ ॥

৩

কয়েকটি প্রধান প্রধান গ্রামের বিবরণ

লিপিগুলিতে অসংখ্য গ্রামের উল্লেখ পাইতেছি, একথা আগেই বলা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে আয়তনে ও মর্যাদায় গুরুত্বসম্পন্ন কয়েকটি গ্রামের লিপি-প্রদত্ত বিবরণ উল্লেখ করিলে প্রাচীন বাঙলার গ্রামগুলির সংস্থান ও বিন্যাস সম্বন্ধে ধারণা একটু পরিষ্কার হইতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গ

পশ্চিম-বাঙলার গ্রাম লইয়াই আরম্ভ করা যাক্। ঔদুম্বরিক বিষয়ের বপ্যঘোষবাট গ্রামের কথা আগেই বলিয়াছি। মল্লসারুল লিপিতে কয়েকটি বাটক-পাটক এবং অগ্রহার গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। নয়পালের ইর্দা লিপিতে বৃহৎ-ছত্তিবন্না নামে এক গ্রামের উল্লেখ আছে; এই গ্রাম ছিল বর্ধমান ভুক্তির দণ্ডভুক্তিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। বৃহৎ-ছত্তিবন্না নাম দেখিয়া মনে হয়, ক্ষুদ্রছত্তিবন্না গ্রামও একটি ছিল। ছত্তিবন্না বাঁকুড়া জেলার চণ্ডীদাসস্মৃতি-বিজড়িত ছাতনা কিংবা সুবর্ণরেখা নদী তীরবর্তী ছাতনা গ্রাম হওয়া অসম্ভব নয়। ভোজবর্মার বেলাব লিপিতে উত্তররাঢ়ের অন্তর্গত সিদ্ধল গ্রামের উল্লেখ আছে; ভট্ট ভবদেবের প্রশস্তিতে এই গ্রামকে আর্যাবর্তের ভূষণ, সমস্ত গ্রামের অগ্রগণ্য এবং রাঢ়লক্ষ্মীর অলঙ্কার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রাচীন সিদ্ধল গ্রাম এবং বর্তমান বীরভূম জেলার লাভপুর থানার অন্তর্গত সিদ্ধল গ্রাম এক এবং অভিন্ন, এ-বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। পূর্বোক্ত লিপিতেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, সাবর্ণগোত্রীয় বেদবিদ্ ব্রাহ্মণদের আবাসস্থল বলিয়া এই গ্রামের একটা বিশেষ মর্যাদা ছিল। উত্তররাঢ়মণ্ডলের স্বল্পদক্ষিণ-বীথীর অন্তর্গত বাল্লহিট্‌ঠা নামে আর একটি গ্রামের ভৌগোলিক বিন্যাসের একটু বিস্তৃততর খবর পাওয়া যাইতেছে বল্লালসেনের নৈহাটি লিপিতে। বাল্লহিট্‌ঠা বর্তমান নৈহাটির ৬ মাইল পশ্চিমে বালুটিয়া গ্রাম। এই বাল্লহিট্‌ঠা গ্রামের চতুঃসীমা এই ভাবে দেওয়া হইয়াছে: (১) খাণ্ডয়িল্লা (বর্তমান খাড়ুলিয়া) গ্রামের উত্তর দিক দিয়া যে সিঙ্গটিয়া নদী প্রবহমানা তাহার উত্তরে; নাড়িচা গ্রামের উত্তর দিক দিয়া একই সিঙ্গটিয়া প্রবহমানা, তাহারও উত্তর-পশ্চিমে; (২) অম্বয়িল্লা (বর্তমান অম্বল গ্রাম) গ্রামের পশ্চিম বাহিয়া এই একই নদী প্রবহমানা, তাহার পশ্চিমে; (৩) কুড়ুম্বমার দক্ষিণ সীমালির দক্ষিণে; কুড়ুম্বমার পশ্চিমে পশ্চিমাভিমুখী সীমালিরও দক্ষিণে; আউহাগড্ডিয়ার দক্ষিণ গোপথেরও দক্ষিণে; এই আউহাগড্ডিয়ার উত্তর দিকে আর একটি গোপথ, এই গোপথ হইতে একটি সীমালি সোজা পশ্চিম অভিমুখী হইয়া সুরকোণাগড্ডিয়াকিয়ের উত্তর সীমালিতে গিয়া মিশিয়াছে, তাহারও দক্ষিণে; (৪) নাড়িনা গ্রামের পূর্ব সীমালির পূর্বে; জলসোথী গ্রামের (বর্তমান মুর্শিদাবাদে ঐ নামীয় গ্রাম) পূর্ব গোপথেরও কতকটা পূর্বে; মোলাডণ্ডী (বর্তমান মুড়ুন্দি) গ্রামের

পূর্বদিকে সিঙ্গটীয়া নদী পর্যন্ত যে গোপথ, তাহারও কথঞ্চিৎ পূর্বদিকে। খাণ্ডয়িল্লা (খাড়ুলিয়া), অম্বয়িল্লা (অম্বলগ্রাম), জেল্লাসোথী (বর্তমানেও ঐ নাম), মোলাডণ্ডী মুড়ুন্দি) এবং বাল্লহিট্‌ঠা (বালুটিয়া) গ্রাম তাহাদের প্রাচীন নামস্মৃতি লইয়া এখনও বিদ্যমান ; ইহাদের বর্তমান সংস্থান হইতে প্রাচীন বাঙলার গ্রাম-সংস্থানের কতকটা আভাস পাওয়া যায়। লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুর পট্টোলীতে বিড্ডারশাসন নামে আর একটি গ্রামের পরিচয় পাইতেছি ; এই গ্রাম বর্ধমানভুক্তির পশ্চিমখাটিকাভুক্ত বেতড্ডচতুরকের (হাওড়া জেলার বর্তমান বেতড়) অন্তর্গত। বিড্ডাশাসন গ্রামের পূর্বার্ধ সীমা স্পর্শ করিয়া জাহ্নবী নদী (বর্তমান হুগলী নদী) প্রবহমানা ; দক্ষিণে লেংঘদেব মণ্ডপী (শিবলিঙ্গ মন্দির ?) ; পশ্চিমে একটি ডালিম্বক্ষেত্র সীমা ; উত্তরে ধর্মনগর সীমা। এই রাজারই শক্তিপুর শাসনে আরও কতকগুলি গ্রামের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। উত্তররাঢ়ের কঙ্কগ্রামভুক্তির (বর্তমান কাঁকজোল অঞ্চল) মধুগিরিমণ্ডলের (বর্তমান মহুয়াগাঢ়ি, কাঁকজোলের ২২ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে) কুন্তীনগর-প্রতিবদ্ধ (বর্তমান কুন্বীর, মহুয়াগাঢ়ি হইতে ২০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে, বীরভূম জেলার রামপুরহাট থানায়), দক্ষিণ-বীথীর অন্তর্গত কুমারপুর চতুরক। মোর বা বর্তমান ময়ূরাক্ষী নদীর ৩½ মাইল উত্তরে মৌরেশ্বর থানার অন্তর্গত কুমারপুর গ্রাম এখনও বিদ্যমান। যাহাই হউক, এই চতুরকের অন্তর্গত পাঁচটি পাটকের উল্লেখ শক্তিপুর শাসনে আছে, যথা, বারহকোণা, বাল্লিহিটা, নিমা, রাঘবহট্ট এবং ডামরবড়াবন্ধ বিজহারপুর পাটক। বারহ-কোণা সিউড়ি থানার বারকুণ্ডা (মোর নদীর আধ মাইল উত্তরে), বা মৌরেশ্বর থানার বারণ (মোর নদীর উত্তরে), অথবা মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার পাঁচথুপীর সন্নিকটে বারকোনার সঙ্গে এক এবং অভিন্ন বলিয়া বিভিন্ন পণ্ডিতেরা মত প্রকাশ করিয়া-ছেন। নিমা এবং বাল্লিহিটা যথাক্রমে বর্তমান নিমা এবং বলুটি (মৌরেশ্বর থানা) গ্রামের সঙ্গে এক এবং অভিন্ন বলিয়া প্রস্তাবিত হইয়াছে। বাড়কুণ্ডা, বারণ, নিমা এবং বলুটি প্রত্যেকটি গ্রামই বর্তমানে মোর নদীর উত্তরে ; অথচ শক্তিপুর শাসনে ইহারা এই নদীর দক্ষিণে বলিয়া উক্ত হইয়াছে। হইতে পারে ময়ূরাক্ষী-মোর প্রবাহপথ পরিবর্তন করিয়া পুরাতন গ্রাম ধ্বংসে করিয়া দিয়াছিল, কিন্তু পুরাতন নামগুলি বিলুপ্ত করিতে পারে নাই ; পরে ঐ নামগুলি আশ্রয় করিয়া নূতন গ্রামের পত্তন হইয়াছে। যাহাই হউক, শক্তিপুর শাসনে দেখিতেছি, বারহকোণা, বাল্লিহিটা, নিমা এবং রাঘবহট্ট এই চারিটি গ্রাম একত্র সংলগ্ন, এবং এক সঙ্গে একই চতুঃসীমার মধ্যে উল্লিখিত ও বর্ণিত হইয়াছে। এই চারিটি গ্রামের (চতুরকের ?) পূর্বদিকে অপরাজোলী (পশ্চিম খাল ?) সমেত মালিকুণ্ডা (গ্রামের) ভূমি ; দক্ষিণে ব্রহ্মস্থল অন্তর্গত ভাগড়ীখণ্ডের ভূমি ; পশ্চিমে অজ্ঝা গোপথ ; উত্তরে মোর নদী সীমা। বিজহারপুর পাটকের পশ্চিমে লাঙ্গলজোলী (লাঙ্গল-খাল ?) ; উত্তরে পরজাণ গোপথ ; দক্ষিণে বিপ্রবড্ডজোলী ;

পূর্বে চাকুলিয়া-জোলী। আর একটি গ্রামের উল্লেখ করিয়াই পশ্চিম-বাঙলার গ্রাম-বর্ণনা শেষ করা যাইতে পারে। ভূরিসৃষ্টি গ্রামের কথা আগেই বলিয়াছি। কৃষ্ণমিশ্রের প্রবোধচন্দ্রদয় নাটকেও রাঢ়দেশান্তর্গত ভূরিশ্রেষ্ঠিকা নামে সুপ্রসিদ্ধ গ্রামের উল্লেখ আছে (একাদশ শতক)। হুগলী জেলার দামোদর নদের দক্ষিণ তীরে এই গ্রাম আজও ভূরসুট নামে পরিচিত; সমস্ত মধ্যযুগ ধরিয়া এই গ্রাম ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির একটি বড় কেন্দ্র ছিল। অষ্টাদশ শতকের বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র রায় ভূরসুটের জমিদার নরেন্দ্র রায়ের পুত্র ছিলেন। অন্নদামঙ্গলে আছে:

ভূরিশিতে ভূপতি নরেন্দ্র রায় সুত।
কৃষ্ণচন্দ্র পাশে হবে হয়ে রাজ্যচ্যুত॥

ভারতচন্দ্রের সত্যপীরের কথায়ও এই গ্রামের উল্লেখ আছে। মুসলমান ঐতিহাসিকেরা এই গ্রামকে ভোসট বলিয়া জানিতেন।

পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ

পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গের কয়েকটি গ্রামের একটু পরিচয় এইবার লওয়া যাইতে পারে। ষষ্ঠ শতকের বৈন্যগুপ্তের গুণাইঘর লিপিতে উত্তরমণ্ডলভুক্ত কন্তেড়দক গ্রামের একটু বিবরণ পাওয়া যাইতেছে। এই গ্রামের ভৌগোলিক সংস্থান আগেই কতকটা উল্লেখ করা হইয়াছে। গ্রামটি মহাযানিক অবৈবর্তিক ভিক্ষুসংঘের একটি বড় কেন্দ্র ছিল এবং অন্তত দুইটি বৌদ্ধ-বিহারও ছিল এই গ্রামে। তাহা ছাড়া প্রদ্যুম্নেশ্বরের একটি মন্দিরও ছিল। গ্রামটির অবস্থিতি যে নিম্নশায়ী জলাভূমিতে এই সম্বন্ধে লিপিগত সংবাদ কোনো সংশয়ই রাখে না। বিহারটির চতুঃসীমায় নৌযোগ, নৌখাট, নৌযোগখাট, বিলাল (বিল), খাল, এবং হজ্জিকখিলভূমিই তাহার প্রমাণ। নৌযোগ, নৌখাট ইত্যাদির উল্লেখ হইতে মনে হয়, ছোট বড় নৌকা ইত্যাদির বৃহৎ আশ্রয়ও ছিল এই গ্রামে। গঞ্জ বা বন্দর ছিল বলিয়াই হয়তো এই সব নৌযোগ, নৌখাট ইত্যাদি গড়িয়া উঠিয়াছিল। বর্তমান ত্রিপুরার ভাটি অঞ্চলে তাহা কিছু অসম্ভবও নয়। এই শতকেই ফরিদপুরের কোটালি-পাড়া অঞ্চলে কয়েকটি গ্রামের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে গোপচন্দ্র-ধর্মাদিত্য-সমাচারদেবের পট্টোলিগুলিতে। বারকমণ্ডলের একটি গ্রামে বহু ভূমি পতিত পড়িয়াছিল; নিম্নভূমিও ছিল প্রচুর, এবং সেখানে বন্য জন্তুরা চরিয়া বেড়াইত; সেই ভূমি হইতে রাজকোষে কোনও অর্থাগম হইত না। কাজেই রাজা যখন সেই ভূমি ধর্মকার্যের জন্য বিক্রয় করিলেন তখন তাঁহার অর্থলাভ ও পুণ্যসঞ্চয় দুইই হইল। বিক্রিত ভূমির পূর্বদিকে ছিল একটা পিশাচাধ্যুষিত পর্কটি বা পাকুড় গাছ; দক্ষিণে বিদ্যাধর জোটিকা (বিদ্যাধর খাল); পশ্চিমে চন্দ্রবর্মণকোটের একটি কোণ; উত্তরে গোপেন্দ্রচরক গ্রাম। বারকমণ্ডলের আর একটি গ্রামে বিক্রিত ভূমির চতুঃসীমায় পাইতেছি,

পূর্বে হিমসেনের ভূমি ; দক্ষিণে তিনটি ঘাট, এবং অপর একজনের শাসনদত্তভূমি ; পশ্চিমে পূর্বোক্ত তিনটি ঘাটে যাইবার পথ এবং শিলাকুণ্ড ; উত্তরে নাবাতক্ষেণী এবং হিমসেনের ভূমি। নাবাতক্ষেণীর উল্লেখ দেখিয়া অনুমান হয় এই গ্রামেও একটি গঞ্জ বা বন্দর ছিল। এই মণ্ডলেরই আর একটি গ্রামের বিক্রীত ভূমিসীমায় পাইতেছি একটি গোযান চলাচলের পথ, পাঁকুড় গাছ এবং একটি নৌদণ্ডক। তদানীন্তন কোটালিপাড়া অঞ্চলের গ্রামগুলি যে নৌগামী ব্যবসা-বাণিজ্যের সমৃদ্ধ কেন্দ্র ছিল, নৌদণ্ডক, নাবাতক্ষেণী, নৌযোগ, নৌখাট প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার তাহার আংশিক প্রমাণ। অষ্টম শতকে ঢাকা অঞ্চলের (ঢাকা সহর হইতে ৩০ মাইল, শীতললক্ষ্যার অদূরে কয়েকটি গ্রামের পরিচয় পাইতেছি দেবখড়্গের আস্রফপুর লিপি দুইটিতে। এই অঞ্চলের একটি বা একাধিক গ্রামের বিভিন্ন পাটকে (পাড়ায়) চারিটি বৌদ্ধবিহার ও বিহারিক (ছোট বিহার) ছিল, এবং ইহাদের আচার্য ছিলেন বন্দ্য সংঘমিত্র। সংঘমিত্রের শিষ্যবর্গের মধ্যে শালিবর্দক ছিলেন অন্যতম। বিভিন্ন পাটকের বিভিন্ন কৃষক ও গৃহস্থদের অধিকার হইতে ভূমি বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া [ইঁহাদের মধ্যে অন্যান্য অনেকের সঙ্গে রাণী শ্রীপ্রভাবতী, শুভংসুকা নামে একটি মহিলা, বন্দ্য জ্ঞানমতি নামে একজন বৌদ্ধ আচার্য (?) এবং শ্রীউদীর্ণখড়্গ নামে রাজপরিবারের (?) একজন মাননীয় ব্যক্তিও আছেন] পূর্বোক্ত চারিটি বিহার-বিহারিকের অধিকারে দান করা হইয়াছিল, আচার্য সংঘমিত্রের তত্ত্বাবধানে। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মপ্রতিষ্ঠান, গঞ্জ, বন্দর, নৌকাযাতায়াত পথ ইত্যাদি লইয়া ফরিদপুর ঢাকা-ত্রিপুরার পূর্বোক্ত গ্রামাঞ্চলগুলিতে সমৃদ্ধজনপূর্ণ বসতি ছিল, এরূপ অনুমান অযৌক্তিক নয়।

ধর্মপালের খালিমপুর লিপিতে ব্যাঘ্রতটীমণ্ডলের মহন্তাপ্রকাশ-বিষয়ের অন্তর্গত ক্রৌঞ্চশ্বভ্রগ্রামের সীমা-পরিচয় প্রসঙ্গে এই গ্রাম ও অন্য আরও তিনটি গ্রামের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ক্রৌঞ্চশ্বভ্রগ্রামের 'পশ্চিমে গঙ্গিনিকা, উত্তরে কাদম্বরী অর্থাৎ সরস্বতীর দেউল (দেবকুলিকা) ও খেজুর গাছ। পূর্বোত্তরে রাজপুত্র দেবটকৃত আলি, এই আলি বীজপূরকে (টাবা লেবুর বাগান ?) গিয়া প্রবিষ্ট হইয়াছে। পূর্বদিকে বিকটকৃত আলি, তাহা খাটক-যানিকাতে (খালে) গিয়া প্রবেশ করিয়াছে ; তাহার পর জম্বু-যানিকা (যে-খালের দুই ধারে বাতাপী লেবুর গাছ ?) আক্রমণ করিয়া তাহার পাশ দিয়া জম্বুযানক পর্যন্ত গিয়াছে। তথা হইতে নিঃসৃত হইয়া পুণ্যারাম-বিল্বার্দ্ধস্রোতিকা পর্যন্ত গিয়াছে। তথা হইতে নিঃসৃত হইয়া, নলচর্মটের উত্তর সীমা পর্যন্ত গিয়াছে। নলচর্মটের দক্ষিণে নামুণ্ডি-কাষ্ঠিকা…হইতে খণ্ডমুণ্ডমুখ পর্যন্ত, সেখান হইতে বেদসাবিম্বিকা, তাহার পর রোহিতবাটী-পিণ্ডারবিটি-জোটিকা(খাল)-সীমা, উত্তারবোটের দক্ষিণ এবং গ্রামবিম্বের দক্ষিণ পর্যন্ত দেবিকা সীমাবিটি ধর্মারোজোটিকা (খাল)। এই প্রকার মাঢ়াশাল্মলী নামক গ্রাম (তুলনীয়, নিধনপুর লিপির

ময়ূরশাল্মলী)। তাহার উত্তরেও গাঙ্গিনিকার সীমা ; তাহার পূর্বে অর্দ্ধস্রোতিকার সহিত মিলিত হইয়া আম্রযানকোলার্দ্ধ-যানিকা (আম্রকাননবর্তী খাল ?) পর্যন্ত গিয়াছে। তাহার দক্ষিণে কালিকাশ্বভ্র ; তথা হইতেও নিঃসৃত হইয়া শ্রীফলাভিষুক পর্যন্ত গিয়াছে ; তাহার পশ্চিমে গিয়া বিষঙ্গর্দ্ধস্রোতিকার গাঙ্গিনিকায় (বর্তমান, গাঙ্গিনা) গিয়া প্রবিষ্ট হইয়াছে। পালিতকের সীমা দক্ষিণে কাণাদ্বীপিকা, পূর্বে কোণ্ঠিয়া স্রোত, উত্তরে গাঙ্গিনিকা, পশ্চিমে জেনন্দায়িকা। এই গ্রামের শেষ সীমায় পরকর্মকৃদ্বীপ ক্ষালীকূট-বিষয়ের অধীন আম্রষণ্ডিকা-মণ্ডলের অন্তর্গত গো-পিপ্পলী গ্রামের সীমা, পূর্বে উড্রগ্রাম-মণ্ডলের পশ্চিমসীমা, দক্ষিণে জোলক, পশ্চিমে বেসানিকা নামক খাটিকা, উত্তরে উড্রগ্রামমণ্ডলের (উড্রগ্রাম কি সেই গ্রাম যে-গ্রামে ওড্র বা ওড়িশাবাসীদের বসতি ছিল বেশি ?) সীমায় অবস্থিত গোপথ। উপরোক্ত ব্যাঘ্রতটীমণ্ডল যে দক্ষিণ-বঙ্গের ব্যাঘ্রাধ্যুষিত নিম্নশায়ী বনময় জনপদ, এ-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কম। সমুদ্রতীরবর্তী নিম্নভূমি বলিয়াই এইসব গ্রামাঞ্চলে এত গাঙ্গিনিকা, যানিকা, স্রোত, স্রোতিকা, জোটিকা, খাটিকা, দ্বীপ, দ্বীপিকা প্রভৃতির এত প্রাদুর্ভাব। বিশ্বরূপসেনের একটি লিপিতে বঙ্গের নাব্যভাগে রামসিদ্ধিপাটক নামে একটি গ্রামের উল্লেখ আছে ; এই গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিমে বরাহকুণ্ড, পূর্বে দেওহারের দেবভোগ-সীমা ; দক্ষিণে বঙ্গালবড়া নামক গ্রামের ভূমি ; পশ্চিমে একটি নদী ; উত্তরে একই নদী। এই নাব্যভাগেই বিনয়াতিলক নামে আর একটি গ্রাম ছিল ; এই গ্রামের পূর্বে সমুদ্র ; দক্ষিণে প্রণুল্লীভূমি ; পশ্চিমে একটি বাঁধ (জাঙ্গলসীমা) ; উত্তরে স্বীয় শাসনসীমা। নাব্য জনপদ-ভাগটাই ছিল নৌচলাচল-নির্ভর, আর এই গ্রাম একেবারে ছিল সমুদ্রশায়ী। কেশবসেনের ইদিলপুর লিপিতে বিক্রমপুর ভাগের অন্তর্গত তালপড়া পাটক নামে আর একটি গ্রামের খবর পাওয়া যাইতেছে। এই গ্রামের পূর্বে শঙ্করবান্ধ গ্রাম ; দক্ষিণে শঙ্করপাশা (পাশা-অন্ত্য গ্রাম-নাম তো বরিশাল-ফরিদপুর অঞ্চলে সুপ্রচুর) এবং গোবিন্দকেলি নামে দুইটি গ্রাম, পশ্চিমে শংকর গ্রাম, উত্তরে বাগুলীবিত্ত···গ্রাম। বিশ্বরূপসেনের মদনপাড়া লিপিতে পিঞ্জোকাস্টি এবং কন্দর্পশংকর নামে দুইটি গ্রামের উল্লেখ আছে। পিঞ্জোকাস্টি বর্তমান ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া পরগণার পিঞ্জারি গ্রাম। যাহা হউক, পিঞ্জোকাস্টি গ্রামের পূর্বদিকে অঠপাগ গ্রামের বাঁধ (জাঙ্গলভূ) ; দক্ষিণে বারুয়ীপড়া (বারুইপাড়া ?) ; পশ্চিমে উপ্তোকাস্টি গ্রাম ; উত্তরে বীরকাট্টী গ্রামের বাঁধ (কাস্টি, কাট্টি=বর্তমান কাটি ; তুলনীয়, বরিশাল-ফরিদপুর অঞ্চলের ঝালকাটি, কলসকাটি, লক্ষণকাটি ইত্যাদি। এই রাজারই সাহিত্য-পরিষদ লিপিতে বিক্রমপুর ভাগের লাউহণ্ডা চতুরকের অন্তর্গত দেউলহস্তি গ্রামের বর্ণনা প্রসঙ্গে দেখিতেছি, এই গ্রামের পূর্ব ও পশ্চিমে রাজহত্য নদী। শ্রীমৎ ডোম্মনপালের সুন্দরবন লিপিতে পূর্বখাটিকার অন্তর্গত ধার্মহিথা নামে একটি গ্রামের সংক্ষিপ্ত পরিচয় একটু পাইতেছি ; এই গ্রামের বাহিরে বোধ হয় একটি বৌদ্ধবিহার

ছিল (রঙ্গত্রয়বাহিঃ)। লক্ষ্মণসেনের আনুলিয়া লিপির মাথরাওঙ্গা নামে আর একটি গ্রামের অবস্থিতি ছিল ব্যাঘ্রতটীতে ; এই গ্রামে একটি বটবৃক্ষ এবং একটি জলাপিল্লের (জলময় নিম্নভূমি ?) উল্লেখ আছে। ইহারই সংলগ্ন ছিল আর দুইটি গ্রাম ; শান্তিগোপী এবং মালামঞ্চবাটী। বাঙলার পূর্ব-দক্ষিণতম প্রান্তের চাটিগ্রাম আনুমানিক দশম শতক হইতেই একটি সমৃদ্ধ ও মর্যাদাসম্পন্ন গ্রাম ছিল বলিয়া মনে হইতেছে। তিব্বতী বৌদ্ধপুরাণ মতে, চাটিগ্রাম বৌদ্ধ তান্ত্রিক গুরু তিল-যোগীর জন্মভূমি ছিল (দশম শতক)। এই গ্রামে পণ্ডিত বিহার নামে সুবৃহৎ একটি বৌদ্ধবিহার ছিল এবং বিহারে বসিয়া বৌদ্ধ-আচার্যরা সমবেত বিরুদ্ধবাদী পণ্ডিতদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক করিতেন। এই চাটিগ্রামই কিছুদিন পরে মধ্যযুগে পূর্ব-বাঙলার বৃহত্তম সামুদ্রিক বাণিজ্যের বন্দর-নগরে পরিণত হইয়াছিল চট্টগ্রাম নাম লইয়া। রাজা গোবিন্দকেশবদেবের ভাটেরা লিপিতে এক-সঙ্গে ২৮টি গ্রামের উল্লেখ আছে ; ভট্টপাটক গ্রামের শিবমন্দিরের পরিচালনার জন্য এই ২৮টি গ্রামে ২৯৬টি বাড়ী (ঘর ?) এবং ৩৭৫ হল জমি দান করা হইয়াছিল। ভট্টপাটক বর্তমান ভাটেরা গ্রাম, কুলাউড়া-শ্রীহট্ট রেলপথের ধারেই। বাকী ২৮টি গ্রামের নাম প্রায় অবিকৃত ভাবে এখনও ভাটেরার আশেপাশে বিদ্যমান। এই গ্রামগুলি হইতে প্রায় ৯০০ শত বৎসরের পূর্বেকার গ্রাম-বিন্যাসের চেহারা এখনও কতকটা অনুমান করা চলে।

উত্তর বঙ্গ

দামোদরপুরে প্রাপ্ত গুপ্ত আমলের একটি লিপিতে (৩ নং) পলাশবৃন্দক নামে একটি স্থানের উল্লেখ আছে ; এই স্থান হইতেই ভূমি বিক্রয়ের রাজকীয় আদেশ নিঃসৃত হইয়াছিল। পলাশবৃন্দক যে একটি গ্রাম এই ইঙ্গিত লিপিতেই পাওয়া যায়। দিনাজপুর সহরের ষোল মাইলের মধ্যে পলাশবাড়ী নামে দুইটি গ্রাম এখনও বিদ্যমান , পলাশ-ডাঙ্গা নামে আর একটি গ্রামও আছে দিনাজপুর সহরের ১১ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে। এই তিনটি গ্রামই দামোদরপুরের খুব সন্নিকটে। গুপ্ত আমলের পলাশবৃন্দক বোধ হয় খুব বড় গ্রাম ছিল, এবং ইহা যে একাধিক 'পলাশ'-পূর্বনাম গ্রামের সমষ্টি ছিল তাহা 'বৃন্দক' শব্দের ব্যবহার হইতেও অনুমেয়। রেনেলের নক্সায়ও (১৭৬৩-৭৬) দেখিতেছি, পলাশবাড়ী বেশ বড় ও মর্যাদাসম্পন্ন স্থান। এই লিপিতেই চণ্ডগ্রাম নামে আর একটি গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। গুপ্ত আমলের লিপিগুলিতে অনেক গ্রামের উল্লেখ আছে ; তন্মধ্যে স্বচ্ছন্দপাটক, সাতুবনাশ্রমক, হিমবচ্ছিখরাবস্থিত ডোঙ্গাগ্রাম, বায়িগ্রাম (বর্তমান বৈগ্রাম, বগুড়া জেলা), পুরাণবৃন্দিকহরি, পৃষ্ঠিমপোট্টক, গোষাটপুঞ্জক, নিত্বগোহালী, পলাশাট্ট, বট-গোহালী প্রভৃতি গ্রাম উল্লেখযোগ্য। এই গ্রামগুলি প্রায় সবই দিনাজপুর-রাজসাহী-বগুড়া জেলায় অন্তর্গত। বায়িগ্রাম যে

একাধিক গ্রামখণ্ডের সমষ্টি ছিল তাহা তো আগেই বলিয়াছি। শ্রীগোহালী এবং ত্রিবৃতা এই গ্রামের অন্তর্গত ছিল। দামোদরপুরের ১৪ মাইল উত্তরে বৃন্দকুড়ি নামে একটি গ্রাম এখনও বিদ্যমান; এই গ্রাম হয়তো পুরাণবৃন্দিকহরির স্মৃতি বহন করিতেছে। নিত্বগোহালী গ্রাম মূল নাগিরট্টমণ্ডলের (অর্থাৎ, মণ্ডল-শাসনাধিষ্ঠানের) সংলগ্ন ছিল, পাহাড়পুর লিপিতেই এইরূপ ইঙ্গিত আছে। পৃষ্ঠিমপোট্টক, গোষাটপুঞ্জক এবং পলাশট্ট গ্রাম ছিল নাগিরট্টমণ্ডলান্তর্গত দক্ষিণাংশকবীথীর অন্তর্গত। বটগোহালী পাহাড়পুরের সংলগ্ন গোয়ালভিটা গ্রাম হওয়া অসম্ভব নয়। মুঙ্গের জেলার নন্দপুর গ্রামে প্রাপ্ত একটি লিপিতে অম্বিল গ্রামাগ্রহার নামে একটি অগ্রহার গ্রামের উল্লেখ পাইতেছি। এই গ্রামে বিষয়পতি সমূহের অধিষ্ঠান-অধিকরণের অবস্থিতি হইতে গ্রামটির আয়তন ও মর্যাদা অনুমান করা কঠিন নয়। শাসনাধিষ্ঠানরূপে কোনও কোনও গ্রাম যে বিশেষ মর্যাদা লাভ করিয়া আয়তনে ও গুরুত্বে বাড়িয়া উঠিত, এসম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কম। অম্বিলগ্রামাগ্রহারের মত পলাশবৃন্দকও ছিল এই রকম একটি গ্রাম; এই গ্রাম হইতে রাজকীয় শাসনের নির্গতি দেখিয়া এই অনুমান করা চলে যে, পলাশবৃন্দকেও শাসনাধিষ্ঠানের একটি কেন্দ্র ছিল।

প্রথম মহীপালের বাণগড়লিপিতে কোটীবর্ষ-বিষয়ের গোকলিকা-মণ্ডলের অন্তর্গত কুরটপল্লিকা গ্রামের উল্লেখ পাইতেছি। এই গ্রামের একটি অংশের নাম ছিল চূটপল্লিকা (অর্থাৎ ছোটপল্লী বা ছোটপাড়া)। দ্রাবিড়ী চূট শব্দের অর্থই তো ছোট। তৃতীয় বিগ্রহপালের আমগাছি লিপিতে কোটীবর্ষ-বিষয়ান্তর্গত ব্রাহ্মণীগ্রামমণ্ডল নামে একটি মণ্ডলের উল্লেখ আছে; ব্রাহ্মণীগ্রামই সম্ভবত মণ্ডলের শাসনাধিষ্ঠান ছিল, এবং সেইহেতু ঐ গ্রামকে আশ্রয় করিয়াই মণ্ডলটির নামকরণ হইয়াছিল। বিষমপুর নামক স্থানের দণ্ডভহেশ্বরের মন্দির এই মণ্ডলের অন্তর্গত ছিল। লক্ষ্মণসেনের মাধাইনগর লিপিতে পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তিবদ্ধ বরেন্দ্রীর অন্তর্গত কান্তাপুর-আবৃত্তিতে দাপনিয়া পাটক নামে এক গ্রামের উল্লেখ আছে; এই গ্রামের নিকটেই রাবণসরসী নামে একটি দীঘির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই লিপি-প্রদত্ত ভূমির পূর্বে চড়সপালা-পাটকের পশ্চিমসীমা; দক্ষিণে গয়নগরের উত্তরাংশ; পশ্চিমে গুণ্ডীস্থিরা-পাটকের পূর্বাংশ; উত্তরে গুণ্ডী-দাপনিয়ার দক্ষিণাংশ। এই রাজারই তর্পণদীঘি শাসনে বরেন্দ্রীর অন্তর্গত বেলহিষ্টী গ্রামের পূর্বসীমায় বৌদ্ধবিহারসীমাজ্ঞাপক একটি বাঁধ; দক্ষিণ সীমায় নিচড়হার পুষ্করিণী; পশ্চিমে নন্দিহরিপাকুণ্ডী গ্রাম ও মোল্লাণ-খাড়ী নামে খাল। কামরূপরাজ জয়পালের সময়ের (একাদশ শতক) সিলিমপুর লিপিতে বালগ্রাম নামে আর একটি গ্রাম সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, পুণ্ড্রদেশান্তর্গত এই গ্রাম বরেন্দ্রীর অলঙ্কার স্বরূপ ছিল (বরেন্দ্রীমণ্ডনং গ্রামো) এবং এই গ্রাম ও তর্কারির মধ্যে সকটীনদীর ব্যবধান ছিল (সকটীব্যবধানবান্)। তর্কারি ব্রাহ্মণ ও করণদের খুব বড় কেন্দ্র ছিল; তর্কারি-

তর্কারিকা-তর্কার-টঙ্কার-টকারীর উল্লেখ সমসাময়িক অনেক লিপিতেই পাওয়া যায়। সন্দেহ নাই যে, এই গ্রাম সমসাময়িক কালে বাঙলায় এবং বাঙলার বাহিরে একাধিক কারণে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। এই গ্রামের অবস্থিতি-নির্দেশ লইয়া পণ্ডিত মহলে অনেক তর্ক-বিতর্ক আছে, কিন্তু ইহা যে প্রাচীন বরেন্দ্রীর অন্তর্গত, এ-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কম। বিশ্বরূপসেনের মদনপাড়া লিপি এবং কেশবসেনের ইদিলপুর লিপি দুইই নির্গত হইয়াছিল "ফল্গুগ্রাম পরিসর সমাবাসিত-শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ।" লক্ষ্মণসেনের মাধাইনগর লিপিও নির্গত হইয়াছিল ধার্যগ্রাম জয়স্কন্ধাবার হইতে। ফল্গুগ্রাম ও ধার্যগ্রামে জয়স্কন্ধাবার স্থাপনার ইঙ্গিত হইতে এই অনুমান স্বাভাবিক যে, সমসাময়িক কালের সেনরাষ্ট্রে এই গ্রাম দুইটির বিশেষ একটা মর্যাদা ও গুরুত্ব ছিল, নহিলে মহারাজের জয়স্কন্ধাবার গ্রামে স্থাপিত হইতে পারিত না ; অন্তত জয়স্কন্ধাবার স্থাপনার পর সে গুরুত্ব ও মর্যাদা নিশ্চয়ই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কোনো কোনো গ্রামে যে শাসনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইত তাহার কতকটা যুক্তিসিদ্ধ অনুমান তো ব্রাহ্মণীগ্রামমণ্ডল হইতেই পাওয়া যায়। সেন-আমলের শেষের পর্বে কোনও কোনও গ্রাম জয়স্কন্ধাবারের মর্যাদাও লাভ করিয়াছে, দেখিতেছি।

৪

বাঙলাদেশের কৃষিপ্রধান প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি যেমন বহুলাংশে সুপ্রাচীন অস্ট্রিক্-ভাষাভাষী আদিবাসিদের দানের উপর গড়িয়া উঠিয়াছে, নাগরিক সভ্যতা, মনে হয়, তেমনই পরিমাণে ঋণী দ্রাবিড়-ভাষাভাষী লোকেদের নিকট। এ-সম্বন্ধে নরতাত্ত্বিক গবেষণালব্ধ কিছু কিছু তথ্যের ঐতিহাসিক ইঙ্গিত দ্বিতীয় অধ্যায়ে ধরিতে চেষ্টা করিয়াছি। প্রাচীন বাঙলার অনেক ব্যক্তি ও স্থান নাম সম্বন্ধে যে সুদীর্ঘ শব্দতাত্ত্বিক গবেষণা হইয়াছে, তাহাও এই ইঙ্গিতের সমর্থক।

নগর ও নগরের সংস্থান

বাঙলাদেশ প্রধানত গ্রামপ্রধান, কিন্তু নগরও এদেশে একেবারে কম ছিল না এবং নাগরিক সভ্যতাও একেবারে নিম্নস্তরের ছিল না। এ-কথা অবশ্য স্বীকার্য, উত্তর-ভারতের পাটলীপুত্র-শ্রাবস্তি-অযোধ্যা-সাকেত-ইন্দ্রপ্রস্থ-শাকলপুর-পুরুষপুর-ভৃগুকচ্ছ-কপিলবাস্তু প্রভৃতি নগরের সঙ্গে প্রাচীন বাঙলার নগরগুলির তুলনা হয়তো চলে না, কিন্তু তৎসত্ত্বেও পুণ্ড্র-মহাস্থান, কোটীবর্ষ-দেবকোট, তাম্রলিপ্তি প্রভৃতি অন্তত কয়েকটি নগর-নগরী সর্বভারতীয় খ্যাতি ও মর্যাদা লাভ করিয়াছিল, এ তথ্যও অস্বীকার করা যায় না। সমসাময়িক লিপি-মালায় এবং সাহিত্যে বাঙলার অনেকগুলি নগর-নগরীর উল্লেখ ও বিবরণ জানা যায় ;

তাহা ছাড়া প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের খননকার্য, আবিষ্কার ইত্যাদি যেটুকু হইয়াছে—বাঙলা-দেশে খুব অল্পই হইয়াছে—তাহার ফলেও কোনো কোনো নগরের সংস্থান ও বিন্যাস সম্বন্ধে মোটামুটি কিছু ধারণা করা চলে। গ্রাম ও নগরের পার্থক্য প্রাচীন ও মধ্যযুগে পৃথিবীর সর্বত্র যেমন, বাঙলা দেশেও তাহাই। প্রথম ও প্রধান পার্থক্য, গ্রামগুলি প্রধানত ভূমি ও কৃষি নির্ভর, কিন্তু নগর নানা প্রয়োজনে গড়িয়া উঠে, এবং কৃষি কতক পরিমাণে তাহার অর্থনৈতিক নির্ভর হইলেও শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যলব্ধ অর্থসম্পদই নগর-সমৃদ্ধির প্রধান নির্ভর। যে-ক্ষেত্রে তাহা নয়, সেখানে গ্রাম ও নগরে পার্থক্যও কম।

প্রাচীন বাঙলায়ও নগরগুলি গড়িয়া উঠিয়াছিল নানা প্রয়োজনে; কোথাও একটি মাত্র প্রয়োজনের তাড়নায়, কোথাও একাধিক প্রয়োজনে। পুণ্ড্র-পুণ্ড্রবর্ধনের মত নগর একটি মাত্র প্রয়োজনে গড়িয়া উঠে নাই; বিভিন্ন সাক্ষ্যে প্রমাণিত হয় যে করতোয়া তীরবর্তী এই নগর প্রখ্যাত একটি তীর্থ ছিল। দ্বিতীয়ত, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া এই নগর বৃহৎ এক রাজ্য ও জনপদ-বিভাগের রাজধানী ও প্রধান শাসনকেন্দ্র ছিল। তৃতীয়ত, এই নগর সর্বভারতীয় এবং আন্তর্দেশিক বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল; একাধিক স্থলপথ এবং প্রশস্ত করতোয়ার জলপথ এই কেন্দ্রে মিলিত হইত। তাম্রলিপ্তির মতন নগরও একটি মাত্র প্রয়োজনে গড়িয়া উঠে নাই। প্রথমত, তাম্রলিপ্তি ভারতের অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ সামুদ্রিক বন্দর; একদিকে সমুদ্রপথ এবং অন্যদিকে ভাগীরথীর জল-পথের এবং অন্যদিকে আন্তর্ভারতীয় ও আন্তর্দেশিক স্থলপথের কেন্দ্র এই নগর। এই কারণেই তাম্রলিপ্তি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বাণিজ্যের এত বড় কেন্দ্র রূপে ভারতে ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে স্থান লাভ করিতে পারিয়াছিল। লক্ষ্যণীয় এই যে, এই নগরে রাষ্ট্রীয় শাসনকেন্দ্র ছিল, দণ্ডীর দশকুমার-চরিতের একটি গল্প ছাড়া আর কোথাও তেমন ইঙ্গিতও কিছু নাই। তাম্রলিপ্তির খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার অন্যতম কারণ, এই নগর বৌদ্ধধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রধানকেন্দ্র। কোটীবর্ষ প্রধানত এবং প্রথমত আন্তর্দেশিক রাজ্যবিভাগের বড় একটা শাসনকেন্দ্র ছিল বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া। দ্বিতীয়ত, সামরিক প্রয়োজনের দিক হইতেও খুব সম্ভবত কোটীবর্ষের ভৌগোলিক অবস্থিতির একটা গুরুত্ব ছিল। অভিধান-চিন্তামণির গ্রন্থকার হেমচন্দ্র এবং ত্রিকাণ্ডশেষের গ্রন্থকার পুরুষোত্তমদেব দুইজনেই কোটীবর্ষ নগরের যে-সব ভিন্ন ভিন্ন নাম সবিস্তারে উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে শুধু শাসনকেন্দ্র হিসাবেই যে ইহার মর্যাদা, তাহা মনে হয় না। ইঁহারা দুইজনই দেবীকোট (মধ্যযুগের মুসলমান ঐতিহাসিকদের দীব্‌কোট, দেবীকোট, দীওকোট ইত্যাদি), উমাবন, বাণপুর, এবং শোণিতপুর কোটীবর্ষের বিভিন্ন নাম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পুনর্ভবা বা পূর্ণভবা নদীর তীরবর্তী এই নগরের সামরিক গুরুত্ব এবং তীর্থমহিমা থাকাও কিছু অসম্ভব নয়। বিক্রমপুর শুধু শাসনকেন্দ্র হিসাবেই গুরুত্ব অর্জন করে নাই, ইহার সামরিক গুরুত্বও অনস্বীকার্য; তাহা না হইলে একাধিক সেন রাজার আমলে এখানে

জয়স্কন্ধাবার প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারিত না। লক্ষ্মণসেনের পরাজয় এবং তুর্কীদের দ্বারা নবদ্বীপ অধিকারের পর সে-গুরুত্ব আরও বাড়িয়াই গিয়াছিল। তাহা ছাড়া, প্রাচীনকালে নদনদীবহুল নৌ-যাতায়াত পথের হৃদয়দেশে অবস্থিত থাকায় ইহার বাণিজ্যিক গুরুত্বও ছিল বলিয়া মনে হয়। অধিকন্তু, আনুমানিক নবম-দশম শতক হইতে বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ও সংস্কৃতিরও একটা বড় কেন্দ্র ছিল বিক্রমপুরে। শুধু মাত্র রাষ্ট্রীয় বা সামরিক প্রয়োজনে, কিংবা শুধু ধর্মকেন্দ্র হিসাবে কোনও নগর প্রাচীন বাঙলায় গড়িয়া উঠে নাই, তাহাও নয়। পঞ্চনগরী বিষয়ের শাসনাধিষ্ঠান, পুন্ড্রবর্ধন, কোটীবর্ষ, দেবীকোট, পাল ও সেন রাজাদের প্রতিষ্ঠিত রামপাল, রামাবতী ও লক্ষ্মণাবতী, শশাঙ্ক ও জয়নাগের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ প্রভৃতি নগর প্রধানত রাষ্ট্রীয় ও সামরিক প্রয়োজনে গড়িয়া উঠিয়াছিল, এরূপ অনুমান অযৌক্তিক নয়। সোমপুর (বর্তমান পাহাড়পুর), ত্রিবেণী প্রভৃতি নগর গড়িয়া উঠিয়াছিল ধর্ম ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসাবেই। কিন্তু সমসাময়িক সাক্ষ্যে দেখা যায়, যে-প্রয়োজনেই নগরগুলি গড়িয়া উঠুক না কেন, কমবেশি ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রেরণা সর্বত্রই ছিল বলিয়া মনে হয়। বস্তুত, প্রাচীন বাঙলার নগরগুলির ভৌগোলিক অবস্থিতি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, প্রায় প্রত্যেকটি নগরই প্রশস্ত ও প্রচলিত স্থল ও জলপথের উপর বা সংযোগকেন্দ্রে অবস্থিত ছিল। ইহা একেবারে অকারণ বা আকস্মিক বলিয়া মনে হয় না। ফরিদপুরের কোটালিপাড়ায় প্রাপ্ত ষষ্ঠ শতকের একটি লিপিতে চন্দ্রবর্মণ-কোট বলিয়া একটি দুর্গের উল্লেখ আছে সামরিক প্রয়োজনে এই দুর্গ-নগর গড়িয়া উঠিয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই লিপিতে এবং এই স্থানে প্রাপ্ত সমসাময়িক অন্যান্য লিপিতে স্থানটি যে নৌ-বাণিজ্যপ্রধান ছিল তাহারও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই কোট হইতেই বর্তমান কোটালিপাড়া নামের উদ্ভব, এরূপ অনুমান একেবারে অযৌক্তিক নয়।

নগরের বাসিন্দা কাহারা ছিলেন তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। সে-সব নগর প্রধানত রাষ্ট্রীয় এবং সামরিক প্রয়োজনে গড়িয়া উঠিয়াছিল, শাসনাধিষ্ঠান ছিল যে-সব নগরে, সেখানে রাষ্ট্রীয় ও সামরিক কর্মচারীরা তো বাস করিতেনই— ইঁহারা সকলেই চাকুরিজীবী, ধনোৎপাদক কেহই নহেন। রাজা, মহারাজ, সামন্তরাও নগরবাসীই ছিলেন। তীর্থমহিমার জন্য বা শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে যে-সব নগর গড়িয়া উঠিত সেখানে বিভিন্ন ধর্ম ও শিক্ষার গুরু, আচার্য, পুরোহিত প্রভৃতি বৃত্তিধারী লোকেরা, তাঁহাদের শিষ্য, ছাত্র প্রভৃতিরাও বাস করিতেন। অন্যান্য নগরবাসীদের ধর্মাচরণ ও অনুষ্ঠানের জন্যও প্রত্যেক নগরেই ব্রাহ্মণ আচার্য, পুরোহিতের একটা সংখ্যা থাকিতই। ইঁহারা তো অনেক রাজপাদপোজীবীর বৃত্তিও গ্রহণ করিয়াছিলেন। তীর্থাচরণোদ্দেশে এই সব নগরে লোক যাতায়াতও ছিল; যাঁহারা আসিতেন অর্থ ব্যয় করিতেই আসিতেন। কাজেই এই সব তীর্থনগরে নানাপ্রকার শিল্প-দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ের কেন্দ্রও সহজেই গড়িয়া উঠিত। কিন্তু শুধু তীর্থ-প্রয়োজনেই নয়,

অধিকাংশ নগরে ব্যবসা-বাণিজ্যের একটা প্রেরণাও ছিল, একথা আগে বলিয়াছি। এই ব্যবসা-বাণিজ্য আশ্রয় করিয়া বহুসংখ্যক শ্রেষ্ঠী, সার্থবাহ, কুলিক নগরেই বাস করিতেন, অষ্টম শতকপূর্ব লিপিগুলিতে এমন প্রমাণ প্রচুর পাওয়া যাইতেছে। রাজকর্মচারী রাষ্ট্রপ্রতিনিধিদের সঙ্গে সঙ্গে ইঁহারাই নগরের প্রধান বাসিন্দা। ইঁহাদের নিগমকেন্দ্রগুলিও নগরে। তাহা ছাড়া, শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যনিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কয়েকটি রাজপদের উল্লেখও লিপিগুলিতে দেখা যায়; এই পদগুলি এবং নগর-শাসন সংক্রান্ত কয়েকটি রাজকীয় পদ (যেমন, পুরপাল, পুরপালোপরিক) রাজধানী, ভুক্তি অথবা বিষয়ের রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে সংপৃক্ত। ইঁহারা সকলেই যে নগরবাসী, এসম্বন্ধে কোনও সংশয়ই থাকিতে পারে না। দেওপাড়া লিপির "বরেন্দ্রকশিল্পীগোষ্ঠীচূড়ামণি" রাণক শূলপাণিও নাগরিক। বৃহদ্ধর্ম ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে যে-সব শিল্পী-বণিক-ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের তালিকা আছে তাহাদের মধ্যে কর্মকার, কংসকার, শাঙ্খিক-শংখকার, মালাকার, তক্ষণ-সূত্রধার, শৌণ্ডিক, তন্তুবায়-কুবিন্দক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের অনেকেই নগরে বাস করিতেন, সন্দেহ নাই। স্বর্ণকার, সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক, অট্টালিকাকার, কোটক, অন্যান্য ছোট বড় শিল্পী ও বণিকেরা তো একান্তই নগরবাসী ছিলেন। ইঁহাদের ছাড়া, অথচ ইঁহাদের সেবার জন্য রজক, নাপিত, গোপ প্রভৃতি কিছু সমাজ-সেবকও নগরে বাস করিতেন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। ম্লেচ্ছ ও অন্ত্যজ পর্যায়ের কিছু কিছু সমাজ-শ্রমিকেদেরও নগরে বাস করিতে হইত, যেমন ডোম, চণ্ডাল, ডোলাবাহী, চর্মকার, মাংসচ্ছেদ ইত্যাদি। কিন্তু ইঁহারা সাধারণত বাস করিতেন নগরের বাহিরে; চর্যাগীতে স্পষ্টতই বলা হইয়াছে 'ডোম্বীর কুঁড়িয়া' নগরের বাহিরে। এইসব সমাজ-সেবক ও সমাজ-শ্রমিকেরা নগরবাসী বটে, কিন্তু যথার্থত নাগরিক ইঁহারা নহেন; নাগরিক বলা যায় প্রধানতঃ শ্রেষ্ঠী, শিল্পী, বণিকদের, নগরবাসী রাজ ও অভিজাত সম্প্রদায়দের, রাষ্ট্রপ্রধানদের এবং সমৃদ্ধ বিত্তবান্ ব্রাহ্মণদের।

এই নাগরিকেরাই সামাজিক ধনের প্রধান বণ্টনকর্তা, এবং যেহেতু নগরগুলিই ছিল সামাজিক ধনবণ্টনের প্রধান কেন্দ্র সেই হেতু নগরগুলিতেই সামাজিক ধন কেন্দ্রীকৃত হইবার দিকে ঝোঁক স্বাভাবিক। সপ্তম-অষ্টম শতক পর্যন্ত বাঙলার সামাজিক ধন যতদিন প্রধানত শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য নির্ভর ছিল ততদিন তো নগরগুলি সামাজিকধনলব্ধ ঐশ্বর্য-বিলাসাড়ম্বরের কেন্দ্র ছিলই, এবং তাহা স্বাভাবিকও; কিন্তু লক্ষ্যণীয় এই যে, অষ্টম হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত সামাজিক ধনের উৎপাদন যখন প্রধানত গ্রাম্য কৃষি ও গৃহশিল্প হইতে, তখনও নগরগুলিই সামাজিক ধনের কেন্দ্র, এবং সেই হেতু ঐশ্বর্যবিলাসাড়ম্বরেরও। বস্তুত রামচরিত, পবনদূত প্রভৃতি কাব্য, সদুক্তিকর্ণামৃতধৃত বিচ্ছিন্ন শ্লোকাবলী, এবং সমসাময়িক লিপিগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, গ্রাম ও নগরের প্রধান পার্থক্যই এই ধনৈশ্বর্যের তারতম্যদ্বারা চিহ্নিত। তৃতীয়-চতুর্থ শতকে বাৎস্যায়ন হইতে আরম্ভ করিয়া একাদশ-দ্বাদশ শতকের কাব্য ও প্রশস্তিগুলিতে সর্বত্রই নগরে নগরে দেখিতেছি শ্রেণীবদ্ধ

প্রাসাদাবলী, নরনারীর প্রসাধন ও অলঙ্কার প্রাচুর্য, বারাঙ্গনাদের কটাক্ষবিস্তার, নানাপ্রকার বিলাসের উপকরণ এবং অত্যুগ্র ঐশ্বর্যের লীলা, আর, সঙ্গে সঙ্গে পাশে পাশে দেখিতেছি গ্রামবাসিদের সারল্যময় সহজ দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, এবং কখনো কখনো দারিদ্র্যের নিষ্করুণ চিত্র। অথচ, এই সব চিত্র যে-যুগের সেই যুগে গ্রামের কৃষি এবং গৃহশিল্পলব্ধ ধনই একমাত্র না হউক, প্রধান সামাজিক ধন।

৫

কয়েকটি প্রধান প্রধান নগরের বিবরণ

প্রাচীন লিপিমালা ও সমসাময়িক সাহিত্যে অনেক নগরের উল্লেখ ও বিবরণ পাইতেছি। সকল নগর গুরুত্বে, মর্যাদায়, আয়তনে বা অর্থসম্পদে সমান ছিল না, একথা বলাই বাহুল্য। তবু, ক্ষুদ্র বৃহৎ কয়েকটি নগরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ জানিতে পারিলে প্রাচীন বাঙলার নগর-বিন্যাস সম্বন্ধে ধারণা একটু স্পষ্ট হইতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গ : তাম্রলিপ্তি

বর্তমান পশ্চিম-বঙ্গের প্রাচীনতম নগর তাম্রলিপ্তির বাণিজ্যসমৃদ্ধির কথা সুপরিচিত। বহুপ্রসঙ্গে বারবার তাহা আলোচিত হইয়াছে। মহাভারত, পুরাণ হইতে আরম্ভ করিয়া টোডরমল্ল পর্যন্ত নানাগ্রন্থে নানা নামে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়—তাম্রলিপ্ত, তামলিপ্ত, তাম্রলিপ্তি, তাম্রলিপ্তক, তমালিনী, বিষ্ণুগৃহ, স্তম্বপুর, তামলিকা, বেলাকুল, তামোলিত্তি, দাম-লিপ্ত, টামালিটেস (Tamalites), টালকটেই (Taluctae), তম্বুলক ইত্যাদি। সপ্তম-অষ্টম শতক পর্যন্ত এই সামুদ্রিক বন্দরের খ্যাতি অক্ষুন্ন ছিল, একথা অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি। টলেমি এই সামুদ্রিক বন্দর-নগরটির অবস্থিতি নির্দেশ করিতেছেন গঙ্গার উপকূলেই; কথাসরিৎসাগরের একটি গল্পে দেখিতেছি, তাম্রলিপ্তিকা পূর্বাম্বুধির অদূরস্থ নগরী; দশকুমার চরিতের মতে দামলিপ্ত সমৃদ্ধ ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র ও সামুদ্রিক বন্দর, গঙ্গার তীরে, সমুদ্রের অদূরে; য়ুয়ান্ চোয়াঙও বলিতেছেন তাম্রলিপ্ত সমুদ্রের একটি খাড়ীর উপর অবস্থিত, যেখানে স্থলপথ ও জলপথ একত্র মিশিয়াছে। সমুদ্রমুখস্থিত এই বন্দর হইতেই ফাহিয়ান্ সিংহল এবং ইৎসিঙ্ শ্রীভোজ বা শ্রীবিজয়রাজ্যে (সুমাত্রা-যবদ্বীপ) যাইবার জন্য জাহাজে উঠিয়াছিলেন। রূপনারায়ণ-তীরবর্তী বর্তমান তমলুক সহর এই সুসমৃদ্ধ বাণিজ্য নগরীর স্মৃতিমাত্র বহন করিতেছে। অন্যত্র আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, পুরাতন সরস্বতী বা গঙ্গার অন্য কোনো শাখানদীর উপর প্রাচীন তাম্রলিপ্তির অবস্থিতি ছিল; সেই নদীর খাত শুকাইয়া যাওয়ার ফলে তাম্রলিপ্তির বাণিজ্য-সমৃদ্ধি নষ্ট হইয়া যায়, এবং নগর

হিসাবেও তাহার প্রাধান্য আর থাকে নাই। কিন্তু তাম্রলিপ্ত শুধু দুই জলপথের সঙ্গমেই অবস্থিত ছিল না; স্থলপথে রাজগৃহ-শ্রাবস্তি-গয়া-বারাণসীর সঙ্গেও এই নগরীর যোগ ছিল; জাতকের গল্পগুলিতে তাহার কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। সিংহলী মহাবংশ গ্রন্থের একটি গল্পে দেখিতেছি, সম্রাট অশোক সিংহলী কয়েকজন দূতকে বিদায়-সম্বর্দ্ধনা জানাইবার জন্য নিজে তাম্রলিপ্ত পর্যন্ত আসিয়া সেই বন্দরে তাহাদিগকে জাহাজে তুলিয়া দিয়াছিলেন। গয়া হইতে স্থলপথে বিন্ধ্যপর্বত (ছোটনাগপুরের পাহাড়?) অতিক্রম করিয়া তাম্রলিপ্ত আসিতে তাঁহার ঠিক সাতদিন লাগিয়াছিল। বৃহৎ ব্যবসা-বাণিজ্যকেন্দ্র ছাড়া তাম্রলিপ্ত সমসাময়িক শিক্ষা ও সংস্কৃতিরও একটি বড় কেন্দ্র ছিল। পঞ্চম শতকে ফাহিয়ান এই নগরে দুই বৎসর ধরিয়া বৌদ্ধসূত্রের পাণ্ডুলিপি অধ্যয়ন ও পুনর্লিখন করিয়াছিলেন, কিছু কিছু বৌদ্ধ দেবদেবীর ছবিও আঁকিয়াছিলেন। সপ্তম শতকের শেষার্ধে ইৎসিঙ্ এই কেন্দ্রে বসিয়াই শব্দবিদ্যা অধ্যয়ন এবং সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন। বর্তমান তমলুক সহরের অদূরে কয়েকটি ধ্বংসস্তূপ ছাড়া এই নগরের আর কিছুই এখন বর্তমান নাই। মাঝে মাঝে ভূমি চাষ করিতে গিয়া কিংবা গর্ত খুঁড়িতে গিয়া অথবা আকস্মিকভাবে কিছু কিছু প্রাচীনমুদ্রা, পোড়ামাটির মূর্তি ও ফলক ইতস্তত পাওয়া গিয়াছে; কোনো কোনো মুদ্রা ও মূর্তির তারিখ প্রায় খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম ও দ্বিতীয় শতকের। সমৃদ্ধ ঐশ্বর্যশালী ব্যবসা-বাণিজ্যপ্রধান তাম্রলিপ্তিতে যাতায়াতের পথঘাট দস্যু তস্কর-বিরহিত ছিল না, এমন অনুমান স্বভাবতই করা চলে। বণিক, সার্থবাহ, তীর্থযাত্রী, পর্যটক প্রভৃতিরা দল বাঁধিয়াই যাতায়াত করিতেন; কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইৎসিঙ্ নালন্দার নিকট হইতে তাম্রলিপ্ত যাইবার সময় একবার পথে দস্যুদল দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিলেন, এবং অত্যন্ত আয়াসে কোনো প্রকারে তাহাদের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছিলেন।

পুষ্করণ, বর্ধমান

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে পুষ্করণ নামে একটি নগরের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে মহারাজ চন্দ্রবর্মার শুশুনিয়া লিপিতে। এই নগর বাঁকুড়া জেলায় দামোদরের দক্ষিণ-তীরবর্তী বর্তমান পোখরণা গ্রামের স্মৃতির মধ্যে আজও বাঁচিয়া আছে। শুঙ্গ আমলের একটি যক্ষিণী মূর্তির পোড়ামাটির ফলক এবং আরও কয়েকটি প্রত্নবস্তু পোখরণা গ্রামে পাওয়া গিয়াছে।

বর্দ্ধমানও অতি প্রাচীন নগর। জৈন কল্পসূত্র, সোমদেবের কথাসরিৎসাগর, বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে এই নগরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কথাসরিৎসাগরে বর্ধমান বসুধার অলঙ্কার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। জৈন কল্পসূত্রের মতে মহাবীর একবার অস্থিকগ্রামে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন; টীকাকার বলিতেছেন পূর্বে এই স্থানের নাম ছিল বর্ধমান। তিনি এই নাম-পরিবর্তনের একটা কারণও উল্লেখ

করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের মল্লসারুল লিপিতে, দশম শতকের ইর্দা লিপিতে এবং দ্বাদশ শতকের নৈহাটি ও গোবিন্দপুর লিপিতে দেখিতেছি এই নগর ভুক্তি-বিভাগের শাসনাধিষ্ঠান ছিল। অনুমান হয়, এই নগর দামোদরের তীরেই অবস্থিত ছিল, যদিও বর্তমান বর্ধমান সহর ও দামোদরের ব্যবধান অনেক। বর্ধমান প্রাচীনকালের অতি জনপ্রিয় নাম; বাঙলার বাহিরেও স্থান নাম হিসাবে ইহার প্রচলন দেখা যায়। হর্ষবর্ধনের বাঁশখেরা লিপিতে এক বর্ধমানকোটির উল্লেখ আছে; আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প-গ্রন্থে কামরূপদেশে এক বর্ধমানপুরের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়; কান্তিদেবের চট্টগ্রাম লিপিতে (নবম শতক) হরিকেল-মণ্ডলান্তর্গত আর এক বর্ধমানপুরের দেখা মিলিতেছে; এই বর্ধমানপুরেই কান্তিদেবের রাজধানী ছিল। হরিকেল যে ব্রহ্মপুত্র-পূর্ব পূর্ববঙ্গের অন্তর্ভুক্ত তাহা তো অন্যত্র বলিয়াছি।

সিংহপুর

সিংহলী পুরাণে বিজয়সিংহ-কাহিনী প্রসঙ্গে লাল (রাঢ়) দেশান্তর্গত সিংহপুর নামে একটি নগরের উল্লেখ আছে; কেহ কেহ মনে করেন সিংহপুর বর্তমান হুগলী-জেলার শ্রীরামপুর মহকুমার সিঙ্গুর। এ-সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা কঠিন।

প্রিয়ঙ্গু

দশম ও একাদশ শতকে দণ্ডভুক্তির কম্বোজরাজদের রাজধানী ছিল প্রিয়ঙ্গু নামক নগরে। এই নগরের অবস্থিতি বা অন্য কোনো প্রকার গুরুত্বে সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না, তবে মেদিনীপুর বা হুগলী জেলার কোথাও ইহার অবস্থিতি হওয়া বিচিত্র নয়।

কর্ণসুবর্ণ

কর্ণসুবর্ণ প্রাচীন পশ্চিম-বাঙলার অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ নগর। সপ্তম শতকে এই নগর গৌড়রাজ শশাঙ্কের রাজধানী, এবং শশাঙ্কের মৃত্যুর পর স্বল্প কিছুদিনের জন্য কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার জয়স্কন্ধাবার ছিল। এই শতকেরই দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদে মহারাজ জয়নাগের রাজধানীও ছিল এই নগরে। য়ুয়ান-চোয়াঙ্ বলিতেছেন, এই নগরের পরিধি ছিল ২০ লি। বাঙলায় ভ্রমণকালে য়ুয়ান-চোয়াঙ্, কর্ণসুবর্ণে আসিয়াছিলেন। সপ্তম শতকের কর্ণসুবর্ণ শুধু রাজধানী হিসাবেই খ্যাতি লাভ করে নাই; সমসাময়িক শিক্ষা ও সংস্কৃতিরও প্রধান একটি কেন্দ্র ছিল এই নগর। নগরের বাহিরে অনতিদূরে রক্তমৃত্তিকা নামে একটি বৃহৎ বৌদ্ধ বিহার ছিল। মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙ্গামাটি এবং কানসোনা গ্রাম যথাক্রমে আজও রক্তমৃত্তিকা বিহার এবং কর্ণসুবর্ণের স্মৃতি বহন করিতেছে। দুইই বহরমপুরের নিকটবর্তী গঙ্গাপ্রবাহের তীরে অবস্থিত ছিল, এরূপ অনুমান অযৌক্তিক নয়। জয়নাগের কালে ঔদুম্বরিক বিষয় নামে কর্ণসুবর্ণের একটি

বিষয়-বিভাগ ছিল, এবং এই বিষয়ের শাসনাধিষ্ঠান বোধ হয় ছিল ঔদুম্বর নামক নগর। ঔদুম্বরিক বিষয় যে আইন-ই-আকবরীর ঔদম্বর পরগণা তাহা তো আগেই বলিয়াছি; বীরভূমের অধিকাংশ এবং মুর্শিদাবাদের কিয়দংশ জুড়িয়া ছিল এই বিষয়ের বিস্তৃতি। রক্তমৃত্তিকা-রাঙ্গামাটির রক্তিম ধূসর ধ্বংসস্তূপে কিছু কিছু খনন কার্য হইয়াছে; এই স্তূপ সমতল ভূমি হইতে প্রায় ৪০।৫০ ফুট উঁচু, কিন্তু ইহার অনেকাংশ ভাগীরথী প্রবাহে ভাঙ্গিয়া ধুইয়া গিয়াছে। ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে প্রায় দুই মাইল জুড়িয়া ছিল রাজধানীর বিস্তৃতি; নদীপ্রবাহের ধ্বংসাবশেষের অনেক ভাঙ্গিয়া ধুইয়া যাওয়া সত্ত্বেও ইহা বুঝিতে কিছু কষ্ট হয় না। রাক্ষসীডাঙ্গার ধ্বংসস্তূপ খননে আনুমানিক সপ্তম শতকীয় একটি বৌদ্ধ বিহারের ভিত্তিচিহ্নের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। রাজা কর্ণের স্তূপ নামে খ্যাত যে-ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান, তাহাই বোধ হয় ছিল প্রাচীন রাজপ্রাসাদ।

অষ্টম শতকের শেষার্ধে অনর্ঘরাঘবের গ্রন্থকার মুরারী চম্পাকে গৌড়ের রাজধানী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই চম্পা গঙ্গাতীরবর্তী এবং বর্তমান ভাগলপুরের নিকটবর্তী চম্পানগরী-চম্পাপুরী হওয়াই স্বাভাবিক; তবে, আইন-ই-আকবরী-গ্রন্থের মন্দারণ-সরকারের (হুগলী-মেদিনীপুর) অন্তর্গত চম্পানগরী হওয়াও একবারে অসম্ভব নয়।

বিজয়পুর

ধোয়ী কবির পবনদূতের সাক্ষ্য প্রামাণিক হইলে স্বীকার করিতে হয়, সেন-রাজাদের (অন্তত লক্ষ্মণসেনের) প্রধান রাজধানী ছিল বিজয়পুর (স্কন্ধাবারং বিজয়পুরিমত্যুন্নতাম্ রাজধানীম্)। ধোয়ীর বিবরণীর আক্ষরিক অনুসরণ করিলে বিজয়পুর যে তপন-তনয়া যমুন ও ভাগীরথী সঙ্গমের অদূরে অবস্থিত ছিল (ভাগীরথ্যাস্তপনতনয়া যত্র নির্যাতি দেবী), তাহা অস্বীকার করিবার উপায় থাকে না। কেহ কেহ বিজয়পুরকে নবদ্বীপ-নদীয়া বা রাজসাহী জেলার বিজয়নগরের সঙ্গে এক এবং অভিন্ন বলিয়া মনে করিয়াছেন। ধোয়ীর পবনদূত কখনও গঙ্গা অতিক্রম করিয়াছিল বলিয়া উল্লেখ নাই; কাজেই বিজয়পুর উত্তরবঙ্গে অবস্থিত হওয়া অসম্ভব। নবদ্বীপ-নদীয়া ত্রিবেণীর কিছুটা দূরে; পবনদূতের বর্ণনা অনুসারে বিজয়পুর ত্রিবেণী হইতে এতদূরে হইতে পারে না। বিজয়পুরের যে বর্ণনা ধোয়ী দিতেছেন তাহাতে উচ্ছ্বাসময় অত্যুক্তি আছে, সন্দেহ নাই; তবু, রাজধানীর নাগরিক ঐশ্বর্যাড়ম্বরের খানিকটা পরিচয় তাহাতে পাওয়া যায়।

দণ্ডভুক্তি

পশ্চিম-দক্ষিণবঙ্গের আর একটি সুপ্রসিদ্ধ নগর দণ্ডভুক্তি। এই নগর দণ্ডভুক্তির এবং পরে দণ্ডভুক্তি-মণ্ডলের শাসনাধিষ্ঠানরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। মেদিনীপুর জেলার দাঁতন থানা ও দাঁতন সহর প্রাচীন দণ্ডভুক্তির স্মৃতি বহন করিতেছে।

ত্রিবেণী

যমুনা-সরস্বতী-ভাগীরথীর তিন 'মুক্তবেণী'র সঙ্গমে অবস্থিত ত্রিবেণী প্রাচীন বাঙলার অন্যতম প্রধান তীর্থনগরী। অন্তত সেন-রাজাদের আমল হইতে আরম্ভ করিয়া তুর্কী আমল পর্যন্ত তীর্থ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের অন্যতম প্রসিদ্ধ কেন্দ্র হিসাবে ত্রিবেণীর খ্যাতি অক্ষুণ্ণ ছিল। আজ সরস্বতী-প্রবাহ শুষ্ক, যমুনা প্রবাহের চিহ্ন ও অনুসন্ধানের বস্তু, কিন্তু ত্রিবেণীর তীর্থস্মৃতি আজও বিদ্যমান, যদিও আজ তাহা গণ্ডগ্রাম মাত্র। ত্রিবেণীর অবস্থান ছিল সেই দেশে যে দেশকে ধোয়ী বলিয়াছেন, "গঙ্গাবীচিপ্লুতপরিসরঃ সৌধমালা-বতংসো যাস্যত্যুচ্চৈস্ত্বয়ি রসময়ো বিস্ময়ং সুহ্মদেশঃ।"

সপ্তগ্রাম

ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগে বা শেষার্ধে ত্রিবেণীর দুই মাইল দূরে, ভাগীরথী সঙ্গমের সন্নিকটে সরস্বতীর তীরে সপ্তগ্রামে এক সুবৃহৎ বন্দর-নগর গড়িয়া উঠে, এবং সেন-রাজাদের রাজধানী বিজয়পুরের মর্যাদা অবলুপ্ত করিয়া দেয়। ষোড়শ শতক পর্যন্ত সপ্তগ্রাম শুধু বৃহত্তম বাণিজ্যকেন্দ্র নয়, দক্ষিণ-পশ্চিম বাঙলার রাজধানী, মুসলমান রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান রাষ্ট্রকেন্দ্র। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে সপ্তগ্রামের সুন্দর ও বিস্তৃত বর্ণনা আছে।

সেন-রাজাদের অন্যতম রাজধানী বোধ হয় ছিল নবদ্বীপ, বা মিনহাজ-উদ্-দীন কথিত নুদীয়া নগর। নদীয়া-নবদ্বীপ যে সেন-রাজাদের অন্যতম রাজধানী ছিল তাহা কুলজী গ্রন্থমালাদ্বারাও সমর্থিত। সম্বন্ধনির্ণয় ও বল্লাল-চরিত গ্রন্থের মতে বল্লালসেন বৃদ্ধবয়সে নবদ্বীপ রাজধানীতেই বাস করিতেন।

গোরক্ষবিজয়, মীনচেতন ও পদ্মপুরাণ গ্রন্থে এক বিজয়নগরের উল্লেখ পাওয়া যায়; এই বিজয়নগর দামোদর নদের উত্তর তীরে অবস্থিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। রাঢ়দেশের সঙ্গেই সেন-রাজবংশের প্রথম ঘনিষ্ঠ পরিচয়; অসম্ভব নয় যে, এই বিজয়নগর বিজয়সেনের নামের সঙ্গে জড়িত।

উত্তর-বঙ্গ, পুণ্ড্রনগর মহাস্থান

পুণ্ড্র-পুণ্ড্রবর্ধন নগর উত্তর বাঙলার সর্বপ্রধান ও সর্বপ্রাচীন নগর। দিব্যাবদান; রাজতরঙ্গিণী, বৃহৎকথামঞ্জরী প্রভৃতি গ্রন্থে এই নগরের উল্লেখ আছে। অন্যান্য অনেক সাহিত্যগ্রন্থে এবং লিপিমালায় পুণ্ড্র-পুণ্ড্রবর্ধনের প্রধান নগর পুণ্ড্রনগর বা পুণ্ড্রবর্ধন-পুরের অল্পবিস্তর উল্লেখ হইতে, এবং বর্তমান বগুড়া জেলার মহাস্থান-ধ্বংসাবশেষের প্রত্নতাত্ত্বিক বর্ণনা হইতে সুপ্রাচীন এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী অধ্যুষিত এই নগরটি সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত সংবাদ আহরণ করা যায়। এই সব সংবাদের সাহায্যে অন্যান্য

নগরগুলি সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্টতর হইতে পারে, এই অনুমানে পুণ্ড্রনগর-বর্ণনা একটু বিস্তৃতভাবেই করা যাইতে পারে।

বৌদ্ধপুরাণ মতে বুদ্ধদেব স্বয়ং কিছুদিন পুণ্ড্রবর্ধন নগরে কাটাইয়াছিলেন এবং নিজের ধর্মমত প্রচার করিয়াছিলেন। মৌর্যরাজত্বকালে পুদনগল (পুণ্ড্রনগর) জনৈক মহামাত্রের শাসনাধিষ্ঠান ছিল। গুপ্ত আমলে এই নগর পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির ভুক্তিকেন্দ্র ছিল, এবং সেই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রয়োদশ শতকে হিন্দু আমলের শেষ পর্যন্ত পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্রনগর কখনও তাহার এই মর্যাদার আসন হইতে বিচ্যুত হয় নাই। শুধু শাসনাধিষ্ঠানরূপেই নয়, ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে এবং আন্তর্ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক স্থলপথ বাণিজ্যের অন্যতম কেন্দ্ররূপেও এই নগরের বিশেষ খ্যাতি ও মর্যাদা বহু শতাব্দী ধরিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। সপ্তম শতকে য়ুয়ান্-চোয়াঙ যখন বাঙলাদেশ পর্যটনে আসিয়াছিলেন তখন এই নগরের পরিধি ৩০ লি'রও (অর্থাৎ ৬ মাইল) অধিক ছিল; পুষ্করিণী, পুষ্প ও ফলোদ্যান, বিহারকানন প্রভৃতিতে এই নগর সুশোভিত ছিল। পরবর্তী পাল ও সেন আমলে প্রধান ভুক্তির শাসনকেন্দ্র হিসাবে ইহার মর্যাদা ও আয়তন বাড়িয়াই গিয়াছিল, এমন অনুমান অযৌক্তিক নয়। সন্ধ্যাকর-নন্দীর রামচরিতে বলা হইয়াছে, পুণ্ড্রবর্ধনপুর বরেন্দ্রীর মুকুটমণি, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম স্থান (বসুধাশিরো বরেন্দ্রী-মণ্ডল চূড়ামণেঃ কুলস্থানম্)। আনুমানিক দ্বাদশ শতকের করতোয়া-মাহাত্ম্য গ্রন্থে পুণ্ড্রবর্ধনপুরকে পৃথিবীর আদিভবন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে (আদ্যম্ ভুবোভবনম্)। এই গ্রন্থেই পবিত্র করতোয়া-তীরবর্তী মহাস্থানকে পুণ্য পৌণ্ড্রক্ষেত্র বা পৌণ্ড্রনগর বলিয়া উল্লেখও করা হইয়াছে। বগুড়া হইতে ৭ মাইল দূরবর্তী করতোয়াতীরে মহাস্থান; এখনও এখানে প্রতিবৎসর স্নানপুণ্যদিবসে সহস্র সহস্র লোক করতোয়া স্নান করিতে আসেন। পৌণ্ড্রক্ষেত্রে করতোয়ার এই তীর্থমহিমার কথা করতোয়া-মাহাত্ম্যে সবিস্তারে উল্লিখিত হইয়াছে। মহাস্থানের সুবিস্তৃত প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ, সেই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে মৌর্য-ব্রাহ্মী লিপিখণ্ডের আবিষ্কার এবং লিপিখণ্ডে পুদনগলের উল্লেখ এবং করতোয়া-মাহাত্ম্যের উক্তি পুণ্ড্রনগর ও মহাস্থান যে এক এবং অভিন্ন তাহা নিঃসংশয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

করতোয়ার বাম তীরে ৩০ বর্গ মাইল জুড়িয়া মহাস্থানের ধ্বংসাবশেষ বিস্তৃত। নগর-প্রাকার, প্রাসাদ, অট্টালিকা, মূর্তি, মন্দির, পরিখা, নগরোপকণ্ঠের বিহার, মন্দির, ঘরবাড়ী প্রভৃতির আবিষ্কৃত ধ্বংসাবশেষ হইতে প্রাচীন নগরটির যে-চিত্র ফুটিয়া উঠে তাহা কোনো অংশেই প্রাচীন বৈশালী-শ্রাবস্তি-কৌশাম্বীর নগরসমৃদ্ধির তুলনায় খর্ব বলিয়া মনে হয় না। অসংখ্য পোড়ামাটির ফলক, মাটি-পাথর-ধাতব মূর্তি, প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ, মুদ্রা, লিপি ইত্যাদি প্রচুর এই সুবিস্তৃত ধ্বংসাবশেষের ভিতর হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

নগরটির দুই অংশ। একটি অংশ পরিখাচিহ্নিত ও প্রাকারবেষ্টিত; এই অংশই যথার্থত নগর। অন্য অংশ প্রাকারের বাহিরে; এই অংশ নগরোপকণ্ঠ। নগরটি চারিধারের সমতল ভূমি হইতে প্রায় ১৫ ফুট উঁচু, চারিদিকে সুপ্রশস্ত সুউচ্চ প্রাকার; চারিকোণে চারিটি উচ্চতর প্রাকারমণ্ড; প্রাকারের বাহিরেই উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে পরিখা; পূর্বদিকে করতোয়া প্রবহমানা। নগরটি দৈর্ঘ্যে উত্তর-দক্ষিণে আনুমানিক ৫,০০০ ফুট, প্রস্থে ৪,২০০ ফুট; সমস্ত নগরটি ক্ষুদ্র বৃহৎ মাটী-ইট্-পাথরের স্তূপ এবং ভগ্ন মৃৎপাত্রের টুক্‌রায় আকীর্ণ। নগর হইতে নগরোপকণ্ঠ এবং বাহিরে যাতায়াতের জন্য উত্তর ও দক্ষিণদিকে দুইটি করিয়া সুপ্রশস্ত নগরদ্বার। পশ্চিমদিকে উত্তর কোণের কাছে প্রধান নগরদ্বার; এখনও এই দ্বার তাম্র-দরওয়াজা নামে খ্যাত। পূর্বদিকে ঠিক ইহার বিপরীত কোণে শিলাদেবীর ঘাটে যাইবার জন্য আর একটি দ্বার; এই শিলাদেবীর ঘাটই করতোয়া স্নানের প্রধান তীর্থকেন্দ্র। একটি প্রশস্ত লম্বমান সোজা পথ একদ্বার হইতে আর একদ্বারে বিলম্বিত; এখনও সেই পথ দূরাপসৃত করতোয়ায় গিয়া নামিয়াছে। নগরাভ্যন্তরের বৈরাগীর ভিটা ও নগরোপকণ্ঠের গোবিন্দ ভিটায় যতটুকু খনন কার্য হইয়াছে তাহার ফলে দুই জায়গায় মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। পূর্বদিকে শিলাদেবীর ঘাটের কাছে নগর-প্রাকারের কিয়দংশের খননে দেখা গিয়াছে, করতোয়ার জলস্রোতের গতি পরিবর্তনের জন্য ঐ স্থানে প্রাকার দৃঢ়তর করিয়া দুইস্তরে গাঁথা হইয়াছিল। খনন-বিশারদ প্রত্নতাত্ত্বিকেরা মনে করেন এই সব ধ্বংসাবশেষ ও নগরপ্রাকার, পরিখা প্রভৃতি সমস্তই পাল আমলের।

নগরাভ্যন্তরে ছিল রাজকীয় প্রাসাদ, রাষ্ট্রের অধিকরণ-গৃহ এবং অন্যান্য রাজকীয় প্রাসাদ ইত্যাদি, সার্থবাহ-বণিক-নাগরিকদের বাসগৃহ, হাট, মন্দির, সভাগৃহ, সৈন্যসামন্তদের আবাসস্থান ইত্যাদি। রামচরিতে দেখিতেছি, পুণ্ড্রনগরের সারি সারি বিপণি গৃহের বর্ণনা। নগরের সমাজসেবক ও শ্রমিকেরা, কুটুম্ব-গৃহস্থেরা বাস করিতেন নগরোপকণ্ঠে; সেখানেও ঘরবাড়ী, মন্দির প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। শুধু পুণ্ড্রনগরেই নয়, কোটিবর্ষ, রামপাল সর্বত্রই নগর-বিন্যাস একই প্রকারের।

কোটীবর্ষ-বাণগড়

পুণ্ড্রনগর-পৌণ্ড্রক্ষেত্রের পরেই বলিতে হয় কোটীবর্ষ নগরের কথা। হেমচন্দ্রের অভিধানচিন্তামণি, পুরুষোত্তমের ত্রিকাণ্ডশেষ প্রভৃতি গ্রন্থের মতে দেবীকোট, বাণপুর, উমাবন, শোণিতপুর প্রভৃতি কোটীবর্ষেরই বিভিন্ন নাম। অভিধানকারদের মতে কোটীবর্ষের খ্যাতি ও মর্যাদা কৌশাম্বী, প্রয়াগ, মথুরা, উজ্জয়িনী, কান্যকুব্জ, পাটলীপুত্র প্রভৃতি নগরের চেয়ে কম নয়। বায়ুপুরাণে "কোটীবর্ষম নগরম"-এর উল্লেখ আছে। জৈন কল্পসূত্রে বলা হইয়াছে, মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের গুরু ভদ্রবাহুর এক শিষ্য গোদাস

প্রাচ্য-ভারতের জৈনদিগকে চারিটি শাখায় শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছিলেন; তাহার মধ্যে তিনটি শাখার নাম তাম্রলিপ্তি, পুণ্ড্রবর্ধন এবং কোটীবর্ষের সঙ্গে যুক্ত। পঞ্চম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া অন্তত পাল আমলের শেষ পর্যন্ত কোটীবর্ষ নগরেই পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির সর্বপ্রধান বিষয় কোটীবর্ষ-বিষয়ের শাসনাধিষ্ঠান অবস্থিত ছিল। মুসলমান অধিকারের পর পুরাতন কেটীবর্ষ নগরেই দেবীকোট-দীব্‌কোট-দীওকোট নামে নূতন নগরের পত্তন হয়। একাদশ শতকের শেষে বা দ্বাদশ শতকের প্রথমে সন্ধ্যাকর নন্দী কোটীবর্ষ নগরের প্রশস্তি উচ্চারণ করিয়া এই নগরের অসংখ্য পূজারী-পূজক-মুখরিত মন্দির ও প্রস্ফুটিত পদ্মহসিত দীঘির দীর্ঘ বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন। ষোড়শ শতক পর্যন্ত মুসলমান ঐতিহাসিকদের রচনায় দীব্‌কোট-দীওকোটের বর্ণনা পাঠ করা যায়।

হেমচন্দ্রের পুনর্ভবাতীরস্থ কোটীবর্ষ এবং বাণরাজপুর বাণাসুরের ও উষা-অনিরুদ্ধের পুরাণ-স্মৃতি বিজড়িত, বাণপুর বর্তমান দিনাজপুর জেলার বাণগড়, এ-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। সমস্ত বাণগড় ও পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি জুড়িয়া এক বৃহৎ সমৃদ্ধ নগরের ধ্বংসাবশেষ এখনও বিস্তৃত। কম্বোজ-রাজবংশের একটি এবং পালবংশের একটি লিপি, অসংখ্য মূর্তি, মন্দির ও প্রাসাদের ভগ্ন প্রস্তর ও ইষ্টকখণ্ড, ভিত্তিস্তর, স্তম্ভখণ্ড, ক্ষুদ্র বৃহৎ মন্দির-নিদর্শন প্রভৃতি এই সুবিস্তৃত ধ্বংসাবশেষের ভিতর হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। কম্বোজ-রাজবংশের লিপিখোদিত যে ক্ষুদ্র মন্দির-নিদর্শনটি পাওয়া গিয়াছে তেমন মন্দিরকে যে সমসাময়িক সাহিত্যে "ভূ-ভূষণ" বলা হইয়াছে তাহা কিছু মিথ্যা অত্যুক্তি বলিয়া মনে হয় না।

ধ্বংসাবশেষ হইতে অনুমান হয়, এই নগর দৈর্ঘ্যে প্রায় ১,৮০০ এবং প্রস্থে ১,৫০০ ফুট বিস্তৃত ছিল; নগরটি চারিদিকে প্রাকার দ্বারা বেষ্টিত এবং প্রাকারের পরেই পূর্বে, উত্তরে ও দক্ষিণে পরিখা, এবং পশ্চিমে পুনর্ভবা নদী। পূর্বদিকে প্রধান নগরদ্বার এবং নগর হইতে নগরোপকণ্ঠে যাইবার জন্য পরিখার উপরে সেতুর ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান। নগরের ঠিক কেন্দ্রস্থলে এখনও একটি সুউচ্চ স্তূপ বর্তমান, এবং জনসাধারণের স্মৃতিতে এখনও এই স্তূপ রাজবাড়ী নামে জাগ্রত; বোধহয় এইখানেই ছিল রাজপ্রাসাদ। নগরাভ্যন্তরে এবং প্রাচীরের বাহিরে নগরোপকণ্ঠে এখনও অসংখ্য ক্ষুদ্র বৃহৎ স্তূপ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত।

পঞ্চনগরী ও সোমপুর

পঞ্চম শতকে পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির অন্যতম বিষয় ছিল পঞ্চনগরী, এবং পঞ্চনগরীতেই বিষয়ের শাসনাধিকরণ অধিষ্ঠিত ছিল। পঞ্চনগরী দিনাজপুর জেলায় সন্দেহ নাই, কিন্তু কোন্ স্থান তাহা নির্ণীত হয় নাই। রাজসাহী জেলার পাহাড়পুরও খুব পুরাতন তীর্থনগর বলিয়া মনে হয়; খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে এই স্থানের অন্তত একাংশের নাম ছিল

বটগোহালী (বর্তমান গোয়ালভিটা) এবং সেখানে জৈন শ্রমণাচার্য গুহনন্দীর একটি বিহার ছিল। ধর্মপালের আমলে এই স্থান সোমপুর নামে খ্যাতি লাভ করে, এবং এইখানেই সোমপুর মহাবিহার (বর্তমান পাহাড়পুর) গড়িয়া উঠে। পাহাড়পুরের সন্নিকটবর্তী ওমপুর আজও পুরাতন সোমপুর নামের স্মৃতি বহন করিতেছে। সোমপুর মহাবিহার সমসাময়িক বৌদ্ধধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থনগর ছিল, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই। একাদশ শতকে (বর্মণ-রাষ্ট্রের ?) বঙ্গাল সৈন্যেরা এই মহাবিহারের একাংশ আগুন লাগাইয়া পুড়াইয়া দিয়াছিল।

জয়স্কন্ধাবার। রামাবতী

পালরাজাদের রাজধানী কোথায় ছিল তাহা নিঃসংশয়ে জানিবার উপায় নাই ; তবে তাঁহারা রাজ্যের সর্বত্র—বোধহয় সামরিক গুরুত্ব এবং শাসনকার্যের সুবিধানুযায়ী—অনেকগুলি বিজয়স্কন্ধাবার স্থাপন করিয়াছিলেন। এগুলি যে অন্তত নগরোপম এ-সম্বন্ধে সন্দেহ কি ? রাজারা যখন সদলবলে এই সব স্থানে আসিয়া বাস করিতেন এবং শাসনকার্যও সেখানে নিষ্পন্ন হইত, তখন সেগুলো অস্থায়ী ছাত্রাবাস মাত্র ছিল, এ কথা কিছুতেই কল্পনা করা যায় না। রাজপ্রাসাদ, রাজকীয় ঘরবাড়ী, সৈন্যসামন্তাবাস, হাট-বাজার, মন্দির, পথঘাট, উদ্যান প্রভৃতি সমস্তই এই সব দুর্গজাতীয় স্কন্ধাবারে থাকিত, এমন অনুমান করিতে কল্পনার আশ্রয় লইতে হয় না। ষষ্ঠ-সপ্তম শতক হইতে একেবারে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত এই ধরনের জয়স্কন্ধাবারের উল্লেখ লিপিগুলিতে পাওয়া যাইতেছে ; চন্দ্র-বর্মণ-সেন আমলের অনেক লিপিই তো 'বিক্রমপুর সমাবাসিত-বিজয়স্কন্ধাবার' হইতে নির্গত। যাহা হউক, পাল লিপিগুলিতে মুদ্গগিরি, বটপর্বতিকা, বিলাসপুর, হরধাম, রামাবতীনগর, হংসাকোঞ্চি, এবং পাটলীপুত্র জয়স্কন্ধাবারের উল্লেখ আছে। এইসব জয়স্কন্ধাবারের মধ্যে রামাবতী স্পষ্টতই নগর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। পাটলীপুত্র তো বহুদিনের প্রাচীন নগর। অন্য জয়স্কন্ধাবারগুলিও নগর না হইলেও নগরোপম ছিল, সন্দেহ নাই। মুদ্গগিরি বর্তমান মুঙ্গের নগর ; গঙ্গার তীরেই ছিল তাহার অবস্থিতি। বিলাসপুর এবং হরধাম দুইই অবস্থিত ছিল গঙ্গার উপরে ; কারণ গঙ্গায় তীর্থস্নান করিয়াই প্রথম মহীপাল এবং তৃতীয় বিগ্রহপাল যথাক্রমে বাণগড় ও আমগাছি লিপি-কথিত ভূমি দান করিয়াছিলেন, বিলাসপুর এবং হরধাম জয়স্কন্ধাবার হইতে। বটপর্বতিকার অবস্থিতি-নির্ণয় কঠিন ; পর্বতিকার উল্লেখ হইতে অনুমান হয় রাজমহল পর্বতের সংলগ্ন গঙ্গার তীরেই কোথাও এই জয়স্কন্ধাবার প্রতিষ্ঠিত ছিল। পাটলীপুত্রও গঙ্গার তীরে। হংসাকোঞ্চী মহারাজ বৈদ্যদেবের কামরূপস্থ জয়স্কন্ধাবার বলিয়া মনে হয়। রামাবতী নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তৃতীয় বিগ্রহপালের পুত্র রামপাল ; মদনপালের মনহলি লিপি এবং সন্ধ্যাকর-নন্দীর রামচরিতে এই নগরের

উল্লেখ ও বর্ণণা আছে। রামাবতী এবং আইন ই-আকবরী কথিত রামাউতি যে এক এবং অভিন্ন নগর, এ-সম্বন্ধে সন্দেহের এতটুকু অবকাশ নাই। পরবর্তী সেন-আমলের গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী নগরের অদূরে গঙ্গা-মহানন্দার সঙ্গমস্থলের সন্নিকটে ছিল রামাবতীর অবস্থিতি। আজ রামাবতীর পরিত্যক্ত ধ্বংসাবশেষ লক্ষ্মণাবতীর প্রাচীন কীর্তি-হর্ম্যাদির অদূরে মাটির ধূলায় মিশিয়া গিয়াছে। অথচ, সন্ধ্যাকরের বর্ণনা হইতে মনে হয়, সমসাময়িককালে রামাবতী সমৃদ্ধ নগর ছিল।

পাল আমলে জয়স্কন্ধাবারগুলির সামরিক গুরুত্ব লক্ষ্যণীয়; অনুমান হয়, এই সামরিক গুরুত্ব বিবেচনা করিয়াই জয়স্কন্ধাবারগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পাটলীপুত্র, মুদ্গগিরি, বিলাসপুর, হরধাম, রামাবতী, এবং বোধহয় বটপর্বতিকাও, প্রত্যেকটিই গঙ্গার তীরে তীরে। এই গঙ্গা বাহিয়া রাজমহলের তেলিগড়ি ও সিক্রিগলির সংকীর্ণ গিরিবর্ত্মের ভিতর দিয়াই বাংলায় প্রবেশের পথ, পাল-রাজ্যের হৃদয়স্থলে প্রবেশের পথ; এবং পাটলীপুত্র হইতে আরম্ভ করিয়া রামাবতী পর্যন্ত সমস্ত পথটিই সুরক্ষিত রাখা প্রয়োজন ছিল। পাল-রাষ্ট্র তাহাই করিয়াছিল। এই অনুমান আরও সমর্থিত হয় পরবর্তীকালে লক্ষ্মণাবতী-গৌড়, পাণ্ডুয়া, টাণ্ডা ও রাজমহলে পর পর বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রধান শাসনকেন্দ্রের অবস্থিতি হইতে। যাহা হউক, সে কথা পরে বলিতেছি।

লক্ষ্মণাবতী

সেন আমলের প্রায় শেষাশেষি লক্ষ্মণসেন রামাবতীর অদূরে লক্ষ্মণাবতী (মুসলমান ঐতিহাসিকদের গৌড়-লখ্‌নৌতি) নামে এক সুবিস্তৃত নগর প্রতিষ্ঠা করেন। রাজমহল হইতে ২৫ মাইল ভাটিতে গঙ্গা-মহানন্দার সঙ্গমস্থলের এই নগর গঙ্গার তীর ধরিয়া প্রায় ১৪।১৫ মাইল জুড়িয়া বিস্তৃত ছিল। সেন-আমলের লক্ষ্মণাবতীকে আশ্রয় করিয়া তুর্কী সুলতানদের গৌড়-লখ্‌নৌতি নগর গড়িয়া উঠে। গঙ্গা আজ খাত্ পরিবর্তন করিয়া বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে, মহানন্দাও তাহাই। কিন্তু গৌড়-লখ্‌নৌতির ধ্বংসাবশেষ আজও বিদ্যমান, এবং তাহা হইতে প্রাচীনতর লক্ষ্মণাবতীর বিস্তৃতি ও সমৃদ্ধির খানিকটা অনুমান করা চলে। গৌড়-লখ্‌নৌতি হইতে রাজধানী কিছুদিন পর পাণ্ডুয়ায় স্থানান্তরিত হয়; তবু লখ্‌নৌতির খ্যাতি ও মর্যাদা হুমায়ুন-আকবরের আমল পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। মুঘলেরা ইহার নামকরণ করিয়াছিলেন জন্নতাবাদ। গঙ্গা ও মহানন্দার খাত্ পরিবর্তনের ফলে লখ্‌নৌতি অস্বাস্থ্যকর জলাভূমিতে পরিণত এবং ষোড়শ শতকের শেষাশেষি নাগাদ পরিত্যক্ত হয়। পরবর্তী কালে বাংলার রাজধানী টাণ্ডায় এবং সর্বশেষে রাজমহলে স্থানান্তরিত হয়।

বিজয়নগর

বর্তমান রাজসাহী শহরের ৭ মাইল পশ্চিমে, গোদাগারী থানার অন্তর্গত দেওপাড়া বা দেবপাড়া নামে একটি গ্রাম আছে ; দেওপাড়ার উত্তরে অদূরে চব্বিশনগর এবং দক্ষিণে কিঞ্চিৎ দূরে বিজয়নগর নামে আর দুইটি গ্রাম। দেওপাড়া গ্রাম জুড়িয়া প্রাচীন অট্টালিকা, প্রাসাদ, মন্দির, মূর্তি ও দীর্ঘিকার বিস্তৃত ধ্বংসাবশেষ ইতস্তত আকীর্ণ। বিজয়সেনের দেওপাড়া প্রশস্তিলিপিটি পাওয়া গিয়াছে দেওপাড়া গ্রাম হইতে ; এই লিপিটিতে প্রদ্যুম্নেশ্বরের একটি সুবৃহৎ মন্দির এবং তৎসংলগ্ন একটি বৃহৎ দীঘির উল্লেখ আছে। আজ মন্দিরটির কয়েকটি ভগ্ন স্থাপত্যখণ্ড ছাড়া আর কিছুই নাই ; তবে দীঘিটি পদুমসর (প্রদ্যুম্নেশ্বর বা প্রদ্যুম্নসর=প্রদ্যুম্ন সরোবর) নামে আজও বাঁচিয়া আছে। মনে হয়, প্রাচীন দেওপাড়া গ্রাম বিজয়সেন-প্রতিষ্ঠিত বিজয়-নগরের একটি অংশ ছিল ; বিজয়-নগর, চব্বিশনগর নাম দুইটি এবং দেওপাড়া প্রশস্তির ইঙ্গিত একান্ত অর্থহীন বলিয়া মনে হয় না। দেওপাড়ার উত্তরে-দক্ষিণে প্রায় ৭।৮ মাইল জুড়িয়া প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের কিছু কিছু চিহ্ন ইতস্তত এখনও বিদ্যমান। এই স্থান পদ্মাতীর হইতে খুব দূরেও নয়।

পূর্ব ও দক্ষিণ-বঙ্গ, গঙ্গাবন্দর, বঙ্গনগর

পূর্ব ও দক্ষিণ-বাঙলার সর্বপ্রাচীন নগর সিংহলী পুরাণ কথিত বঙ্গনগর ও টলেমি-কথিত গঙ্গা-বন্দর (Gange)। গঙ্গা-বন্দর গঙ্গার পঞ্চমুখের একটি মুখে অবস্থিত ছিল ; সম্ভবত দ্বিতীয় মুখের তীরে, কিন্তু নিঃসংশয়ে তাহা বলা যায় না। পেরিপ্লাস-গ্রন্থের বিবরণ অনুসারে গঙ্গাবন্দর সমসাময়িককালের সুপ্রসিদ্ধ সামুদ্রিক বাণিজ্যের কেন্দ্র, এবং টলেমির মতে গঙ্গারাষ্ট্রের রাজধানী ও প্রধান নগর। সিংহলী পুরাণ-কথিত বঙ্গনগরের অবস্থিতি সম্বন্ধে কিছুই বলিবার উপায় নাই।

নব্যাবকাশিকা ; বারকমণ্ডল-বিষয় ; সুবর্ণবীথী

ফরিদপুর কোটালীপাড়ার পট্টোলীগুলিতে নব্যাবকাশিকা, বারকমণ্ডল বিষয় এবং সুবর্ণবীথী নামে যথাক্রমে একটি ভুক্তি(?)-বিভাগ, একটি বিষয়-বিভাগ এবং একটি বীথী-বিভাগের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহাদের প্রত্যেকেরই এক একটি শাসনাধিষ্ঠান ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু কাহার অবস্থিতি কোথায় ছিল নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না, তবে বর্তমান ফরিদপুর ও ঢাকা জেলায়, মোটামুটি এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। একটি লিপিতে চূড়ামণি-নৌযোগ নামে একটি নৌ-বাণিজ্যের কেন্দ্রেরও উল্লেখ পাওয়া যায়।

জয়কর্মান্তবাসক ; সমতট-নগর

দেবখড়্গের আস্রফপুর লিপি দুইটিতে জয়কর্মান্তবাসক নামে একটি নগরের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইতেছে ; এই নগরটিই বোধ হয় খড়্গরাজাদের রাজধানী, অথবা অন্তত জয়স্কন্ধাবার ছিল। কেহ কেহ মনে করেন, কর্মান্তবাসক বা প্রাচীন কর্মান্ত এবং বর্তমান ত্রিপুরা জেলার বড়কামতা গ্রাম এক এবং অভিন্ন। য়ুয়ান-চোয়াঙ্ সমসাময়িক সমতটের রাজধানীটির নামোল্লেখ করেন নাই, কিন্তু তাহার একটি বর্ণনা দিয়াছেন।

পট্টিকেরা

বর্তমান ত্রিপুরা অঞ্চলে পট্টিকেরা রাজ্যের উল্লেখ একাদশ শতক হইতেই পাওয়া যায়। এই রাজ্যের রাজধানীর ইঙ্গিত ব্রহ্মদেশীয় রাজবৃত্ত-কাহিনীতেও জানা যায়। তবে, পট্টিকেরা-নগরের সবিশেষ এবং সুস্পষ্ট সাক্ষাৎ পাইতেছি ত্রয়োদশ শতকে রণবঙ্কমল্ল হরিকালদেবের একটি লিপিতে। ত্রিপুরা জেলার মধ্যযুগীয় পাটিকেরা বা পাইটকেরা এবং বর্তমান পাটিকারা বা পাইট্‌কারা পরগণা প্রাচীন পট্টিকেরা রাজ্যের নাম ও স্মৃতি বহন করিতেছে। প্রাচীন পট্টিকেরা-নগর এবং বর্তমান পাইট্‌কারা পরগণাস্থিত ময়নামতী পাহাড়ের ময়নামতী গ্রাম খুব সম্ভবত এক এবং অভিন্ন। এই গ্রাম এবং আশপাশের গ্রাম হইতে অনেক প্রত্নবস্তু—লিপি, মূর্তি ও মূর্তির অংশ, ভগ্ন প্রস্তর খণ্ড, পোড়ামাটির ফলক ইট্-পাথরের টুকরা ইত্যাদি—বহুদিন হইতেই সময় সময় পাওয়া যাইতেছিল। খুব সম্প্রতি আকস্মিক খননের ফলে ময়নামতীর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ধ্বংসস্তূপের ভিতর হইতে এক সুপ্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে অনেক লিপিখণ্ড, পোড়ামাটির ফলক, মূর্তি, মৃৎপাত্র ইত্যাদি পাওয়া গিয়াছে। গোমতীর তীর এবং ময়নামতী পাহাড়ের ক্রোড়স্থিত এই সুবিস্তৃত ধ্বংসাবশেষই প্রাচীন পট্টিকেরার ধ্বংসাবশেষ, এমন মনে করিবার সঙ্গত কারণ বিদ্যমান। হরিকালদেবের লিপি হইতে জানা যায়, পট্টিকেরা-নগরে দুর্গোত্তারা নামে এক বৌদ্ধ দেবীর একটি মন্দির ছিল।

মেহারকুল

দামোদরদেবের মেহারলিপিতে (১১৫৬ শক) মেহারকুল বা মৃকুল নামে একটি নগরের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। বর্তমান চট্টগ্রাম জেলার মেহার গ্রাম এই নগরের স্মৃতি আজও বহন করিতেছে।

পূর্ব-বাঙলার বৃহত্তম প্রাচীন নগর শ্রীবিক্রমপুর। বিক্রমপুর চন্দ্র, বর্মণ, সেন ও দেববংশীয় রাজাদের অন্যতম প্রধান জয়স্কন্ধাবার। পাল-রাজাদের মত সেন-রাজাদেরও কয়েকটি রাজধানী বা জয়স্কন্ধাবার ছিল, তন্মধ্যে বিক্রমপুরই সর্বপ্রধান ছিল বলিয়া মনে

হয়। এই "শ্রীবিক্রমপুরসমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ" বিজয়সেনের একটি, বল্লালসেনের একটি, এবং লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের প্রথম ছয় বৎসরের মধ্যে অন্তত পাঁচটি শাসনলিপি নির্গত হইয়াছিল। এই বিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবারেই বিজয়সেন-মহিষী বিরাট তুলাপুরুষ মহাদানযজ্ঞ সম্পাদন করাইয়াছিলেন। সুতরাং জয়স্কন্ধাবার অস্থায়ী ছত্রাবাস মাত্র, একথা কিছুতেই সত্য হইতে পারেনা। লক্ষ্মণসেনের দুইটি লিপি এবং বিশ্বরূপ ও কেশবসেনের লিপিগুলি কিন্তু বিক্রমপুর হইতে নির্গত নয়। বিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবার কি পরিত্যক্ত হইয়াছিল ; না এই পরিবর্তন আকস্মিক ? যে ধার্যগ্রাম ও ফল্গুগ্রাম হইতে এই লিপিগুলি উৎসারিত, সে-গ্রাম দু'টিই বা কোথায় ?

বিক্রমপুর নামে একটি সুবিস্তৃত পরগণা এখনও ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ মহকুমা ও ফরিদপুর জেলার কিছু অংশ জুড়িয়া বিস্তৃত। বিক্রমপুর নামে একটি গ্রাম প্রাচীন দলিল-পত্রেও উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ঢাকা-ফরিদপুরে আজ আর কোনও গ্রামই বিক্রমপুর নামে পরিচিত নয়।

মুন্সীগঞ্জ মহকুমার মুন্সীগঞ্জ শহরের অদূরে সুপ্রসিদ্ধ বজ্রযোগিনী (অতীশ-দীপঙ্করের জন্মভূমি) এবং পাইকপাড়া গ্রামের অদূরে রামপাল নামক স্থানে সুপ্রাচীন একটি নগরের ধ্বংসাবশেষ প্রায় পনেরো বর্গমাইল জুড়িয়া বিস্তৃত। প্রায় ১৭।১৮টি গ্রাম এই সুবিস্তৃত ধ্বংসাবশেষের উপর দাঁড়াইয়া আছে ; সমস্ত স্থানটি জুড়িয়া ভগ্ন মৃৎপাত্রের অংশ, পুরাতন ইট-পাথরের টুকরা, মূর্তির ভগ্ন অংশ প্রভৃতি নানা পুরাবস্তু ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। সমগ্র স্থানটির ভৌগোলিক সংস্থান উল্লেখযোগ্য। রামপালের উত্তরে ছিল ইচ্ছামতী নদী ; এই নদীর নিম্নপ্রবাহ আজ ধলেশ্বরী প্রবাহের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। ইচ্ছামতীর প্রাচীন খাতের সমান্তরালে পূর্ব-পশ্চিমে লম্ববান একটি সুউচ্চ প্রাকারের ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্তমান। পূর্বদিকে প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র প্রবাহের খাত ; ব্রহ্মপুত্র যে একসময় এই নগরের পূর্ব সীমা স্পর্শ করিয়া প্রবাহিত হইত এই খাত তাহারই অন্যতম প্রমাণ। পশ্চিমে ও দক্ষিণে দুইটি বিস্তৃত পরিখা ; এই দুইটি পরিখা বর্তমানে যথাক্রমে মিরকাদিম খাল ও মকুহাটি খাল নামে পরিচিত। সমগ্র স্থানটি ছিল বোধ হয় নিম্নভূমি ; বোধ হয় সেই জন্যই অসংখ্য ছোট বড় দীঘি কাটিয়া নগরভূমিকে সমতল উচ্চভূমিতে পরিণত করা হইয়াছিল। সদ্যোক্ত চতুঃসীমাবেষ্টিত বিস্তৃত নগরের মধ্যে উচ্চতর ভূমিতে রাজপ্রাসাদের বিরাট ধ্বংসস্তূপ এখনও সুস্পষ্ট ; জনস্মৃতিতে এই স্তূপ আজও বল্লালবাড়ী নামে খ্যাত। এই নামের মধ্যে বল্লালসেনের স্মৃতি বিজড়িত, সন্দেহ নাই। কিন্তু রামপাল নাম তো পালরাজ রামপালের, এবং খুব সম্ভব রামপালই এই নগর পত্তন না করিলেও ইহার খ্যাতিকে প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছিলেন। যাহাই হউক, রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের চারিদিকের প্রাকার ও পরিখা ভগ্নাবস্থায় আজও দৃষ্টিগোচর হয়। ইচ্ছামতীর প্রাচীন খাত্ হইতে একটি সুপ্রশস্ত রাজপথ নগরটিকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া একেবারে সোজা

দক্ষিণ-সীমা পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে ; উত্তরতম প্রান্তে এবং দক্ষিণতম প্রান্তে দুইটি সুবৃহৎ নগরদ্বার আজও যথাক্রমে কপালদুয়ার ও কচ্‌কিদুয়ার নামে খ্যাত। এই প্রধান রাজপথ হইতে পূর্ব ও পশ্চিমে অনেকগুলি পথ বাহির হইয়া একেবারে সোজা পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে ; এই পথগুলির চিহ্ন এখনও বর্তমান।

এই রামপালই চন্দ্র-বর্মণ-সেন-দেববংশের লিপিগুলির "শ্রীবিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার" বলিয়া মনে হইতেছে। সমগ্র বিক্রমপুর পরগণায় এমন সুপ্রশস্ত এবং ভৌগোলিক দিক হইতে এমন সুবিন্যস্ত ও সুরক্ষিত প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ আর কোথাও আবিষ্কৃত হয় নাই। রামপালের (একাদশ শতকের শেষার্ধ) নাম ও স্মৃতির সঙ্গে জড়িত বলিয়া এই অনুমান আরও গ্রাহ্য বলিয়া মনে হয়। চন্দ্রবংশীয় রাজাদের আমলেই প্রথম বিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবারের কথা জানা যাইতেছে (একাদশ শতকের প্রথমার্ধ) ; ইঁহারাই হয়তো এই নগর প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকিবেন, কিন্তু রামপালই প্রকৃতপক্ষে ইহার খ্যাতি ও মর্যাদার যথার্থ প্রতিষ্ঠাতা। হয়তো তিনিই ইহাকে বিস্তৃত ও সংস্কৃত করিয়া নিজের নামের সঙ্গে জড়িতও করিয়া থাকিবেন।

সুবর্ণগ্রাম

অরিরাজ দনুজমাধব দশরথদেবের আদাবাড়ীর লিপির কাল পর্যন্তও বিক্রমপুর নগর সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। এই দনুজমাধব দশরথ, হরিমিশ্রের কারিকা-কথিত দনুজমাধব এবং জিয়াউদ্‌দীন বারণি কথিত সুবর্ণগ্রাম বা সোনারগাঁ-র রাজা দনুজ রায় যদি একই ব্যক্তি হইয়া থাকেন, এবং তাহা হইবার সঙ্গত কারণও বিদ্যমান, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়, ১২৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বা তাহার আগে কোনো সময় দনুজমাধব দশরথ বিক্রমপুর হইতে তাঁহার রাজধানী সুবর্ণগ্রামে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। এই সময়ের আগে সুবর্ণগ্রামের কোনো উল্লেখ প্রাচীনতর সাক্ষ্যে কোথাও নাই। হইতে পারে, সুবর্ণগ্রাম পূর্বে বিক্রমপুর-ভাগের অন্তর্গত ছিল, কিন্তু বিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার ও বিক্রমপুর ভাগ এক নহে। বিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার বিক্রমপুর-ভাগের শাসন কেন্দ্র ; দনুজরায়-দনুজমাধব শাসনকেন্দ্র বিক্রমপুর হইতে উঠাইয়া সুবর্ণগ্রামে লইয়া গিয়া থাকিবেন। সুবর্ণগ্রাম আজও ঢাকা জেলায় মুন্সীগঞ্জের বিপরীত দিকে ধলেশ্বরী-তীরের একটি সমৃদ্ধ গ্রাম ; এবং কিছু কিছু পুরাবস্তু এখানেও আবিষ্কৃত হইয়াছে। মুঘলপূর্ব মুসলমান রাজাদের আমলে সুবর্ণগ্রামই ছিল পূর্ব-বাঙলার রাজধানী। লক্ষ্যা-সঙ্গমের অদূরবর্তী সুবর্ণগ্রামের অবস্থিতি যে সামরিক দিক হইতে গুরুত্বময়, তাহা স্বীকার করিতেই হয়।

৬

গ্রাম ও নগর সম্বন্ধে দুই একটি সাধারণ মন্তব্য

প্রাচীন বাঙলার গ্রাম ও নগর সম্বন্ধে এইবার দুই একটি সাধারণ মন্তব্য করা যাইতে পারে।

আয়তনে বা আকৃতি-প্রকৃতিতে এক গ্রামের সঙ্গে আর এক গ্রামের যত পার্থক্যই থাকুক, ঐতিহাসিক কালে অর্থাৎ চতুর্থ-পঞ্চম শতক হইতে একেবারে আদি-পর্বের শেষ পর্যন্ত সমগ্রভাবে বাঙলার গ্রামের চেহারা ও প্রকৃতি একই থাকিয়া গিয়াছে। বস্তুত, মোটামুটিভাবে অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত সে-চেহারা ও প্রকৃতির বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয় নাই বলিলেই চলে। ইহার কারণ একাধিক। প্রথম ও প্রধান কারণ, এই সুদীর্ঘ শতাব্দী পর শতাব্দীর মধ্যে গ্রাম্য উৎপাদন ব্যবস্থার, অর্থাৎ কৃষি ও ক্ষুদ্রশিল্পের উৎপাদনোপায়ের কোনো পরিবর্তন হয় নাই। একদিকে গরু ও লাঙ্গল, আখমাড়াই যন্ত্র, অন্যদিকে তকলী ও তাঁতই প্রধান উৎপাদন-যন্ত্র। দ্বিতীয় কারণ, এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে ভূমি-ব্যবস্থারও কোন মূলগত পরিবর্তন হয় নাই, এবং ভূমি-নির্ভর কৃষক-সমাজের মধ্যে যে শ্রেণীবিভাগ তাহাও মোটামুটি একই থাকিয়া গিয়াছে। কোনো গ্রাম হয়ত কখনো ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র হওয়ার ফলে, বা শাসনকার্যের অধিষ্ঠান নির্বাচিত হইবার ফলে, বা দুয়েরই ফলে, পৃথক একটা গুরুত্ব ও মর্যাদা লাভ করিয়াছে এবং গ্রাম্য সমাজের আকৃতি-প্রকৃতিতে স্থানীয় একটা পরিবর্তনও ঘটিয়াছে, কিন্তু তাহা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। কোনো কোনো গ্রাম শেষোক্ত কারণে গুরুত্বে স্ফীত ও সমৃদ্ধ হইয়া নগর মর্যাদায় উন্নীতও হইয়াছে, কিন্তু তাহাও ব্যতিক্রম। ছোট ছোট গ্রামগুলি একাই একক; বড় গ্রামগুলি দেখিতেছি বিভিন্ন পাড়ায় বিভক্ত। আয়তনানুযায়ী প্রত্যেক গ্রামে গ্রামীর মহত্তর, কুটুম্ব, গৃহস্থ, ভূমিবান ও ভূমিহীন কৃষক, কয়েকঘর শিল্পী, সমাজ-সেবক রজক, নাপিত ইত্যাদি এবং সমাজ-শ্রমিক চণ্ডাল, হাড়ি, ডোম ইত্যাদির বিভিন্ন আয়তন ও মর্যাদায় বাস্তুগৃহাদি। এইসব বাস্তু পরস্পর দূরাবিচ্ছিন্ন নয়; তবে চণ্ডাল প্রভৃতি অন্ত্যজ বর্ণের লোকেরা যে-অংশে বাস করে তাহা প্রধান গ্রামাংশ হইতে একটু বিচ্ছিন্ন। বাস্তুগৃহাদির সংলগ্ন গুবাক, নারিকেল, আম্র, মহুয়া, পনস প্রভৃতি ফলবৃক্ষ; পানের বরজ, পুষ্করিণী, তল, বাটক; কিছু কিছু পতিত বাস্তুভিটা, উচ্চনীচভূমি ইত্যাদি। বাস্তু হইতে অদূরে গ্রামের কৃষিক্ষেত্র; সেই সুবিস্তৃত কৃষিক্ষেত্রে প্রত্যেকের ক্ষেত্রভূমিসীমা আলিদ্বারা সুনির্দিষ্ট; গ্রামের সমগ্র কৃষিভূমি সেই জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত। ক্ষেত্রভূমির পাশ দিয়া মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র বৃহৎ খাল নালা ইত্যাদি; এই খাল নালাগুলি শুধু চাষের জল সরবরাহ করে না, পয়ঃপ্রণালীর কাজও করে। ক্ষেত্রভূমির মধ্যে অথবা শেষ সীমায় গোবাট ও তৃণাচ্ছাদিত গোচরভূমি। গ্রামের পাশ দিয়া নদী বা গাঙ্গিনিকা বা

খাল বা অন্য কোনো জলপ্রবাহ এবং গ্রাম্য লোকজন চলাচলের পথ। কোনো কোনো গ্রামের বাহিরে গ্রাম্য হাট, হট্টিয়গৃহ ইত্যাদি। যে-সব গ্রাম সমুদ্র বা সমুদ্র জোয়ারবাহী নদীর তীরে সেখানে সমুদ্র বা নদীর তীরে তীরে গ্রামের লোকদের লবণের গর্ত। যে-সব গ্রাম বর্ষায় জল-প্লাবিত হয় অথবা নদী ও সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসদ্বারা আক্রান্ত হয়, সে-সব গ্রামের নিম্নতর ভূমিতে ক্ষুদ্র বৃহৎ বাঁধ বা জাঙ্গাল। নদী বা বৃহৎ খাল পারাপারের জন্য গ্রাম্য খেয়াঘাট। প্রত্যেক গ্রামেই ক্ষুদ্র বৃহৎ ২।১টি মন্দির; কোনো কোনো গ্রামে ক্ষুদ্র বৃহৎ বৌদ্ধবিহার; পণ্ডিত ব্রাহ্মণদের গৃহে চতুষ্পাঠী। যে-সব গ্রাম ব্যবসা-বাণিজ্যের যাতায়াত পথের কেন্দ্রে বা সীমায় অবস্থিত সেখানে গঞ্জ, বৃহৎ হাট; জলবাণিজ্যের কেন্দ্র হইলে নদীর ঘাটে বা সমুদ্রের খাড়ীতে অসংখ্য নৌকার সমাবেশ, যেমন ফরিদপুর-কোটালীপাড়া অঞ্চলের গ্রামগুলিতে। এই সব গ্রাম অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ সন্দেহ নাই। এই তো মোটামুটি প্রাচীন বাঙলার গ্রামের চিত্র, এবং এ-চিত্র সমসাময়িক বাঙলার লিপিগুলিতে সুস্পষ্ট। মোটামুটি এই চিত্র অষ্টাদশ শতকের শেষ, এমন কি উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাঙলার গ্রামগুলিতে দেখা যাইতেছে। সমসাময়িক সাহিত্যে, যেমন রামচরিতে এবং সদুক্তিকর্ণামৃতের দুই একটি বিচ্ছিন্ন শ্লোকে প্রাচীন বাঙলার গ্রামগুলির মনোরম কাব্যময় ছবি আঁকা হইয়াছে। রামচরিতে বরেন্দ্রীর গ্রাম বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলা হইতেছে (৩।৫।২৮):

> বরেন্দ্রীতে জগদ্দল মহাবিহার, এই দেশেই বোধিসত্ত্ব লোকেশ ও তারার মন্দির। ইহার স্কন্দনগর এবং বহুমন্দির শোভিত শোণিতপুর (বাণগড়-কোটিবর্ষ) নগরে অসংখ্য ব্রাহ্মণের বাস। এই ভূমির দুই প্রান্তে গঙ্গা ও করতোয়া, আর পুনর্ভবার তীরে প্রসিদ্ধ তীর্থঘাট। বরেন্দ্রীতে প্রচুর বৃহৎ বৃহৎ জলাশয় (বিল ?); সেই জলাশয় হইতে বলভী ও ক্ষীণতোয়া কালিনদীর উদ্ভব। স্থানে স্থানে কোকিল কূজিত, কন্দ-লকুচ-শ্রীফল-লবলী-করুণা-প্রিয়াল। শোভিত উদ্যান; মাঠে মাঠে নানা প্রকারের ধানের ক্ষেত, এলার ক্ষেত, প্রিয়ঙ্গুলতা এবং ইক্ষু ও বাঁশের ঝাড়, অগণিত মহুয়া, সুপারী ও নারিকেল গাছ। জলাশয়ে জলাশয়ে নীল ও লাল পদ্ম, গৃহপ্রাঙ্গণে কনক (চম্পক) ও কেতক ফুলের গাছ; আকাশে বিস্তৃত ও দ্রুতসঞ্চরমান প্রচুর বারিবর্ষী মেঘ।

লক্ষ্মণসেনের আনুলিয়া-লিপিতে শালিধান্যভারাবনত শস্যক্ষেত্র এবং রমণীয় উদ্যান শোভিত গ্রামের উল্লেখ আছে; অন্যান্য ২।১টি লিপিতেও ধান্যভারাবনত শস্যসমৃদ্ধ গ্রাম্য শোভার ইঙ্গিত আছে। দুই একটি গ্রামে হর্ম্যাবলীর কথাও আছে।

বর্ষায় ও হেমন্তে বাঙলার গ্রাম-বর্ণনা, গ্রাম্য কৃষকের চিত্র প্রভৃতি সদুক্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থ হইতে অন্যত্র উদ্ধার করিয়াছি (দেশ-পরিচয় প্রসঙ্গে জলবায়ু-বর্ণনা দ্রষ্টব্য)। শালিধান্য

ও ইক্ষুশস্য সমৃদ্ধ এবং ইক্ষুযন্ত্রধ্বনিমুখরিত বাঙলার টুক্‌রা টুক্‌রা চিত্র লিপিমালায় এবং সমসাময়িক সাহিত্যে অন্যত্রও পাওয়া যায়।

গ্রামগুলি মোটামুটি অপরিবর্তিত, কিন্তু প্রাচীন বাঙলার নগরগুলি সম্বন্ধে তাহা বলা চলে না বলিয়াই মনে হইতেছে। খ্রীষ্টপূর্ব শতক হইতে আরম্ভ করিয়া ষষ্ঠ-সপ্তম শতক পর্যন্ত যতগুলি নগরের খবর পাওয়া যাইতেছে, তাহার অধিকাংশই যেন প্রধানত ব্যবসা-বাণিজ্য নির্ভর। তাম্রলিপ্তি তো বটেই, এমন কি পুণ্ড্রনগর, বর্ধমান, গঙ্গাবন্দর-নগর, নব্যাবকাশিকা-নগর, বারকমণ্ডল-বিষয়ের নগর প্রভৃতি সমস্ত নগরই সুপ্রশস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য পথের উপর অবস্থিত। তাম্রলিপ্তি, গঙ্গাবন্দর, ও পুণ্ড্রনগর সম্বন্ধে যে-সমস্ত বিবরণ প্রাচীন সাহিত্যগ্রন্থ, চীনপরিব্রাজকদের বিবরণ, পাশ্চাত্য বণিক ও ভৌগোলিকদের বিবরণ ইত্যাদির মধ্যে পাইতেছি, তাহাতে এসম্বন্ধে কোনো সংশয় থাকে না। নব্যাবকাশিকা-বারকমণ্ডল-পুণ্ড্রনগর-বর্ধমানে শাসনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ছিল সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহাদের গুরুত্ব ও মর্যাদা যেন বাণিজ্য-সমৃদ্ধির উপরই নির্ভর করিত; পুণ্ড্রনগরের ক্ষেত্রে তীর্থমাহিমাও অবশ্যই কার্যকরী ছিল। এই উভয় কারণের জন্যই হয়তো মৌর্য ও গুপ্ত-রাজারা এইখানেই শাসনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। গঙ্গা-বন্দর ও তাম্রলিপ্তির গুরুত্ব নিরঙ্কুশ ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর। কোটীবর্ষ, পঞ্চনগরী, পুষ্করণ, প্রভৃতি নগর প্রধানত রাষ্ট্রীয় ও সামরিক প্রয়োজনে হয়তো গড়িয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু কোটীবর্ষের অবস্থান এবং প্রাচীন সাহিত্যের উল্লেখ-ইঙ্গিতে মনে হয়, এই নগরের কিছু কিছু বাণিজ্য এবং তীর্থ-মহিমাও ছিল। বস্তুত, অন্তত ষষ্ঠ-সপ্তম শতক পর্যন্ত প্রাচীন বাঙলার সব কয়টি নগরেরই অবস্থিতি ও বিবরণ যতটুকু জানা যায়, তাহাতে মনে হয়, ব্যবসা-বাণিজ্য বিবেচনার উপরই ইহাদের অস্তিত্ব ও মর্যাদা প্রাধানত নির্ভর করিত। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে বাঙলার নাগর-সভ্যতার যে সমসাময়িক চিত্র দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাতেও সদাগরী ধনতন্ত্রের লক্ষণ সুস্পষ্ট। কিন্তু সপ্তম শতক ও তাহার পর হইতে ব্যবসা-বাণিজ্য, বিশেষত সামুদ্রিক বহির্বাণিজ্যের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন বাঙলার নগরগুলির আকৃতি ও প্রকৃতি ধীরে ধীরে বদলাইতে আরম্ভ করে। সপ্তম শতকে য়ুয়ান-চোয়াঙ্ বাঙলার যে-কয়টি নগরের বিবরণ দিতেছেন, তাহাদের মধ্যে এক তাম্রলিপ্তি ছাড়া আর একটিরও বাণিজ্য-প্রাধান্যের ইঙ্গিত নাই, বরং রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন-প্রেরণার ইঙ্গিত আছে। কর্ণসুবর্ণ, উদুম্বর নগর, কযঙ্গল-নগর, সমতট-নগর, এমন কি পুণ্ড্রনগর সম্বন্ধেও য়ুয়ান্-চোয়াঙের বর্ণনায় ইঙ্গিত লক্ষ্যণীয়। অষ্টম-নবম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া হিন্দু আমলের শেষ পর্যন্ত যে-কয়টি নগরের বর্ণনা উপরে করা হইয়াছে, তাহাদের ভৌগোলিক অবস্থিতি, নগর-বিন্যাস, এবং সমসাময়িক উল্লেখের ইঙ্গিত একটু সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, অধিকাংশ নগরের পশ্চাতে রাষ্ট্রীয়, বিশেষভাবে সামরিক প্রয়োজন-বিবেচনা সক্রিয় ছিল। মুদগগিরি, বিলাসপুর, হরধাম, রামাবতী, লক্ষণাবতী, বিজয়পুর, সপ্তগ্রাম, বিক্রমপুর, সুবর্ণ-

গ্রাম, পাট্টিকেরা প্রভৃতি সমস্ত নগর সম্বন্ধেই এই উক্তি প্রযোজ্য। দুই একটি নগর, যেমন, ত্রিবেণী, নবদ্বীপ, সোমপুর এবং অন্যান্য বৌদ্ধ বিহার-নগর প্রভৃতির পশ্চাতে হয়তো ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রয়োজন-প্রেরণাই প্রধান বিবেচনার বিষয় ছিল। অন্যত্র সর্বত্রই এই প্রয়োজন-বিবেচনা গৌণ।

রামাবতী ও বিজয়পুরের যে বর্ণনা যথাক্রমে রামচরিত ও পবনদূতে পাইতেছি, মহাস্থান-বাণগড়-রামপাল-পাট্টিকেরা প্রভৃতি নগরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে নগর-বিন্যাসের যে-চিত্র উদ্‌ঘাটিত হইতেছে তাহা সমস্তই অষ্টম শতকপরবর্তী। বলা বাহুল্য, যে ভাবে নগরগুলি অবস্থিত ও বিন্যস্ত তাহাতে সামরিক ও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন, রাজকীয় প্রয়োজন এবং ধন ও বংশাভিমান-সমৃদ্ধ অভিজাত শ্রেণীসমূহের প্রয়োজনকেই গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে বেশি। রামাবতী-লক্ষ্মণাবতী দুইই গঙ্গা-মহানন্দার সঙ্গমে রাজমহল গিরিবর্ত্মের প্রবেশ মুখের প্রহরী; পুণ্ড্রনগর করতোয়ার উপর; কোটীবর্ষ পূনর্ভবার তীরে; রামপাল ইছামতী-ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গমে; পাট্টিকেরা গোমতী নদী ও ময়নামতী পাহাড়ের ক্রোড়ে; বিজয়পুর ভাগীরথী-যমুনা-সরস্বতী এই ত্রিবেণী সঙ্গমের অদূরে। মহাস্থান-বাণগড়-রামপালের ধ্বংসাবশেষ বিশ্লেষণে দেখা যাইতেছে, প্রত্যেকটি নগরই প্রাকার-বেষ্টিত, এবং প্রাকারের পরেই পরিখা। নগর হইতে নগরোপকণ্ঠে বা নদীর ঘাটে যাইবার জন্য প্রাকারের প্রত্যেক দিকেই এক বা একাধিক নগরদ্বার, এবং পরিখার উপর দিয়া সেতু। পরিখার অপর পারে নগরোপকণ্ঠে সমাজ-সেবক, সমাজ-শ্রমিক এবং নগর-নির্ভর কুটুম্ব-গৃহস্থদের বাস; কোথাও কোথাও মন্দির, সংঘ, বিহার প্রভৃতিও আছে। নগরাভ্যন্তরে উচ্চতর ভূমির উপর প্রাচীর-বেষ্টিত রাজপ্রাসাদ। রাজপ্রাসাদের সংলগ্ন রাজকীয় এবং শাসনকার্যসংক্রান্ত অট্টালিকাদি। সোজা সরল রেখায় পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণে লম্বমান্ রাজপথদ্বারা সমস্ত নগরভূমি পৃথক পৃথক চতুর্ভুজে বিভক্ত; রাজপথের দুইধারে সমান্তরালে প্রাসাদোপম আবাস-সৌধশ্রেণী, আপণি-বিপণি প্রভৃতি। তাহা ছাড়া, হাট, বাজার, মন্দির, প্রমোদোদ্যান, দীঘি, পুষ্করিণী, বিহার প্রভৃতি তো ছিলই; য়ুয়ান্-চোয়াঙের বর্ণনায়ও তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে। রামাবতী ও বিজয়পুরের কাব্যময় বর্ণনাতেও পাইতেছি, সুপ্রশস্ত রাজপথের দুইধারে সমান্তরালবর্তী সুউচ্চ সুরম্য প্রাসাদোপম অট্টালিকা-শ্রেণী, প্রত্যেক অট্টালিকার চূড়ায় সুবর্ণকলস; মন্দির, বিহার, প্রমোদোদ্যান; বৃহৎ দীঘির চারিধার তালবৃক্ষ ও সুসজ্জিত প্রস্তরখণ্ডদ্বারা শোভিত ও অলঙ্কৃত।

সকল নগরই যে এইরূপ সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্যবান্ ছিল, এমন বলা যায় না। অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগরও ছিল যাহাদের সামরিক বা রাষ্ট্রীয় বা অন্য কোনো গুরুত্ব যথেষ্ট ছিল না, প্রধানত স্থানীয় শাসনাধিষ্ঠানের কেন্দ্ররূপেই যাহাদের পত্তন হইয়াছিল। বিষয়াধিষ্ঠান, মণ্ডলাধিষ্ঠান, বীথী-অধিষ্ঠান প্রভৃতি জাতীয় নগর সর্বত্র উপরোক্ত নগরগুলির মত সমৃদ্ধ নিশ্চয়ই ছিল না। ছোট ছোট তীর্থ বা শিক্ষাকেন্দ্রগুলিও তাহা ছিল না। এগুলি বরং

অনেকটা বৃহৎ সমৃদ্ধ গ্রামের মতনই ছিল বলিয়া অনুমান হয়। ছোট ছোট বাণিজ্যকেন্দ্র-গুলিও তাহাই ছিল। বিষয়, মণ্ডল বা বীথীর অধিষ্ঠানগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাজস্বসংগ্রহের, স্থানীয় বিচার-ব্যবস্থার, ভূমি-ব্যবস্থার, শান্তিরক্ষা-ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ-কেন্দ্র। কিছু কিছু স্থানীয় বাণিজ্যকার্যও এই সব কেন্দ্রে নির্বাহিত হইত। এইসব উপলক্ষে কিছু কিছু রাজকর্মচারী, শিল্পী, বণিক প্রভৃতির এ-জাতীয় অধিষ্ঠানগুলিতে বাসও করিতেন; কিন্তু তৎসত্ত্বেও গ্রামের সঙ্গে এই জাতীয় নগরের বিশেষ কিছু পার্থক্য ছিল না। অধিকাংশ লিপির সাক্ষ্যেই দেখা যায়, এই জাতীয় ছোট ছোট নগরের সঙ্গে গ্রামগুলি একেবারে সংলগ্ন; নগরের পথ গ্রামে গিয়া মিশিয়াছে, অথবা গ্রামের পথ নগর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। নিকটস্থ গ্রামের উৎপাদিত কৃষি ও শিল্পবস্তু লইয়াই এই সব ছোট ছোট নগরের স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্য। অবশ্য, কোটীবর্ষ-বিষয়ের অধিষ্ঠান কোটীবর্ষ-নগর সম্বন্ধে একথা বলা চলে না, কারণ এই নগরের গুরুত্ব ও মর্যাদা শুধু বিষয়াধিষ্ঠান বলিয়া নয়; তীর্থ ও ধর্মকেন্দ্র এবং আন্তর্দেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যের অন্যতম কেন্দ্র হিসাবেও ইহার অন্যতর গুরুত্ব এবং মর্যাদা ছিল।

৭

গ্রামীণ ও নাগর সভ্যতা এবং সংস্কৃতির প্রকৃতি

আগেই বলিয়াছি, নগরগুলি ব্যবসা-বাণিজ্যলব্ধ ধনের প্রধান সঞ্চয়-কেন্দ্র ছিল; তাহা ছাড়া গৃহশিল্প ও কৃষিলব্ধ ধনের প্রধান বণ্টন-কেন্দ্রও ছিল নগরগুলি। তাহার ফলে সামাজিক ধনের অধিকাংশই কেন্দ্রীকৃত হইত নগরে, এবং অল্পসংখ্যক নগরবাসীই সেই ধনের অপেক্ষাকৃত অধিকাংশ ভোগের সুযোগ ও অধিকার লাভ করিত। ইহাই নগরগুলির ঐশ্বর্য, বিলাস ও আড়ম্বরের মূলে। বস্তুত, পাল ও সেন আমলের লিপি ও সমসাময়িক সাহিত্যপাঠে মনে হয়, নগর ও গ্রামের প্রথম এবং প্রধান পার্থক্যই যেন নির্ণীত হইত ঐশ্বর্য বিলাসাড়ম্বরের তারতম্যদ্বারা। রামচরিতে রামাবতীর এবং পবনদূতে বিজয়পুরের বর্ণনায় দেখিতেছি, রাজপথের দুইধারে চলিয়াছে প্রাসাদের শ্রেণী, নগরে সঞ্চিত প্রচুর মণিরত্ন সম্ভার। রাজতরঙ্গিনী গ্রন্থে পুণ্ড্রবর্ধন নগরের নাগরিকদের ধনৈশ্বর্যের বর্ণনা আছে বাররামা নর্তকী কমলার গল্প প্রসঙ্গে; কিন্তু তাহারও আগে তৃতীয়-চতুর্থ শতকে বাঙলাদেশের নগরগুলি যখন সদাগরী বাণিজ্যলব্ধ ধনে সমৃদ্ধ তখন বাৎস্যায়ন এদেশের নগর ও নাগর সভ্যতার কিছু আভাস রাখিয়া গিয়াছেন। বাৎস্যায়নের কামসূত্র সমসাময়িক ভারতীয় নাগর-সভ্যতার ইতিহাস এবং নাগর যুবক-যুবতীদের অনুশীলন-গ্রন্থ। তিনি এই নাগর-সভ্যতারই জয়গান করিয়াছেন, এবং নাগরাদর্শকেই

বিদগ্ধ সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদর্শ বলিয়া পাঠকের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তদানীন্তন শিক্ষা, রুচি ও সংস্কারানুযায়ী। বাঙলাদেশের সমসাময়িক নাগর-সভ্যতা সম্বন্ধেও তাঁহার কিছু বক্তব্য আছে। গৌড়ের নগরপুষ্ট অবসরসমৃদ্ধ নরনারীদের কামলীলা ও ঐশ্বর্যবিলাসের সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুস্পষ্ট চিত্র তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। গৌড় নাগরকেরা যে লম্বা লম্বা নখ রাখিতেন এবং সেই নখে রং লাগাইতেন যুবতীদের মনোহরণ করিবার জন্য, তাহাও বাৎস্যায়ন লিখিয়া যাইতে ভুলেন নাই। গৌড় ও বঙ্গের রাজপ্রাসাদান্তঃপুরের নারীরা প্রাসাদের ব্রাহ্মণ, রাজকর্মচারী, ভৃত্য ও দাসদের সঙ্গে কিরূপ লজ্জাকর কামষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইতেন তাহার সাক্ষ্যও বাৎস্যায়ন দিতেছেন। নাগর অভিজাত শ্রেণীর অবসর এবং স্বল্পায়াসলব্ধ ধনপ্রাচুর্য তাহাদিগকে ঐশ্বর্য-বিলাস এবং কামলীলার চরিতার্থতার একটা বৃহৎ সুযোগ দিত; বাৎস্যায়নে তাহার আভাস সুস্পষ্ট। অভিজাতগৃহে নর্তকী-বিলাসের ইঙ্গিতও বাৎস্যায়ন দিয়াছেন। কিন্তু শুধুই বাৎস্যায়ন নহেন; কহ্লন তাঁহার রাজতরঙ্গিনীতে অষ্টম শতকের পুণ্ড্রবর্ধন-নগরের নর্তকী কমলার কথা বলিতেছেন। কমলা নগরের কোনো মন্দিরের দেবদাসী বা নর্তকী ছিলেন, নৃত্যে-গীতে সুদক্ষা এবং অন্যান্য কলাবিদ্যায় নিপুণা। বস্তুত, বাৎস্যায়ন এই সব নর্তকী ও সভানারীদের যে-সব কলানিপুণতা থাকা প্রয়োজন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কমলার তাহাই ছিল। অভিজাত নাগর যুবকদের মনোরঞ্জন করিয়া কমলা প্রচুর ধনৈশ্বর্যের অধিকারিণী হইয়াছিলেন। সমসাময়িক নাগর অভিজাত সমাজে এই প্রথা কিছু নিন্দনীয়ও ছিল না। তাহা না হইলে সন্ধ্যাকর নন্দী রামচরিতে এবং ধোয়ী-কবি পবনদূতে যে-ভাষায় নাগর-বাররামাদের স্তুতিবাদ করিয়াছেন তাহা কিছুতেই হয়তো সম্ভব হইত না; বরং ইঁহাদের বর্ণনা হইতে মনে হয়, নাগর অভিজাত সমাজে নর্তকী, সভানারী, বাররামা, দেবদাসীরা অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইতেন। ভট্ট ভবদেবের প্রশস্তি, বিশ্বরূপ ও কেশবসেনের লিপিগুলিতেও ইঁহাদের উচ্ছ্বসিত স্তুতিবাদের সাক্ষাৎ মেলে। বিজয়সেন (দেওপাড়ালিপি) ও ভট্ট ভবদেব তাঁহাদের নির্মিত মন্দিরে শত শত দেবদাসী নিযুক্ত করিয়াছিলেন; তাঁহাদের সৌন্দর্য ও কামাকর্ষণ বর্ণনায় প্রশস্তিকারেরা অজস্র স্তুতিবাদ বর্ষণ করিয়াছেন। রামাবতীর নারীদের সম্বন্ধে রামচরিতের কবিও তাহাই করিয়াছেন।

নাগরিক ঐশ্বর্যবিলাসাড়ম্বরের চিত্র এইখানেই শেষ নয়। নানাপ্রকার সূক্ষ্ম বস্ত্র, মণিরত্নখচিত ধাতব অলঙ্কার, স্বর্ণ ও রৌপ্যের তৈজসপত্র, প্রাসাদোপম সৌধাবলী, মন্দির ইত্যাদির বর্ণনায় দশম-একাদশ শতক-পরবর্তী লিপিগুলি এবং সমসাময়িক নাগর-সাহিত্য প্রায় ভারাক্রান্ত। সপ্তম শতকে ইৎসিঙ্ প্রয়োজন ও ক্ষমতার অতিরিক্ত বৃহৎ সামাজিক ভোজের অপব্যবস্থার কথাও বলিয়াছেন; বাঙলাদেশের গ্রামে নগরে সর্বত্র এই বৃহৎ সামাজিক অপব্যয় আজও অব্যাহত চলিতেছে। বিজয়সেনের দেওপাড়া প্রশস্তিতে

একটি অর্থবহ শ্লোক আছে। গ্রাম্য ব্রাহ্মণ মেয়েরা মুক্তা, স্বর্ণ, রৌপ্য, মরকত প্রভৃতি দেখিতে অভ্যস্ত ছিলেন না; কার্পাস-বীজ, শাকপত্র, অলাবুপুষ্প, দাড়িম্ব-বীচি, কুষ্মাণ্ডপুষ্পই তাঁহাদের অধিকতর পরিচিত। কিন্তু বিজয়সেনের কল্যাণে অনেক ব্রাহ্মণ-পরিবার নগরবাসী হইয়াছিলেন এবং বিত্তবানও হইয়াছিলেন। তখন নাগরীরা (নাগরীভিঃ) ব্রাহ্মণীদের মুক্তা, রৌপ্য, স্বর্ণ, মরকত প্রভৃতি চিনিতে শিখাইয়াছিলেন। ইহার মধ্যে কবিজনোচিত অত্যুক্তি আছে সন্দেহ নাই; কিন্তু গ্রাম্য নারী এবং নগরের নাগরীদের প্রকৃতি-পার্থক্যের যে-ইঙ্গিত আছে তাহাও লক্ষ্যণীয়।

সদুক্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন শ্লোকে গ্রাম্য ও নাগর সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রকৃতি-পার্থক্য খুব সুন্দর ফুটিয়াছে। আপেক্ষিক তুলনার জন্য এই শ্লোকগুলি পর পর উদ্ধার করা যাইতে পারে।

পল্লীগ্রামের লোকেরা নগরবাসিনীদের চালচলন পছন্দ করিতেন না। কবি গোবর্ধনাচার্য বলিতেছেন ঃ

ঋজুনা নিধেহিচরণৌ পরিহর সখি নিখিলনাগরাচারম্।
ইহ ডাকিনীতি পল্লীপতিঃ কটাক্ষেঽপি দণ্ডয়তি ॥

ওগো সখি, ঋজুভাবে পদক্ষেপ করিয়া চল, নাগরাচার সব পরিত্যাগ কর। কটাক্ষপাত করিলেও গ্রামপতি এখানে ডাকিনী বলিয়া ভর্ৎসনা করে।

এই প্রকৃতি-পার্থক্য এখনও কি সত্য নয়? ইহারই সঙ্গে বঙ্গীয় (অর্থাৎ পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গীয়) নগরবাসিনী গৃহস্থ বারাঙ্গনাদের বেশভূষার বর্ণনা উদ্ধার করা যাইতে পারে। জনৈক অজ্ঞাতনামা কবি বলিতেছেন ঃ

বাসঃ সূক্ষ্মং বপুষি ভুজয়োঃ কাঞ্চনী চাঙ্গদশ্রীর্
মালাগর্ভঃ সুরভিমসৃণৈর্গন্ধতৈলৈঃ শিখণ্ডঃ।
কর্ণোত্তংসে নবশশিকলানির্মলং তালপত্রং
বেশঃ কেষাং ন হরতি মনো বঙ্গবারাঙ্গনাম্ ॥

দেহে সূক্ষ্ম বস্ত্র, ভুজবন্ধে সোনার অঙ্গদ, গন্ধতৈলের সুরভিযুক্ত মসৃণ কেশ শিখণ্ড বা চূড়ার মত করিয়া বাঁধা এবং তাহা মালাগর্ভ (অর্থাৎ ফুলের মালা কেশচূড়ায় জড়ান); কর্ণলতিকায় নবশশিকলার মত নির্মল তালপাতার অলঙ্কার— বঙ্গবারাঙ্গনাদের এই বেশ কাহার না মন হরণ করে!

অথচ, ইহারই পাশে পাশে জনৈক কবি চন্দ্রচন্দ্রের পল্লী-বিলাসিনীদের বর্ণনা লক্ষ্যণীয় ঃ

ভালে কজ্জল বিন্দুরিন্দু কিরণস্পর্ধী মৃণালাঙ্কুরো
দোর্বল্লীষু শলাটুফেনিলফলোত্তংসশ্চ কর্ণাতিথিঃ।
ধম্মিল্লস্তিলপল্লবাভিষবণস্নিগ্ধঃ স্বভাবাদয়ং
পান্থান্ মন্থরয়ত্যমাগর বধূ বর্গস্য বেশগ্রহঃ ॥

কপালে কজ্জলবিন্দু, হস্তে ইন্দুকিরণস্পর্ধী শ্বেত পদ্মডাটার বলয়, কর্ণে কোমল রীঠাফুলের কর্ণাভরণ, কেশ স্নানস্নিগ্ধ এবং কবরীতে তিলপল্লব নিবদ্ধ—পল্লীবধূদের এই বেশ স্বতঃই পান্থদের গমন মন্থর করিয়া আনে।

কবি শুভাংক বলিতেছেন, নগরে রাজসৌধাবলীর বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে যুবতীদের ক্রীড়াযুদ্ধে ছিন্ন হারের মুক্তাসমূহ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে থাকে। সেখানে 'বিলাসগৃহে পিঞ্জরস্থিত শুক'; রাজপ্রাসাদে মূলব্যান প্রস্তরখচিত ফুল, কণ্ঠহার, কর্ণাঙ্গুরী, স্বর্ণখচিত বলয় এবং নূপুর পরিধান করিয়া ভৃত্যাঙ্গনারা ঘুরিয়া বেড়ায়; নগর প্রাসাদশিখরে দাঁড়াইয়া নগরাঙ্গনারা নিয়ে রাজপথে চলমান সুদর্শন যুবকের উপর কামকটাক্ষ নিক্ষেপ করেন (সদুক্তিকর্ণামৃত)। অথচ, অন্যদিকে গ্রাম্যজীবনের একাংশে নিষ্করুণ দারিদ্র্য। কবি বার ও অন্য একজন অজ্ঞাতনামা কবি এই দারিদ্র্যের ছবিও আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। অন্যত্র এই শ্লোক দুইটি উদ্ধার করা হইয়াছে (রাষ্ট্রবিন্যাস-অধ্যায়ের উপসংহার দ্রষ্টব্য)। জীবনের সেই দিক্‌টায় 'নিরানন্দে দেহ শীর্ণ, পরিধানে জীর্ণবস্ত্র; ক্ষুধায় শিশুদের চক্ষু ও পেট কুক্ষিগত, আকুল হইয়া তাহারা খাদ্য প্রার্থনা করিতেছে। দীনা দুঃস্থা গৃহিণী চক্ষুর জলে আনন ধৌত করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন, এক মান তণ্ডুলে যেন তাহাদের একশত দিন চলে।' আর একটি পরিবারেও একই চিত্র। 'শিশুরা ক্ষুধায় পীড়িত, তাহাদের দেহ শবের মত শীর্ণ, আত্মীয়-স্বজনেরা মন্দাদর, পুরাতন ভগ্ন জলপাত্রে একফোঁটা মাত্র জল ধরে; গৃহিণীর পরিধানে শতচ্ছিন্ন বস্ত্র' (সদুক্তিকর্ণামৃত)।

গ্রাম্য সমৃদ্ধির ছবিও আছে। তেমন দুইটি শ্লোক দেশ-পরিচয় অধ্যায়ে জলবায়ু বর্ণনা-প্রসঙ্গে উদ্ধার করিয়াছি। একটি ছবি এইরূপ: 'বর্ষায় প্রচুর জল পাইয়া ধান চমৎকার গজাইয়া উঠিয়াছে; গরুগুলি ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে; ইক্ষুর সমৃদ্ধিও দেখা যাইতেছে। অন্য কোনো ভাবনা আর নাই। ঘরে গৃহিণী সারাদিনের শেষে প্রসাধনরতা। বাহিরে আকাশ হইতে জল ঝরিতেছে প্রচুর। গ্রাম্য যুবক সুখে নিদ্রা যাইতেছে।' অন্য আর একটি ছবি: 'হেমন্তে কাটা শালি ধান্যে চাষীর গৃহাঙ্গন স্তূপীকৃত; নবজাত শ্যামল যবাঙ্কুর ক্ষেত্রসীমা ছাড়াইয়া যেন বিস্তৃত; গরু, ষাঁড় ও ছাগলগুলি ঘরে ফিরিয়া আসিয়া নূতন খড় খাইয়া তৃপ্ত ও আনন্দ পাইতেছে; গ্রামগুলি ইক্ষুপেষণযন্ত্রের শব্দে মুখর আর নূতন গুড়ের গন্ধে আমোদিত' (সদুক্তিকর্ণামৃত)। বস্তুত, প্রাচীন বাঙলার কৃষিজীবী গ্রাম্য বাঙালী গৃহস্থের পরম এবং চরম কামনাই হইতেছে, 'বিষয়পতি অর্থাৎ স্থানীয় শাসনকর্তা যেন লোভহীন হ'ন, ধেনুদ্বারা গৃহ যেন পবিত্র হয়, ক্ষেত্রে যেন চাষ হয়, এবং গৃহিণী যেন অতিথিসৎকারে কখনও ক্লান্ত না হ'ন'। কবি শুভাংক পল্লীবাসী ভদ্র গৃহস্থের এই কামনাটি ব্যক্ত করিয়াছেন (সদুক্তিকর্ণামৃত)।

বিষয়পতিরলুব্ধো ধেনুভির্ধাম পূতং
কতিচিদভিমতায়াং সীম্নি সীরা বহন্তি।

শিথিলয়তি চ ভার্যা নাতিথেয়ী সপর্যাম
ইতি সুকৃতমনেন ব্যঞ্জিতং নঃ ফলেন ॥

লক্ষ্মণসেনের সুহৃদ ও সভা-কবি শরণ গ্রাম্যজীবনের আর একটি ছবি রাখিয়া গিয়াছেন ; এই ছবিটি উদ্ধার করিয়াই এই অধ্যায় শেষ করা যাইতে পারে। ছবিটি সুন্দর, বস্তুনির্ভর এবং চমৎকার কাব্যচিত্রময়।

এতাস্তা দিবসান্তভাস্করসদৃশো ধাবন্তি পৌরাঙ্গনাঃ
স্কন্ধপ্রস্খলদংশুকাঞ্চলধৃতিব্যাসঙ্গবদ্ধাদরাঃ।
প্রাতর্যাতকৃষীবলাগমভিয়া প্রোৎপ্লুত্যাবর্ত্ম চ্ছিদো
হট্টক্রয্যপদার্থমূল্যকলন ব্যগ্রাঙ্গুলিগ্রন্থয়ঃ ॥ (সদুক্তিকর্ণামৃত)

এই তো দ্রুত ছুটিয়া চলিয়াছে পৌরাঙ্গনারা ; তাহাদের চক্ষু দিবসান্তসূর্যের মত (অরুণাবর্ণ) ; দ্রুত গমনহেতু তাঁহাদের স্কন্ধের অঞ্চল বারংবার খসিয়া পড়িতেছে আর বার বার তাহা তুলিয়া দিবার জন্য তাহারা ব্যগ্র। ঘরের চাষী (স্বামী-পুত্র-ভ্রাতারা) প্রাতঃকালে বাহির হইয়া গিয়াছে (মাঠের কাজে) ; তাহাদের (ঘরে) ফিরিয়া আসিবার সময় হইয়াছে ভাবিয়া মেয়েরা লাফাইয়া লাফাইয়া পথ ছেদন করিতেছে (অর্থাৎ সংক্ষেপ করিয়া আনিতেছে), (অথচ সেই অবস্থাতেই) তাহারা হাটে ক্রয়-বিক্রয়ের মূল্য আঙ্গুলে গুণিতে ব্যস্ত।

অষ্টম অধ্যায়ের পাঠ-নির্দেশ

অন্যান্য বেশ ক'একটি অধ্যায়ের মত এ-অধ্যায়েরও প্রধান নির্ভর লিপিমালা (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। তবু, এখানে ওখানে নানা প্রাচীন গ্রন্থাদি থেকে নানা টুকরো-টাকরা খবর সংগ্রহ করে ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন, কথাসরিৎসাগর, কামসূত্র, দশকুমারচরিত, পবনদূত (ধোয়ীকৃত, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী সং, কলিকাতা), বল্লালচরিত, বৃহৎসংহিতা, মহাবংশ (Geiger সম্পাদিত Pali Text Society সং), মঞ্জুশ্রীমূলকল্প, রামচরিত, রাজতরঙ্গিনী, সদুক্তিকর্ণামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে। প্রাচীন গ্রীক Periplus of the Erythrean Sea, গ্রীক ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিকদের রচনাদি, Ptolemy-র বিবরণী, চীনা পর্যটকদের ভ্রমণবৃত্তান্ত ইত্যাদি থেকেও কিছু কিছু তথ্য আহরণ করা হয়েছে, যেমন করা হয়েছে মধ্যযুগীয় আইন-ই-আকবরী, তবকাত-ই-নাসিরী গ্রন্থাদি থেকে।

ক'একটি আধুনিক গ্রন্থেও নানা তথ্য ইতস্তত ছড়ানো আছে ; এ-জাতীয় গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নীচে দেওয়া হলো।

Abid Ali Khan, Memoirs of Gaur and Pandua, Calcutta 19 ; Bhattasali, N. K. Iconography of Buddhist and Brahmanical sculptures in the Dacca Museum, Dacca, 1929 ; Chakladar, H. C., Social life in ancient India, Calcutta ; Hunter, W. W., Statistical account of Bengal, 20 Vols London, 1875-77 ; Majumdar, R. C. *ed.* History of Bengal, I, chap I, Dacca, 1943 ; Morrison, B M , Political centres and cultural regions in early Bengal, Tucson, 1970; Majumdar, R. C , History of ancient Bengal, Chap. X, Calcutta, 1974 ; Rennel, J., Memoir of a map of Hindoosthan, London, 1783 ; Saraswati, S. K., Forgotten cities of Bengal, in Calcutta Geographical Review, 1936, pp, 17-18 ;

নবম অধ্যায়

রাষ্ট্র-বিন্যাস

১

সূত্র ও উপাদান

প্রাচীন বাঙলার সমাজ-বিন্যাসের পূর্ণাঙ্গ রূপ দেখিতে হইলে রাষ্ট্র-বিন্যাসের চেহারাটাও একবার দেখিয়া লওয়া প্রয়োজন। রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যক্তিবিশেষের খেয়াল মাত্র নয়, অর্থশাস্ত্র-দণ্ডশাস্ত্র অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ব্যাকরণের উদাহরণ মাত্র নয় ; সমসাময়িক সমাজেরই রূপ কমবেশি রাষ্ট্রে প্রতিফলিত হয়, সেই সমাজের প্রয়োজনেই রাষ্ট্র গড়িয়া উঠে, অর্থশাস্ত্র-দণ্ডশাস্ত্র রচিত হয়। কোনও শাস্ত্রের রীতিপদ্ধতি অচল ও সনাতন নয় ; যখন সমাজের রূপ যেমন সামাজিক আদর্শ যেমন, সেই অনুযায়ী রাষ্ট্র গঠিত হয়, শাস্ত্র রচিত হয় ; সেই রূপ ও আদর্শ যখন বদলায়, রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রীয় শাস্ত্রও বদলায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র বা শুক্রাচার্যের শুক্রনীতিসার সর্বদেশে সর্বকালে প্রযোজ্য নয় ; সমসাময়িক কাল ও তদোক্ত দেশের রাষ্ট্রবিন্যাস-ব্যাখ্যায়ই তাহারা সহায়ক। কিন্তু সহায়ক মাত্রই, তাহার বেশি নয়।

প্রাচীন বাঙলার রাষ্ট্রবিন্যাস-ব্যাখ্যায় এই ধরনের কোনো শাস্ত্র-সহায় আমাদের সম্মুখে উপস্থিত নাই। যাহা আছে তাহা রাষ্ট্রযন্ত্রের বাস্তব ক্রিয়াক্রমের এবং বিভিন্ন শাখা-উপশাখার, বিভাগ-উপবিভাগের পরিচয়জ্ঞাপক কতকগুলি রাজকীয় দলিল—ভূমি দান-বিক্রয়ের পট্ট বা পাটা। ইহা স্বাভাবিক ও সহজবোধ্য যে, এই ধরনের পট্টে রাষ্ট্র-বিন্যাস সংক্রান্ত সকল সংবাদ পাওয়া সম্ভব নয় ; ভূমি দান-বিক্রয়ের জন্য রাষ্ট্রযন্ত্রের যে-অংশের পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন হইয়াছে সেইটুকুই শুধু আমরা পাইতেছি, এবং পরোক্ষ ভাবে আরও কিছু কিছু সংবাদের ইঙ্গিত পাইতেছি। এই সব সংবাদ ও সংবাদের ইঙ্গিত কিছু কিছু প্রাচীনতর অর্থশাস্ত্র-দণ্ডশাস্ত্রের ব্যাখ্যার সাহায্যে স্ফুটতর হয়, সন্দেহ নাই ; কিন্তু এমন সংবাদও আছে যাহা এই সব শাস্ত্রে নাই, যাহা বিশেষ স্থান ও বিশেষ কালেরই সংবাদ। একাদশ-দ্বাদশ শতকের সমসাময়িক সাহিত্যগ্রন্থ হইতেও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দুই একটা টুকরা-টাকরা খবর জানা যায়।

পূর্বাপর-সংলগ্ন তথ্য-সম্বলিত উপাদান পঞ্চম শতকের আগে পাওয়া যায় না। কিন্তু তাহার বহু আগে হইতেই উত্তর-ভারতে, বিশেষভাবে মগধ রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়া, সুবিস্তৃত রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও মতবাদ, জটিল অথচ সুসংবদ্ধ, বিভাগ-উপবিভাগবহুল, কর্মচারীবহুল, রাষ্ট্রযন্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছিল ; মৌর্যাধিকার কালে ভারতবর্ষে তাহার সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট একটা রূপ আমরা দেখিয়াছি। মৌর্য রাষ্ট্রযন্ত্রই শক-কুষাণ আমলের রাষ্ট্রীয় মতবাদ ও আদর্শ এবং রাষ্ট্র-বিন্যাসের প্রভাবে গুপ্ত-রাষ্ট্রযন্ত্রে ও রাষ্ট্রীয়-বিন্যাসে বিবর্তিত হয়। মহাস্থান

শিলাখণ্ড লিপির সাক্ষ্যে অনুমিত হয়, বাঙলাদেশের অন্তত কিয়দংশ মৌর্যরাষ্ট্রের করকবলিত হইয়াছিল ; তখন মৌর্য রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রাদেশিক রূপও এদেশে প্রবর্তিত হইয়াছিল, এরূপ মনে করিবার কারণ আছে। মৌর্য রাষ্ট্র-বিন্যাস উত্তর-ভারতীয় আর্য সমাজ-বিন্যাসেরই আংশিক রূপ ; কাজেই এই অনুমান করা চলে যে, আর্য সংস্কার, সংস্কৃতি ও সমাজ-বিন্যাস বাঙলাদেশে বিস্তৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে আর্য রাষ্ট্র-বিন্যাসের আদর্শ এবং অভ্যাসও ক্রমশ ধীরে ধীরে প্রবর্তিত হইতেছিল। কিন্তু গুপ্তাধিকারের আগে আর্য সমাজ-বিন্যাস যেমন বাঙলায় যথেষ্ট কার্যকরী হইতে পারে নাই, মনে হয়, উত্তর-ভারতীয় রাষ্ট্রাদর্শ এবং বিন্যাসও তেমনই পূর্ণাঙ্গ প্রবর্তন লাভ করে নাই। গুপ্তাধিকারের সঙ্গে সঙ্গে তাহা ঘটিল ; ধর্মে, সংস্কারে, সংস্কৃতিতে, সমাজ-বিন্যাসে যেমন, রাষ্ট্র-বিন্যাসের ক্ষেত্রেও তেমনই বাঙলাদেশ এই সর্বপ্রথম উত্তর-ভারতীয় জীবন-নাট্যমঞ্চে প্রবেশ করিল। কাজেই, ঐতিহাসিক কালে বাঙলার রাষ্ট্র-বিন্যাসের যে-চেহারা আমরা দেখি তাহা গুপ্ত-আমলের উত্তর-ভারতীয় রাষ্ট্র-বিন্যাসেরই প্রাদেশিক ও স্থানীয় বিবর্তনের রূপ।

২

কৌম শাসনযন্ত্র

কিন্তু আরম্ভর আগেও আরম্ভ আছে। পঞ্চম শতকেরও আগে, এমন কি মৌর্য কালেরও আগে প্রাচীন বাঙলার জানপদেরা সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিত, তাহাদের সমাজ ছিল, রাজা ছিল, রাষ্ট্রও ছিল। তাহারও আগে যখন রাজা ছিল না, কৌমসমাজ ছিল, ইতিহাসের সেই উষাকালে সেই সমাজেরও একটা শাসনপদ্ধতি ছিল আজও তাহা নিশ্চিহ্ন হইয়া লোপ পাইয়া যায় নাই। বাঙলার বিভিন্ন জেলায় সমাজের নিম্নতম স্তরে, অথবা পার্বত্য আরণ্য কোমদের মধ্যে, যেমন, সাঁওতাল, গারো, রাজবংশী ইত্যাদির মধ্যে, তাঁহাদের পঞ্চায়েতী প্রথায়, তাঁহাদের দলপতি নির্বাচনে, সামাজিক দণ্ডবিধানে, নানা আচারানুষ্ঠানে, ভূমি ও শীকার স্থানের বিলি বন্দোবস্তে, উত্তরাধিকার-শাসনে এখনও সেই কৌম শাসনযন্ত্র ও পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙলার বাহিরে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশেও এই ধরনের বিচিত্র কৌম শাসন-যন্ত্র ও পদ্ধতি আজও দেখিতে পাওয়া যায়, যদিও উন্নত অর্থনৈতিক সমাজ-পদ্ধতির ক্রমবর্ধমান চাপে আজ তাহা দ্রুত বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। কিন্তু, স্মরণ রাখা প্রয়োজন, সুপ্রাচীন কাল হইতেই আর্য সমাজযন্ত্র ও পদ্ধতি ইঁহাদের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হইয়াছে এবং কালে কালে ইঁহাদের অনেক রীতি-নিয়ম, বিন্যাস-ব্যবস্থা আত্মসাৎ করিয়া সমৃদ্ধ হইয়াছে। বাঙলাদেশেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। প্রাচীন বাঙলার রাষ্ট্র-বিন্যাসের কথা বলিতে গেলে এই সব অস্পষ্ট স্বল্পজ্ঞাত

কৌম শাসনযন্ত্র ও রাষ্ট্র-বিন্যাসের কথা একবার স্মরণ করিতেই হয়। কারণ, ঐতিহাসিক কালের বহুকীর্তিত এবং বহুজ্ঞাত রাষ্ট্রযন্ত্র, রাষ্ট্র-বিন্যাস, তথা সমাজ-বিন্যাসের বাহিরে অগণিত লোক কৌম সমাজ ও শাসন ব্যবস্থার মধ্যে বাস করিত; আজও করে না এমন নয়। ইঁহাদের কথা ভুলিয়া গেলে ঐতিহাসিকের দায়িত্ব পালন করা হয় না।

বাঙলা দেশের শারীর-নৃতত্ত্বের আলোচনা কিছু কিছু হইয়াছে ও হইতেছে; কিন্তু সুপ্রাচীন কৌম সমাজ-বিন্যাসের গবেষণা বিশেষ কিছু হয় নাই বলিলেই চলে। গারো, কোচ, বাহে, রাজবংশী, সাঁওতালদের সমাজশাসন সম্বন্ধে মোটামুটি তথ্য হয়তো আমাদের জানা আছে, কিন্তু হিন্দু সমাজের নিম্নতম স্তরে নানা শাসনগত সংস্কার এখনও সক্রিয়; সে গুলির ঐতিহ্য-আলোচনা যথেষ্ট হয় নাই। এই সব কারণে বাঙলার সুপ্রাচীন কৌম সমাজ ও শাসন-বিন্যাস সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা কঠিন। মোটামুটি ভাবে এই-টুকুই শুধু বলা চলে, আমাদের গ্রাম্য পঞ্চায়েতী শাসনযন্ত্র এই প্রাচীন কৌম সমাজের দান; পঞ্চায়েত কর্তৃক নির্বাচিত দলপতিই স্থানীয় কৌম শাসনযন্ত্রের নায়কত্ব করিতেন। মাতৃপ্রধান বা পিতৃপ্রধান কৌম ব্যবস্থানুযায়ী উত্তরাধিকার শাসন নিয়ন্ত্রিত হইত, এবং সামাজিক দণ্ডের ও নির্দেশের কর্তা ছিলেন পঞ্চায়েতমণ্ডলী। কৌম সমাজ ও রাষ্ট্র-বিন্যাসের বিবর্তন সম্বন্ধে অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি, এখানে আর তাহা পুনরুক্তি করিয়া লাভ নাই। শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট যে, আলেকজান্দারের ভারত-আক্রমণ ও অব্যবহিত পরবর্তী মৌর্যাধিকার কালের আগেই বাঙলাদেশে কৌমতন্ত্র নিঃসন্দেহে রাজতন্ত্রে বিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল, এবং অনুমান হয়, কিছু পরেই মৌর্য রাষ্ট্র-বিন্যাসের প্রাদেশিক রূপও এদেশে প্রবর্তিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল।

বাঙলার এই রাজতন্ত্রের আদি পরিচয় মহাভারতের দুই একটি কাহিনীতে এবং সিংহলী দীপবংশ-মহাবংশ পুরাণের বিজয়সিংহের গল্পে প্রথম পাওয়া যাইতেছে। মহা-ভারতে পৌণ্ড্রক-বাসুদেব নামে পুণ্ড্রদের এক রাজার কথা; ভীম কর্তৃক এক পৌণ্ড্রাধিপের পরাজয়ের কথা; বঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, কর্বট, সুহ্ম প্রভৃতি কৌম রাজাদের কথা; দুর্যোধনসহায় এক বঙ্গরাজের কথা; রামায়ণে প্রাচীন বাঙলার কয়েকটি রাজবংশের কথা প্রভৃতি সমস্তই বাঙলার আদি রাজতন্ত্রের পরিচয় বহন করে। দীপবংশ-মহাবংশের বঙ্গ ও রাঢ়াধিপ সীহবাহুর কথা প্রভৃতি হইতে মনে হয় খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতক হইতেই বোধ হয় বাঙলার বিভিন্ন কৌমতন্ত্র রাজতন্ত্রে বিবর্তিত হইতেছিল; কিন্তু এই বিবর্তন যখনই হউক, তাহার পরও বহুদিন পর্যন্ত ঐতিহ্যে ও লোকস্মৃতিতে কৌমতন্ত্রের স্মৃতিই যে শুধু জাগরূক ছিল তাহা নয়, ইতস্তত তাহার কিছু কিছু অভ্যাস এবং ব্যবস্থাও প্রচলিত ছিল। সমগ্র দেশ বোধ হয় এক সঙ্গে রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই।

৩

রাজতন্ত্রের নিঃসংশয় প্রমাণ ও পরিচয় পাওয়া যায় খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে গ্রীক ইতিহাস-কথিত গঙ্গারাষ্ট্রের বিবরণের মধ্যে। গঙ্গাহৃদি-গঙ্গারাষ্ট্রের সামরিক শক্তির এবং সেনা-বিন্যাসের যে সংবাদ গ্রীক ঐতিহাসিকদের বিবরণীতে পাওয়া যায়, তাহা হইতে স্বভাবতই অনুমান করা চলে যে, দৃঢ়সম্বদ্ধ সুবিন্যস্ত রাষ্ট্রশৃঙ্খলা ছাড়া সামরিক শক্তির এইরূপ বিন্যাস কিছুতেই সম্ভব হইত না। কিন্তু গঙ্গারাষ্ট্রের বাহিরে সমসাময়িক বাঙলার আর যে-সব রাজা ও রাষ্ট্র বিদ্যমান ছিল তাহাদের সঙ্গে গঙ্গারাষ্ট্রের কি সম্বন্ধ ছিল তাহা জানিবার কোনো উপায় নাই। তবে, মহাভারত ও সিংহলী পুরাণের কাহিনী হইতে মনে হয়, এই রাজ্যগুলিতেও রাষ্ট্রীয় সচেতনতার অভাব ছিল না। প্রয়োজন হইলে এই সব রাষ্ট্র সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইত, পররাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধের আদান প্রদান করিতে এবং সময় সময় প্রয়োজন মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা ও রাষ্ট্র বৃহত্তর রাজ্য ও রাষ্ট্রের সঙ্গে একত্র গ্রথিতও হইত। পৌণ্ড্রক-বাসুদেব কাহিনীই তাহার প্রমাণ।

প্রাথমিক রাজতন্ত্র

অব্যবহিত পরবর্তী কালে (আনুমানিক খ্রীষ্টীয় তৃতীয়-দ্বিতীয় শতকে) বাঙলার অন্তত একাংশের রাষ্ট্র-বিন্যাসের একটু আভাস পাওয়া যায় মহাস্থানের শিলাখণ্ড লিপিটিতে। মৌর্য-আমলে উত্তর-বঙ্গ মৌর্য-রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল; উত্তর-বঙ্গে মৌর্য-শাসনের কেন্দ্র ছিল পুডনগল বা পুণ্ড্রনগর, বর্তমান বগুড়া জেলার পাঁচ মাইল দূরে, মহাস্থানে। লিপিটিতে মহামাত্রের উল্লেখ দেখিয়া মনে হয়, জনৈক রাজপ্রতিনিধির নেতৃত্বে বাঙলায় তখন মৌর্য-শাসনযন্ত্র পরিচালিত হইত এবং জটিল ও সুসম্বদ্ধ মৌর্য-রাষ্ট্রের প্রাদেশিক শাসনযন্ত্রের সুবিদিত রূপ তদানীন্তন বাঙলা দেশেও প্রবর্তিত হইয়াছিল। দেবপ্রিয়, প্রিয়দর্শী রাজা অশোকের সুশাসন ও জন-কল্যাণাগ্রহের কথা সুবিদিত। দুর্ভিক্ষে বা এই জাতীয় কোনো প্রাকৃতিক অত্যায়িক কালে প্রজাদের বিপন্মুক্তির জন্য রাষ্ট্রের কোষ্ঠাগারাধ্যক্ষ রাজকীয় শস্যভাণ্ডারের অর্ধেক শস্য পৃথক করিয়া রাখিবেন, রাজা শস্যবীজ ও খাদ্য দিয়া প্রজাদের অনুগ্রহ করিবেন; বিনিময়ে রাষ্ট্র প্রজাদের দিয়া দুর্গনির্মাণ বা সেতুনির্মাণ ইত্যাদি কাজ করাইয়া লইবেন, অথবা শ্রম-বিনিময় না লইয়া এমনই দান করিবেন, কৌটিল্য তাঁহার অর্থশাস্ত্রে এইরূপ বিধান দিয়াছেন। ঠিক এই জাতীয় না হইলেও মহাস্থান লিপিটিতে অনুরূপ রাষ্ট্র-নির্দেশেরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, এবং তাহা হইতে রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনার কিছুটা ইঙ্গিত ধরা যায়। পুণ্ড্রনগরে একবার কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে নিদারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। এই উপলক্ষে প্রধান রাষ্ট্রকেন্দ্র হইতে পুণ্ড্রনগরে অধিষ্ঠিত মহামাত্রকে দুইটি

আদেশ দেওয়া হইয়াছিল, এই আকস্মিক বিপদ হইতে আশু মুক্তির জন্য। প্রথম আদেশটির স্বরূপ বলা কঠিন; লিপির প্রথম লাইনটি ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে এই অংশে কি ছিল জানা যায় না। দ্বিতীয়টিতে বিপদপীড়িত প্রজাদের (একমতে সংবঙ্গীয়দের; অন্যমতে ছবগ্গীয় ভিক্ষুদের; ইঁহারা যাঁহারাই হউন, ইঁহাদের নেতার নাম ছিল গলদন) ধান্য এবং সম্ভবত সঙ্গে সঙ্গে গণ্ডক ও কাকনিক মুদ্রায় অর্থ সাহায্য করিবার আদেশও দেওয়া হইয়াছে। এই সাহায্য ঠিক দান নয়, ধার মাত্র; কারণ রাষ্ট্র বা রাজা আশা ও ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন, এই সাময়িক সাহায্যের ফলে প্রজারা বিপদ কাটাইয়া উঠিতে পারিবে, এবং তাহার পর সুদিন ফিরিয়া আসিলে, দেশ শস্যসমৃদ্ধ হইলে প্রজারা আবার রাজকোষে অর্থ এবং রাজকোষ্ঠাগারে ধান্য প্রত্যর্পণ করিবে। এই ব্যবস্থা একটি সুনিয়ন্ত্রিত সুসংবদ্ধ শাসন-ব্যবস্থার দিকে ইঙ্গিত করে এ-সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

ইহার পর বহুদিন পর্যন্ত বাঙলার রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্র-বিন্যাসের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে, খ্রীষ্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতকে গৌড়-বঙ্গের রাজান্তঃপুর ও নাগর সমাজের যে-পরিচয় বাৎস্যায়নের কামসূত্রে পাওয়া যায়, তাহারও আগে খ্রীষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে পেরিপ্লাস্-গ্রন্থ ও টলেমির বিবরণে, মিলিন্দপঞ্‌হ-গ্রন্থে যে সুসমৃদ্ধ সুবিস্তৃত ব্যবসা-বাণিজ্যের খবর জানা যায়, নাগার্জুনকোণ্ডার শিলালিপিতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারসূত্রে সিংহল ও পূর্ব-দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে বঙ্গের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের আভাস পাওয়া যায়, তাহা হইতে স্পষ্টতই মনে হয়, রাষ্ট্র ও সমাজগত শাসন-শৃঙ্খলা বর্তমান না থাকিলে এই ধরনের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ, বিশেষ ভাবে সুসমৃদ্ধ সুদূর প্রসারী অন্তঃ ও বহির্বাণিজ্য কিছুতেই সম্ভব হইত না। সুবর্ণমুদ্রার প্রচলনও এই অনুমানের অন্যতম ইঙ্গিত। চতুর্থ শতকে রাঢ় দেশে অর্থাৎ পশ্চিম-বঙ্গে একটি রাজা ও রাষ্ট্রের খবর পাওয়া যাইতেছে; এই রাষ্ট্র পুষ্করণাধিপ মহারাজ সিংহবর্মণ ও তাঁহার পুত্র চন্দ্রবর্মণের; কিন্তু ইঁহাদের রাষ্ট্রযন্ত্রের বিন্যাস ও পরিচালনা সম্বন্ধে কোনো তথ্যই জানা যাইতেছে না; ইঁহারা স্বতন্ত্র রাজা ছিলেন কিনা তাহাও জোর করিয়া বলা যাইতেছে না। তবে রাজতন্ত্র যে তাহার সমস্ত মর্যাদা ও সমারোহ লইয়া এই যুগে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, এ-সম্বন্ধে সন্দেহের আর অবকাশ নাই।

৪

গুপ্ত আমলে প্রাচীন বাঙলার অধিকাংশ গুপ্ত-সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং গুপ্ত-রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রাদেশিক রূপ এ-দেশে পুরাপুরি প্রবর্তিত হইয়াছিল। স্থানীয় পরিবেশ ও

প্রয়োজন অনুযায়ী এই প্রাদেশিক রূপের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য এ-দেশে দেখা দিয়াছিল, এ-সম্বন্ধেও সন্দেহ করা চলে না।

গুপ্তপর্ব। আনুমানিক ৩০০—৫০০০ খ্রীষ্টীয় শতক রাজা

মহারাজাধিরাজ পরমভট্টারক পরমদৈবত গুপ্ত সম্রাটদের রাজকীয় মর্যাদা ও রাজতন্ত্রের প্রধান পুরুষ হিসাবে তাঁহাদের ঔপধিক আড়ম্বর ও সমারোহ সহজেই অনুমেয়। তাঁহারা যে নররূপী দেবতা এবং দেবতা-নির্দিষ্ট অধিকারেই রাজা তাহাও "পরমদৈবত" পদটির ইঙ্গিতেই অনুমেয়। এ-তথ্যও সুবিদিত যে, গুপ্ত সম্রাটেরা বিজিত রাজ্যসমূহ সমস্তই তাঁহাদের সাক্ষাৎ রাষ্ট্রযন্ত্রভুক্ত করিতেন না, সমগ্র সাম্রাজ্য তাঁহারা বা তাঁহাদের রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিরা নিজেরা শাসন করিতেন না। অনেক অংশ থাকিত সামন্ত নরপতিদের শাসনাধীনে, এবং এই সব সামন্ত নরপতিরা নিজ নিজ রাজ্যে প্রায় স্বাধীন স্বতন্ত্র রাজা রূপেই রাজত্ব করিতেন; তাঁহাদের নিজেদের পৃথক রাষ্ট্রযন্ত্রও ছিল, এবং সেই রাষ্ট্রযন্ত্রের রূপও ছিল কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রযন্ত্রেরই ক্ষুদ্রতর সংস্করণ মাত্র। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের সঙ্গে এই সব সামন্ত রাজা ও রাষ্ট্রের সম্বন্ধ সাধারণত মহারাজাধিরাজের সর্বাধিপত্য স্বীকৃতিতেই আবদ্ধ ছিল। তবে যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় তাঁহারা সৈন্যবল সংগ্রহ করিতেন, নিজেরা মহারাজাধিরাজের যুদ্ধে যোগদান করিতেন, এই অনুমান সহজেই করা যাইতে পারে; পরবর্তী কালে তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণও আছে। বাঙলা দেশে এই সামন্ত নরপতিদের দায় ও অধিকার কিরূপ ছিল তাহার কিছু কিছু পরিচয় এই পর্বের লিপিমালা হইতে জানা যায়।

সামন্ত-মহাসামন্ত

গুপ্ত-আমলে বাঙলা দেশে আমরা অন্তত দুইজন সামন্ত নরপতির সংবাদ পাইতেছি, এবং এই দুইজনই মহারাজ বৈন্যগুপ্তের (৫০৭-৮) সামন্ত; ইঁহাদের একজন বৈন্যগুপ্তের পাদদাস মহারাজ রুদ্রদত্ত, এবং আর একজন ছিলেন বৈন্যগুপ্তের গুণাইঘর পট্ট-কথিত মহারাজ মহাসামন্ত বিজয়সেন। মল্লসারুল-লিপিতে বিজয়সেন শুধু 'মহারাজ' বলিয়াই আখ্যাত হইয়াছেন। স্পষ্টতই দেখা যাইতেছে, এই সব সামন্ত-মহাসামন্তরা কখনো কখনো মহারাজ বলিয়াই আখ্যাত ও ভূষিত হইতেন। গুণাইঘর পট্টে মহারাজ মহাসামন্ত বিজয়সেনকে বলা হইয়াছে দূতক, মহাপ্রতীহার, মহাপিলুপতি, পঞ্চাধিকরণোপরিক, পুরপালোপরিক এবং পাট্যুপরিক। কোনো বিশেষ রাষ্ট্রীয় অথবা রাজকীয় কর্মের জন্য যে রাষ্ট্রপ্রতিনিধি নিযুক্ত হইতেন তাঁহাকে বলা হইত দূতক। প্রতীহারের সহজ অর্থ দ্বাররক্ষক; মহাপ্রতীহার শান্তিরক্ষা বা যুদ্ধবিগ্রহ ব্যাপারে নিযুক্ত শান্তিরক্ষক বা উচ্চ সামরিক কর্মচারী, অথবা তিনি রাজপ্রাসাদের রক্ষকও হইতে পারেন। মহাপিলুপতি রাজকীয় হস্তীসৈন্যের অধ্যক্ষ বা রাজকীয় হস্তীবাহিনীর প্রধান শিক্ষাদান-

কর্তা। পাঁচটি অধিকরণ (শাসন কর্মকেন্দ্র ; এক্ষেত্রে বোধ হয় বিষয়াধিকরণের কথাই বলা হইয়াছে) মিলিয়া পঞ্চাধিকরণ ; এই পঞ্চাধিকরণের যিনি প্রধান কর্মকর্তা তিনিই পঞ্চাধিকরণোপরিক। পুর বা নগরের অধ্যক্ষদের বলা হইত পুরপাল ; এই পুরপালদের যিনি ছিলেন কর্তা তিনি পুরপালোপরিক। পাট্যুপরিক বলিতে কি বুঝাইতেছে, বলা কঠিন। যাহা হউক, মহাসামন্ত মহারাজ বিজয়সেন যে সমসাময়িক রাষ্ট্রের এক প্রধান ও করিৎকর্মা ব্যক্তি ছিলেন, সন্দেহ নাই ; নহিলে এতগুলি বৃহৎ কর্মের কর্তৃত্ব ভার, এতগুলি উপাধি তাঁহার আয়ত্তে আসিবার কথা নয়। অথচ তাঁহার প্রভু বৈন্যগুপ্ত শুধু 'মহারাজ' আখ্যাতেই রাজকীয় দলিলে আখ্যাত হইয়াছেন। পট্ট-সাক্ষ্যে মনে হয়, সামন্ত নরপতিরা তাঁহাদের শাসিত জনপদে নিজেরা ভূমিদান করিতে পারিতেন না ; মহারাজের কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রে ভূমিদানের অনুরোধ তাঁহারা জানাইতেন, এবং সেই অনুযায়ী মহারাজের নামে সেই ভূমি দত্ত বা বিক্রীত এবং পট্টীকৃত হইত। কিন্তু মল্লসারুল-লিপিতে দেখিতেছি, বিজয়সেন নিজেই ভূমিদান করিতেছেন। হয়তো তখন তিনি স্বাধীন নরপতি, অথবা, গোপচন্দ্রের সামন্ত হইলেও তাঁহার সর্বময় আধিপত্য বিজয়সেন সর্বথা স্বীকার করিতেন না।

সামন্ত নরপতি-শাসিত জনপদ ছাড়া বাকী দেশখণ্ড ছিল খাস রাষ্ট্রের অধিকারে। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের বৃহত্তম রাজ্য-বিভাগের নাম ছিল ভুক্তি ; প্রত্যেক ভুক্তি বিভক্ত হইত কয়েকটি বিষয়ে, প্রত্যেক বিষয় কয়েকটি মণ্ডলে, প্রত্যেক মণ্ডল কয়েকটি বীথীতে, এবং প্রত্যেক বীথী কয়েকটি গ্রামে, এবং গ্রামই ছিল সর্বনিম্ন দেশবিভাগ। প্রত্যেক বিভাগ-উপবিভাগ ছিল সুনির্দিষ্ট সীমায় সীমিত, এবং অধস্তন গ্রাম হইতে আরম্ভ করিয়া ঊর্ধ্বতম ভুক্তি পর্যন্ত একটি সূত্রে গ্রথিত।

গুপ্ত আমলে বাঙলাদেশে অন্তত দুইটি ভুক্তি-বিভাগের খবর পাওয়া যায় ; বৃহত্তর ভুক্তি-বিভাগ পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি, বর্ধমানভুক্তি ক্ষুদ্রতর। প্রথমটির খবর প্রত্যক্ষভাবে পাইতেছি দামোদরপুর পট্টোলী পাঁচটি হইতে, পরোক্ষভাবে পাহাড়পুর-পট্টোলী হইতে। বর্ধমান-ভুক্তির খবর পাইতেছি মহারাজ গোপচন্দ্রের মল্লসারুল-লিপি হইতে। অনুমান হয়, শেষোক্ত ভুক্তি-বিভাগটি গোপচন্দ্রের আগে বৈন্যগুপ্তের সময়েও বিদ্যমান ছিল। পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি অন্তত তিনটি বিষয়ে বিভক্ত ছিল। কোটীবর্ষ নামে একটি বিষয়ের খবর পাইতেছি ১, ২, ৪ ও ৫নং দামোদরপুর-পট্টোলীতে ; ধনাইদহ-পট্টোলীতে খাটাপারা বা খাদাপারা (নন্দপুর লিপির খটাপুরাণ দ্রষ্টব্য) নামে একটি বিষয়ের উল্লেখ দেখা যাইতেছে ; এবং বৈগ্রাম-পট্টোলীতে পঞ্চনগরী নামে তৃতীয় আর একটি বিষয়ের। শেষোক্ত দুইটি বিষয় পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির অন্তর্গত, একথা লিপিতে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ নাই সত্য, কিন্তু লিপি-প্রসঙ্গ এবং স্থানের ইঙ্গিতে এ-তথ্য সুস্পষ্ট। মণ্ডল-বিভাগের একটিমাত্র উল্লেখ এই আমলের লিপিতে পাইতেছি, যদিও বাঙলার বাহিরে গুপ্ত সাম্রাজ্যের

অন্যত্র এই বিভাগের বিদ্যমানতার সাক্ষ্য সুপ্রচুর। পাহাড়পুর-পট্টোলীতে দক্ষিণাংশক-বীথী ও নাগিরট্ট-মণ্ডলের উল্লেখ পর পর দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু মণ্ডল কোন্ বিষয়ের অন্তর্গত, কোনো বিষয়েরই অন্তর্গত কিনা, না সরাসরি পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির অন্তর্গত, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় নাই; লিপিতে কোনো ইঙ্গিতই পাওয়া যাইতেছে না। অথবা, দক্ষিণাংশক বীথী এই মণ্ডলেরই একটি বিভাগ কিনা তাহা ও নিঃসংশয়ে বলা যাইতেছে না। শুধু এইটুকু বলা যায় যে, মণ্ডল নামে একটি রাষ্ট্র-বিভাগ ছিল, এবং বাঙলার বাহিরে গুপ্ত সাম্রাজ্যে অন্যত্র যে রীতি প্রচলিত ছিল তাহা হইতে এই অনুমান করা যায় যে, মণ্ডল ছিল বিষয়ের ক্ষুদ্রতর বিভাগ। দক্ষিণাংশক বীথী ছাড়া আরও দুই একটি বীথী-বিভাগের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। মুঙ্গের জেলার রঙ্গপুর গ্রামে প্রাপ্ত নন্দপুরপট্টোলীতে (৪৮৯ খ্রীঃ) নন্দ-বীথি নামে এক বীথীর উল্লেখ আছে; এই বীথী অম্বিল গ্রামাগ্রহারের অন্তর্ভুক্ত, এবং লিপি-সাক্ষ্যের ইঙ্গিতে মনে হয়, এই অগ্রহারেই ছিল বিষয়পতি ছত্রমহের অধিকরণ বা বিষয়কর্মকেন্দ্র। এই অনুমান বোধ হয় সঙ্গত যে, অম্বিল গ্রামাগ্রহার যে-বিষয়ের রাষ্ট্রকেন্দ্র, সেই বিষয়েরই অন্তর্গত ছিল নন্দ-বীথী। বক্কট্টক নামে আর একটি বীথী-বিভাগের উল্লেখ পাইতেছি গোপচন্দ্রের মল্লসারুল-লিপিতে এবং এই বীথী বর্ধমান-ভুক্তির অন্তর্গত। সর্বনিম্ন রাষ্ট্রবিভাগ গ্রাম। কোনো কোনো ধর্মদেয় বা ব্রহ্মদেয় গ্রাম অগ্রহার নামে অভিহিত হইত, যেমন নন্দপুর লিপির অম্বিল গ্রামাগ্রহার, গুণাইঘর লিপির গুণেকাগ্রহারগ্রাম। অনুমান হয় ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে বা রাষ্ট্রকর্মকেন্দ্র হিসাবে কোনো কোনো অগ্রহার গ্রাম বাড়িয়া উঠিয়া বড় হইত এবং অন্যান্য গ্রামাপেক্ষা অধিকতর প্রাধান্য লাভ করিত। ছোট ছোট একাধিক গ্রাম বা পাড়া (পরবর্তী লিপি সমূহের পাটক, পদ্রক ইত্যাদি) লইয়া একটি বৃহৎ গ্রামও গড়িয়া উঠিত, যেমন বৈগ্রাম পট্টোলীর বায়িগ্রাম। বায়িগ্রামের অন্তত দুইটি অংশের নাম লিপিতে পাইতেছি, একটি ত্রিবৃতা, আর একটি শ্রীগোহালি (পাহাড়পুর-পট্টোলীর বট-গোহালী=বর্তমান গোয়ালভিটা, এবং নিত্বগোহালী দ্রষ্টব্য)।

ভুক্তিপতি ও তাঁহার শাসনযন্ত্র

মহারাজাধিরাজ স্বয়ং ভুক্তির শাসনকর্তা নিযুক্ত করিতেন; ভুক্তিপতিরা সকলেই মহারাজাধিরাজ সম্পর্কে "তৎপাদপরিগৃহীত"। কখনো কখনো রাজকুমার বা রাজপরিবারের লোকেরাও ভুক্তিপতি নিযুক্ত হইতেন; ৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দে পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির উপরিক মহারাজ ছিলেন জনৈক রাজপুত্র দেবভট্টারক। প্রথম কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে ভুক্তিপতিদের বলা হইত উপরিক, কিন্তু বুধগুপ্তের রাজত্বকালে দেখিতেছি তাহাদের বলা হইতেছে, উপরিক মহারাজ বা মহারাজ। মল্লসারুল-লিপিতেও দেখিতেছি, বর্ধমান-ভুক্তির শাসনকর্তাকে বলা হইতেছে উপরিক। ভুক্তির শাসনযন্ত্রের স্বরূপ কি ছিল, বলা কঠিন; লিপিগুলিতে

তাহার কোনো ইংগিত পাওয়া যাইতেছে না। বসারে প্রাপ্ত একটি শীলমোহরে দেখা যাইতেছে, উপরিকের অধিষ্ঠানে বা শাসনকেন্দ্রে একটি অধিকরণ বা কর্মকেন্দ্র থাকিত; কিন্তু এই কর্মকেন্দ্র কাহাদের লইয়া গঠিত হইত তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে না। বুধগুপ্তের পাহাড়পুর-লিপি পাঠে মনে হয়, উপরিক-মহারাজের সঙ্গে পুণ্ড্রবর্ধনের স্থানীয় অধিকরণের সাক্ষাৎভাবে কোনো সম্বন্ধ ছিল না, অন্তত ভূমি দান-বিক্রয়ের ব্যাপারে। এই ক্ষেত্রে ভূমি-বিক্রয়ের প্রস্তাবটি আসিয়াছিল প্রথমে আয়ুক্তক নামে বর্ণিত কর্মচারী এবং স্থানীয় অধিকরণের সম্মুখে; তাঁহারা প্রস্তাবটি পরীক্ষার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছিলেন পুস্তপালদের নিকট। আয়ুক্তক নাম হইতে মনে হয়, এই স্থানীয় অধিকরণ বিষয়াধিকরণ, অর্থাৎ পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির অন্তর্গত পুণ্ড্রবর্ধন-বিষয়ের অধিকরণ, এবং আয়ুক্তক হইতেছেন বিষয়পতি। যেমন ভুক্তিপতির, তেমনই বিষয়পতিরও অধিকরণের অধিষ্ঠান ছিল পুণ্ড্র-বর্ধনে। সেইজন্যই এই ভূমি-বিক্রয়ের ব্যাপারে স্থানীয় অধিকরণের সঙ্গে উপরিক-মহারাজের কোনো প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ দেখা যাইতেছে না। মল্লসারুল-লিপিতে বর্ধমান-ভুক্তির উপরিকের অধিকরণ-সংপৃক্ত কয়েকজন রাজকর্মচারীর খবর পাইতেছি; ইঁহাদের পদোপাধি ভোগ-পতিক, পত্তলিক, চৌরোদ্ধরণিক, আবসথিক, হিরণ্যসমুদায়িক, ঔদ্রঙ্গিক, ঔর্ণস্থানিক, কার্তাকৃতিক, দেবদ্রোণী সম্বন্ধ, কুমারামাত্য, আগ্রহারিক, তদায়ুক্তক, বাহনায়ক এবং বিষয়পতি। উপরিক হইতেছেন ভুক্তির সর্বোচ্চ রাজকর্মচারী; বিষয়পতি বিষয় বিভাগের সর্বোচ্চ রাজকর্মচারী; তদায়ুক্তক বোধ হয় উপরিক-নিযুক্ত কর্মচারী এবং আয়ুক্তক বা বিষয়পতির সমার্থক। কার্তাকৃতিক শিল্পকর্মের অধ্যক্ষ, অথবা রাজকীয় পূর্তবিভাগের কর্মকর্তা হইলেও হইতে পারেন; নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। ভোগপতিক এবং পত্তলিকের কর্ম সম্বন্ধে কিছু ধারণা আপাতত করা যাইতেছে না। ভোগ এক-প্রকারের সুপরিচিত কর; ভোগপতিকরা বোধহয় সেই করের সংগ্রহকর্তা। চৌরোদ্ধরণিক উচ্চপদস্থ শান্তিরক্ষক কর্মচারী। আবসথিক হইতেছেন রাজপ্রাসাদ, রাজকীয় ঘরবাড়ী, বিশ্রামস্থান ইত্যাদির অধ্যক্ষ। হিরণ্যসমুদায়িক মুদ্রায় দেয় কর সংগ্রহকর্মের অধ্যক্ষ। ঔদ্রঙ্গিক স্থায়ী প্রজাদের নিকট হইতে উদ্রঙ্গ নামক করের সংগ্রহ-কর্তা। ঔর্ণস্থানিক বোধ হয় রেশম জাতীয় বস্ত্রশিল্পকর্মের নিয়ামক-কর্তা। দেবদ্রোণীসম্বন্ধ হইতেছেন মন্দির, তীর্থ-ঘাট ইত্যাদির রক্ষক ও পর্যবেক্ষক। কুমারামাত্য এক শ্রেণীর রাজকর্মচারী; ইঁহারা বোধ হয় বংশানুক্রমে প্রত্যক্ষভাবে রাজা বা রাজকুমার কর্তৃক নিযুক্ত এবং তাঁহাদের অধীনস্থ কর্মচারী। অগ্রহার হইতেছে ধর্মদেব, ব্রহ্মদেয় ভূমি; এই ভূমির রক্ষক-পর্যবেক্ষকের নাম বোধ হয় ছিল আগ্রহারিক। বাহনায়ক যানবাহন যাতায়াত প্রভৃতির নিয়ামক-কর্তা।

বিষয়পতি সাধারণত নিযুক্ত হইতেন উপরিক কর্তৃক; কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে বোধ হয় মহারাজাধিরাজ স্বয়ংই ছিলেন নিয়োগকর্তা, যেমন, বৈগ্রাম-পট্টোলী-কথিত

পণ্ডনগরী বিষয়ের বিষয়পতি ছিলেন "ভট্টারকপাদানুধ্যাত"। বিষয়ের শাসনকর্তাকে কোনো কোনো লিপিতে বলা হইয়াছে আয়ুক্তক, যেমন পাহাড়পুর-লিপিতে; কোনো লিপিতে কুমারামাত্য, যেমন বৈগ্রাম-পট্টোলীতে। কিন্তু পরবর্তী গুপ্ত-রাজাদের আমলে সর্বত্রই তাঁহার পদোপাধি বিষয়পতি।

বিষয়পতি ও বিষয়াধিকরণ

বিষয়পতি বিষয়াধিকরণের সর্বোচ্চ কর্মচারী, এবং বিষয়পতির অধিষ্ঠানস্থানেই বিষয়াধিকরণের শাসনকেন্দ্র। শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক নাটকের নবম অঙ্কে এক অধিকরণের বর্ণনা আছে। অধিকরণের কর্মনির্বাহের জন্য একটি মণ্ডপ বা সভাগৃহ ছিল। সেই মণ্ডপে অধিকরণ বসিত। মৃচ্ছকটিকের বিচারাধিকরণের বর্ণনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, অধিকরণিক, অধিকরণ-ভোজক, শ্রেষ্ঠী এবং কায়স্থদের লইয়া অধিকরণ গঠিত হইত, এবং এই সব অধিকরণের উপর ভূমি দান বিক্রয় কর্ম শুধু নহে, বিষয় শাসন-সংক্রান্ত সর্বপ্রকার রাষ্ট্রকর্মের দায়িত্বও ন্যস্ত ছিল, এবং তাহার মধ্যে ন্যায়-অন্যায় বিচার, দণ্ড-পুরস্কার, দানকর্মও বাদ পড়িত না। অধিকরণ-গঠনের যে-ইঙ্গিত মৃচ্ছকটিক নাটকে পাওয়া যায়, প্রায় অনুরূপ ইঙ্গিত গুপ্ত-আমলের লিপিগুলিতেও পাওয়া যাইতেছে; তবে লিপিগুলি সমস্তই ভূমি দান বিক্রয় সংপৃক্ত বলিয়া তাহা ছাড়া অন্য কোনও শাসন-সংপৃক্ত সংবাদ ইহাদের মধ্যে পাওয়া যায় না। কোনো কোনো বিষয়ের বোধহয় কোনো অধিকরণ থাকিত না, বিষয়পতি তাহার কর্মচারীদের লইয়া শাসনকার্য নির্বাহ করিতেন। বৈগ্রাম-পট্টোলীতে দেখিতেছি পণ্ডনগরী বিষয়ের কোনো বিষয়াধিকরণের উল্লেখ নাই; কুমারামাত্য কুলবৃদ্ধি (বিষয়পতি) সংব্যবহার ও পুস্তপালদের সাহায্যে শাসনকার্য চালাইতেন। প্রধান দায়িত্ব যে সর্বত্রই বিষয়পতির উপরই ছিল সন্দেহ নাই। তবে, ১, ২, ৪ ও ৫ নং দামোদর পট্টোলী-কথিত (৪৪২-৪৪—৫৭৩-৪৪ খ্রী) কোটীবর্ষ বিষয়ের অধিকরণের যে-খবর পাওয়া যাইতেছে তাহাতে দেখিতেছি, বিষয়পতির সহায়করূপে অধিকরণ গঠন করিতেছেন নগরশ্রেষ্ঠী, প্রথম কুলিক, প্রথম কায়স্থ এবং প্রথম সার্থবাহ। প্রথম কায়স্থ খুব সম্ভব বিষয়পতির কর্মসচিব এবং সেই হেতু রাজকর্মচারী। কিন্তু বাকী তিনজন অর্থাৎ নগরশ্রেষ্ঠী, প্রথম কুলিক এবং প্রথম সার্থবাহ যথাক্রমে বণিক, শিল্পী এবং ব্যবসায়ী সমাজের প্রতিনিধি, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। প্রাচীন তীরভুক্তি (তিরহুত) অন্তর্গত বর্তমান বসার বা প্রাচীন বৈশালীর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে অনেক মাটির শীলমোহর পাওয়া গিয়াছে; তাহাতে "শ্রেষ্ঠী-সার্থবাহ-কুলিকনিগম" বা "শ্রেষ্ঠীনিগম" এইরূপ পদ উৎকীর্ণ আছে। এলাহাবাদ জেলায় ভিটার ধ্বংসাবশেষ হইতেও "কুলিক-নিগম" পদ উৎকীর্ণ কয়েকটি শীলমোহর পাওয়া গিয়াছে। অনুমান হয়, কোটীবর্ষ বিষয়েও শ্রেষ্ঠী, কুলিক, এবং সার্থবাহদের নিজস্ব নিগম ছিল, এবং বিষয়াধিকরণের

নগরশ্রেষ্ঠী, প্রথম কুলিক এবং প্রথম-সার্থবাহ তাঁহাদের নিজস্ব নিগমের সভাপতি এবং সেই হিসাবে বিষয়াধিকরণে ইঁহাদের প্রতিনিধি ছিলেন। ইঁহারা কি স্ব স্ব নিগম কর্তৃক নির্বাচিত হইতেন, না রাষ্ট্র বা রাজাধারা নিযুক্ত হইতেন ? এ-প্রশ্নের নিঃসংশয় উত্তর দেওয়া কঠিন। তবে, প্রায় সমসাময়িক নারদ ও বৃহস্পতি ধর্মসূত্রের সাক্ষ্য যদি প্রামাণিক হয় তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়, এই সব নিগম-সভাপতিরা স্ব স্ব নিগম কর্তৃক নির্বাচিত হইতেন। দ্বিতীয়ত, অধিকরণের এই সব সভ্যদের সঙ্গে বিষয়পতির সম্বন্ধ কি ছিল ? কেহ কেহ মনে করেন, শাসন-ব্যাপারে ইঁহাদের সাক্ষাৎ দায়িত্ব কিছু ছিল না, অধিকরণের অধিবেশনে ইঁহারা উপস্থিত থাকিতেন মাত্র (রাষ্ট্রকর্ম ইঁহাদের 'পুরোগে' অর্থাৎ উপস্থিতিতে নির্বাহ হইত)। আবার কেহ কেহ বলেন, সর্বময় দায়িত্ব ছিল বিষয়পতির, আর ইঁহারা ছিলেন উপদেষ্টা মাত্র। নগরশ্রেষ্ঠী, প্রথম কুলিক, প্রথম সার্থবাহ এবং প্রথম কায়স্থকে লইয়া একটি উপদেষ্টা মণ্ডলী ছিল, তাঁহারা বিষয়পতিকে উপদেশ পরামর্শ ইত্যাদি দিতেন। কিন্তু লিপিগুলির প্রসঙ্গ-সাক্ষ্য এবং মৃচ্ছকটিকের বিবরণ একত্র করিলে মনে হয়, ইঁহারা শুধু সহায়ক বা উপদেষ্টা মাত্র ছিলেন না, বিষয়-পতির সঙ্গে ইঁহারাও সমভাবে শাসনকার্যের দায়িত্ব নির্বাহ করিতেন, এবং অধিকরণের ইঁহারা অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিলেন।

পুস্তপাল-দপ্তর

বিষয়াধিকরণের সভ্যদের প্রয়োজনমত সাহায্য করিবার জন্য একটি পুস্তপালের দপ্তরও থাকিত ; বিশেষত, ভূমি দান-বিক্রয় ব্যাপারে ইঁহাদের সাহায্য সর্বদাই প্রয়োজন হইত, কারণ ভূমির মাপজোখ্, সীমা-নির্দেশ, ভূমির স্বত্বাধিকার, ইত্যাদি সব কিছুর দলিলপত্র ইঁহাদের দপ্তরেই রক্ষিত হইত। ভূমি দান-বিক্রয়ের ক্রমের যে-বিবরণ এই যুগের লিপিগুলিতে পাওয়া যাইতেছে তাহার বিস্তৃত আলোচনা অন্যত্র করিয়াছি ; এখানে সংক্ষেপে সারমর্ম উদ্ধার করা যাইতে পারে। ভূমি ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা সর্বপ্রথম নির্দিষ্ট ভূমি-ক্রয়ের ইচ্ছা ও সঙ্গে সঙ্গে ক্রয়ের উদ্দেশ্য (প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ধর্মোদ্দেশে দান) এবং স্থানীয় প্রচলিত মূল্যানুযায়ী মূল্যদানের স্বীকৃতি স্থানীয় অধিকরণে আবেদনরূপে উপস্থিত করিতেন ; অধিকরণ তখন প্রস্তাবিত আবেদনটি পরীক্ষা করিবার জন্য পুস্ত-পালের দপ্তরে পাঠাইয়া দিতেন। পুস্তপালের দপ্তর কখনো তিনজন (যেমন, ১,২,৪ ও ৫ নং দামোদরপুর-পট্টোলীতে), কখনও দুইজন পুস্তপাল (যেমন, বৈগ্রাম-লিপিতে) লইয়া গঠিত হইত। যাহাই হউক, পুস্তপালের দপ্তর বিক্রয় অনুমোদন করিলে এবং মূল্য রাজসরকারে জমা হইলে ভূমি-ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের ভূমির অধিকার দেওয়া হইত, অর্থাৎ বিক্রয়কার্য নিষ্পন্ন হইত। এই বিক্রয়কার্য-সম্পাদনা পট্টীকৃত হইত তাম্র-শাসনে, এবং বিক্রীত ভূমির উপর অধিকারের দলিল-প্রমাণস্বরূপ তাম্রশাসনখানি ক্রেতার

হস্তে অর্পিত হইত। ভূমির মাপজোখ্ কাহারা করিতেন, এ-সম্বন্ধে লিপিতে সুনির্দিষ্ট কোনো উল্লেখ নাই, তবে পুস্তপালেরাই তাহা করিতেন এমন অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু সাক্ষাৎভাবে যে-সব ভূমির অবস্থিতি অধিকরণ-শাসনসীমার বাহিরে, দূর গ্রামে, সে-ক্ষেত্রে বিষয়াধিকরণ তাঁহাদের নিকট উপস্থাপিত প্রস্তাব ও তাঁহাদের নির্দেশ স্থানীয় শাসন-প্রতিনিধিদের নিকট পাঠাইয়া দিতেন, এবং স্থানীয় অধিকরণের কর্মচারীরা ভূমি নির্বাচন ও মাপজোখ্ ইত্যাদি সম্পাদন করিয়া মূল্য গ্রহণ করিয়া বিক্রয়কার্য পট্টীকৃত করিয়া দিতেন। গ্রামের শাসনযন্ত্র আলোচনা কালে এই কার্যক্রম আরও পরিষ্কার হইবে।

বীথীর শাসনযন্ত্র

বীথী-বিভাগেরও যে একটি নিজস্ব অধিকরণ থাকিত তাহার প্রমাণ মল্লসারুললিপির সাক্ষ্যেই জানা যাইতেছে, তবে এই অধিকরণ কি ভাবে গঠিত হইত, বলা যাইতেছে না। মহত্তর, খাড়্গী ও অন্তত একজন বাহনায়ক বক্কট্টক বীথী-অধিকরণের শাসন-কার্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ নাই, এবং ভূমি দান-বিক্রয়ের ব্যাপারে এই অধিকরণের ক্ষমতা বিষয়াধিকরণেরই অনুরূপ, এ-তথ্যও লিপি-সাক্ষ্যেই প্রমাণ। এই লিপিতে কুলবারকৃত নামে একাধিক বীথী-অধিকরণ-কর্মচারীর উল্লেখ পাইতেছি; বিক্রীত ভূমির বীথীকোষস্থ অর্থ অধিকরণের নির্দেশানুযায়ী বিলি-বন্দোবস্ত করিবার ভার এই কুলবারকৃতদের উপর দেওয়া হইয়াছিল। স্থানীয় অধিকরণ-সংপৃক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অন্তত দুইজন মহত্তর, তিনজন খাড়্গী এবং একজন বাহনায়কের সাক্ষাৎ পাইতেছি; তবে শাসনকার্যে ইঁহাদের দায়িত্ব কতখানি ছিল বলা কঠিন। বাহনায়কের কথা আগে বলিয়াছি। খাড়্গী এবং পরবর্তী কালের রামগঞ্জ লিপির খড়্গগ্রাহ সমার্থক হওয়া অসম্ভব নয়; খাড়্গী=খড়্গধারী প্রহরী, অর্থাৎ শান্তিরক্ষা-বিভাগের রাজকর্মচারী হওয়া বিচিত্র নয়।

গ্রামের শাসনযন্ত্র

গ্রামের শাসনযন্ত্রের সর্বোচ্চ দায়িত্ব কাহার উপর ছিল, অর্থাৎ গ্রামে প্রধান রাজপুরুষ কে ছিলেন তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতেছে না, তবে গ্রামিক নামে জনৈক রাজপুরুষের (?) সাক্ষাৎ কোনো কোনো লিপিতে পাওয়া যাইতেছে (যেমন, ৩নং দামোদরপুর-লিপিতে); বোধ হয় তাঁহারাই ছিলেন গ্রাম্য শাসনযন্ত্রের কর্তা। অধিকাংশ গ্রামে গ্রামের প্রধান প্রধান লোকেরাই—ব্রাহ্মণ, মহত্তর, কুটুম্ব ইত্যাদিরা—বোধ হয় শাসনকার্য নির্বাহ করিতেন। অন্তত ভূমি দান-বিক্রয় ব্যাপারে ইঁহারা যে স্থানীয় শাসনকার্যের উপদেষ্টা ও সহায়ক ছিলেন, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ নাই (দামোদরপুর-লিপি, পাহাড়পুর-লিপি দ্রষ্টব্য)।

মনে হয় রাষ্ট্রের নির্দেশ কার্যে পরিণত করার ভার ইঁহাদের উপরই দেওয়া হইত। কিন্তু কোনো কোনো গ্রামে একটু বিস্তৃততর শাসনযন্ত্রও বিদ্যমান ছিল; সে-সব ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ, মহত্তর, কুটুম্ব, 'অক্ষুদ্র প্রকৃতয়ঃ' প্রভৃতিরা তো সহায়ক ও উপদেষ্টা হিসাবে থাকিতেনই; তাহা ছাড়া, গ্রামিক এবং অষ্টকুলাধিকরণ নামে একটি অধিকরণও যে থাকিত, তাহারও প্রমাণ আছে (৩ নং দামোদরপুর-পট্টোলী এবং ধনাইদহ-পট্টোলী দ্রষ্টব্য)। অষ্টকুলাধিকরণের গঠন লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে নানা মত দেখিতে পাওয়া যায়। পঞ্চকুলের উল্লেখ অনেক লিপিতেই দেখা যায়, এবং স্থানীয় রাষ্ট্রকার্যে, বিশেষত ভূমি ও অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে পঞ্চকুলের দায়িত্ব যে অনেকখানি ছিল তাহা আমরা একাধিক স্বতন্ত্র সাক্ষ্যে জানিতে পাই। পঞ্চকুল যে কৌমতান্ত্রিক পঞ্চায়েৎ প্রথার সমগোত্রীয়, সন্দেহ নাই। অষ্টকুল বোধ হয় পঞ্চকুলের মতই কোনও জনসংঘ, আট জন প্রধান ব্যক্তি লইয়া গঠিত সমিতি। অবশ্য কুল শব্দের বিশেষ আভিধানিক অর্থ আছে। ছয়টি বলদ ও দুইটি লাঙ্গলে যে পরিমাণ ভূমি চাষ করা যায় তাহাই এক কুল; এই রকম আটটি কুলের শাসন-কর্তৃত্ব যাঁহারা বা যাঁহাদের উপর দেওয়া হয়, তিনি বা তাঁহারাই অষ্ট-কুলাধিকরণ। কিন্তু এই আভিধানিক অর্থ এক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলিয়া মনে হইতেছে না। এই ধরনের বিস্তৃততর গ্রাম্য শাসন-যন্ত্রের কাজের সাহায্যের জন্য পুস্তপালের দপ্তরও একটি থাকিত। ৩ নং দামোদরপুর-পট্টোলীতে পলাশবৃন্দকের শাসনযন্ত্রে মহত্তর, কুটুম্ব, ব্রাহ্মণ, "অক্ষুদ্র প্রকৃতয়ঃ", গ্রামিক, অষ্টকুলাধিকরণ প্রভৃতির সঙ্গে পত্রদাস নামে একজন পুস্তপালের সাক্ষাৎও পাইতেছি।

বিষয় ও বীথী-অধিকরণের মত ভূমি দান-বিক্রয়ের ব্যাপারে গ্রাম্য-অধিকরণেরও একই অধিকার ছিল বলিয়া মনে হইতেছে। ৩ নং দামোদরপুর-পট্টোলীতে দেখিতেছি, গ্রামিক নাভক পলাশবৃন্দকের শাসন-কর্তৃপক্ষের নিকট চণ্ডগ্রামে কিছু ভূমিক্রয়ের প্রার্থনা জানাইয়া ছিলেন। চণ্ডগ্রাম পলাশবৃন্দকের সীমার বাহিরে অবস্থিত থাকায় কর্তৃপক্ষ চণ্ডগ্রামের ব্রাহ্মণ, কুটুম্ব ও মহত্তরদের উপর এই বিক্রয়-ব্যাপার সম্পাদনার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। ধনাইদহ-লিপিতেও দেখিতেছি, গ্রাম্য অষ্টকুলাধিকরণ এবং তৎসংপৃক্ত শাসন-যন্ত্রের নিকটই কয়েকজু ব্যক্তি ভূমিক্রয়ের প্রার্থনা জানাইতেছেন। পাহাড়পুর-লিপিতে দেখা যাইতেছে, নগরশ্রেষ্ঠীর উপস্থিতিতে পুণ্ড্রবর্ধনের ভুক্তি-অধিকরণের সমক্ষে এক ভূমিক্রয়ের প্রার্থনা উপস্থিত করা হইয়াছিল; কিন্তু প্রস্তাবিত ভূমি অধিকরণাধিষ্ঠানের সীমার বাহিরে অবস্থিত থাকায় ভুক্তি-অধিকরণ স্থানীয় ব্রাহ্মণ, কুটুম্ব ও মহত্তরদিগকে এ-কার্যে সহায়তা করিতে আহ্বান ও নির্দেশ করিয়াছিলেন। বৈগ্রাম-লিপির সাক্ষ্যও অনুরূপ; পঞ্চনগরীর বিষয়াধিকরণের সমক্ষে উপস্থাপিত একটি প্রার্থনা প্রস্তাবিত ভূমির স্থানীয় সংব্যবহারীপ্রমুখের—ব্রাহ্মণ, কুটুম্ব ইত্যাদির—নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ঊর্ধতন অধিকরণের নির্দেশানুযায়ী এইসব স্থানীয় কর্তৃপক্ষই ভূমি নির্বাচন করিয়া,

মাপজোখ্ করিয়া, মূল্য লইয়া বিক্রয়-কার্য সম্পাদন করিতেন এবং তাহা পট্টীকৃতও করিতেন।

ভুক্তি অধিকরণ হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রাম্য স্থানীয় অধিকরণ পর্যন্ত সর্বত্রই দেখিতেছি, রাষ্ট্রযন্ত্রে জনসাধারণের ইচ্ছা, মতামত, দায় ও অধিকার কার্যকরী করিবার একটা সুযোগ ছিল। শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যবহুল জনপদের অধিকরণগুলিতে শিল্পী, বণিক ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা স্থান পাইতেন: কৃষিবহুল, ভূমিনির্ভর জনপদের স্থানীয় বীথী ও গ্রাম্য অধিকরণগুলিতে গ্রামিক, অষ্টকুলাধিকরণ, কুটুম্ব, মহত্তর, ব্রাহ্মণ, ইত্যাদিরা শাসনকার্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন, অন্তত সহায়ক ও উপদেষ্টা রূপে। ইঁহাদের দায় ও অধিকারের তারতম্য সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা হয়তো কঠিন, মতভেদও আছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু মোটামুটি ভাবে এই যুগের রাষ্ট্রযন্ত্র জনসাধারণকে একেবারে অবজ্ঞা করিয়া চলিতে পারে নাই, এ-তথ্য স্বীকার করিতে হয়। তবে, জনসাধারণ বলিতে ভূমি ও অর্থবান সমৃদ্ধ শ্রেণী এবং ব্রাহ্মণদেরই বুঝাইতেছে, সন্দেহ নাই; ক্ষুদ্র-প্রকৃতিপুঞ্জের কোনো দায় বা অধিকার রাষ্ট্র স্বীকার করিত, এমন প্রমাণ নাই।

৫

গুপ্তোত্তর যুগ। আনুমানিক ৫০০-৭৫০ খ্রীষ্টীয় শতক

ষষ্ঠ শতকে বঙ্গ স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজস্ব রাষ্ট্রযন্ত্রও গড়িয়া তোলে। তখন উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গে গুপ্ত-বংশের আধিপত্য বিলীয়মান; ছোটখাট বংশধরেরা কোনো প্রকারে তাঁহাদের স্থানীয় আধিপত্য বজায় রাখিতেছেন মাত্র। স্বাধীন স্বতন্ত্র রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গে (অর্থাৎ পূর্ববঙ্গে) নূতন রাষ্ট্রযন্ত্রেরও পত্তন হইল; কিন্তু সে-রাষ্ট্র-বিন্যাস গুপ্ত-আমলের প্রাদেশিক রাষ্ট্ররূপের আদর্শই স্বীকার করিয়া লইল। বস্তুত, বঙ্গের স্বাধীন রাজাদের রাষ্ট্রযন্ত্র গুপ্ত-রাষ্ট্রযন্ত্রের অনুকরণ বলিলেই চলে। রাষ্ট্রবিভাগ, শাসন-পদ্ধতি, রাজপাদোপজীবীদের উপাধি, দায় ও অধিকার, শাসনক্রম, ইত্যাদি সমস্তই একপ্রকার। কাজেই এ-পর্বে নূতন কথা বলিবার বিশেষ কিছু নাই।

রাষ্ট্রযন্ত্রের চূড়ায় বসিয়া আছেন মহারাজাধিরাজ স্বয়ং, তবে এই মহারাজাধিরাজ স্বাধীন স্বতন্ত্র হইলেও স্থানীয় নরপতি মাত্র। ফরিদপুরে কোটালিপাড়ায় প্রাপ্ত পট্টোলী-গুলিতে যে কয়জন নরপতির উল্লেখ পাইতেছি তাঁহারা সকলেই ঐ উপাধিটি ব্যবহার করিতেছেন। যে-ক্ষেত্রে মহারাজাধিরাজের উল্লেখ নাই, সে-ক্ষেত্রে তিনি শুধু ভট্টারক

বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। বপ্পঘোষবাট-লিপিতে জয়নাগ, এবং শশাঙ্কের একাধিক লিপিতে গৌড়-কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্ক মহারাজাধিরাজ উপাধিতেই আখ্যাত হইয়াছেন। খড়্গবংশের প্রতিষ্ঠাতা খড়্গোদ্যম নৃপাধিরাজ এবং ত্রিপুরার লোকনাথ-পট্টোলীর সামন্ত শিবনাথের পিতা, লোকনাথের বংশের প্রতিষ্ঠাতা, অধিমহারাজ আখ্যায় পরিচিত হইয়াছেন। ইঁহারা সকলেই স্বাধীন নরপতি সন্দেহ নাই, এবং সেই হিসাবেই মহারাজাধিরাজ, নৃপাধিরাজ, অধিমহারাজ প্রভৃতি উপাধি ব্যবহৃত হইয়াছে। বঙ্গ মহারাজাধিরাজদের অধীনে, শশাঙ্কের অধীনে এবং জয়নাগের অধীনে সামন্ত নরপতির অস্তিত্ব ইহার অন্যতম প্রধান।

সামন্ততন্ত্র

গুপ্ত আমলেই দেখিয়াছি, এই রাজতন্ত্র ছিল সামন্ততন্ত্র-নির্ভর। এই আমলেও দেখিতেছি তাহার ব্যতিক্রম নাই, বরং সামন্ততন্ত্রের প্রসারই দেখা যাইতেছে। সমাজের ভূমিনির্ভরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। গোপচন্দ্রের মল্লসারুল-লিপি-কথিত দূতকমহারাজ মহাসামন্ত বিজয়সেনের কথা আগেই বলিয়াছি; অনুমান হয়, ইনি আগে মহারাজাধিরাজ বৈন্যগুপ্তের মহাসামন্ত ছিলেন, তারপর বর্ধমান-ভুক্তি গোপচন্দ্রের করায়ত্ত হইলে তিনি গোপচন্দ্রের মহাসামন্ত হন। বপ্পঘোষবাট লিপিতে দেখিতেছি, সামন্ত নারায়ণভদ্র ঔদুম্বরিক বিষয়ে মহারাজাধিরাজ জয়নাগের সামন্ত ছিলেন। লোকনাথ-পট্টোলী-কথিত ব্রাহ্মণ প্রদোষশর্মা মহারাজ লোকনাথের মহাসামন্ত ছিলেন। আশ্রফপুর-লিপিতে জনৈক সামন্ত বনটিয়োকের সাক্ষাৎ পাইতেছি। শশাঙ্ক তো তাঁহার রাষ্ট্রীয় জীবন আরম্ভই করিয়াছিলেন মহাসামন্তরূপে; তারপর যখন তিনি স্বাধীন পরাক্রান্ত নরপতি রূপে প্রতিষ্ঠিত হন, তখন তাঁহার নিজেরও মহাসামন্ত ছিল। বিজিত রাজ্যের রাজারাই বিজেতা মহারাজাধিরাজগণ কর্তৃক মহাসামন্ত রূপে স্বীকৃত হইতেন, এইরূপ অনুমান অসংগত নয়। শৈলোদ্ভববংশীয় কঙ্গোদাধিপতি দ্বিতীয় মাধবরাজ এবং দণ্ডভুক্তির শাসনকর্তা সোমদত্ত এই দুইজনই যথাক্রমে শশাঙ্কের মহারাজ-মহাসামন্ত এবং সামন্ত-মহারাজ ছিলেন। সামন্তরা সকলে যে একই পর্যায় ও মর্যাদাভুক্ত ছিলেন না, তাহা তাঁহাদের উপাধি হইতেই সুপ্রমাণিত। কেহ ছিলেন মহাসামন্ত-মহারাজ, কেহ মহাসামন্ত, কেহ বা শুধু সামন্ত। ভূম্যাধিপত্যের বিস্তৃতি, রাষ্ট্রীয় পদমর্যাদা ও অধিকার, রাজসভায় ব্যক্তিগত প্রতিপত্তি প্রভৃতির উপর এই স্তরবিভাগ নির্ভর করিত, সন্দেহ নাই।

ভুক্তি

বঙ্গরাষ্ট্রের বৃহত্তম রাষ্ট্রবিভাগের নাম এই পর্বে কি ছিল নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। বর্ধমান ভুক্তি (মল্লসারুল-লিপি) ও নব্যাবকাশিকা (ফরিদপুর-লিপি), এই দুইটি যে বৃহত্তম বিভাগ সমূহের দুইটি বিভাগ, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। বর্ধমান-ভুক্তির উল্লেখ হইতে মনে হয়, নব্যাবকাশিকাও ভুক্তি-পর্যায়েরই রাষ্ট্রবিভাগ। ফরিদপুর-লিপিকথিত সর্বোচ্চ শাসনকর্তা উপরিক নাগদেব, উপরিক জীবদত্ত প্রভৃতির উপাধি হইতে প্রায় নিঃসংশয়ে অনুমান করা চলে যে, নব্যাবকাশিকা ভুক্তি বলিয়া উল্লিখিত না হইলেও ইহার বিভাগীয় রাষ্ট্রমর্যাদা ভুক্তি-পর্যায়ের। ভুক্তির শাসনকর্তারা এ-ক্ষেত্রেও উপরিক উপাধিতেই আখ্যাত হইতেছেন, যদিও স্থানুদত্তকে উপরিক বলা হয় নাই, শুধু মহারাজ বলা হইয়াছে। নাগদেব শুধু উপরিক নহেন, মহাপ্রতীহারও বটে ; জীবদত্ত উপরিক এবং অন্তরঙ্গ। অন্তরঙ্গ রাজার নিজস্ব চিকিৎসক, রাজবৈদ্য। চক্রদত্তের এক টীকাকার শিবদাস সেনের পিতা অনন্তসেন বারবক শাহের অন্তরঙ্গ ছিলেন ; শ্রীচৈতন্যের পারষদবর্গের অন্যতম শ্রীখণ্ডবাসী মুকুন্দ সরকার ছিলেন হোসেন শাহের অন্তরঙ্গ। মনে হয়, উপরিক জীবদত্ত মহারাজাধিরাজ সমাচারদেবের রাজবৈদ্যও ছিলেন। ইঁহারা নিযুক্ত হইতেন স্বয়ং মহারাজাধিরাজ কর্তৃক (তদনুমোদনলব্ধাস্পদস্য, তৎপ্রসাদলব্ধাস্পদে, চরণ-কমলযুগলারাধনোপাত্ত, ইত্যাদি পদ দ্রষ্টব্য)। শশাঙ্কের সময় দণ্ডভুক্তি বা দণ্ডভুক্তিদেশও বোধ হয় ছিল একটি ভুক্তি-বিভাগ, এবং তাহার শাসনকর্তার পদোপাধি ছিল উপরিক। সোমদত্ত ছিলেন উপরিক এবং সামন্ত-মহারাজ ; শুভকীর্তি ছিলেন উপরিক এবং মহাপ্রতীহার।

গুপ্তরাষ্ট্রে যেমন, বঙ্গরাষ্ট্রে, এবং শশাঙ্কের গৌড়রাষ্ট্রেও তেমনই ভুক্তি-অধিষ্ঠানের একটি অধিকরণ নিশ্চয়ই ছিল। ফরিদপুরের পট্টোলীগুলিতে এই অধিকরণের উল্লেখ পাইতেছি না ; কারণ, উল্লেখের প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু, শশাঙ্কের মেদিনীপুর লিপি দুইটিতে যে তাবীর-অধিকরণের উল্লেখ আছে, এবং যে-অধিকরণ হইতে শাসন দুইটি নির্গত হইয়াছিল সেই অধিকরণটি তো ভুক্তির অধিকরণ বলিয়াই মনে হইতেছে।

বিষয়

ভুক্তির নিম্নবর্তী রাষ্ট্রবিভাগ বিষয়ের খবর এই পর্বেও পাওয়া যাইতেছে। বঙ্গের নব্যাবকাশিকা (-ভুক্তির ?) প্রধান একটি বিষয় ছিল বারকমণ্ডল বিষয়। বারকমণ্ডলের মণ্ডল এখানে কোনও রাষ্ট্রবিভাগ বলিয়া মনে হইতেছে না ; বিষয়টিরই নাম বারকমণ্ডল। বিষয়ের বিষয়পতি কখনও মহারাজাধিরাজ স্বয়ং নিযুক্ত করিতেন, যেমন বপ্পঘোষবাট লিপিতে ঔদুম্বরিক বিষয়ের বিষয়পতিকে বলা হইয়াছে "তৎপাদানুধ্যাত সামন্ত

নারায়ণভদ্র বিষয়সম্ভোগকালে", কিন্তু সাধারণত উপরিকেরাই বিষয়পতি নিযুক্ত করিতেন, যেমন, বারকমণ্ডল বিষয়ে। বিষয়পতি জজাবকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন (উপরিক)-মহারাজ স্থাণুদত্ত; গোপালস্বামী এবং বৎসপালকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন উপরিক জীবদত্ত। ত্রিপুরার লোকনাথ পট্টোলীতেও এক সুব্যঙ্গ বিষয়ের উল্লেখ পাইতেছি।

বিষয়পতিদের অধিকরণের খবর ফরিদপুর-পট্টোলীগুলিতে তো আছেই। লোকনাথের ত্রিপুরা পট্টোলীতেও "বিষয়পতীন্ সাধিকরণান্"দের উল্লেখ দেখা যায়। শেষোক্ত লিপিটিতে দেখিতেছি, বিষয়পতি ও তাঁহার অধিকরণ স্থানীয় শাসনকার্য নির্বাহ করিতেন "সপ্রধান-ব্যবহারি-জনপাদান্"দের সাহায্যে। ফরিদপুর-কোটালিপাড়ার লিপিগুলিতে যে অধিকরণের উল্লেখ দেখিতেছি, তাহার গঠন ঠিক গুপ্ত আমলের পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির বিষয়াধিকরণের মতন নয়। ধর্মাদিত্যের দ্বিতীয় পট্টোলীতে বিষয়পতি এবং বিষয়াধিকরণ ছাড়া আরও ষোলো-সতেরো জন বিষয়-মহত্তর, ব্যাপারী-ব্যবসায়ী এবং অনুল্লিখিত-সংখ্যক প্রকৃতিপুঞ্জের খবর পাওয়া যাইতেছে। স্পষ্টতই দেখা যাইতেছে, কোটিবর্ষের বিষয়াধিকরণে নগরশ্রেষ্ঠী-প্রথম কুলিক-প্রথম সার্থবাহের যে স্থান, এখানে তাঁহাদের সেই স্থান নাই; বিষয় মহত্তরেরাও বারকমণ্ডল বিষয়াধিকরণের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নহেন বলিয়াই মনে হইতেছে। এতগুলি বিষয়-মহত্তর, ব্যাপারী-ব্যবহারী এবং প্রকৃতিপুঞ্জ লইয়া বিষয়াধিকরণ গঠিত হইত বলিয়া মনে হয় না; ইঁহারা সম্ভবত জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে অধিকরণের অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া শাসনকার্যের আলোচনা ও কর্তব্য নির্ধারণে সহায়তা করিতেন। ইহা ছাড়া বারকমণ্ডল বিষয়ের আরও একটু বৈশিষ্ট্য দেখিতেছি। ঘুগ্রাহাটি-লিপি এবং অন্য আরও দুইটি কোটালিপাড়া-লিপিতে বিষয়পতির অধিকরণের প্রধান হিসাবে একজন জ্যেষ্ঠ-কায়স্থ বা জ্যেষ্ঠাধিকরণিকের সাক্ষাৎ পাইতেছি। এই তিনটি লিপিতে অধিকরণ-ব্যাপারে বিষয়পতির উল্লেখ নাই; কিন্তু তাই বলিয়া এ অনুমান করা চলে না যে, বিষয়পতির সঙ্গে বিষয়াধিকরণের কোনো সম্বন্ধ ছিল না, বা জ্যেষ্ঠাধিকরণিকই অধিকরণের সভাপতি ছিলেন। বরং, এ অনুমানই সঙ্গত যে, বিষয়পতিই ছিলেন সর্বময় কর্তা, অধিকরণের সভাপতি; জ্যেষ্ঠ কায়স্থ বা জ্যেষ্ঠাধিকরণিক ছিলেন অধিকরণের অন্যান্য সভ্যদের মুখ্যতম প্রতিনিধি। এই অন্যান্য সভ্যরা কাহারা, নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন; অনুমান করিয়াও লাভ নাই। এই অধিকরণেই সহযোগী উপদেষ্টা হিসাবে থাকিতেন বিষয় মহত্তরেরা (ধর্মাদিত্যের একটি পট্টোলীকথিত "বিষয়িণঃ" দ্রষ্টব্য), মহত্তরেরা, প্রধান ব্যাপারী বা প্রধান ব্যবহারীরা। মহত্তর ও বিষয় মহত্তর এই দুয়ের পৃথক উল্লেখ হইতে স্বতই মনে হওয়া উচিত যে, ইঁহারা দুই স্তর বা পর্যায়ের লোক, এবং বিষয়-মহত্তরেরা উচ্চতর পর্যায়ের। মহত্তরেরা তো স্থানীয় সম্ভ্রান্ত বিত্তবান ও ভূমিবান্ লোক বলিয়াই মনে হয়। ব্যাপারী ও ব্যবহারীরা নিঃসন্দেহে শিল্পী-বণিক-ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের লোক।

ভূমি ক্রয়-দান-বিক্রয় ব্যাপারে বঙ্গরাষ্ট্রের বিষয়াধিকরণগত সংবাদ গুপ্তরাষ্ট্রেরই অনুরূপ ; খুঁটিনাটি ব্যাপারে যাহা কিছু পার্থক্য তাহা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। মল্লসারুল-লিপিতে বীথী-অধিকরণ সম্পর্কে কুলবারকৃত আখ্যাত এক শ্রেণীর রাজকর্মচারীর উল্লেখ আগেই করা হইয়াছে ; বঙ্গরাষ্ট্রের কোনো কোনো লিপিতেও কুলবার নামে রাজপুরুষের সাক্ষাৎ পাইতেছি। সমাচারদেবের ঘুগ্রাহাটি লিপিতে দেখিতেছি, বারকমণ্ডল-বিষয়ের অধিকরণ বিক্রীত ভূমি মাপিয়া পৃথক করিয়া দিবার জন্য করণিক নয়নাগ, কেশব এবং আরও কয়েকজনকে কুলবার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কোটালিপাড়ার একটি লিপিতেও কুলবারের উল্লেখ আছে এবং সেখানেও ইঁহাদের দায়িত্বের ইঙ্গিত ভূমি ক্রয়-বিক্রয়ের শেষ পর্বে। ইঁহারা বোধহয় স্থায়ী অধিকরণ-কর্মচারী ছিলেন না, সর্বত্রই সকল সময় ইঁহাদের প্রয়োজনও হইত না ; প্রয়োজনানুযায়ী অধিকরণ কর্তৃক ইঁহারা নিযুক্ত হইতেন ; ভূমি-আইন সংক্রান্ত ব্যাপারে বোধ হয় তাঁহারা দক্ষ ছিলেন। যাহা হউক, দেখা যাইতেছে, গুপ্তরাষ্ট্রের অধিকরণগুলিতে যেমন, বঙ্গরাষ্ট্রের অধিকরণেও জনসাধারণের মতামত ইত্যাদি জ্ঞাপন ও কার্যকরী করিবার সুযোগ ও উপায় ছিল ; বিষয়-মহত্তর, মহত্তর, ব্যাপারী-ব্যবহারী ও প্রকৃতিপুঞ্জের সম্মিলনই তাহার প্রমাণ।

বঙ্গরাষ্ট্রের কোনও বীথী ও বীথী-অধিকরণ বা গ্রামাধিকরণের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না ; তবে পূর্ববর্তী পর্বের, এবং মল্লসারুল-লিপিকথিত বর্ধমান-ভুক্তির বক্কট্টক-বীথীর অধিকরণের উল্লেখ ও বিবরণ হইতে মনে হয়, পূর্ববঙ্গের রাষ্ট্রবিভাগ ও রাষ্ট্রযন্ত্রে ইহাদের স্থান ছিল ; সাক্ষ্য প্রমাণ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত নাই মাত্র। বক্কট্টক-বীথী ও তাহার অধিকরণের কথা আগেই বলা হইয়াছে ; এবং তাহা যে মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্রেরই অধিকারভুক্ত ছিল সে-ইঙ্গিতও করা হইয়াছে। মল্লসারুল লিপির সাক্ষ্য এই প্রসঙ্গে অন্যদিক দিয়াও উল্লেখযোগ্য। গুপ্ত-আমলের প্রাদেশিক রাষ্ট্রযন্ত্রের এবং স্বাধীন স্বতন্ত্র বঙ্গরাষ্ট্রের কর্মধারা বা আমলাতন্ত্র একই জাতীয় না হওয়াই স্বাভাবিক। স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের আমলাতন্ত্র বিস্তৃততর হইবে. এবং কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের আমলাতন্ত্রের রূপ লইবে, ইহা কিছু বিচিত্র নয়। বঙ্গরাষ্ট্রের আমলে তাহাই হইয়াছিল, এবং মল্লসারুল-লিপিতে সেই বর্ধিত বিস্তৃত আমলাতন্ত্রের প্রতিফলন দেখা যাইতেছে। এই লিপির কর্মচারী-তালিকা আগেই বিবৃত করা হইয়াছে, এখানে পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই। এই আমলাতন্ত্র এখন হইতে ক্রমশ বিস্তারলাভ করিয়া সেন-আমলে অস্বাভাবিক স্ফীতি লাভ করিবে,—ক্রমে আমরা তাহা দেখিব। ইতিমধ্যেই (সপ্তম শতক) লোকনাথের ত্রিপুরা পট্টোলীতে সান্ধিবিগ্রহিক উপাধিক এক কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র কর্মচারীর উল্লেখ দেখা যাইতেছে। সান্ধি-বিগ্রহিক পররাষ্ট্রব্যাপারে যুদ্ধ ও সন্ধি-শান্তিসম্পর্কিত উচ্চতম রাজকর্মচারী, বর্তমান ইংরেজি পরিভাষায় minister of peace and war। প্রাদেশিক রাষ্ট্রযন্ত্রে সান্ধিবিগ্রহিক থাকার কোনো প্রয়োজন হয় নাই ; কিন্তু স্বাধীন স্বতন্ত্র কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রযন্ত্রের সে-প্রয়োজন হইয়াছিল।

৬

পাল পর্ব

অষ্টম শতকের মাঝামাঝি পালবংশের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বাঙলাদেশে নবযুগের সূচনা দেখা গেল। কিঞ্চিদূন চারিশত বৎসর ধরিয়া এই রাজবংশ বাঙলাদেশে প্রতিষ্ঠিত ছিল; এই বংশের প্রভাবশালী রাজারা বাঙলাদেশের বাহিরে কামরূপে এবং উত্তর-ভারতের সুবিস্তৃত দেশাংশ জুড়িয়া সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন, অসংখ্য ক্ষুদ্র বৃহৎ সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছিলেন, উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতে ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি ব্যাপারে বাঙলাদেশকে ইঁহারা আন্তর্ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক বৌদ্ধজগতে একটা বিশিষ্ট স্থানে উন্নীত ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই সব সুবৃহৎ সুবিস্তৃত প্রচেষ্টার পশ্চাতে যে-রাষ্ট্রের সচেতন কর্ম-কল্পনা সক্রিয় ছিল সেই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রযন্ত্রের সর্বতোমুখী বিস্তার ও জটিলতা সহজেই অনুমেয়। তাহা ছাড়া, যে-রাষ্ট্রযন্ত্র গুপ্ত-আমলে প্রবর্তিত হইয়া স্বাধীন বঙ্গরাজাদের, শশাঙ্ক ও অন্যান্য রাজাদের আমলে সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া অভ্যস্ত ও আচরিত হইয়াছে, তাহা পালবংশের সুদীর্ঘ কালের সুবিস্তৃত রাজ্য ও সুবিপুল দায়িত্বের ক্রমবর্ধমান প্রসারে আরও প্রসারিত, আরও গভীরমূল, আরও দৃঢ়সংবদ্ধ হইবে, স্পষ্টতর রূপ গ্রহণ করিবে তাহাও কিছু বিচিত্র নয়। রাষ্ট্রযন্ত্রের নূতন কোনো বৈশিষ্ট্য পালরাষ্ট্র বা চন্দ্র-কম্বোজরাষ্ট্রে সূচিত হইয়াছিল, এমন নয়, বরং বলা যায় উত্তর-ভারতের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতার সূত্রে সমসাময়িক উত্তর-ভারতীয় রাষ্ট্রসমূহের রাষ্ট্র-বিন্যাসগত অনেক অভ্যাস, অনেক বৈশিষ্ট্য এই যুগের আঞ্চলিক রাষ্ট্র আত্মসাৎ করিয়াছিল। সপ্তম শতকে দ্বিতীয় জীবিতগুপ্তের দেওবরণার্ক লিপি, হর্ষবর্ধনের বাঁশখেরা লিপি প্রভৃতিতে সমসাময়িক রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র-বিন্যাসের যে-চিত্র পাওয়া যায়, পালরাষ্ট্রের প্রথম পর্বেও রাষ্ট্র-বিন্যাসের চিত্র মোটামুটি সেই একই।

রাজতন্ত্র

পূর্ব পূর্ব যুগের মত এ-যুগে এবং পরবর্তী যুগেও রাষ্ট্র-বিন্যাসের গোড়ার কথা রাজতন্ত্র, এবং সে-রাজতন্ত্র আরও দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত, আরও মহিমা ও মর্যাদাসমন্বিত, আরও কীর্তি ও ঐশ্বর্যসমৃদ্ধ। অব্যবহিত পূর্বযুগের স্বাধীন রাজারা ছিলেন মহারাজাধিরাজ অথবা অধিমহারাজ অথবা নৃপাধিরাজ; লোকনাথের পট্টোলীতে রাজাকে পরমেশ্বরও বলা হইয়াছে। এ-সমস্ত উপাধি বাঙলাদেশে গুপ্ত-রাজারাই প্রচলন করিয়াছিলেন। পাল ও চন্দ্রবংশের রাজারা শুধু মহারাজাধিরাজ মাত্র নন, তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে পরমেশ্বর এবং পরমভট্টারকও। গুপ্ত-সম্রাটেরাও তো ছিলেন পরমদৈবত-পরমভট্টারক-মহারাজাধিরাজ। সাম্রাজ্য, রাজকীয় মর্যাদা ও রাষ্ট্রীয় প্রভাব বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে রাজাদের উপাধিক আড়ম্বর

বাড়িবে, তাহা কিছু আশ্চর্যও নয়! বংশানুক্রমিক রাজবংশের সর্বময় প্রভুত্ব, রাজকীয় মহিমা, ঐশ্বর্য-বিলাস, পারিবারিক মর্যাদা ইত্যাদি পাল-আমলের লিপিগুলিতে যে অজস্র অত্যুক্তিময় পল্লবিত স্তুতিবাদ লাভ করিয়াছে তাহাতে মনে হয়, ভারতের অন্যত্র যেমন বাঙলাদেশেও তেমনই এই যুগে রাজাকে দেবতা ও পরমেশ্বরের নররূপী অবতার এবং, পরমগুরু বলিয়া প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল।

রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র যুবরাজ নামে আখ্যাত হইতেন, এবং প্রাপ্তবয়স্ক হইলেই যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইতেন। তাঁহার দায় ও অধিকার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। এক যুবরাজ ত্রিভুবনপাল ধর্মপালের খালিমপুর লিপির দূতকের কার্য করিয়াছিলেন; আর এক যুবরাজ রাজ্যপাল দেবপালের মুঙ্গের-লিপির দূতক ছিলেন। বিগ্রহপাল তাঁহার পুত্র যুবরাজ নারায়ণপালের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া সিংহাসন ত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থে গিয়াছিলেন। রাজার পুত্র কুমার নামে অভিহিত হইতেন, এবং তাঁহাদের কেহ কেহ উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত হইতেন, যুদ্ধবিগ্রহেও যোগদান করিতেন। রামপাল তাঁহার পুত্র রাজ্যপালের সঙ্গে রাজকীয় ও সামরিক ব্যাপারে আলোচনা পরামর্শ করিতেন; পরিণত বয়সে পুত্রের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া তিনিও বানপ্রস্থে গিয়া গঙ্গায় আত্মবিসর্জন করেন। রাজারা রাষ্ট্রকার্যে ভ্রাতাদেরও সহায়তা এবং পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। ধর্মপাল ভ্রাতা বাক্‌পাল এবং দেবপাল কর্তৃক সামরিক ব্যাপারে বহুল উপকৃত হইয়াছিলেন। ভ্রাতা ও রাজ-পরিবারের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের মধ্যে সিংহাসন ও উত্তরাধিকার লইয়া বিবাদ হইত না, এমন নয়; একবার এই ধরনের এক বিবাদ রাষ্ট্রবিপ্লবের অন্যতম কারণ হইয়াছিল। দ্বিতীয় মহীপালের সময়ে কৈবর্ত-বিদ্রোহের অন্যতম কারণ বোধ হয় ভ্রাতৃবিরোধ এবং মহীপাল কর্তৃক ভ্রাতা রামপাল ও শূরপালের কারাবরোধ। তৃতীয় গোপালের মৃত্যুর মূলে খুল্লতাত মদনপালের দায়িত্ব একেবারে ছিল না, এ-কথা জোর করিয়া বলা যায় না। পাল-লিপিমালার রাজপাদপোজীবীদের তালিকায়ও রাজপুত্রের উল্লেখ আছে। চন্দ্রবংশীয় লিপির এই তালিকায় রাজার এবং কম্বোজ বংশের ইর্দা পট্টোলীতে মহিষীর উল্লেখও দেখিতে পাওয়া যায়। রাজকীয় মহিমা ও মর্যাদার সীমার ভিতরে মহিষীরও একটা স্থান ছিল, সন্দেহ নাই।

সামন্ততন্ত্র

পাল-আমলে সামন্ততন্ত্র আরও দৃঢ়প্রতিষ্ঠ ও দৃঢ়সংবদ্ধ হয়। সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সামন্তদের সংখ্যাও ছিল অনেক। অনুমান করা কঠিন নয়, ইঁহাদের অনেকেই বিজিত রাজ্য ও রাষ্ট্রের প্রভু ছিলেন; বিজিত হইবার পর মহাসামন্ত-সামন্তরূপে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। মহারাজাধিরাজ সম্রাটের সঙ্গে ইঁহাদের সম্বন্ধের স্বরূপ নির্ণয় করা কঠিন; তবে, খালিমপুর-লিপি পাঠে মনে হয়, পাল-সম্রাটেরা সময় সময় মহতী রাজকীয়

সভা আহ্বান করিতেন বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে, এবং তখন এই সব মহারাজা-মহাসামন্ত হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ সামন্ত ও মাণ্ডলিক পর্যন্ত সকলেই সেই সভায় উপস্থিত হইয়া মহারাজাধিরাজ সম্রাটকে বিনীত প্রণতি জ্ঞাপন করিয়া নিজেদের অধীনতার স্বীকৃতি জানাইতেন। পাল ও চন্দ্র-লিপিমালায় রাজপুরুষদের যে ক্ষুদ্র বৃহৎ তালিকার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে রাজন্, রাজনক, রাজন্যক, রাণক, সামন্ত, মহাসামন্ত প্রভৃতি ঔপধিক রাজপাদোপজীবীদের সাক্ষাৎ মেলে। ইঁহারা সকলেই যে নানা স্তরের সামন্ত নরপতি, এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কম। ধর্মপালের খালিমপুর লিপিতে জনৈক মহাসামন্তাধিপতি শ্রীনারায়ণবর্মার খবর পাওয়া যাইতেছে; তিনি কোন্ জনপদের মহাসামন্তাধিপতি তাহা জানা যাইতেছে না। এই লিপিতেই উত্তরাপথের যে-সব নরপতিদের কনৌজের রাজদরবারে আসিয়া রাজরাজেশ্বরের সেবার্থ সমবেত হইবার ইঙ্গিত আছে, ভোজ-মৎস্য-মদ্র-কুরু-যদু-যবন অবন্তি-গন্ধার-কীর-পঞ্চাল প্রভৃতি মিত্র রাজন্যবর্গের যে উল্লেখ আছে তাঁহারাও এক হিসাবে সামন্তরাজা, সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালে যাঁহারা পালরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন তাঁহারাও 'অনন্ত সামন্তচক্র'। আবার রামপাল যাঁহাদের সহায়তায় পিতৃরাজ্য বরেন্দ্রী পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন তাঁহাদেরও সন্ধ্যাকর নন্দী রামচরিতে 'সামন্ত'-আখ্যায়ই পরিচয় দিয়াছেন, অথচ তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব জনপদে প্রায় স্বাধীন নরপতি। অপর-মন্দারের অধিপতি লক্ষ্মীশূর তো নিজেও ছিলেন সামন্ত এবং "আটবিক সামন্ত-চক্র-চূড়ামণি"। রামপালের মাতুল রাষ্ট্রকূট মহনের দুই পুত্র, মহামাণ্ডলিক কাহ্নরদেব এবং সুবর্ণদেবও রামপালের পক্ষে যোগ দিয়াছিলেন। তাহার পর, পালরাষ্ট্রের দুর্দিনে যাঁহারা বিদ্রোহপরায়ণ হইয়া সেই রাষ্ট্রকে ধ্বংসের পথে আগাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহারাও সামন্ত। এক বর্মণরাজ রামপালের শরণাগত হইয়াছিলেন এবং ইহা অসম্ভব নয় যে, বর্মণ বংশ সামন্ত-বংশ রূপেই বাঙলাদেশে প্রতিষ্ঠালাভ করেন এবং পরে স্বাধীন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। কামরূপের বিদ্রোহী নরপতি তিঙ্গ্যদেবও পালরাষ্ট্রের সামন্তই ছিলেন।

মন্ত্রী

পাল-চন্দ্র পর্বের রাষ্ট্রেই আমরা সর্বপ্রথম একজন প্রধান রাজপুরুষের সাক্ষাৎ পাইতেছি যাঁহার পদোপাধি মন্ত্রী বা সচিব এবং যিনি রাজা ও সম্রাটদের সকল কর্মের প্রধান সহায়ক, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রযন্ত্রের সর্বপ্রধান কর্মচারী। ভট্ট গুরবমিশ্রের বাদল-প্রশস্তিতে দেখা যাইতেছে, একটি সম্ভ্রান্ত, শাস্ত্রবিদ্, সমসাময়িক পণ্ডিতকুলাগ্রগণ্য ব্রাহ্মণ-পরিবার চারিপুরুষ ধরিয়া পালসম্রাটদের মন্ত্রীত্ব করিয়াছেন। মন্ত্রী গর্গ ধর্মপালকে অখিল রাজ্যের স্বামিত্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন বলিয়া দাবি করা হইয়াছে; তাঁহার পুত্র দর্ভপাণির নীতি কৌশলে দেবপাল হিমালয় হইতে বিন্ধ্য পর্যন্ত সমস্ত ভূভাগ করতলগত করিতে

সমর্থ হইয়াছিলেন! শুধু তাহাই নয়, 'দেবপাল···উপদেশ গ্রহণের জন্য দর্ভপাণির অবসর অপেক্ষায় তাঁহার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিতেন' এবং 'তিনি আগে সেই মন্ত্রীবরকে আসন প্রদান করিয়া স্বয়ং সচকিতভাবেই সিংহাসনে উপবেশন করিতেন।' দর্ভপাণির পুত্র সোমেশ্বর পরমেশ্বর-বল্লভ বা মহারাজাধিরাজের প্রিয়পাত্র বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন। সোমেশ্বরপুত্র কেদারমিশ্রের 'বুদ্ধিবলের উপাসনা করিয়া' দেবপাল উৎকল, হূণ, দ্রাবিড় ও গুর্জরনাথকে পরাজিত করিয়াছিলেন। তাঁহার যজ্ঞস্থলে শূরপাল নামক নরপাল স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া অনেকবার শ্রদ্ধাসলিলাপ্লুত হৃদয়ে নতশিরে পবিত্র শান্তিবারিক গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেদারমিশ্রের পুত্র শ্রীগুরবমিশ্রকে 'শ্রীনারায়ণপাল যখন মাননীয় মনে করিতেন, তখন আর তাঁহার অন্য প্রশংসা বাক্য কি হইতে পারে?' এই সব বর্ণনার মধ্যে অতিশয়োক্তি যথেষ্ট, সন্দেহ নাই; তবে, মন্ত্রীরা সকলেই যে খুব প্রতাপবান ছিলেন, রাজা ও রাষ্ট্রের উপর তাঁহাদের আধিপত্য যে খুব প্রবল ছিল, এ-সম্বন্ধেও সন্দেহ করা চলে না। আর একটি ব্রাহ্মণ-পরিবারও বংশানুক্রমে কয়েক পুরুষ ধরিয়া পালরাজাদের মন্ত্রীত্ব করিয়াছিলেন। শাস্ত্রবিদশ্রেষ্ঠ যোগদেব বংশানুক্রমে (বংশানুক্রমেণাভূৎ সচিবঃ) তৃতীয় বিগ্রহপালের সচিব নিযুক্ত হইয়াছিলেন; যোগদেবের পর "তত্ত্ববোধভূ" বোধিদেব রামপালের সচিব ছিলেন; বোধিদেবের পুত্র কুমারপালের 'চিন্তানুরূপ সচিব' হইয়াছিলেন। এই দুইটি বংশানুক্রমিক দৃষ্টান্ত হইতে মনে হয়, বংশানুক্রমিক মন্ত্রীত্বপদ পালরাষ্ট্রে প্রচলিত ছিল; সম্ভবত এ-ক্ষেত্রেও তাঁহারা গুপ্তবংশীয় প্রথাই অনুসরণ করিয়াছিলেন। শুধু মন্ত্রী-নিয়োগের ক্ষেত্রেই নয়, অন্যান্য অনেক পদনিয়োগের ক্ষেত্রে পাল, বর্মণ ও সেনবংশীয় রাজারা এই বংশানুক্রমিক নিয়োগপ্রথা মানিয়া চলিতেন। গুপ্তরাষ্ট্রের আমলেই এই প্রথা বহুল প্রচলিত হইয়াছিল। আল্ মাসুদি তো পরিষ্কার বলিয়াছেন, ভারতবর্ষে অনেক রাজকীয় পদই ছিল বংশানুক্রমিক। অন্যান্য দুই একটি লিপিতেও পালরাষ্ট্রের মন্ত্রীপদের উল্লেখ আছে, যেমন, প্রথম মহীপালের বাণগড় লিপির দূতক ছিলেন ভট্টবামন মন্ত্রী; তৃতীয় বিগ্রহপালের আমগাছি লিপির দূতকও ছিলেন একজন মন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী (বাণগড় লিপির মহামন্ত্রী দ্রষ্টব্য) বা সচিব ছাড়াও রাজার এবং কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের কার্যে সহায়তা করিবার জন্য আরও কয়েকজন মন্ত্রী থাকিতেন; ইঁহাদের কাহারো কাহারো পদোপাধি পাল ও চন্দ্রবংশের লিপিগুলিতে উল্লিখিত হইয়াছে, যেমন, মহাসান্ধিবিগ্রহিক, রাজামাত্য, মহাকুমারামাত্য, দূত বা দূতক, মহাসেনাপতি, মহাপ্রতীহার, মহাদণ্ডনায়ক, মহাদৌঃসাধসাধনিক, মহাকর্তাকৃতিক, মহাক্ষপটলিক, মহাসর্বাধিকৃত, রাজস্থানীয় এবং অমাত্য। অমাত্য সাধারণভাবে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী; রাজপুত্রের পরই রাজামাত্যের উল্লেখ হইতে মনে হয়, মন্ত্রী বা সচিবের পরই ছিল ইঁহাদের স্থান। কুমারামাত্য সাধারণত বিষয়পতির সমার্থক, বিষয়ের সর্বময় কর্তা; মহাকুমারামাত্য হয়তো বিষয়পতি

বা কুমারামাত্যদের সর্বাধ্যক্ষ। দূত কোন স্থায়ী রাজপদ না-ও হইতে পারে; অন্তত তিনটি লিপিতে দেখিতেছি, মন্ত্রীরা এবং সান্ধিবিগ্রহিকেরাও দূত নিযুক্ত হইতেছেন (বাণগড়, আমগাছি ও মনহলি লিপি)। মহাসান্ধিবিগ্রহিক পররাষ্ট্রসংপৃক্ত যুদ্ধ ও শান্তি ব্যবস্থা-বিষয়ক উচ্চতম রাজকর্মচারী। মহাসেনাপতি যুদ্ধবিগ্রহ সম্পর্কিত উচ্চতম রাজপুরুষ। মহাপ্রতীহার পদোপাধি রাজপুরুষ ও সামন্ত উভয়েরই দেখা যায়, এবং সামরিক ও অসামরিক উভয় বিভাগেই এই পদোপাধি প্রচলিত ছিল। প্রতীহার অর্থ দ্বাররক্ষক; রাষ্ট্রের কর্মচারী মহাপ্রতীহার বোধ হয় রাজ্যের প্রত্যন্ত সীমারক্ষক ঊর্ধ্বতন রাজকর্মচারী। অথবা, ইঁহাকে রাজপ্রাসাদের রক্ষকাবেক্ষক অর্থাৎ শান্তিরক্ষা-বিভাগের কর্মচারীও বলা যায়! ইঁহাকে অবশ্য যথার্থত মন্ত্রী বলা চলে না। মহাদণ্ডনায়ক প্রধান ধর্মাধ্যক্ষ বা বিচারক, বিচার বিভাগের সর্বময় কর্তা। মহাদৌঃসাধসাধনিক ও মহাকর্তাকৃতিকের দায় ও কর্তব্য কি নিশ্চয় করিয়া তাহা বলা যায় না। মহাক্ষপটলিক আয়ব্যয়হিসাব-বিভাগের কর্তা। মহাসর্বাধিকৃত কি কাজ করিতেন এবং কোন্ বিভাগের কর্তা ছিলেন বলা কঠিন; তবে, মধ্যযুগের এবং সাম্প্রতিক কালের সর্বাধিকারী পদবীটি এই রাজপদের স্মৃতি বহন করে। রাজস্থানীয় স্বয়ং রাজাধিরাজ-নিযুক্ত উচ্চ রাজকর্মচারী, রাজপ্রতিনিধি। ইঁহারা সকলেই রাষ্ট্রযন্ত্রে এক একটি প্রধান বিভাগের সর্বময় কর্তা, রাজা এবং রাষ্ট্রের এক এক বিভাগীয় মন্ত্রী বা সাধারণভাবে কোনো কোনো বিশেষ বিশেষ কাজের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। রাজধানীতে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের প্রধান কেন্দ্রে বসিয়া সেখান হইতে ইঁহারা রাষ্ট্রের বিভিন্ন কর্ম-বিভাগের এবং জনপদ-বিভাগের কার্য পরিচালনা করিতেন।

ইঁহাদের ছাড়া কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রযন্ত্রের আরও কয়েকজন পরিচালক থাকিতেন; তাঁহাদের উপাধি ছিল অধ্যক্ষ, এবং কাজ ছিল রাজকীয় অসামরিক বিভাগের হস্তী, অশ্ব, গর্দভ, খচ্চর, গরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল প্রভৃতি পশুর রক্ষণাবেক্ষণ করা। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে হস্তী, অশ্ব প্রভৃতির অধ্যক্ষের উল্লেখ আছে। এই সব অধ্যক্ষদের দায় ও কর্তব্যের বিবৃতি কৌটিল্য-কথিত বিবৃতিরই অনুরূপ ছিল, সন্দেহ নাই। অধ্যক্ষদের মধ্যে নৌকাধ্যক্ষ বা নাবাধ্যক্ষ এবং বলাধ্যক্ষ নামীয় দুইজন রাজকর্মচারীও ছিলেন; নৌকাধ্যক্ষ রাজকীয় নৌবাহিনীর এবং বলাধ্যক্ষ রাজকীয় পদাতিক সৈন্যবাহিনীর অধ্যক্ষ।

ধর্ম ও ধর্মানুষ্ঠান সংক্রান্ত ব্যাপারেও রাষ্ট্রযন্ত্রের বাহু ক্রমশ বিস্তৃত হইতেছিল। পাল ও চন্দ্র-রাষ্ট্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। বর্ণ-ব্যবস্থা ও লোকাচারিত বর্ণ-বিন্যাস বৌদ্ধ পাল নরপতিরাও যে অব্যাহত রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা অন্যত্র বলিয়াছি। ধর্ম ও ধর্মানুষ্ঠান ব্যাপার সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য পাল এবং চন্দ্র রাষ্ট্রযন্ত্রে কয়েকজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী নিযুক্ত হইতেন; সম্ভবত ইঁহারা কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন। নরপতিদের ব্যক্তিগত ও বংশগত ধর্ম যাহাই হউক না কেন, পাল ও চন্দ্র-রাজারা তাঁহাদের ব্যক্তিগত ধর্মমত দ্বারা রাষ্ট্রকে প্রভাবান্বিত হইতে দেন নাই। তাহা

হইলে বংশানুক্রমিক ভাবে দুই দুইটি গোঁড়া ব্রাহ্মণ-পরিবার বহুকাল ধরিয়া পালরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রীর কাজ করিতে পারিতেন না। তাঁহারা যে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য উভয় ধর্মেরই পোষকতা করিতেন এ-সম্বন্ধে সুপ্রচুর লিপিপ্রমাণ এবং তিব্বতী গ্রন্থের সাক্ষ্য বিদ্যমান। এই যুগে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মে সামাজিক পার্থক্য বিশেষ কিছু ছিলও না। দেবপাল বীরদেবকে নালন্দা মহাবিহারে প্রধান আচার্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন; এই সাক্ষ্য হইতে এবং বিভিন্ন মহাবিহার স ক্রান্ত বিচিত্র ও বিস্তৃত তিব্বতী সাক্ষ্য হইতে মনে হয়, ধর্ম ও শিক্ষা ব্যাপারেও পাল-রাষ্ট্রযন্ত্র সক্রিয় ছিল। চন্দ্র-রাজাদের লিপিতে শান্তিবারিক ঔপধিক এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু ইঁহারা বোধ হয় তখনও রাজকর্মচারী হইয়া উঠেন নাই। কম্বোজরাজ জয়পালের ইর্দা পট্টোলীতেই সর্বপ্রথম ঋত্বিক, ধর্মজ্ঞ ও পুরোহিতের সাক্ষাৎ পাইতেছি রাজকর্মচারীরূপে।

পাল ও চন্দ্র লিপিমালায় রাজপুরুষদের সুদীর্ঘ তালিকা দেওয়া আছে। এই রাজপুরুষেরা কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক রাষ্ট্রযন্ত্রের নানা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, সন্দেহ নাই। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, কতকটা নিঃসংশয় ভাবে এমন যাঁহাদের কথা বলা চলে তাঁহাদের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। অন্য আরও অনেকে ছিলেন যাঁহাদের সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না; ইঁহারা অনেকেই কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু, কেহ কেহ স্থানীয় রাষ্ট্রযন্ত্রের কর্মচারী ছিলেন, তাহাও সমান নিঃসন্দেহ। ইঁহাদের সকলের কথা বলিবার আগে পাল ও চন্দ্র রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় জনপদ-বিভাগের কথা বলিয়া লইতে হয়।

বিভিন্ন রাষ্ট্র-বিভাগ

পূর্বতন রাষ্ট্রযন্ত্রে যেমন, এই পর্বেও রাষ্ট্রের প্রধান বিভাগের নাম ভুক্তি। বাঙলাদেশে পালরাষ্ট্রের তিনটি ভুক্তি-বিভাগের খবর লিপিমালা হইতে জানা যায়। বৃহত্তম ভুক্তি, পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তি এবং তাহার পরই বর্ধমান-ভুক্তি ও দণ্ড-ভুক্তি; বর্তমান বিহারে দুইটি, তীর-ভুক্তি (তিরহুত) এবং শ্রীনগর-ভুক্তি; বর্তমান আসামে একটি, প্রাগ্জ্যোতিষ-ভুক্তি। ভুক্তির শাসনকর্তার নাম উপরিক। এই উপরিক কখনো কখনো রাজস্থানীয়-উপরিক, অর্থাৎ তিনি শুধু ভুক্তির শাসনকর্তা নহেন, রাজপ্রতিনিধিও বটে। পূর্ব পর্বে কোটালিপাড়ার একটি লিপিতে দেখিয়াছি, অন্তরঙ্গ বা রাজবৈদ্য কখনও কখনও ভুক্তির উপরিক নিযুক্ত হইতেন। ঈশ্বরঘোষের রামগঞ্জ লিপিতে ভুক্তির শাসনকর্তাকে বলা হইয়াছে ভুক্তিপতি।

ভুক্তির নিম্নতর বিভাগ মণ্ডল না বিষয় তাহা লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায়; সাক্ষ্যও পরস্পর বিরোধী। খালিমপুর লিপির মহান্তপ্রকাশ-বিষয় ব্যাঘ্রতটী মণ্ডলভুক্ত; এই লিপিরই আম্রষণ্ডিকা-মণ্ডল (উদ্রগ্রাম-মণ্ডলের সীমাবর্তী) পালীকট-

বিষয়ের অন্তর্গত ; মুঙ্গের লিপির ক্রিমিল-বিষয় শ্রীনগর-ভুক্তির অন্তর্গত ; বাণগড়লিপির গোকালকা-মণ্ডল কোটিবর্ষ-বিষয়ের অন্তর্গত ; বাণগড়, মনহলি ও আমগাছি লিপির কোটিবর্ষ-বিষয় পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির অন্তর্গত (দ্বিতীয় লিপিটিতে মণ্ডলের উল্লেখই নাই); কমৌলিলিপির কামরূপ মণ্ডল প্রাগ্জ্যোতিষ ভুক্তির অন্তর্গত, মন্দরাগ্রাম বড়া-বিষয়ের অন্তর্গত ; মনহলি-লিপির হলাবর্ত-মণ্ডল কোটিবর্ষ-বিষয়ের অন্তর্গত ; ভাগলপুর লিপির কক্ষ-বিষয় তীরভুক্তির অন্তর্গত, এবং সেই বিষয়েরই অন্তর্গত মুকুতিগ্রাম, ইত্যাদি। এই সাক্ষ্যে দেখা যাইতেছে, ভুক্তির নিম্নতর বিভাগ কোথাও মণ্ডল, কোথাও বিষয়। চন্দ্র-রাষ্ট্রে কিন্তু বিষয়ই বৃহত্তর বিভাগ এবং মণ্ডল বিষয়ের অন্তর্গত বলিয়া মনে হইতেছে। শ্রীচন্দ্রের রামপাল-লিপির নাব্য-মণ্ডল সোজাসুজি পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির অন্তর্গত, কিন্তু ঐ রাজারই ধুল্লা লিপির বল্লীমুণ্ডা-মণ্ডল খেদিরবল্লী বিষয়ের এবং যোলামণ্ডল ইক্কড়াসী-বিষয়ের অন্তর্গত, এবং উভয় বিষয়ই পৌণ্ড্র ভুক্তির অন্তর্গত। ইদিলপুর লিপিতেও দেখিতেছি, কুমারতালক-মণ্ডল সতটপদ্মাবতী-বিষয়ের অন্তর্গত। জয়পালের ইর্দালিপির দণ্ডভুক্তি-মণ্ডল বর্ধমান ভুক্তির অন্তর্গত। দণ্ডভুক্তি বোধ হয় ভুক্তি-বিভাগই ছিল, কিন্তু কম্বোজবংশের অধিকারের পর মণ্ডল-বিভাগে রূপান্তরিত হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে শশাঙ্কের মেদিনীপুরের একটি লিপিতে দণ্ডভুক্তি-দেশ নামে জনপদের উল্লেখ স্মর্তব্য। মনে হয়, ব্যতিক্রম যাহাই থাকুক, বিষয়ই ছিল ভুক্তির অব্যবহিত নিম্নবর্তী রাষ্ট্র-বিভাগ, এবং মণ্ডল বিষয়ের নিম্নবর্তী বিভাগ। বিষয়ের শাসনকর্তার পদোপাধি ছিল বিষয়পতি। গুপ্ত-আমলের কোনো কোনো লিপিতে বিষয়ের শাসনকর্তাকে আয়ুক্তক বলা হইয়াছে ; অন্য দুই একটি লিপিতে কিন্তু আয়ুক্তক বলিতে ভুক্তি বা বিষয়ের উচ্চ কর্মচারী বলিয়া মনে হয়। পাল-আমলের লিপিগুলিতে তদায়ুক্তক এবং বিনিয়ুক্তক পদোপাধিবিশিষ্ট দুইটি রাজকর্মচারীর খবর পাওয়া যায়। ইঁহারা বোধ হয় ভুক্তি ও বিষয় শাসন-সংপৃক্ত উচ্চ রাজকর্মচারী। মণ্ডলের শাসনকর্তার নাম খুব সম্ভব ছিল মণ্ডলাধিপতি (বা মাণ্ডলিক); নালন্দা-লিপিতে আছে, ব্যাঘ্রতটী-মণ্ডলাধি-পতি বলবর্মণ দেবপালের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলেন। শ্রীচন্দ্রের রামপাল-লিপিতেও মণ্ডল-শাসনকর্তার পদোপাধি মণ্ডলপতি।

বাঙলার কোনো পাল-লিপিতে কিংবা চন্দ্রদের কোনও লিপিতে বীথী-বিভাগের কোনো উল্লেখ নাই, কিন্তু বিহারে প্রাপ্ত অন্তত দুইটি লিপিতে আছে। ধর্মপালের নালন্দা লিপির জম্বুনদী-বীথী ছিল গয়া-বিষয়ের অন্তর্গত। বীথীর শাসনকর্তার পদোপাধি কিছু জানা যাইতেছে না। কম্বোজ-বর্মণ-সেন আমলে বাংলাদেশে বীথী-রাষ্ট্রবিভাগের সাক্ষাৎ মেলে ; পাল-পূর্বযুগেও বীথী-বিভাগের প্রমাণ বিদ্যমান ; এই জন্য মনে হয়, পাল এবং চন্দ্র-রাষ্ট্রেও বীথী রাষ্ট্রবিভাগ প্রচলিত ছিল, লিপিগুলিতে উল্লেখ পাইতেছি না মাত্র।

এই সব ভুক্তি, বিষয়, মণ্ডল বা বীথীর অধিকরণ ছিল কিনা, থাকিলে তাহাদের গঠনই বা কিরূপ ছিল, তাহা জানিবার কোনো উপায়ই লিপিগুলিতে বা অন্যত্র কোথাও নাই। ভুক্তি, বিষয়, মণ্ডল, বীথী প্রভৃতি রাষ্ট্রযন্ত্রের শাসনকার্য কি ভাবে পরিচালিত হইত, পূর্ব যুগের মত জনসাধারণের কোনো দায় ও অধিকার এ-ব্যাপারে ছিল কিনা, তাহাও জানা যাইতেছে না। তবে, খালিমপুর লিপিতে একটু ইঙ্গিত যাহা পাওয়া যাইতেছে তাহা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই লিপিতে জ্যেষ্ঠ-কায়স্থ, মহা-মহত্তর, মহত্তর এবং দাশগ্রামিক—ইঁহাদের বলা হইয়াছে "বিষয়ব্যবহারী"। অনুমান হয়, ইঁহারা সকলেই বিষয়ের শাসনকার্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। জ্যেষ্ঠ-কায়স্থ, মহা-মহত্তর ও মহত্তরেরা তো পূর্ব পর্বেও বিষয়াধিকরণের সঙ্গে যুক্ত থাকিতেন দাশগ্রামিক দশটি গ্রামের কর্তা ; পদাধিকারীর উল্লেখ হইতে মনে হয়, বিষয়ের অধীনে দশ দশটি গ্রামের এক একটি উপবিভাগ থাকিত, এবং দাশগ্রামিক ছিলেন এক একটি উপবিভাগের শাসনকর্ম-পর্যবেক্ষক।

রাষ্ট্রের নিম্নতম বিভাগ এই পর্বে গ্রাম, এবং গ্রামের স্থানীয় শাসনকার্যের ভার-প্রাপ্ত কর্মচারীর নাম গ্রামপতি ; তিনিও অন্যতম রাজপুরুষ। ভূমি-দানের বিজ্ঞপ্তি-তালিকায় গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে সাক্ষাৎ পাইতেছি করণ, প্রতিবাসী, ক্ষেত্রকর, কুটুম্ব, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া মেদ, অন্ধ্র ও চণ্ডাল পর্যন্ত সমস্ত লোকদের। কম্বোজ-রাজ জয়পাল ইর্দা-পট্টোলীতে ইঁহাদের সঙ্গে স্থানীয় ব্যবহারী(ব্যবসায়ী-ব্যাপারী)দের উল্লেখও পাইতেছি।

ইর্দা-পট্টোলীতে প্রাদেষ্টৃ নামে এক শ্রেণীর রাজপুরুষের উল্লেখ আছে। এই রাজপুরুষটির উল্লেখ বাঙলাদেশের আর কোনো লিপিতেই দেখা যায় না, অথচ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের মতে ইঁনি কর-সংগ্রহ, শান্তিরক্ষা ইত্যাদি সংপৃক্ত শাসনব্যাপারের নিয়ামক উচ্চ রাজকর্মচারী। ইর্দা-পট্টোলীতে মহিষী, যুবরাজ, মন্ত্রী, পুরোহিত ইত্যাদির সঙ্গে প্রাদেষ্টৃর উল্লেখ হইতে মনে হয়, কম্বোজ-রাষ্ট্রেও এই পদাধিকারী উচ্চ রাজকর্মচারী বলিয়া বিবেচিত হইতেন। ইর্দা-পট্টোলীর রাষ্ট্রযন্ত্র-সংবাদ অন্যদিক হইতেও উল্লেখযোগ্য। এই লিপির রাজপুরুষদের তালিকায় দেখিতেছি, করণসহ অধ্যক্ষবর্গের উল্লেখ, সৈনিক-সংঘমুখ্যসহ সেনাপতির উল্লেখ, গূঢ়পুরুষ এবং মন্ত্রপালসহ দূতের উল্লেখ। এই সব উল্লেখ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, কম্বোজ-রাষ্ট্রযন্ত্রের বহু বিভাগ বিদ্যমান ছিল, এবং প্রত্যেক বিভাগের একজন করিয়া অধ্যক্ষ থাকিতেন। প্রত্যেক অধ্যক্ষের অধীনে বহু করণ (=কেরাণী কর্মচারী) থাকিতেন। যুদ্ধবিগ্রহ-বিভাগ ছিল সেনাপতির অধীনে, এবং তাঁহার অধীনে ছিলেন সৈনিক-সংঘের প্রধান কর্মচারীরা। পররাষ্ট্র-বিভাগের কর্তা ছিলেন দূত ; এই বিভাগের বোধ হয় দুই উপবিভাগ। একটি উপবিভাগে মন্ত্রপালেরা, আর একটিতে গূঢ়পুরুষেরা। মন্ত্রপালেরা সাধারণভাবে পররাষ্ট্র-ব্যাপারে দূতকে মন্ত্রণা দান

করিতেন ; গূঢ়পুরুষেরা গোপনীয় সংবাদ সরবরাহ করিতেন। এই সব বিভাগীয় বর্ণনা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের রাষ্ট্রযন্ত্র বিভাগ-বর্ণনার সঙ্গে প্রায় স্পষ্ট মিলিয়া যাইতেছে। পাল-লিপিতে নৌকাধ্যক্ষ, গো, মহিষ, উষ্ট্র, অজ, অশ্ব, হস্তী, গর্দভ ইত্যাদির অসামরিক অধ্যক্ষদের কথা উল্লেখের আগেই বলিয়াছি। চন্দ্র-বংশীয় লিপিতেও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রোক্ত 'অধ্যক্ষ-প্রচার'-অধ্যায়ের উল্লেখ দেখিতেছি। বাঙলার সমসাময়িক রাষ্ট্র-বিন্যাসে কৌটিল্য-রাষ্ট্রনীতির প্রভাব অনস্বীকার্য। ইহা হইতে এই অনুমানও করা চলে, পাল ও চন্দ্র-রাষ্ট্রযন্ত্র কম্বোজ-রাষ্ট্রযন্ত্রের মতনই বিভিন্ন বিভাগ ও উপবিভাগে বিভক্ত ছিল। এই দুই রাজবংশের লিপিমালায় যে-সব রাজপুরুষদের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতেও এই অনুমান সমর্থিত হয়। সুনির্দিষ্ট ভাবে বলিবার উপায় নাই, তবে, মোটামুটি ভাবে নিম্নলিখিত বিভাগগুলি কতকটা সুস্পষ্ট।

(ক) বিচার-বিভাগ। এই বিভাগের ঊর্ধতন কর্মচারী মহাদণ্ডনায়ক। বৈদ্যদেবের কমৌলি লিপিতে জনৈক কোবিদ (পণ্ডিত) গোবিন্দকে বলা হইয়াছে ধর্মাধিকার (ধর্মাধিকারার্পিত)। দেবপালের নালন্দা লিপিটিই উল্লিখিত হইয়াছে ধর্মাধিকার বলিয়া ; কি অর্থে এই শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে, বলা কঠিন। তবে, কমৌলি-লিপিকথিত গোবিন্দ যে বিচার-বিভাগেরই উচ্চ রাজকর্মচারী, এ-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কম। মহাদণ্ডনায়কের পরেই দণ্ডনায়ক। দাশাপরাধিকও এই বিভাগের কর্মচারী বলিয়া মনে হইতেছে ; স্মৃতিশাস্ত্র-কথিত দশ প্রকার অপরাধের বিচার ইনি করিতেন, এবং অপরাধ প্রমাণিত হইলে অর্থদণ্ড আদায় করিতেন।

(খ) রাজস্ববিভাগ। আয়বিভাগের সর্বাধ্যক্ষ কে ছিলেন বলা কঠিন ; কোনো পদোপাধিতে তাঁহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। রাষ্ট্রের অর্থাগমের নানা উপায় ছিল। প্রথম এবং প্রধান উপায় কর। কর ছিল নানা প্রকারের ; প্রধানত পাঁচ প্রকার করের উল্লেখ লিপিগুলিতে পাওয়া যায়—ভাগ, ভোগ, কর, হিরণ্য এবং উপরিকর। অন্যত্র এই সব করের উল্লেখ ও ব্যাখ্যা করিয়াছি। উপরিক, বিষয়পতি, মণ্ডলপতি, দাশগ্রামিক এবং গ্রামপতির রাষ্ট্রযন্ত্রের সাহায্যে এই সব কর আদায় করা হইত। ভোগ-কর আদায়-বিভাগের যিনি সর্বময় কর্তা ছিলেন তাঁহার পদোপাধি ছিল ভোগপতি। পূর্ব পর্বের মল্লসারুল লিপিতে মহাভোগিক নামে এক রাজপুরুষের উল্লেখ আমরা দেখিয়াছি ; তিনি ভোগ-কর আদায় বিভাগের উচ্চতম কর্তা, সন্দেহ নাই। ষষ্ঠাধিকৃত নামে একটি রাজপুরুষের উল্লেখ পাল-লিপিতে দেখা যায়। রাজা ছিলেন ষষ্ঠাধিকারী, অর্থাৎ প্রজার শস্যের বা শস্যলব্ধ আয়ের একষষ্ঠ অংশের প্রাপক। এই একষষ্ঠ অংশ আদায়-বিভাগের যিনি কর্তা তিনিই ষষ্ঠাধিকৃত। খেয়া পারাপার ঘাট হইতে রাষ্ট্রের একটা আয় হইত ; এই আয়-সংগ্রহের যিনি কর্তা তিনি তরিক। দেবপালের লিপিতে তরিক ও তরপতি দুয়েরই উল্লেখ আছে। তরপতি বা তরপতিক বোধ হয় পারাপার ঘাটের পর্যবেক্ষক।

ব্যবসা-বাণিজ্য সংপৃক্ত শুল্ক আদায়-বিভাগের কর্তার পদোপাধি ছিল শৌল্কিক। দশ প্রকার অপরাধের বিচার ও অর্থদণ্ড আদায়-বিভাগের কর্তা হইতেছেন দাশাপরাধিক। চোর-ডাকাতদের হাত হইতে প্রজাদের রক্ষার দায়িত্ব ছিল রাষ্ট্রের ; সেই জন্য রাষ্ট্র প্রজাদের নিকট হইতে একটা কর আদায় করিতেন। যে-বিভাগের উপর এই কর আদায়ের ভার তাহার কর্তার পদোপাধি চৌরোদ্ধরণিক। কৌটিল্যের মতে বনজঙ্গল ছিল রাষ্ট্রের সম্পত্তি ; সুতরাং আয়ের এই অন্যতম উপায় যে-বিভাগ হইতে সংগৃহীত হইত সেই বিভাগীয় কর্তার নাম গৌল্মিক। অথবা, গৌল্মিক সৈন্যঘাঁটিতে বা শান্তি-রক্ষকদের ঘাঁটিতে দেয় শুল্ক-কর আদায়-বিভাগের কর্তাও হইতে পারেন। পিণ্ডক নামেও একপ্রকার করের উল্লেখ অন্তত একটি পাল-লিপিতে দেখা যায় (খালিমপুর লিপি)।

(গ) আয়ব্যয়-হিসাব-বিভাগ। এই বিভাগের সর্বময় কর্তা বোধ হয় ছিলেন মহাক্ষপটলিক।

জ্যেষ্ঠকায়স্থ বোধ হয় একজন উচ্চ রাজকর্মচারী। এই পর্বে পুস্তপালের উল্লেখ দেখিতেছি না। রাজকীয় দলিলপত্র বোধ হয় জ্যেষ্ঠকায়স্থের তত্ত্বাবধানেই থাকিত। ভূমি-সংপৃক্ত দলিলপত্র থাকিত কৃষি-বিভাগের দপ্তরে।

(ঘ) ভূমি ও কৃষি-বিভাগ। এই বিভাগের কয়েকজন কর্মচারীর নাম লিপিগুলিতে পাওয়া যায়। ক্ষেত্রপ ছিলেন কৃষ্ট ও কৃষিযোগ্য ভূমির সর্বোচ্চ হিসাবরক্ষক ও পর্যবেক্ষক। প্রমাতৃ ভূমির মাপজোখ্‌,ভূমি জরীপ ইত্যাদির বিভাগীয় কর্তা। কেহ কেহ অবশ্য মনে করেন, প্রমাতৃ বিচার-বিভাগীয় কর্মচারী ; তিনি বিচারকার্যে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিতেন। পাল ও সেন লিপিগুলিতে, বিশেষভাবে সেন লিপিগুলিতে, ভূমির মাপ ও সীমা নির্ধারণে, আয়োৎপত্তি নির্ধারণে যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসাবের উল্লেখ আছে, তাহাতে এ-তথ্য অনস্বীকার্য যে, ভূমি মাপজোখ্‌-জরিপ সংক্রান্ত একটি সুবিস্তৃত ও সুপরিচালিত বিভাগ বর্তমান ছিল। গুপ্ত-আমলের পুস্তপাল-বিভাগ হইতেও এই অনুমান কতকটা করা চলে।

(ঙ) পররাষ্ট্র-বিভাগ—এই বিভাগের আভাসোল্লেখ কম্বোজরাজ নয়পালের ইর্দালিপিতে পাওয়া যায়, এবং তাহার ব্যাখ্যা আগেই করা হইয়াছে। এই বিভাগের ঊর্ধতম কর্মচারী ছিলেন দূত ; তাঁহার অধীনে মন্ত্রপাল ও গূঢ়পুরুষবর্গ। সর্বোচ্চ ভারপ্রাপ্ত রাজপুরুষ বোধ হয় ছিলেন মহাসান্ধিবিগ্রহিক।

(চ) শান্তিরক্ষা-বিভাগ। এই বিভাগের অনেক রাজপুরুষের উল্লেখ লিপিগুলিতে পাওয়া যাইতেছে। মহাপ্রতীহার সম্ভবত রাজপ্রাসাদের এবং রাজধানীর রক্ষাবেক্ষক। দাণ্ডিক, দাণ্ডপাশিক (দণ্ড এবং পাশ-রজ্জু), দণ্ডশক্তি, সকলেই এই বিভাগের কর্মচারী। খোল খুব সম্ভব এই বিভাগের গুপ্তচর (খোল শব্দের আভিধানিক অর্থ খোঁড়া ; অর্ধমাগধী অভিধান মতে গুপ্তচর)। কাহারো কাহারো মতে চৌরোদ্ধরণিকও এই

বিভাগেরই উচ্চ কর্মচারী। অঙ্গরক্ষ (দেহরক্ষক)কেও এই বিভাগের কর্মচারী বলা যাইতে পারে। চট্টভট্ট বা চাটভাটরাও এই বিভাগেরই নিম্নস্তরের কর্মচারী, সন্দেহ নাই।

(ছ) সৈন্য-বিভাগ। এই বিভাগের উর্ধতম রাজপুরুষের পদোপাধি মহাসেনাপতি, এবং তাঁহার নীচেই সেনাপতি। হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক এই চতুরঙ্গ বল ছাড়া পাল রাষ্ট্রের বোধ হয় নৌবলও ছিল, এবং এই পাঁচটি বলের প্রত্যেকটির একজন ভারপ্রাপ্ত ব্যাপৃতক বা অধ্যক্ষ থাকিতেন। পদাতিক সেনার কর্তা বলাধ্যক্ষ; নৌবলের কর্তা নৌকাধ্যক্ষ বা নাবাধ্যক্ষ। উষ্ট্রবলও ছিল, এবং তাহারও একজন ব্যাপৃতক ছিলেন। সৈন্যবাহিনীতে বোধ হয় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের লোকেরাও যোগদান করিতেন। গৌড়-সৈন্যেরা তো ছিলেনই; তাহা ছাড়া লিপিগুলিতে মালব-খস-হূণ-কুলিক-কর্ণাট-লাট-চোড় প্রভৃতি যে-সব ভিন্‌দেশি বোমের লোকদের উল্লেখ আছে তাঁহারা যে রাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনীর বেতনভুক্ সেনা, এ-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কম। কোট্টপাল দুর্গাধিকারী-দুর্গরক্ষক; প্রান্তপাল রাজ্যসীমা রক্ষক; মহাব্যূহপতি যুদ্ধকালে ব্যূহ-রচনার কর্তা। ইঁহাদের সকলেরই সাক্ষাৎ মিলিতেছে এবং ইঁহারা সকলেই যে সৈন্য-বিভাগের উচ্চ রাজকর্মচারী এ-সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

এ-পর্যন্ত যে-সব রাজপুরুষদের উল্লেখ করা হইয়াছে তাঁহারা ছাড়া পাল, চন্দ্র ও কম্বোজবংশীয় লিপিগুলিতে আরও কয়েকজন রাজপুরুষের পদোপাধির পরিচয় পাওয়া যায়; যেমন, অভিত্বরমান, গমাগমিক, দূতপ্রৈষনিক, খণ্ডরক্ষ, স(শো)রভঙ্গ, ইত্যাদি। ব্যুৎপত্তিগত অর্থে অভিত্বরমান যে দ্রুত যাতায়াত করে; গমাগমিক অর্থও যাতায়াতকারী। ইহারা উভয়েই যে এক শ্রেণীর সংবাদবাহী বা রাজকীয় দলিলপত্রবাহী দূত এই অনুমান মিথ্যা না-ও হইতে পারে। শান্তিরক্ষা, পররাষ্ট্র অথবা সৈন্য-বিভাগের সঙ্গে হয়তো ইঁহারা যুক্ত ছিলেন, অথবা সাধারণ রাষ্ট্রকর্মেও হয়তো ইঁহাদের প্রয়োজন হইত। তবে, খুব সম্ভব ইঁহারা উচ্চশ্রেণীর রাজকর্মচারী ছিলেন না। দূত-প্রৈষণিক দুইটি পৃথক শব্দ হইতে পারে, আবার এক শব্দও হইতে পারে। প্রৈষণিক অর্থ যিনি প্রেরণ করেন; দূত-প্রৈষণিক অর্থ যিনি দূত প্রেরণ করেন, অথবা দূতের সংবাদবাহী। ইনি যিনিই হউন, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র বা পররাষ্ট্র-বিভাগের সঙ্গেই ইঁহার যোগ। খণ্ডরক্ষ অর্ধমাগধী অভিধান মতে শান্তিরক্ষা-বিভাগের অধ্যক্ষ অথবা শুল্ক-পরীক্ষক; কাহারো কাহারো মতে ইনি সৈন্য-বিভাগের কর্মচারী। আবার, কেহ কেহ মনে করেন, ইনি পূর্ত-বিভাগের কর্মচারী, সংস্কার কার্যাদির পরীক্ষক (খণ্ড-ফুট্ট-সংস্কার)। পরবর্তী পর্বের ঈশ্বরঘোষের রামগঞ্জ লিপিতে খণ্ডপাল নামে এক রাজপুরুষের উল্লেখ আছে; খণ্ডপাল ও খণ্ডরক্ষক সমার্থক বলিয়াই তো মনে হইতেছে। স(শ)রভঙ্গ বলিতে কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন, তীরধনুধারী সৈন্যবর্গের অধ্যক্ষ; আবার কেহ কেহ

বলেন শরভঙ্গ ছিলেন রাজার মৃগয়ার সঙ্গী, বিনি রাজার তীরধনু ইত্যাদি রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। ইঁহারা কেহই উচ্চ রাজকর্মচারী নহেন, এমন অনুমান কতকটা করা যায়।

পাল ও সমসাময়িক অন্যান্য রাষ্ট্রযন্ত্রের যে সংক্ষিপ্ত কাঠামোর মোটামুটি পরিচয় দেওয়া হইল তাহা হইতেই বুঝা যাইবে, এই যুগে রাষ্ট্রের আমলাতন্ত্র পূর্ব পর্বাপেক্ষা অনেক বেশি বিস্তার ও স্ফীতি লাভ করিয়াছে। স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের সচেতন মর্যাদা ও প্রয়োজনবোধে এই বিস্তার ও স্ফীতি ব্যাখ্যা করা যায়; তাহা ছাড়া, পাল পর্বে যে সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার প্রয়োজনেও কোনো কোনো বিভাগে আমলাতন্ত্রের বিস্তৃতির প্রয়োজন হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমলাতন্ত্রের বিস্তৃতি, রাষ্ট্রযন্ত্রের স্ফীতি ও সূক্ষ্মতর বিভাগ সৃষ্টির অর্থই হইতেছে, রাষ্ট্রের বাহু সমাজের সর্বদেহে বিস্তৃত করা। পাল-পর্বে তাহারই সূচনা দেখা দিয়াছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রযন্ত্রের পরিচালনায় জনসাধারণের প্রতিনিধিদের দায় ও অধিকার খর্বীকৃত হইয়াছে। গ্রাম্য স্থানীয় শাসনকার্য ছাড়া আর যে কোথাও এই সব প্রতিনিধিদের কোনো প্রভাব ছিল, মনে হইতেছেনা। বিষয়-শাসনের ব্যাপারে জ্যেষ্ঠকায়স্থ, মহা-মহত্তর, মহত্তর, এবং দাশগ্রামিক প্রভৃতি বিষয়-ব্যবহারীর উল্লেখ পাইতেছি, সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠকায়স্থ ও দাশগ্রামিক উভয়েই রাজপুরুষ। পূর্ব পর্বে যে-ভাবে স্থানীয় রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে স্থানীয় জন-প্রতিনিধিদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ লক্ষ্য করা যায়, এ-পর্বে তাহা নাই বলিলেই চলে। বস্তুত, সমাজ-বিন্যাসের বৃহৎ একটা অংশের দায়িত্ব ও অধিকার এই পর্বে রাষ্ট্রের কুক্ষিগত হইয়া পড়িয়াছে। আমলাতন্ত্রের বাহু-বিস্তৃতিই তাহার কারণ; জনসাধারণও সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্যুত হইয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। গ্রামবাসী মহত্তর, ব্রাহ্মণ, কুটুম্ব, ক্ষেত্রকর, মেদ, অন্ধ্র, চণ্ডাল পর্যন্ত ভূমিদানের বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তিতেই ইঁহাদের রাষ্ট্রীয় অধিকারের পরিসমাপ্তি; আর কোনো অধিকারের উল্লেখ নাই।

৭

সেন-পর্ব

সেন-পর্বে সেন-বর্মণ ও অন্যান্য ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের রাষ্ট্রযন্ত্র সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু বলিবার নাই। এই সব রাষ্ট্রযন্ত্রে মোটামুটি পাল-পর্বের রাষ্ট্রযন্ত্রের আদর্শই স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল; রাষ্ট্র-বিন্যাসের আকৃতি-প্রকৃতিও মোটামুটি একই প্রকার। তবে, এই পর্বে আমলাতন্ত্র আরও বিস্তৃত হইয়াছে, আরও স্ফীত হইয়াছে। রাজা ও রাজপরিবারের মর্যাদা,

মহিমা ও আড়ম্বর আরও বাড়িয়াছে ; রাষ্ট্রযন্ত্রের একাংশে ব্রাহ্মণ ও পুরোহিততন্ত্র জাঁকাইয়া বসিয়াছে। রাষ্ট্রযন্ত্রবিভাগ বৃহত্তর গ্রামগুলিকেও বিভক্ত করিয়া একেবারে পাটক বা পাড়া পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে, অর্থাৎ রাষ্ট্রযন্ত্রের সুদীর্ঘ বাহু জনপদের ও জনসাধারণের শেষসীমা পর্যন্ত পৌঁছিয়া গিয়াছে ; ছোটবড় রাজপদের সংখ্যা বাড়িয়াছে, নূতন নূতন পদের সৃষ্টি হইয়াছে, বড় পদগুলির মহিমা ও মর্যাদা বাড়িয়া গিয়াছে। অথচ, সেন বা বর্মণ বা অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের রাজ্য-পরিধি পাল ও চন্দ্রবংশের রাজ্য-পরিধি অপেক্ষা সংকীর্ণতর। ঈশ্বরঘোষের রাজবংশ, দেববংশ, ইঁহারা তো একান্তই স্থানীয় ক্ষুদ্র জনপদ-স্বামী, অথচ ইঁহাদেরও লিপিগুলিতে আমলাতন্ত্রের যে আকৃতি দৃষ্টিগোচর হয়, রাজতন্ত্রের যে প্রকৃতি ধরা পড়ে তাহা অস্বাভাবিক রূপে স্ফীত ও বিস্তৃত।

সেন-রাজারা পাল-রাজাদের রাজোপাধিগুলি তো ব্যবহার করিতেনই উপরন্তু নামের সঙ্গে তাঁহাদের নিজ নিজ বিরুদও ব্যবহার করিতেন। বিজয়সেন, বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেন, বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেনের বিরুদ যথাক্রমে ছিল অরিবৃষভ-শঙ্কর, অরিরাজ নিঃশঙ্ক-শঙ্কর, অরিরাজ মদন-শঙ্কর, অরিরাজ বৃষভাঙ্ক-শঙ্কর এবং অরিরাজ অসহ্য-শঙ্কর। তাহার উপর, একেবারে শেষ অধ্যায়ের রাজারা আবার এই সব বিরুদের সঙ্গে সঙ্গে অশ্বপতি, গজপতি, নরপতি, রাজত্রয়াধিপতি প্রভৃতি উপাধিও ব্যবহার করিতেন এমন কি দেববংশীয় রাজা দশরথদেবও। সেন ও বর্মণ বংশের, ঈশ্বরঘোষ ও ডোম্মনপালের লিপিগুলিতে রাজ্ঞী ও মহিষীর উল্লেখও পাইতেছি ; ভূমিদানক্রিয়া তাঁহাদেরও বিজ্ঞাপিত হইতেছে। পালবংশের একটি লিপিতেও কিন্তু রাজপুরুষ হিসাবে রাজ্ঞী বা মহিষীর উল্লেখ নাই ; চন্দ্র ও কম্বোজ বংশের লিপিতেই ইঁহাদের প্রথম উল্লেখ দেখা গিয়াছে। ইঁহারা কি হিসাবে রাজপুরুষ ছিলেন, কি ইঁহাদের দায় ও অধিকার ছিল, কিছুই বুঝা যাইতেছে না।

জ্যেষ্ঠ রাজকুমার যুবরাজ হইতেন, এবং সেই হিসাবে রাষ্ট্রকর্মে, সামরিক ব্যাপারে রাজার সহায়কও ছিলেন। মাধাইনগর লিপিতে দেখিতেছি, যুবরাজ লক্ষ্মণসেন কোনো কোনো বিজয়ী সমরাভিযানে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিশ্বরূপসেনের সাহিত্য-পরিষৎ-লিপিতে সূর্যসেন এবং পুরুষোত্তমসেন নামে দুই (রাজ)কুমারের উল্লেখ আছে ; এই লিপিতেই আর একজন অনুল্লিখিতনামা কুমারের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইতেছে। ঈশ্বরঘোষের রামগঞ্জ লিপিতে অন্তত তিনজন রাজপুরুষের উল্লেখ পাইতেছি যাঁহারা রাজপ্রাসাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলিয়া মনে হইতেছে। শিরোরক্ষিক বোধহয় রাজার দেহরক্ষক ; অন্তঃপ্রতীহার প্রাসাদের অন্দর-মহলের রক্ষকাবেক্ষক বা প্রতীহার এবং আভ্যন্তরিক রাজপ্রাসাদের ব্যবস্থাপক বলিয়াই মনে হইতেছে। ইঁহাদের ছাড়া অন্তরঙ্গ ঔপধিক রাজবৈদ্যের সাক্ষাৎও পাইতেছি। মহাপাদমূলিক নামে আর একজন রাজপুরুষের উল্লেখ এই লিপিতে আছে। ইনি কি ছিলেন রাজার ব্যক্তিগত অনুচর ?

এই পর্বেও সামন্তরা অত্যন্ত প্রবল এবং সংখ্যায়ও প্রচুর। এক রাণক শূলপাণি বিজয়সেনের দেওপাড়া প্রশস্তি খোদিত করিয়াছিলেন; শূলপাণি ছিলেন "বারেন্দ্রকশিল্পী-গোষ্ঠীচূড়ামণি"। ত্রিপুরার রণবঙ্কমল্ল হরিকালদেবের বংশ, চট্টগ্রাম-ঢাকার দেববংশ, ঈশ্বরঘোষ, ডোম্মনপাল, মুঙ্গেরের গুপ্ত-উপান্ত-নামা এক রাজবংশ—ইঁহারা সকলেই তো সামন্ত-মহাসামন্ত, মহামাণ্ডলিক বংশ ছিলেন; পরে কেহ কেহ স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিয়া মহারাজাধিরাজ হইয়াছিলেন। ঢেক্করীর ঈশ্বরঘোষ যে মহামাণ্ডলিক ছিলেন তাহা রামগঞ্জ-লিপিতেই সপ্রমাণ। ঢেক্করীর এক মণ্ডলাধিপতি রামপালের সামন্তরূপে বরেন্দ্রী পুনরুদ্ধারে সহায়তা করিয়াছিলেন। ঈশ্বরঘোষ, খুব সম্ভব, সেন-রাষ্ট্রেরই অন্যতম সামন্ত ছিলেন। রামগঞ্জ-লিপি পাঠে স্পষ্টতই মনে হয়, এই সব সামন্তরা প্রকৃতপক্ষে নিজ নিজ জনপদে স্বাধীন রাজার মতই আচরণ করিতেন। দেখিয়েছি, পাল ও চন্দ্রবংশীয় স্বাধীন মহারাজাধিরাজদের রাজকীয় লিপিতে যেমন ভূমিদানক্রিয়া রাজা, রাজনক, রাজন্যক, রাণক ইত্যাদি রাজপুরুষকে বিজ্ঞাপিত করা হইয়েছে,মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের লিপিতেও ঠিক তেমনই করা হইয়াছে, অথচ তিনি স্বাধীন রাজা ছিলেন না। বর্মণ ও সেন-লিপিতেও যথারীতি রাজা রাজন্যক, রাণক প্রভৃতির উল্লেখ বিদ্যমান। মহামাণ্ডলিক ঈশ্বরঘোষের রামগঞ্জ-লিপির তালিকায় এমন কি মহাসামন্তেরও উল্লেখ আছে। প্রসিদ্ধ কাব্যসংকলনগ্রন্থ সদুক্তিকর্ণামৃতের সংকলয়িতা কবি শ্রীধরদাস ছিলেন মহামাণ্ডলিক, এবং শ্রীধরের পিতা, লক্ষ্মণসেনের "অনুপমপ্রেমকপাত্রং সখা", শ্রীবটুদাস ছিলেন "প্রতিরাজ মহামাণ্ডলিক মহাসামন্তচূড়ামণি"।

মন্ত্রীবর্গের মধ্যে প্রধান মহামন্ত্রীর সাক্ষাৎ এইপর্বেও পাইতেছি। ভট্ট ভবদেবের পিতামহ আদিদেব এক (চন্দ্রবংশীয় ?) বঙ্গরাজের মহামন্ত্রী ছিলেন। আদিদেব শুধুই মহামন্ত্রী ছিলেন না, তিনি রাজার বিশ্রাম-সচিব, মহাপাত্র এবং সান্ধিবিগ্রহীও ছিলেন। ভট্টভবদেব স্বয়ং বর্মণরাজ হরিবর্মদেবের মন্ত্রশক্তিসচিব ছিলেন, এবং ভবদেবের পরামর্শেই হরিবর্মদেব নাগ ও অন্যান্য রাজাদের পরাজিত করিতে পারিয়াছিলেন। মহামন্ত্রী নামে কোনো পদের উল্লেখ সেন লিপিগুলিতে পাওয়া যাইতেছে না, কিন্তু কোনো কোনো লিপিতে, যেমন কেশবসেনের ইদিলপুর-লিপিতে, মহামহত্তক বা মহামত্তক নামীয় একজন রাজপুরুষের উল্লেখ পাইতেছি। সেন-বংশের ভূমিদান লিপিগুলি সাধারণত মহাসান্ধিবিগ্রহিক দ্বারা অনুমোদিত হইত, এবং সান্ধিবিগ্রহিকেরা সাধারণত লিপিগুলির দূতের কাজ করিতেন। কিন্তু ইদিলপুর-লিপিটির দৌত্য করিয়াছিলেন শ্রীগৌড়মহামহত্তক স্বয়ং এবং লিপিটির এবং লিপিবদ্ধ বিবরণীর শুদ্ধতা পরীক্ষা করিয়া অনুমোদন করিয়াছিলেন তিনজন করণ বা কেরাণী; ইঁহাদের একজন মহামহত্তকের, একজন মহাসান্ধিবিগ্রহিকের, এবং তৃতীয় জন স্বয়ং মহারাজের। মহামহত্তক মনে হইতেছে সেন-রাষ্ট্রের ও রাজার অন্যতম প্রধানমন্ত্রী। অন্যান্য মন্ত্রীও ছিলেন। পূর্বোক্ত ইদিলপুর লিপিতেই দেখিতেছি, শান্ত্যাগারিক...

দ্বারা রাজপাদপদ্ম লালিত হইত (সচিবশতমৌলিলালিতঃ পদাম্বুজ)। ইঁহাদের মধ্যে মহাসান্ধিবিগ্রহিকই ছিলেন প্রধান, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। অন্তত মহারাজাধিরাজের ভূমিদানক্রিয়ার তিনিই যে প্রধান অনুমোদনকর্তা তাহা তো একাধিক লিপিতে সুস্পষ্ট। লক্ষ্মণসেনের আনুলিয়া লিপির দূত ছিলেন সান্ধিবিগ্রহিক নারায়ণদত্ত, এবং মহারাজের দানক্রিয়া অনুমোদন করিয়াছিলেন মহাসান্ধিবিগ্রহিক। মহাসান্ধিবিগ্রহিকেরাই অধিকাংশ সেন-ভূমিদানলিপির দূত। বস্তুত, এই পর্বে মহাসান্ধিবিগ্রহিক এবং তাঁহার সহকারী সান্ধিবিগ্রহিকেরাই সেন-কেন্দ্রীয়-রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান কর্মচারী এবং রাজার প্রধান সহায়ক বলিয়া মনে হইতেছে। আদিদেব এবং ভট্ট ভবদেব দুইজনই যথাক্রমে বঙ্গ এবং বর্মণ-রাষ্ট্রের সান্ধিবিগ্রহিক ; অধিকন্তু আদিদেব ছিলেন মহামন্ত্রী। লক্ষ্মণসেনের ভাওয়াল-লিপিকথিত শঙ্করধর শুধু গৌড়রাষ্ট্রের মহাসান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন না, শতমন্ত্রীর প্রধান প্রভুও ছিলেন। নানা রাষ্ট্রকর্মে নিযুক্ত অন্যান্য প্রধান মন্ত্রীদের মধ্যে বৃহদুপরিক, মহাভৌগিক বা মহাভোগপতি, মহাধর্মাধ্যক্ষ, মহাসেনাপতি, মহাগণস্থ, মহামুদ্রাধিকৃত, মহাবলাধিকরণিক, মহাবলাকোষ্ঠিক, মহাকরণাধ্যক্ষ, মহাপুরোহিত, মহাতন্ত্রাধিকৃত ইত্যাদি রাজপুরুষের সাক্ষাৎ পাইতেছি। ইঁহারা যে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের এক এক বিভাগের সর্বাধ্যক্ষ বা প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, সন্দেহ নাই। মহাকার্তাকৃতিকের উল্লেখ এই পর্বে পাইতেছি না। ডোম্মনপালের সুন্দরবন লিপিতে সপ্ত-অমাত্যের উল্লেখ পাইতেছি ; ইহার অর্থ পরিষ্কার নয়। পাল-পর্বে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের যে-সব অধ্যক্ষের সাক্ষাৎ মিলিয়াছে, এই পর্বেও তাঁহারা বিদ্যমান। চন্দ্রবংশীয় শাসনে যেমন, সেন-বর্মণ লিপিগুলিতেও তেমনই কৌটিল্যের 'অধ্যক্ষ-প্রচার'-অধ্যায়কথিত কর্মচারীবর্গের উল্লেখ আছে।

কম্বোজ-বর্মণ-সেন-রাষ্ট্রযন্ত্রে পুরোহিততন্ত্রের প্রতিপত্তি লক্ষ্যণীয়। পুরোহিত, মহাপুরোহিত, মহাতন্ত্রাধিকৃত, রাজপণ্ডিত, ইঁহারা সকলেই রাজপুরুষ। এই যুগের লিপিগুলিতে শান্তিবারিক, শান্ত্যাগারিক, শান্ত্যাগারাধিকৃত প্রভৃতি পুরোহিতের ছড়াছড়ি ; ইঁহারা রাজপুরুষ ছিলেন কিনা, নিঃসংশয়ে বলা যায় না। তবে, রামগঞ্জ-লিপির ঠক্কুর রাজপুরুষ এবং ঠক্কুর হইতেই যে বর্তমান পদোপাধি ঠাকুর উদ্ভূত, এ-সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহের কারণ নাই। ঠক্কুর বাঙলার বাহিরে কোনো কোনো লিপিতে লেখক বা করণ অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে ; এক্ষেত্রেও তাহা হইয়া থাকিতে পারে।

পালপর্বের মত এ-পর্বেও রাষ্ট্রের প্রধান জনপদ বিভাগগুলির দেখা মিলিতেছে ; ভুক্তিপতির (উপরিকের) শাসনাধীনে ভুক্তি, মণ্ডলপতির শাসনাধীনে মণ্ডল, বিষয়পতির শাসনাধীনে বিষয়। কিন্তু বিষয় বা মণ্ডলের নীচের গ্রাম-সংক্রান্ত স্থানীয় বিভাগ-উপবিভাগের সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে, এবং ক্ষুদ্র বৃহৎ একাধিক নূতন বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে। এই পর্বের লিপিগুলিতে পৌণ্ড্র বা পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তি, বর্ধমান-ভুক্তি এবং কঙ্কগ্রাম-ভুক্তির খবর পাওয়া যাইতেছে। সেন-রাজাদের আমলে পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির সীমা

খুব বাড়িয়া গিয়াছিল ; উত্তর ও দক্ষিণ-বঙ্গের প্রায় সমস্ত জনপদ এবং পূর্ববঙ্গের বৃহৎ একটি অংশ এই ভুক্তি-বিভাগের অন্তর্গত ছিল। পাল-পর্বের বর্ধমান-ভুক্তি লক্ষ্মণসেনের সময় খর্বীকৃত হইয়া দুইটি ভুক্তির সৃষ্টি করিয়াছিল, উত্তরে কঙ্কগ্রাম-ভুক্তি, দক্ষিণে বর্ধমান-ভুক্তি। দণ্ড-ভুক্তির কোনো উল্লেখ এই পর্বে নাই। ভুক্তিপতি বা উপরিকদের একজন উর্ধতন কর্মচারী ছিলেন ; তাঁহার পদোপাধি বৃহদুপরিক, এবং তিনি সম্ভবত কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মহারাজাধিরাজের অন্তরঙ্গ বা রাজবৈদ্য অনেক সময়ই বৃহদুপরিকর্তৃক নিযুক্ত হইতেন ; সেই জন্যই বোধ হয় কতকগুলি লিপিতে অন্তরঙ্গ-বৃহদুপরিক একসঙ্গে একই রাজপুরুষ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

ভুক্তির অব্যবহিত নিম্নতর বিভাগ মণ্ডল না বিষয়, এ-সম্বন্ধে এই পর্বেও নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় নাই। ভোজবর্মণের বেলাব-লিপির উপ্যালিকা গ্রাম কৌশাম্বী অষ্টগচ্ছখণ্ডল সংবদ্ধ অধঃপত্তন-মণ্ডলের অন্তর্গত, এবং এই মণ্ডল পৌণ্ড্রভুক্তির অন্তর্গত। বিজয়সেনের বারাকপুর লিপির ঘাসসম্ভোভট্টবড়া গ্রাম খাড়ি-বিষয়ের অন্তর্গত, এবং খাড়ি-বিষয় পৌণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির অন্তর্গত। নৈহাটী-লিপির বাল্লহিঠ্ঠা গ্রাম স্বল্পদক্ষিণ-বীথীর অন্তর্গত ; এই বীথী বর্ধমান-ভুক্তির উত্তররাঢ়-মণ্ডলান্তঃপাতী। আনুলিয়া লিপির দণ্ডভুমির (মাথরাণ্ডিয়া গ্রামে) মণ্ডলটি পৌণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির অন্তর্গত। গোবিন্দপুর-শাসনের বিড্ডারশাসনগ্রাম বেতড্ড-চতুরকে অবস্থিত, এই চতুরক বর্ধমানভুক্তির পশ্চিম-খাটিকার অন্তর্গত। তর্পণদীঘি-শাসনের বেলহিষ্টী গ্রাম পৌণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির বরেন্দ্রী (মণ্ডলের) অন্তর্গত। মাধাইনগর-লিপির দাপনিয়া-পাটকও বরেন্দ্রী (মণ্ডলের) অন্তর্গত এবং বরেন্দ্রী পৌণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির অন্তর্গত। সুন্দরবন-লিপির মণ্ডলগ্রাম কান্তল্লপুর চতুরকে অবস্থিত, এই চতুরক খাড়িমণ্ডলের অন্তর্গত, এবং খাড়ি-মণ্ডল পৌণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির অন্তর্গত। শক্তিপুর-শাসনের কঙ্কগ্রাম-ভুক্তির মধুগিরি-মণ্ডল কয়েকটি বীথীতে বিভক্ত, তন্মধ্যে দক্ষিণ-বীথী একটি। ইদিলপুর-লিপির তলপড়া-পাটকের এবং মদনাপাড়া-লিপির পিঞ্জোকাষ্ঠি গ্রামের অবস্থিতি বঙ্গে বিক্রমপুর-ভাগে, এবং বঙ্গ পৌণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির অন্তর্গত। বিশ্বরূপসেনের সাহিত্য-পরিষৎ-লিপির রামসিদ্ধি-পাটক এবং বিজয়তিলক-গ্রাম পৌণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির অন্তর্গত বঙ্গের নাব্যভাগে অবস্থিত ; অজিকুল-পাটক মধুক্ষীরক-আবৃত্তির নবসংগ্রহ-চতুরকে অবস্থিত ; দেউলহস্তী (গ্রাম) বঙ্গের অন্তর্গত লাউহণ্ডা-চতুরকে অবস্থিত, এবং ঘাঘরকাট্টি-পাটক চন্দ্রদ্বীপের উরা-চতুরকে অবস্থিত। ঈশ্বরঘোষের রামগঞ্জ-লিপির দিগ্ঘাসোদিকা গ্রাম গাল্লিটিপ্যক-বিষয়ের অন্তর্গত, এবং এই বিষয় পিয়োল্ল-মণ্ডলের অন্তঃপাতী।

উপরোক্ত বিস্তৃত সাক্ষ্যের মধ্যে ভুক্তির সঙ্গে বিষয় বা মণ্ডলের এবং বিষয় ও মণ্ডলের পারস্পর সম্বন্ধের সঠিক ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে না। কোথাও দেখিতেছি, ভুক্তির অব্যবহিত নিম্নবর্তী বিভাগ মণ্ডল, কোথাও দেখিতেছি বিষয়, আবার কোথাও কোথাও

দেখিতেছি, একেবারে বীথী। বর্ধমান-ভুক্তির পরেই মণ্ডল, মণ্ডলের পর বীথী ; অন্তত নৈহাটি ও শান্তিপুর লিপিতে তো তাহাই দেখিতেছি, যদিও গোবিন্দপুর শাসনে ভুক্তির পরেই পাইতেছি পশ্চিম-খাটিকা। পশ্চিম-খাটিকা কি মণ্ডল, না বিষয়, না বীথী বুঝিবার উপায় নাই ; তাহার পরেই চতুরক। কঙ্কগ্রাম-ভুক্তিতে ভুক্তির পরই বীথী। বঙ্গ পৌণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির অন্তর্গত ; কিন্তু বঙ্গ বিষয় না মণ্ডল কিছুই বুঝা যাইতেছে না ; মনে হয়, ইহাদের উভয়াপেক্ষা বৃহত্তর বিভাগ, কিন্তু এ-বিভাগ রাষ্ট্রীয় বিভাগ নয়, ভৌগোলিক-বিভাগ মাত্র। বঙ্গের দুই ভাগঃ বিক্রমপুর-ভাগ ও নাব্য-(ভাগ ?)। এই নাব্য-(ভাগের) উল্লেখ বোধ হয় শ্রীচন্দ্রের রামপাল-লিপিতেও আছে, নাব্য (নান্য পাঠ অশুদ্ধ বলিয়াই মনে হয়) মণ্ডল রূপে। যাহা হউক, বিক্রমপুর-ভাগের 'ভাগ'ও কোনও রাষ্ট্রীয় বিভাগ বলিয়া মনে হইতেছে না, ভৌগোলিক বিভাগ মাত্র। বিক্রমপুর-ভাগ=বিক্রমপুর অঞ্চল, নাব্য (ভাগ ?)=নাব্য অঞ্চল। অন্যত্র, বিষয় যেন মণ্ডলের অন্তর্গত বলিয়াই মনে হইতেছে, যেমন, পরণায়ি-বিষয় সমতট-মণ্ডলভুক্ত, গাম্পিটিপ্যাক-বিষয় পিয়োল্ল-মণ্ডলের অন্তঃপাতী। লক্ষণীয় এই যে, বিষয় বিভাগ সেনরাষ্ট্রে বিশেষ দেখা যাইতেছে না ; বিজয়সেনের বারাকপুর লিপিতে পৌণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির অন্তর্গত খাড়ী-বিষয়ের উল্লেখ পাইতেছি, কিন্তু লক্ষ্মণসেনের আমলে খাড়ী-মণ্ডলে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে।

অন্তত একটি ক্ষেত্রে মণ্ডলের পরবর্তী বিভাগ দেখিতেছি খণ্ডল, অন্যত্র মণ্ডলের পরেই বীথী, যেমন, বর্ধমান-ভুক্তিতে ; আর এক ক্ষেত্রে মণ্ডলের পরেই পাইতেছি চতুরক যেমন, খাড়ি-মণ্ডলের কান্তল্লপুর চতুরক। অন্যত্র চতুরক হইতেছে আবৃত্তির নিম্নতর বিভাগ, যেমন, নবসংগ্রহ-চতুরক মধুক্ষীরক-আবৃত্তির অন্তর্গত। কিন্তু, আবৃত্তি কাহার বিভাগ, সঠিক জানা যাইতেছে না। তবে মণ্ডলের উপবিভাগ হওয়া অসম্ভব নয়। চতুরক কখনো কখনো সোজাসুজি বৃহত্তর বিভাগের অন্তর্গত, যেমন, বেতড্ড-চতুরক বর্ধমান-ভুক্তির অন্তর্গত। চতুরকের নিম্নবর্তী উপবিভাগ গ্রাম এবং কখনো কখনো সোজাসুজি পাটক (হেমচন্দ্রের আভিধানিক অর্থে, পাটক গ্রামের একার্ধ), যেমন, বিড্ডারশাসন-গ্রাম বেতড্ড-চতুরকে অবস্থিত ; অন্যত্র অজিকুল-পাটকের অবস্থিতি নবসংগ্রহ-চতুরকে। পাটক বর্তমান কালের পাড়া ; চতুরক বর্তমানের চৌকি, চক ; বোধ হয় চতুরক গোড়ায় ছিল চারিটি গ্রামের সমষ্টি।

এই সব রাষ্ট্রীয়-বিভাগের শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোনো তথ্যই লিপিগুলিতে পাওয়া যাইতেছে না ; স্থানীয় কোনো অধিকরণের উল্লেখও নাই। পাল-পর্বে গ্রামে শাসন-ব্যবস্থার নিয়ামক গ্রামপতির (গ্রামিকের) সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়াছিল ; এ-পর্বে তাঁহারও দেখা পাওয়া যাইতেছে না। পাল-পর্বে ভূমিদান ক্রিয়া যাঁহাদের কাছে বিজ্ঞাপিত হইত তাঁহাদের মধ্যে মহামহত্তর, মহত্তর, কুটুম্ব প্রভৃতিরা ছিলেন ; এ-পর্বে তাঁহাদের কোনো উল্লেখ

নাই। এই তালিকায় পাইতেছি শুধু ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণোত্তম, এবং ক্ষেত্রকরদের। মেদ, অন্ধ্র, চণ্ডাল পর্যন্ত যত লোক তাঁহাদের উল্লেখও নাই; অর্থাৎ, এক কথায়, স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে রাষ্ট্রের যোগাযোগ একেবারেই অন্তর্হিত হইয়াগিয়াছে। অথচ, অন্যদিকে রাষ্ট্রের বাহু পাটক পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া জনপদগুলিকে খণ্ড, চতুরক, আবৃত্তি, গ্রাম, পাটক প্রভৃতিতে খণ্ড খণ্ড করিয়া ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর ভাগে বিভক্ত করিয়াছে।

পাল-পর্বের রাষ্ট্রযন্ত্র বিভাগের সব কয়টি বিভাগ এই পর্বেও বিদ্যমান। বিচার-বিভাগে একটি নূতন পদোপাধির উল্লেখ পাওয় যাইতেছে; এই উপাধিটি মহাধর্মাধ্যক্ষ। দণ্ডনায়ক এই পর্বেও বিদ্যমান, কিন্তু মহাদণ্ডনায়কের উল্লেখ নাই। বোধ হয়, তাঁহারই স্থান লইয়াছেন মহাধর্মাধ্যক্ষ। ঈশ্বরঘোষের রামগঞ্জ-লিপিতে অঙ্গিকরণিক নামে এক রাজপুরুষের দেখা পাইতেছি। বিচারকার্য ব্যাপারে যিনি শপথ বা অঙ্গীকার করাইতেন তিনিই বোধ হয় অঙ্গিকরণিক, এবং সেই হিসাবে ইনি হয়তো এই বিভাগের অন্যতম কর্মচারী। এই লিপিতেই দণ্ডপাল নামে যে রাজপুরুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তিনিও বিচার-কর্মচারী সন্দেহ নাই। রাজস্ব-বিভাগে নূতন যে রাজপুরুষের উল্লেখ পাইতেছি তাঁহার পদোপাধি মহাভোগিক। মল্লাসরুল লিপিতে ইঁহার সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়াছিল; ইনি ভোগ-কর আদায় বিভাগের সর্বময় কর্তা। বষ্ঠাধিকৃত ঔপধিক রাজপুরুষের উল্লেখ এই পর্বে নাই। তারিক-তরপতির উল্লেখও এই পর্বে নাই। তবে, হট্টপতি ঔপধিক এক রাজপুরুষের উল্লেখ রামগঞ্জ লিপিতে আছে; ইনি হাট-বাজারের কর্তা সন্দেহ নাই, এবং সেই হিসাবে রাজস্ব-বিভাগের সঙ্গে যুক্ত থাকা অসম্ভব নয়।

ঠিক রাজস্ব-বিভাগ সংপৃক্ত নয়, তবে হট্টপতির মতনই আর একজন রাজপুরুষের দেখা পাইতেছি রামগঞ্জ-লিপিতে; তিনি পানীয়াগারিক। বোধ হয় রাজকীয় বিশ্রামগৃহ, ভোজনশালা, পানীয়াগার, প্রভৃতির তত্ত্বাবধান করা ছিল ইঁহার কাজ। এই লিপিরই বাসাগারিক এবং ঔথিতাসনিক পানীয়াগারিক শ্রেণীরই আর দুই জন রাজপুরুষ। প্রথমোক্ত ব্যক্তিটি বোধ হয় রাষ্ট্রের অতিথিশালা, বা রাজকীয় বাসগৃহের তত্ত্বাবধায়ক; দ্বিতীয়টি সম্ভবত রাজসভা ও দরবারের আসনসজ্জা-ব্যবস্থাপক। ভোজবর্মার বেলাব-লিপিতে পীঠিকাবিত্ত নামে আর একজন রাজকর্মচারীর সাক্ষাৎ পাওয়া যাইতেছে; ইনিও বোধ হয় রাজকীয় সভা-সমিতি-দরবারের আসনসজ্জার ব্যবস্থা করিতেন।

আয়ব্যয়হিসাব বিভাগে মহাক্ষপটলিক এই পর্বেও বিদ্যমান। জ্যেষ্ঠকায়স্থের উল্লেখ এই পর্বে নাই; কিন্তু রামগঞ্জ লিপিতে মহাকায়স্থের উল্লেখ আছে। ইনি এই বিভাগের অন্যতম উর্ধতন কর্মচারী বলিয়াই তো মনে হয়। এই লিপি-উল্লিখিত মহাকরণাধ্যক্ষ এবং লেখক, এবং বহু সেনলিপি-কথিত করণ একান্তভাবে আয়ব্যয়হিসাব-বিভাগের কর্মচারী হয়তো নহেন। লেখক ও করণ সকল বিভাগেই প্রয়োজন হইত; উচ্চতর

রাজপুরুষদের সকলেরই নিজস্ব করণ থাকিতেন। রাষ্ট্রযন্ত্রের সকল করণের সর্বময় কর্তা যিনি তাঁহারই পদোপাধি মহাকরণাধ্যক্ষ।

পূর্ব-পর্বের ভূমি ও কৃষি-বিভাগের ক্ষেত্রপ বা প্রমাতৃ কাহারো সাক্ষাৎ এ পর্বে পাইতেছি না। কর্মকর ঔপধিক এক রাজপুরুষের উল্লেখ রামগঞ্জ-লিপিতে পাইতেছি; ইনি কি শ্রমিক-বিভাগের নিয়ামক কর্তা ছিলেন?

অন্তরাষ্ট্র বিভাগের প্রধান ছিলেন মহামন্ত্রী বা মহামহত্তক। তাঁহাদের সহায়ক সচিব ও মন্ত্রী তো অনেকেই ছিলেন। পররাষ্ট্র-বিভাগের প্রধান ছিলেন মহাসান্ধিবিগ্রহিক; তাঁহার সহায়ক সান্ধিবিগ্রহিক। দূতও এই বিভাগের অস্থায়ী উচ্চ রাজপুরুষ; সান্ধিবিগ্রহিকেরাই সাধারণত দূতের কাজ করিতেন। মন্ত্রপাল বা গূঢ়পুরুষবর্গের উল্লেখ এই পর্বে দেখিতেছি না।

শান্তিরক্ষা-বিভাগ এই পর্বেও খুব সক্রিয়। পূর্ব পর্বের মহাপ্রতীহার, চৌরোদ্ধরণিক, দণ্ডপাশিক, চাটভাট প্রভৃতি এই পর্বেও আছেন। অধিকন্তু, রামগঞ্জ-লিপিতে পাইতেছি দণ্ডপাশিক, ঔপধিক এক রাজপুরুষের উল্লেখ; ইনিও এই বিভাগের কর্মচারী, সন্দেহ নাই। এই লিপিরই শিরোরক্ষক এবং খড়্গগ্রাহ উভয়ই বোধ হয় একশ্রেণীর দেহরক্ষক, এবং সেই হিসাবে উভয়েই শান্তিরক্ষা-বিভাগের কর্মচারী; আরোহক অশ্বারোহী-প্রহরী ও দেহরক্ষক; ইনিও এই বিভাগের সঙ্গে যুক্ত।

সৈন্য-বিভাগে মহাসেনাপতি এই পর্বেও সর্বময় কর্তা। কোট্টপালও আছেন; রামগঞ্জলিপিতে তাঁহাকে বলা হইয়াছে কোট্টপতি। মহাব্যূহপতি, নৌবলাধ্যক্ষ, বলাধ্যক্ষ, হস্তী অশ্ব-গো-মহিষ-অজাবিকাধ্যক্ষরাও আছেন। কিন্তু সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় এই যে, এই পর্বে এই বিভাগে অনেক নূতন নূতন পদোপাধির সাক্ষাৎ পাওয়া যাইতেছে; যেমন, মহাপীলুপতি, মহাগণস্থ, মহাবলাধিকরণিক, মহাবলাকোষ্ঠিক এবং বৃদ্ধধানুষ্ক। মহাপীলুপতি হস্তীসৈন্যচালনাশিক্ষক, হস্তীসৈন্যের অধ্যক্ষ। মহাগণস্থও সামরিক কর্মচারী ২৭ রথ, ২৭ হস্তী, ৮১ ঘোড়া এবং ১৩৫টী পদাতিক সৈন্য লইয়া এক এক গণ। এই সৈন্য-গণের তিনি সর্বময় কর্তা যিনি মহাগণস্থ। গ্রাম বা নগরসংঘ অর্থে গণ শব্দের ব্যবহার আছে সন্দেহ নাই; কিন্তু মহাগণস্থ শব্দে গণ উক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই বলিয়াই মনে হইতেছে। মহাবলাধিকরণিক খুব সম্ভব সৈন্যসংক্রান্ত অধিকরণের প্রধান কর্তা। মহাবলাকোষ্ঠিক এবং বৃদ্ধধানুষ্কের দায় ও কর্তব্য বুঝা যাইতেছেনা, তবে ইঁহারাও যে সামরিক কর্মচারী, সন্দেহ নাই। প্রান্তপালের উল্লেখ এই পর্বে নাই; দূতপ্রৈষণিক এবং খোল বিদ্যমান।

পালও সেন-রাজাদের নৌবলের কথা নানাপ্রসঙ্গে একাধিকবার উল্লেখ করিয়াছি। কালিদাসের রঘুবংশ কাব্যে "নৌসাধনোদ্যতান" সামরিক বাঙালীর বর্ণনা আছে। নদীমাতৃক সমুদ্রাশ্রয়ী বাঙালীর রাষ্ট্র নৌবলনির্ভর হইবে, ইহা কিছুই বিচিত্র নয়। নৌবাট,

নৌবিতান, নৌদণ্ডক ইত্যাদি শব্দের উল্লেখ বাঙলার লিপিগুলিতে বারবার দেখা যায়। বৈদ্যদেবের কমৌলি-লিপিতে কুমারপালের রাজত্বকালে দক্ষিণ-বঙ্গে এক নৌযুদ্ধের সুন্দর অথচ সংক্ষিপ্ত কাব্যময় বর্ণনা আছে ঃ

যস্যানুত্তরবঙ্গ-সংগরজয়ে নৌবাট হীহীরব-
ত্রস্তৈর্দিক্‌করিভিশ্চ বন্নচলিতং চেন্নাস্তি তদ্‌গমাভূঃ।
কিঞ্চোৎপাতুক-কেনিপাত-পতন-প্রোত্‌সর্পিতৈঃ শীকরৈ-
রাকাশে স্থিরতা কৃতা যদি ভবেৎ স্যান্নিষ্কলঙ্কঃ শশী।

বিজয়সেনও একবার গঙ্গার উপরে এক বিজয়ী নৌযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। চর্যাগীতির একটি পদে সেকালের নৌকায় নদীপারাপারের খুব সুন্দর বর্ণনা আছে (১৪ নং—ডোম্বীপাদ)। পাল ও সেনরাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনীর অশ্ব আসিত কম্বোজ দেশ হইতে, দেবপালের মুঙ্গের লিপিতে এই সংবাদ জানা যায়। কিন্তু অশ্ব বোধ হয় আসিত ভুটান-তিব্বত অঞ্চল হইতেও; মিন্‌হাজ-উদ্‌-দীন বখ্‌ত-ইয়ারের তিব্বত অভিযানের যে বিবরণ দিতেছেন এবং সেই প্রসঙ্গে করমবত্তনের হাটের যে-বর্ণনা পাইতেছি তাহাতে এই অনুমান একেবারে মিথ্যা বলিয়া মনে হয় না। আর্তিহর-পুত্র সর্বানন্দের টীকাসর্বস্ব গ্রন্থে (১১৬০) ঘোড়ার বিভিন্ন রকম দৌড়ের বর্ণনা ও বাংলাদেশে ব্যবহৃত নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। বীরব দৌড় (বিষ্টব্ধা সমা চ গতিঃ), পুলিন দৌড় (ঋজু-দূরগমনং), হেডু দৌড় (মণ্ডলিকালয়েন গমনং) এবং মার্জা দৌড় (বেগেন বিক্ষিপ্তো-পরিচরণং)। সর্বানন্দ যুদ্ধসংক্রান্ত আর একটি খবর দিতেছেন—শারদীয়া পূজার মহানবমীর দিনে রাজা ও প্রজারা শান্তিজল গ্রহণ করিতেন। হস্তীসৈন্যের কথা তো প্রাচ্য ও গঙ্গারাষ্ট্রের বর্ণনা দিতে গিয়া গ্রীক ঐতিহাসিক হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক ভারতীয় ও বাঙালী কবি ও লেখকরাই বলিয়া গিয়াছেন।

এই পর্যন্ত সেন-পর্বের রাষ্ট্র-বিন্যাসপ্রসঙ্গে যে-সব রাজপুরুষদের উল্লেখ করিয়াছি তাঁহারা ছাড়া সমসাময়িক লিপিতে আরও কয়েকটি রাজপদোপাধির সাক্ষাৎ মিলিতেছে। দৌঃসাধনিক-দৌঃসাধ্যসাধনিক-মহাদুঃসাধিক ইঁহাদের একজন। ইঁহার দায় ও কর্তব্যের স্বরূপ ঠিক বুঝা যাইতেছে না, তবে কাজটা খুব কঠিন দুঃসাধ্য রকমের ছিল তাহা বুঝা যাইতেছে। মহামুদ্রাধিকৃত আর একজন। রাজকীয় মুদ্রা বা শীলমোহর ইঁহার কাছে থাকিত; যে-সব দলিলপত্রে রাজকীয় শীলমোহর প্রয়োজন হইত তাহা ইনিই অনুমোদন করিয়া মুদ্রায় মুদ্রিত করিয়া দিতেন। কেহ কেহ মনে করেন, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের মুদ্রাধ্যক্ষ এবং মহামুদ্রাধিকৃত একই ব্যক্তি। মহাসর্বাধি-কৃতের কর্তব্যের স্বরূপ বুঝা যাইতেছে না। বাকাটক রাজবংশের লিপিতে সর্বাধ্যক্ষ নামে এক রাজপুরুষের উল্লেখ দেখা যাইতেছে; সর্বাধিকৃত-মহাসর্বাধিকৃত-সর্বাধ্যক্ষ মূলত সকলেরই কর্তব্য বোধ হয় ছিল একই ধরনের। একসরক, মহবল্লিক, শান্তকিক,

তদানিযুক্তক এবং খণ্ডপাল পদোপাধিক কয়েকজন রাজপুরুষের উল্লেখ রামগঞ্জ লিপিতে দেখা যাইতেছে। প্রথম তিনজনের দায় ও কর্তব্য সম্বন্ধে কোনো ধারণাই আপাতত করা যাইতেছে না। তদানিযুক্তক ঔপধিক রাজপুরুষটির সঙ্গে পাল-পর্বের তদায়ুক্তক-বিনিযুক্তক রাজপুরুষদের সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠ, এমন অনুমান করা যাইতে পারে। খণ্ডপালও পাল-পর্বের খণ্ডরক্ষ একই ব্যক্তি, সন্দেহ নাই।

মোটামুটি ইহাই সেন-পর্বের রাষ্ট্র-বিন্যাসের পরিচয়। এই রাষ্ট্র-বিন্যাসের প্রকৃতি সম্বন্ধে দু'একটি ইঙ্গিত আগেই করিয়াছি। বর্তমান প্রসঙ্গে, এবং যে সাক্ষ্যপ্রমাণ বিদ্যমান তাহার উপর নির্ভর করিয়া আর কিছু বলার প্রয়োজন নাই, উপায়ও নাই।

৮

বিভিন্ন পর্বে বর্ণের সঙ্গে রাষ্ট্রের এবং শ্রেণীর সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্বন্ধের বিস্তারিত আলোচনা, অন্যত্র করা হইয়াছে। এখানে আর পুনরুক্তি করিবনা। তবে, রাষ্ট্রবিন্যাস সম্বন্ধেই সাধারণ ভাবে দুই চারিটি উক্তি হয়তো অবান্তর হইবে না।

দৃশ্যত, মহারাজ-মহারাজাধিরাজের ক্ষমতা ও অধিকারের কোনো সীমা ছিল না; তাঁহাদের রাজদণ্ডের প্রতাপ ছিল অব্যাহত, অপ্রতিহত। তিনি শুধু দণ্ডমুণ্ডের সর্বময় প্রভু নহেন, শুধু শাসন, সমর ও বিচার-ব্যাপারের কর্তা নহেন, সর্বপ্রকার দায় ও অধিকারের উৎসই তিনি। রাষ্ট্র-বিন্যাসগত ব্যাপারে অর্থশাস্ত্র-দণ্ডশাস্ত্রোক্ত মতবাদের দিক্ হইতে এ সম্বন্ধে কোনো আপত্তিই কেহ তোলে নাই; অন্তত বাংলার প্রাচীন রাজবৃত্তের ইতিহাসে তেমন কোনো প্রমাণ নাই। কিন্তু কার্যত রাজার ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা সংস্কারের উপর কিছু কিছু বাধা-বন্ধন ছিলই, একেবারে পুরাপুরি স্বেচ্ছাচারী হইবার উপায় তাঁহার ছিল না। প্রথম বাধা-বন্ধন, মহামন্ত্রী এবং অপরাপর প্রধান প্রধান মন্ত্রীবর্গ। ইঁহাদের উপদেশ সর্বত্র সকল সময় না হউক, অন্তত অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানিতেই হইত। বাদল-প্রশস্তি কিংবা কমৌলি লিপির বর্ণনায় কবিজনোচিত যত অতিশয়োক্তিই থাকুক না কেন, উহার পশ্চাতে খানিকটা ঐতিহাসিক সত্য লুক্কায়িত নাই, এমন বলা চলে না। সেন-আমল সম্বন্ধেও এই উক্তি প্রযোজ্য। আদিদেব, ভবদেব, হলায়ুধ, ইত্যাদি ব্যক্তির ইচ্ছা ও মতামত অগ্রাহ্য করা কোনো রাজার পক্ষেই সম্ভব ছিল না। অন্যান্য মন্ত্রী, সভাপণ্ডিত যাঁহারা থাকিতেন তাঁহারাও রাজা এবং রাজপরিবারের অন্যান্য ব্যক্তির অন্যায় আচরণের কতকটা বাধা স্বরূপ ছিলেন, সন্দেহ নাই। লক্ষ্মণসেনের সভাকবি গোবর্ধন আচার্য সম্বন্ধে সেখ শুভোদয়া-গ্রন্থে একটি গল্প আছে। লক্ষ্মণসেনের এক শ্যালক—কুমারদত্ত—কামপরায়ণ হইয়া একবার এক বণিকবধূর উপর বলপ্রয়োগ করিয়াছিলেন। বণিকবধূ মন্ত্রীদের নিকট এই অত্যাচারের

প্রতিকার প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা রাজমহিষীর এবং রাজ-শ্যালকের ক্রোধভাজন হইতে সাহসী হন্ নাই, তবে বণিকবধূকে তাঁহারা লক্ষ্মণসেন-সমীপে উপস্থিত করিয়া রাজার নিকট বিচার প্রার্থনা করিতে বলেন। রাজসভায় মন্ত্রী ও সভাসদবর্গের সম্মুখে বণিকবধূ মাধবীর বিবৃতি শেষ হইলে রাজমহিষী বল্লভা নিজের ভ্রাতাকে রক্ষা করিবার জন্য ভ্রাতার দোষ অপরের (কবি উমাপতিধরের) স্কন্ধে আরোপ করেন। লক্ষ্মণসেনকে মহিষী ও শ্যালক উভয় সম্বন্ধেই দুর্বলতাপরবশ হইয়া বিচারমর্যাদা রক্ষায় অনিচ্ছুক দেখিয়া ক্ষুব্ধ বণিকবধূ শ্লেষমিশ্রিত ভাষায় নিজের মনের ক্ষোভ ব্যক্ত করেন। মহিষী বল্লভা ক্রুদ্ধ হইয়া রাজসভার মধ্যেই মাধবীকে চুল ধরিয়া টানিয়া পদাঘাত করেন। তাহাতেও মহারাজকে অবিচলিত দেখিয়া সভায় উপস্থিত কবি গোবর্ধনাচার্যের ব্রাহ্মণ্য দর্প ও ন্যায়বোধ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে ; তিনি ক্রুদ্ধ প্রদীপ্ত কণ্ঠে মহারাজাধিরাজকে ভৎর্সনা করিয়া মহিষীকে আঘাত করিতে যান, কিন্তু নিরস্ত হইয়া মহিষীকে ভৎর্সনা এবং রাজাকে অভিশাপ দিয়া রাজসভা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হন। তখন লক্ষ্মণসেন সিংহাসন ছাড়িয়া উঠিয়া আসিয়া ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণ-কবির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং তাঁহাকে নিরস্ত করেন। নীরব মন্ত্রীদের লক্ষ্য করিয়া বণিকবধূ মাধবী তখন বাক্যবাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। লজ্জায় ও ঘৃণায় উৎপীড়িত লক্ষ্মণসেন তখন খড়্গ লইয়া কুমারদত্তকে হত্যা করিতে যাইতেছেন, এমন সময় মাধবী মহারাজকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, আপনার শ্যালক আমার হাত ধরিয়াছিল বলিয়া আমি মরিয়া যাই নাই, আমার জাতও যায় নাই। আমারই স্বকর্মফলে এই ঘটনা ঘটিয়াছে। আপনার আচরণে উহার অপরাধের প্রতিকার হইয়াছে, আপনি উহাকে ক্ষমা করুন।' মাধবীর কথা শুনিয়া সভাস্থ সকলে সাধুবাদ করিল। মহারাজ কুমারদত্তকে রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিলেন।

গল্পটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য না হইতে পারে, কিন্তু হইতেও কোন বাধা নাই ; কারণ, সমসাময়িক কালের প্রতিচ্ছবি এই গল্পে সুস্পষ্ট। তাহা ছাড়া বর্তমান প্রসঙ্গে, অর্থাৎ রাজার যথেচ্ছ বা দুর্বল আচরণের উপর সভাকবি ও পণ্ডিতদের বাধা-বন্ধনের দৃষ্টান্ত হিসাবেও ইহার মূল্য আছে। দ্বিতীয় মহীপাল মন্ত্রীদের শুভ পরামর্শে কর্ণপাত না করিয়া সামন্ত-চক্রের বিরোধিতা করিতে গিয়া নিজের প্রাণ ও বরেন্দ্রী উভয়ই হারাইয়াছিলেন।

আর এক বাধা বন্ধনের কারণ ছিলেন সামন্ত-মহাসামন্তরা। বর্তমান নিবন্ধে এবং অন্যত্র বার বার ইহা বলিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, অন্তত গুপ্ত আমল হইতে আরম্ভ করিয়া আদিপর্বের শেষ পর্যন্ত বাঙলার, তথা সমগ্র ভারতবর্ষের রাষ্ট্র ও সমাজ-বিন্যাস একান্তই সামন্ততান্ত্রিক, এবং সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রই একদিকে সমাজের শক্তি, এবং অন্যদিকে দুর্বলতাও। বস্তুত, প্রাচীন ভারতের যে কোনো বৃহৎ রাজ্য বা সাম্রাজ্য (১) কতকগুলি ক্ষুদ্রতর মিত্ররাজ্য, (২) ক্রমসংকুচীয়মান জনপদাধিকার এবং ক্রম:য় তারতম্য লইয়া স্তরে উপস্তরে বিভক্ত বহুতর সামন্ত-মহাসামন্ত, এবং (৩) কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের নিজস্ব জনপদভূমি—

এই তিন প্রধান অঙ্গের সম্মিলিত রূপ। বাঙলা দেশের গুপ্ত, পাল, বা সেনবংশের রাজ্য-সাম্রাজ্যেও, এমন কি ক্ষুদ্রতর চন্দ্র-বর্মণ-কম্বোজ-দেবরাজ্যেও এই রূপের কিছু ব্যতিক্রম নাই। এই সব মিত্র ও সামন্ত-মহারাজদের একেবারে অবজ্ঞা করিয়া চলা কোন মহারাজের পক্ষেই সম্ভব ছিল না। রামপাল যখন কৈবর্ত ক্ষৌণীনায়ক ভীমের কবল হইতে বরেন্দ্রী পুনরুদ্ধারের আয়োজন করিতেছিলেন তখন সাহায্য ভিক্ষা করিয়া তাঁহাকে সামন্তদের দুয়ারে দুয়ারে প্রায় করজোড়ে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছিল, অর্থ ও রাজ্য লোভ দেখাইতে হইয়াছিল।

ঐতিহাসিক কালে বাঙলাদেশে—তথা ভারতবর্ষে—কোনো রাজাই দেখিতেছি না যিনি রাষ্ট্রব্যবস্থা নূতন করিয়া গড়িতে বা নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কোনো রাজা বা রাজবংশ ব্যক্তিগত রুচি, প্রবৃত্তি ও সংস্কার দ্বারা রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র-বিন্যাসকে প্রভাবান্বিত করিয়াছেন, এমন দৃষ্টান্ত একেবারে বিরল নয়, কিন্তু অর্থনীতি-দণ্ডনীতি বা রাষ্ট্র-ব্যবস্থা তাহাতে বদলাইয়া যায় নাই ; মোটামুটি তাহা অপরিবর্তিতই থাকিয়া গিয়াছিল। রাজা, রাষ্ট্রদেহ, সমাজদেহ, ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি সমস্ত কিছুরই ধারক, পোষক ও বর্ধক ছিলেন, সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাদের স্রষ্টা ছিলেন না। বরং তাঁহাকে চিরাচরিত সংস্কার, শাস্ত্রনির্দেশ, ধর্মনির্দেশ মানিয়া চলিতেই হইত ; সাধারণত ইহার অন্যথা হইবার উপায় ছিল না। বৌদ্ধ পালরাজারাও বারবার এ সম্বন্ধে আশ্বাস দিয়াছেন ; তাঁহারা যে শাস্ত্রনির্দেশ, বর্ণ ও সমাজ-ব্যবস্থা, ধর্মনির্দেশ ইত্যাদি মানিয়া চলিয়াছেন বলিয়া একাধিক-বার লিপিগুলিতে বলা হইয়াছে, তাহার ইঙ্গিত নিরর্থক নয়।

শাসন-ব্যবস্থা যে মোটামুটি খুব বিস্তৃত, সুবিন্যস্ত ও সুপরিচালিত ছিল, এ সম্বন্ধে দু' একটি ইঙ্গিত প্রাচীন সাক্ষ্যে পাওয়া যায়। দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান-অতীশ প্রসঙ্গে একটি কাহিনী তিব্বতী গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে ; কাহিনীটি উল্লেখযোগ্য। নয়পালের রাজত্বকালে, আনুমানিক ১০৩০-৪০ খ্রীষ্ট শতকে কোনো সময়ে নগ্-ট্‌চো বাঙলাদেশে আসিতে-ছিলেন, দীপঙ্করকে সঙ্গে করিয়া তিব্বতে লইয়া যাইবার জন্য। বিক্রমশীলা বিহারের অনতিদূরে গঙ্গাতীরে আসিয়া যখন তাঁহারা পৌঁছিলেন তখন সূর্য অস্ত গিয়াছে, যাত্রী বোঝাই খেয়ানৌকা ঘাট ছাড়িয়া নদী পাড়ি দিতে আরম্ভ করিয়াছে। দুই বিদেশি পথিক মাঝিকে ডাক দিয়া তাঁহাদের ঐ নৌকায়ই নদী পার করিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন ; কিন্তু বোঝাই নৌকায় মাঝি আর লোক লইতে অস্বীকার করিয়া বলিল, এখন আর সম্ভব নয়, পরে আবার সে ফিরিয়া আসিবে। নৌকা চলিয়া গেল ; এদিকে রাত্রি হইয়া আসিতেছে, অন্যতম পথিক বিনয়ধর মনে করিলেন, মাঝি নৌকা লইয়া আর ফিরিবে না। কিন্তু, বেশ খানিকক্ষণ পরে মাঝি নৌকা লইয়া ফিরিল ; বিনয়ধর মাঝিকে বলিলেন, 'আমি ত ভাবিয়াছিলাম, এত রাত্রে তুমি আর ফিরিয়া আসিবে না'। মাঝি উত্তর করিল, 'আমাদের দেশে ধর্ম আছে, আমি যখন আপনাকে

ফিরিয়া আসিব বলিয়া গিয়াছি, তখন অন্যথা কি করিয়া হইবে !' মাঝি বিনয়কদেবকে পরামর্শ দিল, এভাবে নদী পার হইয়া কাজ নেই, অদূরবর্তী বিহারের বারান্দার নীচে রাত্রিবাস করাই যুক্তিযুক্ত, সেখানে চোরের উপদ্রব নাই।

খেয়া পারাবার বিভাগের কর্তার নাম পাল-লিপিমালায় পাইতেছি 'তরিক'; তাঁহার বিভাগের সুশাসনের একটু ইঙ্গিত এই গল্পে ধরিতে পারা যায়।

কিন্তু উপরোক্ত গল্প হইতে মনে করিবার প্রয়োজন নাই যে, সমস্ত রাজপুরুষরাই কর্তব্য ও নীতিপরায়ণ ছিলেন। বিষয়পতিরা যে মাঝে মাঝে লোভী হইয়া অত্যাচারী হইতেন, প্রজাসাধারণকে উৎপীড়ন করিতেন তাহার একটু পরোক্ষ ইঙ্গিত পাইতেছি সদুক্তিকর্ণামৃতধৃত একটি শ্লোকে। পল্লীবাসি কৃষিজীবী গৃহস্থের সুখ ও শান্তিলাভের চারিটি উপায়ের মধ্যে একটি উপায় বিষয়পতির (সাধারণ ভাবে, স্থানীয় শাসনকর্তার) লোভহীনতা। নিম্নের শ্লোকটির রচয়িতা হইতেছেন কবি শুভাংক।

বিষয়পতিরলুব্ধো ধেনুভির্ধাম পূর্ণং
কতিচিদভিমতায়াং সীম্নি সীরা বহন্তি।
শিশিলয়তি চ ভার্যা নাতিথেয়ী সপর্যাম্
ইতি সুকৃতমনেন ব্যঞ্জিতং নঃ ফলেন॥

অন্যান্য রাজপুরুষেরাও জনপদবাসিদের উপর নানাভাবে উৎপীড়ন করিতেন। এই সব নানা জাতীয় পীড়ার উল্লেখ প্রতিবাসি কামরূপের সমসাময়িক লিপিতে কিছু কিছু পাওয়া যায়। বাঙলার ভূমি দান-বিক্রয় সম্পর্কিত লিপিগুলিতেও "পরিহৃত-সর্বপীড়া" পদটির উল্লেখ আছে। অর্থাৎ, ভূমি যখন দান করা হইতেছে তখন দানকর্তা দানগ্রহীতাকে উল্লিখিত 'সর্বপীড়া' হইতে মুক্তি দিতেছেন। ইঙ্গিতটা এই যে, সাধারণত সকল প্রজাদেরই এই সব পীড়া বা উৎপীড়ন অল্পবিস্তর ভোগ করিতে হইত। চাটভাট প্রভৃতি "উপদ্রবকারীদের" সংখ্যাও কম ছিল না। অন্যত্র (ভূমি-বিন্যাস অধ্যায় দ্রষ্টব্য) সবিস্তারে ইঁহাদের উল্লেখ করিয়াছি। রাষ্ট্রকে দেয় কর-উপকরও কম ছিল না; সম্পন্ন ও বিত্তবান্ গৃহস্থদের পক্ষে এই সব কর-উপকর দেওয়া ক্লেশকর ছিল না, এরূপ অনুমান করা যায়; কিন্তু সমাজের অর্থনৈতিক নিম্ন শ্রেণীর পক্ষে করভার একটু বেশিই ছিল বই কি? বিভিন্ন প্রকারের করের তালিকা হইতে তো তাহাই মনে হয়। তাহা ছাড়া, রাজপুরুষেরা নানা প্রকারের পুরস্কার-উপহার গ্রহণ করিতেন—অর্থে, ফলে, শস্যে এবং অন্যান্য দ্রব্যে।

পাল ও সেন-আমলের ভূমি ও কৃষিনির্ভর রাষ্ট্র ও সমাজে ভূমিবান্ মহত্তর, কুটুম্ব, সাধারণ গৃহস্থের অবস্থা মোটামুটি স্বচ্ছল ছিল বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু, বৃহৎ ভূমিহীন

গৃহস্থ এবং সমাজ-শ্রমিক গোষ্ঠীর আর্থিক অবস্থা যে খুব স্বচ্ছল ছিল, এমন মনে হয় না। যে দুঃখ-দারিদ্র্যের চেহারা শ্রেণীবিভক্ত সমাজের নিম্নতম স্তরে, বাঙলার পল্লীগ্রামে, সহরের দুঃস্থ পল্লীতে আজও দৃষ্টিগোচর হয় তাহা তখনও ছিল। চর্যাগীতিতে (দশম-দ্বাদশ শতক) ঢেণ্ঢণ্‌পাদের একটি গীতিতে আছে :

টালিতে মোর ঘর নাহি পড়িবেশী
হাঁড়ীতে ভাত নাহি নিতি আবেশী ॥
বেঙ্গ সংসার বড়্‌হিল জা অ।
দুহিল দুধু কি বেণ্টে সমাঅ ॥ (হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পাঠ)

ইহার গূঢ় গুহ্য ব্যাখ্যা যাহাই হউক, বস্তুগত, ইহগত ব্যাখ্যা এইরূপ :

টিলাতে আমার ঘর, প্রতিবেশি নাই। হাঁড়িতে ভাত নাই ; নিত্যই ক্ষুধিত। (অথচ আমার) ব্যাঙ-এর সংসার বাড়িয়াই চলিয়াছে (ব্যাঙের যেমন অসংখ্য ব্যাঙাচি বা সন্তান আমারও সন্তান তেমনই বাড়িয়া যাইতেছে) ; দোহা দুধ আবার বাঁটে ঢুকিয়া যাইতেছে (অর্থাৎ, যে-খাদ্য প্রায় প্রস্তুত তাহাও নিরুদ্দেশ হইয়া যাইতেছে)।

কিন্তু, দারিদ্র্যের আরও নিষ্করুণ বর্ণনা পাওয়া যায় সদুক্তিকর্ণামৃতধৃত নিম্নোক্ত তিনটি শ্লোকে। তিনটিই বাঙালী কবির রচনা ; বাঙলাদেশের দারিদ্র্যের ধূসর চিত্র। প্রথম শ্লোকটি অজ্ঞাতনামা এক কবির।

ক্ষুৎক্ষামাঃ শিশবঃ শবা ইব তনুর্মন্দাদরো বান্ধবো
লিপ্তা জর্জর কর্করী জললবৈর্নোমাং তথা বাধতে।
গেহিন্যাঃ স্ফুটিতাংশুকং ঘটয়িতুং কৃত্বা সকাকুস্মিতং
কুপ্যন্তী প্রতিবেশিনী প্রতিমুহুঃ সূচীং যথা যাচিতা ॥

শিশুরা ক্ষুধায় পীড়িত, দেহ শবের মত শীর্ণ, বান্ধবেরা প্রীতিহীন, পুরাতন জীর্ণ জলপাত্রে স্বল্পমাত্র জল ধরে—এ সকলও আমায় তেমন কষ্ট দেয় নাই, যেমন দিয়াছিল যখন দেখিয়াছিলাম আমার গৃহিণী করুণ হাসি হাসিয়া ছিন্ন বস্ত্র সেলাই করিবার জন্য কুপিত প্রতিবেশিনীর নিকট হইতে সূচ চাহিতেছেন।

দারিদ্র্যের এই বাস্তব কাব্যময় চিত্র সাহিত্যে সত্যই দুর্লভ। অথচ, ইহার ঐতিহাসিক সত্যতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সমসাময়িক আর একটি অনুরূপ বাস্তব অথচ কাব্যময় চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন কবি বার। এই চিত্র আরও নির্মম, আরও নিষ্করুণ।

বৈরাগ্যৈকসমুন্নতা তনুতনুঃ শীর্ণাম্বরং বিভ্রতী
ক্ষুৎক্ষামেক্ষণ কুক্ষিভিক্ষ শিশুভির্ভোক্তুংসমভ্যর্থিতা।
দীনা দুস্থকুটুম্বিনী পরিগলদ্‌বাষ্পাম্বুধৌতাননা-
প্যেকং তণ্ডুলমানকং দিনশতকং নেতুং সমাকাঙ্ক্ষতি॥

বৈরাগ্যে (আনন্দহীনতায় ?) তাহার সমুন্নত দেহ শীর্ণ, পরিধানে জীর্ণবস্ত্র ; ক্ষুধায় শিশুদের চক্ষু কুক্ষিগত হইয়া এবং উদর বসিয়া গিয়াছে ; তাহারা আকুল হইয়া খাদ্য চাহিতেছে। দীনা দুস্থা গৃহিনী চোখের জলে মুখ ভাসাইয়া প্রার্থনা করিতেছেন, এক মান তণ্ডুলে যেন তাহাদের একশত দিন চলিতে পারে।

আরও একটি কাব্যময় অথচ বস্তুগর্ভ বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন কবি বায়। এই শ্লোকটিও সদুক্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থ হইতেই উদ্ধৃত করিতেছি।

চলৎকাষ্ঠং গলৎকুড্যমুত্তানতৃণসঞ্চয়ম।
গণ্ডুপদার্থিমণ্ডুকাকীর্ণং জীর্ণং গৃহং মম॥

কাঠের খুঁটি নড়িতেছে, মাটির দেয়াল গলিয়া পড়িতেছে, চালের খড় উড়িয়া যাইতেছে ; কেঁচোর সন্ধানে নিরত ব্যাঙের দ্বারা আমার জীর্ণ গৃহ আকীর্ণ।

সমাজের এই দারিদ্র্য, এই দুঃখ দৈন্য সম্বন্ধে রাষ্ট্র যথেষ্ট সচেতন ছিল বলিয়া মনে হয় না। অথবা শ্রেণীবিন্যস্ত, ব্যক্তিগত অধিকারনির্ভর, সামন্তত্ত্ব ও আমলাতন্ত্র ভারগ্রস্ত, একান্ত ভূমি ও কৃষিনির্ভর সমাজের ইহাই হয়তো সামাজিক প্রকৃতি।

সেনরাজ বিজয়সেনের প্রশস্তি গাহিয়া কবি উমাপতিধর বলিতেছেন "...ভিক্ষাভুজোস্যাকরাং লক্ষ্মীং স ব্যতনোর্দ্দারিদ্র-ভরণে সুজ্ঞো হি সেনান্বয়", অর্থাৎ "[বিজয়সেনের কৃপায়] ভিক্ষাই ছিল যাহার উপজীব্য সে হইয়াছে লক্ষ্মীর অধিকারী। কি করিয়া দরিদ্রের ভরণপোষণ করিতে হয় সেনবংশ তাহা ভালই জানে"। ব্যক্তিগতভাবে রাজারা দান-ধ্যান করিতেন, পাত্রাপাত্র বিবেচনা করিয়া কৃপাবর্ষণও করিতেন, সন্দেহ নাই ; উমাপতি-ধরও সে কৃপালাভ করিয়াছিলেন এবং লক্ষ্মীর প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্র জনসাধারণের দুঃখ-দারিদ্র্য দূর করা সম্বন্ধে বা দুস্থপীড়িতদের সম্বন্ধে কোন দায়িত্ব স্বীকার করিত বলিয়া মনে হয় না। অন্তত চর্যাগীতি ও সদুক্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থের শ্লোকগুলিতে যে ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাতে এই স্বীকৃতির ইঙ্গিত নাই।

নবম অধ্যায়ের পাঠনির্দেশ

এ-অধ্যায়েরও প্রধান নির্ভর লিপিমালা (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, Periplus গ্রন্থ, গ্রীক ঐতিহাসিকদের বিবরণ, পালি দীপবংস, মহাবংস, আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প, মহাভারত, সদুক্তিকর্ণামৃত, চর্যাগীতি ইত্যাদি থেকে কিছু কিছু তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে অধ্যায়টির গোড়ার দিকে, কিন্তু সে-সব তথ্য তেমন কিছু অর্থবহ নয়। কয়েকটি আধুনিক গ্রন্থে নানা মূল্যবান তথ্যের উল্লেখ ও ইঙ্গিত আছে। সে-জাতীয় ক'একটি গ্রন্থ নীচে উল্লেখ করা হচ্ছে।

Basak, Radhagovinda, The five Damodarpur Copper-plate inscriptions of the Gupta period, in Epigraphia Indica, XV, p 113 ff; Basak, Radhagovinda, Land sale documents of Bengal, in Sir Asutosh Mookerjee Silver Jubilee volume, II, p. 475 ff.; Ghoshal, U. N., Contributions to the history of the Hindu revenue system, Calcutta, 1929; Majumdar, R. C., Corporate life in ancient India, 3rd. edn., Calcutta, 1969; Majumdar, R, C., History of ancient Bengal, Calcutta, 1974, Chap. IX; Majumdar, R. C., *ed.* History of Bengal, I, Dacca, 1943; Sharma, RamSharan, Indian Feudalism, C. 300-1200, Calcutta, 1965; Sircar, D C., Epigraphic discoveries in East Pakistan, Calcutta 1973.

দশম অধ্যায়

রাজবৃত্ত

১

যুক্তি

রাজবৃত্ত বর্ণন ইতিহাসের এক অপরিহার্য অধ্যায়। 'রাগদ্বেষ বহির্ভূত হইয়া ভূতার্থ কথন' বহুদিন পর্যন্ত আমাদের দেশে (এবং বিদেশেও) রাজা ও রাজকীয় বর্ণনাতেই পর্যবসিত ছিল; এখনও নাই এমন বলা যায় না। এক সময় এই বর্ণনাই সমস্ত ইতিহাস জুড়িয়া বিরাজ করিত। তাহার প্রয়োজন ছিল না, এমন নয়। কিন্তু ইতিহাসের যে-যুক্তি আমার এই বাঙালীর ইতিহাসের মূলে সেই যুক্তিতে রাজবৃত্ত বর্ণনা, অর্থাৎ রাজা, রাজবংশ, যুদ্ধবিগ্রহ, রাষ্ট্রের উত্থান ও পতনের সন-তারিখ প্রভৃতির নিছক বিবরণ একেবারে অপরিহার্য না হইলেও গৌণ। ভূত-বিবরণ, অতীতের যথাযথ তথ্য—কখনই ইতিহাসের বড় কথা নয়, ভূতার্থ অর্থাৎ অতীত ঘটনার অর্থের বর্ণনাই যথার্থ ইতিহাস; এই অর্থ বর্ণনাই ঘটনার প্রাণহীন কঙ্কালকে জীবনের গৌরব ও সৌন্দর্য দান করে। রাজতরঙ্গিনীর কবি কহ্লন তাহা জানিতেন; তিনি শুধু ভূত-বর্ণনা করেন নাই, ভূতার্থ কথনই ছিল তাঁহার লক্ষ্য ও আদর্শ; কিন্তু হর্ষচরিত-রচয়িতা বাণভট্ট এই লক্ষ্য ও আদর্শের সন্ধান জানিতেন না।

বহু বৎসরের বহু পণ্ডিত ও গবেষকের শ্রমসাধনার ফলে প্রাচীন বাংলার রাজবৃত্ত বর্ণনার কাজ আজ সহজ হইয়া আসিয়াছে। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর আগে প্রাচীন বাংলার সামগ্রিক রাজবৃত্ত বর্ণনার যে-চেষ্টার সূত্রপাত করিয়াছিলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সদ্যপ্রকাশিত ইংরাজি ভাষায় রচিত বাঙলার ইতিহাসে হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী ও রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাহার পূর্ণতর, সমৃদ্ধতর, যথার্থতর রূপ প্রকাশ করিয়াছেন। বহু পণ্ডিত ও ঐতিহাসিকের সমবেত সাধনার ফলে এই সার সংকলন সম্ভব হইয়াছে। তাহা ছাড়া, রাজবৃত্তের মোটামুটি পরিচয় বহু আলোচনার পর আজ আর বাঙালী পাঠকের কাছে অপরিচিত নয়, অনধিগম্য তো নয়ই। কাজেই একই বিষয়ে বিস্তৃত পুনরালোচনা করিয়া লাভ নাই; নূতন তথ্য পরিবেশন করিবার সুযোগও কম। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তথ্যের নূতন ব্যাখ্যা বা মতামতের অনৈক্য নির্দেশ করা চলে, কিন্তু তাহাও এমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়, বিশেষত নিছক রাজবৃত্ত বর্ণনা যখন এই ইতিহাসের যুক্তির বাহিরে। সেই হেতু খুব সংক্ষেপে এই অধ্যায়ে রাজবৃত্ত কাহিনীর সার সংকলন করিবার চেষ্টা করা হইবে মাত্র।

কিন্তু, এই অধ্যায় রচনার আর একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে যাহা উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রাচীন বাংলার রাজবৃত্ত বর্ণন এ পর্যন্ত যাহা কিছু হইয়াছে তাহা সমস্তই রাজা এবং রাজবংশের ব্যক্তিক দিক্ হইতেই হইয়াছে, বৃহত্তর সমাজের দিক হইতে নয়। বস্তুত, রাজা এবং রাজবংশকে বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে যুক্ত করিয়া পারস্পর প্রভাব ও যোগাযোগের আলোচনা আমাদের ইতিহাসে এখনও কতকটা অবজ্ঞাত। রাষ্ট্র, রাজা বা রাজবংশের অভ্যুদয় বা প্রসার বা বিলয় সমস্তই ঘটে অন্তর্নিহিত সামাজিক কারণে; এই কারণগুলি, অর্থাৎ এক কথায় সামাজিক আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা রাজবৃত্তকে ঘূর্ণমান করে, তাহাকে গতি দেয়, অর্থদান করে। প্রাচীন বাঙলায় এই আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিক সর্বত্র সকল সময় সুস্পষ্ট নয়; যথেষ্ট তথ্য আমাদের সম্মুখে উপস্থিত নাই। সেই সব ক্ষেত্রে রাজবৃত্ত কাহিনী বিচ্ছিন্ন অসংলগ্ন ব্যক্তিক কীর্তিকলাপের বিবরণ ছাড়া এখনও আর কিছু হওয়া সম্ভব নয়, একথা অনস্বীকার্য; কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই এরূপ হইবার যৌক্তিকতা আজ আর নাই, তাহাও স্বীকার করিতেই হয়। অথচ, প্রাচীন ভারত ও বাঙলার ইতিহাস বলিতে আমরা এ-পর্যন্ত যাহা বুঝিয়া আসিয়াছি তাহা এই ধরনের বিচ্ছিন্ন অসংলগ্ন ব্যক্তিক বিবৃতি ছাড়া আর বিশেষ কিছু নয়। খুব সম্প্রতি ইহার কিছু কিছু ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে মাত্র, যেমন হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের Political History of Ancient India-র চতুর্থ সংস্করণে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলার ইতিহাসে। যাহাই হউক, এই অধ্যায়ে রাজবৃত্ত কথা বলিতে গিয়া আমি এই বৃহত্তর সামাজিক আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিক ব্যাখ্যা করিতে কিছু কিছু চেষ্টা করিয়াছি। আমার ব্যাখ্যা সর্বত্র সকলের সম্মতিলাভ করিবে, সে-আশা করা অন্যায় হইবে; তথ্যই তো উপস্থিত নাই। তবু, মনে হয় এই চেষ্টা হওয়া উচিত; রাজবৃত্ত কথা এই উপায়েই অর্থ ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ হইতে পারে, এবং রাজা, রাষ্ট্র ও রাজবংশের ইতিহাস বিচ্ছিন্ন অসংলগ্ন বিবৃতি হইতে মুক্তি পাইতে পারে। বস্তুত মানুষের ইতিহাস তো কার্যকারণ সম্বন্ধের মালায় গাঁথা; তাহার প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন। ইতিহাসের এই কার্যকারণ সম্বন্ধ-বিবৃতিই যথার্থ 'ভূতার্থ কথন'। এই অধ্যায়ে রাজা এবং রাজবংশের নিছক বিবরণ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত; তাহা বহুদিন ধরিয়া বহু আলোচিত এবং সুবিদিত। আমার একমাত্র চেষ্টা, রাজা, রাষ্ট্র এবং রাজবংশের বিবরণগুলিকে কার্যকারণ সম্বন্ধের অবিচ্ছিন্ন একটি প্রবাহে গাঁথিয়া তোলা, সমাজতত্ত্ব এবং ইতিহাস-সম্মত ব্যাখ্যার সাহায্যে। সেই হেতু রাজবৃত্তের সকল পর্বেই আমার চেষ্টা রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও সামাজিক ইঙ্গিতটি ব্যক্ত করা; কিন্তু স্বল্পক্ষেত্রেই তাহা সম্ভব হইয়াছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে তাহা সম্ভব হয় নাই। সেজন্য আরও নূতন ও ব্যাপক তথ্য সংগ্রহের অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নাই। তবু যে সামাজিক পটভূমিকা এবং সামাজিক ইঙ্গিতের পরিবেশের মধ্যে আমি এই রাজবৃত্ত-কাহিনী উপস্থিত করিতেছি

সবিনয়ে তাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও মনে রাখা প্রয়োজন, বহু কর্মীর বহু বৎসরের সাধনায় একটু একটু করিয়া তথ্যের টুকরা সংগৃহীত হইয়া রাজবৃত্তের মোটামুটি কাঠামো-কাহিনী গড়িয়া না উঠিলে এই অসম্পূর্ণ সামাজিক ব্যাখ্যাও সম্ভব হইত না।*

২

পুরাণ-কথা ॥ আঃ খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০—৩৫০

প্রাচীন বাঙলার প্রাচীনতম অধ্যায় অস্পষ্ট, পুরাণ-কথায় সমাচ্ছন্ন। ইতিহাসের সেই প্রদোষ উষায় কয়েকটি প্রাচীন কোমের নাম মাত্র পাওয়া যাইতেছে ; ইঁহাদের কাহারও কাহারও কিছু কিছু কীর্তিকলাপের বিবরণও শোনা যাইতেছে কখনো কখনো। কিন্তু, যে-সব গ্রন্থে এই সব উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে তাহার একটিও এই সব জনপদের পক্ষ হইতে রচিত নয়, প্রত্যেকটিরই উৎস অন্যতর জন, সভ্যতা ও সংস্কৃতি। সিন্ধু এবং উত্তর-গাঙ্গেয় প্রদেশের যে-সব জন ও সংস্কৃতি এই সব গ্রন্থের এবং গ্রন্থোক্ত কাহিনীর জনক তাঁহারা পূর্ব-ভারতের আর্যপূর্ব ও অনার্য কোমগুলিকে প্রীতি ও শ্রদ্ধার চোখে দেখিতে পারেন নাই। ইঁহাদের ভাষা তাঁহাদের বোধগম্য ছিল না ; ইঁহাদের আচার ব্যবহার, আহার-বিহার, বসন-ব্যসন তাঁহাদের রুচিকর ছিল না ; ইঁহাদের প্রতি একটা ঘৃণা ও অবজ্ঞা তাঁহাদের সকল উক্তি ও বিবরণীতে।

ঋগ্বেদে প্রাচীন বাঙলার একটি কোমেরও উল্লেখ নাই। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পূর্ব-ভারতের অনেকগুলি 'দস্যু' কোমের নাম পাওয়া যাইতেছে, তাহাদের মধ্যে পুণ্ড্রকোম একটি। এই সব 'দস্যু' কোমদ্বারাই সমস্ত পূর্ব-ভারত তখন অধ্যুষিত। ঐতরেয় আরণ্যকে বঙ্গ ও বগধ (মগধ ?) জনদের ভাষা পাখীর ভাষার সঙ্গে তুলিত হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন ; ইহার অর্থ বোধ হয় এই যে, পাখীর ভাষা যেমন দুর্বোধ্য বঙ্গ ও মগধ জনদের ভাষাও তেমনই দুর্বোধ্য ছিল আরণ্যক গ্রন্থের ঋষিদের কাছে। এই দুই কোমের লোকদের তাঁহারা মনে করিতেন অনাচারী বা আচারবিরহিত। প্রাচীন জৈনগ্রন্থ আচারাঙ্গসূত্রে মহাবীর ও তাঁহার বতি সঙ্গীদের সম্বন্ধে যে গল্প আছে আগে তাহা একাধিকবার উল্লেখ করিয়াছি। তাহাতেও দেখা যাইতেছে, পথহীন রাঢ় দেশ তখনও পর্যন্ত (আনুমানিক, খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক) এক রূঢ় বর্বর কোমদ্বারা অধ্যুষিত এবং বজ্জ

* অন্যান্য অধ্যায়ের মত এই অধ্যায়েও এই সব বিভিন্ন তথ্যের মূল আমি নির্দেশ করি নাই ; সেজন্য যে-সব গ্রন্থাদি দ্রষ্টব্য তাহা নির্দেশ করিয়াছি মাত্র। বিস্তৃত নির্দেশ অন্যান্য অধ্যায়ে পাওয়া যাইবে ; এই অধ্যায়ে এমন তথ্য ব্যবহৃত হয় নাই যাহা অন্যান্য অধ্যায়ে আলোচিত হইয়া গিয়াছে।

ভূমির (উত্তর-রাঢ়ের ?) ভোজ্য প্রাচীন বিহারবাসী এই সব ব্যক্তিদের কাছে অরুচিকর। মহাভারতে ভীমের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে সমুদ্রতীরবাসী বাঙলার লোকদের বলা হইয়াছে 'ম্লেচ্ছ'; ভাগবত পুরাণে সুহ্মদের বলা হইয়াছে 'পাপ' কোম (হূন, কিরাত, পুলিন্দ, পুক্কস, আভীর, যবন, খস, ইঁহারাও 'পাপ' কোম)। বৌধায়ন ধর্মসূত্রে আরট্ট (বর্তমান পঞ্জাব), সৌবীর (বর্তমান সিন্ধু এবং পঞ্জাবের দক্ষিণাংশ), কলিঙ্গ (বর্তমান ওড়িষ্যা ও অন্ধ্র), বঙ্গ এবং পুণ্ড্র জন এবং জনপদগুলিকে একেবারে আর্য সংস্কার ও সংস্কৃতি-বহির্ভূত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই সব জনপদে যাঁহারা প্রবাস যাপন করিতে যাইতেন ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাদের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প-গ্রন্থে গৌড়, পুণ্ড্র, বঙ্গ, সমতট ও হরিকেল জনপদের লোকদের ভাষাকে বলা হইয়াছে 'অসুর ভাষা'। ঐতিহাসিক কালে (খ্রীষ্টোত্তর সপ্তম শতকের আগে) প্রাচীন কামরূপ রাজ্যে অসুরান্ত ঔপধিক রাজাদের নাম পাওয়া যাইতেছে। এই সব বিচিত্র উল্লেখ হইতে স্পষ্টতই বুঝা যায়, ইঁহারা এমন একটি কালের স্মৃতি ঐতিহ্য বহন করিতেছেন যে-কালে আর্য ভাষাভাষী এবং আর্য সংস্কৃতির ধারক ও বাহক উত্তর ও মধ্য-ভারতের লোকেরা পূর্ব-ভারতের বঙ্গ, পুণ্ড্র, রাঢ়, সুহ্ম প্রভৃতি কোমদের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না, যে-কালে এই সব কোমদের ভাষা ছিল ভিন্নতর, আচার-ব্যবহার অন্যতর। জনতত্ত্বের দিক হইতেও যে এই সব লোকেরা অন্যতর জনের লোক ছিলেন, তাহার ইঙ্গিত তো আমরা আগেই পাইয়াছি; পুরাণ কাহিনীর মধ্যেও তাহার কিছু ইঙ্গিত আছে, পরে তাহা উল্লেখ করিতেছি। এই অন্যতর জন, অন্যতর আচার-ব্যবহার, অন্যতর সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং অন্যতর ভাষার লোকদের সেই জন্যই বিজেতৃ-জাতিসুলভ দর্পিত উন্নাসিকতায় বলা হইয়াছে দস্যু, ম্লেচ্ছ, পাপ, অসুর, ইত্যাদি।

কিন্তু এই দর্পিত উন্নাসিকতা বহুকাল স্থায়ী হইতে পারে নাই। ইতিমধ্যে আর্য-ভাষাভাষী আর্য-সংস্কৃতির বাহকেরা ক্রমশ পূর্বদিকে বিস্তার লাভ করিয়াছেন—ব্যক্তিগত বা কৌমগত খেয়ালবশে নয়, প্রাকৃতিক ও সামাজিক নিয়মের তাড়নায়, উর্বর শস্যক্ষেত্রের সন্ধানে, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য নদীতীরশায়ী বাস্তু ও ক্ষেত্রভূমির সন্ধানে, এবং আদিমতর কোমবৃন্দের উপর অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টায়। এই বিস্তৃতির মূলে ছিল আর্যভাষাভাষী ও আর্যসংস্কৃতিসম্পন্ন লোকদের উন্নততর কৃষিব্যবস্থা, উন্নততর যন্ত্রাদি এবং অস্ত্রশস্ত্র, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। রামায়ণ-মহাভারতে এই অনুমানের কিছু কিছু যুক্তিও আছে। তাহা ছাড়া, মননশক্তি ও অভিজ্ঞতাতেও বোধ হয় ইঁহারা উন্নততর স্তরের লোক ছিলেন। গোড়ার দিকে এই সব বিভিন্ন জন, ভাষা ও সংস্কৃতির পরস্পর পরিচয় বিরোধের মধ্য দিয়াই হইয়াছিল। যাহাই হউক, অনুমান করা যায়, বাঙলা দেশে আর্যভাষীদের ক্রমবিস্তারের, পরস্পর পরিচয় ও যোগাযোগের এবং বিরোধ ও সমন্বয়ের অতীতক দুই চারিটি সাক্ষ্যসূত্রের সন্ধান লওয়া যাইতে পারে।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে অন্ধ্র, পুণ্ড্র, শবর, পুলিন্দ এবং মূতিব কোমের লোকেরা ঋষি বিশ্বামিত্রের অভিশপ্ত পঞ্চাশটি পুত্রের বংশধর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন; তাঁহারা যে আর্যভূমির প্রত্যন্ত দেশে বাস করিতেন তাহাও ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ঠিক এই ধরনের একটি গল্প আছে মহাভারতে এবং বায়ু, মৎস্য ইত্যাদি পুরাণে। এই গল্পে অসুর বলির স্ত্রীর গর্ভে বৃদ্ধ অন্ধ ঋষি দীর্ঘতমসের পাঁচটি পুত্র উৎপাদনের কথা বর্ণিত আছে; এই পাঁচ পুত্রের নাম, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র এবং সুহ্ম ইঁহাদের নাম হইতেই পাঁচ পাঁচটি জনপদের নামের উদ্ভব। রামায়ণে দেখিতেছি, বঙ্গদেশের লোকেরা অযোধ্যাধিপের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল, এবং বঙ্গ, অঙ্গ, মগধ, মৎস্য, কাশী এবং কোশল কোমবর্গ অযোধ্যা-রাজবংশের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। ইক্ষ্বাকু বংশীয় রঘু কর্তৃক সুহ্ম এবং বঙ্গ-বিজয়ের প্রতিধ্বনি কালিদাসের রঘুবংশ কাব্যেও আছে। মহাভারতে কর্ণ, কৃষ্ণ ও ভীমের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গেও প্রাচীন বাঙলার অনেকগুলি কোমের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কর্ণ সুহ্ম, পুণ্ড্র ও বঙ্গদের পরাজিত করিয়াছিলেন; কিন্তু কৃষ্ণ ও ভীমের দিগ্বিজয়ই সমধিক প্রসিদ্ধ। পৌণ্ড্রক বাসুদেব নামে পৌণ্ড্রদের এক রাজা বঙ্গ, পুণ্ড্র ও কিরাতদের এক রাষ্ট্রে ঐক্যবদ্ধ করিয়া মগধরাজ জরাসন্ধের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। কৃষ্ণ-বাসুদেবকে পৌণ্ড্রক-বাসুদেব ও জরাসন্ধের সমবেত সেনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। কৃষ্ণ-বাসুদেব শেষ পর্যন্ত জয়ী হইয়াছিলেন। ভীমও এক পৌণ্ড্রাধিপকে পরাজিত করিয়াছিলেন, এবং তাহার পর একে একে বঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, কর্বট ও সুহ্মের রাজাদের ও সমুদ্রতীরবাসী ম্লেচ্ছদের পর্যুদস্ত করিয়াছিলেন। এই সব কোমদের মধ্যে পুণ্ড্র ও বঙ্গ কোমই সবচেয়ে পরাক্রান্ত ছিল বলিয়া মনে হয়। মহাভারতে পৌণ্ড্রক-বাসুদেবের কীর্তিকলাপ নগণ্য নয়; জরাসন্ধের সঙ্গে তাঁহার মৈত্রীবন্ধন শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডব-ভ্রাতাদের পক্ষে শঙ্কা ও চিন্তার কারণ হইয়াছিল। এক বঙ্গরাজ কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে কৌরবপক্ষে দুর্যোধনের সহায়ক হইয়াছিলেন; ভীষ্মপর্বে দুর্যোধন-ঘটোৎকচ যুদ্ধে এই বঙ্গরাজ যথেষ্ট বীরত্ব ও কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন।

আর্য যোগাযোগ

সদ্যোক্ত পুরাণকথাগুলির ঐতিহাসিক ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যাইতে পারে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে পুণ্ড্র, শবর ইত্যাদি কোমদের এবং পুরাণ-মহাভারতে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ-পুণ্ড্র-সুহ্ম কোমগুলির উৎপত্তি সম্বন্ধে যে-আখ্যান বর্ণিত আছে তাহাতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, এই সব আখ্যান এক সুদূর অতীতের স্মৃতি বহন করিয়া আনিয়াছে। সে-অতীতে আর্য ভাষা ও সংস্কৃতির বাহকেরা পূর্ব-প্রান্তের এই সব দেশগুলিতে কেবল প্রবেশ

পদক্ষেপ করিতেছেন মাত্র। কোনো বিজয় অভিযান নয়; ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা দুরন্ত, দুর্গম পথকামী তাঁহারাই শুধু আসিতেছেন দুঃসাহসী প্রথম পথিকৃতের মত, যেমন বিশ্বামিত্রের অভিশপ্ত পঞ্চাশটি সন্তান। তাহার পরই আসিতেছেন প্রচারকের দল—একটি দু'টি করিয়া, যেমন বৃদ্ধ অন্ধ ঋষি দীর্ঘতমস। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ বড় বিচিত্র; প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে মানুষ মানুষের সঙ্গে মিলনের যত কিছু বাধা—জাতি, সমাজ, আচার, ধর্ম, সকল কিছুর বাধা সবলে অতিক্রম করে। এই সব দুঃসাহসী পথিকৃৎ ও প্রচারক যখন দস্যু, ম্লেচ্ছ, পাপ ও অসুর কোমদের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন, তখন পরস্পরের সংযোগ ঘটিতে দেরী হইল না, প্রাকৃতিক নিয়মেই সকল বাধা ক্রমশ ঘুচিয়া যাইতে লাগিল, এবং বৃদ্ধ অন্ধ ঋষি দীর্ঘতমসও প্রকৃতির নিয়ম এড়াইতে পারিলেন না। কিন্তু, প্রাকৃতিক নিয়মও সক্রিয় হইল বিরোধের মধ্য দিয়াই। কর্ণ, ভীম ও কৃষ্ণের যুদ্ধকাহিনী, পৌণ্ড্রক-বাসুদেব কর্তৃক জরাসন্ধের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধন, বঙ্গরাজ ও দুর্যোধনের মৈত্রীবন্ধন, আচারঙ্গসূত্রের গল্পে রাঢ়বাসীদের দ্বারা মহাবীর ও তাঁহার যতি সঙ্গীদের পশ্চাতে কুকুর লেলাইয়া দেওয়া, ঢিল ছোঁড়া, ইত্যাদি গল্পের ভিতর সেই বিরোধের স্মৃতি সুস্পষ্ট। এই সব কোমের লোকেরা সহজে বিনা যুদ্ধে বিনা প্রতিরোধে আর্য ভাষা ও সংস্কৃতির বাহকদের কাছে পরাভব স্বীকার করিতে রাজী হ'ন নাই। কিন্তু এ-ক্ষেত্রেও সমাজ-প্রকৃতির নিয়মই জয়ী হইল; উন্নততর উৎপাদন ব্যবস্থা, উন্নততর অস্ত্র শস্ত্রবিদ্যা, এবং উন্নততর ভাষা ও সংস্কৃতি জয়ী হইল।

আর্যীকরণের সূত্রপাত

প্রাথমিক পরাভব ও যোগাযোগের পর এই সব পূর্বদেশীয় কোমগুলি ক্রমশ আর্যসভ্যতা ও সংস্কৃতির স্বীকৃতি, এবং আর্য সমাজ-ব্যবস্থার একপ্রান্তে স্থান লাভ করিতে আরম্ভ করিল। এই স্বীকৃতি ও স্থানলাভ একদিনে ঘটে নাই। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া একদিকে এই সংঘাত ও বিরোধ এবং অন্যদিকে এই স্বীকৃতি ও অন্তর্ভুক্তি চলিয়াছিল, কখনও ধীর শান্ত, কখনো দ্রুত কঠোর প্রবাহে, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক পরাভব ঘটিয়াছিল আগে; সংস্কৃতির পরাভব ঘটিয়াছে অনেক পর। বস্তুত, এই সব কোমের ধর্ম ও আচারগত, ধ্যান ও বিশ্বাসগত পরাভব আজও সম্পূর্ণ হয় নাই; সামগ্রিক আর্যীকরণের ক্রিয়া আজও চলিতেছে, ধীরে ধীরে,আপাতদৃষ্টির অগোচরে। যাহাই হউক, খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকেও দেখিতেছি, রাঢ়দেশে আর্য জৈনধর্ম প্রচারকেরা বাধা ও বিরোধের সম্মুখীন হইতেছেন। স্থানে স্থানে এই বিরোধ তখনও চলিতেছে, সন্দেহ নাই। তবে, সঙ্গে সঙ্গে আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্বীকৃতি লাভও ঘটিতেছে। রামায়ণ-কাব্যে দেখিয়াছি, প্রাচীন বঙ্গের রাজন্যেরা অযোধ্যার রাজবংশের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইতেছেন। মানবধর্মশাস্ত্রে আর্যাবর্তের সীমা দেওয়া হইতেছে

পশ্চিম সমুদ্র হইতে পূর্বসমুদ্র পর্বন্ত, অর্থাৎ প্রাচীন বাঙলাদেশের অন্তত কিয়দংশও আর্যাবর্তের অন্তর্গত, এই যেন ইঙ্গিত। কিন্তু মনুই আবার পুণ্ড্রকোমের লোকদের বলিতেছেন ব্রাত্য বা পতিত্ ক্ষত্রিয়, এবং তাঁহাদের পংক্তিভুক্ত করিতেছেন দ্রাবিড়, শক, চীনদের সঙ্গে। মহাভারতের সভাপর্বে কিন্তু বঙ্গ ও পুণ্ড্রদের যথার্থ ক্ষত্রিয় বলা হইয়াছে; জৈন প্রজ্ঞাপনাগ্রন্থেও বঙ্গ এবং রাঢ় কোম দু'টিকে আর্য কোম বলা হইয়াছে। শুধু তাহাই নয়, মহাভারতেই দেখিতেছি, প্রাচীন বাঙলার কোনো কোনো স্থান তীর্থ বলিয়াও স্বীকৃত ও পরিগণিত হইতেছে, যেমন পুণ্ড্র ভূমিতে করতোয়াতীর, সুহ্মদেশে ভাগীরথীর সাগরসঙ্গম। অর্থাৎ, বাঙলা এবং বাঙালীর আর্যীকরণ ক্রমশ অগ্রসর হইতেছে, ইহাই এই সব পুরাণকথার ইঙ্গিত।

প্রাচীন সিংহলী পালিগ্রন্থ দীপবংস ও মহাবংস-কথিত সিংহবাহু ও তৎপুত্র বিজয়সিংহের লঙ্কাবিজয় কাহিনী সুবিদিত। আগেই বলিয়াছি, এই কাহিনীর লাল দেশ প্রাচীন বাঙলার রাঢ় হওয়াই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। বঙ্গ ও রাঢ়াধিপ সিংহবাহুর পুত্র পিতার ক্রোধের হেতু হইয়া রাজ্য হইতে নির্বাসিত হন। তিনি প্রথম সমুদ্রপথে ভারতের পশ্চিম সমুদ্রতীরের সোপারা (সুপ্পারক=শূর্পারক) বন্দরে গিয়া বসতি আরম্ভ করেন, কিন্তু তাহার সঙ্গীদের অত্যাচারে সোপারার লোকেরা উত্যক্ত হইয়া উঠে। বিজয় সেই দেশও পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া অবশেষে তম্বপন্নি দেশের (=তাম্রপর্ণী=বর্তমান লঙ্কা বা সিংহল) লঙ্কা নামক স্থানে চলিয়া যান এবং সেখানে এক রাজ্য ও রাজবংশ স্থাপন করেন। সিংহলী ঐতিহ্যের মতে এই ঘটনার তারিখ এবং বুদ্ধদেবের পরিনির্বাণের তারিখ (অর্থাৎ ৫৪৪ খ্রীষ্টপূর্ব) একই। মোটামুটি ষষ্ঠ-পঞ্চম খ্রীষ্টপূর্ব শতকে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল বলিয়া ধরা যাইতে পারে। প্রাচীন বৌদ্ধ ঐতিহ্যে তাম্রলিপ্তি-তাম্রপর্ণী বা সিংহল-ভৃগুকচ্ছ-সুপ্পারকের সামুদ্রিক বাণিজ্যের উল্লেখ একেবারে অপ্রতুল নয়। সমুদ্র-বণিজ-জাতক, শঙ্খ-জাতক, মহাজনক-জাতক ইত্যাদি গল্পে তাম্রলিপ্তি-সিংহলের বাণিজ্যের কথা বারবার উল্লিখিত আছে। এ-সব গল্পে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতকের বাণিজ্যিক চিত্র প্রতিফলিত বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। বিজয়সিংহ এই ধরনের কোনো প্রাচীন বাণিজ্য-নায়ক হইয়া থাকিবেন। পিতৃক্রোধে নির্বাসিত হইয়া সুপ্পারকে-সিংহলে নিজ ভাগ্যান্বেষণ করিতে গিয়া হয়তো রাজা হইয়া বসিয়াছিলেন।

সামাজিক ইঙ্গিত

সন্যোত্ত জাতকের গল্প ও পালি মহানিদ্দেস-গ্রন্থের ইঙ্গিত, মহাভারতে বঙ্গ ও পুণ্ড্র-রাজগণ কর্তৃক যুধিষ্ঠিরের নিকট হস্তী, মুক্তা এবং মূল্যবান বস্ত্রাভরণ উপঢৌকন আনয়ন, সমুদ্রতীরবাসী লোকজন কর্তৃক সুবর্ণ উপহার দান, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে প্রাচীন বাঙলা-দেশজাত বিচিত্র দ্রব্যসম্ভারের বর্ণনা, মিলিন্দ-পঞহ-গ্রন্থে বাঙলার সমুদ্র-কূল ও সামুদ্রিক

বাণিজ্যের বিবরণ, পেরিপ্লাস-গ্রন্থে, স্ট্রাবো ও প্লিনির বিবরণীতে বাংলার বিচিত্র মূল্যবান বাণিজ্যিক দ্রব্যসম্ভারের বিবরণ প্রভৃতি পড়িলে মনে হয়, খুব প্রাচীন কাল হইতেই বাঙলাদেশ কতকগুলি কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যে এবং খনিজদ্রব্যে খুবই সমৃদ্ধ ছিল; বাঙলার হস্তীও উত্তর-ভারতীয় রাজন্যবর্গের লোভনীয় ছিল। এই সব সমৃদ্ধির লোভেই হয়তো উত্তর-ভারতের ক্ষমতাবান্ রাজা ও রাজবংশ পূর্ব-ভারতের এই জনপদগুলির দিকে আকৃষ্ট হন এবং তাঁহাদের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক প্রভুত্ব আশ্রয় করিয়া ধীরে ধীরে উত্তর-গাঙ্গেয়-ভূমির আর্যভাষা, আর্যসমাজ ও সংস্কৃতি ধীরে ধীরে বাঙলায় বিস্তৃতি লাভ করে।

অঙ্গ (উত্তর-বিহার)-পুণ্ড্র-সুহ্ম বঙ্গ-কলিঙ্গ কোমের লোকেরা, অন্ধ্র-পুণ্ড্র-শবর-পুলিন্দ-মুতিব জনেরা যে সুপ্রাচীন বাংলায় মোটামুটি একই নরগোষ্ঠীর লোক ছিলেন, এ-তথ্য ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ঋষি এবং মহাভারতকারের বোধ হয় অজ্ঞাত ছিল না। আগে এক অধ্যায়ে দেখিয়াছি, ইঁহারা বোধ হয় ছিলেন অস্ট্রিক-ভাষী আদি-অস্ট্রেলয়েড্ নরগোষ্ঠীর লোক, মঞ্জুশ্রীমূলকল্পের ভাষায় 'অসুর'। উপরোক্ত বিচিত্র উল্লেখ হইতেই দেখা যায়, সেই সুপ্রাচীন কালেই ইঁহারা কোমবদ্ধ হইয়াছেন এবং এক একটি জনপদকে আশ্রয় করিয়া এক একটি বৃহত্তর কোমসমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। এক কোমসমাজের সঙ্গে অন্য কোমসমাজে পরস্পর বিরোধ ঘটিতেছে, কখনো কখনো আবার পরস্পরের মৈত্রীবন্ধনও দেখা যাইতেছে। মহাভারতে তাহার আভাস পাওয়া যায়। ভারতযুদ্ধ গল্পের তিলমাত্র ঐতিহাসিকত্ব স্বীকার করিলে ইহাও মানিয়া লইতে হয় যে, মাঝে মাঝে এই সব কোম ঐক্যবদ্ধ হইয়া প্রতিবেশী জনপদরাষ্ট্রের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে মিলিত হইত এবং উভয়ের শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধও করিত। কোমবদ্ধ সমাজ যখন ছিল, সেই সমাজের একটা শাসন-শৃঙ্খলাও নিশ্চয়ই ছিল। তাহা না হইলে প্রাচীনতম বাঙলার যে সমৃদ্ধ বাণিজ্য-বিবরণের কথা বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য-পুরাণ গ্রন্থাদিতে পাঠ করা যায়, এবং যাহার কয়েকটি সূত্র ইতিপূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, সেই সমৃদ্ধ বাণিজ্য সম্ভব হইত না। কিন্তু, এই শাসনশৃঙ্খলার স্বরূপ কি ছিল, বলা কঠিন। গোড়ার দিকে এই শাসন-ব্যবস্থা বোধ হয় কৌমতান্ত্রিক, কিন্তু মহাভারতে ও সিংহলী বিবরণীতে যে-যুগের কথা পাইতেছি সেই যুগে কৌমতন্ত্র রাজতন্ত্রে বিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু, প্রায় সর্বত্রই প্রাচীন গ্রন্থাদিতে যে-ভাবে বহুবচনে কোম-গুলির নাম উল্লেখ করা হইয়াছে (যথা, পুণ্ড্রাঃ, বঙ্গাঃ, রাঢ়াঃ, সুহ্মাঃ ইত্যাদি) তাহাতে মনে হয়, রাজতন্ত্র সুপ্রচলিত হইবার পরও বহুদিন পর্যন্ত ঐতিহ্য ও লোকস্মৃতিতে কৌমতন্ত্রের স্মৃতি জাগরূক শুধু নয়, তাহার কিছু কিছু অভ্যাস এবং ব্যবস্থাও বোধ হয় প্রচলিত ছিল, বিশেষত শাসনকেন্দ্র হইতে দূরে গ্রাম্য লোকালয়গুলিতে। প্রাচীন বাঙলায় রাজতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপ্রচলিত হইতে হইতে মৌর্য-আমলের খুব আগে হইয়াছিল বলিয়া যেন মনে হয় না।

৩

প্রাচীন গ্রীক্ ও লাতিন লেখকদের কৃপায় খ্রীষ্টপূর্ব শতকের তৃতীয় পাদে বাঙলার রাজবৃত্ত-কথা অনেকটা স্পষ্ট। এই গ্রীক ও লাতিন লেখকেরা আলেকজাণ্ডারের ভারত-অভিযান সম্পর্কে এক সুবিস্তৃত সাহিত্য রচনা করিয়া গিয়াছেন ; সে-সাহিত্য বর্তমান ঐতিহাসিকদের নিকট সুবিদিত, সুআলোচিত। কাজেই তাহার বিস্তৃত উল্লেখের প্রয়োজন নাই। এই প্রসঙ্গেই প্রথম শোনা যাইতেছে যে, বিপাশা নদীর পূর্বতীরে দুইটি পরাক্রান্ত রাষ্ট্র বিস্তৃত ছিল, একটি Prasioi বা প্রাচ্য এবং আর একটি Gangaridai (পাঠান্তরে Gandaridai) বা গঙ্গারাষ্ট্র (?)। প্রাচ্য রাষ্ট্রের রাজধানী ছিল Palibothra বা পাটলীপুত্র, এবং গঙ্গারাষ্ট্রের Gange বা গঙ্গা (-নগর)। পেরিপ্লাস-গ্রন্থ ও টলেমীর বিবরণ হইতে জানা যায়, গঙ্গা-নগর সামুদ্রিক বাণিজ্যের বৃহৎ বন্দর ছিল ; টলেমি আরও বলিতেছেন, এই গঙ্গা বন্দরের অবস্থিতি ছিল গাঙ্গেয় Kamberikhon-নদীর মোহনায়। Kamberikhon এবং কুমার নদী যে অভিন্ন তাহা আগেই এক অধ্যায়ে নদনদী-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে। Gangaridai-রা যে গাঙ্গেয় প্রদেশের লোক এ-সম্বন্ধে সন্দেহ নাই, কারণ গ্রীক লেখকরা এ-সম্বন্ধে এক মত। দিয়োদোরস-কার্টিয়াস্-প্লুতার্ক-সলিনাস্-প্লিনি-টলেমি-স্ট্যাবো প্রভৃতি লেখকদের প্রাসঙ্গিক মতামতের তুলনামূলক বিস্তৃত আলোচনা করিয়া হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, Gangaridai বা গঙ্গারাষ্ট্র গঙ্গা-ভাগীরথীর পূর্বতীরে অবস্থিত ও বিস্তৃত ছিল, এবং প্রাচ্যরাষ্ট্র গঙ্গা-ভাগীরথী হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিমদিকে সমস্ত গাঙ্গেয় উপত্যকায় বিস্তৃত ছিল। তাম্রলিপ্তি যে প্রাচ্য রাষ্ট্রের অন্তর্গত ছিল, ইহাও তাঁহারই অনুমান। রায়চৌধুরী মহাশয়ের এই অনুমান যুক্তিসম্মত ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। যাহা হউক, এই দুই রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্বন্ধ প্রসঙ্গে পূর্বোক্ত বিদেশি লেখকরা কি বলিতেছেন তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতে পারে। কার্টিয়াসের বিবরণী পড়িলে মনে হয়, প্রাচ্য ও গঙ্গারাষ্ট্র দুই স্বতন্ত্র রাজ্য, কিন্তু খ্রীষ্টের জন্মের চতুর্থ শতকের তৃতীয় পাদে একই রাজার অধীন এবং একই রাষ্ট্রে সংবদ্ধ। দিয়োদরসও বলিতেছেন, প্রাচ্য ও গঙ্গা একই রাষ্ট্র, একই রাজার অধীন। প্লুতার্ক এক জায়গায় বলিতেছেন "the kings of the Gangaridai and the Prasioi" ; অথচ আর এক জায়গায় ইঙ্গিত যেন একটি রাজা এবং একটি রাষ্ট্রের দিকে। যাহাই হউক, এই সব উক্তি হইতে যে-অনুমান সহজেই যুক্তিতে স্বীকৃতি লাভ করে তাহা এই যে, প্রাচ্য ও গঙ্গা দুইটি স্বতন্ত্র জনপদ রাষ্ট্র হিসাবেই বিদ্যমান ছিল ; দুই স্বতন্ত্র নামই তাহার প্রমাণ। কিন্তু চতুর্থ শতকের তৃতীয় পাদে, কিংবা তাহার আগে কোনো সময় দুই জনপদ-রাষ্ট্র এক রাজার অধীনস্থ হয়, এবং একটি যুক্তরাষ্ট্র

গঠিত হয়, যদিও তাহার পরে খুব সম্ভব দুই জনপদের সৈন্যসামন্ত প্রভৃতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল। একদিকে কার্টিয়স-দিয়োদোরস এবং অন্যদিকে প্লুতার্কের সাক্ষ্য তুলনা করিয়া দেখিলে এ-অনুমান একেবারে অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

মনন্দবংশাধিকার

এই যুক্তরাষ্ট্রের রাজা ছিলেন Agrammes বা Xandrammes=ঔগ্রসৈন্য= উগ্রসেনের পুত্র। পুরাণে যাঁহাকে বলা হইয়াছে মহাপদ্মনন্দ তাঁহাকেই বোধ হয় মহা-বোধিবংশ-গ্রন্থে উগ্রসেন বলা হইয়াছে। Agrammes নীচকুলোদ্ভব নাপিতের পুত্র ছিলেন, এ-সাক্ষ্য পূর্বোক্ত লেখকেরাই দিতেছেন; হেমচন্দ্র-পরিশিষ্টপর্ব নামক জৈন গ্রন্থেও মহাপদ্মকে বলা হইয়াছে নাপিত-কুমার। পুরাণে কিন্তু মহাপদ্মনন্দকে শূদ্রাগর্ভোদ্ভব বলা হইয়াছে। মহাপদ্মকে আরও বলা হইয়াছে, "সর্বক্ষত্রান্তক নৃপঃ" এবং "একরাট্"। যিনি কাশী, মিথিলা, বীতিহোত্র, ইক্ষ্বাকু, কুরু, পঞ্চাল, হৈহয় ও কলিঙ্গদের পরাভূত করিয়াছিলেন তাঁহার পক্ষে গঙ্গারাষ্ট্র স্বীয় প্রাচ্য রাজ্যের অন্তর্গত করা কিছু অসম্ভব নয়। যাহাই হউক, আজ এ-তথ্য সুবিদিত যে, ঔগ্রসৈন্যর সমবেত প্রাচ্য-গঙ্গারাষ্ট্রের সুবৃহৎ সৈন্য এবং তাঁহার প্রভূত ধনরত্ন পরিপূর্ণ রাজকোষের সংবাদ আলেকজান্দারের শিবিরে পৌঁছিয়াছিল, এবং তিনি যে বিপাশা পার হইয়া পূর্বদিকে আর অগ্রসর না হইয়া বাবিলনে ফিরিয়া যাইবার সিদ্ধান্ত করিলেন, তাহার মূলে অন্যান্য কারণের সঙ্গে এই সংবাদগত কারণটিও অগ্রাহ্য করিবার মতন নয়।

মৌর্যাধিকার

মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া সুবিস্তৃত নন্দ-সাম্রাজ্য, নন্দ-সৈন্যসামন্ত এবং প্রভূত ধনরত্নপূর্ণ নন্দ-রাজকোষের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। মহাপদ্ম ও তাঁহার পুত্রদের গঙ্গারাষ্ট্রও মৌর্য-সাম্রাজ্যের করতলগত হইয়াছিল, এ-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কম। প্রাচীন জৈন এবং বৌদ্ধগ্রন্থ, মহাস্থানে প্রাপ্ত শিলাখণ্ডলিপি এবং য়ুয়ান্-চোয়াঙের সাক্ষ্য প্রামাণিক বলিয়া মানিলে স্বীকার করিতে হয়, পুণ্ড্রবর্ধন বা উত্তর-বঙ্গ নিঃসন্দেহে মৌর্য-সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। য়ুয়ান্-চোয়াঙ তো পুণ্ড্রবর্ধন ছাড়া প্রাচীন বাঙলার অন্যান্য জনপদেও (যথা কর্ণসুবর্ণ, তাম্রলিপ্ত, সমতট) মৌর্য-সম্রাট অশোক-নির্মিত বৌদ্ধস্তূপ ও বিহার দেখিয়াছিলেন বা তাহাদের বিবরণ শুনিয়াছিলেন বলিয়া বলিতেছেন। যদি তাহাই হয় তবে প্রাচীন বাঙলায় মৌর্য রাষ্ট্রব্যবস্থাও প্রচলিত ছিল বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। মহাস্থানের ব্রাহ্মী-লিপিতে দেখিতেছি, রাজধানী পুন্দনগলে (পুণ্ড্রনগরে) একজন মহামাত্র নিযুক্ত ছিলেন, এবং স্থানীয় রাজকোষ ও রাষ্ট্রশস্যভাণ্ডার গণ্ডক ও কাকনিক মুদ্রায় এবং ধান্যশস্যে পরিপূর্ণ ছিল। দুর্ভিক্ষের সময় প্রজাদের বীজ এবং

খাদ্য-দানের নির্দেশ কৌটিল্য দিতেছেন ; তাহার পরিবর্তে প্রজাদের দুর্গ অথবা সেতু নির্মাণ কার্যে নিযুক্ত করা হইত, অথবা রাজা ইচ্ছা করিলে কোন শ্রম গ্রহণ না করিয়াও দান করিতে পারিতেন (দুর্ভিক্ষে রাজা বীজ-ভক্তোপগ্রহম্ কৃত্বানুগ্রহম্ কুর্বাৎ। দুর্গসেতুকর্ম বা ভক্তানুগ্রহেণ ভক্তসংবিভাগং বা॥ অর্থশাস্ত্র, ৪।৩।৭৮)। মহাস্থান লিপিতেও দেখিতেছি, কোনো এক অত্যায়িক কালে রাজা পুন্দনগলের মহামাত্রকে নির্দেশ দিতেছেন, প্রজাদের ধান্য এবং গণ্ডক ও কাকনিক মুদ্রা দিয়া সাহায্য করিবার জন্য, কিন্তু সুদিন ফিরিয়া আসিলে ধান্য ও মুদ্রা উভয়ই রাজভাণ্ডারে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে, তাহাও বলিয়া দিতেছেন। বিনা শ্রমবিনিময়ে দান বা দুর্গ অথবা সেতু নির্মাণে শ্রম কোনো কিছুরই উল্লেখ এক্ষেত্রে করা হইতেছে না। লিপিকথিত অত্যায়িক যে কি জাতীয় তাহাও বলা হয় নাই।

শুঙ্গ রাজাদের আমলেও বোধ হয় বাঙলাদেশ পাটলিপুত্র-রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, কিন্তু এ-সম্বন্ধে কোনও নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ নাই। তবে শুঙ্গ শিল্পশৈলী এবং সংস্কৃতি বাঙলা-দেশে প্রচলিত হইয়াছিল, এমন প্রমাণ কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে গঙ্গাবন্দর

বাঙলাদেশে কিছু কিছু নানা চিহ্নাঙ্কিত (punch-marked) মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে ; এই সব মুদ্রা মৌর্য ও শুঙ্গ আমলের হইলেও হইতে পারে ; নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় নাই। তবে, খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে পেরিপ্লাস-গ্রন্থে নিম্নগাঙ্গেয় ভূমিতে "ক্যালটিস্" নামক এক প্রকার সুবর্ণমুদ্রা প্রচলনের খবর পাওয়া যাইতেছে। প্রথম ও দ্বিতীয় শতকের বাঙলাদেশ সম্বন্ধে পেরিপ্লাস-গ্রন্থ ও টলেমির বিবরণে আরও কিছু খবর পাওয়া যাইতেছে। যে-গঙ্গারাষ্ট্রের কথা গ্রীক ও লাতিন লেখকদের রচনায় পাওয়া গিয়াছে, সেই গঙ্গারাষ্ট্র একই রূপে ও শাসন-প্রকৃতিতে এই যুগেও ছিল কিনা বলা যায় না ; তবে, গঙ্গারাষ্ট্রের রাজধানী গঙ্গাবন্দর নগর এখনও বিদ্যমান। এই গঙ্গাবন্দরে অতি সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্র উৎপন্ন হইত, এবং ইহার সন্নিকটেই কোথাও সোনার খনি ছিল। গঙ্গা-বন্দরের অবস্থিতি যে কুমার-নদীর মোহনায়, অর্থাৎ প্রাচীন কুমারতালক-মণ্ডলে, এই ইঙ্গিত আগেই করা হইয়াছে। ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া অঞ্চলে প্রাপ্ত ষষ্ঠ শতকের একটি লিপিতে সুবর্ণবীথীর উল্লেখ ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমায় সুবর্ণগ্রাম, মুন্সীগঞ্জ মহকুমায় সোনারঙ, সোনাকান্দি, বর্তমান বাঙলার পশ্চিম প্রান্তে সুবর্ণরেখা নদী, ইত্যাদি সমস্তই সুবর্ণ-স্মৃতিবহ। টলেমি নিম্নগঙ্গা-অঞ্চলে যে সোনার খনির কথা বলিতেছেন তাহা একান্ত কাল্পনিক না-ও হইতে পারে।

কুষাণ মুদ্রা, মুরণ্ড

কুষাণ-আমলের কিছু কিছু সুবর্ণ ও অন্য ধাতব মুদ্রা বাঙলাদেশে পাওয়া গিয়াছে। মহাস্থানের ধ্বংসস্তূপেও কনিষ্কের (?) মূর্তি-চিহ্নিত একটি সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। বাঙলাদেশের কুষাণাধিপত্যের কোনও অকাট্য প্রমাণ নাই ; এই সব মুদ্রা হয়তো বাণিজ্যসূত্রে এখানে আসিয়া থাকিবে। তবে, টলেমি গঙ্গার পূর্বদিকে (India Extra-Gangem-র) কোনো স্থানে Murandooi নামে এক কৌমজনপদের উল্লেখ করিয়াছেন। এই মুরণ্ডরা পঞ্জাব অঞ্চলের সুপরিচিত মুরুণ্ডদের সঙ্গে সংপৃক্ত হইলেও হইতে পারেন। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ-স্তম্ভলিপিতে কুষাণ রাজবংশ এবং শক-মুরুণ্ডদের উল্লেখ আছে। শক-মুরুণ্ড বলিতে কেহ বুঝেন 'শক-প্রধান', কেহ বা মনে করেন শক এবং মুরণ্ড দুইটি পৃথক কোম। টলেমির উল্লেখ হইতে মনে হয়, মুরণ্ড বা মুরুণ্ড এক স্বতন্ত্র কোম। ইঁহারা যদি কখনো বাঙলাদেশের অধিবাসী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে শক এবং কুষাণ জনগোষ্ঠী সংপৃক্ত মুরুণ্ডরা হয়তো প্রথম বা দ্বিতীয় শতকে কখনো বাঙলাদেশে আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকিবেন, এবং কুষাণ মুদ্রার প্রচলন তাঁহারাই করিয়া থাকিবেন। তবে, এ-সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছুই বলিবার উপায় নাই।

সামাজিক ইঙ্গিত, আর্থিক ও বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি

বস্তুত, গ্রীক-লাতিন লেখকবর্গ-কথিত গঙ্গারাষ্ট্র এবং মৌর্য-আমলের পর হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীষ্টোত্তর চতুর্থ শতকের প্রারম্ভে গুপ্তরাজবংশ প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত প্রাচীন বাঙলার রাজবৃত্তকাহিনী সম্বন্ধে স্বল্প তথ্যই আমরা জানি। দুই চারিটি বিচ্ছিন্ন সংবাদ ছাড়া রাজা, রাজবংশ বা রাষ্ট্র সম্বন্ধে কিছুই নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় নাই। অথচ, পেরিপ্লাস ও টলেমির বিবরণ, মিলিন্দপঞ্‌হ্‌, জাতকের গল্প, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিতেছি, এই সময়ে বাঙলাদেশে সমৃদ্ধ ও বিস্তৃত ব্যবসা-বাণিজ্যের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ; বাণিজ্যসূত্রে ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশ এবং ভারতের বাহিরে বিদেশের সঙ্গে—একদিকে মিশর ও রোম সাম্রাজ্য, অন্যদিকে পূর্ব-দক্ষিণ এশিয়ার দেশ ও দ্বীপপুঞ্জ এবং চীন—তাহার যোগাযোগ। বৌদ্ধধর্ম প্রচারসূত্রে সিংহল ও পূর্ব-দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে যোগাযোগেরও কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। রাষ্ট্র ও সমাজগত শাসন শৃংখলা বর্তমান না থাকিলে এই ধরনের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ, বিশেষভাবে সুসমৃদ্ধ, সুদূরপ্রসারী অন্তঃ ও বহির্বাণিজ্য কিছুতেই সম্ভব হইত না। সুবর্ণমুদ্রার প্রচলনও এই অনুমানের অন্যতম ইঙ্গিত। এই যুগের বিভিন্ন বাণিজ্যিক দ্রব্য-সম্ভারের কথা পেরিপ্লাস ও টলেমির বিবরণে সবিশেষ উল্লিখিত আছে ; ধনসম্বল ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসঙ্গে তাহা আলোচনাও করিয়াছি। সোনা, মণি-মুক্তা, বিচিত্র সূক্ষ্ম রেশম ও কার্পাস বস্ত্র, নানাপ্রকার মসলা ও গন্ধদ্রব্য ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে দেশ-বিদেশে রপ্তানী হইত,

এবং তাহার ফলে দেশে প্রচুর অর্থাগম হইত। তাহা ছাড়া, যুদ্ধের ও যানবাহনের একটি মস্ত বড় উপকরণ—হস্তী—প্রাচীন বাঙলা ও কামরূপ হইতে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে যাইত, তাহার প্রমাণ তো বারবার পাওয়া যায়। দিয়দোরস ও প্লুতার্ক উগ্রসেন্যের সৈন্যবাহিনীর যে বিবরণ দিতেছেন তাহার তুলনামূলক আলোচনা হইতে মনে হয়, প্রাচ্য বাহিনীতে যেমন গঙ্গারাষ্ট্র বাহিনীতেও তেমনই যথেষ্ট সংখ্যক হস্তী ছিল। মহাভারত ও অর্থশাস্ত্রের সাক্ষ্য পুনরুল্লেখ করিয়া লাভ নাই। যাহাই হউক, এই আমলে বাঙলাদেশ নানা ধনরত্নে ও উৎপন্ন দ্রব্যাদিতে খুবই সমৃদ্ধ ছিল, সন্দেহ নাই; এবং এই সমৃদ্ধির আকর্ষণেই মহাপদ্মনন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া গুপ্তদের আমল পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন রাজবংশ একের পর এক বাঙলাদেশে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করিয়াছেন, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সফলকামও হইয়াছেন। আর, বাণিজ্য-বিস্তারের চেষ্টা তো মিশর দেশ হইতে আরম্ভ করিয়া চীন পর্যন্ত সকলেই করিয়াছে। মহাবোধিবংশ-গ্রন্থে মহাপদ্মের কনিষ্ঠতম পুত্রের নাম পাইতেছি ধন (নন্দ); এই ধননন্দ সম্বন্ধে সিংহলী মহাবংশ-গ্রন্থে বলা হইয়াছে, এই রাজা প্রভূত ধন সংগ্রহ করিয়াছিলেন নানা ন্যায় ও অন্যায় উপায়ে; ধনের পরিমাণ দেওয়া হইয়াছে আশী কোটি; বোধ হয় সুবর্ণমুদ্রাই হইবে; এই ধন তিনি গঙ্গার নীচে এক সুড়ঙ্গের ভিতর লুকাইয়া রাখিতেন। য়ুয়ান-চোয়াঙ্‌ও এ-বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছেন। কথাসরিৎসাগরের এক গল্পেও আছে যে, নন্দরাজের ধনের পরিমাণ ছিল নিরানব্বই কোটি সুবর্ণখণ্ড (মুদ্রা?)। নন্দদের এই বিপুল অর্থ ও সম্পদের কতকটা অংশ যে গঙ্গারাষ্ট্র হইতে সংগৃহীত হইত এ-সম্বন্ধে তো কোনো সন্দেহ থাকিতে পারে না। মৌর্যরাও নিশ্চয়ই এই বিপুল ধনের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন; বিশেষত কৌটিল্য অর্থনৈতিক শাসন-ব্যবস্থার যে-ইঙ্গিত দিতেছেন তাহাতে তো রাজকোষে প্রচুর অর্থাগম হওয়ার কথা। এ-বিষয়ে কিছু পরোক্ষ প্রমাণও মহাস্থান শিলাখণ্ডলিপিতে সুবর্ণমুদ্রার প্রচলন ইত্যাদি সাক্ষ্যে পাওয়া যাইতেছে।

আর্যীকরণ ও পরাজয়ের হেতু

মধ্য ও উত্তর-ভারত হইতে যে-সব রাজবংশ, যে-সব বণিক ও ব্যবসায়ী যুদ্ধ, রাষ্ট্রকর্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে বাঙলাদেশে আসিয়াছেন, তাঁহারাই সঙ্গে সঙ্গে মধ্য ও উত্তর-ভারতের আর্য-ভাষা, আর্য-ধর্ম এবং আর্য-সংস্কৃতিও বহন করিয়া আনিয়াছেন। তাঁহারাই পথ ও ক্ষেত্র রচনা করিয়াছেন এবং সেই পথ বাহিয়া সেই সব ক্ষেত্রে আসিয়া আর্য অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছেন আর্য-ধর্ম ও শিক্ষার প্রচারকেরা। প্রথমে জৈন-ধর্ম ও সংস্কৃতি, পরে বৌদ্ধ-ধর্ম ও সংস্কৃতি এবং আরও পরে, বিশেষ ভাবে গুপ্ত আমলে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম ও সংস্কৃতি ক্রমশ বাঙলাদেশে বিস্তার লাভ করিয়াছে। যে-

আমলের কথা বলিতেছি, সেই আমলে বিশেষ ভাবে আসিয়াছে জৈন ও বৌদ্ধ-ধর্মের প্রভাব, এবং দুই ধর্মকে আশ্রয় করিয়া আর্য ভাষা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি।

বাধা ও বিরোধ গড়িয়া তোলা সত্ত্বেও সমসাময়িক বাঙলার প্রাচীন কোমগুলি এই প্রভাব ঠেকাইতে পারে নাই। রাষ্ট্রক্ষেত্রে পরাভব স্বীকারের প্রধান সামাজিক কারণ, এই সব প্রাচীন কোমগুলি তাহাদের কৌম-সামাজিক মন পরিত্যাগ করিয়া কৌমসীমা অতিক্রম করিয়া রাজতন্ত্রের বৃহত্তর সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিধির মধ্যে স্থায়ীভাবে ঐক্যবদ্ধ হইতে পারে নাই; নিজ নিজ কৌম স্বার্থবুদ্ধিই বোধ হয় এই পরাভবের কারণ। রাষ্ট্র ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে বাহিরের বিজেতা রাষ্ট্রগুলির উন্নততর উৎপাদন ব্যবস্থা এবং উন্নততর শস্ত্র ও যুদ্ধপ্রণালী নিঃসন্দেহে যেমন পরাভবের অন্যতম কারণ, তেমনই উহাদের উন্নততর সামাজিক ব্যবস্থাও ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পরাভবের হেতু, এ-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ স্বল্প। আর, অর্থ ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে পরাভব ঘটিলে ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও অল্প বিস্তর পরাভব ঘটে যে অনিবার্য তাহা তো আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাসে বারবারই দেখা গিয়াছে, এমন কি সুপ্রাচীন সংস্কৃতি-সম্পন্ন চীন ও ভারতবর্ষের মতন দেশেও।

৪

বাঙলায় গুপ্তাধিপত্য: আঃ ৩০০-৫৫০ খ্রীষ্টাব্দ

খ্রীষ্টোত্তর তৃতীয় শতকের শেষ বা চতুর্থ শতকের সূচনা হইতেই প্রাচীন বাঙলা দেশ যে নিঃসংশয়ে কৌম সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, তাহার কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। কৌমতন্ত্র আর নাই; রাজতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; রাষ্ট্রীয় চেতনার সঞ্চার হইয়াছে; বাহির হইতে আক্রমণের প্রতিরোধ সংঘবদ্ধ হইয়াছে; জনপদগুলির কৌম-নাম জনপদ-নামে বিবর্তিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে; পুষ্করণ, সমতট প্রভৃতি নূতন রাজ্যের নাম শুনা যাইতেছে, যদিও বঙ্গ এবং অন্যান্য রাজ্যও বিদ্যমান।

বঙ্গজনসমূহ

দিল্লীর কুতব-মিনারের কাছে মেহেরৌলি-লৌহস্তম্ভের লিপিতে চন্দ্র নামক এক রাজা বঙ্গজনপদ সমূহে (বঙ্গেষু) তাঁহার শত্রু-নিধনের গৌরব দাবি করিতেছেন। "বঙ্গেষু" অর্থে বঙ্গ ও তৎসংলগ্ন জনপদগুলি বুঝাইতে পারে, আবার বঙ্গের অন্তর্গত বিভিন্ন ক্ষুদ্রতর জনপদখণ্ডও বুঝাইতে পারে। যে-অর্থেই হউক, মেহেরৌলি-লিপিতে

একথাও বলা হইয়াছে যে, বঙ্গীয়েরা একত্র সংঘবদ্ধ হইয়া রাজা চন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ রচনা করিয়াছিল। এই চন্দ্র কে, তাহা লইয়া ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিচিত্র মত আছে। কাহারও মতে ইনি গুপ্তসম্রাট্ প্রথম চন্দ্রগুপ্ত, কাহারও মতে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত; কেহ কেহ আবার মনে করেন ইনি সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ লিপির চন্দ্রবর্মা, যে-চন্দ্রবর্মা ছিলেন সিংহবর্মার পুত্র এবং পুষ্করণের অধিপতি (শুশুনিয়া লিপি)। অথবা, এমনও হইতে পারে, তিনি একেবারে স্বতন্ত্র নরপতি ছিলেন। ইনি যিনিই হউন, এ-তথ্য সুস্পষ্ট যে, বঙ্গজনেরা চন্দ্রের আক্রমণ পর্যন্ত স্বাধীন ও স্বতন্ত্র, এবং চন্দ্রের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ রচনা করা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তাঁহারা পরাভূত হইয়াছিলেন।

পুষ্করণ

বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পাহাড়ের একটি লিপিতে সিংহবর্মাপুত্র পুষ্করণাধিপ চন্দ্রবর্মা নামক এক রাজার খবর পাওয়া যাইতেছে। শুশুনিয়া পাহাড়ের প্রায় ২৫ মাইল উত্তর-পূর্বদিকে বর্তমান পোখর্ণা গ্রাম প্রাচীন পুষ্করণের স্মৃতি আজও বহন করিতেছে বলিয়া মনে হয়। এই পুষ্করণাধিপই বোধ হয় সমসাময়িক রাঢ়ের অধিপতি। কেহ কেহ মনে করেন, ইনিই এলাহাবাদ-লিপিকথিত এবং গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্ত কর্তৃক পরাজিত চন্দ্রবর্মা।

সমতট, ডবাক

সমুদ্রগুপ্ত পুষ্করণাধিপ চন্দ্রবর্মাকে পরাজিত করিয়াছিলেন কিনা, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলেও তিনি যে সমতট ছাড়া প্রাচীন বাঙলার আর প্রায় সকল জনপদই গুপ্ত-সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। তাঁহার বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের পূর্বতম প্রত্যন্ত রাজ্য ছিল নেপাল, কর্তৃপুর, কামরূপ, ডবাক এবং সমতট। সমতট নিঃসন্দেহে দক্ষিণ ও পূর্ব-বঙ্গের কিয়দংশ, ত্রিপুরা অঞ্চল যাহার কেন্দ্র। কিন্তু, প্রত্যন্ত রাজ্য হইলেও সমতটের রাজা সমুদ্রগুপ্তের আদেশ পালন করিতেন এবং তাঁহাকে যথোচিত সম্মান ও যথোপহার দান করিতেন। সমুদ্রগুপ্তই বাঙলায় প্রথম গুপ্তাধিকার প্রতিষ্ঠা করেন নাই। সে-অধিকার বোধ হয় প্রথম চন্দ্রগুপ্তেরও আগে কোনও রাজা প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকিবেন। চীন পরিব্রাজক ই-ৎসিঙ্ বলিতেছেন, মহারাজ শ্রীগুপ্ত নামে একজন নরপতি চীন দেশীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জন্য গঙ্গার তীর ধরিয়া নালন্দা হইতে চল্লিশ যোজন পূর্বে মি-লি-কিয়া-সি-কিয়া-পো-নো নামে একটি ধর্মস্থান নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন এবং মন্দিরের ব্যয় নির্বাহের জন্য চব্বিশটি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। মহারাজ শ্রীগুপ্ত এবং সমুদ্রগুপ্তের প্রপিতামহ মহারাজ গুপ্ত (আনুমানিক তৃতীয় শতকের তৃতীয় বা চতুর্থ পাদ)

বোধ হয় একই ব্যক্তি ; এবং ই-ৎসিঙ্-কথিত মি-লি-কিয়া-সি-কিয়া-পো-নো এবং বরেন্দ্র-ভূমির মৃগস্থাপন স্তূপ (মি-লি-কিয়া-সি-কিয়া-পো-নো=মৃগস্থাপন) একই ধর্মস্থান। এ-তথ্য যদি সত্য হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, বরেন্দ্রভূমি তৃতীয় শতকের তৃতীয়-চতুর্থ পাদেই গুপ্তাধিপত্য স্বীকার করিয়াছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে বাঙলাদেশে পুণ্ড্রবর্ধন যে গুপ্ত-সাম্রাজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল, এবং সেখানকার উপরিক বা উপরিক মহারাজ যে সম্রাট নিজে নিয়োগ করিতেন—কখনো কখনো রাজকুমারদের একজনই নিযুক্ত হইতেন—তাহার ইঙ্গিত একেবারে অকারণ না-ও হইতে পারে। মেহেরৌলি-লিপির চন্দ্র যদি প্রথম চন্দ্রগুপ্ত হইয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি বঙ্গজনদের জয় করিয়াছিলেন, এ-তথ্য স্বীকার করা চলে। প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পুত্র সমুদ্রগুপ্ত পুষ্করণাধিপ চন্দ্রবর্মাকে পরাজিত করিয়া রাঢ়দেশ অধিকার করিয়াছিলেন, এ-তথ্যের সম্ভাবনাও অস্বীকার করা যায় না। এলাহাবাদ-লিপির সাক্ষ্য যদি প্রামাণিক হয় তাহা হইলে অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, সমতট ছাড়া বাঙলা দেশের আর সকল অংশই সমুদ্রগুপ্তের বিস্তৃত সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রানুগতা স্বীকার করিয়াছিল।

গুপ্তাধিকারের কেন্দ্র

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পুত্র প্রথম কুমারগুপ্তের আমল হইতে একেবারে প্রায় ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাঙলার গুপ্ত রাজত্বের প্রধানতম কেন্দ্র ছিল পুণ্ড্রবর্ধন। ৫০৭-৮ খ্রীষ্টাব্দের আগে কোনো সময়ে সমতটেও গুপ্তাধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল, এ-সম্বন্ধে লিপি-প্রমাণ বিদ্যমান ; এই সময়ে মহারাজ বৈন্যগুপ্ত নামে একজন গুপ্তান্ত্য নামীয় রাজা ত্রিপুরা জেলায় কিছু ভূমিদান করিয়াছিলেন। সম্ভবত বৈন্যগুপ্ত গুপ্তরাষ্ট্রেরই সামন্ত-রাজরূপে পূর্ববাঙলায় রাজত্ব করিতেছিলেন, পরে গুপ্তরাষ্ট্রের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া দ্বাদশাদিত্য এবং মহারাজাধিরাজ উপাধি লইয়া স্বাধীন স্বতন্ত্র নরপতিরূপে খ্যাত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, নিঃসংশয় ঐতিহাসিক তথ্য এই যে, ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এবং সম্ভবত একেবারে শেষ পর্যন্ত বাঙলা দেশ গুপ্তাধিকারভুক্ত ছিল, এবং এই রাজ্যখণ্ডের প্রধান কেন্দ্র ছিল পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তি। এই রাষ্ট্রবিভাগ এত গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া গণ্য হইত যে, সম্রাট স্বয়ং ইহার শাসনকর্তা—উপরিক বা উপরিক-মহারাজ—নিযুক্ত করিতেন, কখনো কখনো স্বয়ং বিষয়পতিও নিযুক্ত করিতেন। সময়ে সময়ে উপরিক-মহারাজ হইতেন একেবারে রাজকুমারদেরই একজন।

সামাজিক ইঙ্গিত ; শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যক সমৃদ্ধি, সওদাগরী ধনতন্ত্র

গুপ্তাধিকারে বাঙলাদেশে সুবর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন প্রায় সর্বব্যাপী বলিলেই চলে। সুবর্ণমুদ্রা ছিল দিনার এবং রৌপ্য মুদ্রা রূপক। সাধারণ গৃহস্থরাও ভূমি ক্রয়-

বিক্রয়ে সুবর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা ব্যবহার করিতেছেন, প্রত্যেকটি লিপির সাক্ষ্য তাহাই। প্রাচীন বাঙলার সর্বোত্তম বাণিজ্যিক সমৃদ্ধিও এই যুগেই। রক্তমৃত্তিকা (মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙ্গামাটি)-বাসী বণিক বুধগুপ্ত এই সময়েরই লোক; তিনি মালয় অঞ্চলে গিয়াছিলেন ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যপদেশে। সোমদেবের কথাসরিৎসাগর, বিদ্যাপতি পুরুষপরীক্ষা, হাজারিবাগ জেলার দুধপানি পাহাড়ের লিপি, বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্র প্রভৃতির ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সাক্ষ্য এই যুগেরই অন্তর্দেশি ও বহির্দেশি বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির দিকে ইঙ্গিত করে। নিকষোত্তীর্ণ, সুমুদ্রিত এবং যথানির্দিষ্ট ওজনের সুবর্ণমুদ্রার বহুল প্রচলনও দেশের আর্থিক সমৃদ্ধির দ্যোতক। মনে হয়, নিয়মিত এবং সুসংবদ্ধ প্রণালীগত রাষ্ট্র শাসন-ব্যবস্থার ফলে দেশের অর্থগত ও সমাজগত-ব্যবস্থার, তথা বাণিজ্য-ব্যবস্থার উন্নতি সম্ভব হইয়াছিল, এবং তাহারই ফলে দেশের এই সমৃদ্ধি। প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই, কিন্তু পরোক্ষ প্রমাণ বিদ্যমান। এই যুগের প্রায় প্রত্যেকটি লিপিতেই দেখিতেছি, স্থানীয় রাষ্ট্রাধিকরণ (বিষয়াধিকরণ) যে পাঁচটি লোক লইয়া গঠিত তাহার মধ্যে দুইজন বোধ হয় রাজপুরুষ, বাকী তিনজনই শিল্পী, বণিক ও ব্যবসায়ী সমাজের প্রতিনিধি—নগরশ্রেষ্ঠি, প্রথম সার্থবাহ এবং প্রথম কুলিক। ব্যবসা-বাণিজ্যের সমৃদ্ধি ছিল বলিয়াই রাষ্ট্রে এই সব সম্প্রদায়ের প্রাধান্যও স্বীকৃত হইয়াছিল; অথবা এমনও হইতে পারে, এই সমৃদ্ধির পশ্চাতে রাষ্ট্রের সজ্ঞান একটা চেষ্টা ছিল এবং সে-চেষ্টারই কতকটা রূপ আমরা দেখিতেছি এই রাষ্ট্রাধিকরণগুলিতে। বঙ্গের বাহিরে অন্য রাষ্ট্র-বিভাগের সাক্ষ্য যদি পুণ্ড্রবর্ধনের পক্ষেও প্রামাণিক হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়, শ্রেষ্ঠী, সার্থবাহ ও কুলিক প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই নিজ নিজ নিগম বা সংঘ ছিল, নিজেদের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা ও বিস্তারের জন্য, এবং প্রত্যেক নিগম বা সংঘের যিনি প্রধান সভাপতি ছিলেন তিনিই স্থানীয় রাষ্ট্রাধিকরণের সভ্য হইতেন, ইহা অসঙ্গত অনুমান নয়। রাষ্ট্রে বণিক, শ্রেষ্ঠী ও ব্যবসায়ী সমাজের এই আধিপত্য, দেশিয় ও বৈদেশিক বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি, সুবর্ণমুদ্রার প্রচলন, বাৎস্যায়ন-বর্ণিত নাগর-জীবনের বিলাস-লীলা, এই সমস্তই সওদাগরী ধনতন্ত্রের দিকে নিঃসংশয় ইঙ্গিত দান করে। এই যুগের বাঙলার সামাজিক ধন শ্রেষ্ঠী-বণিক-ব্যবসায়ী সমাজের আয়ত্তে, এবং সেই ধনেই রাষ্ট্র পুষ্ট। সামাজিক ধন উৎপাদন ও বণ্টনের সাধারণ নিয়মে রাষ্ট্র যেমন ইঁহাদের পোষাক ও সমর্থক, ইঁহারাও তেমনই রাষ্ট্রের প্রধান ধারক ও সমর্থক। শুধু ভূমি ক্রয়-বিক্রয়-দানের ব্যাপারে নয়, স্থানীয় সকল ব্যাপারে এই সমাজই অন্যতম কর্তা; এমন কি, লিপিপ্রমাণ দেখিলে মনে হয়, রাজপুরুষকেও বোধ হয় ইঁহাদের নির্দেশ মান্য করিয়া চলিতে হইত। এই সব সাক্ষ্য-প্রমাণ ও তথ্য রাষ্ট্র-বিন্যাস অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচিত হইয়াছে; এখানে রাজবৃত্তের আবর্তন-বিবর্তন প্রসঙ্গে সেই ইঙ্গিত-গুলির উল্লেখ রাখিয়া যাইতেছি মাত্র। লক্ষণীয় এই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে কৃষি-সমাজের কোনো স্থান রাষ্ট্রে প্রায় নাই বলিলেই চলে। কৃষি ও সাধারণ গৃহস্থ-সমাজ

তো নিশ্চয়ই ছিল ; ভূমির মাপ-জোখ, পট্টোলী-রেজেষ্টির সাক্ষী ইত্যাদি ব্যাপারে তাঁহারা স্থানীয় অধিকরণের সাহায্যও করিতেছেন, কিন্তু রাষ্ট্রযন্ত্রে তাঁহাদের প্রাধান্য তো নাই-ই, স্থানও নাই। এই যুগের দুইটি মাত্র লিপিতে (ধনাইদহ লিপি, ৪৩২-৩৩ এবং ৩নং দামোদরপুর লিপি, ৪৮২-৮৩) ভূমি ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে রাজপ্রতিনিধির (আয়ুক্তক) সঙ্গে রাজকার্য নির্বাহ যাঁহারা করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে বিত্তবান ব্যবসায়ী-সমাজের প্রতিনিধিদের কাহাকেও দেখিতেছি না, পরিবর্তে দেখিতেছি স্থানীয় মহত্তর (প্রধান প্রধান লোক), গ্রামিক (গ্রাম-প্রধান), কুটুম্বিক (সাধারণ গৃহস্থ) এবং অষ্ট-কুলাধিকরণদের। ধনাইদহ পট্টোলী-উল্লিখিত ভূমি খাদা (খাটা ?) পার-বিষয়ের অন্তর্গত ; দামোদরপুর পট্টোলীর নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল পলাশবৃন্দকের অধিকরণ হইতে। মনে হয়, এই দুইটি স্থানীয় অধিকরণ-শাসিত জনপদখণ্ডে শিল্প-বাণিজ্য-ব্যবসায়ের প্রসিদ্ধি ছিল না, এবং শ্রেষ্ঠী-বণিক-ব্যবসায়ী শিল্পীকুলের কোনও নিগম বা সংঘ ছিল না। বস্তুত, এই সব অধিকরণ গ্রামাধিকরণ ; তবে, স্থানীয় সমাজ একান্তভাবে কৃষিসমাজ না-ও হইতে পারে, কারণ মহত্তর, গ্রামিক, কুটুম্বিরা সকলেই যে কিছু সম্পূর্ণ কৃষিনির্ভর ছিলেন, এমন কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। মধ্যবিত্ত সমাজ তো একটা ছিলই, সেই সমাজের লোকেরা ভূমিলব্ধ আয়নির্ভর যেমন ছিলেন, তেমনই কিছুটা পরিমাণে শিল্প-বাণিজ্য-ব্যবসায়নির্ভরও বোধ হয় ছিলেন।

অবসরপুষ্ট নাগর সমাজ

যে শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যনির্ভর সমাজের কথা এই মাত্র বলিয়াছি স্বভাবতই তাহার কেন্দ্র ছিল নগরগুলিতে। এই নাগর-সমাজের জীবন-প্রণালীর কিছু কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায় বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্রে। বাৎস্যায়ন আনুমানিক চতুর্থ-পঞ্চম শতকের লোক, কাজেই আলোচ্য যুগের সমসাময়িক। গ্রাম ও নগর-বিন্যাস অধ্যায়ে প্রাচীন বাঙলার নাগরজীবন সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে ; এখানে এ কথা বলিলেই যথেষ্ট যে, সওদাগরী ধনতন্ত্রে পুষ্ট নগর-সমাজে যে অবসর ও বিলাসলীলা, যে কামচাতুর্যলীলা রাজান্তঃপুরে এবং ধনী সমাজের গৃহান্তঃপুরে পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বত্র দৃষ্টিগোচর হয়, ভারতবর্ষেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। তবে, বাঙলাদেশ চিরকালই উত্তর-ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির প্রত্যন্তদেশে অবস্থিত বলিয়া, এবং এখানে আর্যপূর্ব গ্রাম্য সমাজ ও সংস্কৃতির প্রভাব বহুদিন সক্রিয় ছিল বলিয়া এদেশে নগর ও নাগর-সমাজ কোনদিনই খুব একান্ত ও সমাদৃত হইয়া উঠিতে পারে নাই। তবু সামাজিক আবর্তন-বিবর্তনের নিয়ম এবং উত্তর-ভারতের স্পর্শ এড়াইয়া যাওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। নাগরকদের বিলাস-অবসরময় দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা সম্বন্ধে বাৎস্যায়ন যাহা বলিয়াছেন তাহা কতকাংশে বাঙলাদেশের প্রতিও প্রযোজ্য

একাধিক জায়গায় তিনি প্রাচীন বাঙলার (গৌড়ের) পুরুষদের সৌন্দর্যবোধ ও সৌন্দর্য-চর্চার উল্লেখ করিয়াছেন; তাঁহারা যে লম্বা লম্বা নখ রাখিয়া আঙুলের সৌন্দর্যচর্চা করিতেন তাহাও উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই। বঙ্গ ও গৌড়ের রাজান্তঃপুরে নানাপ্রকার কামচাতুর্য-লীলা অভিনীত হইত, একথাও তিনি বলিতেছেন।

পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি

আগেকার রাষ্ট্রপর্বে দেখিয়াছি বাঙলায় জৈন ও বৌদ্ধধর্মের প্রসার, এবং এই দুই ধর্মকে আশ্রয় করিয়া আর্যভাষা ও সংস্কৃতির বিস্তার। এই যুগেও এই দুই ধর্মের বিস্তার অব্যাহত, এবং রাষ্ট্র ও রাজবংশের সমর্থন ও পোষকতা ইহাদের পশ্চাতে বিদ্যমান। অশ্বমেধযাজী ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও গুপ্ত-সম্রাটেরা এই দুই ধর্মের, বিশেষত বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরক্ত ও শ্রদ্ধাবান ছিলেন। নালন্দা-মহাবিহারের গোড়াপত্তন তো তাঁহাদের পোষকতায়ই হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়; অন্তত য়ুয়ান-চোয়াঙের সাক্ষ্য তাহাই। সারনাথ-বিহারের ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি-সাধনার পিছনেও তাঁহাদের পোষকতা সক্রিয় ছিল, এ-সম্বন্ধেও সন্দেহ করিবার কিছু নাই। বাঙলাদেশেও অনুরূপ সাক্ষ্য বিদ্যমান। ই-ৎসিঙের মি-লি-কিয়া-সি-কিয়া-পো-নো যদি ফুসে' (Foucher)-কথিত বরেন্দ্রদেশান্তর্গত মৃগস্থাপন স্তূপ হইয়া থাকে তাহা হইলে মহারাজা শ্রীগুপ্ত বৌদ্ধধর্মের একজন পোষক ছিলেন, স্বীকার করিতে হয়। পাহাড়পুর পট্টোলীর (৪৭৮-৭৯) সাক্ষ্য হইতে মনে হয়, জৈনধর্ম ও সংঘও গুপ্তরাজাদের সমর্থন লাভ করিয়াছিল। মহারাজ বৈন্যগুপ্ত ছিলেন মহাদেবের ভক্ত অর্থাৎ শৈব; তিনি তাঁহার সামন্ত মহারাজ রুদ্রদত্তের অনুরোধে ত্রিপুরা জেলার গুণাইঘর (গুণিকাগ্রহার) গ্রামে কিছু ভূমি দান করিয়াছিলেন, মহাযানাচার্য শান্তিদেব প্রতিষ্ঠিত মহাযানিক অবৈবর্তিক ভিক্ষুসংঘের আশ্রম-বিহারের সেবার জন্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্মর্তব্য যে, গুপ্তরাজবংশ ছিল ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী, এবং ইঁহাদের রাজত্বকালেই ভারতবর্ষে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম—এখন আমরা যাহাকে বলি হিন্দুধর্ম—তাহার অভ্যুত্থান ও প্রসারলাভ ঘটে। মৎস্য, বায়ু, বিষ্ণু প্রভৃতি প্রধান প্রধান পুরাণগুলি এই যুগেই রচিত হয়, এবং পৌরাণিক দেবদেবীরা এই সময়ই পূজা ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে আরম্ভ করেন। জৈন ও বৌদ্ধধর্মের প্রতি রাজকীয় ঔদার্য ও পোষকতা থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা এই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সবিশেষ পোষক ও ধারক হইবেন, এবং এই ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রচারে সচেষ্ট হইবেন, ইহাই তো স্বাভাবিক। বাঙলাদেশের সমসাময়িক লিপিগুলির সাক্ষ্যও তাহাই। অধিকাংশ লিপিতেই ব্রাহ্মণদের সাক্ষাৎ তো পাই-ই, ভূমিদান তো তাঁহারাই লাভ করিতেছেন, ছান্দোগ্য-ব্রাহ্মণের উল্লেখও একটি লিপিতে আছে (ধনাইদহ লিপি); কিন্তু তাহার চেয়েও লক্ষণীয়, বিবিধ ব্রাহ্মণ্য যাগযজ্ঞ এবং পৌরাণিক দেবদেবী পূজার প্রচলন, ব্রাহ্মণদের জন্য নূতন নূতন বসতি স্থাপন, ইত্যাদি।

অগ্নিহোত্র যজ্ঞ, পঞ্চ মহাযজ্ঞ, চক্রস্বামী (বিষ্ণু), কোকামুখস্বামী, শ্বেতবরাহস্বামী, নামলিঙ্গ, গোবিন্দস্বামী, অনন্তনারায়ণ মহাদেব, প্রদ্যুম্নেশ্বর প্রভৃতি দেবতার পূজা, বলি-চরু-সত্র প্রবর্তন, গব্য-ধূপ-পুষ্প-মধুপর্ক-দীপ ইত্যাদি পূজোপকরণ প্রভৃতির সাক্ষাৎ বাঙলাদেশে এই প্রথম পাওয়া যাইতেছে। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতি সমাজের অন্তত একটা অংশের—এবং এই অংশই সমাজের প্রতিষ্ঠাবান্ অংশ—সবিশেষ শ্রদ্ধা ও পোষকতা কিছুতেই দৃষ্টি এড়াইবার কথা নয়। এই যুগে ইঁহারা যে ক্রমশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছেন এবং ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের আদর্শ বলবত্তর হইতেছে তাহার সবিশেষ প্রমাণ পাই যখন দেখি সাধারণ গৃহস্থ ব্যক্তিরাও নূতন নূতন ব্রাহ্মণ বসতি করাইবার জন্য ভূমি ক্রয় করিতেছেন এবং তাহা ব্রাহ্মণদের দান করিতেছেন। ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করিবার যে-রীতি পরবর্তীকালে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপ্রচলিত হইয়াছে তাহার সূত্রপাতও দেখি এই সময় হইতে। অব্যবহিত পরবর্তী যুগে যে এই অভ্যাস আরও বাড়িয়াই গিয়াছে, তাহার প্রমাণ ষষ্ঠ এবং সপ্তম শতকের প্রত্যেকটি লিপিতেই পাওয়া যাইবে। লোকনাথের ত্রিপুরা-পট্টোলীতে দেখিতেছি, রাজা লোকনাথের মহাসামন্ত ব্রাহ্মণ প্রদোষশর্মা সুব্বুঙ্গ বিষয়ের অরণ্যময় ভূমিতে অনন্ত-নারায়ণের এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এবং তাহারই সন্নিকটে চতুর্বেদবিদ্যাবিশারদ (চাতুর্বিদ্য) ত্রিশতাধিক ব্রাহ্মণের বসতি স্থাপন করিয়া দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের এই যে সবিশেষ পোষকতা ইহার রাষ্ট্রীয় ইঙ্গিত লক্ষণীয়; এই পোষকতার ফলেই ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্য সমাজ রাষ্ট্রের অন্যতম ধারক ও পোষক শ্রেণীরূপে গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করে, এবং তাঁহারাই ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির আদর্শ নির্দেশের নিয়ামক হইয়া উঠেন। উত্তর-ভারতে এই শ্রেণী ও শ্রেণীগত সমাজের ঐতিহাসিক বিবর্তন আগেই দেখা দিয়াছিল। গুপ্তাধিপত্যকে আশ্রয় করিয়া বাঙলাদেশে সেই বিবর্তন এই যুগেই, অর্থাৎ চতুর্থ হইতে ষষ্ঠ শতকের মধ্যে সর্বপ্রথম দেখা দিল; এবং ইহাদের অবলম্বন করিয়াই আর্য ভাষা, আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতির স্রোত সবেগে বাঙলাদেশে প্রবাহিত হইল। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণকথা, বিচিত্র লৌকিক গল্প-কাহিনী ইত্যাদি সমস্তই সেই স্রোতের মুখে এদেশে আসিয়া পড়িয়া এদেশের প্রাচীনতম ধর্ম, সংস্কৃতি, ভাষা, লোককাহিনী সমস্ত কিছুকে সবেগে সমাজের একপ্রান্তে অথবা নিম্নস্তরে ঠেলিয়া নামাইয়া দিল। উচ্চতর শ্রেণীগুলির ভাষা হইল আর্য ভাষা; ধর্ম হইল বৌদ্ধ, জৈন বা পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম; সাংস্কৃতিক আদর্শ গড়িয়া উঠিল আর্যাদর্শানুযায়ী। প্রত্যন্তস্থিত বাঙলাদেশ এই যুগে উত্তর-ভারতের বৃহত্তর রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ধারার সঙ্গে যুক্ত হইয়া গেল; এবং তাহা সম্ভব হইল বাঙলাদেশ গুপ্ত রাজবংশের প্রায় সর্বভারতীয় সাম্রাজ্যের অংশ হওয়ার ফলে, ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত আদান-প্রদানের ফলে, ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কৃতির প্রসারের ফলে।

৫

যুগান্তর ও বঙ্গ-গৌড়ের স্বাতন্ত্র্য আঃ ৫০০- ৬৫০

খ্রীষ্টোত্তর পঞ্চম শতকে দুর্দ্ধর্ষ হূণেরা ভারতবর্ষের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং গুপ্ত-সাম্রাজ্যের বুকের উপর বসিয়া তাহার ভিত্তি একেবারে ঝাঁকিয়া নাড়িয়া দুর্বল করিয়া দিল। প্রায় এই সময়ই বা তাহার কিছু আগে এই হূণদেরই আর এক শাখা য়ুরোপের বুকের উপর পড়িয়া পূর্ব ও মধ্য-য়ুরোপের রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থা তছনছ করিয়া দিয়াছিল। ষষ্ঠ শতকের গোড়ায় গুপ্ত-সাম্রাজ্যের দুর্বলতা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল; পূর্বতম প্রত্যন্তে সামন্ত নরপতি মহারাজ বৈন্যগুপ্ত স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়া মহারাজাধিরাজ হইয়া উঠিলেন। মধ্য-ভারতে মান্দাসোর অঞ্চলের বংশগোত্র পরিচয়-বিহীন যশোধর্মণ নামে জনৈক দিগ্বিজয়ী বীর প্রবল প্রতাপশালী হইয়া উঠিয়া শিথিলমূল গুপ্তসাম্রাজ্যসৌধটিকে প্রায় ধরাশায়ী করিয়া দিলেন। যশোধর্মণ লৌহিত্যতীর পর্যন্ত তাঁহার অপরাভূত সৈন্যবাহিনী লইয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন, এবং সম্ভবত বাঙলাদেশ আর একবার বৈতসীবৃত্তি আশ্রয় করিয়া এই অপরাজেয় যোদ্ধার কাছে মস্তক অবনত করিয়াছিল। তিনি দুর্দ্ধর্ষ হূণদেরও পরাজিত করিয়া তাঁহাদের নেতা মিহিরকুলকে তাড়াইয়া লইয়া গিয়াছিলেন কাশ্মীরে। কিন্তু যশোধর্মার দিগ্বিজয় ছিল ক্ষণস্থায়ী, এবং তিনি কোনো রাজবংশ বা স্থায়ী রাজ্য বা রাজত্ব গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই। সুযোগ পাইয়া উত্তর-ভারতের বড় বড় সামন্তেরা স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিয়া নূতন নূতন রাজ্য ও রাজবংশ গড়িয়া তুলিলেন; কনৌজ-কোশলে মৌখরী রাজবংশ এবং স্থানীশ্বরে পুষ্যভূতি বংশ মস্তক উত্তোলন করিল। গুপ্ত-রাজবংশের দুর্বল বংশধর ও প্রতিনিধিরা মগধ-মালবকে কেন্দ্র করিয়া কোনো প্রকারে একদা-প্রদীপ্ত সূর্যের স্মৃতি একটি ক্ষুদ্র দীপ শিখায় জিয়াইয়া রাখিলেন। বাঙলা দেশও এই সুযোগ গ্রহণে অবহেলা করিল না। সর্বাগ্রে স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিল পূর্ব ও দক্ষিণ-বঙ্গ এবং পশ্চিম-বঙ্গের বর্ধমান অঞ্চল। ৫০৭-৮ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরা অঞ্চল অর্থাৎ পূর্ব-বঙ্গ বৈন্যগুপ্তের অধীন ছিল; বর্ধমান অঞ্চল তখন বৈন্যগুপ্তের সামন্ত বিজয়সেনের শাসনাধীনে। অনুমান হয়, এই অঞ্চল হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রিপুরা পর্যন্ত বৈন্যগুপ্তের রাজ্য বিস্তৃত ছিল; এই অঞ্চলই ষষ্ঠ শতকের প্রথম অথবা দ্বিতীয় পাদে, ৫০৭-৮'র কিছু পরে, স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিয়া বসিল। এই শতকেরই শেষপাদে কোনো সময়ে স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিল গৌড়। গৌড় ও বঙ্গের স্বাতন্ত্র্যের ইতিহাসই ষষ্ঠ শতকের দ্বিতীয় পাদ হইতে সপ্তম শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বাঙলাদেশের ইতিহাস; এবং এই ইতিহাস একদিকে ধর্মাদিত্য-গোপচন্দ্র-সমাচারদেবের রাজবংশ এবং অন্যদিকে গৌড়াধিপ শশাঙ্ককে আশ্রয় করিয়া কেন্দ্রীকৃত।

বঙ্গ-গোপচন্দ্রের বংশ

ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া অঞ্চলে প্রাপ্ত পাঁচটি এবং বর্ধমান অঞ্চলে আবিষ্কৃত একটি, এই ছয়টি পট্টোলীতে তিনটি মহারাজাধিরাজের খবর পাওয়া যাইতেছে : গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য এবং নরেন্দ্রাদিত্য সমাচারদেব। ইঁহাদের পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের কি সম্পর্ক তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় নাই, তবে ইঁহারা তিনজনে মিলিয়া অন্যূন ৩৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং এই রাজত্বের কাল মোটামুটি ষষ্ঠ শতকের দ্বিতীয় পাদ হইতে তৃতীয় পাদ পর্যন্ত। লিপি-প্রমাণ হইতে মনে হয়, গোপচন্দ্রই ইঁহাদের প্রথমতম এবং প্রধানতম, এবং ইঁহাদের রাজ্য বর্ধমান অঞ্চল হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে ত্রিপুরা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল ; কেন্দ্রস্থল ছিল বোধ হয় ফরিদপুর অথবা ত্রিপুরা অঞ্চলে। রাজ্যের ছিল দুইটি বিভাগ, একটি বর্ধমানভুক্তি, অপরটি নব্যাবকাশিকা (নূতন অবকাশ বা নবসৃষ্ট ভূমি = ফরিদপুরের কোটালিপাড়া অঞ্চল ?)। বর্ধমান অঞ্চলের যে-বিজয়সেন একদা ছিলেন মহারাজ বৈন্যগুপ্তের সামন্ত তিনি এখন সামন্ত হইলেন গোপচন্দ্রের। আবিষ্কৃত সুবর্ণমুদ্রা হইতে মনে হয়, সমাচারদেবের পরও আরও কয়েকজন রাজা এই সব অঞ্চলে রাজত্ব করিয়াছিলেন ; ইঁহাদের মধ্যে একজনের নাম পৃথুজেবীর (মতান্তরে, পৃথুবীর অথবা পৃথুবীরজ) ও আর একজনের নাম সুধন্যা (বা শ্রীসুধন্যাদিত্য)। বাতাপী বা বাদামীর চালুক্যরাজ কীর্তিবর্মা ৫৯৭-৯৮ খ্রীষ্টাব্দের আগে কোনো সময় একবার বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন। বোধ হয় তাঁহার এই আক্রমণের ফলে, অথবা গৌড়ে শশাঙ্কের অভ্যুদয় ও রাজ্য-বিস্তারের ফলে, অথবা দুইয়েরই সম্মিলিত ফলে বঙ্গের স্বাতন্ত্র্য কিছুদিনের জন্য ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকিবে।

বঙ্গ ও সমতট বৌদ্ধ খড়্গ বংশ

সপ্তম শতকের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদে সমতটে একটি বৌদ্ধ রাজবংশের খবর পাওয়া যাইতেছে আস্রফপুরের দুইটি লিপিতে এবং চীন পরিব্রাজক ই-ৎসিঙ ও সেং-চি'র বিবরণীতে। আস্রফপুরের লিপি দুইটিতে নৃপাধিরাজ খড়্গোদ্যম, (পুত্র) জাতখড়্গ, (পুত্র) দেবখড়্গ এবং (পুত্র) রাজরাজ (ভট্ট) নামে চারজন রাজার খবর পাওয়া যাইতেছে। এই বংশ ইতিহাসে খড়্গ বংশ নামে খ্যাত। ত্রিপুরা জেলার দেউলবাড়ীতে প্রাপ্ত শর্বাণী দেবীর (দুর্গার) একটি মূর্তির পাদপীঠে দেবখড়্গের স্ত্রী এবং রাজরাজভট্টের মাতা প্রভাবতীর নাম উৎকীর্ণ আছে। সেং-চি রাজভট নামে সমতটের এক বৌদ্ধ রাজার নাম করিয়াছেন, এবং ই-ৎসিঙ্ও দেববর্মা নামে পূর্বদেশের এক রাজার খবর দিতেছেন। দেববর্মা ও দেবখড়্গ এক ব্যক্তি হইলেও হইতে

পারেন, না-ও হইতে পারেন; কিন্তু সেং-চি কথিত রাজভট যে আস্রফপুর পট্টোলীর রাজরাজভট্ট, এ-তথ্য নিঃসংশয় বলিলেই চলে। যাহা হউক, এই বংশের অন্তত একটি জয়স্কন্ধাবার ছিল কর্মান্তবাসক (বোধ হয়, ত্রিপুরা জেলার বর্তমান বড়কামৃতা)। আস্রফপুর ঢাকার ত্রিশ মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে। অনুমান হয়, অন্তত বর্তমান ঢাকা ও ত্রিপুরা অঞ্চল এই বংশের রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। যাহাই হউক, খড়্গ এই উপান্ত নাম দেশজ বলিয়া মনে হয় না। খড়্গ বংশের রাজারা কোনো পার্বত্য কোমের প্রতিনিধি হইলেও হইতে পারেন। খড়্গ বংশ বোধ হয় স্বাধীন রাজবংশ ছিল না। রাজরাজভট্টের আস্রফপুর-লিপিতে একখণ্ড ভূমির উল্লেখ আছে; এই ভূমি খণ্ড ইতিপূর্বেই জনৈক "বৃহৎ-পরমেশ্বর" কর্তৃক দান করা হইয়াছিল। এই "বৃহৎ-পরমেশ্বর" কে ছিলেন, বলা কঠিন, তবে, খড়্গরা যে সদ্যোক্ত বৃহৎ-পরমেশ্বরের সামন্তবংশ ছিলেন, এমন অনুমান অযৌক্তিক নয়। সামন্তরাও যে অনেক সময় 'নৃপাধিরাজ', 'অধিমহারাজ' বলিয়া উল্লিখিত হইতেন, এমন প্রমাণ দুর্লভ নয়। খড়্গবংশীয় রাজারা প্রথমে বোধ হয় বঙ্গে রাজত্ব করিতেন, পরে সমতটে রাজত্ব বিস্তার করিয়া থাকিবেন।

সমতট

ত্রিপুরা জেলায় প্রাপ্ত সপ্তম শতকীয় একটি পট্টোলীতে আর একটি সামন্ত রাজবংশের খবর পাওয়া যাইতেছে। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা একজন অধিমহারাজ ছিলেন; তাঁহার পুত্র ছিলেন মহাসামন্ত শিবনাথ, শিবনাথের পুত্র শ্রীনাথ, শ্রীনাথের পুত্র ভবনাথ, তারপর লোকনাথ। অনেকে মনে করেন এই সামন্ত-রাজবংশ খড়্গবংশীয় নৃপাধিরাজদের অধিরাজত্ব স্বীকার করিতেন। এ-সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলিবার উপায় নাই।

সমতটেশ্বর রাত বংশ

লোকনাথের ত্রিপুরা পট্টোলীতে লোকনাথেরই সমসাময়িক জনৈক নৃপ জীবধারণের উল্লেখ আছে। এই জীবধারণ যে-বংশের রাজা ছিলেন সেই বংশকে রাতবংশ বলা যাইতে পারে। ত্রিপুরা জেলার কৈলান গ্রামে অধুনাবিষ্কৃত একটি পট্টোলী হইতে এই বংশের দুইটি রাজার খবর পাওয়া যাইতেছে। অক্ষর-সাক্ষ্য হইতে মনে হয়, এই সামন্ত রাজবংশ সপ্তম শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদে সমতটের অধীশ্বর ছিলেন। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা বোধ হয় ছিলেন সমতটেশ্বর প্রতাপোপনতসামন্তচক্র-শ্রীজীবধারণ রাত; তাঁহার পুত্র ছিলেন সমতটেশ্বর প্রাপ্তপঞ্চমহাশব্দ (অর্থাৎ যিনি একাধারে মহাপ্রতীহার, মহাসান্ধি-বিগ্রহিক, মহাক্ষপটলাধিকৃত, মহাভাণ্ডাগারিক এবং মহাসাধনিক) শ্রীশ্রীধারণরাত; শ্রীধারণের পুত্র ছিলেন যুবরাজ বলধারণ রাত। বলা বাহুল্য, এই রাতবংশও সামন্তবংশ, স্বাধীন রাজবংশ নহেন। তবে খড়্গ বংশ বা লোকনাথের বংশ বা রাতবংশ, ইঁহারা

নামেই শুধু ছিলেন সামন্তবংশ ; কার্যত ইঁহারা স্বাধীন নরপতিদের মতই ব্যবহার করিতেন। রাতবংশের রাজারা ছিলেন ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী, এবং শ্রীধারণ নিজে ছিলেন পরম বৈষ্ণব ; কিন্তু কৈলান-পট্টোলীদ্বারা যে-ভূমি বিক্রীত এবং পট্টিকৃত হইয়াছিল সে-ভূমি রাজার মহাসান্ধিবিগ্রাহিক জয়নাথ দান করিয়াছিলেন একটি বৌদ্ধবিহারে, আর্যসংঘের অশন, বসন এবং ঔষধাদির ব্যয় নির্বাহের জন্য এবং কতিপয় ব্রাহ্মণকে, তাঁহাদের পঞ্চমহাযজ্ঞের ব্যয় নির্বাহের জন্য। শ্রীধারণ ছিলেন পরমকারুণিক, এবং একাধারে কবি, মধুর চিত্র রচয়িতা (অতি মধুরচিত্রগীতৈরুৎপাদয়িতা), শব্দবিদ্যাপারঙ্গম এবং নানা বিদ্যা ও কলায় পারদর্শী। তাঁহার পুত্র বলধারণও শব্দবিদ্যা, শস্ত্রবিদ্যা এবং হস্তী ও অশ্ববিদ্যায় সুনিপুণ ছিলেন।

খড়্গ বংশ, লোকনাথের বংশ এবং রাত বংশের রাজারা প্রায় সমসাময়িক ; ইঁহারা সকলেই আবার সমতটে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কে কাহার পরে সমতটের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন, নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন ; ইঁহাদের বৃহৎ-পরমেশ্বর মহারাজাধিরাজরাই বা কাহারা ছিলেন, তাহাও বলা যায় না। তবে, মনে হয়, খড়্গ বংশ প্রথমে বঙ্গেই রাজত্ব করিতেন, পরে রাজা দেবখড়্গ সমতটে রাজ্যবিস্তার করেন। বোধ হয়, খড়্গদের সামন্ত হিসাবে, অথবা তাঁহাদের অবসানের পর আর কাহারও সামন্ত হিসাবে লোকনাথ সমতটের অধীশ্বর হন, এবং লোকনাথকে পরাজিত করিয়া রাতবংশীয় জীবধারণ নিজ বংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে সমতটে একটি ব্রাহ্মণ রাজবংশ রাজত্ব করিতেছিলেন, এবং নালন্দার বৌদ্ধ মহাস্থবির য়ুয়ান্-চোয়াঙের গুরু শীলভদ্র সেই রাজবংশের সন্তান ছিলেন বলিয়া য়ুয়ান্-চোয়াঙ নিজেই সাক্ষ্য দিতেছেন। এই ব্রাহ্মণ রাজবংশ রাত বংশ হওয়া কিছু অসম্ভব নয়।

অসম্ভব নয় যে, সপ্তম শতকে গৌড়ে এবং উত্তর ও পশ্চিম-দক্ষিণবঙ্গে শশাঙ্ক যে গৌড়তন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন খড়্গ ও রাতবংশীয় রাজারা গোড়ায় তাহারই সামন্ত ছিলেন। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর গৌড়তন্ত্র বিনষ্ট হইলে এই সব সামন্ত বংশ একে একে কার্যত স্বাধীন হইয়া উঠেন।

এই সংক্ষিপ্ত তথ্যবিবৃতি হইতেই বুঝা যাইবে, সপ্তম শতকের শেষাশেষি পর্যন্ত কি অষ্টম শতকের গোড়া পর্যন্ত বঙ্গ ও সমতটের স্বাতন্ত্র্য বজায় ছিল ; কিন্তু ঘন ঘন রাজবংশ পরিবর্তন ও প্রবল সামন্তাধিপত্য দেখিয়া মনে হয়, এই স্বাতন্ত্র্যের মূল শিথিল হইয়া পড়িতেছিল। তাহা ছাড়া, সমসাময়িক অন্যান্য সাক্ষ্য প্রমাণ হইতে জানা যায়, বঙ্গ ও সমতট এই সময় একাধিকবার বহিঃশত্রু দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে, এবং রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলার সূচনা দেখা দিতেছে। এই বিশৃঙ্খলার ইতিহাস পরবর্তী পর্বে আলোচনা করা যাইবে।

সপ্তম শতকের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদে যখন বঙ্গ ও সমতটে খড়্গ ও রাজ-বংশীয় সামন্তদের প্রভুত্ব চলিতেছে তখন গৌড়ের অবস্থাটা কি, তাহা দেখা যাইতে পারে।

গৌড়তন্ত্র

৫নং দামোদর লিপির সাক্ষ্যানুযায়ী পুণ্ড্রবর্ধন ৫৪৪ খ্রীষ্ট শতকেও জনৈক গুপ্ত-রাজের অধীন। মহাসেনগুপ্ত নামক জনৈক গুপ্তান্তনামা নরপতি (আনুমানিক ষষ্ঠ শতকের চতুর্থপাদ) লৌহিত্যতীরে কামরূপরাজ সুস্থিতবর্মাকে পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়া লিপিপ্রমাণ বিদ্যমান। পুণ্ড্রবর্ধন ও গৌড় ষষ্ঠ শতকের চতুর্থ পাদের আগে স্বাতন্ত্র্য লাভ করিতে পারিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক, সপ্তম শতকের সূচনায় দেখা যাইতেছে, জনৈক শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্ক গৌড়ের স্বাধীন স্বতন্ত্র নরপতিরূপে দেখা দিতেছেন, এবং গৌড়রাষ্ট্র উত্তর-ভারতের ইতিহাসে একটি স্বতন্ত্র বিশিষ্ট অধ্যায় রচনা করিতেছে।

গৌড়ের এই স্বাতন্ত্র্য লাভ ঐতিহাসিকেরা সাধারণত যতটা আকস্মিক বলিয়া মনে করেন, ততটা আকস্মিক নয়। ৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দে বা তাহার অব্যবহিত আগে কোনো সময়ে কনৌজ-কোশলের মৌখরীরাজ ঈশানবর্মার সঙ্গে একবার গৌড়জনদের এক সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। হড়াহা লিপিতে ঈশানবর্মা দাবি করিয়াছেন, তিনি গৌড়জনদের সমগ্র জনপদের ভবিষ্যৎ বিনষ্ট করিয়া দিয়া তাঁহাদিগকে সমুদ্রাশ্রয়ী করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। ঈশানবর্মার দাবি একটু অভিনিবেশে বিশ্লেষণ করিলে মনে হয়, ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি সময়েই গৌড় জনপদ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যলাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, এবং এই জনপদ একান্তই সমুদ্রনির্ভর। একাদশ শতকের গুর্‌গি শিলালিপিকেও দেখা যাইতেছে, গৌড়জনদের একটি সমুদ্র-জলদুর্গ ছিল (জলনিধিজলদুর্গং গৌড়োরাজোহধিশেতে)। যাহা হউক, এই গৌড় জনপদ বোধ হয় ষষ্ঠ শতক হইতেই স্বাতন্ত্র্যাভিলাষী, অথবা নামে মাত্র গুপ্তবংশধরদের আয়ত্তে, এবং ঈশানবর্মার গৌড়বিজয় বোধ হয় বংশ-পরম্পরা-বিলম্বিত গুপ্ত-মৌখরী সংঘর্ষের একটি ক্ষুদ্র কাহিনী মাত্র। গুপ্তরাজ মহাসেন-গুপ্তের ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন পুষ্প বা পুষ্যভূতিরাজ প্রভাকরবর্ধন; তাঁহাদের দুই পুত্র ও এক কন্যা; রাজ্যবর্ধন, হর্ষবর্ধন ও রাজ্যশ্রী। রাজ্যশ্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন মৌখরীরাজ গ্রহবর্মা। গৌড়-স্বাতন্ত্র্যের নায়ক শশাঙ্ক ইঁহাদের সকলের, এবং মহাসেনগুপ্তের পরবর্তী গুপ্তরাজ দেবগুপ্তের সমসাময়িক; কাজেই তাঁহার ইতিহাস এবং গৌড়-স্বাতন্ত্র্যের ইতিহাস ইঁহাদের সকলের সঙ্গে জড়িত। সে-ইতিহাস সমসাময়িক লিপিমালা, বাণভট্টের হর্ষচরিত, য়ুয়ান্-চোয়াঙের বিবরণী এবং আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প প্রভৃতি

গ্রন্থে উল্লিখিত, ব্যাখ্যাত ও কীর্তিত হইয়াছে। তাহার ফলে পুষ্যভূতিরাজ হর্ষবর্ধনের সঙ্গে সঙ্গে শশাঙ্ক-কাহিনীও অল্পবিস্তর সুপরিচিত।

শশাঙ্ক

শশাঙ্কের প্রথম পরিচয় মহাসামন্তরূপে। কাহার মহাসামন্ত তিনি ছিলেন, নিঃসংশয়ে বলা কঠিন, তবে, মনে হয়, মহাসেনগুপ্ত বা তৎপরবর্তী মালবাধিপতি দেবগুপ্ত তাঁহার অধিরাজ ছিলেন। রাজ্যবর্ধন কর্তৃক দেবগুপ্তের পরাজয়ের পর শশাঙ্কই যে দেবগুপ্তের দায়িত্ব ও কর্তব্যভার (মৌখরী-পুষ্যভূতি মৈত্রীবন্ধনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম) নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছিলেন ; তাহা হইতে মনে হয়, শশাঙ্ক মগধ-মালবাধিপতি গুপ্ত-রাজাদেরই মহাসামন্ত ছিলেন। যাহা হউক, এ-তথ্য নিঃসংশয় যে, ৬০৬-৭ খ্রীষ্টাব্দের আগে কোনো সময়ে শশাঙ্ক গৌড়ের স্বাধীন নরপতিরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, এবং কর্ণসুবর্ণে (মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙ্গামাটির নিকট কানসোনা) নিজ রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন।

মৌখরীদের সঙ্গে গুপ্তদের একটা সংগ্রাম কয়েক পুরুষ ধরিয়াই চলিয়া আসিতেছিল, এবং তাহা গৌড় ও মগধের অধিকার লইয়াই মনে হয়। দুই পুরুষ সংগ্রাম চলিবার পর বোধ হয় মহাসেনগুপ্তের পিতা নিজের শক্তিবৃদ্ধির উদ্দেশে নিজ কন্যা মহাসেন-গুপ্তাকে পুষ্যভূতিরাজ প্রভাকরবর্ধনের মহিষীরূপে অর্পণ করেন। এই মৈত্রীবন্ধনের ভয়ে কিছুদিন মৌখরী বিক্রম শান্ত ছিল। কিন্তু অবন্তীবর্মার পুত্র গ্রহবর্মা যখন মৌখরী-বংশের রাজা, তখন মালবের সিংহাসনে রাজা দেবগুপ্ত উপবিষ্ট। পক্ষ-প্রতিপক্ষের রূপ তখন বদলাইয়া গিয়াছে। মগধ ইতিমধ্যেই গুপ্তহস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছিল। মালবরাজ মহাসেনগুপ্তের দুই পুত্র, কুমার ও মাধব, প্রভাকরবর্ধনের গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন, এবং মালবের অধিপতি হইয়াছিলেন দেবগুপ্ত। দেবগুপ্তের মৈত্রীবন্ধন গৌড়াধিপ শশাঙ্কের সঙ্গে, যে-শশাঙ্ক মঞ্জুশ্রীমূলকল্প-গ্রন্থের মতে ইতিমধ্যেই বারাণসী পর্যন্ত তাঁহার আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। অন্য দিকে গ্রহবর্মাও ইতিপূর্বেই প্রভাকরবর্ধনের কন্যা এবং রাজ্যবর্ধন-হর্ষবর্ধনের ভগিনী রাজ্যশ্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন ; সেই সূত্রে তাঁহার মৈত্রীবন্ধন পুষ্যভূতি বংশের সঙ্গে। বৃদ্ধ প্রভাকরবর্ধনের অসুস্থতা এবং মৃত্যুর সুযোগে মালবরাজ দেবগুপ্ত মৌখরীরাজ গ্রহবর্মাকে আক্রমণ ও হত্যা করিয়া রাণী রাজ্যশ্রীকে কনৌজে কারারুদ্ধ করেন। হর্ষচরিত পাঠে মনে হয়, প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যু এবং শেষোক্ত দু'টি ঘটনা একই দিনে সংঘটিত হইয়াছিল। দেবগুপ্ত তাহার পর যখন স্থানীশ্বরের দিকে অগ্রসরমান শশাঙ্কও তখন দেবগুপ্তের সহায়তার জন্য কনৌজের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন ; কিন্তু দেবগুপ্তের সৈন্যের সঙ্গে মিলিত হইবার আগেই সদ্যসিংহাসনারূঢ় রাজ্যবর্ধন সসৈন্যে

দেবগুপ্তের সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ, পরাভূত ও নিহত করেন। তাহার পর হয়তো তিনি ভগিনী রাজ্যশ্রীকে কারামুক্ত করিবার জন্য কনৌজের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, কিন্তু উদ্দেশ্য সিদ্ধির আগেই তাঁহাকে শশাঙ্কের সম্মুখীন হইতে হয়, এবং তিনি তাঁহার হস্তে নিহত হন। বাণভট্ট ও য়ুয়ান-চোয়াঙ্‌ বলিতেছেন, শশাঙ্ক রাজ্যবর্ধনকে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া হত্যা করিয়াছিলেন; অন্য দিকে হর্ষবর্ধনের লিপির সাক্ষ্য এই যে, রাজ্যবর্ধন সত্যানুরোধে (হয়তো কোনো প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য) তাঁহার শত্রুর শিবিরে গিয়াছিলেন এবং সেইখানেই তনুত্যাগ করিয়াছিলেন। মঞ্জুশ্রী-মূলকল্পের গ্রন্থকারের মতে রাজ্যবর্ধন নগ্নজাতির কোনো রাজ-আততায়ী কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। বাণভট্ট ও য়ুয়ান-চোয়াঙ দুইজনেই শশাঙ্কের প্রতি কিছুটা বিদ্বিষ্ট ছিলেন, তাহা ছাড়া দুই জনই রাজ্যবর্ধনের ভ্রাতা হর্ষবর্ধনের কৃপাপাত্র ছিলেন। কাজেই তাঁহাদের সাক্ষ্য কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য বলা কঠিন। যাহাই হউক, এই বিতর্ক কতকটা অবান্তর, কারণ শশাঙ্কের ব্যক্তি-চরিত্রগত এই তথ্যের সঙ্গে জনসাধারণের ইতিহাসের যোগ প্রায় অনুপস্থিত। রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর শশাঙ্ক আর স্থানীশ্বরের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না, কারণ মৌখরী রাজবংশের পরাভবের আর কিছু বাকী ছিল না। হর্ষবর্ধন রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াই তৎক্ষণাৎ সসৈন্যে গৌড়রাজ শশাঙ্কের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। পথে কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও মৈত্রীবন্ধন, সংবাদবাহক ভণ্ডীর মুখ হইতে রাজ্যবর্ধন-হত্যার বিস্তৃততর বিবরণ ও বিন্ধ্যপর্বতে রাজ্যশ্রীর পলায়ন-বৃত্তান্ত প্রাপ্তি, সসৈন্যে ভণ্ডীকে গৌড়রাজের বিরুদ্ধে পাঠাইয়া নিজে রাজ্যশ্রীর উদ্ধারে গমন ও অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিবার আগেই রাজ্যশ্রীর উদ্ধার, এবং তাহার পর গঙ্গাতীরে ভণ্ডীচালিত সৈন্যের সঙ্গে পুনর্মিলন, ইত্যাদি বাণভট্টের কৃপায় আজ অতি সুবিদিত ঐতিহাসিক তথ্য। কিন্তু তাহার পর শশাঙ্কের সঙ্গে হর্ষবর্ধনের সম্মুখ যুদ্ধ কিছু হইয়াছিল কিনা এ-সম্বন্ধে বাণভট্ট নীরব। মঞ্জুশ্রীমূলকল্পের গ্রন্থকারের মতে এই সময় প্রাচ্যদেশের রাজা ছিলেন সোম (= চন্দ্র =শশাঙ্ক); তাঁহার রাজধানী ছিল পুণ্ড্র। হর্ষবর্ধন এই সোমরাজকে পরাজিত করিয়া তাঁহাকে নিজ রাজ্যসীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। মঞ্জুশ্রী-মূলকল্পের বিবরণ কতটুকু সত্য ও বিশ্বাসযোগ্য বলা কঠিন; তবে, তাঁহার এই জয় যে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই, এবং কামরূপ রাজ ভাস্করবর্মা ও হর্ষবর্ধনের সম্মিলিত শত্রুতা সত্ত্বেও মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত শশাঙ্ক যে সমগ্র গৌড় দেশ, মগধ-বুদ্ধগয়া অঞ্চল এবং উৎকল ও কঙ্গোদ দেশের অধিপতি ছিলেন, তাহার প্রমাণ বিদ্যমান। কঙ্গোদের শৈলোদ্ভব-বংশীয় অধিপতি মহারাজ-মহাসামন্ত দ্বিতীয় শ্রীমাধবরাজের (৬১৯ খ্রীষ্ট শতক) একটি লিপিতে মাধবরাজ শশাঙ্ককে তাঁহার অধিরাজ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সামন্ত-মহারাজ সোমদত্ত এবং মহাপ্রতীহার শুভকীর্তির অনুমোদিত

মেদিনীপুর (প্রাচীন নাম, মিধুনপুর) লিপি দুইটিতেও শশাঙ্ক অধিরাজ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। এই লিপি দুইটির সাক্ষ্যে প্রমাণিত হয়, দণ্ডভুক্তিদেশ শশাঙ্কের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং উৎকলদেশ দণ্ডভুক্তি-বিভাগের অন্তর্গত ছিল। ৬৩৭-৩৮ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পূর্বে শশাঙ্কের মৃত্যু হইয়া থাকিবে, কারণ ঐ সময় য়ুয়ান-চোয়াঙ মগধ-ভ্রমণে আসিয়া শুনিলেন, কিছুদিন আগেই শশাঙ্ক বুদ্ধগয়ার বোধিদ্রুম কাটিয়া ফেলিয়াছেন, এবং স্থানীয় বুদ্ধমূর্তিটি নিকটেই একটি মন্দিরে সরাইয়া রাখিয়াছেন ; এই পাপের ফলেই নাকি শশাঙ্ক কুষ্ঠ-জাতীয় কোনো ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অল্পদিনের মধ্যে মারা যান। মঞ্জুশ্রীমূলকল্প-গ্রন্থেও এই গল্পের পুনরাবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু গল্পটি কতদূর বিশ্বাসযোগ্য, বলা কঠিন।

শশাঙ্ক কীর্তিমান নরপতি ছিলেন, সন্দেহ নাই। তাঁহাকে 'জাতীয়' নায়ক অথবা বীর বলা যাইতে পারে কিনা সে-সম্বন্ধে গভীর সন্দেহ থাকিলেও তিনি যে অজ্ঞাতকুলশীল মহাসামন্তরূপে জীবন আরম্ভ করিয়া তদানীন্তন উত্তর-ভারতের সর্বোত্তম রাষ্ট্রগুলির সমবেত শক্তির (কনৌজ-স্থানীশ্বর-কামরূপ মৈত্রী) বিরুদ্ধে সার্থক সংগ্রামে লিপ্ত হইয়া, শেষ পর্যন্ত স্বতন্ত্র স্বাধীন নরপতিরূপে সুবিস্তৃত রাজ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন, এ-তথ্যই ঐতিহাসিকের প্রশংসিত বিস্ময় উদ্রেকের পক্ষে যথেষ্ট। পুরুষপরম্পরাবিলম্বিত কনৌজ-গৌড়মগধ সংগ্রাম তাঁহারই শৌর্য ও বীর্যে নূতন রূপে রূপান্তরলাভ করিয়াছিল ; সকলোত্তরপথনাথ হর্ষবর্ধনকে যদি কেহ সার্থক প্রতিরোধ প্রদান করিয়া থাকেন তবে শশাঙ্ক এবং চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীই তাহা করিয়াছিলেন। উত্তর-ভারতের আধিপত্য লইয়া পালরাজ ধর্মপাল-দেবপাল প্রভৃতির আমলে গৌড়-কনৌজের যে সুদীর্ঘ সংগ্রাম পরবর্তী কালের বাঙলার রাষ্ট্রীয় ইতিহাসকে উজ্জ্বল ও গৌরবান্বিত করিয়াছে, তাহার প্রথম সূচনা শশাঙ্কের আমলেই দেখা দিল, এবং তিনিই সর্বপ্রথম বাঙলাদেশকে উত্তর-ভারতের রাষ্ট্রীয় রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ করাইলেন। বাণভট্ট-য়ুয়ান চোয়াঙ-মঞ্জুশ্রীমূলকল্পের গ্রন্থকার যদি তাঁহার প্রতি বিদ্বিষ্ট হইয়া থাকেন তবে তাহার মূলে ঈর্ষা ও হিংসা একেবারেই কিছু ছিল না, এমন বলা যায়না।

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর গৌড় ও মগধের অধিকার লইয়া প্রায় কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। মঞ্জুশ্রীমূলকল্পের গ্রন্থকার মানব নামে শশাঙ্কের এক পুত্রের নাম করিয়াছেন ; এই পুত্র নাকি ৮ মাস ৫ দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। অন্য কোনো সাক্ষ্যে এই তথ্যের উল্লেখ নাই, কাজেই ইহা সত্য হইতে পারে, না-ও হইতে পারে। তবে, শশাঙ্কের মৃত্যুর পর পারস্পরিক হিংসা, বিদ্বেষ ও অবিশ্বাসে গৌড়তন্ত্র বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল, মঞ্জুশ্রীমূলকল্পের এই সাক্ষ্য অবিশ্বাস্য নয় বলিয়াই মনে হয়। ৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে য়ুয়ান-চোয়াঙ যখন বাঙলাদেশ ভ্রমণে আসেন তখন এই দেশ পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত : কজঙ্গল, পুণ্ড্রবর্ধন, কর্ণসুবর্ণ, তাম্রলিপ্তি ও সমতট। এই পাঁচটি

জনপদের কোনোটিরই রাজা বা রাষ্ট্র সম্বন্ধে য়ুয়ান-চোয়াঙ কিছু বলেন নাই। পাঁচটি জনপদের মধ্যে এক সমতট ছাড়া আর বাকী চারটিই নিঃসন্দেহে শশাঙ্কের রাজ্যান্তর্গত ছিল। মনে হয়, তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে প্রত্যেকটি জনপদই স্বাধীন ও স্বতন্ত্রপরায়ণ হইয়া উঠে, এবং ৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে কজঙ্গলে ভাস্করবর্মা-হর্ষবর্ধন সাক্ষাৎকারের আগেই ভাস্করবর্মা কোনো সময় পুণ্ড্রবর্ধন-কর্ণসুবর্ণ জয় করিয়া কর্ণসুবর্ণের জয়স্কন্ধাবার হইতে এক ভূমিদান পট্টোলী নির্গত করাইয়াছিলেন। চীন-রাজতরঙ্গের সাক্ষ্যানুযায়ী ৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্করবর্মা পূর্ব-ভারতের নরপতি ছিলেন। ৬৪২-৪৩ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ কঙ্গোদ এবং কজঙ্গলও হর্ষবর্ধন কর্তৃক বিজিত ও অধিকৃত হইয়াছিল, য়ুয়ান-চোয়াঙের বিবরণ হইতে এইরূপ মনে হয়। তাম্রলিপ্তি-দণ্ডভুক্তি সম্বন্ধে কিছু বলা কঠিন, তবে ৬৩৭-৩৮ খ্রীষ্টাব্দে মগধের রাজা ছিলেন পূর্ণবর্মা, কিন্তু ৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে কি তাহার অব্যবহিত আগে মগধও হর্ষবর্ধন কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল, কারণ চীনদূত মা-তোয়ান্-লিন্ বলিতেছেন, শিলাদিত্য (হর্ষবর্ধন) ঐ বৎসর "মগধাধিপ" এই আখ্যা গ্রহণ করেন।

কামরূপরাজ ভাস্করবর্মা বোধ হয় বেশি দিন গৌড়-কর্ণসুবর্ণ নিজ-করায়ত্ত রাখিতে পারেন নাই। শশাঙ্কের গৌড়তন্ত্র বিনষ্টির স্বল্পকাল পরেই গৌড়ে জয় নামক কোন নাগরাজ রাজত্ব করিয়াছিলেন, মঞ্জুশ্রীমূলকল্পে এইরূপ একটি ইঙ্গিত আছে। আনুমানিক সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে মহারাজাধিরাজ জয়নাগ নামক এক রাজা কর্ণসুবর্ণের জয়স্কন্ধাবার হইতে কিছু ভূমিদানের আদেশ মঞ্জুর করিয়াছিলেন। জয় নামক এক রাজার নামাঙ্কিত কয়েকটি মুদ্রাও বীরভূম-মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে। মুদ্রার জয়, মঞ্জুশ্রীমূলকল্পের জয়, এবং বপ্পঘোষবাট পট্টোলীর জয়নাগ এক এবং অভিন্ন বলিয়া বহুদিন স্বীকৃত হইয়াছেন। মঞ্জুশ্রীমূলকল্পের বিবরণ হইতে মনে হয়, ভাস্করবর্মার কর্ণসুবর্ণাধিকারের পর শশাঙ্কপুত্র মানব পিতৃরাজ্য পুনরধিকারের একটা চেষ্টা করিয়া থাকিবেন, এবং সে চেষ্টা হয়তো ক্ষণস্থায়ী সার্থকতাও লাভ করিয়া থাকিবে। কিন্তু তাহার পরই কর্ণসুবর্ণ জয়নাগের করায়ত্ত হয়, এবং তিনি মহারাজাধিরাজ আখ্যায় স্বতন্ত্র নরপতিরূপে পরিচিত হন। অথবা, এমনও হইতে পারে ভাস্করবর্মা কর্তৃক কর্ণসুবর্ণ জয়ের আগেই জয়নাগ কোনো সময় ঐ রাজ্য কিছুদিনের জন্য ভোগ করিয়াছিলেন। যাহাই হউক, ৬৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই শশাঙ্কের গৌড়-রাজ্য একেবারে তছ্‌নছ্‌ হইয়া গেল। শশাঙ্ক গৌড়কে কেন্দ্র করিয়া যে বৃহত্তর গৌড়তন্ত্র গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন তাহা অন্তত কিছুকালের জন্য ধূলিসাৎ হইয়া গেল। যতদিন তিনি বাঁচিয়াছিলেন ততদিন এই রাষ্ট্রাদর্শ কার্যকরী ছিল সন্দেহ নাই; কিন্তু একদিকে ভাস্করবর্মা, অন্যদিকে হর্ষবর্ধন, এ-দুজনের টানা-পোড়েনের মধ্যে পড়িয়া শশাঙ্কের অব্যবহিত পরই গৌড়তন্ত্র প্রায় বিনষ্ট হইয়া গেল। অষ্টম শতকের দ্বিতীয় পাদে জনৈক গৌড়াধিপ আবার, বোধ হয়

শশাঙ্কের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া, মগধ হইতে গুপ্তবংশের অবশেষ অবলুপ্ত করেন এবং মগধেরও আধিপত্য লাভ করেন। কিন্তু সে-চেষ্টা সত্ত্বেও গৌড়তন্ত্র আর পুনরুদ্ধার করা গেল না। শশাঙ্কের ধনুকে গুণ টানিবার মতন বীর অব্যবহিত পরে আর দেখা গেল না। তাহার পর সুদীর্ঘ একশত বৎসর গৌড়ের, শুধু গৌড়েরই বা কেন, বঙ্গেরও, অর্থাৎ সমগ্র বাঙলাদেশের ইতিহাসে গভীর ও সর্বব্যাপী বিশৃঙ্খলা, মাৎস্যন্যায়ের অপ্রতিহত প্রভাব।

সামাজিক ইঙ্গিত ॥ আমলাতন্ত্র

এই যুগের স্বাধীন গৌড়-রাষ্ট্রের আদর্শ ছিল গৌড়তন্ত্র গড়িয়া তোলা; শশাঙ্কের কর্মকীর্তি এবং মঞ্জুশ্রীমূলকল্পের সাক্ষ্য এ-বিষয়ে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিতে আপত্তি হইবার কারণ নাই। শশাঙ্কই ছিলেন এই আদর্শের নায়ক। কি ভাবে তিনি এই আদর্শকে কার্যকরী করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা তো আগেই আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু বঙ্গে-সমতটে এবং গৌড়তন্ত্রে রাষ্ট্রের সামাজিক আদর্শ কি ছিল তাহা এখন একটু দেখিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। রাষ্ট্রের গঠনবিন্যাস এবং পরিচালনাপদ্ধতি গুপ্ত আমলের মতই ছিল বলিয়া মনে হয়; রাষ্ট্রবিভাগ এবং রাজকর্মচারিদের যে-ইঙ্গিত সমসাময়িক লিপিগুলিতে পাওয়া যাইতেছে তাহা দ্বারা এই অনুমান সমর্থিত হয়। এই যুগে নূতন একটি রাষ্ট্রবিভাগ, বীথীর নাম শুনা যাইতেছে, অন্তত বঙ্গে-সমতটে; ভুক্তি এবং বিষয়-বিভাগের মত বীথী-বিভাগেরও একটি অধিকরণ থাকিত। ভুক্তির যিনি উপরিক বা শাসনকর্তা থাকিতেন তাঁহার মর্যাদা এই যুগে ক্রমশ যেন বাড়িয়া যাইবার দিকে। তাঁহাকে কখনো কখনো মহারাজ বলা হইয়াছে, যেমন গুপ্ত-আমলেও বলা হইত; কিন্তু কখনো কখনো নূতন উপাধি তাঁহার উপর অর্পিত হইয়াছে। যেমন, সমাচারদেবের কুর্পালা পট্টোলীতে ভুক্তির শাসনকর্তাকে বলা হইয়াছে, "পৌরোপকারিক-ব্যাপারপর-মহাপ্রতীহার"; শশাঙ্কের অন্যতম মেদিনীপুর লিপিতেও দণ্ডভুক্তির শাসনকর্তাকে বলা হইয়াছে মহাপ্রতীহার; সমাচারদেবের ঘুগ্রাহাটি লিপিতে উপরিক জীবদত্তকে অধিকন্তু বলা হইয়াছে অন্তরঙ্গ। মনে হয়, ভুক্তি-উপরিকের ক্ষমতা এই যুগে বাড়িয়াছে। তাহা ছাড়া, মল্লসারুল-পট্টোলীতে (গোপচন্দ্রের আমল) অনেক নূতন নূতন রাজপুরুষের নামের দীর্ঘ তালিকা সর্বপ্রথম পাওয়া যাইতেছে; এই সব নাম ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্রিয়াকর্তব্য সম্বন্ধে রাষ্ট্র-বিন্যাস অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে, কিন্তু এখানে একথা নির্দেশ করা প্রয়োজন যে, এই নূতন নূতন রাজপুরুষ এবং রাজকর্মবিভাগ সৃষ্টি একেবারে অর্থহীন নয়; ইহার সামাজিক ইঙ্গিত লক্ষণীয়। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র অনেক বেশী আত্মসচেতন হইয়াছে, নূতন নূতন সামাজিক দায় ও কর্তব্য রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। ইহার পর হইতে এই সচেতনতা ও স্বীকৃতি

ক্রমশ বাড়িয়াই যাইবে এবং তাহার পূর্ণতর রূপ দেখা যাইবে পাল-আমলে, পূর্ণতম রূপ সেন ও বর্মণবংশীয় রাজাদের আমলে। যাহা হউক, বিস্তৃত কর্মচারীতন্ত্র (এখন আমরা যাহাকে বলি আমলাতন্ত্র) রচনার সূত্রপাত এই যুগেই প্রথম দেখা যাইতেছে। ছোটখাট সামাজিক দায় ও কর্তব্য সম্বন্ধেও রাষ্ট্র সচেতন হইতেছে; সমাজের অভ্যন্তরেও রাষ্ট্রহস্ত সম্প্রসারণের চেষ্টা চলিতেছে; আগে যাহা ছিল পল্লী বা স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের অন্তর্গত তাহা ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের কুক্ষিগত হইতেছে, এই ইঙ্গিত কিছুতেই অবহেলা করিবার নয়।

বিষয়াধিকরণ যাঁহারা গঠন করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠী-সার্থবাহ-কুলিকদের দেখিতেছি না; পরিবর্তে পাইতেছি মহত্তর এবং ব্যাপারী বা ব্যবহারী প্রভৃতিদের। মহত্তরেরা স্থানীয় প্রধান, ব্যাপারী-ব্যবহারীরা তো স্পষ্টতই শিল্পী-বণিক-ব্যবসায়ী সমাজের প্রতিনিধি। দেখা যাইতেছে, রাষ্ট্রে শিল্পী-বণিক-ব্যবসায়ীদের আধিপত্য এখনও বিদ্যমান; তবে সে-আধিপত্য এখন অন্যান্য স্থানীয় প্রধানদের সঙ্গে ভাগ করিয়া ভোগ করিতে হইতেছে, অথবা এমনও হইতে পারে, যে-অঞ্চলের বিষয়াধিকরণে এই গঠন-বিন্যাস পাওয়া যাইতেছে সেই অঞ্চলে এই সমাজের নির্বাধ নিরবচ্ছিন্ন প্রাধান্য ছিল না। মল্লসারুল লিপিতে বীথী-অধিকরণ গঠন-বিন্যাসেরও সংবাদ পাওয়া যাইতেছে; এই অধিকরণটি গঠিত হইয়াছিল একজন বাহনায়ক এবং মহত্তর, অগ্রহারী ও খাড়্গীদের লইয়া। বাহনায়ক পথঘাট-যানবাহনের কর্তা এবং রাজপুরুষ বলিয়াই মনে হয়। অগ্রহারীরা বোধ হয় যে-সব ব্রাহ্মণ ব্রহ্মোত্তর ভূমি ভোগ করিতেন তাঁহাদের, এক কথায় ব্রাহ্মণদের প্রতিনিধি অথবা অগ্রহার-ভূমি বা গ্রামের শাসনকর্তা। মহত্তরেরা স্থানীয় প্রধান প্রধান গৃহস্থ। খাড়্গী কাহারা বুঝা কঠিন, তবে পরবর্তী কালের খড়্গগ্রাহী এবং খড়্গী বোধ হয় একই শ্রেণীর রাজপুরুষ। শিল্পী-বণিক-ব্যবসায়ী সমাজের প্রতিনিধি এই বীথী-অধিকরণে দেখিতেছি না, অথচ বীথীটি বর্তমান বর্ধমান জেলায় অবস্থিত ছিল। এই গ্রামে কি এই সম্প্রদায়ের প্রাধান্য ছিল না? গ্রামের বা গ্রাম সমূহের অধিকাংশ ব্রাহ্মণই কি ব্রহ্মোত্তর ভোগ করিতেন? বাহনায়ককে দেখিয়া মনে হয়, এই বীথীর পথঘাট নদী-নালা দিয়া নৌকা, শকট, পশু ইত্যাদির যাতায়াত খুব বেশিই ছিল; ইহার কিছু তো নিশ্চয়ই ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ কি?

সামন্ততন্ত্র

এই যুগে রাষ্ট্রের আর একটি বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য করিবার মতন। বাঙলাদেশে এই আমলেই পুরাপুরি সামন্ততন্ত্র রচনারও সূত্রপাত দেখা যায়। শশাঙ্কের জীবনই তো আরম্ভ হইয়াছিল মহাসামন্তরূপে; বোধ হয় তিনি গুপ্তদেরই মহাসামন্ত ছিলেন। তাহা

ছাড়া, মেদিনীপুরে প্রাপ্ত শশাঙ্কের একটি লিপিতে দণ্ডভুক্তির শাসনকর্তা সামন্ত-মহারাজ সোমদত্তের উল্লেখ পাইতেছি; সোমদত্ত বোধ হয় আগে দণ্ডভুক্তির রাজা ছিলেন; দণ্ডভুক্তি শশাঙ্ক কর্তৃক বিজিত হওয়ার পর তিনি হয়তো সামন্ত শাসনকর্তা রূপে উহার উপরিক নিযুক্ত হন। কঙ্গোদের শৈলোদ্ভব বংশীয় মহারাজ দ্বিতীয় শ্রীমাধবরাজও শশাঙ্কের একজন মহাসামন্ত ছিলেন। তিনিও বোধ হয় শশাঙ্ক কর্তৃক কঙ্গোদ-বিজয়ের পর মহাসামন্ত নিযুক্ত হইয়া থাকিবেন। গুণাইঘর-লিপির দূতক মহাপ্রতীহার মহাপীলুপতি পঞ্চাধিকরণোপরিক মহারাজ বিজয়সেনও গোপচন্দ্রের একজন শ্রীমহাসামন্ত ছিলেন। বিজয়সেন গোপচন্দ্রের আগে মহারাজ বৈন্যগুপ্তেরও অন্যতম মহাসামন্ত ছিলেন। মহা-রাজাধিরাজ সমাচারদেবের কুর্পালা-লিপিতে এবং জয়নাগের বপ্পঘোষবাট-লিপিতেও সামন্তের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে; শেষোক্ত লিপিটিতে দেখিতেছি, সামন্ত নারায়ণভদ্র ঔদুম্বরিক বিষয়ের (= আইন-ই-আকবরী গ্রন্থের ঔদম্বর পরগণা=বীরভূম-মুর্শিদাবাদের কিয়দংশ) বিষয়পতি ছিলেন। খড়্গ-বংশীয় রাজারাও বোধ হয় সামন্ত নরপতিই ছিলেন; এবং লোকনাথের বংশও তো সামন্ত বংশ। রাতবংশীয় রাজারাও সামন্ত-মহাসামন্ত ছিলেন, সন্দেহ কি? এই সামন্তদের সঙ্গে মহারাজাধিরাজদের সম্বন্ধের রূপ ও প্রকৃতি কি ছিল, পরস্পরের দায় ও অধিকার কি ছিল, বলা কঠিন; এ-সম্বন্ধে কোনো তথ্য অনুপস্থিত। তবে অনুমান হয়, কোনো কোনো সামন্ত (তাঁহারা একেবারে মহাসামন্ত অথবা সামন্ত-মহারাজ, যেমন কঙ্গোদাধিপ মাধবরাজ বা শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্ক, অথবা দূতক বিজয়সেন, অথবা খড়্গ ও রাত-বংশীয় রাজারা) প্রকৃত পক্ষে প্রায় স্বতন্ত্র স্বাধীন নরপতিরূপেই রাজত্ব করিতেন, শুধু মৌখিকত বা দলিলপত্রে নিজদের সেই ভাবে প্রচার করিতেন না। তবে, মহারাজাধিরাজের ক্ষমতা ও রাষ্ট্র দুর্বল হইলে অথবা অন্য কোনো উপায়ে সুযোগ পাইলেই তাঁহারা স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিয়া বসিতেন। কোনো কোনো সামন্ত-মহাসামন্ত মহারাজাধিরাজের উচ্চ রাজকর্মচারী (যথা ভুক্তিপতি বা বিষয়পতি) রূপেও কাজ করিতেন। সামন্ত রাজাদেরও আবার সামন্ত থাকিতেন; লোকনাথ পট্টোলীতে দেখিতেছি, লোকনাথের এক মহাসামন্ত ছিলেন ব্রাহ্মণ প্রদোষশর্মা। পরবর্তীকালের সাক্ষ্য যদি প্রামাণিক হয় (যেমন, রামচরিতের) তাহা হইলে সামন্তদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য ছিল যুদ্ধবিগ্রহের সময় সৈন্যবাহিনী দিয়া এবং নিজে যুদ্ধে যোগ দিয়া মহারাজাধিরাজকে সাহায্য করা। এই সামন্ত-মহাসামন্তরা বস্তুত মহারাজাধিরাজেরই একটি ক্ষুদ্রতর সংস্করণ মাত্র। সামন্তপ্রথা এখন হইতে ক্রমশ বিস্তার লাভ করিয়াই চলিবে এবং পাল আমলে তাহার পূর্ণতর রূপ দেখা যাইবে। এ-পর্বের বঙ্গ ও সমতট রাষ্ট্র এবং গৌড়তন্ত্র এই আমলাতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্র লইয়াই গঠিত।

রাষ্ট্র ও সামাজিক ধন

সুবর্ণমুদ্রার এই প্রচলন এইযুগেও দেখা যাইতেছে—বঙ্গ, সমতট এবং গৌড় প্রত্যেক রাষ্ট্রেই। কিন্তু সুবর্ণমুদ্রার সেই নিকষোত্তীর্ণ সুমুদ্রিত রূপ আর নাই ; নকল মুদ্রার প্রচলনও আরম্ভ হইয়াছে। রৌপ্য মুদ্রা তো একেবারেই নাই। ইহার ঐতিহাসিক ইঙ্গিত অন্যত্র ধরিতে চেষ্টা করিয়াছি (ধনসম্বল অধ্যায়ে মুদ্রাপ্রসঙ্গ); এখানে শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট যে, বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যের বিবর্তন মুদ্রার এই অবনতির অন্যতম কারণ হইতেও পারে। রাষ্ট্রও যেন সামাজিক ধনোৎপাদনের দিকে এই যুগে খুব বেশি দৃষ্টি রাখে নাই ; কর্মচারীতন্ত্রের বিস্তৃতি এবং বিচিত্র পদনাম ও বিভাগ বিশ্লেষণ করিলে মনে হয়, উৎপাদিত ধনের বণ্টন-ব্যবস্থার দিকেই রাষ্ট্রের ঝোঁকটা যেন বেশি। কৃষিসমাজ এবং ব্যাপারী-ব্যবহারী সমাজের কিছু কিছু খবর পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু রাষ্ট্রে বিশেষভাবে কাহারও প্রাধান্য দেখা যাইতেছে না, অন্তত তেমন কোনো সাক্ষ্য উপস্থিত নাই। বাণিজ্য-ব্যবসায় ব্যাপারে যেন একটু মন্দা পড়িয়াছে ; মহত্তর-গ্রামিক কুটুম্বদের প্রতিপত্তি বাড়িতেছে। এই যুগেই ভূমির চাহিদা বাড়িতে আরম্ভ হইয়াছে, এবং সমাজ ক্রমশ ভূমিনির্ভর হইয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। পাল ও সেন আমলে দেখা যাইবে, বাণিজ্য-ব্যবসায়ে, বিশেষত বহির্বাণিজ্যে একেবারেই মন্দা পড়িয়া গিয়াছে, এবং সমাজ উত্তরোত্তর ভূমি ও কৃষিনির্ভর হইয়া পড়িয়াছে। বাৎস্যায়নের আমলে নাগর-সমাজকেই যেমন সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদর্শ বলিয়া তুলিয়া ধরা হইয়াছিল—সওদাগরী ধনতন্ত্রের প্রকৃতিই নগরকেন্দ্রিক—এই আমলে সেই আদর্শে যেন একটু ভাঁটা পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। ভূমি ও কৃষিনির্ভরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমাজ যেন ক্রমশ গ্রাম-কেন্দ্রিক হইবার লক্ষণ প্রকাশ করিতেছে ; কৃষিনির্ভর সমাজের প্রকৃতিই তো গ্রাম-কেন্দ্রিক। কিন্তু এই প্রকৃতি এখনও সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দেয় নাই ; কোটালিপাড়ার পট্টোলীগুলিতে তাহার ক্ষীণ আভাস মাত্র পাওয়া যাইতেছে। একশত বছর পরে তাহা একেবারে সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দিবে।

ধর্ম ও সংস্কৃতি

এই যুগের বঙ্গ ও সমতটের রাজারা সকলেই ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী ; রাত-বংশ ও আচার্য শীলভদ্রের পিতৃবংশও ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী ; লোকনাথের সামন্ত-বংশও তাহাই। শশাঙ্ক ছিলেন শৈব ; তৎপ্রচলিত মুদ্রা এবং য়ুয়ান-চোয়াঙের বিবরণই তাহার প্রমাণ। নিধনপুর-শাসনের সাক্ষ্যে ভাস্করবর্মাকেও শৈব বলা যাইতে পারে। সমাচারদেবের রাজত্বকালে বলি-চরু-সত্র প্রবর্তনের জন্য অনেক ব্রাহ্মণ রাজকীয় ভূমিদান গ্রহণ করিয়াছিলেন। বস্তুত, ধর্মাদিত্য, গোপচন্দ্র, সমাচারদেব, জয়নাগ বা লোকনাথের আমলের যে-কয়টি ভূমিদান-

লিপি এ-পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে তাহার প্রত্যেকটিই ব্রাহ্মণদের ভূমিদান সম্পর্কিত পট্টোলী এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের পোষকতার প্রমাণ। চতুর্থ ও পঞ্চম শতকের রাজকীয় লিপিগুলিতে দেখিয়াছি, বিভিন্ন নামে ও রূপে বিষ্ণু ক্রমশ পূজা ও সমাদর লাভ করিতেছেন; মহারাজ বৈন্যগুপ্ত মহাদেব-ভক্ত ছিলেন, এবং পুণ্ড্রবর্ধনে পঞ্চম শতকে বুধগুপ্তের আমলেই নামলিঙ্গ পূজা প্রবর্তিত হইয়াছিল। এই যুগে, অর্থাৎ ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে গৌড়ে-কামরূপেও শৈবধর্ম বিস্তার লাভ করিয়াছে; উভয় স্থানেই রাজা শৈব। কিন্তু বিষ্ণু এবং কৃষ্ণধর্মই অধিক প্রচলিত বলিয়া মনে হয়। পাহাড়পুরের মন্দির-প্রাচীরে সপ্তম-অষ্টম শতকের যে সব মৃৎ ও প্রস্তরচিত্র দেখা যায় তাহাতে মনে হয়, কৃষ্ণলীলার যমলার্জুন, কেশীবধ, কৃষ্ণ-বলরামের সঙ্গে কংসরাজের মল্লদের যুদ্ধ, গোবর্ধনধারণ, গোপ-বালকদের সঙ্গে কৃষ্ণ-বলরাম, কৃষ্ণকে লইয়া বাসুদেবের গোকুলে গমন, গোপীলীলা প্রভৃতি কাহিনী ইতিমধ্যেই বাঙলাদেশে সুপ্রচলিত হইয়াছিল। রাজবংশের মধ্যে একমাত্র খড়্গ রাজারাই ছিলেন বৌদ্ধ; আর কোথাও বৌদ্ধধর্ম রাজকীয় পোষকতা লাভ করিতে পারে নাই।

ষষ্ঠ শতকের গোড়ায় গুণাইঘর লিপির (৫০৭-৮) সাক্ষ্যে দেখিয়াছিলাম, বৌদ্ধধর্ম ত্রিপুরা অঞ্চলে রাষ্ট্র ও রাজবংশের পোষকতা লাভ করিয়াছে। প্রায় দেড় শত বৎসর এই ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি বাঙলার কোনো রাষ্ট্রের কোনো অনুগ্রহ বা সমর্থন দেখা যায় না, তাহার পর সপ্তম শতকের শেষপাদে দেখিতেছি, বৌদ্ধধর্ম আবার রাষ্ট্র ও রাজবংশের পোষকতা ও সমর্থন লাভ করিতেছে। খড়্গ বংশই বৌদ্ধরাজবংশ; রাজারা সকলেই পরম সুগত, কাজেই এই পোষকতা খুবই স্বাভাবিক। লক্ষণীয় এই যে, এই পোষকতা ঢাকা-ত্রিপুরা অঞ্চলেই যেন সীমাবদ্ধ; কালপ্রান্তিক দুইটি সাক্ষ্যই বঙ্গ ও সমতটে। আশ্চর্য হইতে হয় এই ভাবিয়া যে, এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে গৌড়ে বা বাঙলার অন্য কোনো স্থানে বৌদ্ধ বা জৈনধর্ম ও সংস্কৃতি কোথাও রাষ্ট্রের কোনোপ্রকার স্বীকৃতি ও সমর্থন লাভ করিতেছে, এমন একটি দৃষ্টান্তও এ-পর্যন্ত জানা যায় নাই। অথচ, অন্যদিকে এই যুগের সব কয়টি রাজবংশই ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কারাশ্রয়ী, এবং এই ধর্ম ও সংস্কৃতি সমানেই রাজকীয় সমর্থন ও পোষকতা লাভ করিতেছে; ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর পূজা প্রসারিত হইতেছে—খড়্গবংশীয় বৌদ্ধরাজবংশেও এবং বৌদ্ধ-রাজমহিষী প্রভাবতী দেবীর পোষকতায়ও তাহা হইয়াছে,—পৌরাণিক গল্পকথা প্রচারিত হইতেছে। এই যুগের রাষ্ট্র ও রাজবংশ বৌদ্ধ (বা জৈন) ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে যে খুব শ্রদ্ধা ও অনুগ্রহপরায়ণ ছিলেন এমন মনে হয় না; অথচ দেশে বৌদ্ধ অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের কিছু অপ্রতুলতা ছিল, এমন নয়। জনসাধারণের বেশ একটা অংশ বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কারাশ্রয়ী ছিল; যুয়ান-চোয়াঙ, ই-ৎসিঙ্ এবং সেং-চি'র বিবরণ এবং আস্রফপুর লিপির সাক্ষ্যেই তাহা সুস্পষ্ট। ধর্মকর্ম-অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যাইবে।

শশাঙ্কের বৌদ্ধ-বিদ্বেষ ?

বৌদ্ধধর্ম ও অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, বৌদ্ধ সংস্কৃতি সম্বন্ধে রাষ্ট্রে এই নেতিবাচক ঔদাসীন্য কি কখনো কখনো ইতিবাচক বিদ্বেষ ও শত্রুতায় রূপান্তরিত হইয়াছিল ? কোথাও কি তাহার কোনো ইঙ্গিত আছে ? য়ুয়ান-চোয়াঙ কিন্তু ইঙ্গিত শুধু নয়, সুস্পষ্ট অভিযোগই করিয়াছেন শশাঙ্কের বৌদ্ধবিদ্বেষ ও শত্রুতা সম্বন্ধে। শশাঙ্ক নাকি একবার কুশীনগরে এক বিহারের ভিক্ষুদের বহিষ্কার করিয়া দিয়াছিলেন, পাটলিপুত্রে বুদ্ধপদাঙ্কিত একখণ্ড প্রস্তর গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, বুদ্ধগয়ার বোধিদ্রুম কাটিয়া ফেলিয়া উহার মূল পর্যন্ত ধ্বংস করিয়া পুড়াইয়া দিয়াছিলেন, একটি বুদ্ধমূর্তি সরাইয়া সেখানে শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন এবং সাধারণভাবে বৌদ্ধধর্মের প্রভূত অনিষ্ট সাধন করিয়াছিলেন। শশাঙ্কের মৃত্যু সম্বন্ধেও য়ুয়ান্-চোয়াঙ একটি অলৌকিক কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ; সেই-প্রসঙ্গেও শশাঙ্কের বৌদ্ধ-বিদ্বেষ এবং তাহার ফলে শশাঙ্কের শাস্তির প্রতি ইঙ্গিত আছে। বোধিদ্রুম ধ্বংস ও এই মৃত্যু-কাহিনীর প্রতিধ্বনি মঞ্জুশ্রীমূলকল্প-গ্রন্থেও আছে। য়ুয়ান-চোয়াঙ বৌদ্ধ শ্রমণ, আংশিকত হর্ষবর্ধনের প্রসাদপ্রার্থী এবং সেই হেতু শশাঙ্কের প্রতি বিদ্বিষ্ট হইয়া থাকিতে পারেন। মঞ্জুশ্রীমূলকল্পও বৌদ্ধলেখকের রচনা এবং বৌদ্ধসমাজে প্রচলিত গ্রন্থ। কাজেই এ-বিষয়ে ইঁহাদের সাক্ষ্য প্রমাণিক বলিয়া স্বীকার করা একটু কঠিন, বিশেষত য়ুয়ান-চোয়াঙের সাক্ষ্য। শশাঙ্ক-হর্ষবর্ধন বা শশাঙ্ক-বৌদ্ধধর্ম ব্যাপারে এই বিদেশি শ্রমণ সর্বত্র হয়তো অপক্ষপাত দৃষ্টির পরিচয় দিতে পারেন নাই। তবু, একটু আগেই ষষ্ঠ-সপ্তম শতকের রাজবংশের ও বৌদ্ধধর্মের প্রতি রাষ্ট্রের ঔদাসীন্য এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও অনুরাগের যে সংক্ষিপ্ত যুক্তি আমি উপস্থিত করিয়াছি তাহার পটভূমিকায় শশাঙ্কের বৌদ্ধবিদ্বেষ কাহিনী একেবারে নিছক অনৈতিহাসিক কল্পনা, এমন মনে হয় না। য়ুয়ান-চোয়াঙ যে-সব ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন তাহার মধ্যে অত্যুক্তি প্রচুর, সন্দেহ নাই ; কিন্তু মোটামুটিভাবে এ-কথা উড়াইয়া দেওয়া যায় না যে, শশাঙ্ক বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন এবং বৌদ্ধধর্মের প্রভূত ক্ষতিও করিয়াছিলেন। কিছুটা সত্য কোথাও না থাকিলে য়ুয়ান-চোয়াঙ বারবার একই তথ্যের পুনরাবৃত্তি করিয়া গিয়াছেন, একথা মনে করা একটু কঠিন। এমন কি, তিনি যখন বলিয়াছেন, কর্ণসুবর্ণরাজ কর্তৃক বৌদ্ধধর্মের ক্ষতির খানিকটা পূরণ এবং ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যই হর্ষবর্ধনের সিংহাসনারোহণ প্রয়োজন, বোধিসত্ত্ব হর্ষকে তাহাই বুঝাইয়াছিলেন, তখন মনে হয়, খুব জোর দিয়াই য়ুয়ান-চোয়াঙ শশাঙ্কের বৌদ্ধবিদ্বেষের কথা বলিতেছেন। মঞ্জুশ্রীমূলকল্পের লেখকও একজায়গায় শশাঙ্ককে দুষ্কর্মকারী এবং চরিত্রহীন বলিয়াছেন। বৌদ্ধলেখক বৌদ্ধধর্মবিদ্বেষীর সম্বন্ধে খুব সংযত ভাষা ব্যবহার করিতে পারেন নাই, একথা অনস্বীকার্য ; কিন্তু, কোথাও সত্যের বীজ একটু সুপ্ত না থাকিলে শতাব্দীর লোকস্মৃতিই বা এই ইঙ্গিত ধরিয়া রাখিবে কেন ?

শশাঙ্কের বৌদ্ধ-বিদ্বেষের কারণ অনুমান সহজেই করা যায়। প্রথমত, এই যুগে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কৃতি ক্রমশ বিস্তার লাভ করিতেছিল বাঙলা ও আসামের সর্বত্র; তাহার নানা সাক্ষ্য-প্রমাণ আগেই উল্লেখ করিয়াছি। কোনো কোনো রাজবংশ এই নবধর্ম ও সংস্কৃতির গোঁড়া পোষক ও ধারক হইবেন, ইহা কিছু অস্বাভাবিক নয়। বিশেষত, যে-সব উচ্চকোটি শ্রেণীসমূহের মধ্যে এই ধর্ম ও সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করিতেছিল সেই সব শ্রেণীই তো রাষ্ট্রের প্রধান ধারক ও সমর্থক; কাজেই, তাঁহাদের ধর্ম ও সংস্কৃতির ধারক ও সহায়ক হইবে রাষ্ট্র, ইহা আর বিচিত্র কি? এই যুগের সকল রাজবংশই তো ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কারাশ্রয়ী। দ্বিতীয়ত, শশাঙ্কর অন্যতম প্রধান শত্রু হর্ষবর্ধন বৌদ্ধধর্মের অতি বড় পোষক; শত্রুর আশ্রিত ও লালিত ধর্ম নিজের ধর্ম না হইলে তাহার প্রতি বিদ্বেষ স্বাভাবিক। য়ুয়ান-চোয়াঙ শশাঙ্কের অপকীর্তি যে-সব স্থানের সঙ্গে যুক্ত করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটির অবস্থিতি বাঙলার বাহিরে। অন্য অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ বিদ্যমান থাকাও অসম্ভব নয়, যথা বাণিজ্যে বৌদ্ধদের প্রতিপত্তি। তৃতীয়ত, বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধ ও বর্ধিষ্ণু অবস্থা হয়তো ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী রাজার খুব রুচিকর ছিল না। য়ুয়ান-চোয়াঙের বিবরণী পাঠে মনে হয়, বাঙলার পাঁচটি বিভাগেই বৌদ্ধধর্ম ও অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব, প্রসার ও প্রতিপত্তি যথেষ্টই ছিল—শশাঙ্কের সময়ে এবং পরেও। সেই যুগে, এবং পারিপার্শ্বিক ধর্ম ও সংস্কৃতির অবস্থা, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অবস্থার পরিবেশের মধ্যে শশাঙ্কের বৌদ্ধবিদ্বেষী হওয়া খুব বিচিত্র বলিয়া মনে হয় না। ভারতবর্ষের অনেক স্থানে এই সময় বৌদ্ধ-চিন্তা ও সংস্কৃতির প্রতি একটা বিরূপ মনোবৃত্তি গড়িয়া উঠিতেছিল, এরূপ ইঙ্গিত দুর্লভ নয়। তবে, কি উপায়ে এবং কতটুকু অনিষ্ট তিনি করিতে পারিয়াছিলেন এ-সম্বন্ধে য়ুয়ান-চোয়াঙ পক্ষপাতশূন্য মত দিতে পারিয়াছেন, স্বীকার করা কঠিন। খুব কিছু অনিষ্ট যে করিতে পারেন নাই তাহা তো য়ুয়ান-চোয়াঙ ও ই-ৎসিঙের বিবরণীতেই সুস্পষ্ট। তাহা হইতে শশাঙ্কের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে য়ুয়ান-চোয়াঙ এবং ৫০ বৎসর পরে ই-ৎসিঙ্ বাঙলা দেশে বৌদ্ধধর্মের এতটা সমৃদ্ধি দেখিতে পাইতেন না।

ইহার সামাজিক অর্থ

এই প্রসঙ্গের আলোচনার প্রয়োজন হইল শশাঙ্ক-চরিত্রের কলঙ্ক-মুক্তির চেষ্টায় নয়, ইহার সামাজিক ইঙ্গিত উদ্‌ঘাটনের জন্য। বাঙালী জনসাধারণের ইতিহাসের দিক হইতে শশাঙ্ক-চরিত্র রাহুমুক্ত হইল কি না হইল, সে-প্রশ্ন অবান্তর; সে-প্রশ্ন একান্তই ব্যক্তিক। কিন্তু, এই প্রসঙ্গ তাহা নয়। শশাঙ্ক যদি বৌদ্ধ-বিদ্বিষ্ট হইয়া থাকেন তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়, তাঁহার বা তাঁহার রাষ্ট্রের সামাজিক সমন্বয় সম্বন্ধে সচেতনতা ছিল

না, ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে রাষ্ট্রের পক্ষপাতিত্ব ছিল, এবং সমাজের একটা অংশ, যত ক্ষুদ্র বা বৃহৎই হউক, রাষ্ট্রের পোষকতা লাভ করিতে পারে নাই। যদি শশাঙ্ক বৌদ্ধ-বিদ্বিষ্ট না হইয়া থাকেন তাহা হইলে এই স্বীকৃতি মিথ্যা হইয়া যাইবে না, কারণ, এই প্রসঙ্গের সূচনায় আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, সুদীর্ঘ দেড়শত বৎসর ধরিয়া কোনো রাষ্ট্র বা রাজবংশই সমসাময়িক বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির কোনো পোষকতা করেন নাই; অন্য দিকে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কৃতি তাঁহাদের অবারিত কৃপা লাভ করিয়াছে এবং তাঁহাদের সকলেরই আশ্রয় ঐ ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কৃতি।

৬

মাৎস্যন্যায়ের শতবৎসর ॥ আ ৬৫০—৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ ॥ তিব্বত ও বাঙলা

৬৪৬ বা ৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দে হর্ষবর্ধনের মৃত্যু হইল। তাঁহার মৃত্যুর পর চীনা-পুরাণের মতে ন-ফু-টি ও-লো-ন-সুয়েন (অর্জুন বা অরুণাশ্ব) নামে তি-ন-ফ়্-তি বা তীর-ভুক্তির (তিরহুত) শাসনকর্তা পুষ্যভূতি সিংহাসন দখল করেন। অর্জুন বা অরুণাশ্ব মগধে হর্ষবর্ধনের নিকট প্রেরিত এক চীনা রাজদূত ওয়াঙ-হিউয়েন-থ্‌সের সমস্ত সাঙ্গো-পাঙ্গোদের হত্যা করেন। রাজদূত নেপালে পলাইয়া গিয়া সে-দেশ ও তিব্বত হইতে একদল সৈন্য সংগ্রহ করেন এবং ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়া অরুণাশ্বের রাজধানী (বোধ হয় মগধ) ও অন্যান্য বহু প্রাচীরবেষ্টিত নগর ধ্বংস করেন; অরুণাশ্বকেও বন্দী করিয়া চীনদেশে লইয়া যান। কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার সাহায্যও তিনি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া চীনা-ইতিহাসে বর্ণিত আছে। এই ঘটনা বোধ হয় ঘটিয়াছিল ৬৪৮-র গোড়ায় বা শেষে, কিন্তু চীনা রাজবৃত্ত-বর্ণিত এই কাহিনী কতদূর বিশ্বাসযোগ্য বলা কঠিন। তবে, এ-তথ্য নিঃসংশয় যে, হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর পূর্ব-ভারতের রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলার সুযোগে চীন-তিব্বত-কামরূপের লোলুপ দৃষ্টি এইদিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং তিব্বতরাজ স্রং-ৎসন-গ্যাম্পো (৬০০-৬৫০) ভারতীয় রাষ্ট্রীয় আবর্তে বহুখ্যাত তিব্বতী বৌদ্ধ যোগদান করিয়াছিলেন। এই নরপতি আসাম ও নেপাল, এবং ভারতবর্ষের বহুস্থান জয় করিয়াছিলেন বলিয়া দাবি করা হইয়াছে। মনে হয়, এই দাবি একেবারে নিরর্থক নয়। গ্যাম্পোর আমল হইতে আরম্ভ করিয়া নেপাল তো প্রায় দুইশত বৎসর তিব্বতের অধীন ছিল। কামরূপে ভাস্করবর্মার রাজবংশ এক ম্লেচ্ছরাজ কর্তৃক বিনষ্ট হইয়াছিল, এ-তথ্যও সুবিদিত। এই ম্লেচ্ছরাজ গ্যাম্পো হওয়া বিচিত্র নয়, অথবা, গ্যাম্পোর মতই ভোট-ব্রহ্মীয় কোনো

নরপতিও হইতে পারেন। কামরূপের শালস্তম্ভ ও তদ্‌বংশীয় রাজারা যে ভোট-ব্রহ্ম নরগোষ্ঠীরই প্রতিনিধি, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ কি ? গ্যাম্পো ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে তনুত্যাগ করেন, এবং তাঁহার পৌত্র কি-লি-প-পু (৬৫০-৬৭৯) তিব্বতের অধিপতি হন। তিনিও দিগ্বিজয়ী বীর ছিলেন, এবং মধ্য-ভারত পর্যন্ত তাঁহার রাষ্ট্রীয় প্রভাব বিস্তৃত ছিল। ৭০২ খ্রীষ্টাব্দে নেপাল ও মধ্য-ভারত তিব্বতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, কিন্তু এই বিদ্রোহ বোধ হয় রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্য সফল করিতে পারে নাই। কারণ, ৭১৩ হইতে ৭৪১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোনো সময়ে তিব্বতী ও আরবীদের বিরুদ্ধে সহায়তা প্রার্থনা করিয়া মধ্য-ভারত হইতে এক দৌত্য চীন রাজসভায় প্রেরিত হইয়াছিল বলিয়া চীন-রাজবৃত্তে বর্ণিত আছে। চীনা ইতিহাসের মধ্য-ভারত সাধারণত বর্তমান বিহার অঞ্চলকেই বুঝায়, অন্তত এই যুগে। যাহা হউক, এই সব রাষ্ট্রীয় উপপ্লবের ঢেউ বাঙলা দেশে আসিয়াও লাগিয়াছিল সন্দেহ নাই। তিব্বত-রাষ্ট্রের ভীতিশঙ্কাময় প্রভাব বহুদিন ভারতবর্ষে, বিশেষত কাশ্মীর, কামরূপ, নেপাল এবং বাঙলা দেশে সক্রিয় ছিল বলিয়া মনে হয়, এবং সম্ভবত শুধু সপ্তম শতকেই নয়, সমস্ত অষ্টম শতক এবং নবম শতকের কিয়দংশ জুড়িয়া বাঙলাদেশকে বার বার তিব্বতী অভিযানে বিব্রত ও পর্যুদস্ত হইতে হইয়াছিল, এমন কি পাল-সম্রাট ধর্মপাল সিংহাসনে আরোহণ করিবার পরও। নারায়ণপালের রাজত্বকালেও একাধিক তিব্বতী সামরিক অভিযান বাঙলাদেশের বুকের উপর দিয়া বাহিয়া গিয়াছে। তিব্বতরাজ খ্রী স্রং-লৃদে-ব্‌ৎসন্‌ (Khre srong-lde-tsan, 755-97) ভারতবর্ষ জয়ের দাবি করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র মু-তিগ্‌-ব্‌ৎসন্‌-পো (Mu-tig-Btsen-po) ও ভারতবর্ষে বিজয়বাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলেন :

> "In the south the indian kings there established the Raja Dharma-dpal and Drahu-dpun, both waiting in their lands under order to shut up their armies yielded the Indian kingdom in subjection to Tibet ; the wealth of the Indian country, gems and all kinds of excellent provisions, they punctually paid. The two great kings of India, upper & lower, out of kindness to themselves (or in obedience to him), pay honour to commands."

ধর্মপালের উল্লেখ তো সুস্পষ্ট, কিন্তু Drahu dpun কে, বলা কঠিন। আর এক-জন তিব্বত-রাজ, রল্‌-প-চন্‌ (Ral-pa-can, আ ৮১৭—৮৩৬) বাঙলা দেশ জয় করিয়া একেবারে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন বলিয়া লদাকী-রাজবৃত্তে দাবি করা হইয়াছে। তিব্বতী ও লদাকী-রাজআলিনীর এই সব দাবিদাওয়া কতখানি সত্য, অত্যুক্তি কতখানি আছে বা নাই, বলা কঠিন। তবে, সপ্তম শতকের মাঝামাঝি হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে নবম শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত একদিকে কামরূপ-বাঙলা-বিহারকে এবং

অন্যদিকে নেপাল ও কাশ্মীরকে বারবার তিব্বতী রাষ্ট্রীয় ও সামরিক পরাক্রমের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, সন্দেহ নাই। বঙ্গ-তিব্বত ইতিহাসের এই বিরোধ-মিলনপর্ব আজও খুব সুবিদিত নয়; তথ্য স্বল্প, অস্পষ্ট এবং অসমর্থিত। তবে, এ-তথ্য অনস্বীকার্য যে, মাৎস্যন্যায়ের পর্বে একশত বৎসর ধরিয়া যে-রাষ্ট্রীয় দুর্যোগে বাঙলার আকাশ সমাচ্ছন্ন তাহার খানিকটা মেঘ ও ঝড় বহিয়া আসিয়াছে তিব্বতের হিমতুষারময় পার্বত্যদেশ হইতে।

নবগুপ্ত বংশ

হর্ষের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে মগধ রাষ্ট্রীয় দুর্যোগে বিপর্যস্ত হইয়াছিল। বোধ হয়, এই বিপর্যয়ের পর্বেই মগধে এক নবগুপ্ত রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এই বংশের প্রথম রাজা আদিত্যসেন (গুপ্ত); ইনি মগধগুপ্তের পুত্র এবং পূর্বকথিত মহাসেনগুপ্তের প্রপৌত্র। কাজেই মগধের উপর বংশগত অধিকারের দাবি আদিত্যসেনের ছিলই। আদিত্যসেন এবং তাঁহার তিনজন বংশধর প্রত্যেকেই স্বাধীন মহারাজাধিরাজরূপে পর পর মগধে রাজত্ব করিয়াছিলেন, প্রায় অষ্টম শতকের প্রথম পাদ পর্যন্ত। বাঙলা দেশের কোনো অংশ এই রাজবংশের করায়ত্ত ছিল কিনা বলা কঠিন; ছিল না বলিয়াই মনে হয়। তবে নিজেদের লিপিতে চতুঃসমুদ্র পর্যন্ত রাজ্যজয় এবং উত্তরাপথনাথ হইবার দাবি যে-ভাবে জানানো হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, ইঁহাদের রাষ্ট্রীয় প্রভাব একেবারে তুচ্ছ করিবার মতন ছিল না।

শৈলাধিপত্য

এই নবগুপ্ত বংশের কোনো রাষ্ট্রীয় আধিপত্য থাকুক বা না থাকুক, অষ্টম শতকের প্রথম পাদের শেষে অথবা দ্বিতীয় পাদের প্রারম্ভেই শৈলবংশীয় কোন রাজা পৌণ্ড্রদেশ, অর্থাৎ উত্তর-বঙ্গ জয় করিয়াছিলেন এবং পৌণ্ড্রাধিপকে হত্যা করিয়াছিলেন। শৈলবংশ হিমালয় উপত্যকাবাসী; কিন্তু ইঁহাদের রাষ্ট্রীয় পরাক্রম বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হইয়া গুর্জর, কাশী এবং বিন্ধ্য অঞ্চল গ্রাস করিয়াছিল। কিন্তু ইঁহাদের পৌণ্ড্রাধিকার বা ইঁহাদের বংশ ও রাজত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

যশোবর্মা কর্তৃক মগধ-গৌড়-বঙ্গজয়

বাঙলা দেশে এই সব বৈদেশিক আক্রমণ ও তৎসংপৃক্ত রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়ের মধ্যে সব-চেয়ে বড় বিপর্যয় দেখা দিয়াছিল কনৌজরাজ যশোবর্মার মগধ এবং গৌড়াক্রমণ ও বিজয়ের ফলে। এই দুর্ধর্ষ বিজয়মদমত্ত রাজা ৭২৫ হইতে ৭৩৫-র মধ্যে কোনো সময় মগধাক্রমণ করিয়া মগধরাজকে প্রথমত বিন্ধ্য পর্বতে পলাইয়া যাইতে বাধ্য করেন, পরে

সম্মুখ যুদ্ধে তাঁহাকে নিহত এবং তাঁহার সৈন্য-সামন্তদিগকে পরাজিত করেন। বোধ হয় মগধ জয়ের পর তিনি গৌড়রাজকেও পরাজিত ও নিহত করেন। বাক্‌পতিরাজ তাঁহার সভাকবি ছিলেন, এবং তিনি এই মগধ ও গৌড় বিজয়কাহিনী লইয়া গৌড়বহো নামে একটি (অসমাপ্ত ?) প্রাকৃত কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। এই কাব্যে গৌড়রাজ-বধের কাহিনী যে-ভাবে প্রসঙ্গক্রমে মাত্র উল্লিখিত হইয়াছে, এই সমস্ত কাহিনীটির বর্ণনা যে-ভাবে করা হইয়াছে তাহাতে এই অনুমান স্বাভাবিক যে, এই সময় গৌড়ের রাজাই মগধেরও রাজা ছিলেন এবং দুইজনই এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন; কিন্তু তিনি কে ছিলেন বলা কঠিন। মগধ ও গৌড় বিজয়ের পর যশোবর্মা সমুদ্রতীরের দিকে অগ্রসর হন এবং বঙ্গদেশও জয় করেন। স্পষ্টতই দেখা যাইতেছে, প্রায় সমস্ত বাঙলাদেশই তাঁহার নিকট মস্তক অবনত করিয়াছিল। কিন্তু যশোবর্মা অধিকদিন তাঁহার এই বৈদ্যুতিক দিগ্বিজয় ভোগ করিতে পারেন নাই।

কাশ্মীর ও বাঙলা

সম্ভবত ৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পরই যশোবর্মা কাশ্মীররাজ মুক্তাপীড় ললিতাদিত্য কর্তৃক অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। ললিতাদিত্য কর্তৃক উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতে বহু রাজ্যবিজয়ের কথা কহ্লন্ রাজতরঙ্গিণী-গ্রন্থে সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। এই সব বিবরণের ঐতিহাসিকত্ব কতটুকু বলা কঠিন, তবে কহ্লনের বিবৃতি পাঠ করিলে মনে হয়, গৌড় কিছুদিনের জন্য হইলেও কাশ্মীরের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। গৌড়রাজকে কাশ্মীররাজের আদেশে একদল হস্তীসেনা লইয়া কাশ্মীরে যাইতে হইয়াছিল। কাশ্মীররাজ সম্বন্ধে গৌড়রাজের বোধ হয় কিছু ভীতি ও অবিশ্বাসের কারণ ছিল; সেই হেতু ললিতাদিত্য বিষ্ণুমূর্তি সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করেন যে, গৌড়রাজের কিছু অনিষ্ট তিনি করিবেন না। কিন্তু গৌড়রাজ কাশ্মীরে পৌঁছিবার পর ললিতাদিত্য এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন নাই; গৌড়রাজকে তিনি হত্যা করেন। একদল গৌড়বাসী এই হত্যার প্রতিশোধ মানসে তীর্থযাত্রী সাজিয়া কাশ্মীরে গমন করেন, এবং ললিতাদিত্যের শপথসাক্ষী বিষ্ণুমূর্তি ও মন্দির ধ্বংস করেন। ইতিমধ্যে কাশ্মীররাজের সৈন্যরা আসিয়া গৌড়বাসীদের খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলে। এই কাহিনীর উল্লেখের কোনো প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু এই উপলক্ষ্যে কাশ্মীর-সন্তান কহ্লন্ গৌড়বাসীদের প্রভুভক্তি, সাহস ও শৌর্য সম্বন্ধে যে স্তুতিবাদ কাব্যস্থ করিয়াছেন তাহা উদ্ধারযোগ্য, এবং সেই জন্যই এই কাহিনীর উল্লেখ। কহ্লন্ বলিতেছেন: গৌড়বাসীরা এই ব্যাপারে যাহা করিয়াছিল তাহা স্রষ্টা বিধাতারও অসাধ্য

বলিলে কিছু অত্যুক্তি হয় না (৩৩২ শ্লোক)। [কহ্লনের সময়েও] রামস্বামীর মন্দিরটি যেমন একদিকে দেবতাশূন্য হইয়া পড়িয়া আছে, তেমনই সেই গৌড়বীরদের অপূর্ব যশোগানে সমগ্র পৃথিবী পরিপূর্ণ হইয়া আছে (৩৩৫ শ্লোক)।

ললিতাদিত্যের পৌত্র জয়াপীড় সম্বন্ধে কহ্লন্ আর একটি গল্পের উল্লেখ করিয়াছেন। জয়াপীড় দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া নিজের সৈন্যদল কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া একা একা ঘুরিতে ঘুরিতে পুণ্ড্রবর্ধন নগরে আসিয়া উপস্থিত হন এবং ছদ্মবেশে এক বারাঙ্গনার গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। জয়ন্ত নামে এক ব্যক্তি তখন পুণ্ড্র-বর্ধনের সামন্ত-রাজা ; গৌড়ের রাজাদের তিনি অন্যতম সামন্ত। জয়ন্তের কন্যা কল্যাণদেবীর সঙ্গে জয়াপীড়ের প্রণয় সঞ্জাত হয়, এবং তিনি তাঁহাকে বিবাহ করিয়া পঞ্চগৌড়াধিপতিদের পরাজিত করেন, এবং জয়ন্তকে তাঁহাদের অধিরাজ পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। কহ্লনের এই সব কাহিনীর ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া কঠিন ; তবে মনে হয়, এই সময় গৌড়দেশ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে বহুধা বিভক্ত ছিল, এবং সর্বব্যাপী কোনো রাষ্ট্রীয় প্রভুত্বের অস্তিত্ব ছিল না, স্থানীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তরাই নিজ নিজ স্থানে রাষ্ট্রপ্রধান হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এই অবস্থায় বৈপ্রান্তিক পরাক্রান্ত শক্তিদের দ্বারা বারবার পর্যুদস্ত হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়।

ভগদত্ত-বংশীয় হর্ষ

আনুমানিক অষ্টম শতকের দ্বিতীয় পাদে গৌড়ে আর একটি বৈপ্রান্তিক অভিযানের খবর পাওয়া যায়। নেপালের লিচ্ছবিরাজ দ্বিতীয় জয়দেবের একটি লিপিতে দেখিতেছি (৭৫৯ অথবা ৭৪৮), জয়দেবের শ্বশুর (কামরূপের ?) ভগদত্তবংশীয় হর্ষ গৌড়, ওড্র, কলিঙ্গ এবং কোশলের অধিপতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

এই সব বিচিত্র বৈপ্রান্তিক বিজয়ী সমরাভিযান বাহিরের বা বাঙলাদেশের কোনো লিপি বা অন্য কোনো স্বতন্ত্র সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা অসমর্থিত ; সুতরাং ইহাদের সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া কঠিন। তবে, সদ্যোক্ত সমস্ত সাক্ষ্যগুলি একত্র করিলে এই তথ্যই মনকে অধিকার করে যে, এই একশত বৎসর গৌড়রাষ্ট্রে সর্বময় প্রভু কেহ ছিলেন না, রাষ্ট্রের কোনো সামগ্রিক ঐক্য ছিল না, এবং এই সমৃদ্ধ অথচ বহুধা বিভক্ত দেশ-পরিবার ভিন্ন প্রদেশি রাজা ও রাষ্ট্রের লোলুপ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিল।

চন্দ্রবংশ ॥ বঙ্গবীরদের অপমান

গৌড়তন্ত্রের যখন এই অবস্থা বঙ্গরাষ্ট্রের অবস্থাও যে তখন ইহার চেয়ে উন্নত ও দৃঢ় ছিল তাহা বলা যায় না। তবে, আগেকার পর্বে দেখিয়াছি, বঙ্গ ও সমতট রাষ্ট্র

সপ্তম শতকের প্রায় শেষ পর্যন্ত খড়্গ ও রাত বংশের নায়কত্বে একটা মোটামুটি সামগ্রিক ঐক্য বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল। ভৌগোলিক দূরত্ব এবং কতকটা অনধিগম্যতাও বোধ হয় তাহার অন্যতম কারণ। সুপ্রতিষ্ঠিত রাজবংশ ও রাষ্ট্রও তাহার অন্যতম কারণ হইতে পারে। বৌদ্ধধর্মের ঐতিহাসিক তিব্বতী লামা তারনাথের মতে খড়্গবংশের পতনের পর বঙ্গরাষ্ট্র চন্দ্রবংশীয় রাজাদের করায়ত্ত হয় এবং তাঁহারা বঙ্গে, এবং কখনো কখনো গৌড়ে, প্রায় অষ্টম শতকের প্রথম পাদ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। গোবিন্দচন্দ্র এবং ললিতচন্দ্র এই বংশের শেষ দুই রাজা। বোধ হয় ললিতচন্দ্রের আমলেই বঙ্গ যশোবর্মার বিজয়ী সমরাভিযানের সম্মুখীন হইয়াছিল। এই রাজা যিনিই হউন, গৌড়বহের কবি বাক্‌পতিরাজ তৎকালীন বঙ্গবীরদের পরোক্ষে খুবই সুখ্যাতি করিয়াছেন। পরাজয়ের পর বঙ্গবীরেরা যখন যশোবর্মার সম্মুখে শির অবনত করিয়াছিল তখন তাহাদের মুখমণ্ডল (লজ্জা ও অপমানে) রক্তহীন পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিয়াছিল, কারণ তাহারা এইরূপ পরাজয়ে (লজ্জা ও অপমান স্বীকারে) অভ্যস্ত ছিল না (৪২০ শ্লোক)।

নৈরাজ্য মাৎস্যন্যায়

তারনাথের বিবৃতিমতে ললিতচন্দ্রের মৃত্যুর পর সমগ্র বাঙলাদেশ জুড়িয়া অভূতপূর্ব নৈরাজ্যের সূত্রপাত হয়। গৌড়ে-বঙ্গে-সমতটে তখন আর কোনো রাজার আধিপত্য নাই, সর্বময় রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব তো নাইই। রাষ্ট্র ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন; ক্ষত্রিয়, বণিক, ব্রাহ্মণ, নাগরিক স্ব স্ব গৃহে সকলেই রাজা। আজ একজন রাজা হইতেছেন, রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব দাবি করিতেছেন, কাল তাঁহার ছিন্ন মস্তক ধূলায় লুটাইতেছে। ইহার চেয়ে নৈরাজ্যের বাস্তব চিত্র আর কি হইতে পারে। প্রায় সমসাময়িক লিপি (যেমন, খালিমপুর লিপি) এবং কাব্যে (যেমন, রামচরিত) এই ধরনের নৈরাজ্যকে বলা হইয়াছে মাৎস্যন্যায়। রাজা নাই, অথচ সকলেই রাষ্ট্রীয় প্রভুত্বের দাবিদার। বাহুবলই একমাত্র বল, সমস্ত দেশময় উচ্ছৃঙ্খল বিশৃঙ্খল শক্তির উন্মত্ততা; এমন যখন হয় দেশের অবস্থা, প্রাচীন অর্থশাস্ত্রে তাহাকেই বলে মাৎস্যন্যায়, অর্থাৎ বৃহৎ মৎস্য কর্তৃক ক্ষুদ্র মৎস্য-গ্রাসের যে ন্যায় বা যুক্তি সেই ন্যায়ের অপ্রতিহত রাজত্ব। বৎসরের পর বৎসর বাঙলাদেশ এই মাৎস্যন্যায় দ্বারা পীড়িত হইয়াছিল। শেষ পর্যন্ত এই উৎপীড়ন যখন আর সহ্য হইল না তখন সমগ্র বাঙলা-দেশের রাষ্ট্র-নায়কেরা একত্র হইয়া নিজেদেরই মধ্য হইতে একজনকে অধিরাজ বলিয়া নির্বাচন করিলেন এবং তাঁহার সর্বময় আধিপত্য মানিয়া লইলেন; এই রাষ্ট্রনায়ক অধিরাজটির নাম গোপালদেব। কিন্তু এই বিপ্লবগর্ভ ইতিহাস পরবর্তী পর্বের।

এই মাৎস্যন্যায়ের অপ্রতিহত রাজত্ব গোপালদেবের নির্বাচনের পূর্ববর্তী কয়েক বৎসরেই শুধু আবদ্ধ নয়; এ-রাজত্ব চলিয়াছিল একশত বৎসর ধরিয়া, সপ্তম শতকের মাঝামাঝি হইতে অষ্টম শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত। এই পর্ব জুড়িয়াই যে বৃহৎ মৎস্য

কর্তৃক বাঙলার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্ররূপ মৎস্য-ভক্ষণের যুক্তি বিকৃত। মঞ্জুশ্রীমূলকল্পের গ্রন্থাকার শশাঙ্কের পর হইতেই গৌড়তন্ত্র পক্ষাঘাতগ্রস্ত হওয়ার সংবাদ দিতেছেন ; শশাঙ্কের পর যাঁহারা রাজা হইতেছেন তাহারা কেহই পুরা এক বৎসর রাজত্ব করিতে পারিতেছেন না ! শিশু নামক এক রাজার রাজত্বকালে নারীর প্রতাপ ও প্রভাব দুর্জয় হইয়া উঠিয়াছিল এবং হতভাগ্য রাজা একপক্ষকাল মাত্র রাজত্ব করিবার পরই নাকি নিহত হন। বারবার বৈপ্রাদেশিক রাষ্ট্র ও রাজাকর্তৃক পরাজিত পর্যুদস্ত হওয়ার কথা তো আগেই বলিয়াছি। মঞ্জুশ্রীমূলকল্পে এই পর্বেই আবার পূর্বপ্রত্যন্ত দেশে এক নিদারুণ দুর্ভিক্ষের খবরও পাওয়া যাইতেছে। এ-সমস্ত বিবরণ একত্র করিলে মনে হয়, এই সুদীর্ঘ একশত বৎসর বাঙলাদেশে, অন্তত গৌড়ে, কোথাও কোনো সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা বজায় ছিল না। খালিমপুর লিপিতে আছে, মাৎস্যন্যায় দূর করিবার জনাই প্রকৃতিপুঞ্জ গোপালকে রাজা নির্বাচন করিয়াছিল, কিন্তু এই প্রকৃতিপুঞ্জ মাৎস্যন্যায়ের ফলে কতদূর উৎপীড়িত হইয়াছিল তাহা এই সব বিচ্ছিন্ন ঘটনা ও উল্লেখের ভিতর হইতে সুস্পষ্ট ধারণা করা যায় না। অবস্থা যে খুবই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

সামাজিক ইঙ্গিত, ব্যবসা-বাণিজ্যের অবনতি

এই মাৎস্যন্যায়ের সামাজিক ইঙ্গিত ধরিবার মতন সাক্ষ্য-প্রমাণ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত নাই, কিন্তু পূর্ব ও পশ্চাতের ইতিহাসের ধারা হইতে মোটামুটি অনুমান হয়তো একেবারে অসম্ভব নয়। প্রথমত, রাষ্ট্রের এক বিশৃঙ্খল অবস্থায় ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা খুব ভাল থাকিবার কথা নয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের পশ্চাতে রাষ্ট্রের যে সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা-বিন্যাস থাকা প্রয়োজন এই যুগে তাহার কোনো সাক্ষ্যই পাওয়া যাইতেছে না ; শান্তি ও শৃঙ্খলা যেখানে অব্যাহত নাই সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের সমৃদ্ধি কল্পনা করা কঠিন। ইহার পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়, সুবর্ণমুদ্রা এমন কি রৌপ্য মুদ্রারও অপ্রচলন হইতে। বস্তুত এই যুগের কোনো প্রকার মূল্যবান ধাতব মুদ্রা বাঙলাদেশের কোথাও এ-পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। শশাঙ্ক-জয়নাগের কালে রৌপ্যমুদ্রা ছিল না, কিন্তু যত অপকৃষ্ট বা নকলই হউক না কেন, সুবর্ণমুদ্রা তো ছিল। বাঙলাদেশের মুদ্রাজগৎ হইতে সুবর্ণমুদ্রা এই যে অন্তর্হিত হইল মুসলমান আমলের আগে আর তাহা ফিরিয়া আসে নাই। আর একটি পরোক্ষ প্রমাণ পাইতেছি, তাম্রলিপ্তির ইতিহাসের মধ্যে। সপ্তম শতকের শেষ পাদেও ই-ৎসিঙ্ তাম্রলিপ্ত বন্দরের উল্লেখ করিতেছেন ; অষ্টম শতকের সাক্ষ্যেও, যেমন, দুধপানি পাহাড়ের লিপিতে, ২।১ বার তাম্রলিপ্তির উল্লেখ পাইতেছি, কিন্তু এই সব উল্লেখ হয় প্রাচীনতর স্মৃতিবহ অথবা শুধু উল্লেখই মাত্র। তাম্রলিপ্তির সেই সম্পদ-সমৃদ্ধির কথা আর কেহ বলিতেছেন না। অষ্টম শতকের শেষার্ধ হইতে উল্লেখও আর পাওয়া যাইতেছে না, এবং চতুর্দশ শতকের আগে সমগ্র বাঙলাদেশের আর কোথাও

বৈদেশিক সামুদ্রিক বাণিজ্যের আর কোনো বন্দরই গড়িয়া উঠিল না। বস্তুত, সপ্তম শতকের চতুর্থপাদ হইতে অষ্টম শতকের মাঝামাঝির মধ্যে একমাত্র সামুদ্রিক বন্দর তাম্রলিপ্তির সৌভাগ্য চিরতরে ডুবিয়া গেল! সরস্বতীর প্রাচীনতর খাত্ বন্ধ হওয়া ইহার একটি কারণ হইতে পারে, কিন্তু সুদীর্ঘকাল জুড়িয়া দেশব্যাপী এই অরাজকতাও অন্যতম কারণ নয়, তাহা কে বলিবে? দেশের অর্থসম্পদ ছিল না এ-কথা সত্য নয়, কিন্তু এই অর্থসম্পদ ব্যবসা-বাণিজ্যলব্ধ নয় বলিয়াই যেন মনে হয়—ভূমিলব্ধ, কৃষিলব্ধ সম্পদ। তিব্বতরাজ খ্রি-স্রোং-দে-ব্‌ৎসন্-পোর সঙ্গে ধর্মপালের সম্বন্ধের কথা আগেই বলিয়াছি; সেই সময়ও বাঙলা দেশ যথেষ্ট সম্পদশালী, শস্য ও মণিমাণিক্যে সমৃদ্ধ, এবং এই সব শস্য ও মণিমুক্তা সম্পদ নিয়মিত তিব্বতে প্রেরিত হইত বাৎসরিক উপঢৌকন রূপে। ইহার কিছু অবশ্য অন্তর্দেশি ব্যবসা-বাণিজ্যলব্ধ হইতে পারে, কিন্তু মোটের উপর দেশের সামাজিক ধন ক্রমশ যে উত্তরোত্তর কৃষিলব্ধ ধনে বিবর্তিত হইতেছে, এ-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কম। কারণ, পরবর্তী পালযুগে বাঙলার সমাজ প্রধানত কৃষি এবং গৃহশিল্পনির্ভর হইয়া পড়িয়াছে, অধিকাংশই কৃষিনির্ভর, কারণ, রাষ্ট্রে কৃষক বা ক্ষেত্রকর সমাজের স্থান যদি বা উল্লিখিত হইতেছে, শিল্পী বা বণিক সমাজ পৃথকভাবে উল্লিখিত হইতেছে না। দেখা যাইবে, ভূমির চাহিদাও পরবর্তীকালে উত্তরোত্তর বাড়িয়াই যাইতেছে।

সামন্ততন্ত্র

রাষ্ট্রবিন্যাস-ব্যাপারে নূতন করিয়া কিছু বলিবার নাই; সাক্ষ্য-প্রমান প্রায় অনুপস্থিত। তবে, এই যুগের রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হইতেছে সামন্ততন্ত্র। সর্বময় অধিরাজ কেহ সাধারণত নাই; থাকিলে তো মাৎস্যন্যায়ই হইতে পারিত না। সামন্তরাই এ-যুগের নায়ক, এবং সকলেই স্ব স্ব প্রধান। বঙ্গে-সমতটে খড়্গ-বংশীয় রাজারা রাজতন্ত্র হয়তো বজায় রাখিয়াছিলেন, কিন্তু এই রাজতন্ত্রেও সামন্তরা প্রবল ও পরাক্রান্ত। লোকনাথের বংশ সামন্তবংশ; সামন্ত লোকনাথেরও আবার সামন্ত ছিল। মাৎস্যন্যায়ের শেষ পর্বে এই সব সামন্ত নায়কেরাই তো একত্র হইয়া গোপালদেবকে রাজা নির্বাচিত করিয়াছিলেন। প্রকৃতিপুঞ্জ বলিতে খালিমপুর-লিপি ও রামচরিত এই সব সামন্ত-নায়কদেরই বুঝাইতেছে; ইঁহারাই ছিলেন প্রকৃতিপুঞ্জের নায়ক।

সংস্কৃতি

ধর্ম ও সংস্কৃতির কথা আগেকার রাজবৃত্ত-পর্বেই বলিয়াছি। বঙ্গের খড়্গ-বংশীয় রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন, এ-কথা আগেই বলা হইয়াছে; তাঁহারা বৌদ্ধধর্মের খুব উৎসাহী পোষকও ছিলেন। আর যাঁহাদের, যে-সব রাজা, রাজবংশ বা সামন্তদের খবর পাওয়া

যাইতেছে, তাঁহারা প্রায় সকলেই ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী। এই একশত বৎসরের মধ্যে ভিন্‌দেশি বা বৈপ্রান্তিক যে সব অভিযাত্রীরা বিরোধের মধ্য দিয়া বাঙলা দেশের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে তিব্বতী স্রং-ৎসন্‌-গ্যাম্পো এবং তাঁহার পৌত্র কি-লি-প পু ছাড়া আর প্রায় সকলেই ছিলেন ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কারাশ্রয়ী। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ই-ৎসিঙ ও সেংচি'র বিবরণী পড়িলে মনে হয়, বৌদ্ধধর্মের প্রভাবও খুব কম ছিল না। কিন্তু যে-ধর্মের যেরূপ প্রভাবই থাকুক না কেন, এই দুর্যোগে দুর্দিনে সকল ধর্ম ও সংস্কৃতিকেই দেশব্যাপী অনিশ্চয়তা ও অরাজকতার কিছু কিছু ফল ভোগ করিতে হইয়াছিল নিশ্চয়ই। তাহার কিছু কিছু প্রমাণ-পরিচয় বোধ হয় বাঙলার দুই চারিটি ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পাওয়া যায়। পাহাড়পুরে পাল-সম্রাট ধর্মপালের আমলে বৌদ্ধ সোমপুর-মহাবিহার প্রতিষ্ঠার আগে সেইস্থানে যে একটি জৈন-বিহার ছিল, এ-তথ্য পাহাড়পুরের পট্টোলীতেই (৪৭৮-৭৯) প্রমাণ। এই বিহারের ধ্বংসাবশেষের উপরই সোমপুর-মহাবিহার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মহাস্থানের ধ্বংসাবশেষের মধ্যেও দেখা যায়, গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগের ধ্বংসস্তূপের উপর পরবর্তী পাল-আমলের বিহার-মন্দির ইত্যাদি গড়িয়া উঠিয়াছে। নিশ্চিত ভাবে বলিবার উপায় নাই, কিন্তু মনে হয়, এই সব ধ্বংসকার্য এই নৈরাজ্য ও বৈদেশিক আক্রমণের যুগেই সম্ভব হইয়াছিল। তাহা ছাড়া, বৌদ্ধধর্মের যে সমৃদ্ধ অবস্থাই য়ুয়ান-চোয়াঙ, ই-ৎসিঙ ও সেংচি বর্ণনা করিয়া থাকুন না, পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম ক্রমশ বিস্তৃতি লাভ করিতেছিল, সন্দেহ নাই। প্রায় সমসাময়িক লোকনাথ-পট্টোলী এবং কৈলান পট্টোলীর সাক্ষ্য এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। শত শত বৌদ্ধ সংঘ, বিহার প্রভৃতি থাকা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কার ক্রমশ জয়ী ও সর্বব্যাপী হইতেছিল। মঞ্জুশ্রীমূলকল্পের গ্রন্থকার গোপালের নির্বাচনের অব্যবহিত পূর্বেকার বাঙলার কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছেন: 'এই সময় সমুদ্র পর্যন্ত বাঙলাদেশ তীর্থিকদের (ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী) দ্বারা পরিপূর্ণ, বৌদ্ধ মঠগুলি ভাঙিয়া পড়িতেছে, এবং তাহারই ইটকাঠ কুড়াইয়া লোকে বাড়ী তৈয়ারী করিতেছে; দেশে অনেক ব্রাহ্মণ সামন্ত ভূম্যধিকারী ছিল, এবং গোপালও ব্রাহ্মণানুরক্ত ছিলেন।'

ধর্ম ও সংস্কৃতির দিক হইতে একশত বৎসর ধরিয়া বাঙলায় এক বৈপ্লবিক রূপান্তর সাধিত হইতেছিল বলিয়া মনে হয়। যে সংস্কৃত ভাষা বাঙালী পণ্ডিতদের হাতে কোনো প্রকারে ভাব প্রকাশের উপায় মাত্র ছিল (পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকের সংস্কৃত লিপিগুলিই তাহার প্রমাণ), সেই সংস্কৃত ভাষা সপ্তম শতকের মাঝামাঝি, বিশেষভাবে পাল-আমলের সূত্রপাত হইতেই, অপূর্ব ছন্দলালিত্যময় কাব্যময় ভাব প্রকাশের বাহন হইয়া উঠিয়াছে (দ্রষ্টব্য, লোকনাথের লিপি, পাল-আমলের লিপিগুলি)। বৌদ্ধধর্ম আরও বিস্তৃত হইয়াছে শুধু তাহাই নয়, বাঙলার বহুস্থানে সুবৃহৎ মহাবিহার ইত্যাদিও স্থাপিত হইতেছে অষ্টম শতকের শেষপাদ হইতেই, এবং বৌদ্ধ শিক্ষাদীক্ষা বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। যে-ব্রাহ্মণ্যধর্মের দেবদেবীর সংখ্যা ও প্রসার ছিল সীমিত তাহাদের সংখ্যা কেবল বাড়িয়াছে, বিষ্ণু, শৈব,

শাক্ত এবং নানা মিশ্র দেবদেবীতে দেশ যেমন ছাইয়া গিয়াছে, তেমনই তাঁহাদের প্রভাবও গিয়াছে বাড়িয়া। পাল-আমলের সূচনা হইতেই বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের এই সমৃদ্ধি দৃষ্টি আকর্ষণ করে; সংস্কৃত ভাষার সমৃদ্ধিও দৃষ্টি এড়াইবার কথা নয়। বৌদ্ধধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তারের কারণ সুবোধ্য; পালবংশই তো প্রধানত বৌদ্ধবংশ ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যধর্মও পূর্বযুগের অনুপাতে এই যুগে বহুতর বিস্তৃতি, প্রসার ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে, এমন কি বৌদ্ধধর্মেরও সাংস্কৃতিক আদর্শ অনেকটা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি অনুযায়ী। এই বিবর্তন সমস্তটাই সংঘটিত হইয়াছে মাৎস্যন্যায়ের একশত বৎসরের মধ্যে, এবং পাল-আমলে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হওয়ার পর তাহার সম্পূর্ণ রূপটি আমাদের দৃষ্টি-গোচর হইতেছে। এই একশত বৎসরের বৈদেশিক আক্রমণের দুর্যোগ-দুর্বিপাককে আশ্রয় করিয়াই উত্তর-ভারতের ক্রমবর্ধমান ক্রমপ্রসারমান ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কৃতি এবং সংস্কৃত ভাষা বাঙলা দেশে আসিয়া বিস্তৃততর সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। আর, বাঙলাদেশের বৌদ্ধধর্ম যে পাল-আমল হইতে উত্তরোত্তর তন্ত্রাশ্রিত হইয়াছে তাহার মূলে স্রং-ৎসন্-গ্যাম্পো এবং তাহার পৌত্রের এবং তাঁহারও পরবর্তী একাধিক তিব্বতী অভিযানের কোনো প্রভাব নাই, খড়্গ বংশীয় বৌদ্ধ রাজাদের কোনো প্রভাব নাই, এ-কথাই বা কে বলিবে? খড়্গ বংশীয় রাজারা বহির্দেশাগত বলিয়াই তো মনে হয়। একশত বৎসরের রাষ্ট্রীয় দুর্যোগের কোন্ ফাঁকে কে বা কাহারা কোন্ সংস্কৃতির ধারায় কোন্ নূতন স্রোত বহাইয়া দিয়া গিয়াছেন, ইতিহাস তাহার হিসাব, এমন কি ইঙ্গিতও রাখে নাই। অথচ, বৃহৎ সামাজিক আবর্তন-বিবর্তন তো এই রকম দুর্যোগের মধ্যেই ঘটিয়া থাকে। বাঙলা-দেশেও তাহাই হইয়াছিল; নহিলে পাল-আমলের সূচনা হইতেই বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কৃতির, সংস্কৃত ভাষার এমন সুসমৃদ্ধ রূপ আমরা দেখিতে পাইতাম না।

৭

[গো]পালায়ন

[মা]ৎস্যন্যায় হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বাঙলার প্রকৃতিপুঞ্জ যাঁহাকে রাজা নির্বাচন [ক]রিয়াছিল সেই গোপালদেব ছিলেন দয়িতবিষ্ণুর পুত্র এবং বপ্যটের পৌত্র। সমসাময়িক [রী]তিসুলভ পৌরাণিক বংশ-মর্যাদায় নিজেদের কৌলীন্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা পাল-অধিপতিদের [কা]হারও দেখা যায় না; বস্তুত, পাল-রাজাদের দলিলপত্রে অথবা রাজসভায় রচিত কোনো [গ্র]ন্থেই সে-চেষ্টা নাই। খালিমপুর-লিপিতে তিনটি মাত্র শ্লোকে ধর্মপালের বংশ পরিচয়; [প্রথ]ম শ্লোকটিতে দয়িতবিষ্ণুর উল্লেখ, দ্বিতীয় শ্লোকে বপ্যটের; তৃতীয় শ্লোকে বলা [হই]য়াছে মাৎস্যন্যায় দূর করিবার অভিপ্রায়ে প্রকৃতিপুঞ্জ গোপালকে রাজলক্ষ্মীর কর গ্রহণ [করা]ইয়াছিলেন, অর্থাৎ রাজা নির্বাচন করিয়াছিল। তাঁহারই পুত্র ধর্মপাল।

অনুক্রম ।। বংশ-পরিচয় ।। পিতৃভূমি

এই প্রকৃতিপুঞ্জ কাহারা ? প্রকৃতির অভিধানগত অর্থ প্রজা। কিন্তু বাঙলার তৎকালীন সমস্ত প্রজাবর্গ অর্থাৎ জনসাধারণ সম্মিলিত হইয়া গোপালকে রাজা নির্বাচন করিয়াছিলেন, এমন মনে হয় না। কেহ কেহ মনে করেন, প্রকৃতি অর্থ রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান কর্মচারী, এবং গোপালকে রাজা নির্বাচন তাঁহারাই করিয়াছিলেন। এই মতও সমর্থনযোগ্য নয়। কারণ, সেই নৈরাজ্যের যুগে বাঙলাদেশে পরস্পর বিবদমান অনেকগুলি রাষ্ট্রের আধিপত্য ; কোন্ রাষ্ট্রের প্রধান কর্মচারীরা একত্র হইয়া এই নির্বাচন করিয়াছিলেন ? একটি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের ব্যাপার হইলে হয়তো এইরূপ নির্বাচন সম্ভব হইতে পারিত, যেমন একবার কাশ্মীরে হইয়াছিল তৃতীয় শতকে জলৌকের ক্ষেত্রে। সমস্ত প্রজাবর্গের সম্মিলিত নির্বাচনও সেই নৈরাজ্যের যুগে সম্ভব ছিল না ; তাহা হইলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সামন্ত-নায়কদের সঙ্গে প্রজাবর্গের একটা প্রবল বিরোধের ইঙ্গিত কোথাও পাওয়া যাইত। বরং মনে হয়, এই সামন্ত-নায়কেরাই বহু বৎসর নৈরাজ্য ও মাৎস্যন্যায়ে উৎপীড়িত হইয়া শেষ পর্যন্ত সকলে একত্র হইয়া এই নির্বাচন কার্যটি নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন। এই সামন্ত-নায়কদের এবং সামন্ততন্ত্রের কথা তো আগেই একাধিকবার ইঙ্গিত করিয়াছি ; ইঁহাদের প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা যে কম ছিল না, তাহাও বলিয়াছি। দেশে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র যখন বিদ্যমান তখনই সামন্ত-নায়কদের সংখ্যা অনেক ; নৈরাজ্য ও মাৎস্যন্যায়ের পর্বে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র যখন দুর্বল হইয়া বা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে তখন ইঁহাদের সংখ্যা আরও বাড়িয়াই গিয়াছে। বস্তুত, দেশ জুড়িয়া ছোট বড় এই সামন্ত-নায়কেরাই তখন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। ইঁহারা যখন দেশকে বারবার বৈদেশিক শত্রুর হাত হইতে আর বাঁচাইতে পারিলেন না, শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে পারিলেন না, তখন একজন রাজা এবং একটি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র গড়িয়া তোলা ছাড়া বাঁচিবার আর পথ ছিল না। ইঁহারাই গোপাল-নির্বাচনের নায়ক। যাহা হউক, এই শুভবুদ্ধির ফলে বাঙলাদেশ নৈরাজ্যের অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা এবং বৈদেশিক শত্রুর কাছে বারবার অপমানের হাত হইতে রক্ষা পাইল। শুধু বাঙলার ইতিহাসে নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাসেই এই ধরনের শুভ সামাজিক বুদ্ধি এবং রাষ্ট্রীয় চেতনার দৃষ্টান্ত বিরল। পাল-রাজাদের লিপিতে এবং সন্ধ্যাকর-নন্দীর রামচরিতে এই নির্বাচন-কাহিনীর সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু ভারতীয় সাহিত্যে কোথাও তাহা যথোচিত কীর্তন ও মর্যাদা লাভ করে নাই। তবে, লোকস্মৃতিতে ইহার গৌরব ও উদ্দীপনা ষোড়শ শতক পর্যন্তও জাগ্রত ছিল, তাহার প্রমাণ তারনাথের বিবরণীতে পাওয়া যায়।

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের মাঝামাঝি কোনো সময় গোপালদেব পাল-বংশের প্রতিষ্ঠা করেন, এবং দ্বাদশ শতকের তৃতীয় পাদে গোবিন্দপালের সঙ্গে সঙ্গে এই বংশের বিলয়

ঘটে। সুদীর্ঘ চারিশত বৎসর ধরিয়া নিরবচ্ছিন্ন একটি রাজবংশের রাজত্ব খুব কম দেশের ইতিহাসেই দেখা যায়। গোপালদেবের কুলগৌরব কিছু ছিল বলিয়া মনে হয় না, তেমন দাবিও কোথাও করা হয় নাই। হয়তো তিনিও একজন অন্যতম সামন্ত-নায়ক ছিলেন। অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার হরিভদ্রকৃতটীকায় ধর্মপালকে "রাজভটাদিবংশপতিত" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; খালিমপুর-লিপির "ভদ্রাত্মজা" শব্দ কেহ কেহ ধর্মপালের মাতা দেদ্দাদেবীর বিশেষণ বলিয়া মনে করিয়াছেন। এই দুই পদের অর্থ লইয়া পণ্ডিত মহলে মতভেদের অন্ত নাই। মোটামুটি চেষ্টাটা হইয়াছে পালবংশের রাজকীয় আভিজাত্য প্রমাণের দিকে। কিন্তু এই দুইটি পদের একটিও নিঃসংশয়ে তেমন কিছু ইঙ্গিত করে না। তৃতীয় বিগ্রহপালের মন্ত্রী বৈদ্যদেবের কমৌলি লিপিতে পাল-রাজাদের সূর্যবংশীয় বলা হইয়াছে; সোঢ্ঢল কবির উদয়সুন্দরীকথায় পালরাজাদের সূর্যবংশীয় মান্ধাতৃ পরিবার-সম্ভূত বলা হইয়াছে। এই সব দাবির মূলে কোনো সত্য আছে কিনা সন্দেহ। সন্ধ্যাকরনন্দীর রামচরিতে ধর্মপালকে বলা হইয়াছে "সমুদ্রকুলদীপ"; তারনাথও ধর্মপালের সঙ্গে সমুদ্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ইঙ্গিত ক'রয়াছেন। ঘনরামের ধর্মমঙ্গল-কাব্যেও সমুদ্রের সঙ্গে ধর্মপাল মহিষীর একটা সম্পর্কের ইঙ্গিত আছে। সমুদ্রাশ্রয়ী ও জলনিধিদুর্গনির্ভর গৌড়জনদের সঙ্গে অথবা সামুদ্রিক ও সমুদ্রাশ্রয়ী আদি-অস্ট্রেলীয়-পলিনেশীয় নরগোষ্ঠীর সঙ্গে বাঙলার পাল-বংশের কোনো সম্বন্ধের ইঙ্গিত এই সব কাহিনীর সঙ্গে জড়িত থাকা অসম্ভব নয়। সুপ্রাচীন বাঙলাদেশে, বাঙলার জাতিতত্ত্ব ও ভাষায় এই নরগোষ্ঠীর দানের কথা তো আগে বিস্তৃতভাবেই উল্লেখ করিয়াছি। রামচরিতে এবং তারনাথের ইতিহাসে পাল-রাজাদের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি উপস্থিত করা হইয়াছে; এ-দাবি কিছু অস্বাভাবিক নয়, কারণ ভারতীয় আর্য-ব্রাহ্মণ্য স্মৃতিতে রাজা মাত্রেই ক্ষত্রিয়। ইহার ঐতিহাসিক বর্ণগত ভিত্তি কিছু না-ও থাকিতে পারে। মঞ্জুশ্রীমূলকল্প-গ্রন্থে পালবংশকে বলা হইয়াছে "দাসজীবিনঃ"। আবুল ফজল বলিয়াছেন "কায়স্থ"। যাহা হউক, উপরোক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ হইতে এ-তথ্য পরিষ্কার যে, ইঁহারা উচ্চতর বংশ বা বর্ণসম্ভূত নহেন, এমন কি আর্য-ব্রাহ্মণ্য স্মৃতি ও সংস্কারের উত্তরাধিকারের দাবি পরোক্ষেও কোথাও তাঁহারা করেন নাই। সমসাময়িক রাজবংশের ইতিহাসে এই ধরনের দৃষ্টান্ত বিরল।

সন্ধ্যাকরনন্দী সুস্পষ্ট বলিতেছেন, পালরাজাদের জনকভূমি বরেন্দ্রীদেশ। ভোজদেবের গোয়ালিয়র-লিপিতে পাল-রাজ (ধর্মপাল)-কে বলা হইয়াছে বঙ্গপতি। ইঁহারা যে বাঙালী ছিলেন এ-সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার এতটুকু কারণ নাই। মনে হয়, ইঁহাদের আদিভূমি বরেন্দ্রভূমি, এবং সেখানেই গোপাল কোনও সামন্ত-নায়ক ছিলেন; রাজা নির্বাচিত হইবার পর তিনি বঙ্গদেশেরও রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন, এবং বোধ হয়, গৌড়েরও। তারনাথ ঠিক এই কথাই বলিতেছেন: পুণ্ড্রবর্ধনের কোনও

ক্ষত্রিয়বংশে গোপালের জন্ম, কিন্তু পরে তিনি ভঙ্গলের (= বঙ্গাল বা বঙ্গালের) রাজা নির্বাচিত হন।

গোপালদেব বরেন্দ্রী ও বঙ্গে রাজা হইয়াই দেশে অন্য যত "কামকারী" বা যথেচ্ছপরায়ণশক্তি বা সামন্ত বা নায়কেরা ছিলেন তাঁহাদের দমন করেন, এবং বোধ হয়, সমগ্র বাঙলাদেশে আপন প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। এই প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছিল বহু সামন্ত-নায়কের সহায়তায় সন্দেহ নাই; এই সামন্ত-নায়কেরাই স্বেচ্ছায় তাঁহাকে তাঁহাদের অধিরাজ নির্বাচন করিয়াছেন।

ধর্মপাল ॥ আ. ৭৭০-৮১০ ॥ সাম্রাজ্য-বিস্তার

গোপালদেবের পুত্র ধর্মপাল সিংহাসন আরোহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর-ভারতের আধিপত্য লইয়া গুর্জরপ্রতীহার-রাষ্ট্রকূট-পালবংশে বংশপরম্পরাবিলম্বিত এক তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইয়া গেল। এই যুগে উত্তর-ভারতাধিপত্যের প্রতীক ছিল কনৌজ-রাজলক্ষ্মী বা মহোদয়শ্রীর অধিকার। গুর্জরপ্রতীহার-বংশের কেন্দ্রভূমি গুর্জরত্রা-ভূমি (রাজস্থান); রাষ্ট্রকূটেরা চালুক্য বংশের অধিকার লইয়া দাক্ষিণাত্যের অধিপতি; আর, গোপালদেবের উত্তরাধিকার লইয়া ধর্মপাল সমগ্র বাঙলাদেশের সর্বময় রাষ্ট্রনায়ক। ধর্মপালের সাম্রাজ্য-লিপ্সা পশ্চিমমুখী, বৎসরাজের পূর্বমুখী। এই সময় উত্তর-ভারতে আর কোনও পরাক্রান্ত রাষ্ট্র ও রাজবংশ না থাকাতে এই রাজচক্রবর্তীদের সংঘর্ষ প্রথম আরম্ভ হইল ধর্মপাল (আ ৭৭০—৮১০) ও প্রতীহাররাজ বৎসরাজের (আ ৭৮৩—৮৪) মধ্যে। ধর্মপাল পরাজিত হইলেন, এবং হয়তো আরও পর্যুদস্ত হইতেন, কিন্তু দক্ষিণ হইতে রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব (আ ৭৮০—৭৯৫) একেবারে গাঙ্গেয় উপত্যকায় ঝড়ের মতন আসিয়া পড়িয়া প্রথমে বৎসরাজ এবং পরে ধর্মপাল উভয়কেই পরাজিত করিলেন। বৎসরাজ রাজস্থানের পথহীন মরুভূমিতে পলাইয়া গেলেন; কিন্তু ধ্রুব দাক্ষিণাত্যে ফিরিয়া যাওয়াতে ধর্মপালের বিশেষ কিছু অসুবিধা আর হইল না। তিনি অবাধে এবং নির্বিবাদে তাঁহার রাজ্যবিস্তারে মনোনিবেশ করিলেন এবং স্বল্পকালের মধ্যেই ভোজ (বর্তমান বেরারের অংশ, প্রাচীন ভোজকটক), মৎস্য (আলওয়ার এবং জয়পুর-ভরতপুরের অংশ), মদ্র (মধ্য-পঞ্জাব), কুরু (পূর্ব-পঞ্জাব), যদু (বোধ হয় পঞ্জাবের সিংহপুর, যাদব-রাষ্ট্র), যবন (বোধ হয়, পঞ্জাব বা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কোনো আরব খণ্ডরাষ্ট্র), অবন্তী (বর্তমান মালব), গন্ধার (পশ্চিম-পঞ্জাব) এবং কীর (পঞ্জাবের কাংড়া জেলা) রাজ্য জয় করেন। এই সাম্রাজ্য-বিজয়চক্রেই তিনি কনৌজ বা মহোদয়শ্রীর অধিপতি ইন্দ্ররাজ (ইন্দ্রায়ুধ)-কে পরাজিত করেন, এবং সেই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন চক্রায়ুধকে। কনৌজের চক্রা-

মূখের অভিষেকের সময় উপরোক্ত বিজিত রাজ্যের রাজারা ধর্মপালের নিকট "প্রণতি পরিণত" হন। এই দিগ্বিজয়চক্র উপলক্ষেই তাঁহার সৈন্য-সামন্তরা কেদার, গোকর্ণ ও "গঙ্গাসমেতাম্বুধি"তে তীর্থপূজাক্রিয়া ইত্যাদি সমাপন করিয়াছিলেন। কেদার (হিমালয়-সানুতে গাড়োয়াল জেলায়) এবং গোকর্ণের (নেপাল-রাজ্যে বাগমতী নদীর তীরে) উল্লেখ দেখিয়া মনে হয় ধর্মপাল নেপালও জয় করিয়াছিলেন ; স্বয়ম্ভূপুরাণে তো স্পষ্টই বলা হইয়াছে, গৌড়রাজ ধর্মপাল নেপালেরও অধিপতি ছিলেন। ধর্মপালের মুঙ্গের-লিপির একটি শ্লোকে হিমালয়ের সানুদেশ ধরিয়া ধর্মপালের সমরাভিযানের একটু ইঙ্গিতও আছে। কেহ কেহ মনে করেন "গঙ্গাসমেতাম্বুধি" স্থানটিও নেপালেই। হয়তো এই নেপালের অধিকার লইয়াই তিব্বতরাজ মু-তিগ্-ব্ৎসন-পো'র সঙ্গে ধর্মপালের সংঘর্ষ হইয়া থাকিবে, কারণ নেপাল এই সময় তিব্বতের অধীন ছিল। পঞ্চগৌড়াধিপ ধর্মপাল যে উত্তর-ভারতের প্রায় সর্বাধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন তাহা গুর্জররাষ্ট্রবাসী সোঢ্ঢল কবির উদয়সুন্দরীকথাতেও (একাদশ শতক) স্বীকৃত হইয়াছে ; এই গ্রন্থে ধর্মপালকে বলা হইয়াছে "উত্তরাপথস্বামী"। যাহা হউক, এই সব বিজিত রাজ্য ধর্মপালের সর্বাধিপত্য স্বীকার করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই ; কিন্তু, ধর্মপাল ইঁহাদের তাঁহার গৌড়-বঙ্গ-মগধধৃত কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের অন্তর্গত করেন নাই ; স্ব স্ব রাজ্যে ইহাদের রাজারা স্বাধীন নরপতি রূপেই স্বীকৃত হইতেন, কিন্তু ধর্মপালের বশ্যতা ও আনুগত্য স্বীকার করিতে হইত। কিন্তু, ইতিমধ্যে বৎসরাজ পুত্র দ্বিতীয় নাগভট প্রতীহার-সিংহাসন আরোহণ করিয়াছেন, এবং সিন্ধু, অন্ধ্র, কলিঙ্গ ও বিদর্ভ রাজ্যের সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পূর্ব-পরাজয়ের প্রতিশোধ লইতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। প্রথমেই কনৌজ আক্রান্ত হইল এবং চক্রায়ুধ পরাজিত হইয়া ধর্মপালের নিকট পলাইয়া গেলেন। নাগভট পূর্বদিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, এমন সময় মুদ্গগিরি বা মুঙ্গেরের নিকট এক তুমুল সংগ্রাম হইল। ধর্মপাল পরাজিত হইলেন, কিন্তু এবারও রাষ্ট্রকূট-রাজ তৃতীয় গোবিন্দ আসিয়া নাগভটকে একেবারে পরাজিত ও পর্যুদস্ত করিয়া দিলেন এবং এই পরাক্রান্ততর নরপতির কাছে ধর্মপাল ও চক্রায়ুধ দুইজনেই স্বেচ্ছায় নতি স্বীকার করিলেন। কিন্তু গোবিন্দ আবার দাক্ষিণাত্যে স্বরাজ্যে ফিরিয়া গেলেন এবং ধর্মপাল আবার রাহুমুক্ত হইলেন। এই সাময়িক নতি স্বীকার সত্ত্বেও ধর্মপালের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত উত্তর-ভারতে তাঁহার সর্বময় আধিপত্য ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল, এমন কোনো সাক্ষ্য উপস্থিত নাই। তাঁহার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতীহার-রাষ্ট্র দুই দুইবার পর্যুদস্ত হইয়া শীর্ণ ও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল, আর রাষ্ট্রকূটেরা দুই দুইবার জয়ী হওয়া সত্ত্বেও উত্তর-ভারতে রাজ্যবিস্তারের সচেতন চেষ্টা বোধ হয় করেন নাই। যাহা হউক, ধর্মপাল-পুত্র দেবপালের সিংহাসন আরোহণের কালে রাজ্যে কোথাও কোনো যুদ্ধবিগ্রহ বা অশান্তি কিছু ছিল না বলিয়াই মনে হয়।

দেবপাল ॥ আ ৮১০—৮৫০ ॥

ধর্মপালের পুত্র দেবপাল (আ ৮১০-৮৫০) রাজা হইয়া পিতৃ-আদর্শানুযায়ী পাল-সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোযোগী হইলেন। তাহা ছাড়া উপায়ও ছিল না ; প্রতীহার ও রাষ্ট্রকূটেরা তখনও প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ; আরও নিকটে উৎকল ও প্রাগ্‌জ্যোতিষ (কামরূপ) তখন নিজ নিজ রাজবংশের অধীনে পরাক্রান্ত রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিয়াছে ; দূরে দক্ষিণে পাণ্ড্যরাও প্রবল হইয়া উঠিতেছে। এমন সময়ে স্বীয় রাজ্য ও রাষ্ট্র বজায় রাখিতে হইলেও বাধ্য হইয়া আক্রমণমুখী হওয়া ছাড়া অন্য উপায়ই বা কি ? তাহা ছাড়া, উত্তর-ভারতাধিপত্যের আদর্শ তখনও উত্তর-ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে সক্রিয়। মৌর্য ও গুপ্ত-যুগের আদর্শ ছিল সর্বভারতের একরাট্ হওয়া ; হর্ষবর্ধন-পরবর্তী রাষ্ট্রীয় আদর্শ "সকলোত্তরপথ-নাথ" বা "সকলোত্তর পথস্বামী" হওয়া। নবম শতক পর্যন্তও এই আদর্শ উত্তর ভারতে সক্রিয় ও প্রায় সর্বব্যাপী। এই আদর্শ অনুসরণে দেবপালের সহায়ক হইলেন পর পর তাঁহার দুই প্রধান মন্ত্রী : ব্রাহ্মণ দর্ভপাণি ও তাঁহার পৌত্র কেদারমিশ্র। লিপিমালার সাক্ষ্য এই যে, এই দুই মন্ত্রীর সহায়তায় দেবপাল হিমালয় হইতে বিন্ধ্য পর্বত এবং পূর্ব হইতে পশ্চিম সমুদ্রতীর পর্যন্ত সমস্ত উত্তর-ভারত হইতে কর ও প্রণতি আদায় করিয়াছিলেন ; হূণ-উৎকল-দ্রবিড়-গুর্জরনাথদের দর্প খর্ব করিয়া তিনি সমুদ্রমেখলা রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন ; তাঁহার এক সমরনায়কের (খুল্লতাত ভ্রাতা জয়পাল) সহায়তায় তিনি উৎকল-রাজকে রাজ্য ছাড়িয়া পলাইতে এবং প্রাগ্‌জ্যোতিষ-রাজকে বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করাইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার বিজয়ী সমরাভিযান তাঁহাকে উত্তর পশ্চিমে কম্বোজ এবং দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্যন্ত লইয়া গিয়াছিল। দেবপাল, দেবপালের মন্ত্রী ও সমরনায়কদের এই দাবি খুব মিথ্যা বলিয়া মনে হয় না। হূণরাষ্ট্র (উত্তরাপথে হিমালয়ের সানুদেশে), কম্বোজ, উৎকল ও প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্য ধর্মপালবিজিত সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত সীমায় অবস্থিত ; কাজেই দেবপাল কর্তৃক এই সব রাজ্য নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করিবার চেষ্টা স্বাভাবিক। গুর্জর-রাষ্ট্র ও প্রতীহারদের, এবং প্রতীহারদের সঙ্গে পালদের সংগ্রামের সূচনা ও পরিণতি কতকটা ধর্মপালের সাম্রাজ্যবিস্তার উপলক্ষেই আমরা দেখিয়াছি। নাগভট্টের সঙ্গে দেবপালের কোনো সংগ্রাম হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না ; তাঁহার পুত্র রামভদ্রও উল্লেখ-যোগ্য নরপতি ছিলেন না। কিন্তু রামভদ্রপুত্র ভোজ প্রতীহারদের হৃতগৌরব অনেকটা উদ্ধার করিয়াছিলেন ; এবং বোধ হয় ভোজদেবের সঙ্গেই দেবপালের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। এই সংঘর্ষে ভোজদেব জয়ী হইতে পারেন নাই ; কিছুদিন পর রাষ্ট্রকূট-রাজের কাছেও তিনি পরাজিত ও পর্যুদস্ত হন। যে-দ্রবিড়নাথকে দেবপাল পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়া দাবি করিয়াছেন, তিনি বোধ হয় রাষ্ট্রকূট-রাজ অমোঘবর্ষ। কেহ কেহ মনে করেন, এই দ্রবিড়নাথ হইতেছেন পাণ্ড্যরাজ শ্রীমার শ্রীবল্লভ, কিন্তু তাহার স্বপক্ষে যুক্তি দুর্বল। যাহা হউক, এই তথ্য সুস্পষ্ট যে, দেবপাল ধর্মপালের সাম্রাজ্য আরও

বিস্তৃত করিয়াছিলেন, এবং হিমালয়ের সানুদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া অন্তত বিন্ধ্য পর্যন্ত এবং উত্তর-পশ্চিমে কম্বোজদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষ পর্যন্ত তাঁহার আধিপত্য স্বীকৃত হইত। সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্যন্ত এক সমরাভিযানের ইঙ্গিত মুঙ্গের-লিপিতেও আছে ; ইহার সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা কঠিন, কারণ, রাজসভাকবির অত্যুক্তি বলিয়াই মনে হয়। দেবপালের সময়েই পালসাম্রাজ্য সর্বাপেক্ষা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। আরব-দেশি বণিক ও পর্যটক সুলেমান্ এই সময় (৮৫১) কয়েকবারই ভারতবর্ষে আসা-যাওয়া করিয়াছিলেন। তাঁহার বিবরণীতে দেখা যাইতেছে, পালরাজ গুর্জর-প্রতীহারও রাষ্ট্রকূটদের সঙ্গে সংগ্রামরত ছিলেন। তাঁহার সৈন্যদলে ৫০,০০০ হাজার হাতী ছিল, এবং সৈন্যদলের সাজসজ্জা ও পোষাক পরিচ্ছদ ধোওয়া, গুছানো ইত্যাদি কাজের জন্যই ১০ হইতে ১৫ হাজার লোক নিযুক্ত ছিল। ধর্মপালের সাম্রাজ্যে যেমন, দেবপালের সময়ও তেমনই বিজিত রাজ্যের রাজারা স্ব স্ব রাষ্ট্রে স্বাধীন বলিয়া গণ্য হইতেন ; কেন্দ্রীয় রাজ্য ও রাষ্ট্রের অন্তর্গত তাঁহারা ছিলেন না, যদিও দেবপালের সর্বময় আধিপত্য তাঁহাদের স্বীকার করিতে হইত।

সাম্রাজ্যের বিলয় ।। আ ৮০০—৯৮৮ ।। নারায়ণ পাল । আ (৮৫৪—৯০৮)

দেবপালের মৃত্যুর (আ ৮৫০) কিছুদিন পর হইতেই পালবংশের সাম্রাজ্য-গৌরব-সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলিয়া পড়িতে আরম্ভ করে। যে-সাম্রাজ্য প্রায় শতাব্দীর তিনপাদ ধরিয়া প্রধানত ধর্মপাল ও দেবপালের চেষ্টা ও উদ্যমে গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা প্রথম বিগ্রহপাল (আ ৮৫০—৮৫৪) হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বের মধ্যে (আ ৯৬০—৯৮৮) ধীরে ধীরে ভাঙ্গিয়া পড়িল। প্রথম বিগ্রহপাল দেবপালের পুত্র ছিলেন না ; দেবপালের সমরনায়ক বাক্‌পাল বোধ হয় ছিলেন তাঁহার পিতা। দেবপালের পুত্র থাকা সত্ত্বেও এই উত্তরাধিকার পরিবর্তন কেন হইয়াছিল বলা কঠিন ; তবে, ইহার মধ্যে কেহ কেহ পারিবারিক অনৈক্যের হেতু বিদ্যমান বলিয়া মনে করেন। হয়তো পাল-সাম্রাজ্যের শক্তিহীনতা এবং অন্তর্বিরোধও অন্যতম কারণ হইতে পারে। এই অনুমান কতটা ঐতিহাসিক বলা কঠিন, তবে মোটামুটি ইহা যুক্তিসিদ্ধ। বিগ্রহপালের অন্য নাম শূরপাল ; তিনি ধর্মনিষ্ঠ ধর্মাচরণরত নৃপতি ছিলেন বলিয়া মনে হয় ; পুত্র নারায়ণপালকে সিংহাসন অর্পণ করিয়া তিনি ধর্মাচরণোদ্দেশে বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। নারায়ণপাল (আ ৮৫৪—৯০৮) অন্যূন ৫৪ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন ; কিন্তু এই সুদীর্ঘ রাজত্বকাল বাঙলার গৌরবের হেতু হইতে পারে নাই। সম্ভবত, এই সময়েই রাষ্ট্রকূটরাজ অমোঘবর্ষ একবার অঙ্গ-বঙ্গ-মগধে বিজয়ী সমরাভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন ; উড়িষ্যার শুল্কিরাজ মহারাজাধিরাজ রণস্তম্ভও বোধ হয় এই সময়েই রাঢ়ের কিয়দংশ জয়

করেন। প্রতীহাররাজ ভোজদেবও নারায়ণপালের রাজত্বকালেই প্রায় মগধ পর্যন্ত সমস্ত পালসাম্রাজ্য অধিকার করেন, এবং কলচুরীরাজ গুণাম্বোধিদেব এবং গুহিলোট্‌-রাজ দ্বিতীয় গুহিল ভোজদেবের এই বিজয়ের অংশীদার হন। এই সময়ই বোধ হয় ডাহলরাজ প্রথম কোকল্লদেব (৮২০-৮৯০) বঙ্গরাজভাণ্ডার লুন্ঠন করেন। ভোজদেবের পুত্র প্রতীহার মহেন্দ্রপাল পাটনা এবং গয়া পার হইয়া একেবারে পুণ্ড্রবর্ধনের পাহাড়পুর অঞ্চল-পর্যন্ত প্রতীহার-সাম্রাজ্য বিস্তৃত করেন। মহেন্দ্রপালের পঞ্চম রাজ্যাঙ্কের একটি লিপি পাহাড়-পুরের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। মহেন্দ্রপাল বেশি দিন উত্তরবঙ্গ ও বিহার ভোগ করিতে পারেন নাই বলিয়া মনে হয়; নারায়ণপাল তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে বঙ্গ-বিহার পুনরাধিকার করিয়াছিলেন, এ-সম্বন্ধে লিপি-প্রমাণ বিদ্যমান। প্রতীহারদের কতকটা খর্ব করা সম্ভব হইলেও রাষ্ট্রকূটরাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণের নিকট নারায়ণপালকে বোধ হয় কিছুটা আনুগত্য স্বীকার করিতে হইয়াছিল। দেওলিতে প্রাপ্ত এক শাসনে কৃষ্ণ গৌড়বাসিদের বিনয় শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ-মগধে তাঁহার আদেশ মান্য ও স্বীকৃত হইত, এই বলিয়া দাবি করা হইয়াছে। পিঠাপুরমের এক লিপিতে কৃষ্ণা জেলার বেলনাণ্ডুর এক রাজা বঙ্গ, মগধ এবং গৌড়দের পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়া দাবি করিতেছেন; এই রাজা হয়তো দ্বিতীয় কৃষ্ণের সমরা-ভিযানের সঙ্গে আসিয়া এই সব দেশজয়ে কিছু অংশ গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। দেব-পালের সময়ে উৎকল ও কামরূপ দেবপালের আধিপত্য স্বীকার করিয়াছিল, কিন্তু নারায়ণপালের কালে রাজা মাধববর্মা শ্রীনিবাসের নেতৃত্বে (আ ৮৫০) শৈলোদ্ভব বংশ উড়িষ্যায় এবং রাজা হর্জর ও পুত্র বনমালের নেতৃত্বে কামরূপ প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠে।

নারায়ণপালের পুত্র রাজ্যপাল (আ ৯০৮—৯৪০) এবং পৌত্র দ্বিতীয় গোপালের (আ ৯৪০—৯৬০) রাজত্বকালে পাল-সাম্রাজ্য অন্তত মগধ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় গোপালের পুত্র দ্বিতীয় বিগ্রহপালের আমলে মগধের অধিকার বোধ হয় পাল-বংশের করচ্যুত হইয়া থাকিবে। প্রতীহার ও রাষ্ট্রকূটভয় এই সময় আর ছিল না বটে, কিন্তু উত্তর-ভারতে চন্দেল্ল ও কলচুরী এই দুই রাজবংশ এই সময় প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠে। চন্দেল্লরাজ যশোবর্মা "লতারূপ গৌড়দের তরবারী স্বরূপ" ছিলেন, এবং তাঁহার পুত্র ধঙ্গ (আ ৯৫৪—১০০০) রাঢ়া এবং অঙ্গের রাজমহিষীদের কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। কাব্যিক ভাষার আশ্রয় ছাড়িয়া দিলে স্পষ্টই বুঝা যায় এই দুই চন্দেল্ল নরপতি গৌড়, অঙ্গ এবং রাঢ়দেশকে সমরে পর্যুদস্ত করিয়াছিলেন। কলচুরীরাজ প্রথম যুবরাজ (আ দশম শতকের প্রথম পাদ) গৌড়-কর্ণাট-লাট কাশ্মীর-কলিঙ্গকামিনীদের লইয়া নাকি কেলি করিয়াছিলেন, অর্থাৎ এই সব দেশে সমরাভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণরাজ (আ দশম শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদ) বঙ্গালদেশ জয়

করিয়াছিলেন। এই সব ক্রমান্বয় পরাজয় ও সামরিক বিপর্যয় পাল-সাম্রাজ্যের এবং রাষ্ট্রের সামরিক ও রাষ্ট্রীয় দৈন্য সূচিত করে, সন্দেহ নাই। চন্দেল্ল ও কলচুরী লিপি-মালায় গৌড়-অঙ্গ-রাঢ়া-বঙ্গালের পৃথক পৃথক উল্লেখ হইতেও মনে হয় বাঙলাদেশেও পালরাজ্য বিভিন্ন জনপদ রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়া পড়িবার দিকে ঝোঁক স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। অন্তত রাঢ়া অঞ্চল ও বঙ্গালদেশে যে স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছে এ-সম্বন্ধে সুস্পষ্ট লিপি-প্রমাণ বিদ্যমান। বস্তুত, বাণগড়-লিপিতে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে পাল-রাজ্য "অনধিকৃতবিলুপ্ত" হইয়া গিয়াছিল।

রাঢ়া-গৌড়ে কম্বোজাধিপত্য

বাণগড়-লিপির এই উক্তি মিথ্যা নয়। এই সময় উত্তর ও পূর্ব-বঙ্গে কম্বোজ নামক এক রাজবংশ প্রবল হইয়া উঠে। দিনাজপুর-স্তম্ভলিপিতে এক কম্বোজান্বয় গৌড়পতির উল্লেখ আছে। ইর্দা-তাম্রপট্টে এই "কম্বোজান্বয় গৌড়পতি"দের, তথা "কম্বোজকুলতিলক"-দের কয়েকজন রাজার খবর পাওয়া যায়। লিপিটি কম্বোজবংশীয় রাজ্যপাল-ভাগ্যদেবীর পুত্র এবং নারায়ণপালদেবের কনিষ্ঠভ্রাতা পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীজয়-পালের ত্রয়োদশ রাজ্যাঙ্কের, এবং এই লিপি দ্বারা জয়পাল বর্ধমানভুক্তিতে কিছু ভূমিদান করিয়াছিলেন। স্পষ্টতই বুঝা যায়, পশ্চিম-বঙ্গের অন্তত কিয়দংশ, এবং বোধ হয় উত্তর-বঙ্গেরও কিয়দংশ কম্বোজকুলতিলকদের করায়ত্ত হইয়াছিল। ইঁহাদের রাষ্ট্রকেন্দ্র ছিল প্রিয়ঙ্গু নামক স্থানে; স্থানটি কোথায় এখনও জানা যায় নাই। ইর্দাপট্টকথিত রাজ্যপাল ও পালরাজ রাজ্যপাল এক এবং অভিন্ন কিনা ইহা লইয়া পণ্ডিত মহলে প্রচুর তর্কবিতর্ক আছে। এক হইলে স্বীকার করিতে হয়, রাজ্যপালের পর বাঙলায় পালরাজ্য দ্বিধা বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল; এক এবং অভিন্ন না হইলে স্বীকার করিতে হয়, কম্বোজ-বংশীয় রাজ্যপাল পালরাষ্ট্রের দৈন্য এবং দৌর্বল্যের সুযোগ লইয়া রাঢ়া-গৌড়ে নিজ বংশের প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। এই কম্বোজদের আদিভূমি কোথায় তাহা লইয়াও বিতর্কের অন্ত নাই। কেহ কেহ বলেন, ইঁহারা উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তের কম্বোজদেশাগত; কেহ কেহ বলেন, কম্বোজ দেশ তিব্বতে; আবার কাহারো মতে পূর্ব-দক্ষিণ ভারতের কম্বুজ (Cambodia) এই কম্বোজদেশ। পাগ্-সাম্-জোন্-জাং নামক তিব্বতী গ্রন্থে লুসাই পর্বতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এক কম্-পো-ৎস বা কম্বোজ দেশের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই কম্-পো-ৎস এবং বাণগড় ও ইর্দালিপির কম্বোজ এক এবং অভিন্ন হওয়া কিছু বিচিত্র নয়।

পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গও এই সময় পাল-বংশের করচ্যুত হইয়া গিয়াছিল। হরিকেল অঞ্চলে মহারাজাধিরাজ কান্তিদেব (৯ম দশম শতকের প্রথমার্ধ) নামে এক বৌদ্ধ রাজার

খবর পাওয়া যায় চট্টগ্রামের একটি তাম্র পট্টোলীতে। ইঁহার রাষ্ট্রকেন্দ্র ছিল বর্ধমানপুর। এই বর্ধমানপুরের সঙ্গে পশ্চিম-বঙ্গের বর্ধমানের কোনো সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে হয় না। বর্ধমানপুর শ্রীহট্ট-ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম অঞ্চলে বোধ হয় কোন স্থান হইবে।

ত্রিপুরা জেলার ভারেল্লা গ্রামে প্রাপ্ত নটেশ শিবের এক প্রস্তর মূর্তির পাদপীঠে লড়হচন্দ্র (আ দশম শতকের শেষার্ধ) নামে এক রাজার নাম পাওয়া যায়। বোধ হয় ত্রিপুরা অঞ্চলেই তাঁহার আধিপত্য বিস্তৃত ছিল। লড়হচন্দ্র অন্ততঃ ১৮ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন (আ দশম শতকের তৃতীয় পাদ)।

ঢাকা জেলার রামপাল ও ধুল্লা, ফরিদপুর জেলার ইদিলপুর এবং কেদারপুর অঞ্চলে প্রাপ্ত চারিটি লিপি হইতে এক চন্দ্র রাজবংশের চারিজন রাজার খবর পাওয়া যাইতেছে : পূর্ণচন্দ্র, পুত্র সুবর্ণচন্দ্র, মহারাজাধিরাজ ত্রৈলোক্যচন্দ্র (পত্নী শ্রীকাঞ্চনা) এবং পুত্র মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্র। সুবর্ণচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেই বৌদ্ধধর্মাশ্রয়ী। ত্রৈলোক্যচন্দ্র ও শ্রীচন্দ্র হরিকেলে অধিপতি ছিলেন, এবং চন্দ্রদ্বীপ (বাখরগঞ্জ জেলা) ছিল তাঁহাদের রাষ্ট্রকেন্দ্র। লিপি-প্রমাণ হইতে মনে হয়, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, ঢাকা ও ফরিদপুর অঞ্চল ইঁহাদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বঙ্গে-বঙ্গালে চন্দ্রাধিপত্য

গোবিন্দচন্দ্র নামে আর একজন চন্দ্রান্ত্যনামা রাজার নাম জানা যায় চোলরাজ রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলয় লিপি হইতে (১০২১)। ইনি বঙ্গালদেশের অধিপতি ছিলেন। লড়হচন্দ্র এবং গোবিন্দচন্দ্রের সঙ্গে পূর্ণচন্দ্রের বংশের কোনো সম্বন্ধ ছিল, কিনা বলা যায় না ; তবে, দশম শতকের প্রথমার্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া একাদশ শতকের দ্বিতীয় পাদ পর্যন্ত পূর্ব ও দক্ষিণ-বঙ্গের অন্ততঃ কিয়দংশে পালবংশের রাজসীমার বাহিরে ছিল, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোনো কারণ নাই। বোধ হয়, চন্দ্রবংশীয় রাজাদের এবং গোবিন্দচন্দ্রকে যথাক্রমে কলচুরীরাজ এবং অন্তত একজন চোলরাজের পরাক্রান্ত সৈন্য-বাহিনীর সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। কলচুরীরাজ কোক্কল্ল একবার বঙ্গরাজের রাজকোষ লুণ্ঠন করিয়াছিলেন ; লক্ষ্মণরাজ একবার বঙ্গালরাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন ; কর্ণদেব একবার বঙ্গরাজ্য আক্রমণ করিয়া প্রাচ্যদেশের রাজাকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছিলেন বলিয়া দাবি করিয়াছেন। চোলরাজ রাজেন্দ্রচোল কর্তৃক রাজা গোবিন্দচন্দ্রের বঙ্গাল দেশ জয় সুবিদিত।

সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা

দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পুত্র প্রথম মহীপালের (আ ৯৮৮—১০৩৮) প্রথম ও প্রধান কীর্তি "অনধিকৃতবিলুপ্ত পিতৃরাজ্য" পুনরুদ্ধার। সমস্ত বঙ্গদেশই তো পালরাষ্ট্রের করচ্যুত

হইয়া গিয়াছিল, এবং পাল-রাজ্য মগধাঞ্চলেই কেন্দ্রীভূত হইয়া গিয়াছিল। মহীপাল হৃত উত্তর ও পূর্ব-বঙ্গ পুনরুদ্ধার করিলেন। ত্রিপুরা জেলায় তাঁহার তৃতীয় ও চতুর্থ রাজ্যাঙ্কের লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে; লিপি দু'টি বীলকীন্দক গ্রামবাসি (দেবিদ্দা থানার বাইলকান্দি গ্রাম?) দুই বণিক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি বিষ্ণু ও একটি গণেশমূর্তির পাদপীঠে উৎকীর্ণ। দিনাজপুর জেলায় বাণগড়ে প্রাপ্ত নবম রাজ্যাঙ্কের আর একটি লিপি তাঁহার উত্তর-বঙ্গাধিকারের প্রমাণ। উত্তর-বিহার বা অঙ্গদেশে মহীপালের লিপি পাওয়া গিয়াছে; মনে হয় মহীপাল এই দেশও পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। মগধ তো পিতৃ-অধিকারে ছিলই; সারনাথে একটি এবং নালন্দায় দুইটি মহীপালের রাজ্যাঙ্কের লিপিও পাওয়া গিয়াছে। পশ্চিম ও দক্ষিণ-বঙ্গ তিনি পুনরাধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছু নাই, তবে, রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলয় লিপির সাক্ষ্যে মনে হয়, পশ্চিম-বঙ্গের অন্তত কিয়দংশে তাঁহার আধিপত্য স্বীকৃত হইত। রাজেন্দ্রচোল গঙ্গা হইতে পুণ্য তীর্থবারি আনিয়া নিজের রাজ্যভূমি পবিত্রকরণোদ্দেশে উত্তর-পূর্বভারতে সেনাবাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলেন (১০২১—১০২৩)। ওড্ডবিষয় (উড়িষ্যা) এবং কোসলৈ-নাড়ু (দক্ষিণ-কোশল) জয়ের পর তাঁহার সেনাবাহিনী ধর্মপালকে পরাজিত করিয়া তণ্ডবুত্তি (দণ্ডভুক্তি) অধিকার করেন; রণশূরকে পরাজিত করিয়া তক্কণলাড়ম (দক্ষিণ-রাঢ়) অধিকার করেন; রাজা গোবিন্দচন্দ্রকে পলায়মান করিয়া বিরামহীন বৃষ্টিস্নাত বঙ্গালদেশ অধিকার করেন; তুমুল যুদ্ধে মহীপালকে ভীতসন্ত্রস্ত করিয়া নারী, ধনরত্ন এবং পরাক্রান্ত হস্তী অধিকার করেন এবং মুক্তাপ্রসূ বিস্তৃত সমুদ্রতীরশায়ী উত্তিরলাড়ম্ (উত্তর-রাঢ়) অধিকার করেন। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে এই সময় দণ্ডভুক্তি, দক্ষিণ-রাঢ় এবং বঙ্গালদেশ স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন নরপতির অধীন। কেবল উত্তর-রাঢ় মহীপালের অধীন বলিয়া মনে হইতেছে, তাহা না হইলে মহীপাল এবং উত্তর-রাঢ় বিজয় লিপিটিতে এইভাবে উল্লিখিত হইত না। যাহাই হউক, রাজেন্দ্রচোলের দিগ্বিজয় সাম্রাজ্যবিস্তার বলিয়া মনে হয় না, উদ্দেশ্য তাহা ছিল না; যে-ভাবেই হউক তাঁহার এই দিগ্বিজয় স্থায়ী হয় নাই বলিয়াই মনে হয়। রাজত্বের শেষদিকে পুনর্বিজিত সাম্রাজ্যের কিয়দংশ আবার বোধ হয় মহীপালের করচ্যুত হইয়াছিল। ১০২৬ খ্রীষ্টাব্দের পরে কোন সময়ে কলচুরীরাজ গাঙ্গেয়দেব অঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন বলিয়া গোহ্‌রবা লিপিতে দাবি করা হইয়াছে। ১০৩৪ খ্রীষ্টাব্দে আহমদ্ নিয়ল্‌তিগিন যখন বারাণসী আক্রমণ করেন, তখন বারাণসী কলচুরীরাজ গাঙ্গেয়দেবের অধীন ছিল।

মহীপাল ও সমসাময়িক ভারতবর্ষ ॥ মহীপাল আ। ৯৮৮-১০২৭ ॥

বহু আয়াসে অনেক বৎসরের অবিরত সংগ্রামের পর মহীপাল শুধু যে পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন তাহাই নয়, বিলুপ্ত সাম্রাজ্যেরও অন্তত বৃহদংশের উদ্ধার সাধন

করিয়া পাল-বংশের লুপ্ত গৌরবও খানিকটা ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। নালন্দার অনেক জীর্ণ বিহার ও মন্দিরের সংস্কার, নূতন বিহার-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা, বুদ্ধগয়াবিহারের সংস্কার ইত্যাদি সাধনের ফলে আন্তর্জাতিক বৌদ্ধজগতেও বাঙলা দেশ কতকটা তাহার স্থান ফিরিয়া পাইয়াছিল। পুনরুত্থানের চেষ্টা ও আয়াসে বাঙালীর দেশ ও রাষ্ট্র আত্মগৌরব এবং প্রতিষ্ঠা খুঁজিয়া পাইয়াছিল; সেই জন্যই বাঙালীর লোকস্মৃতি মহীপালের গানে মহীপালকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে; লোকে আজও 'ধান ভানুতে মহীপালের গীত' ভুলে নাই; মহীপাল-যোগীপাল-ভোগীপালের গান তাঁহাদের কণ্ঠে। রংপুর জেলার মাহীগঞ্জ (মহীগঞ্জ), বগুড়া জেলার মহীপুর, দিনাজপুর জেলার মহীসন্তোষ, মুর্শিদাবাদ জেলার মহীপাল, দিনাজপুর জেলার মহীপালদীঘি, মুর্শিদাবাদ জেলার (মহীপালের) সাগরদীঘি প্রভৃতি নগর ও দীঘিকা এখনও এই নৃপতির স্মৃতি বহন করিতেছে। মহীপালের সমগ্র রাজ্যকাল কাটিয়াছিল পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধারে, সাম্রাজ্যের হৃত অংশ ও গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টায় এবং রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনঃস্থাপনে। বোধ হয়, এই জন্যই তিনি এই সময়ে পঞ্জাবের শাহী রাজারা গজনীর সুলতান মামুদের বিরুদ্ধে যে সমবেত হিন্দুশক্তিসংঘ গড়িয়া তুলিতেছিলেন, মহীপাল তাহাতে যোগদান করিতে পারেন নাই। সমসাময়িক হিন্দু-শক্তিপুঞ্জ পশ্চিমদিকে সুলতান মামুদের পৌনঃপুনিক আক্রমণে বিব্রত ও বিপর্যস্ত ছিলেন বলিয়াই বোধ হয় মহীপালের পক্ষে হৃত সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার অন্তত আংশিকত সম্ভব হইয়াছিল। মহীপালের স্বপক্ষে যুক্তি আরও দেওয়া যাইতে পারে; তিনি হয়তো ভাবিয়াছিলেন, স্বাধীন পরাক্রান্ত এবং সুশৃঙ্খল একটি রাষ্ট্রের পক্ষেই দুর্ধর্ষ নূতন বৈদেশিক অভিযাত্রীদের বাধা দেওয়া সম্ভব, বিচিত্র ও দুর্বল খণ্ড খণ্ড রাষ্ট্রের সম্মিলিত শক্তিপুঞ্জের পক্ষে নয়। হয়তো এই ভাবিয়াই তিনি তাঁহার রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্য পুনর্গঠনের দিকে, এক কথায় বৈদেশিক অভিযাত্রীদের বিরুদ্ধে কঠিনতর প্রতিরোধ-প্রাচীর গড়িয়া তুলিবার দিকে মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে অযৌক্তিক কিছু বলিতেছি না, কিন্তু ইহা যথার্থ বস্তুনিষ্ঠ ঐতিহাসিক দৃষ্টি কিনা, এ-সম্বন্ধে বোধ হয় সন্দেহ করা চলে। মহীপাল বোধ হয় বুঝিতে পারেন নাই যে, একাধিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণেই উত্তর-ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রপুঞ্জ একে একে পশ্চিমাগত মুসলিম অভিযাত্রী কর্তৃক পরাজিত ও পর্যুদস্ত হইতেছিল। ভারতের সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় ঐক্যের আদর্শের স্থলে স্থানীয় প্রাদেশিক সচেতনতার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি দেখা দিতেছিল; অষ্টম শতকের সূচনা হইতেই ভারতের সমৃদ্ধ বৈদেশিক বাণিজ্যে আরব ও পারসিক বণিকেরা বৃহৎ অংশীদার হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; ভারতের রাষ্ট্রীয় ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র ক্রমশ উত্তর-ভারত হইতে দক্ষিণ-ভারতে হস্তান্তরিত হইতেছিল; আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির আদর্শবাদ ক্রমশ রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের প্রধান সহায়ক উচ্চতর বর্ণ ও শ্রেণীগুলির স্বচ্ছ বাস্তব সামাজিক দৃষ্টিকে

আবদ্ধ করিয়া দিতেছিল। এই সব কারণ বিস্তৃত তথ্যগত বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবার স্থান এখানে নয়, তবে মোটামুটি বলা যায়, অষ্টম শতকের সূচনা হইতেই এই সব সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ সক্রিয় হইতে আরম্ভ করে, এবং ভারতের সমাজে ও রাষ্ট্রে ইহাদের অনিবার্য ফলের সূচনা দেখা দেয়। মহীপাল কিংবা উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতের কোনও রাষ্ট্রই এ-সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। রাষ্ট্রক্ষেত্রে যে রাষ্ট্রীয় আদর্শের প্রেরণা মৌর্য বা গুপ্তসাম্রাজ্য গড়িয়াছিল, সেই আদর্শ সক্রিয় থাকিলে বৈদেশিক অভিযাত্রী প্রতিরোধ অনেকটা সহজ হইত, কিন্তু এই যুগে আর তাহা ছিল না। তবু, পঞ্জাবের শাহী রাজারা সেই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া দেশের সমগ্র রাষ্ট্রশক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া একটা প্রতিরোধ রচনার চেষ্টা করিয়াছিলেন: ভারতবর্ষের সমসাময়িক ইতিহাসে ভারতীয় রাষ্ট্রপুঞ্জের ইহাই ছিল ঐতিহাসিক কর্তব্য। মহীপাল এই সামগ্রিক ঐক্যাদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'ন নাই এবং সমসাময়িক ঐতিহাসিক কর্তব্য পালন করেন নাই। স্থানীয় প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্বের আদর্শই তাঁহার কাছে বড় হইয়া দেখা দিয়াছিল, এই ঐতিহাসিক সত্য অস্বীকার করা যায় না। সেই ক্রমবর্ধমান আপদের সম্মুখে ভারতীয় ইতিহাসের সামগ্রিক আদর্শই স্মর্তব্য, স্থানীয় আত্মকর্তৃত্বের বা পাল-সাম্রাজ্যের আদর্শ নয়। সেই সুবৃহৎ বিপদের সম্মুখে পাল-সাম্রাজ্যের আদর্শ সমগ্র ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক কর্তব্যের কাছে ক্ষুদ্র। তবে, এ-সম্বন্ধে শুধু মহীপালকেই দায়ি করা চলে না, দক্ষিণ-ভারতের রাষ্ট্রকূট ও চোলেরা এবং উত্তর-ভারতেরও দু'একটি রাষ্ট্র সমান দায়ি। রাষ্ট্রকূটেরা তো এই সব বৈদেশিক অভিযাত্রীদের সহায়তাই করিয়াছিলেন। বস্তুত, অষ্টম শতক হইতেই রাষ্ট্রক্ষেত্রে স্থানীয় প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্বের যে আদর্শ বলবত্তর হইতেছিল সেই আদর্শই ইহার জন্য দায়ি। অন্যান্য সামাজিক ও আর্থনৈতিক কারণ তো ছিলই। মহীপাল যোগদান করিলেই যে হিন্দু শক্তিপুঞ্জের চেষ্টা সার্থক হইত, তাহা বলা যায় না; সে-সম্ভাবনা বরং কমই ছিল। কি হইলে কি হইত, এই আলোচনা করিয়া ইতিহাসে লাভ কিছু নাই; কি কারণে কি হইয়াছে এবং কি হয় নাই, তাহাই ইতিহাসে আলোচ্য। তথ্য এই যে, মহীপাল সমবেত শক্তিসংঘে যোগ দেন নাই।

মহীপাল গৌড়তন্ত্রের, তথা পাল-সাম্রাজ্যের, পুনরুদ্ধারে অনেকটা সার্থকতা লাভ করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু এই পুনরুদ্ধার স্থায়ী হওয়া সম্ভব ছিল না। নারায়ণপালের সময় হইতেই পাল-সাম্রাজ্যের যে ভগ্নদশা আরম্ভ হইয়াছিল এবং দ্বিতীয় বিগ্রহপালের সময় যে চরম অবনতি দেখা দিয়াছিল, মহীপাল তাহা রোধ করিয়া পূর্ব গৌরব অনেকটা ফিরাইয়া আনিলেন সত্য, কিন্তু মহীপালের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আবার সেই রাজ্য ও রাষ্ট্র ধীরে ধীরে ভাঙ্গিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। ভাঙ্গন-রোধের চেষ্টা যে কিছু হয় নাই তাহা নয়, কিন্তু কোনো চেষ্টাই সফল হয় নাই। হওয়া সম্ভব ছিল না। যে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কারণের ইঙ্গিত আগে করিয়াছি তাহা বঙ্গ-বিহারের

পক্ষেও সত্য ছিল; স্থানীয় আত্মকর্তৃত্বের রাষ্ট্রীয় আদর্শ বাহির ও ভিতর হইতে ক্রমাগতই পালরাজ্য ও রাষ্ট্রকে আঘাত করিতে আরম্ভ করিল, এবং সেই আঘাতে রাজ্য ও রাষ্ট্র ক্রমশ দুর্বল হইয়া পড়িল। তাহা ছাড়া আভ্যন্তরীণ অন্যান্য সামাজিক কারণও ছিল; যথাস্থানে তাহা বলিতে চেষ্টা করিব। এই সব কারণ সম্বন্ধে রাষ্ট্রের সচেতনতা যে খুব বেশি ছিল, মনে হয় না। সেই জন্য রাজ্য ও রাষ্ট্র গঠন এবং রক্ষার চেষ্টার ত্রুটি না হইলেও সমাজ-ইতিহাসের অমোঘ নিয়মের ব্যতিক্রম হইল না; ভাঙ্গনের গতি মন্থর হইল বটে, কিন্তু তাহা রোধ করা সম্ভব হইল না।

ভগ্নদশা

মহীপালের পুত্র জয়পালের (আ ১০৩৮—১০৫৫) রাজত্বকালে বঙ্গ ও গৌড় কলচুরীরাজ কর্ণ বা লক্ষ্মীকর্ণের হস্তে পরাজয়ের অপমান স্বীকার করে, কিন্তু তিব্বতী সাক্ষ্য হইতে মনে হয়, এই যুদ্ধ জয়-পরাজয়ে মীমাংসিত হয় নাই। দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞানের (অতীশ) মধ্যস্থতায় দুই রাষ্ট্রের মধ্যে একটা সন্ধি-শান্তির প্রতিষ্ঠায় এই যুদ্ধ পরিণতি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু, জয়পালের পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে (আ ১০৫৫—৭০) কর্ণ বোধ হয় দ্বিতীয়বার বাঙলা দেশ আক্রমণ করেন এবং অন্তত বীরভূম পর্যন্ত অগ্রসর হন। বীরভূমের পাইকোর গ্রামে একটি প্রস্তরস্তম্ভের উপর কর্ণের একটি লিপি খোদিত আছে। এই দ্বিতীয় আক্রমণের পরিণতিই বোধ হয় তৃতীয় বিগ্রহপাল এবং কর্ণ-কন্যা যৌবনশ্রীর বিবাহ। বঙ্গে এই সময় চন্দ্র বা বর্মারা রাজত্ব করিতেছিলেন, এবং কর্ণ প্রথমবারের আক্রমণে ইঁহাদেরই একজন রাজাকে পরাজিত করিয়া থাকিবেন।

লক্ষ্মীকর্ণের হাত হইতে উদ্ধার সম্ভব হইলেও পশ্চিম-বঙ্গ বোধ হয় বেশি দিন আর পাল-সাম্রাজ্যভুক্ত থাকে নাই। মহামাণ্ডলিক ঈশ্বরঘোষ নামে এক সামন্তরাজা এই সময়ে বর্ধমান অঞ্চলে স্বাধীন স্বতন্ত্র মহারাজাধিরাজরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। ইঁহার কেন্দ্র ছিল বর্ধমান জেলার ঢেক্করী নামক স্থানে। পূর্ববঙ্গে ত্রিপুরা অঞ্চলে এই সময়ে পট্টিকেরা রাজ্য গড়িয়া উঠে; এই রাজ্যের সঙ্গে সমসাময়িক পগানের (ব্রহ্মদেশ) আনাহ্‌রহ্‌ থা বা অনিরুদ্ধের রাজবংশের কয়েক পুরুষের রাষ্ট্রীয় ও বৈবাহিক সম্বন্ধের বিবরণ জানা যায়। দ্বাদশ শতকে রণবংকমল্ল নামে অন্তত একজন নরপতির নামও আমরা জানি। পূর্ব-বঙ্গের অন্যান্য স্থানে একাদশ শতকের শেষার্ধে এবং দ্বাদশ শতকে চন্দ্রবংশ এবং পরে বর্মণ বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। কাজেই পূর্ব-বঙ্গ পুনরুদ্ধার পালরাজারা আর করিতেই পারেন নাই।

কর্ণাটাক্রমণ

তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে (আ ১০৫৫—১০৭০) বাঙলা দেশে আর এক নূতন বহিঃশত্রুর আক্রমণ দেখা দিল। বিক্রমাঙ্কদেবচরিত-রচয়িতা বিল্হন্ বলিতেছেন, কর্ণাটের চালুক্যরাজ প্রথম সোমেশ্বরের জীবিতকালেই পুত্র (ষষ্ঠ) বিক্রমাদিত্য এক বিপুল সৈন্যবাহিনী লইয়া দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছিলেন (১০৬৮ আ)। চালুক্য-লিপিতেও এই দিগ্বিজয়ের কিছু আভাস আছে, এবং বাঙলায় একাধিক চালুক্যরাজ কর্তৃক একাধিক সমরাভিযানের উল্লেখ আছে। এই সব কর্ণাটদেশিয় সমরাভিযানকে আশ্রয় করিয়াই কিছু কিছু কর্ণাটী ক্ষত্রিয়সামন্ত-পরিবার এবং অন্যান্য কিছু কিছু লোক বাঙলাদেশে আসিয়াছিলেন, এবং সৈন্যাভিযান স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পরও তাঁহারা এখানেই থাকিয়া গিয়াছিলেন। বিহার ও বাঙলাদেশের সেন-রাজবংশ এবং (পূর্ব)-বঙ্গের বর্মণ রাজবংশ এই সব দাক্ষিণী কর্ণাটী-পরিবার হইতে উদ্ভূত বলিয়া ইতিহাসে বহুদিন স্বীকৃত হইয়াছে। একাদশ শতকের মধ্যভাগে বাঙলার উপর আর একটি ভিন্-প্রদেশী আক্রমণের সংবাদ জানা যায়। উড়িষ্যার রাজা মহাশিবগুপ্ত যযাতি গৌড়, রাঢ়া এবং বঙ্গে বিজয়ী সমরাভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন বলিয়া দাবি করিয়াছেন। আর এক উড়িষ্যারাজ উদ্যোতকেশরী, তিনিও একবার গৌড়সৈন্যবিজয়ের দাবি জানাইতেছেন ; তাহাও সম্ভবত এই সময়েই। এই সব ভিন্-প্রদেশী আক্রমণের ফল অনুমান করা কঠিন নয় ; (পূর্ব)-বঙ্গ তো আগেই করচ্যুত হইয়া গিয়াছিল ; জয়পাল-বিগ্রহপালের আমলে পশ্চিম-বঙ্গও তাঁহারা হারাইয়াছিলেন। ক্ষীণায়মান পাল-রাজ্য এখন এই সব ভিন্-প্রদেশি আক্রমণে প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। মগধেও পাল রাজাদের শাসন মুষ্ঠি শিথিল হইয়া আসিতেছিল। জয়পালের সময় হইতেই পরিতোষ এবং তৎপুত্র শূদ্রক নামে দুই সামন্ত গয়া অঞ্চলে প্রধান হইয়া উঠিতেছিলেন ; বস্তুত, বাহুবলে তাঁহারা গয়া পরিচালন করিতেছিলেন বলিয়া তাঁহাদের লিপিতে দাবি করা হইয়াছে। শূদ্রক, শূদ্রকের পুত্র বিশ্বরূপ বা বিশ্বাদিত্য এবং তৎপুত্র যক্ষপালের সময় এই বংশ ক্রমশ আরও পরাক্রান্ত হইয়া উঠে। গৌড়রাজ তো শূদ্রককে নিজে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন বলিয়া দাবি করা হইয়াছে। তাঁহার পুত্র বিশ্বরূপ নৃপ বা রাজা বলিয়াই কথিত হইয়াছেন। বিহার ও বাঙলার পাল-রাজ্যের অবস্থা কল্পনা করা কঠিন নয়। বর্মণ রাজবংশ পূর্ব-বাংলায় স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাজ্য গড়িয়া তুলিল ; কামরূপরাজ রত্নপাল গৌড়রাজকে উদ্ধত অস্বীকারে অপমানিত করিতে এতটুকু ভীতিবোধ করিলেন না !

তৃতীয় বিগ্রহপালের তিন পুত্র : দ্বিতীয় মহীপাল (আ ১০৭০—১০৭৫), দ্বিতীয় শূরপাল (আ ১০৭৫—৭৭) এবং রামপাল (আ ১০৭৭—১১২০)। মহীপাল যখন রাজা হইলেন তখন ঘরে-বাহিরে অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। নিজ পরিবারের মধ্যে নানা চক্রান্ত, সামন্তরা বিদ্রোহোন্মুখ। ভ্রাতা রামপাল পারিবারিক চক্রান্তের মূল ভাবিয়া

মহীপাল শূরপাল ও রামপাল দুই ভ্রাতাকেই কারারুদ্ধ করিলেন। কিন্তু এখানেই বিপদের শান্তি হইল না। বিদ্রোহী সামন্তদের দমনে তিনি কৃতসংকল্প হইলেন, অথচ তাঁহার সৈন্যদল এবং যুদ্ধোপকরণ যথেষ্ট ছিল বলিয়া মনে হয় না। মন্ত্রীবর্গের সুপরামর্শেও তিনি কর্ণপাত করিলেন না। বরেন্দ্রীর কৈবর্ত-সামন্তদের বিদ্রোহ দমন করিতে গিয়া তিনি যুদ্ধে পর্যুদস্ত এবং নিহত হইলেন ; কৈবর্ত-নায়ক দিব্য (দিব্বোক, দিবোক) বরেন্দ্রীর অধিকার লাভ করিলেন।

কৈবর্ত-বিদ্রোহ ; বরেন্দ্রীতে কৈবর্তাধিপত্য ॥ আ ১০৭৫—১১০০ ॥

সন্ধ্যাকরনন্দীর রামচরিত-কাব্যে এই বিদ্রোহ, মহীপাল হত্যার বিবরণ, এবং রামপাল কর্তৃক বরেন্দ্রীর পুনরুদ্ধার ইত্যাদির সুবিস্তৃত ইতিহাস কাব্যকৃত করা হইয়াছে। সন্ধ্যাকর রামপালপুত্র মদনপালের অনুগ্রহভাজন ; মহীপালের উপর তিনি যে খুব শ্রদ্ধিত ছিলেন, মনে হয় না। তিনি মহীপালকে নিষ্ঠুর এবং দুর্নীতিপরায়ণ বলিয়া কটূক্তিও করিয়াছেন। মহীপাল লোকশ্রুতিতে বিশ্বাস করিয়া জনপ্রিয় রামপালকে চক্রান্তকারী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, অথচ রামপাল যথার্থত তাহা ছিলেন না। তাহা ছাড়া তিনি যুদ্ধকামী হইয়া মন্ত্রীবর্গের আদেশ অমান্য করিয়া অনন্ত-সামন্তচক্রের বিরুদ্ধে অপরিমিত সেনাদল লইয়া বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হইয়াছিলেন, এ-সব সংবাদ সন্ধ্যাকরই দিতেছেন। মহীপালের প্রকৃতি, চরিত্র এবং রাষ্ট্রবুদ্ধি সম্বন্ধে সন্ধ্যাকরের সাক্ষ্য কতখানি প্রামাণিক বলা কঠিন। অন্য কোনো সাক্ষ্য উপস্থিতও নাই। এই অবস্থায় মহীপালের ভালমন্দ বা কর্তব্যাকর্তব্য বিচারের দোষগুণ কিছুই চলিতে পারে না। তবে, তিনি যে দুর্বল এবং রাষ্ট্রবুদ্ধিবিহীন ছিলেন, এ-সম্বন্ধে বোধ হয় সংশয় নাই। ঘটনাচক্রের পরিণতিই তাহার প্রমাণ।

দিব্য ॥ আ ১০৭৫ ॥

দিব্য সম্বন্ধেও সন্ধ্যাকরের সাক্ষ্য কতটুকু গ্রাহ্য, বলা কঠিন। পালরাজাদের পারিবারিক শত্রুর প্রতি সন্ধ্যাকর সুবিচার করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। রামচরিত পাঠে মনে হয়, দিব্য ছিলেন একজন নায়ক, পালরাষ্ট্রেরই একজন নায়ক-কর্মচারী ! কি কারণে তিনি বিদ্রোহপরায়ণ হইয়াছিলেন, আর কোন্ কোন্ সামন্ত তাঁহার সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন, ইত্যাদি কিছুই সন্ধ্যাকর বলেন নাই। অনন্ত সামন্তচক্রের সম্মিলিত বিদ্রোহের তিনি নায়কত্ব করিয়াছিলেন, এমন কোনো প্রমাণও নাই। সন্ধ্যাকর তাঁহাকে বলিয়াছেন 'দস্যু' এবং 'উপধি-ব্রতী' (ছলাকলায় অজুহাতে অন্যায় কৌশলে কার্যোদ্ধারপরায়ণ)। মনে হয়, দিব্য পাল-রাজাদের অন্যতম রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন, এবং পালরাষ্ট্রের দুর্বলতায় এবং রাজপরিবারে ভ্রাতৃবিরোধের সুযোগ লইয়া তিনি বিদ্রোহপরায়ণ

হইয়াছিলেন। অন্তত, তিনি যে কোনো প্রজাবিদ্রোহের নায়কত্ব করিয়াছিলেন, এমন কোনো প্রমাণ উপস্থিত নাই ; সন্ধ্যাকরনন্দী অন্তত তাহা বলেন নাই, অন্যত্রও তেমন প্রমাণ নাই। সন্ধ্যাকর তো দিব্যকে 'কুৎসিত কৈবর্ত নৃপ' বলিয়াছেন, এই বিদ্রোহকে 'অনীক ধর্ম-বিপ্লব' বলিয়াছেন (অনীক = অন্যায়, অপবিত্র), এবং এই উপপ্লবকে "ভবস্য আপদম্" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সন্ধ্যাকরের সাক্ষ্য যে পক্ষপাতদুষ্ট নয়, এমন অবশ্যই বলা যায় না। যাহাই হউক, বরেন্দ্রীর এই কৈবর্ত-বিদ্রোহে মহীপাল নিহত হইলেন, এবং দিব্য বরেন্দ্রীর অধিকার লাভ করিলেন।

রামপাল ।। আ ১০৭৭—১১২০ ।।

বরেন্দ্রাধিপ দিব্যকে যুদ্ধে বর্মণ-বংশীয় বঙ্গরাজ জাতবর্মার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল ; কিন্তু তাহাতে কৈবর্ত-রাজ্যের কিছু ক্ষতি হয় নাই বলিয়া মনে হয়। শূরপাল বেশি দিন রাজত্ব করিতে পারেন নাই ; রামপাল রাজা হইয়া দিব্যর রাজত্বকালেই বরেন্দ্রী পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সফলকাম হইতে পারেন নাই। বরং কৈবর্তপক্ষ একাধিকবার রামপালের রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল। দিব্যর পর রুদোকের আমলেও রামপাল বোধ হয় কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। রুদোকের ভ্রাতা বরেন্দ্রীর অধিপতি হওয়ার পর সুপ্রতিষ্ঠিত কৈবর্ত শক্তি এক নূতন ও পরাক্রান্ততর আকারে দেখা দিল। ভীম জনপ্রিয় নরপতি ছিলেন ; তাঁহার স্মৃতি আজও জীবিত। রামপাল শঙ্কিত হইয়া প্রতিবেশী রাজাদের ও পালরাষ্ট্রের অতীত ও বর্তমান, স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সামন্তদের দুয়ারে দুয়ারে তাঁহাদের সাহায্য ভিক্ষা করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরিলেন। অপরিমিত ভূমি ও অজস্র অর্থ দান করিয়া এই সাহায্য ক্রয় করিতে হইল। রামচরিতে এই সব রাজা ও সামন্তদের যে তালিকা দেওয়া আছে তাহা বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যাইবে, তদানীন্তন বাঙলা ও বিহারের রাষ্ট্রতন্ত্র অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। রামপালের প্রথম ও প্রধান সহায়ক হইলেন (১) তাঁহার মাতুল রাষ্ট্রকূটবংশীয় সামন্ত মথন (মহন) ও তাঁহার মহামাণ্ডলিক দুই পুত্র ও এক মহাপ্রতীহার ভ্রাতুষ্পুত্র ; (২) পীঠি ও মগধাধিপতি ভীমযশ ; (৩) কোটাটবীর রাজা বীরগুণ ; কোটাটবী বিষ্ণুপুরের পূর্বে বর্তমান কোটেশ্বর ; (৪) দণ্ডভুক্তির রাজা জয়সিংহ ; (৫) বাল-বলভীর অধিপতি বিক্রম রাজ ; বালবলভী মেদিনীপুরের পশ্চিম-দক্ষিণ সীমান্তে বলিয়া মনে হয় ; (৬) অপর-মন্দারের অধিপতি লক্ষ্মীশূর ; অপর-মন্দার পরবর্তী কালের মদারুণ বা মন্দারণ-সরকারের পশ্চিমাংশে, বর্তমান হুগলী জেলায় ; লক্ষ্মীশূর ছিলেন এই অঞ্চলের সমস্ত আটবিক খণ্ডের সামন্তচক্র-চূড়ামণি ; (৭) কুজবটীর রাজা শূরপাল ; কুজবটী সাঁওতাল পরগণায়, নয়া-দুমকার ১৪ মাইল উত্তরে ; (৮) তৈলকম্প বা বর্তমান তেলকূপির (মানভূম জেলা) অধিপতি রুদ্রশিখর ; (৯) উচ্ছালাধিপতি ভাস্কর বা ময়গল সিংহ ; উচ্ছাল বর্তমান

বীরভূমের উঝিয়াল পরগণা; (১০) কয়ঙ্গল-মণ্ডলাধিপতি নরসিংহার্জুন; (১১) সঙ্কটগ্রামের চণ্ডার্জুন; সঙ্কটগ্রাম বল্লালচরিত-গ্রন্থের সংককোট, আইন-ই-আকবরী গ্রন্থের সকোট, বোধ হয় হুগলী জেলায়; (১২) ঢেক্করীয় (কাটোয়া মহকুমার ঢেকুরী)-রাজ প্রতাপসিংহ; (১৩) নিদ্রাবলীর বিজয়রাজ; (১৪) কৌশাম্বী-অধিপতি দ্বোরপবর্ধন; কৌশাম্বী রাজশাহীর কুসুম্বা পরগণা, অথবা বগুড়া জেলার তপে কুসুম্বি পরগণা; (১৫) পদুবম্বার সোম; পদুবম্বা পাবনা হইতে পারে, কিন্তু হুগলী জেলার পৌনান পরগণা হওয়াই অধিকতর সম্ভব।

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, পদুবম্বা যদি পাবনাও হয়, তাহা হইলে পদুবম্বা এবং কৌশাম্বী ছাড়া আর সমস্ত সামন্তরাই দক্ষিণ-বিহার ও দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের। বুঝিতে পারা যায়, অঙ্গ বা উত্তর-বিহার এবং উত্তর-পশ্চিম বঙ্গ ছাড়া রামপালের রাজত্বের বিস্তার আর কোথাও ছিল না। কৌশাম্বীর দ্বোরপবর্ধনকে এই তালিকায় দেখিয়া মনে হইতেছে, খাস বরেন্দ্রীতেও রামপাল ২।১ জন সহায়ক সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

ক্ষোণী-নায়ক ভীম

এই সম্মিলিত শক্তিপুঞ্জের সঙ্গে ক্ষোণী-নায়ক ভীমের পক্ষে আঁটিয়া ওঠা সম্ভব ছিল না। রামচরিতে রামপাল কর্তৃক বরেন্দ্রীর উদ্ধার-যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ আছে। এইখানে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট যে, গঙ্গার উত্তর-তীরে দুই সৈন্যদলে তুমুল যুদ্ধ হয়, এবং ভীম জীবিতাবস্থায় বন্দী হন। ভীমের অগণিত ধনরত্নপূর্ণ রাজকোষ রামপালের সেনাদল কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়। কিন্তু ভীম বন্দী হওয়ার অব্যবহিত পরেই ভীমের অন্যতম সুহৃৎ ও সহায়ক হরি পরাজিত ও পর্যুদস্ত কৈবর্ত সৈন্যদের একত্র করিয়া আবার যুদ্ধে রামপালের পুত্রের সম্মুখীন হন, কিন্তু অজস্র অর্থদানে কৈবর্তসেনা ও হরিকে বশীভূত করা হয়। ভীম সপরিবারে রামপালহস্তে নিহত হন। বরেন্দ্রী এবং কৈবর্ত-রাজকোষ রামপালের করায়ত্ত হইল, করভার-পীড়িত বরেন্দ্রীতে সুখ ও শান্তি ফিরিয়া আসিল। রামাবতী নগরে বরেন্দ্রী রাষ্ট্রকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইল।

বরেন্দ্রী উদ্ধারের পর রামপাল হৃতরাজ্যের অন্যান্য অংশ উদ্ধারে যত্নবান হইলেন। (পূর্ব)-বঙ্গের এক বর্মণরাজ, বোধহয় হরিবর্মা, নিজ স্বার্থে রামপালের আনুগত্য স্বীকার করিলেন। রামপালের এক সামন্ত কামরূপ জয় করিয়া রামপালের প্রিয়পাত্র হইলেন। রাঢ়দেশের সামন্তদের সহায়তায় উড়িষ্যারও অন্তত কিয়দংশ জয় তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইল; অবশ্য তাহা করিতে গিয়া কলিঙ্গের চোড়গঙ্গ-রাজদের সঙ্গে, অন্তত পরোক্ষে, কিছু সংঘর্ষে তাঁহাকে আসিতে হইয়াছিল। বোধ হয় উৎকল-কলিঙ্গে রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা করিতে গিয়াই রামপালকে চোলরাজ কুলোত্তুঙ্গের (আ ১০৭০—১১১৮) আক্রমণের

সম্মুখীন হইতে হয় ; বঙ্গ-বঙ্গাল এবং মগধ কুলোত্তুঙ্গকে কর প্রদান করিত এবং কুলোত্তুঙ্গ গঙ্গা হইতে কাবেরী পর্যন্ত সমস্ত ভূভাগের অধিকারী হইয়াছিলেন বলিয়া অন্তত একটা দাবি কুলোত্তুঙ্গের পক্ষ হইতে করা হইয়াছে। এই দাবি কতটুকু ঐতিহাসিক, বলা কঠিন।

কর্ণাটাভ্যুদয়

এই সময় কর্ণাটের লুব্ধদৃষ্টি বরেন্দ্রীর উপর পতিত হয়। বাঙলা দেশে কর্ণাটাক্রমণের কথা তো আগেই বলা হইয়াছে। কিন্তু রামচরিতে বরেন্দ্রীর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে "অধরিত-কর্ণাটেক্ষণ-লীলা"। এই কর্ণাটীরা কি সেই সুদূর দক্ষিণের কর্ণাটবাসী ? বোধ হয় তাহা নয়। ইঁহারা সম্ভবত পশ্চিম-বঙ্গ ও মিথিলার দুই কর্ণাট রাজবংশ। কর্ণাটাগত এক সেন-বংশ ইতিমধ্যেই পশ্চিম-বঙ্গে, এবং আর এক সেন-বংশ মিথিলায় নিজেদের বংশের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। আপাতত, মিথিলার সেন-বংশীয় রাজা নান্যদেবের (আ ১০৯৭) সঙ্গে রামপালের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। নান্যদেব বঙ্গ এবং গৌড়ের পরাক্রম খর্ব করিয়াছিলেন বলিয়া দাবি করিয়াছেন; সমসাময়িক গৌড়-রাজ রামপাল বলিয়াই মনে হয়, এবং বঙ্গরাজ হইতেছেন বিজয়সেন। বিজয়সেনও অবশ্য নান্যদেবকে পরাজয়ের দাবি করিয়াছেন। যাহা হউক, মিথিলা (উত্তর-বিহার) যে রামপালের করচ্যুত হইয়াছিল এ-সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ নাই।

কাশী-কান্যকুব্জাধিপতি পরাক্রান্ত গাহড়বাল রাজাদের সঙ্গেও রামপালকে যুঝিতে হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। গাহড়বাল বংশীয় গোবিন্দচন্দ্রের পুত্র মদনপালের সঙ্গে গৌড়-সৈন্যের সংগ্রামের ইঙ্গিত গহড়বাল-লিপিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু মদনপাল নিশ্চিত জয়লাভ করিয়াছিলেন, এমন বলা যায় না। বরং রামচরিতে এমন ইঙ্গিত আছে যে, বরেন্দ্রী মধ্যদেশের বিক্রম সংযত করিয়া রাখিয়াছিল।

রামপাল বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তিনি কৃতী পুরুষ ছিলেন, সন্দেহ নাই। নির্বাসনে জীবন আরম্ভ করিয়া বিদ্রোহীদের হাত হইতে পিতৃভূমি বরেন্দ্রী উদ্ধার, অধিকাংশ বাঙলার পুনরুদ্ধার, উড়িষ্যা ও কামরূপে আধিপত্য বিস্তার, এবং একাধিক বহিঃশত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াও পালরাজ্য ও রাষ্ট্রের সীমা এবং আধিপত্য মৃত্যু পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রাখা, এক জীবনের পক্ষে এত কর্মকীর্তি তাঁহার রাষ্ট্রবুদ্ধি, দৃঢ়চরিত্র এবং অদম্য শৌর্যবীর্যের পরিচায়ক, স্বীকার করিতেই হয়।

কিন্তু রাষ্ট্রীয় আদর্শ বা সামাজিক ব্যবস্থার সময়োপযোগী পরিবর্তন না হইলে শুধু কোনো রাজা বা সম্রাটের ব্যক্তিগত চরিত্রের গুণ রাজ্য বা রাষ্ট্রকে পরিণাম-বিনষ্টির হাত হইতে বাঁচাইতে পারে না। মহীপালের মতন সম্রাট পারেন নাই, রামপালও পারিলেন

না। বিনষ্টিকে তাঁহারা তাঁহাদের শৌর্যে বীর্যে পরাক্রমে কূটবুদ্ধিতে দূরে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়াছেন সন্দেহ নাই ; কিন্তু যে বিচ্ছিন্ন স্থানীয় সংকীর্ণ আত্মসচেতনতা ভারতীয় রাষ্ট্রবুদ্ধিকে এই যুগে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিল, মহীপাল বা রামপাল কেহই তাহা দূর করিতে পারেন নাই। এই অনুরাষ্ট্রীয় আদর্শের এতটুকু পরিবর্তন এই সময়ে ভারতবর্ষের কোথাও হয় নাই। বস্তুত, ভারতবর্ষের কোনো রাজা বা রাজবংশই এই যুগে সেদিকে সচেষ্ট হন নাই। বরং একে অন্যের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া নিজেদের রাজ্যসীমা বাড়াইবার চেষ্টাই কেবল করিয়াছেন। অথচ, অন্যদিকে তখন বৈদেশিক আধিপত্যের ঘন কৃষ্ণমেঘ ভারতের রাষ্ট্রীয় আকাশ ক্রমশ ঢাকিয়া ফেলিতেছিল ; মুসলমান অধিকারের সীমা ক্রমশ পূর্বদিকে বিস্তৃত হইতেছিল ! রামপাল যখন মাতুল মথনের মৃত্যুশোক সহ্য করিতে না পারিয়া পরিণত বার্ধক্যে গঙ্গায় আত্মবিসর্জন করেন তখন হয়তো তিনি সার্থক জীবনের পরম পরিতৃপ্তি লইয়াই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু যে স্থানীয় সংকীর্ণ আত্মসচেতনতা মহীপালের চেষ্টাকে সার্থক হইতে দেয় নাই, তাহাই রামপালের চেষ্টাকেও পরিণামে ব্যর্থ করিয়া দিল। ইহার সঙ্গে অন্যান্য সামাজিক ও আর্থনীতিক কারণ তো ছিলই।

বঙ্গে বর্মণাধিপত্য ।। আঃ—১০৫০

সুদীর্ঘ চারিশত বৎসর পরে এই বিষাদান্ত পরিণতির কথা বলিবার আগে বঙ্গের বর্মণ-বংশের কথা একটু বলিয়া লইতে হয়। ইঁহাদের কথা আগেও একাধিক প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে। যাদববংশীয় এই বর্মণ রাজারা কলিঙ্গ দেশের সিংহপুর নামক স্থান হইতে একাদশ শতকের দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় পাদে কোনো সময় পূর্ববঙ্গে আসিয়া আধিপত্য স্থাপন করেন। বজ্রবর্মাপুত্র জাতবর্মা এই বংশের প্রথম রাজা। জাতবর্মা কলচুরীরাজ কর্ণের কন্যা বীরশ্রীকে বিবাহ করেন, এবং অঙ্গ, কামরূপ এবং বরেন্দ্রী-নায়ক দিব্যকে পরাজিত করেন বলিয়া দাবি করিয়াছেন। অঙ্গ এই সময় বোধ হয় রামপালের অধীন ছিল, এবং দিব্য নিশ্চয়ই বরেন্দ্রীর কৈবর্ত-নায়ক। দ্বিতীয় মহীপালের মৃত্যুর পর পাল-রাজ্যে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল, জাতবর্মা তাহার পূর্ণ সুযোগ লইতে বোধ হয় দ্বিধা বোধ করেন নাই। জাতবর্মার পশ্চাতে কলচুরীরাজ গাঙ্গেয়দেব এবং কর্ণের সহায়তা ছিল, এ-সন্দেহ অমূলক নয়। জাতবর্মার পর পুত্র মহারাজাধিরাজ হরিবর্মা রাজা হন ; বিক্রমপুরে ছিল তাঁহার রাজধানী, এবং তাঁহার সান্ধিবিগ্রহিক মন্ত্রী ছিলেন ভট্ট ভবদেব। এই হরিবর্মা রাম-চরিতোক্ত ভীমবন্ধু হরি, এবং রামপাল-শরণাগত বর্মণরাজ এক এবং অভিন্ন বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। এই অনুমান যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে না করিবার আপাতত কোনো কারণ নাই। হরিবর্মার পর ভ্রাতা শ্যামলবর্মা বঙ্গের রাজা হন ; তাঁহার রাষ্ট্রীয় কোনো কীর্তিই জানা নাই, তবে তিনি বাঙলার বৈদিক ব্রাহ্মণদের লোকস্মৃতিতে আজও বাঁচিয়া

আছেন। কুলজী-গ্রন্থের মতে শ্যামলবর্মার আমলেই বাঙলায় বৈদিক ব্রাহ্মণদের আগমন। তাঁহার পুত্র ভোজবর্মা এই বংশের শেষ রাজা; ইঁহারও রাষ্ট্রকেন্দ্র ছিল বিক্রমপুরে, কিন্তু তিনি পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্গত কৌশাম্বী-অষ্টগচ্ছ-খণ্ডলে কিছু ভূমি দান করিয়াছিলেন দেখিয়া মনে হয়, পুণ্ড্রবর্ধনের রাজসাহী-বগুড়া অঞ্চলেও ভোজবর্মার আধিপত্য এক সময় বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। তাঁহার রাজত্বকালে অথবা তাঁহার অব্যবহিত পরেই পূর্ব-বঙ্গের বর্মণরাজ্য সেন-রাজবংশের করতলগত হয়।

পালায়নের পরিনির্বাণ ॥ আ ১১২০—১১৬২।

রামপালের চারিপুত্রের মধ্যে দুই পুত্র, বিত্তপাল ও রাজ্যপালের সিংহাসন আরোহণের সৌভাগ্যলাভ ঘটে নাই। অন্য দুই পুত্র, কুমারপাল ও মদনপালের মধ্যে কুমারপাল (আ ১১২০—২৫) রাজা হন; তাঁহার পর কুমারপাল-পুত্র তৃতীয় গোপাল (আ ১১২৫—১১৪০) এবং গোপালের পর রামপালের অন্যতম পুত্র মদনপাল (আ ১১৪৪—১১৫৫) রাজা হইয়াছিলেন। রামচরিত-কাব্যপাঠে মনে হয়, সিংহাসনারোহণের এই ক্রম সম্বন্ধে একটা রহস্য কোথাও ছিল। রামচরিত রামপালকে লইয়াই রচনা, কিন্তু বস্তুত মদনপালের রাজত্ব পর্যন্ত কাব্যটি বিস্তারিত, অথচ রামপালের পর কুমারপাল এবং গোপাল সম্বন্ধে এই কাব্যে প্রায় কিছু বলা হয় নাই বলিলেই চলে। মদনপালে পৌঁছিয়া সন্ধ্যাকর যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিয়াছেন। কোনও বংশগত বা পারিবারিক গোলমালের কল্পনা একেবারে অলীক না-ও হইতে পারে!

যাহা হউক, এই তিন জনের রাজত্বকালেই চারিশত বৎসরের সযত্নলালিত, বাঙালীর গৌরব পাল-রাজ্য ও রাষ্ট্র ধীরে ধীরে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল। ধর্মপাল-দেবপাল যে-সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, মহীপাল যাহাকে ধ্বংসের মুখ হইতে বাঁচাইয়া ছিলেন, রামপাল যাহাকে শেষবারের জন্য আত্মপ্রত্যয় এবং প্রতিষ্ঠা ফিরাইয়া দিয়াছিলেন, কেহ আর তাহাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। ঘরে এবং বাহিরে স্থানীয় আত্মসচেতন, একান্ত ব্যক্তিক রাষ্ট্রবুদ্ধি উৎকট হইয়া দেখা দিল; ইহাকে ব্যাহত করিবার মতন শক্তি ও বুদ্ধি লইয়া কোনো মহীপাল বা রামপাল আর সিংহাসন আরোহণ করিলেন না!

কুমারপালের নিজের প্রিয় সেনাপতি বৈদ্যদেব কামরূপে এক বিদ্রোহ দমন করিয়া নিজেই এক স্বতন্ত্র স্বাধীন নরপতিরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া লইলেন। পূর্ব-বঙ্গে ভোজবর্মার নেতৃত্বে বর্মণরা স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হইল। দক্ষিণ হইতে কলিঙ্গের গঙ্গবংশীয় রাজারা আরম্য (= বর্তমান আরামবাগ) দুর্গ জয় করিয়া মেদিনীপুরের (মিধুনপুর) ভিতর দিয়া গঙ্গাতীর পর্যন্ত ঠেলিয়া চলিয়া আসিলেন। কুমারপালের রাজত্বকালে সেনাপতি বৈদ্যদেব বোধ হয় সাফল্যের সঙ্গে এই আক্রমণ কতকটা ব্যাহত

করিয়াছিলেন, এবং মদনপালও বোধ হয় একবার কলিঙ্গ পর্যন্ত বিজয়াভিযান করিয়া থাকিবেন। কিন্তু, কিছু দিনের মধ্যেই পাল ও গঙ্গদের সংগ্রামের এবং দক্ষিণের কল্যাণ-চালুক্যদের আক্রমণের সুযোগ লইয়া দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে কর্ণাটাগত সেন-রাজবংশ মস্তক উত্তোলন করিল। এই সেন-রাজবংশ ইতিপূর্বেই পূর্ব-বঙ্গে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। এইবার তাঁহারা একেবারে গৌড়ের হৃদয়দেশ আক্রমণ করিল। কালিন্দী-নদীর তীরে, বোধ হয় মদনপালের রাজধানীর নিকটেই, এক তুমুল যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধের ফলাফল অনিশ্চিত, কারণ রামচরিতে যেমন মদনপালের জয় দাবি করা হইয়াছে, তেমনই দেওপাড়া-লিপিতে সেন-রাজ বিজয়সেনের পক্ষ হইতেও জয়ের দাবি জানান হইয়াছে।

অন্যদিকে দুর্বলতার সুযোগ লইয়া গাহড়বাল-রাজারাও এই সময় বাঙলাদেশে আবার নূতন করিয়া সমরাভিযানে উদ্যত হইলেন। ১১২৪ খ্রীষ্টাব্দের আগেই পাটনা অঞ্চল তাঁহাদের অধিকারে চলিয়া গেল; ১১৪৬ খ্রীষ্টাব্দের আগে গেল মুদ্গগিরি বা মুঙ্গের অঞ্চল। মদনপালের রাজত্বের অষ্টম বৎসর পর্যন্ত বরেন্দ্রীর অন্তত কিয়দংশ তাঁহার অধিকারে ছিল বলিয়া লিপি-প্রমাণ বিদ্যমান। এইটুকু ছাড়া বাঙলাদেশের আর কোনো অংশই তাঁহার অধিকারে ছিল বলিয়া মনে হয় না; তবে বিহারের মধ্য ও পূর্বাঞ্চল তখনও পাল-রাজ্যভুক্ত ছিল। মদনপালের মৃত্যুর দশ বৎসরের মধ্যে তাহাও আর রহিল না, এবং পাল-রাজ্যের শেষচিহ্নও বিলুপ্ত হইয়া গেল।

মদনপালই পালবংশের শেষ রাজা। তবে, তাঁহার পরও গোবিন্দচন্দ্র (আ ১১৫৫—১১৬২) নামে একজন পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ গৌড়েশ্বরের নাম পাওয়া যায়। লিপি-প্রমাণ হইতে মনে হয়, গয়া জেলাই ছিল তাঁহার রাজ্য-কেন্দ্র; গৌড়রাজ্যের কিয়দংশও হয়তো এক সময় তাঁহার রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

সামাজিক ইঙ্গিত

বাঙলার ইতিহাসে পালবংশের আধিপত্যের চারিশত বৎসর নানাদিক হইতে গভীর ও ব্যাপক অর্থ বহন করে। বর্তমান বাঙলাদেশ ও বাঙালী জাতির গোড়া-পত্তন হইয়াছে এই যুগে; এই যুগই প্রথম বৃহত্তর সামাজিক সমীকরণ ও সমন্বয়ের যুগ। এই চারিশত বৎসরের সামাজিক ইঙ্গিতগুলি কতকটা বিস্তৃতভাবেই নানা অধ্যায়ে বিভিন্ন দিক হইতে ধরিতে চেষ্টা করিয়াছি। এখানে রাষ্ট্রের ও রাজবৃত্তের দিক্ হইতে ইঙ্গিতগুলি ব্যাখ্যার সংক্ষিপ্ত একটু চেষ্টা করা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রীয় আদর্শ

খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় খ্রীষ্টপরবর্তী ষষ্ঠ-সপ্তম শতক পর্যন্ত ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় আদর্শ সর্বভারতীয় একরাটত্ব, সমস্ত ভারতের একচ্ছত্রাধিপত্য।

মাঝে মাঝে এই আদর্শ হইতে বিচ্যুতি ঘটিয়াছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু যখন তাহা হইয়াছে, তখনই ভারতবর্ষকে রাষ্ট্রক্ষেত্রে বিদেশির নিকট অনেক লাঞ্ছনা ও অপমান সহ্য করিতে হইয়াছে, এবং প্রচুর মূল্য দিয়া আবার সেই পুরাতন আদর্শকেই মানিয়া লইতে হইয়াছে। মৌর্য ও গুপ্তরাজবংশ এই আদর্শের প্রতীক। সপ্তম শতকেও এই আদর্শ সক্রিয়, কিন্তু তখন সীমা সংকীর্ণতর হইয়া গিয়াছে. সর্বভারত হইতে সকল-উত্তরাপথে সেই আদর্শ নামিয়া আসিয়াছে ; 'সকলোত্তরপথনাথ' হওয়াই এই যুগের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি। অষ্টম শতকেও এই আদর্শকে কেন্দ্র করিয়াই প্রতীহার ও পালবংশের সংগ্রাম অক্ষুণ্ণ, এবং তাহাকে ব্যর্থ করিবার চেষ্টায় দক্ষিণের রাষ্ট্রকূটবংশ সদাজাগ্রত। অন্যদিকে ধীরে ধীরে অন্য একটি রাষ্ট্রীয় আদর্শ গড়িয়া উঠিতেছিল ; এই আদর্শের অস্তিত্ব যে ছিল না তাহা নয়, তবে সর্বভারতীয় আদর্শের মতন এতটা সক্রিয় কখনো ছিল না। এই আদর্শ স্থানীয় ও প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্বের আদর্শ। গুপ্ত-সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই ক্রমশ এই আদর্শ মাথা তুলিতে আরম্ভ করে : কিন্তু ধর্মপাল-দেবপাল, বৎসরাজ-নাগভটের সময়েও উত্তরাপথস্বামীত্বের আদর্শ একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। কিন্তু তাহার পর হইতেই স্থানীয় ও প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্বের আদর্শের জয়জয়কার। এই সময় হইতেই যেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশখণ্ডের অর্থ-সংস্থান, ভাষা ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করিয়া এক একটি রাষ্ট্র গড়িয়া উঠে, এবং এই রাষ্ট্রগুলি নিজেদের প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারে সচেষ্ট হইয়া উঠে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও দেখা যায়, মোটামুটি অষ্টম শতক বা তাহার কিছু পর হইতে এক একটি বৃহত্তর জনপদরাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়া মূলগত এক কিন্তু এক একটি বিশিষ্ট লিপি বা অক্ষর রীতি, ভাষা এবং শিল্পাদর্শ গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে, এবং দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে তাহাদের এক একটি প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্য দাঁড়াইয়া গিয়াছে। বস্তুত, ভারতবর্ষের, বিশেষত উত্তর-ভারতের, মহারাষ্ট্র ও উড়িষ্যার প্রত্যেকটি প্রাদেশিক লিপি ও ভাষার ভ্রূণ ও জন্মাবস্থা মোটামুটি এই চারিশত বৎসরের মধ্যে। বাঙলা লিপি ও ভাষার গোড়া খুঁজিতে হইলে এই চারিশত বৎসরের মধ্যেই খুঁজিতে হইবে। বাঙলার ভৌগোলিক সত্তাও এই যুগেই গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারতের অন্যান্য লিপি, ভাষা ও প্রাদেশিক ভৌগোলিক সত্তা সম্বন্ধেও একই উক্তি প্রযোজ্য।

জাতীয় স্বাতন্ত্র্য

এই লিপি, ভাষা, ভৌগোলিক সত্তা ও রাষ্ট্রীয় আদর্শকে আশ্রয় করিয়া এক একটি স্থানীয় রাষ্ট্রীয় সত্তাও গড়িয়া উঠে এই যুগেই। বঙ্গ-বিহারে এই রাষ্ট্রীয় সত্তার সূচনা সপ্তম শতকেই দেখা দিয়াছিল, এবং তাহার প্রতীক ছিলেন শশাঙ্ক। কিন্তু পরবর্তী একশত বৎসরের মাৎস্যন্যায়ে এই রাষ্ট্রীয় সত্তাই আহত হইয়াছিল সকলের চেয়ে বেশি। পাল-রাজারা আবার তাহা জাগাইয়া তুলিলেন ; বাঙালী নিজস্ব স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র লাভ করিল,

এবং চারিশত বৎসর ধরিয়া তাহা ভোগ করিল। শুধু তাহাই নয়, ধর্মপাল-দেবপাল-মহীপালের সাম্রাজ্য বিস্তারের কৃপায় এই রাষ্ট্র একটা আন্তভারতীয় রাষ্ট্রীয় সত্তার স্বাদও কিছুদিনের জন্য পাইয়াছিল। অধিকন্তু, এই পালরাজাদের এবং পালরাষ্ট্রের পোষকতা ও আনুকূল্যে, নালন্দা-বিক্রমশীলা-ওদন্তপুরী-সারনাথের বৌদ্ধ সঙ্ঘ ও মহাবিহারগুলিকে আশ্রয় করিয়া আন্তর্জাতিক বৌদ্ধজগতেও বাঙলাদেশ ও বাঙ্গালীর রাষ্ট্র একটি গৌরবময় স্থান ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। এই সকলের সম্মিলিত ফলে বাঙলায় এই যুগেই, অর্থাৎ এই প্রায় চারিশত বৎসর ধরিয়া একটা সামগ্রিক ঐক্যবোধ গড়িয়া ওঠে। ইহাই বাঙালীর স্বদেশ ও স্বাজাত্যবোধের মূলে, এবং ইহাই বাঙালীর এক-জাতীয়ত্বের ভিত্তি। পাল-যুগের ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ দান।

সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক সমন্বয়

এই দানের মূলে পালরাজাদের কৃতিত্ব স্বীকার করিতেই হয়। পালরাজারা ছিলেন বাঙালী, বরেন্দ্রী তাঁহাদের পিতৃভূমি। বংশ-প্রতিষ্ঠায়ও ইঁহারা পুরাপুরি বাঙালী; পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য-সমাজের বংশাভিজাত্যের দাবি ইঁহাদের নাই। রামচরিতে ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি করা হইয়াছে, কিংবা ক্ষত্রিয় রাজবংশের সঙ্গে তাঁহাদের বিবাহাদি হইত, এজন্য তাঁহাদের ক্ষত্রিয় মনে করা কঠিন। রাজা মাত্রেই তো ক্ষত্রিয়, বিশেষত পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি প্রবর্তনের পর। আর, রাজরাজড়ার বৈবাহিক সম্বন্ধ অধিকাংশ ক্ষেত্রে তো রাষ্ট্রীয় কারণেই হইয়া থাকে; তাঁহাদের তো কোনো বর্ণ নাই! আবুল ফজল যে ইঁহাদের কায়স্থ বলিতেছেন তাহার মূলেও কোন বস্তুভিত্তি আছে কিনা সন্দেহ; তবে তাঁহারা উচ্চতর তিন বর্ণের কেহ নহেন এই সংস্কার লোকস্মৃতিতে ষোড়শ শতকেও বিদ্যমান ছিল বলিয়া মনে হয়। তারনাথ এবং মঞ্জুশ্রীমূলকল্পের গ্রন্থকারই বোধ হয় যথার্থ ঐতিহাসিক ইঙ্গিতটি রাখিয়াছেন। তারনাথ বলিতেছেন, জনৈক বৃক্ষদেবতার ঔরসে ক্ষত্রিয়াণীর গর্ভে গোপালের জন্ম কাহিনীটি টটেম্-স্মৃতি জড়িত বলিয়া সন্দেহ করিলে অন্যায় বা অনৈতিহাসিক কিছু করা হয় না। পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি-বহির্ভূত, আর্য সমাজ-বহির্ভূত সমাজের সংস্কার এই গল্পের মধ্যে বিদ্যমান। গোপাল এই সমাজ, সংস্কার ও সংস্কৃতির লোক। বোধ হয় এই জন্যই মঞ্জুশ্রীমূলকল্পের গ্রন্থকার পালরাজাদের বলিয়াছেন "দাসজীবিনঃ"। অথচ এই পালরাজারা ব্রাহ্মণ্যধর্ম, স্মৃতি, সংস্কার ও সংস্কৃতির ধারক ও পোষক, চাতুর্বর্ণের রক্ষক ও সংস্থাপক; লিপিগুলিতে তাহার প্রমাণ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। ধর্মে ইঁহারা বৌদ্ধ, পরম সুগত; ইঁহারা মহাযানী বৌদ্ধসংঘ ও সম্প্রদায়ের পরম অনুরাগী পোষক; অথচ বৈদিক ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্মও ইঁহাদের আনুকূল্য ও পোষকতা লাভ করিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, একাধিক পালরাজা ব্রাহ্মণ্যধর্মের পূজা এবং যাগযজ্ঞে নিজেরা অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, পুরোহিত-সিঞ্চিত শান্তিবারি নিজেদের মস্তকে ধারণ করিয়াছেন।

রাষ্ট্রের বিভিন্ন কর্মে ব্রাহ্মণেরা নিয়োজিত হইতেন, মন্ত্রী এবং সেনাপতিও হইতেন, আবার কৈবর্তরাও স্থান পাইতেন না, এমন নয়। এই ভাবে পালবংশকে কেন্দ্র ও আশ্রয় করিয়া বাঙলাদেশে প্রথম সামাজিক সমন্বয় সম্ভব হইয়াছিল; একদিনে নয়, চারিশত বৎসর ধরিয়াই তাহা চলিয়াছিল। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর স্মৃতি ও আচার, আর্য ও আর্যেতর সংস্কার ও সংস্কৃতি, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য পুরাণ, পূজা, শিক্ষা ও আদর্শ, দেবদেবী সমস্তই পালবংশকে কেন্দ্র ও আশ্রয় করিয়া পরস্পরে আদানপ্রদান করিয়াছে এবং এক মিলন সমন্বয় সূত্রে গ্রথিত হইয়া একটি বৃহৎ সামাজিক সমন্বয় গড়িয়া তুলিয়াছে। গুপ্ত আমল হইতে আরম্ভ করিয়া আর্য জৈন ও বৌদ্ধধর্মের উপর যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কৃতির স্রোত বাঙলার বুকের উপর দ্রুত প্রবাহিত হইতেছিল, এবং মোটামুটি সপ্তম শতকে যে সাংস্কৃতিক সংঘর্ষের সৃষ্টি করিয়াছিল —শশাঙ্ক তো ইহারই প্রতীক—সেই স্রোত ও সংঘর্ষ সমন্বিত হইল এই চারিশত বৎসর ধরিয়া পাল-রাজাদের বৃহৎ ছত্রছায়ায়। এই আর্য সংস্কার ও সংস্কৃতির বাহিরে যে বৃহৎ আর্যেতর সংস্কার ও সংস্কৃতি দেশের অধিকাংশ জুড়িয়া বিরাজ করিতেছিল তাহাও অন্তত কিছুটা যে পাল রাজচ্ছত্রের আশ্রয় লাভ করিয়াছিল তাহার কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় পাহাড়পুরের অসংখ্য পোড়ামাটির ফলকগুলিতে এবং সমসাময়িক ধর্মমত ও সম্প্রদায়-গুলিতে। বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্য উভয় ধর্মেই এই সময়ই আর্যেতর দেবদেবী, আচার ও সংস্কার ধীরে ধীরে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে, এবং কিছু কিছু স্বীকৃতিও লাভ করে। এই যুগের দেবদেবীর মূর্তিতত্ত্ব তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ, এবং এ-প্রমাণ অনস্বীকার্য। এই সুবৃহৎ সমন্বয় অবশ্যই সংগঠিত হইয়াছিল আর্য ব্রাহ্মণ্য স্মৃতি ও সংস্কৃতির আদর্শানুযায়ী; পাল-রাজারাও তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। ভূমি-ব্যবস্থা, উত্তরাধিকার, চাতুর্বর্ণের স্বীকৃতি, সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের স্বীকৃতি এবং প্রচলন শুধু নয়, সেই ভাষায় কাব্যময় সাহিত্য রচনা এই সমস্তই সেই আদর্শের নিঃসন্দিগ্ধ পরিচয় বহন করে। এই আর্য বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি আশ্রয় করিয়াই বাঙলাদেশ উত্তরোত্তর উত্তর ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির ক্রমবর্ধমান ধারার সঙ্গে আত্মীয়তায় যুক্ত হয়। এই সচেতন যোগ সাধন আরম্ভ হইয়াছিল গুপ্ত-আমলেই, কিন্তু পূর্ণরূপ গ্রহণ করিল পাল-আমলে; এবং বাঙলাদেশে তাহা এক বৃহত্তর সমন্বয়ের আশ্রয় হইল, আর্যেতর এবং মহাযান-বজ্রযান-তন্ত্রযান-বৌদ্ধধর্মের সংস্কার ও সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তায় যুক্ত হইয়া। এই সমন্বিত এবং সমীকৃত সংস্কৃতিই বাঙালীর সংস্কৃতির ভিত্তি, এবং ইহাও পাল-আমলের অন্যতম শ্রেষ্ঠদান। সমন্বয় এবং সমীকরণের এই রূপ ও প্রকৃতি ভারতের অন্যত্র আর কোথাও দেখা যায় না।

সামন্ততন্ত্র

কিন্তু জাতীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং সমন্বয় ও সমীকরণ পালযুগের রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধান করিতে পারে নাই। স্থানীয় প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্বের রাষ্ট্রীয় আদর্শের কথা বলিয়াছি। এই আদর্শ শুধু যে বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেই সক্রিয় ছিল তাহা নয়, সাম্রাজ্যিক গুপ্ত-আমলের পর হইতে অন্তররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও এই আদর্শ ক্রমশ কার্যকরী হইল। ইহা হইতেই সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব, এবং আগেই দেখিয়াছি মোটামুটি ষষ্ঠ শতক হইতে বাঙলা দেশেও মহারাজাধিরাজের বৃহত্তর রাজ্যের মধ্যে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত নায়ক ও সামন্ত রাজার রাজ্য ও রাষ্ট্রের বিস্তার। নিজেদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে ইঁহারা প্রায় স্বাধীন নরপতির মতনই ব্যবহার করিতেন; শুধু মৌখিকত মহারাজাধিরাজকে মানিয়া চলিতেন মাত্র। পাল-আমলে এই সামন্তপ্রথা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বাঙলাদেশেও পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছিল। বস্তুত পালরাষ্ট্রের রাষ্ট্রভিত্তিই এই সামন্ততন্ত্র, এবং এই সামন্ততন্ত্রই পাল-রাষ্ট্রের শক্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে দুর্বলতাও। বিজিত রাষ্ট্রসমূহকে মৌর্য বা গুপ্ত রাষ্ট্রের মত এই আমলে আর কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করা হইত না; বস্তুত তাহারা স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্রই থাকিত, পাল-রাষ্ট্রের সর্বাধিপত্য স্বীকার করিত মাত্র। কিন্তু এই কেন্দ্রীয় অন্তর্রাষ্ট্রেও যে অসংখ্য সামন্ত নরপতি ও নায়ক ছিলেন, পাল-লিপিমালা ও রামচরিতই তাহার প্রমাণ। উভয় ক্ষেত্রেই স্থানীয় আত্মকর্তৃত্বের আদর্শই জয়ী হইয়াছে, এ-কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র ও রাজবংশ যখন দুর্বল হইত তখন উভয়ই মস্তকোত্তলন করিত। দেবপালের মৃত্যুর পর বিজিত রাষ্ট্রসমূহ স্থানীয় আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াই পালসাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল; মহীপাল সেই সাম্রাজ্যের কতকাংশ জোড়া লাগাইয়াছিলেন, কিন্তু বেশিদিন তাহা স্থায়ী হয় নাই। বিজিত ও অবিজিত রাষ্ট্র এবং আন্তর্রাষ্ট্রের সামন্তবর্গ মহীপালের চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিল। আর, দ্বিতীয় মহীপালের বিরুদ্ধে যাঁহারা বিদ্রোহ করিয়াছিলেন তাঁহারা তো অন্তর্রাষ্ট্রেরই অনন্তসামন্ত-চক্র। আবার, রামপাল যখন বরেন্দ্রী পুনরুদ্ধার করিয়া পাল-রাজ্যের লুপ্ত গৌরব ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন তখনও তাঁহার প্রধান সহায়ক ছিলেন এই সামন্তবর্গ। আবার ইঁহারাই রামপালের মৃত্যুর পর পালরাজ্য ও রাষ্ট্রকে বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল করিয়া তাহাদের বিলুপ্তির পথে আগাইয়া দিয়াছিলেন। সামন্ত-মহাসামন্ত, মাণ্ডলিক-মহামাণ্ডলিক, মণ্ডলেশ্বর-মহামণ্ডলেশ্বর ইঁহারা সকলেই ক্ষুদ্র বৃহৎ সামন্ত, এবং অনেক রাজা-মহারাজাও সামন্ত; ইঁহাদের সাক্ষাৎ পাল-লিপিগুলিতে বরাবরই পাওয়া যায়। রাজন্, রাণক, রাজনক, রাজন্যক ইঁহারা সকলেই সামন্ত। আর সামন্ততন্ত্র যখন ছিল তখন সামন্ততান্ত্রিক বীরধর্ম এবং সেই ধর্মোদ্ভূত বীরগাথাও প্রচলিত নিশ্চয়ই ছিল। এই বীরধর্মের কতকটা পরিচয় পাওয়া যায় দেবপালের সামন্ত বলবর্মার (নালন্দা-লিপি) চরিত্রে, রামচরিতে রামপালের সামন্তদের আচরণে, ভীম-সহায়ক হরির আচরণে। আর বীরগাথার পরিচয় পাওয়া

যায় ধর্মপাল-সম্বন্ধীয় গাথায় (খালিমপুর-লিপি), উত্তর-বঙ্গের মহীপালের গানে, যোগীপাল-ভোগীপালের গীতে। সূতেরা (পরবর্তী কালের ভাট-ব্রাহ্মণেরা) যে বীরগাথা গাহিয়া বেড়াইতেন তাহার অন্তত একটি প্রমাণ পাওয়া যায় মহামাণ্ডলিক ঈশ্বরঘোষের লিপিটিতে। ঈশ্বরঘোষের বংশের প্রতিষ্ঠাতা ধূর্তঘোষের পুত্র বালঘোষ যুদ্ধব্যবসায়ী ছিলেন; তাঁহার পুত্র ধবলঘোষের বীরত্ব ও গৌরব গাথায় গীত হইত। কিন্তু এই বীরধর্ম বা স্বামীধর্ম সম্বন্ধে সবচেয়ে সুন্দর সংবাদ পাওয়া যায় বোধ হয় তৃতীয় গোপালের নিমদীঘি বা মাণ্ডা শাসনে। এই লিপিটির পাঠ নিঃসন্দিগ্ধ নয়। নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের পাঠ গ্রহণযোগ্য কিনা, এ-বিষয়ে সন্দেহ পোষণের যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান। এই পাঠ অনুযায়ী মিজং নামে গোপালের এক সামন্ত বলিতেছিলেন, "শ্রীমদ্ গোপালদেব স্বেচ্ছায় শরীর ত্যাগ করিয়া স্বর্গত হইয়াছেন এবং তাঁহার পদধূলি মিজং নামে প্রথিত আমি (হায় !) এখনও বাঁচিয়া আছি। পিতৃ আজ্ঞায় (রাজার প্রতি) প্রতিজ্ঞাবদ্ধ অসীম কৃতজ্ঞতা সম্পন্ন ঐড়দেব সেনশত্রুকে একশত তীক্ষ্ণশরদ্বারা পূরিত করিয়া আটজন সহচরসহ রাজার সহিত স্বর্গে গিয়াছেন। বৃদ্ধদ্বারা নিজের (জীবিতাবস্থা) অতিক্রম করিয়া চন্দ্রকিরণের মত অমল যশ অর্জন পূর্বক শুভদেবনন্দন (ঐড়দেব) দেবতাগণের মত ত্রিদশসুন্দরীগণের দৃষ্টি লইয়া খেলা করিতেছেন। তাঁহার (ঐড়দেবের) গীতবাদ্যপ্রিয়, ধর্মধর অমৎসর, গলবস্ত্র, দানশূর সুসংযতবেশ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা শ্রীমান্ ভাবক যজ্ঞাদি ধর্মকার্য (শ্রাদ্ধ ?) সম্পাদন করেন। শরশল্য দ্বারা পূরিত বহু প্রাণীকে (সৈন্যকে) যে স্থানে দগ্ধ করা হইয়াছিল, সেইস্থানে ভাবকদাসকৃত এই কীর্তি (মন্দির ?) বিরাজ করিতেছে। * * *"—সামন্ততান্ত্রিক স্বামীধর্ম, বীরধর্ম পালনের ইহার চেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে ? ঐড়দেব ও মিজং দুইটি নামই অ-সংস্কৃত, অন্-আর্য; দুইজনই প্রাচীন বাঙলার স্বামীধর্ম ও বীরধর্মের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। তাহা ছাড়া, সামন্ততান্ত্রিক যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য সতীদাহ প্রথাও পাল-আমলের শেষ দিকে এবং সেন আমলে প্রসার লাভ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। বৃহদ্ধর্মপুরাণ গ্রন্থে (২।৮।৩—১০) মৃত স্বামীর সঙ্গে পুড়িয়া মরিবার জন্য সমাজ-নায়কেরা দ্বিজ নারীদের পুণ্যলোভে প্রলুব্ধ করিয়াছেন। ইহার চেয়ে বীরত্ব নাকি তাঁহাদের আর কিছু নাই; সহমরণে গেলে নাকি এক পূর্ণ মন্বন্তর স্বামীসঙ্গসুখ ভোগ করা যায়! বাঙলাদেশ একাদশ-দ্বাদশ শতকেই সামন্ততন্ত্রের সব ক'টি লক্ষণ ফুটাইয়া তুলিয়াছিল, সন্দেহ নাই।

আমলাতন্ত্র

সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা যেমন প্রসারিত হইয়াছিল, তেমনই প্রসারিত হইয়াছিল আমলা বা কর্মচারীতন্ত্র। বস্তুত, পাল-যুগের লিপিমালায় রাজকর্মচারীদের যে সুদীর্ঘ

তালিকা দৃষ্টিগোচর হয় তাহা হইতে এই তথ্য সুস্পষ্ট যে, এই যুগে রাষ্ট্রের বৃহদ্বাহু সমাজের সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া বিস্তৃত। বিভিন্ন রাষ্ট্রকর্মের বিচিত্র বিভাগে বিচিত্র কর্মচারী রাষ্ট্রের প্রধান কেন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে গ্রামের হাট খেয়াঘাট পর্যন্ত বিস্তৃত। লৌকিক প্রায় সমস্ত ব্যাপারই রাষ্ট্রশাসনের গণ্ডীর অন্তর্ভুক্ত, এমন কি পারলৌকিক ধর্মাচরণ পর্যন্ত। লিপিগুলিতে এই সব বিভিন্ন বিভাগের বিচিত্র কর্মচারীর সুদীর্ঘ তালিকা দেওয়ার পরও যখন তাহা শেষ হয় নাই তখন "অন্যাংশ্চাকীর্তিতান্" বলিয়া বাকি সকলকে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। একটা বৃহৎ আমলাতন্ত্র যে পাল-যুগে গড়িয়া উঠিয়াছিল এই সব সাক্ষ্যই তাহার প্রমাণ। প্রধান প্রধান কর্মচারী, যেমন মন্ত্রী, সেনাপতি ইত্যাদির হাতে ক্ষমতাও প্রচুর কেন্দ্রীকৃত হইত অত্যন্ত স্বাভাবিক উপায়েই। এই সব কর্মচারীরাও কখনো কখনো সুযোগ পাইলে রাষ্ট্রের স্বার্থের প্রতিকূল আচরণ করিতেন না, এমন নয়। দিব্য তো একজন উচ্চ রাজকর্মচারী ছিলেন বলিয়াই মনে হয়; আর, বৈদ্যদেব তো কুমারপালের সেনাপতিই ছিলেন।

সমাজের কৃষি-নির্ভরতা

এই সামন্ততন্ত্র ও আমলাতন্ত্র অকারণে গড়িয়া উঠে নাই। এই আমলে বাঙলাদেশের সামুদ্রিক বাণিজ্যের খবর একেবারেই পাওয়া যাইতেছে না। তাম্রলিপ্তি মৃত; নূতন কোনো বন্দর গড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়া খবর নাই। বিহার-বাঙলার সঙ্গে সুমাত্রা-যবদ্বীপ-ব্রহ্মদেশ ইত্যাদি পূর্ব-দক্ষিণ এশিয়ার দেশ ও দ্বীপগুলির যোগাযোগ অব্যাহত; নালন্দায় প্রাপ্ত শৈলেন্দ্রবংশীয় বালপুত্রদেবের লিপিই তাহার অন্যতম প্রমাণ। এই সব দ্বীপ ও দেশগুলির ইতিহাসেও এই যোগাযোগের অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়; কিন্তু একটি প্রমাণও ব্যবসা-বাণিজ্যিক যোগাযোগের দিকে ইঙ্গিত করে বলিয়া মনে হয় না, সবই যেন ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধীয়। তবে আন্তর্দেশীয় ব্যবসা-বাণিজ্য অব্যাহত; লিপিগুলিতে বণিক-ব্যবসায়ী ইত্যাদির সংবাদ অপ্রতুল নয়। নানাপ্রকার কারু এবং চারুশিল্পের সংবাদও পাওয়া যাইতেছে, এবং শিল্পীদের গোষ্ঠী যে ছিল তাহার অন্তত একটি প্রমাণ আছে। জনৈক শিল্পীগোষ্ঠী-চূড়ামণি তো একজন সামন্ত বা উচ্চরাজপদও (রাণক) লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মনে হয় রাষ্ট্রে বা সমাজে শিল্পী-বণিক-ব্যবসায়ীর প্রাধান্য খুব ছিল না। তাহা ছাড়া, বর্ণ ব্রাহ্মণ্য-সমাজে তাঁহারা উচ্চস্থান অধিকার করিতেন বলিয়া মনে হয় না। রৌপ্যমুদ্রা প্রচলনের খবর যদি বা পাওয়া যাইতেছে সুবর্ণমুদ্রা একেবারে নাই। এই সব সাক্ষ্য হইতে মনে হয়, শিল্পী-বণিক-ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তি রাষ্ট্রে ও সমাজে খুব ছিল না। অথচ অন্যদিকে সমাজে ভূমি ও কৃষিনির্ভরতা ক্রমশ বাড়িয়া যাইতেছে,

তাহার প্রমাণ প্রচুর। ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়, রাজপাদোপজীবী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী (মহত্তর, কুটুম্ব প্রভৃতি) ইত্যাদি সকলেই তো ভূমিনির্ভর। তাহা ছাড়া, ক্ষেত্রকর, কৃষক, কর্ষকেরা বারবার লিপিগুলিতে উল্লিখিত হইতেছেন দেখিয়া এ-অনুমান করা চলে যে, সমাজে তাঁহাদের স্বীকৃতি বাড়িয়াছে। প্রধানত ভূমি-নির্ভর সমাজে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা কতকটা স্বাভাবিক। ভূমিই যে-সমাজে জীবিকার প্রধান উপায়, এবং ভূমির উপর ব্যক্তিগত ভোগাধিকার যেখানে স্বীকৃত, সেখানে সামন্ততান্ত্রিক ভূম্যধিকারগত সমাজ-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিবে, ইহা কিছু আশ্চর্য নয়।

এই একান্ত ভূমি-নির্ভরতার ছবি পালযুগের রাজকর্মচারীদের তালিকাটি দেখিলেও চোখে পড়ে। আশ্চর্য এই, সুদীর্ঘ তালিকাটির মধ্যে নাকাধ্যক্ষ (নৌকাধ্যক্ষ-নাবাধ্যক্ষ), শৌল্কিক (যিনি শুল্ক আদায় করেন) এবং তরিক (পারাপার-কর্তা) ছাড়া আর একটি পদও ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। এবং এই তিনটি পদও যে একান্তই ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত তাহাও বলা চলে না। অন্যদিকে সামরিক ও শাসনসংক্রান্ত কর্মচারী ছাড়া অধিকাংশ রাজপদ ভূমি ও কৃষিসম্পর্কিত।

৭

সেনায়ন

বাঙলার সেন-রাজবংশ "দাক্ষিণাত্য-ক্ষৌণীন্দ্র" এবং ব্রহ্মক্ষত্রিয় ; "কর্ণাট-ক্ষত্রিয়" বলিয়াও তাঁহারা আত্মপরিচয় দিয়াছেন। ইঁহাদের পূর্বপুরুষ বীরসেনকে চন্দ্রবংশীয় এবং পুরাণ-কীর্তিত বলিয়া দাবি করা হইয়াছে। বিজয়সেনের পিতামহ সামন্তসেন দাক্ষিণাত্যে কর্ণাট-লক্ষ্মীর লুণ্ঠনকারীদের হত্যা করিয়াছিলেন বলিয়া একটি উক্তিও সেন-লিপিতে দেখা যায়। ইহার পর সেন-রাজাদের পূর্বপুরুষ যে দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটদেশ হইতে আসিয়াছিলেন, এ-সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহ করা চলে না। কর্ণাটাগত চন্দ্রবংশীয় কোনো সেন-পরিবার রাঢ়াভূমিতে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই পরিবারে সামন্তসেনের জন্ম হয়। সামন্তসেনের বাল্য এবং যৌবন বোধ হয় কাটিয়াছিল কর্ণাটে ; দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইয়া কিছু সুখ্যাতিও তিনি অর্জন করিয়া থাকিবেন ; পরে বৃদ্ধ বয়সে রাঢ়দেশে আসিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া গঙ্গাতীরে আশ্রমবাসে দিন কাটাইয়াছিলেন।

ব্রহ্ম-ক্ষত্রি বা ব্রহ্মক্ষত্রিয় সেন-পরিবারের পূর্বপুরুষরা আগে ব্রাহ্মণ ছিলেন, পরে ব্রাহ্মণদের আচার-সংস্কার এবং জীবিকা পরিত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয়বৃত্তি গ্রহণ করেন।

সামন্তসেন নিজে ব্রহ্মবাদী ছিলেন ; তাহা ছাড়া সেন-রাজারা যে একসময় বৈদিক-যাগ-যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণ ছিলেন তাহার কিছু আভাসও সেন-লিপিতে আছে। ভারত-বর্ষের অন্যত্রও ৪।৫টি ব্রহ্মক্ষত্রিয় রাজবংশের খবর জানা যায়।

বংশপরিচয় ॥ অভ্যুদয় । পিতৃভূমি

এই ব্রহ্মক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয় বা কর্ণাট-ক্ষত্রিয় সেন-পরিবার কি করিয়া কখন বাঙলা দেশে আসিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। পালরাজাদের সৈন্যদলে (এবং বোধ হয় আমলাতন্ত্রেও) অনেক ভিন্নপ্রদেশি—খস-মালব-হূণ-কুলিক-কর্ণাট-লাট—লোক নিযুক্ত হইতেন ; কর্ণাটিরাও তাহা হইতে বাদ পড়েন নাই। কোনো সেনবংশীয় কর্ণাটী রাজকর্মচারী হয়তো ক্রমে ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়া আপন সামন্তত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকিবেন, এবং পরে পালবংশের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া নিজ আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকিবেন। অথবা, দক্ষিণাগত কোনো সমরাভিযানের সঙ্গেও এই কর্ণাটী সেন-পরিবারের বাঙলা দেশে আসা বিচিত্র নয়। কর্ণাটী চালুক্যরাজ ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য একবার উত্তর-ভারতে সমরাভিযানে আসিয়াছিলেন, এবং অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, গৌড়, মগধ, নেপাল প্রভৃতি দেশ জয় করিয়াছিলেন (১১২১, ১১২৪)। তাঁহারই এক সামন্ত আর একবার কলিঙ্গ, বঙ্গ, গুর্জর, মালব প্রভৃতি দেশ জয় করিয়াছিলেন (১১২২-২৩)। কর্ণাটী চালুক্যবংশের রাজা তৃতীয় সোমেশ্বর (১১২৭-৩৮) ও তাঁহার পুত্র সোম বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ, নেপাল, অন্ধ্র, গৌড় ও দ্রাবিড় দেশে বিজয়ী সমরাভিযানের দাবি করিয়াছেন। বস্তুত, এই বংশের রাজা প্রথম সোমেশ্বর কর্তৃক পরমাররাজ প্রথম ভোজ এবং কলচুরীরাজ কর্ণের পরাজয়ের পর হইতেই উত্তর-ভারতে কার্ণাটী প্রতাপ-প্রবাহের দ্বার উন্মুক্ত হয়। এই সব বিচিত্র কর্ণাটী সমরপ্রবাহের সঙ্গেই কর্ণাটী সেনবংশ বাঙলায় আসিয়া থাকিবেন। বস্তুত, বাঙলাদেশে যখন সামন্ত সেন-পুত্র হেমন্তসেন এবং তৎপুত্র বিজয়সেন ধীরে ধীরে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন, তখন মিথিলা ও নেপালে আর একটি কর্ণাটী সেন-বংশও ধীরে ধীরে মস্তকোত্তলন করিতেছিল ; এই বংশই নান্যদেবের বংশ। এই সময়ই কান্যকুব্জ-বারাণসীতে গাহড়-বাল রাজবংশও নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করিতেছিলেন ; ইঁহারাও কর্ণাটাগত বলিয়া কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন। লক্ষ্য করা প্রয়োজন, এই প্রত্যেকটি রাজবংশই গোঁড়া পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম, সংস্কার এবং সংস্কৃতি আশ্রয়ী।

সামন্তসেনের পুত্র হেমন্তসেন দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালে সামন্ত-চক্রের বিদ্রোহের এবং ভ্রাতৃবিরোধের সুযোগ লইয়া রাঢ়দেশ অঞ্চলে কিছু স্থানীয় সামন্তা-ধিপত্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকিবেন। তাঁহার সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় না, তবে তাঁহার পুত্র-পৌত্রদের লিপিতে তিনি মহারাজাধিরাজ আখ্যায় ভূষিত হইয়াছেন।

বিজয়সেন ॥ আ ১০৯৫-১১৫৮

হেমন্তসেনের পুত্র বিজয়সেন (আ ১০৯৫-১১৫৮) শূর-পরিবারের কন্যা বিলাস-দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রচোলের পূর্বভারতে সমরাভিযানের সময় এক রণশূর দক্ষিণ রাঢ়ের রাজা ছিলেন; আর এক শূর-নরপতি লক্ষ্মীশূরের খবর পাওয়া যায় রামচরিতে; তিনি অপর-মন্দারের (হুগলী জেলার পশ্চিমাঞ্চল) সামন্ত নৃপতি ছিলেন এবং ভীমের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রামপালকে সাহায্য করিয়াছিলেন। আর এক শূর-রাজ আদিশূর বাঙলার লোকস্মৃতিতে আজও বাঁচিয়া আছেন; কুলজী-গ্রন্থের মতে আদিশূরের নাম বাংলার কৌলিন্যপ্রথার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। শূর-পরিবারে এই বিবাহ রাঢ়দেশে বিজয়সেনের প্রভাব বিস্তারে সহায়তা করিয়া থাকিবে। কিন্তু তিনি কি করিয়া রাঢ়দেশের অন্যান্য সামন্তদের জয় করিয়াছিলেন, কি করিয়া বর্মণদের পরাজিত করিয়া পূর্ব-বঙ্গে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন এবং পাল-বংশের প্রভুত্ব হইতে উত্তর-বঙ্গ কাড়িয়া লইয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। দেওপাড়া-লিপিতে তাঁহার হস্তে গৌড়, কামরূপ এবং কলিঙ্গরাজ এবং বীর, নান্য, রাঘব এবং বর্ধন নামে কয়েকজন সামন্ত-নরপতির পরাজয়ের দাবি করা হইয়াছে। বর্ধন রামচরিতোক্ত কৌশাম্বীর (বগুড়া বা রাজসাহী জেলায়) নরপতি দ্বোরপবর্ধন: বীর কোটাটবীর নরপতি বীরগুণ হওয়া অসম্ভব নয়। ইঁহারা দুইজনই ছিলেন বরেন্দ্রীযুদ্ধে রামপালের সহায়ক। রাঘব সম্ভবত কলিঙ্গ নরপতি অনন্তবর্মণ চোড়গঙ্গের (১১৫৬-১১৭০) দ্বিতীয় পুত্র। নান্য মিথিলার কর্ণাট-বংশীয় সেন-রাজ নান্যদেব বলিয়াই মনে হয়। আর যে গৌড়পতিকে বিজয়সেন পরাজয়ের দাবি করিয়াছেন, তিনি মদনপাল হওয়াই সম্ভব। গৌড়-জয় অর্থ বরেন্দ্রী-জয়, কারণ গৌড়েশ্বর পাল-রাজাদের আধিপত্য মদনপালের সময়ে বাঙলাদেশে বরেন্দ্রীর বাহিরে আর কোথাও ছিল না। বিজয়সেন প্রদ্যুম্নেশ্বরের একটি মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন; রাজসাহী সহরের ৭।৮ মাইল পশ্চিমে পদুমসহর দীঘির পাড়ে এই মন্দিরের বিস্তৃত ধ্বংসাবশেষ এখনও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। লক্ষ্মণসেনের আগে গৌড়বিজয় বিজয়সেন বা তৎপুত্র বল্লালের ভাগ্যে সম্ভব হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না; কারণ ইঁহাদের নিজেদের লিপিতে ইঁহারা গৌড়েশ্বর উপাধি দাবি করেন নাই। লক্ষ্মণ-সেনই সর্বপ্রথম এই উপাধি-অলঙ্কার ধারণ করিয়াছেন, এবং তাহাও তাঁহার রাজত্বের শেষদিকে। বিজয়সেন বর্মণবংশীয় রাজাদের হাত হইতে (পূর্ব)-বঙ্গও কাড়িয়া লইয়াছিলেন; রাজকীয় লিপিই তাহার অকাট্য সাক্ষ্য। বস্তুত, সেন-বংশের গোড়াকার দিকে সমস্ত লিপিরই উৎস "বঙ্গে বিক্রমপুরভাগে"; এই বিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবারেই বিজয়সেন-মহিষী মহাযজ্ঞ তুলাপুরুষ মহাদান অনুষ্ঠান করেন। বিজয়সেনের কলিঙ্গ ও কামরূপ-জয়ের প্রকৃতি নির্ধারণ কঠিন; তাঁহার পৌত্র লক্ষ্মণসেনও এই দুই দেশে বিজয়ী সমরাভিযান প্রেরণের দাবি করিয়াছেন।

সেনরাজবংশ-কথার সামাজিক অর্থ

যাহাই হউক, সুদীর্ঘকাল রাজত্ব এবং রামপাল-পরবর্তী বাঙলাদেশের রাষ্ট্রীয় ভগ্নদশার সুযোগ লইয়া পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ বিজয়সেনই বাঙলার সেনবংশের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। পরস্পর ঈর্ষাপরায়ণ ও বিবদমান সামন্ত নরপতিদের অন্ধ রাষ্ট্রবুদ্ধিতে আচ্ছন্ন ও ক্লিষ্ট বাঙলাদেশ পরাক্রান্ত রাজবংশ ও রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠায় শান্তি ও স্বস্তি লাভ করিল বটে; কিন্তু এ-কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এই রাষ্ট্র ও রাজবংশ বাঙলার ও বাঙালীর নয়। কবি উমাপতি-ধর কিংবা শ্রীহর্ষ বিজয়সেনের, কিংবা পরবর্তী সভাকবিরা সেন রাজাদের স্তুতি ও চাটুবাদে যতই উচ্ছ্বসিত হইয়া থাকুন না কেন—রাষ্ট্র বা রাজপ্রসাদপুষ্ট কবিরা তো তাহা হইয়াই থাকেন—সমসাময়িক বাঙালী জনসাধারণ এই রাজবংশকে আপনার জন বলিয়া মনে করিয়াছিল, এমন কোনো প্রমাণ বা ইঙ্গিত কোথাও পাওয়া যায় না। গোপাল বাঙালী ছিলেন, পালবংশের পিতৃভূমি বাঙলাদেশ; সেই হিসাবে পাল-রাজারা যতটা বাঙালী জনসাধারণের হৃদয়ের নিকটবর্তী ছিলেন, সেন-রাজারা তাহা হইতে পারেন নাই। তারনাথের আমলে যে-ভাবে গোপাল-নির্বাচনের কাহিনী লোকস্মৃতিতে বিধৃত ছিল, ধর্মপালের যশ যেভাবে দোকানে-চত্বরে জনসাধারণের কণ্ঠে গীত হইত, মহীপাল-যোগীপাল-ভোগীপালের গানের স্মৃতি যে-ভাবে বাঙালী জনসাধারণ আজও ধারণ করে, বহুদিন পর্যন্ত লোকে যে-ভাবে 'ধান ভানতে মহীপালের গীত' গাহিত, বল্লালসেন ছাড়া সেন-রাজাদের কাহারও সে-সৌভাগ্য হয় নাই। এই তথ্যের ঐতিহাসিক ইঙ্গিত অবহেলার জিনিস নয়। সেন-রাজাদের মহিমা যাহা যতটুকু গীত হইয়াছে তাহা সভাকবিদের কণ্ঠে; যেটুকু তাঁহাদের স্মৃতি আজও জাগরূক, তাহা ব্রাহ্মণ্যস্মৃতিশাসিত সমাজের উচ্চতর শ্রেণীগুলিতে মাত্র; এ-তথ্যও ঐতিহাসিকদের বিচারের বস্তু। গোপাল বা ধর্মপাল-দেবপাল-মহীপালের সঙ্গে বিজয়-বল্লাল-লক্ষ্মণের তুলনা নিরর্থক এবং অনৈতিহাসিক। পালবংশকে বাঙালী ভালবাসিয়াছিল, এবং তাঁহাদের গৌরবকে নিজেদের জাতীয় গৌরব বলিয়া মানিয়া লইয়াছিল; বাঙলাদেশে তাহার প্রমাণ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। বল্লাল ব্যতীত সেন-রাজাদের একজনের সম্বন্ধেও একথা বলা চলে কি না সন্দেহ। একটি লোকগীতিও সেন-রাজাদের কাহারও নামে রচিত হয় নাই; বাঙলা সাহিত্যে লোকস্মৃতিতে সেন-রাজারা বাঁচিয়া নাই।

বল্লালসেন ॥ আ ১১৫৮-১১৭৯

বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেন (আ ১১৫৮-১১৭৯) একবার গৌড় আক্রমণ ও জয় করিয়াছিলেন, বোধহয় গোবিন্দপালের আমলে। বল্লালের অদ্ভুতসাগর-গ্রন্থে এই গৌড়-বিজয়ের একটু ইঙ্গিত আছে। বল্লাল-চরিত গ্রন্থে তাঁহার মগধ ও মিথিলায় বিজয়ী সমরাভিযানের ইঙ্গিত পাওয়া যায়; কিন্তু এই দুই শতক পরবর্তী গ্রন্থের সাক্ষ্য কতখানি

প্রামাণিক বলা কঠিন। তবে, মিথিলা অধিকার একেবারে অমূলক না-ও হইতে পারে। যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে বল্লালের সময় বঙ্গ, রাঢ় বরেন্দ্রী এবং মিথিলা সেনরাজ্যভুক্ত ছিল ; আর একটি ছিল বাগড়ী (সুন্দরবন-মেদিনীপুর অঞ্চল)। বল্লাল কর্ণাট-চালুক্যরাজ দ্বিতীয় জগদেকমল্লের কন্যা রামদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। অদ্ভুতসাগর-গ্রন্থ সমাপনের (আরম্ভ শকাব্দ ১০৯০) আগেই বল্লালসেন পুত্র লক্ষ্মণসেনের স্কন্ধে রাজ্যভার এবং গ্রন্থ-সমাপনভার অর্পণ করিয়া সপত্নীক গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে (ত্রিবেণীতে ?) নিরঞ্জরপুরে গমন করেন। ইহার অর্থ হয়তো তিনি সপত্নীক গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে নিরঞ্জরপুর নামক স্থানে বানপ্রস্থে গিয়াছিলেন, অথবা গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে দুইজনেই জলে ঝাঁপ দিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মণসেন ॥ আ ১১৭৯-১২০৫

লক্ষ্মণসেন যখন সেন-সিংহাসনে আরোহণ করিলেন তখন তিনি প্রায় ষাট বৎসরের পরিণত প্রৌঢ়। পিতামহ বিজয়সেনের আমলেই গৌড়-কলিঙ্গ-কামরূপের রণ-ক্ষেত্রে তিনি শৌর্য-বীর্য প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয় ; তাঁহার রাজত্বকালে এই তিনটি দেশই যে সেন-রাজ্যভুক্ত হয়, এ-সম্বন্ধে নিঃসংশয় লিপিপ্রমাণ বিদ্যমান। তাঁহার পুত্রদের লিপিতে বলা হইয়াছে লক্ষ্মণসেন পুরী, বারাণসী ও প্রয়াগে বিজয়স্তম্ভ প্রোথিত করিয়াছিলেন। পুরী-জয়ের ইঙ্গিত বোধ হয় কলিঙ্গ-জয়ের মধ্যেই পাইতেছি। কাশী-জয়ের সুস্পষ্ট উল্লেখ লক্ষ্মণসেনের নিজের লিপিতেই আছে। পশ্চিমে তাঁহার রাজত্ব প্রয়াগ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া মনে হইতেছে। শেষ পালরাজ গোবিন্দপালের পর মগধাঞ্চল গাহড়বাল-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল ; বিজয়-সেন এই অঞ্চল সেন-রাজ্যভুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে-চেষ্টা খুব সার্থক হয় নাই। ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দেও বুদ্ধগয়া অঞ্চল গাহড়বালদের অধিকারে ছিল বলিয়া লিপিপ্রমাণ বিদ্যমান। কাশীও গাহড়বালদের অধীনেই ছিল, এবং যে-কাশীরাজকে লক্ষ্মণসেন পরাজয়ের দাবি করিয়াছেন তিনি নিশ্চয়ই গাহড়বাল-রাজ জয়চন্দ্র। লক্ষ্মণসেন প্রয়াগ পর্যন্ত দেশ গাহড়বালদের করচ্যুত করিয়াছিলেন কিনা বলা কঠিন ; তবে, মুসলমান-বিজয় পর্যন্ত গয়া অঞ্চল যে লক্ষ্মণসেনের আধিপত্যের অন্তর্গত ছিল অশোকচল্লের দুইটি লিপিই তাহার প্রমাণ। বারাণসী-প্রয়াগেও হয়তো একবার তিনি বিজয়ী সমরাভিযান করিয়া থাকিবেন। লক্ষ্মণসেনের মগধাধিকার এবং প্রয়াগ পর্যন্ত সমরাভিযান গাহড়বালশক্তিকে দুর্বল করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। এই রাজ্যই ছিল ক্রমাগ্রসরমান মুসলমানদের বিরুদ্ধে শেষ প্রতিরোধ-প্রাচীর ; সেই প্রাচীরকে দুর্বল করিয়া লক্ষ্মণসেন রাষ্ট্র ও সমরবুদ্ধির কতটুকু পরিচয় দিয়াছিলেন, এ-সম্বন্ধে ঐতিহাসিকের প্রশ্ন অনিবার্য। এ-তথ্য সুবিদিত যে, মুহম্মদ বখ্‌তিয়ার খিল্‌জি প্রায় বিনা বাধায় সমস্ত বিহার ও বাঙলা জয় করিয়াছিলেন ; গাহড়বাল

রাজশক্তির প্রতিরোধ-প্রাচীর ভাঙিয়া পড়ার পর আর কোনো বাধাই তাঁহার সম্মুখে উত্তোলিত হয় নাই। যে অস্ত্র ও সৈন্যবল কামরূপ-কাশী-কলিঙ্গ জয় করিয়াছিল সেই অস্ত্র ও সৈন্যবল কোথায় আত্মগোপন করিয়াছিল?

যাহা হউক, লক্ষ্মণসেন যে-রাজ্য ও রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, সেই রাজ্য ও রাষ্ট্র ভিতর হইতে আপনি দুর্বল ও ক্ষীণ হইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। স্থানীয় আত্ম-কর্তৃত্বের যে-ব্যাধি পাল-রাষ্ট্রকে ভিতর হইতে দুর্বল করিয়া দিয়াছিল, সেন-রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। এই ব্যাধিরই এক রাষ্ট্রীয় রূপ সামন্ততন্ত্র।

শ্রীডোম্মনপাল ॥ রণবঙ্কমল্ল হরিকালদেব

সুন্দরবন অঞ্চলে (পূর্ব-খাটিকা) এক পরমমহেশ্বর মহামাণ্ডলিকের পুত্র মহা-রাজাধিরাজ শ্রীডোম্মনপাল প্রধান হইয়া উঠিয়া স্বাধীন রাজ্যখণ্ড প্রতিষ্ঠা করিলেন (১১৯৬)।

এই সময়ই বোধ হয় অথবা অব্যবহিত পরই ত্রিপুরা অঞ্চলে পট্টিকের-রাজ্য আবার কতকটা প্রাধান্য লাভ করে, এবং রণবঙ্কমল্ল হরিকালদেব নামে এক নরপতি সেখানে স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করেন (১২০৪-১২২০)। বর্তমান কুমিল্লা সহরের পাঁচ মাইল পশ্চিমে ময়নামতী পাহাড় অঞ্চলেই ছিল বোধ হয় তাঁহার রাজধানী। প্রাচীন পট্টিকেরা, ব্রহ্ম-দেশীয় ইতিকথার পটিক্কর-পটেইক্কর, আদি ব্রিটিশযুগের পাটিকেরা-পাইটকেরা পরগণা এবং বর্তমান পাইটকারা-পাটিকেরা এক এবং অভিন্ন।

দেববংশ

মেঘনার পূর্বতীরে আর একটি নূতন স্বাধীন স্বতন্ত্র রাজবংশও এই সময়ই গড়িয়া উঠিল। এই বংশ দেববংশ নামে (দেবান্বয়গ্রামণী) ইতিহাসে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। দ্বাদশ শতকের শেষে বা ত্রয়োদশ শতকের গোড়াতেই পুরুষোত্তমদেবের পুত্র মধুমথন বা মধুসূদনদেব প্রথম স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিয়া রাজা আখ্যা গ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র বাসুদেব; বাসুদেবের পুত্র দামোদরদেবই এই বংশের পরাক্রান্ত নরপতি (১২৩১-১২৪০)। "অরিরাজ চানূর-মাধব-সকল-ভূপতিচক্রবর্তী"-দামোদর বর্তমান ত্রিপুরা-নোয়াখালি-চট্টগ্রামে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, এ-সম্বন্ধে লিপি-প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু পরবর্তীকালে এই বংশের আর এক রাজা দশরথদেব তাঁহার রাজ্য আরও বিস্তৃত করিয়াছিলেন, এবং বিক্রমপুরে রাষ্ট্রকেন্দ্র গড়িয়া ঢাকা অঞ্চলও তাঁহার রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু, সে-কথা পরে বলিতেছি।

গুপ্তবংশ

বাঙলার বাহিরে, গুপ্ত-উপান্তনামা এক গুপ্ত-বংশ মুঙ্গের অঞ্চলে সেনবংশের মহামাণ্ডলিক সামন্ত ছিলেন বলিয়া মনে হয়। ইঁহাদের রাষ্ট্রকেন্দ্র ছিল মুঙ্গের জেলার লখীসরাইর নিকট জয়নগর (প্রাচীন জয়পুর) নামক স্থানে। এই বংশের রাজা "পরমমাহেশ্বর বৃষভধ্বজ...পরমেশ্বর" কৃষ্ণগুপ্ত ও তাঁহার পুত্র সংগ্রামগুপ্ত স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিয়াছিলেন লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালেই।

অনৈক্য ও বৈষম্যমূলক স্থানীয় আত্মকর্তৃত্ব ব্যাধির এই সব দুর্লক্ষণ যখন ধীরে ধীরে রাষ্ট্রকে ভিতর হইতে দুর্বল করিতেছিল, তখন অন্যদিকে পশ্চিম হইতে ক্রমাগ্রসরমান মুসলমান রাজশক্তি পূর্বদিকে লুব্ধ বাহু বাড়াইয়া দিতেছিল। কুতব্-উদ্-দীন্ তখন দিল্লীর তক্তে আসীন। উত্তর-ভারতের হিন্দুরাষ্ট্রশক্তি তখন একে একে সকলই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে; রাষ্ট্রীয় শান্তি ও শৃঙ্খলা বলিতে বিশেষ কিছু নাই। স্থানীয় রাষ্ট্রকর্তৃত্ব ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হিন্দু ও তুরুষ্ক সামন্তদের করকবলে, কিন্তু দুর্ধর্ষ পরাক্রান্ত শত্রুকে ঠেকাইয়া রাখিবার শক্তি কাহারও নাই। এই ধরনের বিশৃঙ্খল রাষ্ট্রীয় অবস্থায় মুসলমান অভিযাত্রীর রাষ্ট্রীয় ও সামরিক প্রতাপকে আশ্রয় করিয়া সেনাপতিদের সামরিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তি খুঁজিয়া বেড়াইবে, ইহা কিছু বিচিত্র নয়।

বখ্ত্-ইয়ারের বঙ্গ-বিহার জয় ॥ ১২০১ খ্রীষ্টাব্দ

এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভাগ্যান্বেষীদের মধ্যে তুর্ক জাতীয় যুদ্ধব্যবসায়ী মুহম্মদ বখ্ত্-ইয়ার খিল্জী অন্যতম। দিল্লীর তক্ত তাঁহাকে বিহার ও বাঙলাদেশ জয় করিবার জন্য আদেশ করে নাই; বখ্ত্-ইয়ার স্বেচ্ছায় তাঁহার সৈন্যদল লইয়া বিহারে-বাঙলায় ভাগ্যান্বেষণে অগ্রসর হইয়াছিলেন। বখ্ত্-ইয়ার কর্তৃক বিহার-বাঙলা জয়ের কাহিনী লক্ষ্মণসেনের পক্ষ হইতে কেহ লিখিয়া রাখে নাই। সভাকবি শরণ অবশ্য লক্ষ্মণসেন কর্তৃক একবার এক ম্লেচ্ছরাজের পরাজয়ের কথা ইঙ্গিত করিয়াছেন; হইতে পারে এই ম্লেচ্ছরাজ বখ্ত-ইয়ার। অথবা এমনও হইতে পারে, বখ্ত্-ইয়ারের বঙ্গবিজয়ের পর লক্ষ্মণসেন যখন বিক্রমপুর অঞ্চলে রাজত্ব করিতেছিলেন তখন লখ্নৌতি বা লক্ষ্মণাবতীর কোনো সুলতানের সঙ্গে সেনরাজের সংঘর্ষ হইয়া থাকিতে পারে; কবি শরণ সেন-রাজ কর্তৃক সেই যুদ্ধজয়েরই ইঙ্গিত করিয়া থাকিবেন। শরণ-রচিত শ্লোকটি উদ্ধার করিতেছি। এই শ্লোকে ম্লেচ্ছবিনাশ ছাড়া লক্ষ্মণসেনের অন্যান্য দেশ জয়ের ইঙ্গিতও আছে।

> ভ্রূক্ষেপাদ্ গৌড়লক্ষ্মীং জয়তি বিজয়তে কেলিমাত্রাৎ কলিঙ্গান্
> চেতশ্চৌদক্ষিতীন্দোস্তপতি বিতপতে সূর্যবদ্ দুর্জনেষু।
> স্বেচ্ছাম্লেচ্ছান্ বিনাশং নয়তি বিনয়তে কামরূপাভিমানং
> কাশীভর্তুঃ প্রকাশং হরতি বিহরতে মূর্ধ্নি যো মাগধস্য ॥

লক্ষ্মণসেন কর্তৃক গৌড়, কলিঙ্গ, চেদি, কামরূপ, কাশী ও মগধে যুদ্ধজয়ের কথা লক্ষ্মণ-সেনের লিপি-সাক্ষ্যে এবং অন্যতম সভাকবি উমাপতি-ধরের বিচ্ছিন্ন দুইটি শ্লোকেও পাওয়া যায় ; কাজেই তাঁহার ম্লেচ্ছ-বিনাশের কথা অস্বীকার করার কোনো কারণ নাই। ইঁহারা—শরণ বা উমাপতি-ধর—লক্ষ্মণসেনের নাম করিতেছেন না সত্য, তবে যেহেতু তাঁহারা লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ছিলেন এবং যে-সব বিজয়কীর্তির উল্লেখ তাঁহারা করিতেছেন সেগুলি লক্ষ্মণসেনের সঙ্গেই যুক্ত সেই হেতু এ-সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশের কোনো অবসর নাই। কিন্তু, উমাপতি-ধর যে-শ্লোকে লক্ষ্মণসেনের সঙ্গে ম্লেচ্ছ সংঘর্ষের ইঙ্গিত করিয়াছেন, সেই শ্লোকেই তিনি ম্লেচ্ছ রাজার সাধুবাদও করিয়াছেন এবং তাহা প্রায় হাস্যকর স্তুতিবাক্যে!

সাধু ম্লেচ্ছ নরেন্দ্র সাধু ভবতো মাতৈব বীরপ্রসূর্
নীচেনাপি ভবদ্বিধেন বসুধা সুক্ষত্রিয়া বর্ততে।
দেবে কুপ্যতি যস্য বৈরিপরিষন্মারাঙ্কমল্লে পুরঃ
শস্ত্রং শস্ত্রমিতি স্ফুরন্তি রসনাপত্রান্তরালে গিরঃ॥

ম্লেচ্ছরাজ! সাধু, সাধু! আপনার মাতাই (যথার্থ) বীরপ্রসবিনী; নীচ (বংশোদ্ভব) হইলেও আপনার মত লোকের জন্যই বসুধা এখনও সুক্ষত্রিয় আছে: (যেহেতু) মারাঙ্কমল্লদেব (লক্ষ্মণসেন) যখন সম্মুখ (যুদ্ধে) শত্রুসৈন্য ধ্বংস করিতেছিলেন তখন আপনার রসনারূপ পত্রান্তরাল হইতে শস্ত্র, শস্ত্র. এই বাক্য নির্গত হইতেছিল।

পর পর তিনটি রাজার রাজসভাকবি, বৃদ্ধ না হউন অন্তত প্রৌঢ় উমাপতি-ধর কি বখ্‌ত্‌-ইয়ার কর্তৃক নবদ্বীপজয়ের পর সেন-রাজসভা পরিত্যাগ করিয়া নিজের ভক্তি ও স্তুতি অর্পণ করিবার পাত্র পরিবর্তন করিয়াছিলেন, এবং ম্লেচ্ছরাজকেই সেই পাত্র বলিয়া নির্বাচন করিয়াছিলেন! সভাকবি সভাকবিই থাকিয়া গিয়াছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু সেন-রাষ্ট্র, সেন-রাজসভা, সেই সভার অলংকার কবি ও পণ্ডিত, এবং সমসাময়িক কাল ও সমাজের উপর ইহা যে কত বড় কটাক্ষ, উমাপতি-ধর কি তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন?

যাহাই হউক, লক্ষ্মণসেনের সঙ্গে ম্লেচ্ছদের (তুরুষ্কদের) একটা সংঘর্ষ হইয়াছিল, এবং সে-সংঘর্ষে সেন-রাজ জয়ী হইয়াছিলেন এ-সম্বন্ধে সন্দেহ নাই; তবে তাহা নবদ্বীপ জয়ের আগে না পরে, ঐতিহাসিক গবেষণার বর্তমান অবস্থায় তাহা বলা কঠিন। আমার মনে হয়, নবদ্বীপ জয়ের অব্যবহিত পরে।

নবদ্বীপ-জয় সম্বন্ধে মুসলমান অভিযাত্রীদের পক্ষে এ-বিষয়ে বিস্তৃত সাক্ষ্য উপস্থিত, এবং এই সাক্ষ্য দিতেছেন ঘটনার প্রায় ৫০ বৎসর পর দিল্লীর ভূতপূর্ব প্রধান কাজী মৌলানা মিনহাজ-উদ্-দীন। তিনি লখ্‌নৌতিতে দুই বৎসর কাটাইয়াছিলেন এবং সেখানে দুইটি বৃদ্ধ মুসলীম সৈন্যের মুখে বখ্‌ত্‌-ইয়ারের বিহার-বিজয় কাহিনী এবং অন্যান্য "বিশ্বস্ত" লোকের মুখে বঙ্গ-বিজয় কাহিনী শুনিয়াছিলেন। তিনি এই দুই দেশ

বিজয় সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত সারমর্ম জানা প্রয়োজন। বখ্‌ত্‌-ইয়ারের আক্রমণের সময় সেনরাজ লক্ষ্মণসেন (রায় লখ্‌মনিয়া) নুদীয়া (নদীয়া=নবদ্বীপ) রাজধানীতে বাস করিতেছিলেন।

বর্তমান চুনারের ১১ মাইল পূর্বে ভুইলি গ্রাম; এই গ্রামই ছিল বখ্‌ত্‌-ইয়ারের জায়গীরের কেন্দ্রভূমি। গাহড়বাল-সামন্তরাজদের পরাভূত করিয়া বখ্‌ত্‌-ইয়ার মুনের ও বিহার অঞ্চলের নানা জায়গায় লুঠতরাজ আরম্ভ করিয়া দিলেন এবং তাহারই লোভে প্রচুর খিল্‌জি ও তুর্কী দস্যুব্রতী তাঁহার সামন্তদণ্ডের চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। উত্তর-বিহারে মিথিলাকে আশ্রয় করিয়া তখন হিন্দু কর্ণাটক রাজবংশের আধিপত্য; কনৌজের সিংহাসনে তখনও জয়চন্দ্রপুত্র হরিশচন্দ্র আসীন; রোহ্‌তস্‌ অঞ্চলের হিন্দু মহানায়কেরা তখনও নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রাখিয়াছেন; বিহারে শোননদীর তীরবর্তী অঞ্চলে নবনেয়াপত্তনের সামন্তদের আধিপত্য বিদ্যমান। এই সব হিন্দুরাজশক্তিকে উৎখাত করা বা দেশব্যাপী বিরাট চাঞ্চল্য সৃষ্টি করা বখ্‌ত্‌-ইয়ারের উদ্দেশ্য ছিল না। কাজেই রাজশক্তি যেখানে শিথিল বা প্রায় অনুপস্থিত, সেই সব স্থান লুণ্ঠন ও অধিকার করাই হইল তাঁহার উদ্দেশ্য। বৎসর দুই এই ভাবে কাটাইবার পর বখ্‌ত্‌-ইয়ার হঠাৎ একদিন হিসার-ই-বিহার বা বিহার-দুর্গ আক্রমণ এবং অধিকার করিয়া বসিলেন এবং তাহার অধিবাসীদের প্রায় সকলকেই হত্যা করিলেন, প্রচুর ধনরত্ন লুটিয়া লইলেন এবং প্রচুর গ্রন্থ পোড়াইলেন (১১৯৯)। বস্তুত, যে দুর্গ-নগরটি তিনি অধিকার করিলেন তাহা দুর্গই নয়, এক বিরাট বৌদ্ধ-বিহার, এবং এই বিহারই প্রখ্যাত ঔদণ্ড্‌ বা ওদণ্ডপুর বিহার; যে-অধিবাসীদের তিনি হত্যা করিলেন তাঁহারা সকলেই মুণ্ডিতশির বৌদ্ধ ভিক্ষু। এই বিহার হইতেই বর্তমান বিহার জনপদের নামকরণ। এই জনপদে এক সময় বৌদ্ধবিহারও ছিল অনেকগুলি।

ওদণ্ডপুর-বিহার ধ্বংসের প্রায় এক বৎসর পর দ্বিতীয়বার বখ্‌ত্‌-ইয়ার বিহারে সমরাভিযানে আসেন এবং নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করেন (১২০০ খ্রী)। প্রসিদ্ধ কাশ্মীরী বৌদ্ধ ভিক্ষু ও আচার্য শাক্যশ্রীভদ্র এই সময় মগধে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন; তিনি দেখিয়াছিলেন ওদণ্ডপুরী ও বিক্রমশীলা বিহার তখন ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। তিনি নিজেও তুর্কীদের নিষ্ঠুর অত্যাচারে ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া পলাইয়া গিয়াছিলেন জগদ্দলবিহারে।

যাহাই হউক, ইতিমধ্যে বিহার-ধ্বংস ও মগধাধিকারের সংবাদ নদীয়ার রায় লখ্‌মনিয়ার এবং তাহার কর্মচারীদের কর্ণগোচর হয়। রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তি, মন্ত্রীবর্গ এবং জ্যোতিষীরা তখন লক্ষ্মণসেনকে পরামর্শ দিলেন, তুর্কী আক্রমণকে বাধা দিয়া কাজ নাই, দেশ পরিত্যাগ করাই যুক্তিযুক্ত, কারণ শাস্ত্রে লেখা আছে, এই দেশ

তুর্কীদের দ্বারা বিজিত হইবে। খোঁজ লইয়া জানা গেল, তুর্কী অভিযাত্রীটির চেহারা একেবারে শাস্ত্রের বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়া যাইতেছে! রায় লখ্‌মনিয়া মন্ত্রী ও জ্যোতিষী-বর্গের পরামর্শ গ্রহণ করিলেন না। অধিকাংশ ব্রাহ্মণ ও বণিকেরা পূর্ববঙ্গে, আসামে ও অন্যান্য স্থানে পলাইয়া গেলেন; রায় লখমনিয়া পলাইলেন না। ইহার (মগধ-জয়ের) পর বৎসরই (১২০১) বখ্‌ত্‌-ইয়ার একদল সৈন্য গঠন করিয়া বিহার-সরিফ হইতে গয়া ও ঝাড়খণ্ড জনপদের ভিতর দিয়া নদীয়ার দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার অধিকাংশ সৈন্য রহিল পশ্চাতে। একদিন বেলা দ্বিপ্রহরে তিনি আঠারোজন অশ্বারোহী সৈন্যমাত্র লইয়া ধীরে ধীরে পথ অতিক্রম করিয়া একেবারে রাজপ্রাসাদের দ্বারে আসিয়া পৌঁছিলেন; অশ্ববিক্রেতা মনে করিয়া কোথাও কেহ তাঁহাকে বাধা দিল না। প্রাসাদের ভিতরে ঢুকিয়াই বখ্‌ত্‌-ইয়ার ও তাঁহার সঙ্গীরা তরবারী উন্মুক্ত করিয়া লোকেদের মুণ্ডচ্ছেদ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন দ্বিপ্রহর, রায় লখ্‌মনিয়া ভোজনে বসিয়াছেন; এমন সময় প্রাসাদের দরজা এবং নগরের মধ্যস্থল হইতে তুমুল আর্তনাদ ও কোলাহল উত্থিত হইল। ততক্ষণ বখ্‌ত্‌-ইয়ারের বাকী সৈন্যদলের একটি বৃহৎ অংশ নগরের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িয়াছে এবং বোধ হয় নগর অবরুদ্ধও হইয়া গিয়াছে। ব্যাপার যে কি তাহা রায় লখ্‌মনিয়া বুঝিবার আগেই বখ্‌ত্‌-ইয়ার রাজপ্রাসাদে ঢুকিয়া পড়িয়াছেন; অনেক লোক তাঁহার তরবারীর আঘাতে প্রাণও দিয়াছে। উপায়ান্তর না দেখিয়া রায় লখ্‌মনিয়া প্রাসাদের পশ্চাত দ্বার দিয়া নগ্নপদে সংকনাট এবং বংগ্‌ অভিমুখে পলাইয়া গেলেন। সমস্ত সৈন্যদল আসিয়া যখন নদীয়া এবং তাহার পার্শ্ববর্তী সমস্ত স্থান অধিকার করিল, বখ্‌ত্‌-ইয়ার তখন সেইখানে (প্রাসাদে ?) শিবির স্থাপন করিলেন। রায় লখ্‌মনিয়া (পূর্ব)-বঙ্গে আরও কিছুকাল রাজত্ব করিবার পর লোকান্তর গমন করেন। মিনহাজের তবকাত্‌-ই-নাসিরী রচনার কালেও (১২৬০'র পরও) রায় লখ্‌মনিয়ার বংশধরেরা (পূর্ব)-বঙ্গে রাজত্ব করিতেছিলেন। রায় লখ্‌মনিয়ার প্রাসাদ ও নগর অধিকারের পর বখ্‌ত্‌-ইয়ার কয়েকদিন ধরিয়া নদীয়া বিধ্বস্ত করিয়া গৌড়-লখনৌতিতে ফিরিয়া গিয়া নিজ শাসনকেন্দ্র স্থাপন করিলেন। ইহার পর তিনি মহোবায় গিয়া কুত্‌ব-উদ্‌-দীনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কয়েক বৎসর পর (১২০৬) তিনি তিব্বত-জয়ের জন্য দশহাজার অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া এক সমরাভিযানে গিয়াছিলেন; মিনহাজ এই অভিযানের বিবরণও রাখিয়া গিয়াছেন। বখ্‌ত্‌-ইয়ার তিব্বত পর্যন্ত অগ্রসরই হইতে পারেন নাই; মধ্যপথেই নানাভাবে লাঞ্ছিত ও পর্যুদস্ত হইয়া তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। মিনহাজ কথিত তিব্বতাভিযানের একটু পরোক্ষ সমর্থন বোধ হয় পাওয়া যায় কামরূপের একটি লিপিতে। লিপিটি গৌহাটির নিকটে ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরে কানাইবরশীবোয়া নামক স্থানে একটি পাষাণগাত্রে খোদিত; ইহার পাঠ এইরূপ: "শাকে ১১২৭ (২৭ মার্চ, ১২০৬ আনুমানিক) শাকে তুরগযুগ্মেশে মধুমাস ত্রয়োদশে। কামরূপং

সমাগত্য তুরুষ্কাঃ ক্ষয়মাযযুঃ ॥" আবার, এমনও হইতে পারে তুরস্কগণ কর্তৃক তিব্বত ও কামরূপাভিযান দুই পৃথক অভিযান।

মিন্‌হাজ্‌-বিবরণের সামাজিক পটভূমি

ইহাই বখ্‌ত্‌-ইয়ারের অষ্টাদশ অশ্বারোহী সৈন্য কর্তৃক বিহার, গৌড় ও বরেন্দ্রী বিজয়ের প্রায় ঔপন্যাসিক কাহিনী। প্রথমত, মিন্‌হাজ পঞ্চাশ বৎসর পর যাঁহাদের মুখ হইতে শুনিয়া এই কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের স্মৃতিশক্তি এবং বিশ্বস্ততা কতটুকু নির্ভরযোগ্য, বলা কঠিন। দ্বিতীয়ত, বিহার-নগর ধ্বংস করিবার পর এবং দিল্লী হইতে বখ্‌ত্‌-ইয়ারের ঘুরিয়া আসিয়া সেই দেশ অধিকারের ভিতর লক্ষ্মণসেন সময় যথেষ্ট পাইয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যে কি লক্ষ্মণসেন নিজ রাজ্য রক্ষার কোনও ব্যবস্থাই করেন নাই? মগধ-জয়ের পরও এক বৎসর না হউক, অন্তত কিছু সময় তো সেন-রাষ্ট্র নিশ্চয়ই পাইয়াছিল; সেই সময়ের মধ্যেও কি লক্ষ্মণসেন শত্রু-প্রতিরোধের কোনো ব্যবস্থাই করেন নাই? যে অস্ত্র ও সৈন্যবল, যে শৌর্য-বীর্য কাশী-কলিঙ্গ-কামরূপ জয় করিয়াছিল তাহারা কোথায় আত্মগোপন করিয়াছিল? মগধরাজ্যের পশ্চিম সীমা হইতে আরম্ভ করিয়া নদীয়া পর্যন্ত কোথাও কি লক্ষ্মণসেন নিজের রাজ্য ও রাষ্ট্ররক্ষার জন্য কোনো প্রতিরোধ দান করেন নাই? নদীয়ার রাজপ্রাসাদ রক্ষারও কি কোনো ব্যবস্থাই ছিল না? এ-সব সহজ ও স্বাভাবিক প্রশ্নের কোনও উত্তরই মিন্‌হাজের বিবরণীতে নাই। তৃতীয়ত, মিন্‌হাজ অলৌকিক গালগল্পেও আস্থা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন; লক্ষ্মণসেনের জন্মকাহিনীই তাহার প্রমাণ। বিহার-বঙ্গবিজয় কাহিনীতেও এই ধরনের প্রচলিত গালগল্প কিছু ঢুকিয়া পড়ে নাই, এ-কথাই বা কি করিয়া বলা যাইবে?

মিন্‌হাজ-বিবরণ রচনার এক শতকের মধ্যে ইসমী নামে এক ঐতিহাসিক ফুতুহ্-উস্-সালাতিন্ নামক গ্রন্থে নদীয়া-অধিকারের আর একটি বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। মিন্‌হাজ ও ইসমীর বিবরণ দুইটির বঙ্গানুবাদ পাশাপাশি উদ্ধার করা যাইতে পারে।

> মিন্‌হাজ বলিতেছেন, "ইহার পর (মগধ অধিকারের) দ্বিতীয় বৎসরে বখ্‌ত্‌-ইয়ার তাঁহার সৈন্যগঠন করিয়া বিহার (বিহার-সরিফ) হইতে যাত্রা করিলেন; এবং সহসা নদীয়ায় প্রবেশ করিলেন, এত সহসা এবং দ্রুত যে, তাঁহার অশ্বারোহী-দের ভিতর ১৮ জন ছাড়া আর কেহ তাঁহার সঙ্গে তাল রাখিতে পারিল না; বাকী সকলে পিছন পিছন অগ্রসর হইতে লাগিল। নগরের দ্বারে পৌঁছিয়া তিনি কাহারও উপর কোনো অত্যাচার করিলেন না, বরং নীরবে এবং বিনীতভাবে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; কেহই সন্দেহও করিতে পারিল না যে, ইনিই বখ্‌ত্‌-ইয়ার; বরং সকলেই ভাবিল, এই আগন্তুকেরা বোধহয় ব্যবসায়ী এবং মহার্ঘ অশ্ববিক্রয়

উদ্দেশ্যেই ইহাদের আগমন। বখ্‌ত্-ইয়ার রাজপ্রাসাদের দ্বারে আসিয়াই কোষ হইতে তরবারী উন্মুক্ত করিলেন, এবং বিধর্মীদের হত্যা শুরু করিয়া দিলেন। তখন দ্বিপ্রহর ; রায় লখ্‌মনিয়া ভোজনে বসিয়াছেন, এমন সময় সহসা রাজপ্রাসাদের দ্বার হইতে এবং নগরের কেন্দ্রস্থল হইতে তুমুল আর্তনাদ উত্থিত হইল। (লক্ষ্মণসেন) ব্যাপার কি বুঝিবার আগেই বখ্‌ত্-ইয়ার প্রাসাদের ভিতর এবং অন্তঃপুরে ঢুকিয়া পড়িলেন, এবং নরহত্যা আরম্ভ করিয়া দিলেন। রায় তখন নগ্নপদে প্রাসাদের পশ্চাৎ দ্বার দিয়া পলাইয়া গেলেন।...

ইসমীও বলিতেছেন, বখ্‌ত্-ইয়ার অশ্ববিক্রেতার ছদ্মবেশেই নদীয়ায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। নগরে প্রবেশ করিয়া তিনি লক্ষ্মণসেনকে সংবাদ পাঠাইলেন, প্রাসাদের বাহিরে আসিয়া তাঁহাদের আনীত তাতার-অশ্ব, চীনা বস্ত্রসম্ভার এবং অন্যান্য মূল্যবান্ দ্রব্যাদি পরীক্ষা করিবার জন্য। রায় যখন কারবানে (অশ্বদের বিশ্রামস্থল) আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন বখ্‌ত্-ইয়ার তাঁহাকে বহুমূল্য এক উপঢৌকন দান করিলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার অনুচরদের ইঙ্গিত করিলেন হিন্দুদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে। তুর্কী সৈন্যেরা তৎক্ষণাৎ তাহাই করিল। হিন্দু রক্ষী সৈন্যেরা অতর্কিত আক্রমণ ঠেকাইতে না পারিয়া পরাভূত হইল, কিন্তু তাঁহাদের একদল রায় লখ্‌মনিয়াকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া স্থির বিক্রমে আক্রমণ প্রতিহত করিতে লাগিল এবং তুর্কী সৈন্যদের মনে ত্রাস সঞ্চার করিল...। অবশেষে যখন দুর্ধর্ষ খিল্‌জি অশ্বারোহীরা ঝড়ের মতন ছুটিয়া আসিয়া কয়েকজন হিন্দু-সওয়ারকে হত্যা করিল, তখন রায় লখ্‌মনিয়া বখ্‌ত্-ইয়ারের হাতে বন্দী হইলেন।

উপরোক্ত দুই বিবরণেই এবং সমসাময়িক ইতিহাসে কয়েকটি তথ্য পরিষ্কার। প্রথমত, আক্রমণটা ঘটিয়াছিল বেলা দ্বিপ্রহরে যখন প্রাতঃসভা শেষ করিয়া সভাসদ্, কর্মচারী ও রক্ষী সৈন্যেরা সকলেই যে যাঁহার ঘরে ফিরিয়া গিয়া স্নানাহার ও বিশ্রামে রত। দ্বিতীয়ত, ১১ জন অশ্বারোহী তুর্কী সেনাকে কেহই আক্রমণকারী বলিয়া মনে করে নাই অশ্ব-বিক্রেতা মনে করিয়াই রক্ষীরা তাঁহাদের কেহ বাধা দেয় নাই। তৃতীয়ত, সহসা অতর্কিত অবিকল্প আক্রমণ ঠেকাইবার জন্য কেহ প্রস্তুতও ছিল না। চতুর্থত, প্রথম ১১ জনের (বখ্‌ত্-ইয়ার ও ১৮ জন তুর্কী অশ্বারোহী) পক্ষেই প্রাসাদ ও নগরাধিকার সম্ভব হইত না, যদি না পশ্চাতের বৃহত্তর তুর্কী ও খিল্‌জি অশ্বারোহী সেনাদল তৎক্ষণে নগরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িয়া চারিধারে আক্রমণ ও লুণ্ঠন শুরু করিয়া দিত। পঞ্চমত, নবদ্বীপ সেন-রাজাদের রাজধানী ছিল না, ছিল গঙ্গাতীরবর্তী একটি তীর্থস্থান এবং সেখানে একেবারে গঙ্গার কূল ঘেঁষিয়া ছিল রাজার প্রাসাদ। এই প্রাসাদ সুদৃঢ়-অট্টালিকা না, তৎকালীন বাংলার রুচি ও অভ্যাসানুযায়ী কাঠ ও বাঁশের তৈরী সাধারণ বাংলা-বাড়ি। নবদ্বীপ দুর্গও না, একটি তীর্থ-নগর মাত্র এবং নগর-প্রাচীর ও [illegible]

বলিতে বাঁশ ও কাঠের তৈরী বেড়া ও দরজা ছাড়া আর কিছু নয়। মুঘল-প্রাসাদ বা দুর্গ-নগর বলিতে যাহা বুঝায় নবদ্বীপে তাহার কিছুই ছিল না, এ-তথ্য অনুমানে কিছুমাত্র বাধা নাই। ষষ্ঠত, বিদেশি অশ্ববিক্রেতার আসা-যাওয়া নগরে নিশ্চয়ই ছিল; সুতরাং অশ্ববিক্রেতার ছদ্মবেশে ১৯ জন অশ্বারোহীর আগমন কাহারও মনে কোনো সন্দেহের উদ্রেক করে নাই। সপ্তমত, প্রাচ্য ইতিহাসে স্বল্পসংখ্যক অশ্বারোহী সেনা কর্তৃক অতর্কিত আক্রমণে কোনো নগরাধিকার একেবারে অজ্ঞাত নয় এবং নিছক কল্পনার সৃষ্টিও নয়।

এ-সব অবস্থার প্রেক্ষাপটে বখ্‌ত্‌-ইয়ারের নবদ্বীপাধিকার কিছু বিস্ময়কর ব্যাপার বলিয়া মনে হয় না, কিংবা তাহাতে তদানীন্তন বাঙালীর ভীরুতাও কিছু প্রমাণিত হয় না। আলোচিত সাক্ষ্যে স্পষ্টই বুঝা যায়, নবদ্বীপে শত্রু-আক্রমণের কোনো প্রতিরোধ-ব্যবস্থাই ছিল না। রাজমহলের নিকটে, বোধ হয় তেলিয়াগড়ে, কোথাও ছিল দক্ষিণ-বিহার হইতে বাঙলায় প্রবেশের পথ; সেখানে প্রতিরোধের কী ব্যবস্থা ছিল বা না ছিল, জানিবার উপায় নাই। থাকিলেও বখ্‌ত্‌-ইয়ারের পক্ষে যে তাহা যথেষ্ট বাধা রচনা করিতে পারে নাই তাহা তো পরিষ্কার! আর ঝাড়খণ্ডের দুর্ভেদ্য জঙ্গল ও দুর্গমপথ অতিক্রম করিয়া কোনো দুঃসাহসী শত্রুসৈন্য যে বীরভূমের পথে বাঙলায় আসিয়া প্রবেশ করিবে, সেন-রাজ ও রাষ্ট্র বোধ হয় তেমন আশঙ্কাও করেন নাই।

যাহা হউক, মোটামুটিভাবে মিনহাজ ও ইসমীর বিবরণের সত্যতা অস্বীকার করা চলে না। বখ্‌ত্‌-ইয়ার, তথা বিদেশি শক্তির কাছে নবদ্বীপ তথা সেনরাষ্ট্র ও বাঙালীর পরাজয়ের কারণ আরও গভীর, আরও অর্থবহ এবং তাহা সমগ্র উত্তর-ভারতের সমসাময়িক ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত। ইস্‌লামধর্মী আরব, তুর্কী, খিল্‌জি প্রভৃতি বিদেশি আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে উত্তর-ভারত তো কয়েক শতাব্দী ধরিয়া সমানেই যুঝিতেছিল; সাহস ও বীর্যের পরিচয়, দেশাত্মবোধের পরিচয়ও কম দেয় নাই; কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিল তিল করিয়া এইসব বৈদেশিক আক্রমণকারীদের প্রভুত্বও স্বীকার করিয়া লইতে হইতেছিল —নানা রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে, সামরিক শক্তির অভাবে নয়। ভারতীয় পদাতিক, হস্তীসৈন্য ও স্বল্পসংখ্যক মাত্র অশ্বসৈন্যনির্ভর সামরিক শক্তি অপেক্ষা আরব-খিল্‌জি-তুর্কীদের দ্রুত ও সুকৌশলী ঘোড়সওয়ারী সেনাদল অধিক কার্যকরী ছিল, সন্দেহ নাই। তবু এই সব কারণ ছাড়া, সমসাময়িক বাঙলাদেশে যে মনোবৃত্তি এই বৈদেশিক পরাভবের হেতু তাহাও এই প্রসঙ্গে আলোচ্য। উত্তর-ভারত তো একটু একটু করিয়া ইতিপূর্বেই দিল্লীর তকের অধীন হইয়া গিয়াছিল; সাহব-উদ্‌-দীন ঘোরী কর্তৃক গাহড়-বালরাজ জয়চন্দ্রের পরাজয়ের (১১৯৪) পর পূর্বদিকের একমাত্র পরাক্রান্ত স্বাধীন রাজ্য ও রাষ্ট্র ছিল লক্ষ্মণসেনের। এই রাজ্যেরই কিয়দংশ যখন অধিকৃত হইয়া গেল, বিহার দখল হইল, নগর লুণ্ঠিত হইল, প্রাণ বিসর্জিত হইল তখন [illegible] আতঙ্ক-

গ্রস্ত হইয়া পড়া কিছু বিচিত্র নয়। এই আতঙ্কেই দেশের লোক (পূর্ব)-বঙ্গে, কামরূপে পলাইয়া গিয়াছিল, এমন কি নবদ্বীপও প্রায় জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল, মিনূহাজের এই ইঙ্গিত মিথ্যা না-ও হইতে পারে। সাধারণ যুক্তিতে এইরূপ হওয়া খুবই স্বাভাবিক, বিশেষত ব্রাহ্মণ ও বণিকদের পক্ষে। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও অনেক ব্রাহ্মণের দল যে এই সময় নানাদিকে পলাইয়া গিয়াছিলেন, এ-সাক্ষ্য তো বৌদ্ধ লামা তারনাথও রাখিয়া গিয়াছেন। জনসাধারণের প্রতিরোধের মনোবৃত্তি যে ছিল না, এবং গড়িয়া তুলিতে চেষ্টাও কেহ করে নাই, এ-তথ্য একেবারে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। জ্যোতিষী ব্রাহ্মণ ও মন্ত্রীবর্গ যে লক্ষ্মণসেনকে যুদ্ধ না করিয়া দেশত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বলিয়াছিলেন, তাহাতে মনে হয়, রাষ্ট্রেরও প্রতিরোধ-ইচ্ছা বিশেষ ছিল না ; ভাগ্যনির্ভর পরাজয়ী মনোবৃত্তি রাষ্ট্রকেও গ্রাস করিয়াছিল। দ্বিতীয়ত, ব্রাহ্মণ জ্যোতিষীদের জ্যোতিষ-গণনা ও শাস্ত্রের দোহাইয়ের যে ইঙ্গিত মিনূহাজ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাও অস্বীকার করিবার কারণ দেখিতেছি না। লক্ষ্মণসেনের জন্মকাহিনী অলৌকিক, অবিশ্বাস্য, এমন কি হাস্যকর, সন্দেহ নাই ; কিন্তু সে-ক্ষেত্রেও জ্যোতিষে সমসাময়িক জনসাধারণের অত্যধিক বিশ্বাসই সূচিত করে। নিঃসন্দিগ্ধ ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা এই তথ্য সমর্থিত। এই যুগের খ্যাতনামা পণ্ডিতদের, ভবদেব ভট্ট, হলায়ুধ প্রভৃতি সকলেরই পাণ্ডিত্যখ্যাতি স্মৃতি ও জ্যোতিষনির্ভর। আর, যে-সব সুবিস্তৃত ব্রাহ্মণ্য ক্রিয়াকাণ্ডের উল্লেখ, বিভিন্ন তিথি-নক্ষত্রে স্নান, পূজা, উপবাস, হোম, যাগযজ্ঞ ইত্যাদির দর্শন সেন-আমলের লিপি-গুলিতে পাওয়া যায়, তাহা তো সমস্তই জ্যোতিষনির্ভর। রাজ-পরিবার, মন্ত্রী-সেনাপতি ইত্যাদিরা, ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতেরা এবং উচ্চতর বর্ণের লোকেরা যে স্মৃতি ও জ্যোতিষ ছাড়া জীবনচর্চার আর কোনো নির্দেশ মানিতেন, সেন-আমলের লিপি ও সুবিপুল সংস্কৃত-সাহিত্য পড়িলে তাহা মনে হয় না। আর, রাজারা স্বয়ং জ্যোতিষচর্চা করিতেছেন, বল্লাল ও লক্ষ্মণসেন দু'জনই জ্যোতিষের গ্রন্থ লিখিতেছেন, এমন তথ্যও রাজবৃত্তের ইতিহাসে সচরাচর দেখা যায় না। কাজেই, সেই সংকটময় মুহূর্তে মিনূহাজ জ্যোতিষীদের উক্তি ও আচরণ সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন, তাহা একেবারে অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হইতেছে না ; কিছু অত্যুক্তি হয়তো থাকিতে পারে। তৃতীয়ত, যদি মানিয়া লওয়া যায় যে (এবং তাহা করিতে কিছু বাধা দেখা যাইতেছে না), লক্ষ্মণসেন বিহারে, বাঙলার পথে এবং নবদ্বীপে শত্রু প্রতিরোধের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা হইলেও স্বীকার করিতে হয়, এই বাধা যথেষ্ট ছিল না, এবং সংঘর্ষের পশ্চাতে সৈন্যদলের চিত্তশক্তি ও প্রতিরোধ-কামনা খুব প্রবল ছিল না। মিনূহাজ্ বখ্ত-ইয়ারের তিব্বতাভিযানের ব্যর্থতা এবং লাঞ্ছনার কথা গোপন করেন নাই ; প্রতিরোধ প্রবল এবং সংঘর্ষ সঙ্কটময় হইলে এক্ষেত্রেও মিনূহাজ অন্তত তাহার উল্লেখ করিতেন। সংবাদদাতা নিজাম্-উদ্-দীন ও সামস্-উদ্-দীন এই সংঘর্ষের উল্লেখের ভিতর দিয়াই নিজেদের শৌর্য-বীর্যের কথা ভাল ব্যক্ত করিতে পারিতেন,

অথচ তাহা করেন নাই। তাহা ছাড়া, বিহার-ধ্বংসের যে বিবরণ ত্বরনাথ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আচরণও খুব প্রশংসনীয় বলিয়া মনে করা যায় না। আচরণ দেখিয়া মনে হয়, ইঁহারা গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী সেন-রাজবংশ ও রাষ্ট্রের প্রতি খুব প্রসন্ন ছিলেন না! অন্য কারণ কিছু থাকাও বিচিত্র নয়। নবদ্বীপেও প্রতিরোধ ব্যবস্থা হয়তো কিছু হইয়াছিল, কিন্তু বখ্‌ত্‌-ইয়ারের বুদ্ধি ও আক্রমণ কৌশল তাহা সহজেই ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিল, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আসল ব্যাপার এই যে, যেখানে জনসাধারণ আতঙ্কগ্রস্ত ও পলায়মান, উপদেষ্টা ও মন্ত্রীবর্গ পরাজয়ী মনোবৃত্তি দ্বারা আচ্ছন্ন, এবং জ্যোতিষ যেখানে রাষ্ট্রবুদ্ধির নিয়ামক সেখানে সৈন্যদলের ও জনসাধারণের প্রতিরোধ দুর্বল হইতে বাধ্য। সেইজন্যই কোনো প্রতিরোধই হয়তো যথেষ্ট কার্যকরী হয় নাই। মিন্‌হাজের বিবরণী পড়িয়া যে মনে হয়, বখ্‌ত্‌-ইয়ার একেবারে বিনা বাধায় বিহার ও বাঙলাদেশ জয় করিয়াছিলেন, তাহা এই কারণেই। বস্তুত, লক্ষ্মণসেনের রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রযন্ত্র নানা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কারণে ভিতর হইতে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। গাহড়বালদের প্রতিরোধ-প্রাচীর যতদিন বজায় ছিল ততদিন নিশ্চিন্ত হইয়া কলিঙ্গ-কামরূপ-কাশী জয় লক্ষ্মণসেন ও তাঁহার সৈন্যদের পক্ষে খুব কঠিন ব্যাপার হয় নাই। কিন্তু সে-প্রাচীর যখন ভাঙিয়া পড়িল যখন দুর্ধর্ষ মুসলমান অভিযাত্রীদের ঠেকাইয়া রাখিবার মতন ইচ্ছা বা শক্তি রাষ্ট্রযন্ত্রের ছিল না। ব্রাহ্মণ, বণিক, উপদেষ্টা, জ্যোতিষী ও মন্ত্রীবর্গের আচরণই তাহার প্রমাণ।

লক্ষ্মণসেনের আচরণ

চারিদিকে যখন এই আতঙ্ক ও পরাজয়-মনোবৃত্তির আচ্ছন্নতা তখন বৃদ্ধ লক্ষ্মণসেনের নিজের আচরণ সত্যই প্রশংসনীয় এবং যথার্থ রাজকীয় মর্যাদাবোধের পরিচয়। শত্রু অগ্রসরমান জানিয়া এবং উপদেষ্টা ও মন্ত্রীবর্গের পরামর্শে বিচলিত হইয়া তিনি রাজধানী পরিত্যাগ করেন নাই। শেষ পর্যন্ত তিনি স্বীয় পদে ও কর্তব্যে অবিচল ছিলেন। তারপর যখন প্রায় সকলে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল, পায়ের নীচ হইতে মাটি খসিয়া পড়িল, শত্রুসৈন্য অতর্কিতে এবং অশ্ববিক্রেতার ছদ্মবেশে রাজপ্রাসাদ আক্রমণ ও অধিকার করিল, তখন তাঁহার পলায়ন ছাড়া আর কোনো পথ ছিল না। লক্ষ্মণসেন কাপুরুষ ছিলেন না, তিনি হতভাগ্য! সমাজ-ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে, ইতিহাস-চক্রের জটিল ও অমোঘ আবর্তনে বাঙলার ইতিহাস শতাব্দী ধরিয়া যে অনিবার্য পরিণতির দিকে অগ্রসর হইতেছিল, লক্ষ্মণসেন তাহার শেষ অধ্যায় মাত্র! তাঁহার ব্যক্তিগত শৌর্যবীর্য ও অন্যান্য গুণাবলী তাঁহাকে কিংবা বাঙলাদেশকে সেই পরিণতির হাত হইতে বাঁচাইতে পারে নাই; পারা সম্ভব

ছিল না। লক্ষ্মণসেনের ব্যক্তিগত পরাক্রম ও অন্যান্য গুণাবলীর সাক্ষ্য তো মিন্‌হাজ নিজেও দিয়াছেন: 'রায় লখ্‌মনিয়া মহৎ রাজা (great Rae) ছিলেন; হিন্দুস্থানে তাঁহার মত সম্মানিত রাজা আর কেহ ছিল না। তাঁহার হাত কাহারও উপর কোনো অত্যাচারে অবিচারে অগ্রসর হইত না। এক লক্ষ কড়ির কমে তিনি কাহাকেও কিছু দান করিতেন না।'

নদীয়া বা নবদ্বীপ আক্রমণ ও অধিকার ঠিক কবে হইয়াছিল তাহা লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে বিতণ্ডার অন্ত নাই। মোটামুটি মনে হয় ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ বা তাহার কিছু পরে (১২০১ খ্রী) এই ঘটনার সংঘটন কাল। শেক শুভোদয়া-গ্রন্থে এই ঘটনার তারিখ দেওয়া হইতেছে ১১২৪ — ১২০২ খ্রীষ্টাব্দ, এবং এই তারিখ পাগ্‌-সাম্‌-জোন-জাং নামক তিব্বতী গ্রন্থদ্বারা সমর্থিত।

বিশ্বরূপ সেন ।। কেশব সেন

নদীয়া-নূদীয়া-নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্মণসেন (পূর্ব)-বঙ্গে যান এবং সেখানে অত্যল্পকাল রাজত্ব করিয়া পরলোকগমন করেন (১২০৬?). মিনহাজ একথা বলিতেছেন। সদুক্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থের সাক্ষ্যে মনে হয়, লক্ষ্মণসেন ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দেও জীবিত এবং রাজত্ব করিতেছিলেন। বিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার হইতে নির্গত লক্ষ্মণসেনের লিপিগুলির মধ্যে ভাওয়াল ও মাধাইনগর লিপি দুইটি তুর্কী-বিজয়ের পরবর্তী হওয়া একেবারে অসম্ভব নয়। কবি উমাপতিধরও একটি বিচ্ছিন্ন শ্লোকে লক্ষ্মণসেন কর্তৃক এক ম্লেচ্ছরাজ জয়ের ইঙ্গিত করিয়াছেন। ম্লেচ্ছ-বিনাশ প্রসঙ্গে কবি শরণেরও একটি শ্লোক আগে উদ্ধার করিয়াছি। হইতে পারে, বঙ্গে বিক্রমপুরে গিয়া অধিষ্ঠিত হইবার পর মুসলমান সৈন্যের সঙ্গে কোথাও কোনো সংঘর্ষ তাঁহার হইয়া থাকিবে। এই অনুমানের কারণ এই যে, লক্ষ্মণসেনের পুত্র বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেনের লিপিতেও যবনদের সঙ্গে তাঁহাদের সংঘর্ষের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। গৌড় ও বরেন্দ্রীর মুসলমান নরপতি ও সেনানায়কেরা কেহ কেহ হয়তো পূর্ব ও দক্ষিণ-বঙ্গের সেন-রাজ্যের বাকী অংশও অধিকার করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু প্রায় এক শতাব্দীকাল সে চেষ্টা সার্থক হয় নাই। প্রধান কারণ, নদনদীবহুল পূর্ববঙ্গের ভৌগোলিক সংস্থান, সন্দেহ নাই। যাহাই হউক, লক্ষ্মণসেন, বিশ্বরূপ ও কেশব তিনজনই এই সব সংঘর্ষে জয়ী হইয়াছিলেন, লিপিগুলিতে যেন তাহারই ইঙ্গিত।

লিপি প্রমাণ হইতে এ-তথ্য নিঃসংশয় যে, লক্ষ্মণসেনের বংশ বঙ্গে আরও অর্ধ শতাব্দী কালের উপর রাজত্ব করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের রাজ্য পূর্ব ও দক্ষিণ-বঙ্গে বিস্তৃত ছিল। মিনহাজ বলিতেছেন, তাঁহার গ্রন্থরচনা কালেও সেন-রাজারা বঙ্গে রাজত্ব করিতেছিলেন। বিশ্বরূপ ও কেশব দুইজনই লক্ষ্মণসেনের ন্যায় নিজেদের "গৌড়েশ্বর"

এবং "পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ" বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন। রাজ্যের অধিকাংশই তাঁহাদের করচ্যুত হইয়া গিয়াছিল ; একাধিকবার যবনদের সঙ্গে তাঁহাদের সংঘর্ষও হইয়াছিল ; কিন্তু তৎসত্ত্বেও নিজেদের রাজকীয় দলিলপত্রে অভ্যস্ত ও চিরাচরিত ধরাবাঁধা ঔপাধিক আড়ম্বরের ত্রুটি হয় নাই। হয়তো তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, নিজেদের স্বাধীনতা এখনও অক্ষুণ্ণই আছে, এবং পূর্ববর্তী অনেক ভিন্‌-প্রদেশি রাজবংশ কর্তৃক আক্রমণ ও পরাজয়ের মত এই আক্রমণ এবং পরাজয়ও অধিককাল স্থায়ী হইবে না। বস্তুত, নবদ্বীপ করচ্যুত এবং বখ্‌ত্‌-ইয়ার লখ্‌নৌতিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার পরও সেন-রাজারা যেভাবে তাঁহাদের লিপিগুলিতে সর্বপ্রকার ঔপাধিক আড়ম্বর এবং চিরাচরিত রীতি ও অভ্যাস বজায় রাখিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় না, এই মুসলমান বিজয়ের যথার্থ ঐতিহাসিক ইঙ্গিত তাঁহারা যথেষ্ট উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সমসাময়িক সাহিত্যেও এই সঙ্কটময় বৈপ্লবিক আবর্তনের কোনো পরিচয় কোথাও পাওয়া যাইতেছে না। সমাজের শিক্ষিত জ্ঞানী-গুণীরা বা জনসাধারণও কি সে ইঙ্গিত ধরিতে পারেন নাই ?

বিশ্বরূপ ও কেশব দু'জনই "সগর্গ-যবনান্বয়-প্রলয়-কালরুদ্র" বলিয়া নিজেদের পরিচয়-দান করিয়াছেন। একাধিক মুসলমান সুলতান—গিয়াস-উদ্‌-দীন্‌ (১২১১-১২২৬), মালিক সৈফ্‌-উদ্‌-দীন (১২৩১-৩৩), ইজ্‌-উদ্‌-দীন্‌ বলবন্‌ (১২৫৮) প্রভৃতি কয়েক বারই বঙ্গ (পূর্ব ও দক্ষিণ-বঙ্গ) বিজয়ের চেষ্টা করিয়াছেন, মুসলমান ঐতিহাসিকদের বিবরণী হইতেই তাহা জানা যায়। তবে, সে-চেষ্টা সার্থক হয় নাই। আগেই বলিয়াছি যে, মিন্‌হাজের সাক্ষ্যেই জানা যায় সেন-রাজারা ১২৬০ খ্রীষ্টাব্দেও বঙ্গে রাজত্ব করিতেছিলেন। বিশ্বরূপ ও কেশবের পরও আরও কয়েকজন সেন-রাজার নাম আবুল ফজলের আইন-ই-আক্‌বরী এবং রাজাবলী-গ্রন্থে পাওয়া যায়। তবে, স্বতন্ত্র ও বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্য দ্বারা এই সব রাজার নাম বা কীর্তিকাহিনী সমর্থিত নয়। ইঁহাদের মধ্যে মাধবসেন এবং শূরসেনের নাম একান্ত অনৈতিহাসিক না-ও হইতে পারে। পঞ্চরক্ষা গ্রন্থের একটি পাণ্ডুলিপিতে (১২৮৯ খ্রী) গৌড়েশ্বর, পরমসৌগত পরমরাজাধিরাজ মধুসেন নামে এক নরপতির খবর পাওয়া যায়। বিশ্বরূপের সাহিত্য-পরিষৎ-লিপিতে সূর্যসেন (শূরসেন ?) এবং পুরুষোত্তমসেন নামে দুই রাজকুমারের উল্লেখ আছে। সেন-বংশীয় কোনো কোনো রাজপুত্র-রাজকুমার স্থানীয় সামন্তরাজ রূপেও রাজত্ব করিয়া থাকিবেন।

অবসান

পূর্ব-বঙ্গেও সেন-রাষ্ট্র ভিতর হইতে ক্রমশ দুর্বল হইয়া পড়িতেছিল। ১২২১ খ্রীষ্টাব্দের আগেই কোনো সময়ে পট্টিকেরা (ত্রিপুরা জেলা) রাজ্যে রণবঙ্কমল্ল হরিকালদেব স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিলেন। লক্ষ্মণসেনের জীবিতকালেই বোধ হয় মেঘনার পূর্বতীরে ত্রিপুরা-

নোয়াখালি-চট্টগ্রামে এক দেববংশ মাথা তুলিয়াছিল, এ-সব কথা তো আগেই বলিয়াছি। এই তিনটি জেলাই এই রাজবংশের রাজা দামোদরের (১২৩১-১২৪৩) অধিকারভুক্ত ছিল, এ-বিষয়ে লিপিপ্রমাণ বিদ্যমান। কিছুদিন পর, ১২৮৩ খ্রীষ্টাব্দের আগেই, বোধ হয় এই দেববংশেরই অন্যতম রাজা দশরথদেব বর্তমান ঢাকা জেলাও তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন, এবং বিক্রমপুরে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। দেব-বংশের আরও দুই একটি লিপি ক্রমশ আবিষ্কৃত হইতেছে। মনে হয়, ত্রয়োদশ শতকের শেষ পর্যন্ত পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গ কোনো রকম করিয়া মুসলমানাধিকারের হাত হইতে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছিল, কোথাও সেন-বংশীয় রাজাদের নায়কত্বে, কোথাও অন্য কোনো স্থানীয় রাজা বা সামন্তের নায়কত্বে। নদীবহুল জলমগ্ন ভাটি অঞ্চলে অশ্বনির্ভর মুসলমান অভিযাত্রীরা বহুদিন পর্যন্ত নিজেদের অধিকার বিস্তৃত করিতে পারেন নাই। অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া নবদ্বীপ অধিকার করা যায়, কিন্তু জলপথে অনভ্যস্ত নৌকাবাহিনী-বিহীন মুসলমান সেনাপতিদের পক্ষে (পূর্ব ও দক্ষিণ)-বঙ্গ বিজয় নিশ্চয়ই খুব সহজ ছিল না। কিন্তু, তাহা ক'দিনের জন্য ? ত্রয়োদশ শতকের পর বাঙলাদেশের কোথাও আর কোনো স্বাধীন স্বতন্ত্র হিন্দু নরপতির নাম শোনা যাইতেছে না।

সেনায়ন-কাহিনী বিবৃতির সঙ্গে সঙ্গে এই যুগের রাজবংশ এবং রাষ্ট্রসম্বন্ধগত সামাজিক ইঙ্গিত আগেই কিছু কিছু ধরিতে চেষ্টা করিয়াছি। এখানে একটু বিস্তৃত করিয়া একটা সামগ্রিক দৃষ্টি লওয়ার চেষ্টা করা যাইতে পারে।

সামাজিক ইঙ্গিত

সেন-রাজবংশ বাঙালী ছিলেন না, দক্ষিণের কর্ণাট দেশ হইতে এ দেশে আসিয়া রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করিয়া পাল-যুগসৃষ্ট বাঙলাদেশ ও বাঙালীজাতির আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। লক্ষণীয় এই যে, এই যুগে আর একটি রাজবংশ (পূর্ব)-বঙ্গে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন ; এই বর্মণ রাজবংশও কিন্তু অবাঙালী ; ইঁহারাও বিদেশাগত, বোধ হয় কলিঙ্গাগত। পাল-বংশ মুখ্যত বৌদ্ধধর্মাবলম্বী, সেন-বংশ গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী। আর, যে-চন্দ্ররাজবংশকে অধিকারচ্যুত করিয়া বর্মণ-বংশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাঁহারাও পালরাজাদের মত পরম সুগত অর্থাৎ বৌদ্ধ, আর বর্মণেরা এবং মেঘনা-অঞ্চলের দেব-বংশের রাজারা সেনদের মতনই গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কারাশ্রয়ী। এই দুই তথ্যের মধ্যে এই যুগের সামাজিক ইঙ্গিত অনেকাংশে নিহিত ; ইহাদের ঐতিহাসিক ব্যঞ্জনা অবহেলার বস্তু নয়। ক্রমে তাহা স্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছি।

রাষ্ট্রীয় আদর্শ ॥ সংকীর্ণ সামাজিক দৃষ্টি ॥ আমলাতন্ত্রের বিস্তৃতি ॥ রাষ্ট্রযন্ত্রে পৌরোহিত্যের প্রভাব

সুদীর্ঘ পালযুগের রাষ্ট্রীয় আদর্শ এই যুগে অপরিবর্তিত ; নূতন কোনো রাষ্ট্রীয় আদর্শ এই যুগে গড়িয়া উঠে নাই, রাষ্ট্রযন্ত্রেরও কোনো পরিবর্তন হয় নাই। স্থানীয়

স্বাতন্ত্র্য ও আত্মকর্তৃত্বের আদর্শ সমভাবে বিদ্যমান। সুপ্রতিষ্ঠিত ও ক্রমাগ্রসরমান বৈদেশিক মুসলমানশক্তির নিরন্তর করাঘাতেও রাষ্ট্রীয় আদর্শের কোনো পরিবর্তন হয় নাই; সামগ্রিক ভারতীয় ঐক্যবোধ ও আদর্শ, বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় আদর্শ কিছু গড়িয়া উঠে নাই। সামন্ততন্ত্র সমভাবে সক্রিয়। উত্তরোত্তর ভূমির চাহিদা বাড়িতেছে; পুরোহিত-ব্রাহ্মণেরাও ভূমিসংগ্রহে তৎপর হইয়া উঠিয়াছেন, সমাজ ক্রমশ ভূমিনির্ভর, কৃষিনির্ভর হইয়া উঠিতেছে। অথচ, রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে ক্ষেত্রকর বা কৃষক সম্প্রদায় অবজ্ঞাত; রাজকীয়-ভূমিসংক্রান্ত দলিলপত্রে তাঁহারা ভুলেও উল্লিখিত হইতেছেন না। সমাজের নিম্নতম স্তরের লোকদেরও কোনো উল্লেখ দেখিতেছি না। অথচ, পালযুগের লিপিমালায় সর্বত্রই কৃষক-কর্ষক-ক্ষেত্রকরদের উল্লেখ তো আছেই, চণ্ডালদের পর্যন্ত উল্লেখ আছে; অর্থাৎ, সমাজের কোনো স্তরই তখন রাষ্ট্রের দৃষ্টির বহির্ভূত ছিল না। স্পষ্টই দেখিতেছি, সেন-যুগে রাষ্ট্রের সামাজিক দৃষ্টি সংকীর্ণ হইয়া আসিয়াছে। রাষ্ট্রের আধিপত্যের বিস্তার, অর্থাৎ, রাজ্যপরিধিও পাল-সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই; তাহাও সংকীর্ণই বলা যায়, যদিও লক্ষ্মণসেন প্রায় মহীপালের রাজ্যসীমা উদ্ধার করিয়াছিলেন, তবে স্বল্পকালের জন্য মাত্র। অথচ, অন্যদিকে ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল রাজ ও সামন্তবংশেরই রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্র ক্রমবর্ধমান। নূতন নূতন রাজকর্মচারীদের নাম এই যুগে প্রথম শোনা যাইতেছে; সঙ্গে সঙ্গে ক্রমসংকুচীয়মান নূতন নূতন রাজ্যবিভাগ—খণ্ডল, চতুরক, আবৃত্তি, পাটক ইত্যাদি। ছোট ছোট রাজপদ যেমন বাড়িয়াছে তেমনই বাড়িয়াছে "মহা"-পদের সংখ্যা—মহামন্ত্রী, মহাপুরোহিত, মহাসান্ধিবিগ্রহিক, মহাপিলুপতি, মহাগণস্থ, মহাধর্মাধ্যক্ষ, ইত্যাদি—"মহা"-পদের আর শেষ নাই। কম্বোজরাজ নয়পালের ইর্দা পট্টোলীতে নূতন রাষ্ট্রযন্ত্র বিভাগের নামও শোনা যায়: করণ অর্থাৎ কেরাণী মণ্ডলসহ "অধ্যক্ষবর্গ", সেনাপতিসহ "সৈনিকসংঘমুখ্য", দূতসহ "গূঢ়পুরুষ"বর্গ, এবং আরও কত কি। পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে, একদিকে রাষ্ট্রের সমাজদৃষ্টি যত সংকীর্ণ হইতেছে, পরিধি যত সংকীর্ণ হইতেছে, আমলাতন্ত্রের বিস্তার হইতেছে তত বেশী, রাজপাদোপজীবীর সংখ্যা তত বাড়িতেছে, চাকুরীজীবী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় তত বিস্তৃত হইতেছে। দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর তালিকা দিয়াও যখন ইঁহাদের শেষ করা যাইতেছে না তখন বলা হইতেছে, ইহার পর অন্যান্য অনুল্লিখিত রাজকর্মচারী যাঁহারা রহিলেন তাঁহাদের নাম অর্থশাস্ত্র-গ্রন্থের অধ্যক্ষ-প্রচার অধ্যায়ে লিখিত আছে। আমলাতন্ত্র যে সংখ্যায় ও অধিকার-বৃদ্ধিতে স্ফীত ও অভিজাতায় সচেতন হইয়াছে, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ করিবারও অবকাশ নাই। শুধু তাহাই নয়, রাজার সর্বময় কর্তৃত্বও বাড়িয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয় আড়ম্বরও। এই যুগেই দেখিতেছি, তাঁহার নূতন নূতন উপাধি গ্রহণের আতিশয্য। পালযুগের রাজকীয় লিপিগুলিতে রাণীর উল্লেখ দেখা যায় না; কিন্তু এখন দেখিতেছি রাজ্ঞী-মহিষীরাও উল্লিখিত হইতেছেন। রাজপরিবারের আভিজাত্য ও দরবারী জৌলুসও বাড়িতেছে, [illegible] [illegible]

করা বোধ হয় অন্যায় নয়। বর্মণ, কম্বোজ ও সেন-বংশ সকলেই তো বিদেশাগত; মাতৃপ্রধান অথবা মাতৃতান্ত্রিক সমাজের স্মৃতি তাঁহারা বহন করিয়া আনিয়াছিলেন, এমনও হইতে পারে! এইখানেই শেষ নয়; পুরোহিত, মহাপুরোহিত, শান্ত্যাগারিক, শান্ত্যাগারাধিকৃত, শান্তিবারিক, মহাধর্মাধিকৃত প্রভৃতি নূতন নূতন রাজপুরুষ (ইঁহারা সকলেই ধর্মাচরণ-ধর্মানুষ্ঠান সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত) রাজসভা জাঁকাইয়া বসিয়া আছেন। সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ রাজপণ্ডিতও আছেন; তিনিও এই যুগে অন্যতম রাজকর্মচারী। আমলাতন্ত্রের এই সুদীর্ঘ ও সর্বব্যাপী বাহু এবং সর্বময় প্রভুত্ব জনসাধারণ কি দৃষ্টিতে দেখিত তাহা জানিবার কোনো উপায় নাই।

শিল্পী-বণিক-ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের স্থান

রাষ্ট্রের সামাজিক দৃষ্টি-সংকীর্ণতার কথা বলিয়াছি। অন্য সাক্ষ্য-প্রমাণ হইতেও এই উক্তির সমর্থন পাওয়া যায়। পূর্বতন যুগের মতন পালযুগের রাষ্ট্রে শিল্পী-বণিক-ব্যবসায়ীর প্রাধান্য ছিল না, এ-কথা সত্য; কিন্তু সমাজে তাঁহাদের একটা স্থান ছিল, স্বীকৃতি ছিল। সেন-আমলে দেখা যাইতেছে, শিল্পী ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের লোকেরা সমাজের নিম্নস্তরে নামিয়া গিয়াছে। বৃহদ্ধর্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে এ-সম্বন্ধে যে-সাক্ষ্য পাওয়া যায় তাহার বিস্তৃত বিচারালোচনা বর্ণ-বিন্যাস ও শ্রেণী-বিন্যাস অধ্যায়ে করা হইয়াছে। এই দুই গ্রন্থে বর্ণ-বিন্যাসের যে-ছবি পাওয়া যায়, যদি তাহা সেন-আমলের সমাজ-বিন্যাসের কিছু ইঙ্গিতও বহন করে তাহা হইলে স্বীকার করিতেই হয়, অনেক শিল্পী ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সংশূদ্র বলিয়াও গণ্য হইতেন না; বর্ণ-বিন্যাসের নিম্নতর স্তরে ছিল তাঁহাদের স্থান।

রাষ্ট্রের সামাজিক আদর্শ।। বৌদ্ধধর্ম ও সংঘের প্রতি রাষ্ট্রের আচরণ

এই দৃষ্টি-সংকীর্ণতা সেন-রাজবংশ ও রাষ্ট্রের উপর কেন আরোপ করিতেছি তাহার কারণ বলিতে হইলে রাষ্ট্রের সামাজিক আদর্শ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা দরকার। সেন-আমলের রাজকীয় লিপিমালার সাক্ষ্য লইয়াই আরম্ভ করা যাইতে পারে। বর্মণ ও সেন বংশের প্রত্যেকটি লিপিতেই দেখা যায়, ব্রাহ্মণ্য স্মৃতি, সংস্কার ও পূজার্চনার জয়জয়কার; বিভিন্ন তিথি উপলক্ষে তীর্থস্নান, উপবাস; নানা প্রকারের বৈদিক ও পৌরাণিক যাগযজ্ঞ হোম ইত্যাদির বিবরণ; এই সব অনুষ্ঠান উপলক্ষে যত ভূমি দান সমস্তই লাভ করিতেছেন ব্রাহ্মণেরা। এই যুগের একটি লিপিতেও এমন প্রমাণ নাই যেখানে বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী কেহ বা কোনো বৌদ্ধ বিহার বা সংঘ কোনো প্রকার রাজানুগ্রহ লাভ করিতে-ছেন। বাঙলাদেশে যত বৌদ্ধমূর্তি ইত্যাদি পাওয়া গিয়াছে তাহার অধিকাংশই অষ্টম হইতে একাদশ শতকের। অল্প কয়েকটি মূর্তিই দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের। পণ্ডিতেরা

রাজ্যের এক রণবঙ্কমল্ল হরিকালদেব ছাড়া এই যুগে আর কোনো বৌদ্ধ নরপতির খোঁজ পাওয়া কঠিন। মধুসেন পরমসুগত সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি সেন-বংশের রাজা কিনা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন ; অ.র, এই ধরনের ২।১টি দৃষ্টান্তের সাহায্যে রাষ্ট্রের সামাজিক আদর্শ ধরাও কঠিন। বর্মণ ও সেন-বংশীয় রাজারা কেহ শৈব, কেহ বৈষ্ণব, কেহ সৌর, কিন্তু প্রত্যেকেরই আশ্রয় পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য স্মৃতি ও সংস্কার, এবং তাঁহারা প্রত্যেকেই এই স্মৃতি ও সংস্কার প্রচার ও বিস্তারে সদা উৎসুক। রাজপরিবারের লোকদেরও এ-সম্বন্ধে আগ্রহের সীমা নাই। বৌদ্ধধর্ম এই সময় বিলীন হইয়া গিয়াছিল, সংঘ-বিহার ইত্যাদি ছিল না, একথা বলা চলে না ; অথচ রাষ্ট্রের কোনো অনুগ্রহই সেদিকে বর্ষিত হইল না। শুধু যে বর্ষিত হয় নাই, তাহা নয় ; বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি একটা বিরোধিতাও বোধহয় আরম্ভ হইয়াছিল, এবং রাষ্ট্রের সমর্থনও এই বিরোধিতার পশ্চাতে ছিল। বর্মণ-রাজ জাতবর্মার রাজত্বকালেই সম্ভবত বর্মণ-রাষ্ট্রের বঙ্গাল সৈন্যদল সোমপুরের বৌদ্ধ মহাবিহারের অন্তত একাংশ পুড়াইয়া দিয়াছিল ; নালন্দার একটি লিপিতে এই ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতি উল্লিখিত আছে। এই আক্রমণ শুধু কৈবর্তনায়ক দিব্যর বিরুদ্ধেই নয় ; বৌদ্ধধর্মেরও বিরুদ্ধে। ভট্ট-ভবদেব ছিলেন রাজা হরিবর্মার সান্ধিবিগ্রহিক; তাঁহার পিতামহ আদিদেব ছিলেন বঙ্গরাজের সান্ধিবিগ্রহিক ; এই পরিবারের রাষ্ট্রীয় প্রভাব সহজেই অনুমেয়। তাহার উপর ভবদেব নিজে ছিলেন সমসাময়িক কাল এবং সংস্কৃতির একজন প্রধান নায়ক, কুমারিলভট্টের মীমাংসা-বিষয়ক তন্ত্রবার্তিক গ্রন্থের টীকাকার, হোরাশাস্ত্র, মীমাংসা-সিদ্ধান্ত-তন্ত্র-গণিত এবং ফলসংহিতা বিষয়ক গ্রন্থাদির রচয়িতা, কর্মানুষ্ঠান পদ্ধতি বা দশকর্মপদ্ধতি, প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ প্রভৃতি স্মৃতি বিষয়ক গ্রন্থের লেখক এবং ব্রহ্মবিদ্যাবিদ্ পণ্ডিত। এই ভবদেব-ভট্ট 'অগস্ত্যের মত বৌদ্ধরূপ সমুদ্রকে গণ্ডূষে পান করিয়াছিলেন এবং তিনি পাষণ্ডবৈতণ্ডিকদের যুক্তিতর্কখণ্ডনে দক্ষ ছিলেন' বলিয়া তাঁহার প্রশস্তিলিপিতে দাবি করা হইয়াছে। পাষণ্ডবৈতণ্ডিকেরা যে বৌদ্ধ নৈয়ায়িক এ-সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। দেখা যাইতেছে, এই যুগের ব্রাহ্মণ্যধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতি বৌদ্ধ দর্শন ও সংস্কৃতির বিরোধী। বর্মণ বংশের রাষ্ট্রে ভবদেব যেমন সামাজিক আদর্শের প্রতিনিধি সেন-রাষ্ট্রে তেমনই হলায়ুধ। এই হলায়ুধও ভবদেবেরই মতন ব্রাহ্মণকুলতিলক, এবং তেমনই প্রথমে রাজপণ্ডিত, তারপর লক্ষ্মণসেনের মহামাত্য, এবং সর্বশেষে লক্ষ্মণ সেনেরই ধর্মাধিকারী বা ধর্মাধ্যক্ষ। তাঁহার পিতা ধনঞ্জয়ও ছিলেন রাজকীয় ধর্মাধ্যক্ষ। এই পরিবারেরও রাষ্ট্রীয় প্রভাব অনস্বীকার্য। হলায়ুধের দুই ভাই ঈশান এবং পশুপতি যথাক্রমে আহ্নিক এবং শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে দুইটি পদ্ধতি রচনা করিয়াছিলেন। পশুপতি একখানা পাকযজ্ঞ-গ্রন্থেরও রচয়িতা। আর, হলায়ুধ নিজে তো ব্রাহ্মণসর্বস্ব, মীমাংসাসর্বস্ব, বৈষ্ণবসর্বস্ব শৈবসর্বস্ব এবং পণ্ডিতসর্বস্ব প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। সুস্পষ্ট বিরোধিতার ইঙ্গিত ভবদেব ছাড়া আর কাহারও জীবনে পাওয়া যায় না, কিন্তু এ-কথা সত্য যে, এ-যুগের রাষ্ট্রের

সামাজিক আদর্শ একান্তই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতি আশ্রয়ী। দুটি মাত্র দৃষ্টান্ত আহরণ করা হইল; কিন্তু বস্তুত, বাঙলাদেশ আজও যে স্মৃতিশাসনে শাসিত, যে বর্ণ-বিন্যাসে বিন্যস্ত সেই স্মৃতি ও বর্ণ-বিন্যাস দুইই এই সেন-বর্মণ যুগের সৃষ্টি। বল্লালসেনের গুরু অনিরুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া জিতেন্দ্রিয়, বালক, ভবদেব, হলায়ুধ এবং বোধ হয় জীমূতবাহন, ইঁহারা প্রত্যেকেই সেন-বর্মণ আমলের লোক; এবং হারলতা-পিতৃদয়িতা হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যবহারমাতৃকা-দায়ভাগ-কালবিবেক পর্যন্ত সমস্ত স্মৃতি, ব্যবহার ও মীমাংসা গ্রন্থ এই যুগের রচনা। এই স্মৃতি-ব্যবহার-মীমাংসাই শূলপাণি-রঘুনন্দন কর্তৃক পরিবর্ধিত ও পরিশোধিত হইয়া আজও বাঙলার সমাজ শাসন করিতেছে। এই ধর্ম ও সাংস্কৃতিক আদর্শের পশ্চাতে রাষ্ট্রের সক্রিয় পোষকতা ও সমর্থন না থাকিলে একশত-দেড়শত বৎসরের মধ্যে ইহাদের এমন সমৃদ্ধ রূপ কিছুতেই দেখা যাইত না। পোষকতা ও সমর্থন যে ছিল তাহার প্রমাণ বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেন স্বয়ং। বল্লাল স্বয়ং আচারসাগর, প্রতিষ্ঠাসাগর, দানসাগর এবং আংশিকত অদ্ভুতসাগর এই চারিটি স্মৃতি বিষয়ক গ্রন্থের রচয়িতা। দানসাগর তিনি লিখিয়াছিলেন তাঁহার গুরুদেবের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া। অসম্পূর্ণ অদ্ভুতসাগর সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন লক্ষ্মণসেন স্বয়ং, এবং তাহা পিতৃনির্দেশে।

এই একান্ত ব্রাহ্মণ্য আদর্শের শাসন অন্যদিক দিয়াও কি করিয়া রাষ্ট্রে প্রতিফলিত হইয়াছে তাহার ইঙ্গিত আগেই করিয়াছি। এই যুগের সেন-বর্মণ রাষ্ট্রেই প্রথম দেখা যাইতেছে, পুরোহিত-মহাপুরোহিত, শান্ত্যাগারিক-শান্তিবারিক, আবিকৃত প্রভৃতিরা রাজ-কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইতেছেন। রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য, ব্রাহ্মণধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে, এবং রাষ্ট্র ও রাজবংশ এই সংস্কৃতি বিস্তারে সচেষ্ট, ইহা কিছুতেই অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সমাজ-নিয়ন্ত্রণ রাজার কর্তব্য বলিয়া ভারতবর্ষে বরাবরই স্বীকৃত হইয়াছে; পাল-রাজারাও বর্ণাশ্রম রক্ষণ ও পালন করিয়াছেন; কিন্তু সেন-আমলে রাষ্ট্র ও রাজবংশ যেমন করিয়া দেশের সকলের দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাট ক্রিয়াকর্তব্য হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত ধর্ম ও সমাজগত আচার ও আচরণ, পদ্ধতি ও অনুষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, এমন সজ্ঞান সচেতন এবং সর্বব্যাপী কর্তৃত্বমূলক চেষ্টা বাঙলা-দেশে ইহার আগে বা পরে আর কখনো হয় নাই। এই যুগের সর্বপ্রধান চেষ্টাই যেন হইতেছে, বাঙলার সমাজকে একেবারে নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজা, নূতন করিয়া গড়া এবং তাহা একান্ত পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য স্মৃতি-সংস্কৃতির আদর্শানুযায়ী। সেই চেষ্টার পশ্চাতে রাষ্ট্র ও রাজবংশের পরিপূর্ণ সক্রিয় সমর্থন; উচ্চতর বর্ণ ও শ্রেণীর লোকেরাও তাহার পোষক ও সমর্থক। এই যুগের লিপিমালা এবং সমসাময়িক [illegible] পাঠ করিলে এ-তথ্য যেন কিছুতেই অস্বীকার করা চলে না। [illegible] [illegible] ও বিস্ময়বোধ হয়; [illegible]।

কিন্তু, লোকস্মৃতি ও লোকেতিহাসের যদি কিছুমাত্র ঐতিহাসিক মূল্যও থাকে তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়, শ্যামলবর্মা এবং বল্লালসেনের সঙ্গেই বাঙলায় প্রচলিত বর্ণ-বিন্যাস ও সামাজিক স্তর-বিভাগের ইতিহাস অঙ্গাঙ্গী জড়িত। লোকস্মৃতির নীচে সাধারণত কোথাও একটা কিছু সত্য গোপন থাকে; বর্মণ ও সেন-বংশের সামাজিক আদর্শ সম্বন্ধে যে অকাট্য নিঃসংশয় প্রমাণ সুবিদিত, লোকস্মৃতি এই ক্ষেত্রে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে না। আনন্দভট্টের বল্লালচরিত-গ্রন্থ খুব প্রামাণিক না হইতে পারে (সে-আলোচনাও অন্যত্র করিয়াছি) কিন্তু ইহার সামাজিক ইঙ্গিত একেবারে হয়তো মিথ্যা নয়। বল্লালসেন বণিকদের উপর অত্যাচার এবং সুবর্ণবণিকদের 'পতিত' করিয়া দিয়াছিলেন, এবং কৈবর্ত, মালাকার, কুম্ভকার ও কর্মকারদের সৎশূদ্রস্তরে উন্নীত করিয়াছিলেন বলিয়া এই গ্রন্থে যে-বর্ণনা আছে, তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য না-ও হইতে পারে, কিন্তু সেন-রাষ্ট্র ও রাজবংশের আমলে এইভাবে সমাজের বিভিন্ন স্তর নির্ণয় এবং কোন্ স্তরে কোন্ সম্প্রদায়ের স্থান ইত্যাদি নির্দেশ করা হইতেছিল, তাহা অস্বীকার করা চলে না। হয়তো তাহার পশ্চাতে রাষ্ট্রের বা রাজকীয় নির্দেশও কিছু ছিল।

এই ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল বরেন্দ্রী ও রাঢ়দেশ, এবং পরবর্তীকালে বিক্রমপুর অঞ্চল। কিন্তু বিক্রমপুর বৌদ্ধ সাধনা ও সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্রস্থল থাকাতে সেখানে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতাপ রাঢ়-বরেন্দ্রীর মতন এতটা প্রবল হইয়া উঠিতে পারে নাই। আর, ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম অঞ্চলে বৌদ্ধ সাধনার প্রভাব বহুদিন পর্যন্ত প্রবল ছিল। এ-সম্বন্ধে লিপিপ্রমাণ বিদ্যমান। বোধ হয়, এইজন্যই মৈমনসিংহ-ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম-শ্রীহট্ট অঞ্চলে আজও ব্রাহ্মণ্য স্মৃতির শাসন অপেক্ষাকৃত শিথিল।

সেন ও বর্মণ উভয় বংশই দাক্ষিণাগত; এ-তথ্য সুবিদিত যে, আন্ধ্র-সাতবাহন আমল হইতেই দক্ষিণদেশ ব্রাহ্মণ্যধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতির খুব বড় কেন্দ্র। পল্লব, চোল, চালুক্য ইত্যাদি সকল রাজবংশই এই ধর্ম ও সংস্কৃতির পোষক, ধারক ও সমর্থক। বস্তুত, উত্তর-ভারত অপেক্ষা দক্ষিণ-ভারত এই বিষয়ে অধিকতর গোঁড়া, পরিবর্তন-বিবর্তন বিমুখ। শুধু আজই এইরূপ নয়; প্রাচীনকালেও তাহাই ছিল। কলিঙ্গ-কর্ণাট হইতে বর্মণ ও সেনেরা সেই আদর্শ লইয়াই বাঙলাদেশে আসিয়াছিলেন, এবং রাষ্ট্রের বিপুল ও সক্রিয় সমর্থন এবং রাজবংশের মর্যাদার বলে সহায়তায় সেই আদর্শ এবং তদনুযায়ী স্মৃতি ও ব্যবহার শাসন বাঙলাদেশে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই চেষ্টা সফল হইয়াছিল। বাধা-বিরোধীতা তখনও হইয়াছিল, পরেও হইয়াছে; বঙালী সমাজ পদ্ধতি ও শাসন বাঙলায় সর্বত্র সমভাবে স্বীকৃত ছিল না, এখনও নাই; কিন্তু কোনো বাধাই যথেষ্ট কার্যকরী হয় নাই। আজ পর্যন্ত উচ্চতর বর্ণ ও সমাজ সেই যুগেরই স্মৃতি ও ব্যবহার-শাসন মানিয়া চলিতেছে, নিম্নতর বর্ণেরও তাহাই আদর্শ ও মাপকাঠি।

কিন্তু, সমসাময়িক বাঙলাদেশের পক্ষে কি তাহা সার্থক ও কল্যাণকর হইয়াছিল?

পরবর্তী ইতিহাসের কথা বলিব না, তাহা এই গ্রন্থের বিষয়ীভূত নহে। কিন্তু সমসাময়িককালে ইহার ঐতিহাসিক ইঙ্গিত নির্ধারণ ঐতিহাসিকের কর্তব্য।

আগের পর্বে দেখিয়াছি, পাল-যুগের সামাজিক আদর্শ ছিল বৃহত্তর সামাজিক সমন্বয় ও স্বাঙ্গীকরণ। ইতিহাসের চক্রাবর্তে বৈদিক ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের যে-স্রোত বাঙলাদেশে প্রবাহিত হইতেছিল সেই স্রোতকে ব্রাহ্মণেতর ধর্ম ও সংস্কৃতির স্রোতের সঙ্গে মিলাইয়া মিশাইয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্মেরই কাঠামো ও আদর্শানুযায়ী একটি বৃহত্তর সামাজিক সমন্বয় গড়িয়া তোলাই ছিল পাল-চন্দ্র পর্বের সাধনা। সমসাময়িক সমাজ, রাষ্ট্র ও রাজবংশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আদর্শ তাহাই ছিল। গুপ্ত-আমল হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব বাঙলাদেশে সুস্পষ্ট এবং ক্রমবর্ধমান; তখন হইতেই না হউক, অন্তত সপ্তম-অষ্টম শতক হইতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কৃতিই বলবত্তর; কখনো তাহা অস্বীকৃত হয় নাই। বৌদ্ধ খড়্গ বা পাল বা চন্দ্র রাজারাও তাহা করেন নাই, বরং তাঁহারা সেই আদর্শই মানিয়া লইয়াছেন, ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করিয়াছেন, পুরোহিত অর্চিত শান্তিবারি মস্তকে গ্রহণ করিয়াছেন, ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর মন্দির স্থাপন করিয়াছেন, চাতুর্বর্ণ্য সমাজ রক্ষা ও পালন করিয়াছেন, রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ পাঠ শুনিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, পাল-যুগে ব্রাহ্মণ্য এবং বৌদ্ধ দেবদেবীদের মধ্যেও একটা বৃহৎ সমন্বয়-স্বাঙ্গীকরণ ক্রিয়া চলিতেছিল; বৌদ্ধ ও শৈব তন্ত্রধর্ম ও চিন্তা বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীদের একটি বৃহৎ সমন্বয় সূত্রে গাঁথিয়া তুলিতেছিল; বৌদ্ধেরা অসংখ্য ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীকে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন; আর্যেতর, ব্রাহ্মণেতর সংস্কৃতির দেবদেবীদের পংক্তিভুক্ত করিতেছিলেন। অন্যদিকে ব্রাহ্মণেরাও বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণেতর, আর্যেতর দেবদেবীদের কিছু কিছু মানিয়া লইতেছিলেন। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই এই সমন্বয়-স্বাঙ্গীকরণ ক্রিয়া সমভাবে চলিতেছিল। বর্ণ-বিন্যাস ও সামাজিক স্তরভেদের ব্যাপারেও তাহা দৃষ্টিগোচর। পাল-আমলে চণ্ডাল পর্যন্ত সকল শ্রেণী ও বর্ণের লোকেরাই রাষ্ট্রের দৃষ্টিভূত; সেন-আমলে শুধু উচ্চতর বর্ণের লোকেরাই রাষ্ট্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আছেন। এমন কি রাষ্ট্রযন্ত্রেও ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতদের প্রাধান্য। পাল-রাজারা চাতুর্বর্ণ্য সমাজ রক্ষা ও ধারণ করিয়াছেন, কিন্তু সেন ও বর্মণ রাজারা ইচ্ছামত এবং স্মৃতি-নির্দেশমত চতুর্বর্ণের বিভিন্ন স্তর ঢালিয়া সাজিয়াছেন। বস্তুত, পাল আমলের ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির সমন্বয় ও স্বাঙ্গীকরণের আদর্শ এই যুগে যেন একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছিল; সেই আদর্শের স্থানে সবলে ও সোৎসাহে তাঁহারা এক নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই আদর্শ স্মৃতি-শাসিত বৈদিক ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কৃতির আদর্শ, সর্বপ্রকার যুগোপযোগী সমন্বয় ও স্বাঙ্গীকরণ-বিরোধী আদর্শ।

কুলজী-গ্রন্থধৃত লোকস্মৃতির যদি কিছু মাত্র মূল্যও থাকে, বল্লাল-চরিত গ্রন্থোক্ত কাহিনীর পশ্চাতে যদি কোনো সত্য থাকে, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়, সেন ও বর্মণ

কিন্তু, লোকস্মৃতি ও লোকেতিহাসের যদি কিছুমাত্র ঐতিহাসিক মূল্যও থাকে তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়, শ্যামলবর্মা এবং বল্লালসেনের সঙ্গেই বাঙলার প্রচলিত বর্ণ-বিন্যাস ও সামাজিক স্তর-বিভাগের ইতিহাস অঙ্গাঙ্গী জড়িত। লোকস্মৃতির নীচে সাধারণত কোথাও একটা কিছু সত্য গোপন থাকে ; বর্মণ ও সেন-বংশের সামাজিক আদর্শ সম্বন্ধে যে অকাট্য নিঃসংশয় প্রমাণ সুবিদিত, লোকস্মৃতি এই ক্ষেত্রে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে না। আনন্দভট্টের বল্লালচরিত-গ্রন্থ খুব প্রামাণিক না হইতে পারে (সে-আলোচনাও অন্যত্র করিয়াছি) কিন্তু ইহার সামাজিক ইঙ্গিত একেবারে হয়তো মিথ্যা নয়। বল্লালসেন বণিকদের উপর অত্যাচার এবং সুবর্ণবণিকদের 'পতিত' করিয়া দিয়াছিলেন, এবং কৈবর্ত, মালাকার, কুম্ভকার ও কর্মকারদের সৎশূদ্রস্তরে উন্নীত করিয়াছিলেন বলিয়া এই গ্রন্থে যে-বর্ণনা আছে, তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য না-ও হইতে পারে, কিন্তু সেন-রাষ্ট্র ও রাজবংশের আমলে এইভাবে সমাজের বিভিন্ন স্তর নির্ণয় এবং কোন্ স্তরে কোন্ সম্প্রদায়ের স্থান ইত্যাদি নির্দেশ করা হইতেছিল, তাহা অস্বীকার করা চলে না। হয়তো তাহার পশ্চাতে রাষ্ট্রের বা রাজকীয় নির্দেশও কিছু ছিল।

এই ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল বরেন্দ্রী ও রাঢ়দেশ, এবং পরবর্তীকালে বিক্রমপুর অঞ্চল। কিন্তু বিক্রমপুর বৌদ্ধ সাধনা ও সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্রস্থল থাকাতে সেখানে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতাপ রাঢ়-বরেন্দ্রীর মতন এতটা প্রবল হইয়া উঠিতে পারে নাই। আর, ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম অঞ্চলে বৌদ্ধ সাধনার প্রভাব বহুদিন পর্যন্ত প্রবল ছিল। এ-সম্বন্ধে লিপিপ্রমাণ বিদ্যমান। বোধ হয়, এইজন্যই মৈমনসিংহ-ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম-শ্রীহট্ট অঞ্চলে আজও ব্রাহ্মণ্য স্মৃতির শাসন অপেক্ষাকৃত শিথিল।

সেন ও বর্মণ উভয় বংশই দাক্ষিণাগত ; এ-তথ্য সুবিদিত যে, আন্ধ্র-সাতবাহন আমল হইতেই দক্ষিণদেশ ব্রাহ্মণ্যধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতির খুব বড় কেন্দ্র। পল্লব, চোল, চালুক্য ইত্যাদি সকল রাজবংশই এই ধর্ম ও সংস্কৃতির পোষক, ধারক ও সমর্থক। বস্তুত, উত্তর-ভারত অপেক্ষা দক্ষিণ-ভারত এই বিষয়ে অধিকতর গোঁড়া, পরিবর্তন-বিবর্তন বিমুখ। শুধু আজই এইরূপ নয় ; প্রাচীনকালেও তাহাই ছিল। কলিঙ্গ-কর্ণাট হইতে বর্মণ ও সেনেরা সেই আদর্শ লইয়াই বাঙলাদেশে আসিয়াছিলেন, এবং রাষ্ট্রের বিপুল ও সক্রিয় সমর্থন এবং রাজবংশের মর্যাদার বলে সহায়তায় সেই আদর্শ এবং তদনুযায়ী স্মৃতি ও ব্যবহার শাসন বাঙলাদেশে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই চেষ্টা সফল হইয়াছিল। বাধা-বিরোধীতা তখনও হইয়াছিল, পরেও হইয়াছে ; বঙালী সমাজ পদ্ধতি ও শাসন বাঙলার সর্বত্র সমভাবে স্বীকৃত ছিল না, এখনও নাই ; কিন্তু কোনো বাধাই যথেষ্ট কার্যকরী হয় নাই। আজ পর্যন্ত উচ্চতর বর্ণ ও সমাজ সেই যুগেরই স্মৃতি ও ব্যবহার-শাসন মানিয়া চলিতেছে, নিম্নতর বর্ণেরও তাহাই আদর্শ ও মাপকাঠি।

কিন্তু, সমসাময়িক বাঙলাদেশের পক্ষে কি তাহা সার্থক ও কল্যাণকর হইয়াছিল ?

রাজপাদপোজীবী হইতেছিলেন, তাহা তো আগেই বলিয়াছি। ভবদেব-ভট্টের মতন একজন পণ্ডিত ও রাষ্ট্রনায়ক ব্রাহ্মণদের কৃষিকার্য সমর্থন করিয়াছেন ; লিপিমালার প্রমাণ পাইতেছি, ব্রাহ্মণেরা রাষ্ট্রকার্যে, সামরিক ও অন্যান্য ব্যাপারেও উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত আছেন, অথচ ভবদেবই ব্রাহ্মণদের পক্ষে অন্য প্রায় সকল বৃত্তিই নিষিদ্ধ বলিয়া বলিতেছেন, এমন কি অব্রাহ্মণকে শিক্ষাদান, এবং অব্রাহ্মণের যাগযজ্ঞ-পূজা-অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য পর্যন্ত। শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিভেদের সৃষ্টি, ভেদবুদ্ধি সৃষ্টির প্রমাণ ইহার চেয়ে আর কি থাকিতে পারে! ব্রাহ্মণদের পক্ষে চিকিৎসাবিদ্যার চর্চা, চিত্রবিদ্যার চর্চাও নিষিদ্ধ ছিল ; যাঁহারা তাহা করিতেন তাঁহারা 'পতিত' হইতেন। জ্যোতির্বিদ্যার চর্চাও নিষিদ্ধ ছিল ; দেবল ব্রাহ্মণরা তো এই জন্যই 'পতিত' হইয়াছিলেন। অথচ ভবদেব-ভট্ট, বল্লালসেন প্রভৃতিরা স্বয়ং এবং আরও অনেক সমসাময়িক প্রধান প্রধান পণ্ডিত-ব্রাহ্মণ জ্যোতিষ, ফলসংহিতা, হোরাশাস্ত্র ইত্যাদির চর্চা করিতেন। তাঁহারা তো 'পতিত' হন নাই! ব্রাহ্মণেতর বর্ণের পৌরোহিত্য যাঁহারা করিতেন তাঁহারা ঐ সব নিম্ন বর্ণের বর্ণভুক্ত হইতেন! শ্রেণী-ভেদবুদ্ধির আর কি প্রমাণ প্রয়োজন? এই সব সাক্ষ্য সমস্তই সমসাময়িক। ইহার উপর বল্লাল-চরিতের সাক্ষ্য যদি প্রামাণিক হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়, বল্লালের সেনরাষ্ট্র কোনো না কোনো কারণে বণিকদের সমর্থন হারাইয়াছিল, এবং তাহারই ফলে সমাজে সুবর্ণবণিকদের 'পতিত' হইতে হইয়াছিল। সেক-শুভোদয়ার একটি গল্পে দেখিতেছি, লক্ষ্মণসেনের এক শ্যালক, রাণী বল্লভার এক ভ্রাতা কুমারদত্ত, এক বণিক্-বধূর উপর পাশবিক অত্যাচার করিতে গিয়াছিল। বণিকবধূ মাধবী যে শেষ পর্যন্ত রাজসভায় সুবিচার পাইয়াছিলেন তাহা শুধু তেজস্বী ব্রাহ্মণ সভাকবি ও পণ্ডিত গোবর্ধন আচার্যের জন্য। নাহিলে রাজসভায় মন্ত্রী, রাজমহিষী ও স্বয়ং রাজার যে আচরণ এই গল্পের মধ্যে প্রকাশ তাহা সেন-রাজসভার পক্ষে খুব প্রশংসনীয় নয়। বল্লালসেন যে মালাকার, কর্মকার, কুম্ভকার এবং কৈবর্তদের উন্নীত করিয়াছিলেন, এইখানেও তো শ্রেণীগত ভেদবুদ্ধির প্রমাণ সুস্পষ্ট। বৃহদ্ধর্ম ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেও দেখিতেছি, অনেকগুলি সমৃদ্ধ ও অর্থশালী শিল্পী ও বণিক সম্প্রদায় মধ্যম সংকর ও অসৎ-শূদ্র পর্যায়ভুক্ত এবং স্বর্ণকার ও সুবর্ণবণিকদের স্থান এই পর্যায়ে। বৌদ্ধ ধর্ম-সম্প্রদায়ের লোকেরা যে সেন-রাষ্ট্রের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন না, তাহার ইঙ্গিত তো তারনাথের বিবরণীতেও খানিকটা পাওয়া যাইতেছে। তাঁহাদের দোষও দেওয়া যায় না ; সেন-বর্মণ রাষ্ট্র তো তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধিত ও সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল না, আর, রাষ্ট্রের সামাজিক আদর্শও বৌদ্ধস্বার্থ বিরোধী ছিল। বর্ণভেদবুদ্ধি এবং এই শ্রেণীভেদবুদ্ধি একত্র জড়িত হইয়া নবগঠিত বাঙলাদেশ ও জাতিকে, সেন-রাষ্ট্রকে ভিতর হইতে দুর্বল করিয়া দেয় নাই, এ-কথাই বা কে বলিবে? সামন্ততন্ত্র এবং অস্বাভাবিকরূপে স্ফীত আমলাতন্ত্র-বিন্যস্ত সেন-বর্মণরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় আদর্শে ভেদবুদ্ধির দুর্বলতা, স্থানীয় আত্ম-কর্তৃত্বের দুর্বলতা তো

ছিলাই ; তাহার উপর বর্ণ ও শ্রেণীগত এই ভেদবুদ্ধি, সমাজাদর্শগত ভেদবুদ্ধি বৈদেশিক আক্রমণকে প্রশ্রয় দেয় নাই, সহজ করিয়া দেয় নাই, তাহা কে বলিবে ? বিহার-ধ্বংসের কথা শুনিয়াই নবদ্বীপের প্রায় সমস্ত লোক ভয়ে আতঙ্কে পলাইয়া গিয়াছিল, রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান উপদেষ্টা ও মন্ত্রীবর্গ লক্ষ্মণসেনকে পলায়নের পরামর্শ দিয়াছিলেন, রাজ-জ্যোতিষীরা লক্ষ্মণসেনকে বিভ্রান্ত করিয়াছিলেন, সমসাময়িক সামাজিক আদর্শ ও বিন্যাসের দিক হইতে দেখিলে মিনহাজ্-উদ্-দীনের এই সব উক্তি একেবারে মিথ্যা বলিয়া মনে হয় না। বণিকেরা বিরোধীতা করেন নাই, তাহাই বা কে বলিবে ? অন্তত তাঁহারাও নিজেদের কর্তব্য ফেলিয়া দিয়া পলাইয়াছিলেন, মিনহাজ বলিয়াছেন। এই সব সর্বব্যাপী ভেদবুদ্ধির আচ্ছন্নতার মধ্যে লক্ষ্মণসেনের কিংবা তাঁহার পুত্রদের ব্যক্তিগত শৌর্যবীর্য বা সৈন্যদলের প্রতিরোধ কতটুকু কার্যকরী হইতে পারে ?

শুধু তো এইখানেই শেষ নয়। আর্যেতর ধর্মের আচারানুষ্ঠান এবং ভ্রান্তধর্মের বিকৃতি এই সময় বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য উভয় ধর্ম ও সমাজকেই স্পর্শ করিয়াছিল, এবং উভয় ধর্মেরই আচারানুষ্ঠানকে নানাপ্রকার যৌনাতিশয্যে ব্যাধিগ্রস্ত করিয়াছিল। বোধ হয়, তাহারই ফলে সমাজে, বিশেষভাবে উচ্চ বর্ণ ও শ্রেণীগুলিতে নানাপ্রকারের কাম ও যৌনবিলাস দেখা দিয়াছিল। সেন-বর্মণ যুগের স্মৃতি ও কাব্যগ্রন্থাদি, লিপিমালা এবং ধর্মানুষ্ঠানের বিবরণগুলি পাঠ করিলে এ-সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহ থাকে না। বস্তুত, যৌন আচার-ব্যবহারে কোনোপ্রকার শ্লীলতা জ্ঞান এই সমাজে ছিল বলিয়াই মনে হয় না। নাগর সমাজে প্রায় প্রত্যেকের বাড়ীতে ব্যক্তিগত উপভোগের জন্য দাসী রাখা নিয়মের মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। জীমূতবাহন এবং টীকাকার মহেশ্বরের সাক্ষ্য এ-সম্বন্ধে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। আর, সেন-আমলেই বোধ হয় দেবদাসী প্রথা বাঙলাদেশে বিস্তৃতি লাভ করে। বাঙলাদেশে এই প্রথা কল্যাণকর হয় নাই। এই প্রথা ক্রমশ যৌনাতিশয্যের দ্যোতক হইয়া উঠিয়াছিল এবং রাজরাজড়া হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চতর বর্ণ ও শ্রেণীর সমৃদ্ধ লোকেরা এই প্রথার আশ্রয়ে তাঁহাদের কাম-বাসনার চরিতার্থতা খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন, এ-সম্বন্ধেও সন্দেহ করিবার কারণ নাই। বিজয়সেন ও ভট্ট ভবদেব দুইজনই তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত ধর্মমন্দিরে শত শত দেবদাসী উৎসর্গ করিবার গৌরব দাবি করিয়াছেন! সুহ্মদেশে আর এক সেনরাজ (বোধ হয়, লক্ষ্মণসেন)-প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে দেবদাসীর (বার-রামা) উল্লেখ ধোয়ী কবির পবনদূত-কাব্যে পাওয়া যায়। সন্ধ্যা-করনন্দীর রামচরিতেও দেববারবনিতার উল্লেখ সুস্পষ্ট। হয়তো পালযুগেই এই প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছিল ; রাজতরঙ্গিণী-গ্রন্থে কমলা-নর্তকীর কাহিনী প্রাসঙ্গিক। কিন্তু সেন-আমলে ইহার বিস্তৃতি ও সমসাময়িক কবিকণ্ঠে এই সব বাররামা-বারবনিতাদের উচ্ছ্বাসময় নির্লজ্জ স্তুতিগান অনস্বীকার্য। ধোয়ী এবং ভবদেব-প্রশস্তির কবি এই বারবনিতাদের উপর কবিকল্পনার অজস্র মধুময় বাণী বর্ষণ করিয়াছেন। সেন-বর্মণরা বোধ হয় দাক্ষিণ-

দেশ হইতে এই দেবদাসী প্রথার প্রবাহ নূতন করিয়া বাঙলাদেশে লইয়া আসিয়াছিলেন। সমসাময়িক বাঙলার নাগর-সমাজের যুবক যুবতীদের যে কামলীলার বিবরণ ধোয়ী কবির পবনদূতে পাওয়া যায় তাহাও খুব প্রশংসনীয় নয়, অথচ কবি তাহাকে সাধারণসমাজ জীবনের অঙ্গ বলিয়াই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। বাৎস্যায়ন তাঁহার কামসূত্রে গৌড়-বঙ্গের রাজান্তঃপুরে কামচাতুর্যলীলার এবং নির্লজ্জ কামক্রিয়ার উল্লেখ করিয়াছেন (তৃতীয়-চতুর্থ শতক), এবং বৃহস্পতিও বলিয়াছেন যে, প্রাচ্যদেশের দ্বিজবর্ণেরা মেয়েরা যৌনব্যাপারে দুর্নীতিপরায়ণ। কিন্তু সমাজ তখনকার সেই সওদাগরী ধনতন্ত্র এবং সুগঠিত কেন্দ্রীয় রাজতন্ত্রের আমলে এত দুর্বল ছিল না, ভেদবুদ্ধি এত প্রবল ছিল না, এবং এই সব দুর্নীতি দ্বিজবর্ণ, রাজান্তঃপুর এবং অভিজাতশ্রেণী অতিক্রম করিয়া সমাজের সকল স্তরে বিস্তৃত হইয়া পড়ে নাই। পাল-আমলের শেষের দিক হইতেই তাহা দেখা দিল এবং সেন-আমলে সমগ্র সমাজদেহকে তাহা কলুষিত করিয়া দিল। ব্রাহ্মণ শূদ্র নারীকে বিবাহ করিতে পারিত না, কিন্তু শূদ্র নারীর সঙ্গে বিবাহবহির্ভূত যৌন সম্বন্ধে তাহার বিশেষ কোন বাধা ছিল না; নামমাত্র শাস্তিতেই সে-অপরাধ কাটিয়া যাইত, ইহাই সমসাময়িক বাঙলার স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান! বিলাস ও আড়ম্বরাতিশয্যও এই সময় নাগর সমাজকে গ্রাস করিয়াছিল। সন্ধ্যাকরনন্দী রামাবতী এবং ধোয়ী কবি বিজয়পুরের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে এ-সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকে না। এই যুগের প্রস্তরশিল্পেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। পল্লবিত বাক্য, ভাবোচ্ছ্বাসবিলাসময় কল্পনা, আড়ম্বরময় অতিশয়োক্তি, অলঙ্কার প্রাচুর্য এবং লাস্যবিলাসময়, শৃঙ্গাররসাবিষ্ট দৃষ্টি তো এই যুগেরই সাহিত্য ও শিল্পের বৈশিষ্ট! সদ্যোক্ত যৌনাতিশয্য ও কামবিলাস জনসাধারণের ধর্মানুষ্ঠানগুলিকেও স্পর্শ করিয়াছিল। শারদীয়া দুর্গাপূজার সময় দশমী তিথিতে শারদোৎসব নামে একটি নৃত্যগীতোৎসব প্রচলিত ছিল; গ্রামে নগরে এই উৎসবে নরনারীর দল কর্দমলিপ্ত এবং বৃক্ষপত্রমাত্র পরিহিত ও অর্ধ উলঙ্গ হইয়া নানাপ্রকার যৌনক্রিয়াগত অঙ্গভঙ্গী করিয়া এবং তদ্বিষয়ক গান গাহিয়া উন্মত্ত নৃত্যে মাতিত; তাহা না করিলে নাকি দেবী ভগবতী ক্রুদ্ধা হইতেন, সমসাময়িক কালবিবেক-গ্রন্থ এবং প্রায় সমসাময়িক বা কিছু পরবর্তী কালিকাপুরাণে তাহা উল্লেখ করা হইয়াছে। বৃহদ্ধর্মপুরাণে এই সম্বন্ধে একটু বিধিনিষেধের বর্ণনা আছে, কিন্তু তাহা শক্তি-উপাসক বা উপাসিকার পক্ষে প্রযোজ্য নয়। তাঁহারা এইরূপ করিলে নাকি দেবীর সুখ উৎপাদিত হইত! যৌন অধোগতির প্রমাণ ইহার চেয়ে বেশী আর কি হইতে পারে! বসন্তে হোলাক (হোলী) এবং চৈত্র মাসে কাম-মহোৎসবেও প্রায় অনুরূপ অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল। কালবিবেক-গ্রন্থে বলা হইয়াছে, কামমহোৎসবে নানাপ্রকার যৌন অঙ্গভঙ্গী এবং জুগুপ্সিতোক্তি করিয়া নৃত্যগীত করিলে কামদেবতা প্রীত হন, এবং তাহার ফলে ধনেপুত্রে লক্ষ্মীলাভ হয়! ইহাই বুঝি ছিল সমসাময়িক কালের বিবেক!

এইখানেই শেষ নয়। সেন-রাজসভায় কবি ও পণ্ডিতের সমাদর ছিল খুব। বিজয়-বল্লাল-লক্ষ্মণ-কেশবের রাজসভা অনেক কবিরাই অলঙ্কৃত করিতেন; আর বল্লাল, লক্ষ্মণ, এবং তাঁহার একপুত্র তো নিজেরাও ছিলেন কবি ও পণ্ডিত। বস্তুত, সেন-আমল বাঙলা-দেশে সংস্কৃত সাহিত্যের সুবর্ণযুগ। এই ক্ষেত্রেও সেন-রাজাদের সামাজিক আদর্শ সক্রিয়। কিন্তু, এই সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যও সমসাময়িক ঐশ্বর্য-বিলাস এবং কামবাসনার আতিশয্য দ্বারা স্পৃষ্ট। জয়দেব স্বয়ং বলিতেছেন, ত্রুটিবিহীন শৃংগার কাব্য রচনায় গোবর্ধন কবির তুলনা ছিল না। আর্যা সপ্তশতীই তাহার সাক্ষ্য। আর, জয়দেবের গীতগোবিন্দও তো এক হিসাবে শৃংগার কাব্যই; কামবাসনার কাব্যোচ্ছ্বাসময় কল্পনাই তো এই কাব্যের বৈশিষ্ট্য। ষোড়শ শতকে সন্ত কবি নাভাজী দাস তাঁহার ভক্তমাল-গ্রন্থে এই কাব্যকে বলিয়াছেন কোকশাস্ত্র (কামশাস্ত্র) এবং শৃংগার রসের আগার। বস্তুত, এই যুগের সর্বোৎকৃষ্ট কাব্য এবং কবিতাগুলি ঐশ্বর্যবিলাসে এবং যৌনকামবাসনায় মদির এবং মধুর। রাজসভায় বসিয়া রাজা ও পাত্রমিত্রসভাসদ সকলে এই সব মদির-মধুর কাব্য উপভোগ করিতেন। এই পরিবেশ ও আবেষ্টনীর সঙ্গে দেববারবনিতা ও দেবদাসীদের যে উচ্ছ্বাসময় স্তব সমসাময়িক কবিরা করিয়াছেন তাহার কোথাও কোনো অমিল নাই। এই মদিরমাধুর্য এবং বিলাসলালসময় ভাবকল্পনা কি রাজসভার বাহিরেও বিস্তার লাভ করে নাই, বৃহত্তর সমাজদেহের নাড়ীতে প্রবেশ করে নাই? এই প্রসঙ্গে সভাকবি উমাপতি-ধরের ম্লেচ্ছ রাজার সাধুবাদ সম্বন্ধে যে শ্লোকটি আগে উদ্ধার করিয়াছি তাহার সামাজিক ইঙ্গিত, এবং সেক-শুভোদয়া কথিত কুমারদত্ত মাধবী কাহিনী আবার স্মরণ করা যাইতে পারে। সেন-রাজসভার চরিত্র ও আবহাওয়া তাহা হইতেও কতকটা বুঝা যায়। সেক-শুভোদয়ায় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইয়াছে যে, লক্ষ্মণসেনের রাজসভার অন্যতম অলঙ্কার, কবি, স্মার্ত পণ্ডিত, বাল্যে রাজপণ্ডিত, যৌবনে মহামন্ত্রী এবং প্রৌঢ়াবস্থায় মহাধর্মাধ্যক্ষ, রাজার সর্বোত্তম আবাল্য সুহৃৎ হলায়ুধ মিশ্র শেখ্ জালাল উদ্-দীন তাব্রিজির খুব পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিলেন। এ-তথ্য যদি সত্য হয়, সেক-শুভোদয়ার সাক্ষ্য যদি প্রামাণিক হয় তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়, সেনরাষ্ট্র ও সেন রাজসভার চরিত্র বলিয়া কিছু ছিল না! সভাকবি উমাপতি ধর এবং মহাধর্মাধ্যক্ষ হলায়ুধ মিশ্র এই চরিত্রহীনতার দুইটি দৃষ্টান্ত মাত্র! পৃথিবীর সর্বত্রই তো রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অধোগতির এই একই চিত্র—প্রাচীন গ্রীসে, রোমে, অষ্টাদশ শতকের প্যারিসে, অষ্টাদশ শতকের কৃষ্ণনগরে, ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধের কলিকাতায়। সে-চিত্র-সামাজিক দুর্নীতির, চারিত্রিক অবনতির, মেরুদণ্ডবিহীন ব্যক্তিত্বের, কামপরায়ণ বিলাসলীলার, শৃংগাররসাবিষ্ট, অলংকারবহুল, মদির-মধুর শিল্প ও সাহিত্যের, তরল রুচি ও দেহগত বিলাসের, অতিমাত্রায় ভেদ-বৈষম্যের, ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত বিশ্বাসঘাতকতার। একাদশ-দ্বাদশ শতকের রামাবতী, বিজয়পুর, নবদ্বীপেও সেই একই ছবি দেখিতেছি!

উত্তর-পূর্ব ভারতের রাষ্ট্রীয় অবস্থাটাও এই ফাঁকে একটু দেখিয়া লওয়া যাইতে পারে। বখ্‌ত্‌-ইয়ার কর্তৃক বিহার-লুণ্ঠনের মিন্‌হাজ্‌-কথিত কাহিনী তো আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এ-সম্বন্ধে বৌদ্ধ লামা তারনাথও কিছু বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন। তারনাথের বর্ণনা জনশ্রুতিনির্ভর ; কাজেই তাঁহার সব উক্তি বিশ্বাসযোগ্য হয়তো নয়। তবু সামাজিক তথ্যের খানিকটা ইঙ্গিত এই বর্ণনার মধ্যে পাওয়া যাইতে পারে। তারনাথ বলিতেছেন, চন্দ্রবংশীয় (?) লবসেনের বংশধরেরা (তারনাথ কর্ণাটাগত ব্রহ্মক্ষত্রিয় সেন-বংশের খবর নিশ্চয়ই জানিতেন না) আশী বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। মগধে এই সময় তীর্থিক (ব্রাহ্মণ্য) ধর্ম ক্রমশ বিস্তার লাভ করিতেছিল, এবং তাজিক (ইস্‌লাম্‌) ধর্মবিশ্বাসী অনেক লোকের উদয় হইতেছিল। ইহার পর গঙ্গা-যমুনার মধ্যস্থিত অন্তর্বেদীতে তুরস্ক-রাজ 'চন্দ্র' (মূল তুরস্ক-নামের তিব্বতী অনুবাদ হওয়া বিচিত্র নয় ; তিব্বতী পণ্ডিতেরা তো নামও অনুবাদ করিতেন) আবির্ভূত হন। তিনি অনেক সংবাদবাহী ভিক্ষুদের মধ্যবর্তিতায় বাঙলা ও তাহার পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তুরস্ক রাজাদের নিজের দলভুক্ত করিয়া মগধ লুণ্ঠন করিতে থাকেন. এবং অনেক বৌদ্ধ আচার্যকে হত্যা করিয়া ওদন্তপুরী ও বিক্রমশিলা বিহার ধ্বংস করেন। এই সব ও অন্যান্য বৌদ্ধবিহারের অনেক পণ্ডিত নানাদিকে পলাইয়া যাইতে বাধ্য হন, এবং তাহার ফলে মগধে বৌদ্ধধর্ম বিলুপ্ত হইয়া যায়।

তারনাথের বিবরণী হইতে মনে হয়, একদল বৌদ্ধ ভিক্ষু মুহম্মদ বখ্‌ত্‌-ইয়ারের গুপ্তচরের কাজ করিয়াছিলেন, এবং বাঙলার সঙ্গে তাঁহার যোগাযোগের ব্যবস্থাও করিয়া দিয়াছিলেন। মিন্‌হাজ ও তারনাথের বিবরণ একত্র মিলাইয়া দেখিলে মনে হয়, বিহার-বাঙলারই একদল লোক বিভীষণ-বাহিনীর কাজ করিয়াছিল। মগধে তখন পরিপূর্ণ নৈরাজ্য, কিন্তু ভিতরে ভিতরে অবস্থাটা যে অচিরেই কি হইবে তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছিল। তাহা না হইলে, বিক্রমশিলা-বিহারের প্রধান মন্ত্রাচার্য রত্নরক্ষিত যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, দুই বৎসরের মধ্যেই তাজিকেরা মগধের দুইটি বিহার ধ্বংস করিবে, এই ভবিষ্যদ্বাণীর কোনো অর্থই হয় না। মিন্‌হাজ্‌ ও লক্ষ্মণসেনের রাজ-জ্যোতিষীদের মুখে যে-ভবিষ্যদ্বাণীর ইঙ্গিত দিয়াছেন তাহার অর্থও এই যে. সকলেই অবস্থাটা জানিত, এবং তুরুস্ক জাতীয় মুসলমান শত্রুরাই যে আক্রমণ-কর্তা, তাহাও জানিত। অথচ, প্রতিরোধের ব্যবস্থা তেমন কিছু হইয়াছিল, বলা যায় না। সাহাব্‌-উদ্‌-দীন্‌ ঘোরী দুইবার পরাজিত হইয়া তৃতীয় বারের চেষ্টায় পাঞ্জাব অধিকার করিয়াছিলেন, এবং তাহাও রাজদ্রোহীর বিশ্বাসঘাতকতায়। পরেও হিন্দুরাষ্ট্রশক্তিপুঞ্জ মুসলমান শক্তির বিরুদ্ধে কোনো সামগ্রিক প্রতিরোধ রচনা করিতে পারেন নাই। গজনীর মামুদের সফল আক্রমণের পর হইতে উত্তর-ভারতের অনেক স্থানেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলমান বসতিকেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। গাহড়বাল রাজ্যেও বোধ হয় এই ধরনের ছোট ছোট তুরুস্ক কেন্দ্র ছিল। জয়চন্দ্রের পিতামহ গাহড়বাল-রাজ গোবিন্দচন্দ্রের লিপিতে

তুরুষ্কদণ্ড নামে একপ্রকার করের উল্লেখ আছে ; এই সব কর বোধ হয় আদায় করা হইত গাহড়বাল রাজ্যান্তর্গত তুরুষ্ক-বাসিন্দাদের নিকট হইতে। মুহম্মদ বখ্ত্-ইয়ারের আক্রমণের আগেই উত্তর-ভারতের বিহার পর্যন্ত যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তুরুষ্ক-কেন্দ্র কিছু কিছু গড়িয়া উঠিয়াছিল তারনাথের বিবরণ হইতেও তাহার কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা কি এই সব তুরুষ্ক কেন্দ্রের সঙ্গেই বখ্ত্-ইয়ারের যোগসাধন করিয়া দিয়াছিলেন ? উত্তর-পূর্ব ভারতের এই উচ্ছৃঙ্খল অবস্থা কি লক্ষ্মণসেন ও তাঁহার উপদেষ্টা ও মন্ত্রীবর্গ জানিতেন না ? বোধ হয় জানিতেন, কিন্তু প্রতিকারের অর্থাৎ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় এই নিম্নগামী প্রবাহকে রোধ করিবার মতন সাহস ও শক্তি, বুদ্ধি ও চরিত্র, দৃষ্টি ও ব্যক্তিত্ব, ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি কাহারও ছিল না, না সেন-রাজসভায়, না বৃহত্তর সমাজে। সকলেই যেন অনিবার্য গড্ডালিকা প্রবাহে গা' ভাসাইয়া দিয়াছিলেন।

একদিকে উত্তর-ভারতের অধিকাংশ যখন মুসলমানদের করতলগত, উত্তর-গাঙ্গেয় ভারতে, অর্থাৎ বর্তমান যুক্তপ্রদেশ ও বিহারে যখন রাষ্ট্রীয় অবস্থা প্রায় নৈরাজ্য বলিলেই চলে, তখন বাঙলাদেশের রাষ্ট্র ও সমাজ ভেদবুদ্ধিদ্বারা আচ্ছন্ন, স্তরে উপস্তরে দুর্লঙ্ঘ্য সীমায় বিভক্ত ; রাজসভা চরিত্র ও আত্মশক্তিহীন ; ধর্ম ও সমাজ বিলাসলালসায় ও যৌনাতিশয্যে পীড়িত ; শিল্প ও সাহিত্য বস্তুসম্বন্ধবিচ্যুত ভাবকল্পনার জগতে পল্লবিত বাক্য, উচ্ছ্বাসময় অত্যুক্তি, আলঙ্কারিক আতিশয্য এবং দেহগত লীলাবিলাসে ভারগ্রস্ত ও মদির ; জনসাধারণের দেহমন বৌদ্ধ বজ্রযান-সহজযান প্রভৃতির এবং তান্ত্রিক সিদ্ধাচার্য-ডাকিনী-যোগিনীদের অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড তুকতাকে পঙ্গু ; উচ্চতর বর্ণসমাজ ব্রাহ্মণ্য পুরোহিততন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ্য রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্বে আড়ষ্ট ! রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অধোগতির চিত্র সম্পূর্ণ ; উভয়ই চরিত্রে ও আত্মশক্তিতে দুর্বল ও দৈন্যপীড়িত। এই দুর্বল ও দৈন্যপীড়িত রাষ্ট্র ও সমাজ ভাঙ্গিয়া পড়িবে, এবং সমাজ-প্রকৃতির নিয়মে পরবর্তীকালে শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপিয়া দেশ তাহার মূল্য দিয়া যাইবে, ইহা কিছু বিচিত্র নয়। বখ্ত্-ইয়ারের নবদ্বীপ-জয় এবং এক শত বৎসরের মধ্যে সমগ্র বাঙলাদেশ জুড়িয়া মুসলমান রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা কিছু আকস্মিক ঘটনা নয়, ভাগ্যের পরিহাসও নয়, রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধোগতির অনিবার্য পরিণাম !

মুসলমান অভ্যুদয়ের অব্যবহিত পূর্বের ভারতীয় বুদ্ধি ও সংস্কৃতির অবস্থার কথা বলিতে গিয়া প্রসিদ্ধ উর্দু ভাষী মুসলমান কবি হালি বলিয়াছেন :

"ইধর্ হিন্দ্ মেঁ হরতরফ অন্ধেরা।
কি থা দিয়ান গুলকা লড়াইয়াঁসে ভরা ॥"

বাস্তবিকই হিন্দুস্থানে তখন চারিদিকে অন্ধকার ॥

দশম অধ্যায়ের পাঠনির্দেশ

এ-অধ্যায়ের সূচনাপর্বে আমাকে নির্ভর করতে হয়েছে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ও ঐতরেয় আরণ্যক, আচারঙ্গসূত্র, রামায়ণ-মহাভারত, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, বায়ু, মৎস্য ইত্যাদি দু'চারিটি পুরাণ, রঘুবংশ জাতীয় সাহিত্যগ্রন্থ, গ্রীক ঐতিহাসিকদের বিবরণ ইত্যাদি উপাদান-উপকরণের উপর। ব্যবহৃত তথ্যাদি প্রায় সমস্তই সুপরিজ্ঞাত, বহু আলোচিত। কিন্তু মৌর্য আমল থেকে সুরু করে একেবারে আদিপর্বের শেষ পর্যন্ত আমার একান্ত নির্ভর প্রাচীন বাঙলাদেশ ও ভারতবর্ষের লিপিমালার উপর। প্রাচীন বাঙলার লিপিমালার একটি সমগ্র তালিকা পরিশিষ্ট "খ"-তে পাওয়া যাবে। অন্যান্য ভারতীয় লিপির উল্লেখ মূল গ্রন্থেই করা হয়েছে। প্রাচীন বাঙালীর একটিমাত্র চরিতকাব্য আছে যার ঐতিহাসিক মূল্য সর্বজন স্বীকৃত; সে-কাব্যটি হচ্ছে সন্ধ্যাকর-নন্দীর রামচরিত। যথাস্থানে এই গ্রন্থটি আমি ব্যবহার করেছি। ধোয়ীর পবনদূত কাব্যটিও আমার কাজে লেগেছে।

প্রাচীন বাঙলার রাজবৃত্ত সম্বন্ধে, অর্থাৎ বিশুদ্ধ রাজা-মহারাজ, রাজ্যবিজয়, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাবে আধুনিক কয়েকটি গ্রন্থে; বস্তুত অধিকাংশ গ্রন্থের প্রধান উপজীব্যই তো রাজা-রাজড়ার কীর্তিকাহিনী, যে-কীর্তিকাহিনীর প্রধান নির্ভর সাধারণত সভাকবির উচ্ছ্বাস-অত্যুক্তিময়, প্রভুস্তুতিময় অলংকৃত বাক্যাবলী। লক্ষণীয় এই যে, এ-গ্রন্থের যা কিছু 'সংযোজন', 'সংশোধন' বা 'পরিবর্তন' প্রয়োজন হচ্ছে তা প্রায় সবই এই রাজবৃত্ত অধ্যায়ে। তার প্রধান কারণ, ইতিমধ্যে অনেকগুলি লিপির আবিষ্কার, যার ফলে আমরা জানতে পেরেছি নূতন নূতন রাজার নাম, তাঁদের সন-তারিখ, তাঁদের কীর্তিকাহিনী, এমন কি নূতন রাজবংশেরও খবর। অন্যত্র, অন্যান্য অধ্যায়ে যে দু'চারিটি পরিবর্তন প্রয়োজন হয়েছে তা প্রায় সবই 'সংযোজন', 'সংশোধন' তত নয়, এবং এই 'সংযোজন' পূর্ববর্তী দুই সংস্করণের প্রায় সমস্ত বক্তব্যেরই সমর্থক ও পরিপূরক। আসল কথা, রাজপরম্পরা বদলায়, তাদের সন-তারিখ বদলায়, রাজ্যের পরিধি হ্রাসবৃদ্ধি পায়, কিন্তু সমাজ চলে, বদলায় নিজের নিয়মে, সামাজিক ঘটনা ও অবস্থার বিচিত্র আবর্তনের যুক্তি শৃঙ্খলায়, কোনও একজন ব্যক্তির নিরবচ্ছিন্ন নির্দেশে নয়। পরম্পরাগত ইতিহাসে তা হয় না। একক একজন ব্যক্তির নির্দেশে সমাজ পরিবর্তনের চেষ্টা সার্থক হয় না; ভারতের ইতিহাসে তার সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত সম্রাট অশোক।

যে-সব আধুনিক ক'একটি গ্রন্থের কথা একটু আগে উল্লেখ করেছি, তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা এই খণ্ডেই প্রথম অধ্যায়ের পাঠনির্দেশের শেষাংশে দেওয়া হয়েছে;

এখানে আর তার পুনরুল্লেখ করছিনা। যে তালিকায় উল্লেখ নেই এমন দু' একটি গ্রন্থ ও প্রকীর্ণ রচনার এখানে উল্লেখ করছি মাত্র।

Chaudhury, A. M., *Dynastic history of Bengal*, Dacca, 1967. Dani A. H., "Mainamati plates of the Candras", in *Pakistan Archaeology*, no. 3, 1966. Morrison, B. M., *Lalmai, a cultural centre of early Bengal*, Seattle, 1974. Morrison, B. M., *Political centres and cultural regions in early Bengal*, Tucson, 1970. Sircar, D. C., *Epigraphic discoveries in East Pakistan*, Calcutta, 1973. দীনেশচন্দ্র সরকার, "প্রথম শূরপালের তাম্রশাসন", বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৮৩, ১-২ সংখ্যা, ৪০ পৃ পৃ। দীনেশচন্দ্র সরকার, "সিয়ান গ্রামের শিলালেখ", বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৮৩, ৩-৪ সংখ্যা, ১ পৃ পৃ।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

বাঙালীর ইতিহাস

২নং মানচিত্র

জাও দ্য ব্যারোস-কৃত (১৫৫০) বাংলার ভূমি ও নদনদী নক্সা

বাঙালীর ইতিহাস

৩নং মানচিত্র

ফন্ ডেন্ ব্রোক-কৃত (১৬৬০) বাঙলার ভূমি ও নদনদী নক্সা

বাঙালীর ইতিহাস

৪নং মানচিত্র

রেনেল-কৃত (১৭৬৪-৭৭) বাঙলার ভূমি ও নদনদী নকসা

৩নং মানচিত্র

প্রাচীন বাঙলার জনপদ-বিভাগ

চম্পা
গঙ্গা
সোমপুর
পুণ্ড্রবর্ধন
রামাবতী
কর্ণসুবর্ণ
সিঙ্গল
কেন্দুবিল্ব
নবদ্বীপ
বিজয়পুর
তাম্রলিপ্তি
উপবঙ্গ
প্রাচীন
রাঢ়া
পূর্ব সাগর

৬নং মানচিত্র

প্রাচীন রাঢ়-দেশ